Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Mundaka Upanishad* before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math in the year 2012
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

শান্তি পাঠঃ
ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

(হে দেবগণ, আমরা কর্ণে যেন কল্যাণবচন শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন সুন্দর বস্তু দর্শন করি; দৃঢ়-অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত হয়ে আমরা যেন তোমাদের স্তবগানপূর্বক দেবকর্মে নিয়োজিত জীবনকাল প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন; সর্বজ্ঞানাধার পূষা আমাদের মঙ্গল করুন, সর্পাদিকৃত হিংসানিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন; বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।)

ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের ইতিহাস

বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ - দুটো আলাদা জগতের সমষ্টিতে সমগ্র জগৎ। এই দুটো জগৎই সম্পূর্ণ আলাদা। পাশ্চাত্য জগৎ তার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রিভূত করেছে বহির্জগতের উপর। যার জন্য তারা বিজ্ঞান ও কারিগরিতে সবার থেকে এগিয়ে গেছে। অন্য দিকে প্রাচ্য বিশেষ করে ভারত অন্তর্জগতের অনুসন্ধানেই নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত রেখেছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সময় আসে যখন তাকে বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে হয়। শাস্ত্রই আমাদের অন্তর্জগতের দিকে নিয়ে যেতে প্রাথমিক ভাবে সাহায্য করে। ধর্মশাস্ত্র মানেই হল যেখানে অন্তর্জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকে আছেন যাঁদের অন্তর্জগতের সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, আবার অনেকে আছেন যাঁদের ধারণা থাকলেও কখনই অন্তর্জগতে ঢুকতে চান না। কিন্তু মৃত্যু সবাইকে একটা সময়ে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাই সবাইকেই কোথাও না কোথাও বহির্জগতকে বিদায় জানাতে হয়। অনেকে জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজের ইচ্ছাতেই বহির্জগতকে ছেড়ে দেন, আর যারা নিজে থেকে ছাড়তে পারে না তাদের প্রকৃতি জোর করে ছাড়িয়ে দেয়।

যে শাস্ত্র আমাদের অন্তর্জগতের সন্ধান দিচ্ছে, সেই শাস্ত্রের ব্যাপারে অনেকে নানা রকম অদ্ভুত প্রশ্ন করেন। তার মধ্যে একটি অতি সাধারণ কিছু প্রশ্ন হল, শাস্ত্রের কথার কি প্রমাণ আছে? শাস্ত্রের কথা কেন মেনে চলতে হবে? ইত্যাদি। কিন্তু মানব জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাসের কষ্টিপাথরে শাস্ত্রের সব কথাই প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। প্রামাণ্য না হলে বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতা পাঁচ ছয় হাজার বছর ধরে একটা আদর্শকে হৃদয়ের গভীরে দৃঢ়তার সাথে অবলম্বন করে মানবজাতির চরম উন্নতির শিখরে এগিয়ে যেতে পারে! ধর্মশাস্ত্র যদি ধাপ্পা হয় তাহলে তো আমদের মুনি ঋষিদের মহা ধাপ্পাবাজ বলতে হয়। রাজনৈতিক নেতারা তো পাঁচ বছরও ধাপ্পা দিয়ে চালাতে পারেনা। অথচ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, পুরান, মহাভারত পাঁচ-ছয় হাজার বছর ধরে ধাপ্পাবাজি করে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার মজ্জা মজ্জায় আরামসে বসে আছে। আমাকে যদি মরতেই হয় তাহলে ছিঁচকে চোরের হাতে মরার থেকে বড় ওস্তাদ ডাকাতের সর্দারের হাতে মরাই ভাল।

কিন্তু আসলে তা নয়। উপনিষদ, গীতা, মহাভারতে জগতের খুব মৌলিক প্রশ্নগুলিকেই সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ খুব সহজ করে বলে দিলেন জীবনে দুঃখই দুঃখ। বাচ্চারা দুঃখটা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, বয়স্করা ভুলতে পারেনা। দুঃখ সবারই আছে, কিন্তু দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ কি? উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যখন তত্ত্বের আলোচনা শুরু করতে যাবেন তখন এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করবেন। যখন খুব খারাপ অবস্থা তখন নিম্নস্তরে বলবেন ভাই জগতে দুঃখই তো আছে। আর একটু উচ্চস্তরে বলবেন এই জগৎটাই অনিত্য, জগতের সব কিছুই নশ্বর।

এই মুহুর্তে আমার আপনার জীবনে হয়ত কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে সব কিছুই প্রতি মুহুর্তে পাল্টে যাচ্ছে। হাতের মুঠোয় জল ধরে রাখার মত মানুষের জীবন থেকে সব কিছুই হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া ব্যাপারটাই দুঃখ। তখন মনে অনেক জিজ্ঞাসা জাগে। এই দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার পথ আছে কিনা। কিংবা এই জগতের সব কিছুকেই অনিত্য দেখছি, এই অনিত্যের পেছনে নিত্য কিছু আছে কিনা? বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে পূণ্যতোয়া গঙ্গা যুগ যুগ ধরে সেই গঙ্গোত্রী থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। গঙ্গার জল প্রতিনিয়ত পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, হাজার হাজার বছর ধরে জল পাল্টেই যাচ্ছে। আবার গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সেই একই গঙ্গা। তাহলে গঙ্গা বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে? গঙ্গাসাগরের গঙ্গা না গোমুখের গঙ্গা? আর এই মুহুর্তের গঙ্গা, না পাঁচ দিন আগেকার গঙ্গা? গঙ্গা ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও গঙ্গার একটা ধারাবাহিকতা আছে, ক্রমাগত একই জিনিষ চলছে তো চলছেই। এই গঙ্গার আধার কি? এগুলোকে ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। গঙ্গা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে গঙ্গার যে মাটিটা পড়ে থাকবে সেটাই কি গঙ্গা? ঠিক তাও বলা যাবে না। তাহলে গঙ্গা মানে গঙ্গার জল? পুকুরের যে জল সেই জলটা একটা জায়গায় আবদ্ধ, তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু যারা সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সামান্যতম ওয়াকিবহাল, তারাও জানে সূর্যের তাপে পুকুরের জল ক্রমাগত বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার রাতে যখন হিম পড়ছে তখন অন্য জল এসে জমা হচ্ছে। অথচ সেই একই পুকুর, একই জল। বদ্ধতেই এই অবস্থা আর যে নদী প্রবাহমান তার মধ্যে তো মুহুর্তে মুহুর্তে পরিবর্তন হচ্ছে।

আমাদের শরীরেও প্রতি মুহুর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। শরীরের জীবকোষের অনবরত মৃত্যু হচ্ছে, আবার নতুন নতুন জীবকোষ জন্ম নিচ্ছে। গতকাল আমার যে শরীর ছিল আজকে আর সেই শরীর নেই। আমি রোজ খাওয়া-দাওয়া করছি, এই খাদ্য আমার শরীরে নতুন নতুন কোষের জন্ম দিচ্ছে। অথচ আমি জানি গতকাল আমার যে শরীর ছিল আজও সেই শরীরেই আমি আছি। আবার শৈশবে আমি এক রকম ছিলাম, যৌবনে আরেক রকম আর এখন বার্ধক্যে এসে অন্য রকম। জীব জগৎ থেকে শুরু করে জড় জগৎ সব কিছুর মধ্যেই অবিরাম এই পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় চিরন্তন শাশ্বত একটা জিনিষ সর্বদা সমান ভাবে চলেছে। এই অপরিবর্তনীয়ের ব্যাপারে যখন জানার ইচ্ছা হবে তখন মনে নানা রকমের প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে – এই অনিত্যের পেছনে নিত্য কিছু আছে কিনা, এই অনিত্য শুধু কি এই শরীরকে নিয়েই নাকি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে, তখনই মনের মধ্যে নিত্যের ব্যাপারে মানুষের অনুসন্ধিৎসা জাগে।

অতি সাধারণ অবস্থায় ধর্ম শুরু হয় দুঃখ থেকে – এই দুঃখের নিবৃত্তি চাওয়া থেকে। যাদের দার্শনিক মন, উচ্চ চিন্তনে নিজেকে যারা ব্যস্ত রাখতে ভালোবাসে তারাই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের পশ্চাৎপটে নিত্যের অস্তিত্বের অনুসন্ধানে চিন্তা ভাবনাকে ডুবিয়ে দেয়। আমাদের শাস্ত্রাদি এতই পুরনো যে বলা খুব মুশকিল কিভাবে প্রথম তাঁরা নিত্যের অন্বেষণে নামলেন। কিন্তু তারপর থেকে ধীরে ধীরে একজন থেকে দুজন, দুজন থেকে চারজন নিত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। তারপর এটাই একটা সম্প্রদায় বিদ্যা হয়ে গেল। সম্প্রদায় হল, গুরু যখন শিষ্যকে তাঁর আবিষ্কৃত বা উপলব্ধ জ্ঞানটা দিয়ে দেন, সেই শিষ্যই পরে আবার গুরু হয়ে তাঁর শিষ্যদের জ্ঞান বিতরণ করছেন। এইভাবে গুরু-শিষ্যের পরম্পরাতে বিদ্যা এগিয়ে যেতে থাকে। তখন এই বিদ্যাটা হয়ে যায় সম্প্রদায় বিদ্যা। কেউ যদি এখন জিজ্ঞেস করে তুমি কি করে জান এটা সত্য? তখন সে বলবে এটা সম্প্রদায় বিদ্যা। উপনিষদেও অনেক জায়গায় বলা হয় এই বিদ্যা সম্প্রদায় বিদ্যা। আমার মাথায় হঠাৎ কিছু খেয়াল হল আর আমি আমার খেয়ালকে বিদ্যা বলিয়ে চালিয়ে দিতে পারব না, যে কোন বিদ্যাই গুরু-শিষ্য পরম্পরা হয়ে আসতে হবে। ইসলাম ধর্মে সুফিদের মধ্যে এই সম্প্রদায় বিদ্যাকেই বলা হয় সিল্‌সিলা। সুফিরা তাদের বিদ্যাকে মহম্মদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে বলবে আমরা মহম্মদের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি। মহম্মদ কোথা থেকে শিক্ষা পেয়েছেন? আল্লার কাছ থেকে। এর তাৎপর্য হল যে জিনিষটা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে সেই জিনিষটারই মূল্য ও গুরুত্ব আছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে না এলে সেই শিক্ষার কোন দাম নেই। একই জিনিষ হিন্দুদের মধ্যেও আছে, হিন্দুরা বলে ভগবানের কাছ থেকে যেটা এসেছে সেটাই একমাত্র ঠিক ঠিক, বাকি কোন কিছুরই দাম নেই।

অনেক বাবাজীরা আজকাল বলছেন ভোগ না হলে যোগ হয় না। এই ধরণের কথা আমাদের পরম্পরাতে নেই অর্থাৎ বেদ থেকে শুরু করে মহাভারত, পুরান কোথাও এই ধরণের কথা বলা হয়নি। ভোগের ব্যাপারে যারা নিজেকে দুর্বল করে রেখেছে তাদের শুধু বলবে যে বাসনাগুলো একেবারে না মেটালেই নয়, সেই বাসনাগুলো কোন রকমে মিটিয়ে ভোগ থেকে যে করেই হোক আগে বেরিয়ে এস। তা নাহলে শোকরূপী মহাসুর তোমাকে গ্রাস করে বিনাশের দিকে নিয়ে যাবে। শাস্ত্র কখনই বলবে না আগে ভোগ করে নাও তারপর যোগ করবে। আজ পর্যন্ত ভোগ করে কেউ উপরে উঠতে পারেনি। ঠাকুর বলছেন বিশালক্ষ্মীর দ। বিশালক্ষ্মীর দয়ের মধ্যে হাতিও যদি পড়ে যায় সেও আর বেরোতে পারবে না। অন্য দিকে যারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করেন, সাধন ভজন করেন সাধারণ মানুষ মনে করে এরা দুর্বল, ভোগ করার ক্ষমতা নেই তাই চোখ বুজে পড়ে থাকে। আদপেই তা নয়, শাস্ত্র এর ঠিক উল্টো কথাই বলছে। বলছেন, যাঁরা এই বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত হন তাঁরা সব রকমের শক্তি পেয়ে যান। সাধু সন্ন্যাসীদের আলাদা শক্তি হয়। সাধু সন্ন্যাসীরা যখন শাস্ত্র কথা বলেন তখন মনে হয় ইনি যেটা বলছেন এটাই সত্যি। একই কথা যখন কোন গৃহস্থ পণ্ডিত বলেন তখন তাঁর সম্বন্ধে ধারণা হবে তিনি অনেক কিছু জানেন, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা ভক্তিটা হবে না। শাস্ত্র হল সব সময় শ্রদ্ধার জিনিষ। এই শ্রদ্ধা যদি না থাকে তখন শাস্ত্রের জ্ঞান কিছুতেই হবে না।

মূল তত্ত্ব একটা জায়গা সেই বেদ থেকেই বেরিয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে অনেক পরম্পরা হয়ে হয়ে ছয় সাত হাজার বছর চলে চলে আজ এত তত্ত্ব এসে হাজির হয়ে গেছে যে এটাকে সামলে রাখা খুব কঠিন। সব জিনিষকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা জায়গায় সংগ্রহিত করে সার্বিক ভাবে যে জিনিষটা দাঁড়িয়েছে তাকেই আমরা এক কথায় বলছি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে প্রত্যেকটি ভারতবাসীর, বিশেষ করে যারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছে, জানা অবশ্যই কর্তব্য। তবে খুব অল্প কয়েক দিনে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তার জন্য হয়ত কয়েক জন্মই লেগে যেতে পারে। তবে আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে মূল তত্ত্বগুলো যে কটি প্রধান প্রধান শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, ভারতের ধর্মের বিভিন্ন রূপকে যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার একটা রূপরেখা আলোচনার দ্বারা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে কিছুটা ধারণা করতে পারি।

উপনিষদ আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের কয়েকটি জিনিষ জেনে নেওয়া দরকার। হিন্দু ধর্মের মূল শাস্ত্র হল বেদ। বেদের বাইরে হিন্দুরা কোন কিছুই মানবে না। বেদের বাইরে যখনই কেউ কিছু বলে দু-চারদিন সেই কথা কিছু লোক শুনবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেদের বাইরের কোন কথাই দাঁড়াতে পারেনা। ঠাকুর কথামৃতে বলছেন ঋষিদের সনাতন ধর্মই শেষ পর্যন্ত থাকবে, বাকি সব ধর্ম কদিনের জন্য আসবে আর যাবে। ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করছেন। ঋষিদের সনাতন ধর্মই বেদ। সনাতন মানে যা সব সময়ই আছে, যা দেশ ও কালের অপেক্ষা রাখে না। যুগধর্ম আর সনাতন ধর্ম দুটো আলাদা। সনাতন ধর্ম কখনই পাল্টাবে না। দেশ আর কালের মধ্যে যদি ধর্ম আবদ্ধ থাকে তাহলে সেটা আর সনাতন ধর্ম হবে না। এই কারণে গোঁড়া হিন্দুরা খ্রীশ্চান ধর্মকে বলবে তোমাদের ধর্ম দু-হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে, তার আগে তোমাদের ধর্ম ছিল না। তাই তোমাদের ধর্ম সনাতন নয়। ইসলাম ধর্মের নামেও তারা একই কথা বলে, তোমাদের ধর্মতো চোদ্দশ কি পনেরশ বছর আগে শুরু হয়েছে, তাই তোমাদের মানতে পারলাম না। মজার ব্যাপার হল খ্রীশ্চানরা প্রশ্ন করে হিন্দুধর্ম কে প্রতিষ্ঠা করেছিল? যিশু খ্রীশ্চান ধর্ম স্থাপন করে গেছেন, ইসলাম ধর্ম মহম্মদের তৈরী। হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তোমরা কারুর নাম বলতে পারবে না। হিন্দুরা এদের উল্টো বলবে – যে ধর্মের আদি আছে সেই ধর্মের অন্তও আছে, যে ধর্ম সনাতন সেটাই ধর্ম। হিন্দুধর্মের স্থাপনকর্তা কেউ নেই। কেন নেই? কারণ হিন্দু ধর্ম সনাতন, এটাই ধর্ম। এই ধর্ম সৃষ্টির আদি থেকে চলছে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত চলবে। স্থাপনকর্তা থাকলে সেই ধর্ম আর সনাতন ধর্ম থাকবে না।

আমেরিকায় থাকাকালীন প্রথম দিকে স্বামীজীর খুব প্রত্যাশা ছিল ভারতের দারিদ্রতা দূর করতে তিনি আমেরিকা থেকে সাহায্য পাবেন। কিন্তু পরবর্তিকালে স্বামীজীর উপর খ্রীশ্চান মিশনারি গুলোর প্রচুর আক্রমণ

শুরু হতে তাঁর সেই প্রত্যাশা ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এদের আক্রমণের ভাষা ও ভঙ্গি দেখে স্বামীজী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি পাল্টা আঘাত দিতে শুরু করলেন। সেখানকার প্রচলিত খ্রীশ্চান মিশনারিগুলিকে যে প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন, তাতে তিনি এটাকেই হাতিয়ার হিসাবে নিয়েছিলেন। ধর্ম সেটাই যেটা চিরন্তন সত্য। সনাতন সত্যই ধর্ম। বাকি সব ধর্ম পোকামাকড়। পোকামাকড় জন্মাবে আর মরবে। তাই বলে কি খ্রীশ্চান ধর্মে সনাতন সত্য নেই? নিশ্চয়ই আছে। খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্মেও সনাতন সত্য আছে। স্বামীজী তাদের ধর্মের সেই সনাতন সত্যের উপর জোর দিতে বললেন। হিন্দুরা বলে আমাদের সনাতন সত্য হল বেদ। বেদ কি? ঋষিদের দেওয়া ধর্ম। ঋষিরা এই ধর্ম কিভাবে পেয়েছিলেন? ঋষিরা যখন ধ্যানের গভীরে গেলেন তখন তাঁরা কিছু কিছু সত্যকে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। আমাদের মুখ থেকে যত রকম শব্দ বেরোয় তার বেশির ভাগ শব্দ শব্দ থেকেই জন্ম নেয়। যেমন যত খবরের কাগজ, নাটক, নভেল সবই শব্দ থেকে শব্দের জন্ম হচ্ছে। স্কুলের বাচ্চাদের 'রাম' শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে দেওয়া হয়ছে। 'রাম' শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে গিয়ে কেউ লিখবে বলবে 'রাম যায়', কেউ লিখবে 'রাম খায়', কেউ লিখবে 'রাম ঘুমায়'। একটা শব্দ 'রাম', এই একটা শব্দের পর আরেকটা শব্দ লাগিয়ে দেওয়া হল। এখানে শব্দ জন্ম নিল শব্দ থেকে। কিন্তু মানুষ যখন শব্দের জন্ম হওয়াকে বন্ধ করে দেয় তখন সে মৌন হয়ে যায়। যখন সে মৌন হয়ে যায় তখন তার মন ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু করে। সেই মৌন থেকে তখন কিছু কিছু শব্দ ভেসে ওঠে। মৌন থেকে যে শব্দের জন্ম হয় সেই শব্দের সাঙ্ঘাতিক শক্তি। মৌন অবস্থা থেকে যে শব্দগুলো বেরোয় সেটাই ঠিক ঠিক কবিতা।

আমাদের শাস্ত্র মতে শব্দ চার প্রকার – ১) পরা, ২) পশ্যন্তি, ৩) মধ্যমা ও ৪) বৈখরী। চার রকম শব্দ চার জায়গা থেকে জন্ম নেয় – পরা ঠোঁট থেকে, পশ্যন্তি কণ্ঠ থেকে, মধ্যমা হৃদয় থেকে আর নাভি থেকে বৈখরী জন্ম নেয়। যে যত মৌন হতে থাকবে ততই শব্দগুলো আরও গভীর থেকে গভীরতর স্থান থেকে বেরোতে শুরু করে। যত গভীর থেকে শব্দ বেরোবে সেই শব্দের তত বেশি শক্তি হবে। মৌন থেকে যে রচনা গুলো উঠে আসে সেই রচনাই কালজয়ী হয়ে যায়। মৌনেরও আলাদা আলাদা স্তর আছে। মৌন যখন আরও গভীরে চলে যায় তখন সেটাই ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যানে মানুষ যখন গভীর থেকে গভীরতর স্তরে চলে যেতে শুরু করে প্রায় সমাধির অবস্থায় যখন চলে যায় কিংবা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা থেকে যখন অবতরণ করে, তখন তার মনে কিছু কিছু ভাব উঠতে থাকে। তখন আর শব্দও ওঠে না। যাঁরা সমাধি তে গিয়ে ভাবগুলোকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁদেরকে ঋষি বলা হয়। সমাধি থেকে নেমে এসে তিনি আবার তাঁর শিষ্যকে এই ভাবগুলো বলে দেন। শিষ্যরা এই ভাবগুলোকে কখন ছন্দোবদ্ধ করে দেন বা কখন ঋষিরা নিজেরাই ছন্দোবদ্ধ করে দিয়ে শিষ্যদের দেন। এই ভাবগুলোই চিরন্তন সত্য।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কারও ঠিক এই ভাবেই হয়েছিল। নিউটনকে অসুস্থতার কারণে প্রায় বছর খানেকের জন্য একটা ফার্ম হাউসে থাকতে হয়েছিল। সেখানে তাঁর বিশেষ কিছু করার ছিল না, কোন অধ্যয়ণ নেই, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নেই। ওই অবসর সময় তিনি এক গভীর চিন্তার রাজ্যে ডুবে গিয়ে মৌন অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন। কারুর সঙ্গে কথা বলার কিছু নেই। আগে থাকতেই তিনি গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। ফার্ম হাউসে এই চিন্তা করতে করতে তিনি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের যত নিয়ম এগুলোও ধ্যানের গভীর থেকেই এসেছে। জগতের সত্যগুলো যত কবিতার মাধ্যমে, দর্শনের মাধ্যমে ফুটে উঠছে সবই মৌনতা থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু সনাতন সত্য যা কিছু আছে সেগুলো সমাধি থেকে বেরোয়। সমাধির গভীর থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে সেটাকেই আমরা বলছি বেদ, কোরান, বাইবেল। মহাপুরুষরা সমাধির গভীরে যে সত্যকে দর্শন করলেন সেটাকেই তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, শিষ্যরা সেই তত্ত্বকে ছন্দোবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখলেন। এর ভালো উদাহরণ হল কোরান। কোরানের ব্যাপারে বলা হয় আল্লা যা কিছু মহম্মদকে বলেছিলেন সেটা আয়াৎ রূপেই অর্থাৎ কবিতা রূপেই সরাসরি এসেছিল। বেদ কিভাবে সৃষ্টি হল? ধ্যানের গভীরে ঋষিরা নিজের চোখের সামনে যেটা প্রত্যক্ষ দেখেছেন, সেই সত্যগুলোকে পুঞ্জিভূত করে জমিয়ে রেখেছিলেন সেটাকেই বেদরাশি বলা হচ্ছে, এটাই হল জ্ঞানরাশি। এগুলোই সনাতন সত্য। এই সত্য শুধু অন্তর্জগতের নয়, অন্তর্জগত বহির্জগত দুটো জগতের জ্ঞান তাঁর মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। একটা

সমস্যাকে নিয়ে তিনি চিন্তা করছেন, ভাবছেন, ভাবতে ভাবতে তিনি মৌন হয়ে গেলেন। সেখান থেকে ধ্যানের গভীরে সমাধির অবস্থায় চলে গেলেন। তখন হঠাৎ একটা সত্য তাঁর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর শিষ্যকে বলে দিলেন – এই হচ্ছে সত্য। সেটাই এক ভাবে নথিবদ্ধ হয়ে গেল। এখন শিষ্য হয়ত তার গুরুর মত ধ্যানশীল নয়। গুরু তাকে বলে দিলেন 'তুমি এটাকে ধারণা করে রাখ যাতে হারিয়ে না যায়'। শিষ্য তখন প্রাণপনে সেটাকে মুখস্ত করে নিত। মুখস্ত থাকলে মানুষ কখন ভুল করে না, কাগজে কপি করার সময় ভুল করতে পারে। এই কারণে আমাদের পূর্বজরা লেখাকে কখন বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্য আগেকার দিনে বাচ্চা বয়স থেকে ব্রাহ্মণদের মুখস্ত করাবার একটা বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ব্রাহ্মণ সন্তানের যজ্ঞ উপবীত হয়ে গেলে তাদের গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হত। গুরুর আশ্রমে সব কাজ করতে থাকত আর শুধু বেদ মুখস্ত করে যেত। তাদের খাওয়া-দাওয়া কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল।

স্বামীজী যখন আমেরিকাতে ছিলেন তখন বিধবাদের উত্থানের জন্য একটা সম্প্রদায় অনেক কাজকর্ম করছিল। একটা সময় সেই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রমাবাঈ নামে একজন ভদ্রমহিলা স্বামীজীর বিরুদ্ধে অনেক বিষোদ্‌গার করতে শুরু করলেন। স্বামীজী বলতেন ভারতে নারী আদর্শ বিশেষ করে মাতৃ আদর্শকে খুব সম্মান দেওয়া হত, নারী আদর্শের মত এত উচ্চ আদর্শ ভারত ছাড়া আর কোথাও নেই। স্বামীজীর এই বক্তব্যের উপরই এরা আক্রমণ করেছিল। তার মধ্যে ছিল ভারতে বিধবাদের উপর খুব নির্যাতন করা, তাদের খেতে না দেওয়া, ইত্যাদি। স্বামীজী তখন বলেছিলেন, গরীব গরীবই, সেখানে সে বিধবা কি সধবা তাতে কিছু আসে যায় না, সে গরীবই থাকে। আরও অনেক কিছু বলার থাকলেও স্বামীজী জেনেশুনেই কোন উত্তর দেননি। কারণ ঐ নোংরামির মধ্যে তিনি নামতে চাননি। ডঃ জেমস্ এক ব্যক্তির সাথে স্বামীজীর পরিচয় হয়েছিল, পরিচয়ের দিন থেকেই তিনি স্বামীজীর খুব অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শেষে ডঃ জেমস্ থাকতে পারলেন না, রমাবাঈরা এত নোংরাম করতে শুরু করেছে এর একটা উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। তিনি ছয়-সাত পাতার একটা লম্বা উত্তর লিখলেন, সেটা আবার তখনকার খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। সেখানে তিনি মনুসংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালেন বিধবাদের কি কি অধিকার দেওয়া আছে। মনু শুধু অধিকার দিয়েই ক্ষান্ত হননি, মনুস্মৃতিতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে এই অধিকার যেন কখনই লঙ্ঘন না করা হয়। প্রথমে রাজাকে বলা হয়েছে, রাজার কর্তব্য হল বিধবাদের এই অধিকারগুলো যেন সর্বদা সুরক্ষিত থাকে। তারপরেই লেখা আছে যদি কোন আত্মীয়, পরিবারের সদস্য বিধবার এই অধিকারকে লঙ্ঘন করে তার উপর ভগবানের অভিশাপ বর্ষিত হবে। এরপর রমাবাঈরা কি করে বলছেন যে বিধবাদের উপর উৎপীড়ন হচ্ছে!

বাংলাতে একটা সময় সতীদাহ প্রথা নিয়ে বিরাট সমস্যা ছিল, রাজা রামমোহন রায় এই প্রথাকে আইন করে বন্ধ করালেন। সতীদাহে দুটো ব্যাপার ছিল, প্রথম ছিল ভালোবাসার ব্যাপার, আমার স্বামী মারা গেছে, আমি স্বামীহারা হয়ে থাকতে চাইনা। দ্বিতীয় ব্যাপার হল, তখন একটা ধারণা ছিল সতী হয়ে মারা গেলে আমার নামে মন্দির হয়ে যাবে, আমার সম্মান হবে। এই দুটোর বাইরে আরেকটা মারাত্মক ছিল, সতী যদি মরে যায় তাহলে তার সব সম্পত্তি স্বামীর ভাইয়েরা পেয়ে যাবে। এরাই লোভে পরে কোন রকমে বিধবাদের মেরে দিত। লোভে পরে খুন করা সেতো সব জায়গাতেই আছে। লোভে পরে একটা অনাথ মেয়েকে মেরে ফেলল এতে অবাকের কি আছে! লোভে পরে খুন করা আর বিধবাদের উৎপীড়নকে একই পঙক্তিতে ফেলে দিলে তো হবে না। ভারতকে বলা হয় World Capital of suicide। পরিসংখ্যানবিদরা বলছেন প্রত্যেকে ছ মিনিটে একজন করে ভারতে আত্মহত্যা করছে। এই ব্যাপারে কেউ কিছু বলছে না। তখনকার দিনের হিসাবে সেই সময় বছরে সারা ভারতে চার পাঁচশ লোক আত্মহত্যা করত, তার মধ্যে বিধবা মরছে অতি নগণ্য কয়েকজন। আর তাই নিয়ে এত হৈচৈ, বিধবাদের উপর উৎপীড়ন হচ্ছে।

ঐ চিঠিতে ডঃ জেমস্ খুব মূল্যবান একটা কথা বলছেন। মনুস্মৃতিতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে যে যে নিয়মগুলো পালন করতে হয় একজন বিধবাকে ঠিক সেই নিয়মগুলোই পালন করতে হয়। এর পেছনেও কারণ আছে। তখনকার দিনে মেয়ের সংখ্যার তুলনায় ছেলের সংখ্যা কম হত। কিন্তু ইতিহাসে প্রথমবার এখন ছেলে

ও মেয়ের সংখ্যার অনুপাতে ছেলের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। World Ratio তে ছেলের সংখ্যা বেশি হওয়াটাকে খুব ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয়। হাজার নারী আর নশ পুরুষ এই অনুপাতকে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সব সময় উপযুক্ত মনে করা হয়। হাজারটা ছেলের জন্য নশটা মেয়ে এটা খুব বিপজ্জনক অনুপাত। সেইজন্য ভারতে চেষ্টা করা হচ্ছে কি করে মেয়ের সংখ্যা বাড়ান যায়। অন্য দিকে মেয়েদের বিয়ে হতে চাইছে না। তখনকার দিনে ছেলের সংখ্যা কম তাই বিধবাদের বলা হত ভাই তোমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে তুমি বিধবা হয়ে গেছ। আমি কোথা থেকে তোমাকে আরেকটা ছেলে দেব। তাই বলে তুমি তো উৎসন্নে চলে যেতে পারনা। যদি তুমি আমোদ-আহ্লাদ ভোগ করতে যাও তাহলে তুমি অনেক বিপদে পড়বে। তাই দ্যাখো আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরা যে ভাবে দিন যাপন করে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায়, তুমিও তাই কর। কারণ ভারত হল ধর্মের দেশ, ধর্মই হল শেষ আদর্শ, ভারত ভৌতিক আদর্শকে আদর্শ রূপে কখনই গ্রহণ করেনি। ঠিক কি ভুল এই আলোচনা আমরা করছি না, তখন এটাই আদর্শ ছিল। এখন ভারত স্বাধীন, আমাদের এখন নতুন আদর্শ। কি সেই আদর্শ? ভৌতিক আদর্শ, যে আদর্শে শেষ কথা হল ইন্দ্রিয় সুখ। এই আদর্শের পরিণতি কি? প্রত্যেক ছয় মিনিটে একটি করে আত্মহত্যা। কিন্তু ভারত পাঁচ ছ হাজার বছর ধরে আধ্যাত্মিক আদর্শকে লালন-পালন করে এসেছে। কিন্তু সেখানে এটা বলা হচ্ছে না যে শুধু বিধবাকেই এই আদর্শ পালন করতে হবে। বলছেন, আমাদের ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী যারা, যারা বেদ পাঠ করছে তাদের যে নিয়ম-কানুন, মস্তক মুণ্ডিত, বিধবাদেরও মাথা ন্যাড়া। মাথা ন্যাড়াটা বাধ্যতামূলক ছিল না, চুল বড় রাখলেই নানা ঝামেলা, তার রক্ষণা-বেক্ষণ করতেই কত সময় চলে যাবে, তাই ফেলে দাও। ব্রহ্মচারীরা সাদা পোষাক পরিধান করত, বিধবারাও সাদা কাপড় পড়ত। এছাড়া ব্রহ্মচারীদের নিয়ম ছিল একবস্ত্র, দিনে একবার সামান্য আহার করবে, তাও সেই খাবারে ঝাল-মশলা-টক কিছু থাকবে না, মাটিতে শোবে, ছাতা ব্যবহার করবে না, জুতো পায়ে দেবে না। বিধবারাও তাই করত। তুমি যদি এগুলো পালন না কর তাহলে তোমাকে কেউ কিছু জোর করবে না। খুব বেশি হলে লোকসমাজে তোমার নিন্দা হবে, লোকে কি বলল না বলল তাতে কি আর যায় আসে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী যদি এগুলো পালন না করে, তখন তাকে বলে দেবে তোমার দ্বারা বেদ অধ্যয়ণ হবে না, তুমি এখান থেকে আসতে পার। তাকে আশ্রম থেকে বার করে দেবে। বেলুড় মঠের কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যদি কামিনী-কাঞ্চনে জড়িয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলে দেওয়া হবে তোমার জন্য এই আদর্শ নয়, তুমি আসতে পার। আমরা একটা লক্ষ্যকে ধরতে চাইছি, সেই লক্ষ্যকে পেতে গেলে আমাদের এই এই জিনিষ করতে হবে, যদি না পার ছেড়ে দাও। তখন অন্য কোন লক্ষ্যকে তুমি সামনে রেখে এগোও যে লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য তোমাকে এত কিছু করতে হবে না।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরা এই নিয়মের মধ্যে চলতে চলতে শুধু বেদ মুখস্ত করতে থাকত। এদিকে ঋষিদের পরম্পরাতে বেদের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকল। এরপর ব্যাসদেব যখন আবির্ভূত হলেন তখন তিনি দেখলেন এইভাবে বেদের আয়তন বাড়তে থাকলে অনেক সমস্যা দেখা দেবে, এত কিছু একজনের পক্ষে মুখস্ত করা সম্ভব নয়। তখন তিনি সমগ্র বেদরাশিকে, যেটা আমাদের ঋষিরা স্তুপাকৃত করে যাচ্ছিলেন, সেগুলোকে চারটে ভাগে বিভাজন করে সঙ্কলন করে দিলেন। এই চারটে বেদ হল – ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এই চারটে বেদকে এক সঙ্গে মিশিয়ে দিলে হয়ে যাবে বেদরাশি। আসলে চারটে বেদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা অনেক চেষ্টা করেছেন চারটে বেদই আলাদা। কিন্তু সেই ভাবে আলাদা কিছু নেই, একই কথা চারটে বেদে অনেকবার বলা হয়েছে। এই বেদরাশির মধ্যে চার রকমের জিনিষ আছে – প্রথমটিকে বলা হয় সংহিতা, সংহিতার আরেকটি নাম মন্ত্র। যজ্ঞের কাজে সংহিতার মন্ত্রগুলো বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় হল ব্রাহ্মণ। কোন যজ্ঞ কিভাবে কোন পদ্ধতিতে, কোন মন্ত্রে করতে হবে ব্রাহ্মণে তার বিবরণ পাওয়া যাবে।

আমাদের ঋষিরা দেখলেন এই মন্ত্র, ব্রাহ্মণ আর যজ্ঞাদি মানুষকে সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ রাখছে। আমরা এর আগে বলেছিলাম অনিত্যের পেছনে নিত্য এক বস্তু আছে। দেখছেন এই সুখটাও অনিত্য। বৃষ্টি হচ্ছিল না, খরা দূর করবার উদ্দেশ্যে পর্জন্য যজ্ঞ করান হল, বৃষ্টি হয়ে গেল খরাও কেটে গেল। আগামীবছর

আবার খরা হয়ে গেল। শান্তি কোন ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তাঁরা দেখলেন মনটাকে আরও ভেতরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। প্রথমের দিকে এই ঋষিরাই প্রকৃতির শক্তিকে জয় করে মানব জীবনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায় গুলোকে বার করলেন। এই সমৃদ্ধি নিয়ে এলেন মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ দিয়ে। এগুলো সবই একই সাথে চলছে, আগে এটা পরে এটা এইভাবে আলাদা করা যায় না। এখনও নতুন নতুন পথ আবিষ্কার হয়েই চলেছে। যাই হোক, যখন দেখলেন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দিয়ে কল্যাণকারী যা কিছু আসছে সবই ক্ষণস্থায়ি। সাথে সাথে তাঁরা দেখছেন একটা বয়স পর্যন্ত যতক্ষণ মানুষের শারীরিক কর্মক্ষমতা থাকে ততক্ষণ সে প্রচুর যজ্ঞাদি করতে পারছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যজ্ঞের বিপুল কর্মসমূহকে সামাল দেওয়ার মত তার আর শারীরিক ক্ষমতা থাকে না। তখন তাদের জন্য ঠিক করে দিলেন তোমাদের জন্য এই তৃতীয় বিভাগ আরণ্যক। আরণ্যকে এসে বলছেন তোমাকে আর শারীরিক ভাবে যজ্ঞ করতে হবে না, এই যজ্ঞটাই তুমি এবার মনে মনে মানসিক প্রক্রিয়ায় করতে থাক। এইখানে এসে তার মনটা আস্তে আস্তে অন্তর্মুখীন হতে থাকে।

আমাদের সমাজে তখন চারটে আশ্রমকে পালন করতে হত – ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারীরা শুধু সংহিতা মুখস্ত করতে থাকত। যারা গৃহস্থ হয়ে যেতেন তাদের বেদের ব্রাহ্মণ অংশকে খুব ভালো করে আয়ত্ত করতে হত। কারণ তাকে পূজোর কাজ করতে হবে। যখন বাণপ্রস্থী হয়ে যেতেন তখন তাঁরা আরণ্যককে অনুসরণ করতেন, একটু উচ্চ চিন্তন করছেন, ধ্যান ধারণা করছেন। চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে এসে বলছেন আমার আর কিছু লাগবে না, জগৎ-সংসারের এই লীলাখেলা থেকে আমি বেরোতে চাইছি। সংসারে যা কিছু আছে, ইহলোক ও পরলোকের কোন কিছুতেই আমার আগ্রহ নেই। আর যজ্ঞের যে চিন্তা ভাবনা করবে সেটাতেও আমার কোন ইচ্ছা নেই। আমি সত্যকে জানতে চাই, আমি নিত্যবস্তুকে পেতে চাই। এদের জন্য হল বেদের চতুর্থ বিভাগ, যাকে বলা হয় উপনিষদ। নিত্যবস্তু ও সত্য সম্পর্কিত যত তত্ত্ব ও উপদেশ আছে সব উপনিষদে বলা হয়েছে। এই হল আমাদের চারটে বেদ – ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্বঃ আর প্রত্যেকটি বেদের চারটি অঙ্গ – মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। প্রত্যেকটি বেদেই মোটামুটি এই চারটে অঙ্গ পাওয়া যাবে। আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সব কিছু এই কটি জিনিষের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের যত রকমের দর্শন আছে, যত রকমের তত্ত্ব বা ধারণা চিন্তা-ভাবনা আছে, সবটাই কোন না কোন ভাবে তা সে সরাসরি ভাবেই হোক বা বীজাকারেই হোক, এই কটি জিনিষের মধ্যে দেওয়া আছে।

বেদের যে চারটে অঙ্গের কথা বলা হল এতে অনেক কিছু জিনিষকে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে আবার অনেক কিছু জিনিষের একটা সূত্র দিয়ে খুব অল্প করে বলে দেওয়া হয়েছে, আর অনেক জিনিষকে বলা হয়নি। আমাদের ঋষিরা অন্তর্জগতে যা কিছু আছে তার অনুসন্ধানের উপর জোর দিয়েছিলেন। সেইজন্য বেদে যে জিনিষগুলো খুব অল্পে বলা হয়েছে, সেই জিনিষগুলোকে অনেকে আরও বিস্তারিত করলেন। আর যে জিনিষগুলো বলা নেই সেগুলোকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করলেন। কিন্তু তাঁরা এই ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বেদে যে কথাগুলো আগে থাকতেই আছে তার সাথে নতুন জিনিষগুলোর যাতে কোন বিরোধ না হয়ে যায়। যখনই নতুন কিছু বলছেন তখন তাঁরা দেখে নিচ্ছে বেদে এই জিনিষটাকেই অন্য রকম ভাবে বলা আছে কিনা। যা কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হবে সবটাই বেদ সম্মত হতে হবে।

বেদের আরেকটা নাম শ্রুতি। বেদকে কেন শ্রুতি বলা হয় এই নিয়ে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কোন ব্যাখ্যাকেই পুরোপুরি সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না, তার অবশ্য অনেক কারণ আছে। একটা জিনিষকে পরিভাষিত করার পর দেখা যায় তার অনেক অপবাদ সামনে চলে আসছে, তখন আবার সেটাকে মানাও যায় না। সাধারণতঃ বলা হয় গুরুর মুখে শ্রবণ করা হত বলে বেদকে শ্রুতি বলা হয়। কিন্তু হিন্দুদের সব কিছু গুরুমুখেই শ্রবণ করা হয়। শুধু গুরুমুখে শোনা হত বলেই বেদের আরেক নাম শ্রুতি নয়। কেননা স্মৃতিও গুরুমুখে শোনা হত। পরের দিকে এনারা স্মৃতিগুলিকে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলেন। কিন্তু বেদকে কখনই লেখা হত না। এর কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কপি করতে গিয়ে কি ভুল করে দেবে কেউ বলতে পারবে না। সেইজন্য এনারা হস্তলিপির উপর একেবারেই ভরস করতেন না। বেদ প্রথম হাতে লেখা হয়

সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দিতে এসে। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ম্যাক্সমূলার প্রথম বেদকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলেন। ভারতের কোথায় কোথায় কোন পণ্ডিত আছে, কার কাছে কি কি পাণ্ডুলিপি আছে সব সংগ্রহ করে, সব পণ্ডিতদের এক জায়গায় নিয়ে এসে সবাইকে বলতে বলা হল – আপনারা কে কে কি কি জানেন সব বলুন। এই করে বেদের সব কিছু সংগ্রহিত করা হয়েছিল। এখন আমরা যে ছাপার অক্ষরে বেদ পাই এর পেছনে ম্যাক্সমূলারেরই সম্পূর্ণ অবদান। তিনি না থাকলে আমরা জানতেও পারতাম না বেদ কি।

বেদের বেশির ভাগই হল মন্ত্র, যার দ্বারা যজ্ঞযাগ করা হয়। কিন্তু সেটাও যেন সম্পূর্ণ নয়। যেখানে যেখানে অনেক কিছু আছে যেগুলো বলা হয়নি, সেগুলো আবার তন্ত্রে চলে এসেছে। বেদে মোটামুটি যা কিছু বলা হয়েছে সবটাকে পরে এনারা চারটে অঙ্গে বিভক্ত করে দিলেন। এই চারটি অঙ্গ শুধু বেদ বা হিন্দু ধর্মেরই অঙ্গ নয়, যে কোন ধর্মকে দাঁড়াতে হলে এই চারটে অঙ্গের দরকার হয়। তার প্রথম অঙ্গ হল দর্শন। আমাদের মূল দর্শন এসেছে উপনিষদ বা বলতে পারি গীতা থেকে। হিন্দুধর্মের মূল দর্শনই হল উপনিষদ আর গীতা। উপনিষদ আবার পুরোপুরি বেদেরই একটা অঙ্গ, আর অনেকে বলছেন গীতার কথা বেদেরই কথা। আজ যদি কোন দার্শনিক নতুন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয় তাহলে প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করা হবে – আপনি নতুন যে দর্শন দিচ্ছেন এর কি গীতার সম্মতি আছে? না। উপনিষদের সম্মতি আছে? না, নেই। বেদে আপনার এই দর্শনের কথা আছে? না তাও নেই। তাহলে আপনার দর্শনের এই বইকে ডাস্টবিনে ফেলে দিন। আচ্ছা উপনিষদে আপনার দর্শনের কথা নেই বলছেন ঠিক আছে, তাহলে বেদের কোথাও কি ছোট্ট করে কিছু একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যেটাকে টেনে নিয়ে এসে আপনি আপনার এই দর্শনে ব্যাখ্যা করেছেন? হ্যাঁ, বেদের অমুক জায়গায় এই রকম একটা কথা আছে। আচ্ছা তাহলে আপনার কথা আমি শুনতে রাজী আছি। ঠাকুরের ব্যাপারে অনেকেই মাঝে মাঝে বলে ঠাকুরের নতুন ভাবধারা, নতুন ভাবান্দোলন। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে এই জিনিষ কখনই মানা হবে না। যেমনি বলা হবে এটা নতুন ভাবান্দোলন, হিন্দুধর্ম বলবে তুমি তাহলে হিন্দু নও। হিন্দু মানেই সম্প্রদায় পরম্পরা। বেদ, উপনিষদ ও গীতার বাইরে কিছুই হবে না, সব কিছু এই তিনটের মধ্যে বাঁধা। গীতাতে আবার এমন কিছু কিছু জিনিষ আছে যেটা বেদে নেই, বেদে নেই কিন্তু তাই বলে সেগুলো বেদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না, বেদ এর উপর নীরব থেকে গেছে। সেইজন্য ঠাকুরের নতুন ধর্ম বলে কিছু নেই, পুরনো ধর্মকেই নতুন আঙ্গিকে বলা হয়েছে। এক একজন অবতার যাঁরা আসছেন তিনি কি করেন? বেদে যা কিছু আছে তার এক একটা ভাবের উপর খুব জোর দেন। শ্রীকৃষ্ণ একটা জিনিষের উপর জোর দিলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্র অন্য একটা ভাবের উপর জোর দিলেন। যে জিনিষটার উপর জোর দিচ্ছেন এটাই তখন তাঁর নতুন একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। মূল কথা হল হিন্দুধর্মের আসল দর্শন হল উপনিষদ। গীতা যা বলছে সেটাও উপনিষদের কথা।

ধর্মের দ্বিতীয় অঙ্গ হল কাহিনী। হিন্দুধর্মে যত কাহিনী আছে সব আসছে ইতিহাস আর পুরান থেকে। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস হল বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর আঠারোটি পুরান ও আঠারোটি উপপুরান মিলিয়ে মোট ছত্রিশটি পুরান শাস্ত্রে হিন্দুধর্মের সমস্ত কাহিনী পাওয়া যাবে। এই ছত্রিশটি পুরানে যত কাহিনী আছে এর সব কাহিনীই বেদে আছে। কিন্তু বেদে এই কাহিনীগুলো হয়তো একটি বা আধখানা বাক্যে বলে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তারই একটা বাক্যকে নিয়ে পুরান একটা কাহিনী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে হিন্দুরা কেউ আপত্তি করবে না, আপত্তি করবে সেইখানে যেখানে বেদে যে দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে যদি পাল্টে দেওয়া হয়। যেমন বেদে বলবে দেবাসুর সংগ্রাম, দেবতারা অসুরদের থেকে শ্রেষ্ঠ। পুরানে গিয়ে যদি বলে দেবতারা শ্রেষ্ঠ কিন্তু অসুররাও কোন কোন জায়গায় দেবতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, তখন হিন্দুরা আটকে দেবে। বেদে যেভাবে বলা হয়েছে ওর মধ্যেই থাকতে হবে। এরপর আপনি যত দেবতার সংখ্যা বাড়ান, দেবতাদের সন্তান দিয়ে যান সেখানে কেউ কোন আপত্তি করতে আসবে না। মূল কথাকে কখন পাল্টানো যাবে না।

ধর্মের তৃতীয় অঙ্গ হল উপাচার। পূজা অর্চনা কিভাবে করতে হবে, পূজার যত রকমের বিধি আছে সব এই উপাচারের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের সমস্ত পূজার উপাচার আসছে তন্ত্র ও পুরান থেকে। যার

দর্শনের যুক্তি বিচার করতে ভালো লাগছে না, পুরানের গালগল্পকেও আজগুবি মনে হচ্ছে, এদের কাছে ঈশ্বরকে ভক্তি পূর্বক পূজা অর্চনা করাটাই খুব ভালো লাগার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পূজা অর্চনা করার বিধি নিয়মগুলো পাওয়া যাবে তন্ত্রে আর কিছু কিছু বিধি নিয়ম পুরানেও পাওয়া যাবে। তন্ত্রে আবার সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের কথা পাওয়া যাবে না।

ধর্মের শেষ ও চতুর্থ অঙ্গ হল স্মৃতি। আমাদের হিন্দুধর্মে একটা খুব মজার ধারণা আছে, বলা হয় কেউ যদি শুধু ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের উপরই জোর দেয় আর সৎ ভাবে শাস্ত্র সম্মত ভাবে সামাজিক ও পারিবারিক আচরণগুলো পালন করতে থাকে তাতেই তার ঈশ্বরের উপলব্ধি হবে। তাকে আর দর্শন মানতে হবে না, পূজা অর্চনা করতে হবে না। এটাকেই বলছেন Social Conduct সামাজিক আচার আচরণ-বিধি বা স্মৃতি, যেমন মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি, রঘুনন্দন স্মৃতি ইত্যাদি। মেয়ের কত বয়সে বিয়ে দিতে হবে, সন্তান হলে কি কি করতে হবে, বাড়িতে নবজাতকের জন্ম হলে কি করতে হবে, মারা গেলে কি কি নিয়ম পালন করতে হবে, এই জিনিষগুলো সব স্মৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যারই ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানার আগ্রহ আছে তাকে ধর্মের এই চারটে অঙ্গের উপর যত গ্রন্থ আছে সব কটি গ্রন্থকেই একবার দেখে নিতে হবে।

হিন্দুধর্মের যত কাহিনী আছে সব পুরানের মধ্যেই বলা হয়েছে, পূজা উপাচারের কথা তন্ত্রের মধ্যেই বলা আছে, সামাজিক আচার বিধির কথা স্মৃতির মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে উপনিষদ আর গীতাতেই দর্শন শেষ হয়ে যায় না। বিশেষ করে পুরানে দর্শনও পাওয়া যাবে, আচার-বিধিও আছে আবার স্মৃতিরও কাজ করে। ফলে পুরান থেকে অনেক আলাদা দর্শন বেরিয়ে আসতে পারে। আমাদের ঋষিরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন বলে তাঁদের অনেক চিন্তা-ভাবনা বেদে খুব হাল্কা করে বলা হয়েছে। সেটাকেই পুরান একটা পূর্ণাঙ্গ দর্শনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই দর্শনগুলো আবার উপনিষদে পাওয়া যাবে না। এখান থেকে জন্ম নিল ষড়দর্শন। যদিও ষড়দর্শন নামে চলছে কিন্তু ভারতে যে কত দর্শন আছে কেউ সঠিক জানে না, এখনও অনেক বই ছাপাই হয়নি। একমাত্র বেদান্তেই হাজার খানেক শাখা আছে, বাকিদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল। কেউ জানেই না কটি শাখা আছে। বলা হয় বেদান্ত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটে দর্শন নিয়ে চলে। কিন্তু বেদান্তে শুধু এই তিনটে দর্শনই নেই, হাজার হাজার মত আছে। কারণ প্রত্যেক মানুষই এক একটি দর্শন। একটু ডান দিক বাঁ দিক করে দিলেই দর্শন পাল্টে যাবে। কিন্তু মোটামুটি আমরা ছটি দর্শনের কথা বলি। এই ছটির মধ্যে বেদান্তের আবার তিনটে দর্শন রয়েছে, তাই মোটামুটি বলতে গেলে আটটি দর্শন হয়ে যায়। এই আটটি দর্শন পড়লে হিন্দু দর্শনকে ঠিক ঠিক জানা যায়। এই সব কটি দর্শনের মা হল উপনিষদ। উপনিষদের মা হল বেদ।

দর্শনের এই যে বিরাট চালচিত্র এর কোন একটাকে যদি কেউ মানে তাহলেই তার নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ যে বেদকে মানবে সেই হিন্দু। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ মানুষ বেদ চোখেই দেখেনি, তাহলে তারা হিন্দু হল কি করে? বেদ না পড়লে, বেদ চোখে না দেখলেও কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মানে সেই হিন্দু হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের কথা কোথায় আসছে? ভাগবতে আছে। ভাগবত আছে পুরানে। পুরান মানে ধর্মের একটি অঙ্গ। এই অঙ্গ কোথা থেকে এসেছে? বেদ থেকে। তাহলেই হল, শ্রীকৃষ্ণকে মানা মানে সে বেদকে মেনে নিল। আরেকজন এসে বলল 'আমি কোন ধর্মই মানিনা, ধর্মের দর্শনকেও মানিনা, পুরানের গালগপ্পকে গাঁজাখুড়ি মনে করি, এর থেকে টিনটিন, এ্যস্ট্রিক্সের কমিকস্ অনেক ভাল'। 'কেন? আপনি মন্দির, দেবালয়ে যে এত পূজা হচ্ছে, এত লোক যাচ্ছে এগুলোকে মানবেন না'? 'দূর মশাই! এগুলো সব বিজনেস'। তখন তাকে এই সামাজিক আচার বিধিতে ফেলা হবে। 'আচ্ছা ভাই আপনার ছেলের যখন জন্ম হয়েছিল তখন আপনি ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন'? 'কেন দেব না, ছেলে প্রথম ভাত খেতে যাচ্ছে তার জন্য একটা অনুষ্ঠান করে সবাইকে আপ্যায়ন করাটা পিতা হিসাবে আমার কর্তব্য'। তাহলেই তো আপনি হিন্দু হয়ে গেলেন। অন্নপ্রাশন হবে কি হবে না, হলে কি ভাবে করতে হবে সব স্মৃতিতে বলে দিচ্ছে। স্মৃতি আবার বেদকে মেনে চলে।

এই যে শাস্ত্রের বিরাট পরিধি এর সবটাই কোন হিন্দুই মানবে না, মানা সম্ভবও নয়। কিন্তু এর সামান্য কিছুও যদি কেউ অনুসরণ করে, দেখা যাবে সেটাও বেদের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে। এই আটটি দর্শনের সবাই কিন্তু আবার বেদকে মানছে। মনুস্মৃতি বলবে আমরা বেদের সামনে সর্বদা নত মস্তক। তন্ত্র, পুরানও তাই বলবে। ইতিহাস-পুরান কথায় কথায় বলবে বেদ থেকেই আমরা শক্তি পেয়েছি। আর উপনিষদ তো বেদেরই একটি অঙ্গ। আমি যদি বলি ঠাকুরই আমার সব কিছু, ঠাকুর ছাড়া আমি আর কিছু মানিনা। ঠাকুরের যত কথা আছে স্বামীজী সেগুলোকে ব্যাখ্যা যখন করছেন তখন সবই উপনিষদের কথার সঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে। উপনিষদ মানেই বেদ। ঠাকুরকে ভালোবাসা মানেই আমি বেদকে মানছি, তার জন্য আলাদা করে আমার বেদকে জানার কোন দরকারই নেই। আমি বলছি আমি শীতলা মাকে মানি। তাও ঘুরে বেদে চলে যাবে। শীতলা মাতার কথা আমরা তন্ত্রে কোথাও ছোট্ট করে পেয়ে যাব। তন্ত্রে থাকা মানে ঘুরে ফিরে সেটাও বেদে চলে যাবে। হিন্দু মানেই হল যে বেদকে মানে, প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক পরোক্ষ ভাবেই হোক। হিন্দুধর্মের এটাই হল মূল।

চারটে বেদ আর প্রত্যেকটি বেদের যে চারটি করে অঙ্গ, এরা আসলে কি বলতে চাইছে? এদের বক্তব্য হল সুখপ্রাপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য। তুমি সুখ কোথায় পাবে? প্রথমে এই লোকে, এই জগতে আমাকে সুখ ভোগ করতে হবে। এখানে কি সুখ ভোগ করবে? যত সুখ আছে তার মধ্যে আসল সুখ হয় পুরুষ নারীর সংযোগ সুখ। এই সুখের মত কোন সুখ নেই। সেই সুখ থেকে সন্তান প্রাপ্তি হয়। তখন আসে সন্তান সুখ। সেইজন্য বলছেন প্রথম সুখই হল কাম। নারী থাকলেই অর্থের প্রয়োজন। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলছেন যার টাকা নেই সেতো অভাগা, তার সতী স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে যায়। তাই দ্বিতীয় হল অর্থ। অর্থ না হলে তোমার সুখ আসবে না, সুখ ভোগ যদি করতে চাও তোমাকে অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। বেদ আমাদের এই কাম আর অর্থের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, কি যজ্ঞ করলে, কি মন্ত্র পাঠ করলে অর্থ আর কাম আসবে বেদ সব বলে দেবে। এইভাবে এই জীবনেই যাদের সব কিছু সুখভোগ হয়ে গেল, এবার তারা বলছে আমার মৃত্যুর পরেও যেন এই সুখটা থাকে। যারা এই জীবনে কষ্ট পাচ্ছে তারাও বলে এই কালটা তো এইভাবে গেল পরকালটা যেন ঠিক হয়। অর্থ আর কাম গেল ইহকালের সুখে। আর পরকালের সুখের জন্য যেটা করা হয় সেটাকে বলছেন ধর্ম। ধর্ম মানে, তীর্থাদি করা, দানা-ধ্যান করা। এনাদের মত হল, ধর্ম করলে পরকালটা ভালো হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমি ভালো স্বর্গে যাব। সেখান থেকে আবার আমার যখন জন্ম হবে তখন ভালো ঘরে জন্ম হবে। ঠাকুর বলছেন – আগের জন্মে দান পূণ্য করলে এই জন্মে টাকা-পয়সা থাকে।

আরেকজন বলছেন আমার ইহকালের সুখও চাইনা আর পরকালেরও কোন সুখ চাইনা। আমার কামিনী-কাঞ্চন লাগবে না, সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। যে স্ত্রী চাইছে না, সন্তান চাইছে না সে টাকা-পয়সা নিয়ে কি করবে! অর্থ হল একটা উপায়, অর্থ কখনই উদ্দেশ্য নয়। স্ত্রী সঙ্গে থাকাটা কিছুটা উপায় আর কিছুটা উদ্দেশ্য। কি রকম উপায়? মহাভারতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী সব কিছুতে সাহায্য করেন, স্বামী পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে তাকে সেবা করছে, আপদে বিপদে স্বামীর পাশে দাঁড়াচ্ছে, মনে শান্তি দিচ্ছে। যজ্ঞাদি যখন হয় তখন স্ত্রী সেখানে স্বামীকে সহায়তা করছে। আর স্বামীকে সন্তান সুখ দিচ্ছে। ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেতেই স্ত্রী সাহায্য করে। কিন্তু সে বলছে আমার এসব কোন কিছুই লাগবে না। তখন এদের জন্য চতুর্থ পথ হল মোক্ষ। ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ এই চারটেকে বলা হয় পুরুষার্থ। মানুষ যে এই জীবনটা পেয়েছে, এই জীবন দিয়ে সে কি করবে? একটা পথ হল যেমন তেমন করে হো হো করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া, সকালে উঠে খবর কাগজ পড়ছি, এক কাপ চা খেয়ে রান্নাবান্ন করলাম, দুপুরবেলা টিভিতে কত সিরিয়াল চলছে, ক্রিকেট ম্যাচ চলছে, এগুলোতে দেখতে সময় দিলাম। বিকেল হল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা, পার্কে বেড়ান, সিনেমা দেখা অনেক কিছুই করা যাবে। সন্ধ্যা হল। বাড়িতে এলাম বা কোন পার্টিতে গেলাম। তারপর মাঝ রাতের সিনেমা দেখা বা নাটক নভেল পড়া। তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। আবার সকাল হল। সেই একই জিনিষের পুনারাবৃত্তি চলল। এটাই হো হো করা জীবন। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন এরা বর্ণাশ্রমের বাইরে। এরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোনটাই না।

আমেরিকায় স্বামীজীকে একজন বলছেন 'আপনারা শূদ্রদের উপর খুব অত্যাচার করেছেন'। স্বামীজী খুব মজা করে উত্তর দিচ্ছেন 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের উপর অনেক কিছুর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছিল কিন্তু শূদ্রদের উপর কোন রকম নিষেধাজ্ঞা ছিল না, তারা যত খুশি মদ খেতে পারে, মাংস খেতে পারে, যত খুশি বিয়ে করতে পারে, ডিভোর্স দিতে পার, সব রকমের ভোগ করতে পার। এরা ঠিক কি রকম ছিল জানেন, আপনাদের হায়ার সোসাইটিতে যা কিছু হয় তাদের মতই এদের সব কিছু ছিল'। স্বামীজীর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে। স্বামীজী বলতে চাইছেন তোমাদের উচ্চবিত্ত সমাজে যে আচরণ করা হয় আমাদের শূদ্ররা ঠিক সেই ধরণের আচরণ করে। আমাদের শূদ্রদের যে মানসিক অবস্থা তার থেকেও তোমাদের অবস্থা করুণ। স্বামীজী এত মিষ্টি করে বলছেন লোকেরা শুনে হাসিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। ব্রাহ্মণরা যেভাবে জীবন-যাপন করত তোমাদের দ্বারা এই জন্মে সে আচরণ করা সম্ভব হবে না। আমাদের ব্রাহ্মণদের ত্যাগ তপস্যা তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না। সেইজন্য ব্রাহ্মণরা সমাজ থেকে খুব সম্মানও পেত। ব্রাহ্মণরা ত্যাগ তপস্যার জোরে এগিয়ে গেল, আর পড়াশোনাও ছিল, তাই তারা সবার থেকে উপরে চলে গেল, বাকিরা এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। শূদ্ররা কোন কিছুই পালন করত না, আর ভোগের ব্যাপারে তাদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণও ছিল না, সব কিছুতেই তাদের অনুমোদন ছিল কিন্তু তার বদলে তুমি সম্মানটাও দাবী করতে পারবে না। কিন্তু শূদ্রও যদি উপরের দিকে আসতে চায় তাহলে সেও আসতে পারবে। তবে তাকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এর সব কিছুরই সাধনা করতে হবে। যদিও উপনিষদ পড়ার অধিকার শূদ্রদের ছিল না কিন্তু পুরান, স্মৃতি এসব পড়ার অধিকার ছিল আর পুরানের মধ্যে সে সব কিছুই পেয়ে যাচ্ছে।

উপনিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষ। মোক্ষ ছাড়া অন্য কোন কথা বলবে না। কথামৃতেও দু চারটে সংসার ধর্মের কথা পাওয়া যাবে। ঠাকুর বলছেন গৃহস্থকে অর্থ উপার্জন করতে হয়, সাধুসেবার জন্য, সন্তানের জন্য দুটো পয়সা সঞ্চয় করে। পাখিও ছানার জন্য মুখে করে দানা নিয়ে আসে। আবার বলছেন একটি দুটি সন্তান হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে। উপনিষদ এই ধরণের কথাও বলবে না, শুধু একটি কথা – মোক্ষ। উপনিষদ ধর্ম, অর্থ আর কামের প্রসঙ্গ নিয়ে আসবে, কিন্তু এনেই এক চাপড় মেরে ফেলে দেবে। এই কারণে সন্ন্যাসী ছাড়া উপনিষদ কাউকে পড়তে দেওয়া হত না। বিষয় বাসনার লেশ মাত্রও যদি থাকে উপনিষদের কথা ধারণাই করতে পারবে না। বাচ্চা বয়সে ব্রাহ্মণের ছেলেরা যখন ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুগৃহে বাস করত তখন তাদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এগুলো মুখস্ত করতে দিতেন। মুখস্ত করার পর গুরু যদি দেখতেন এর মধ্যে সাংসারিক বুদ্ধি নেই তখন তাকে উপনিষদের কথা বলতেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে আছেন তখন সবাইকে বলতেন তোমরা শনি মঙ্গলবার আসবে। বেশির ভাগ ভক্ত রবিবার দিন যেতেন। আর নরেন, তারক, শশী, নিরঞ্জন এদেরকে আলাদা দিনে আসতে বলতেন। শুধু তাই না, কিছু বলার আগে বলতেন বাইরে দেখে আয় কেউ আছে কিনা। দেখলেন অন্য কোন ভক্ত নেই, তারপর আবার দরজা বন্ধ করে দিতেন। এরপর এদেরকে আসল শিক্ষাটা দিতেন। কারণ এদেরকে ঠাকুর যে কথা গুলো বলতেন এগুলো এত উচ্চ কথা যে এসব কথা সাধারণের জন্য নয়। কথামৃতে ঠাকুরের আসল শিক্ষাটা পাওয়া যাবে না, যেটা তিনি এই উচ্চ আধারের গুটি কয়েক যুবক সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। ঠাকুরের ঠিক ঠিক শিক্ষাটা বোঝা যায় তাঁর যে সন্তানরা ছিলেন তাঁদের আচরণ কথাবার্তা থেকে।

যে কোন ধর্মই শেষে গিয়ে মোক্ষের শিক্ষাটাই দেবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ মোক্ষের শিক্ষাটা নিতে পারেনা। তাই তাদের প্রথমে বলে দেয় আগে তুমি কামিনী-কাঞ্চন থেকে বেরোবার চেষ্টা কর। কামিনী-কাঞ্চন থেকে বেরোবে কি করে? আগে তুমি অর্থ আর কামের সাধনা কর। এখানে কামিনী-কাঞ্চন আর অর্থ ও কামের তফাৎ আছে। কামিনী-কাঞ্চন হল ভোগের মধ্যে লাগাম ছাড়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু মানুষ যখন সৎ ভাবে অর্থ উপার্জন করতে যাচ্ছে, ধর্ম সম্মত ভাবে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করছে তখন এটা অর্থ ও কাম সাধন হয়ে যাচ্ছে। বেদ বলে দেবে কিভাবে অর্থ ও কামের সাধনা করতে হবে। অর্থ আর কামের ভোগ যখন মিটে যাবে তখন জিজ্ঞেস করবে তোমার কি পরলোকের সুখ চাই। যদি বলে না আমার স্বর্গসুখে কোন আগ্রহ নেই। বেদান্তে খুব সুন্দর করে বলছে উপনিষদ কে অধ্যয়ণ করতে পারে? *ইহামুত্রফলভোগবিরাগ* – *ইহ* মানে

এই সংসারে, *অমুত্র* মানে মৃত্যুর পরে স্বর্গে, *ফলভোগবিরাগ* – এই জগতের আর স্বর্গের কোন ফলের ভোগে আমার আগ্রহ নেই। এবার তুমি মোক্ষ পথের জন্য তৈরী। কিন্তু আমরা এত নীচে পড়ে আছি, ঘোর তমোগুণের মধ্যে নিমজ্জ হয়ে আছি। তরকারিতে একটু নুন কম বা বেশি হলেই ফাটাফাটি করছি, তারপর বলছি আমার এই লোকের কিছু কামনা নেই আর স্বর্গলোকেরও কোন কামনা নেই, এই কথা আমাদের মুখে সাজেনা।

ব্যাসদেবের আগে সমগ্র বেদ এক সঙ্গে স্তুপাকৃত ছিল, যার ফলে এত বিশাল বেদ একজনের পক্ষে মুখস্ত করা খুব কষ্টসাধ্য। ব্যাসদেব প্রথম এই সমস্যাটা উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি সমগ্র বেদকে চার ভাগে বিভাজন করে নিজের চার জন প্রধান শিষ্যকে দিয়ে দিলেন। যার ক্ষমতায় কুলাবে সে চারটে বেদকেই মুখস্ত করবে, তা নাহলে তিনটে কিংবা দুটো বেদকে মুখস্ত করবে কিন্তু একটা বেদ মুখস্ত করা বাধ্যতামূলক ছিল। ব্যাসদেবের চারজন শিষ্য আবার নিজের শিষ্যদের মুখস্ত করাতে থাকলেন। কিন্তু বেশির ভাগ শিষ্যরা চারটে বেদকেই মুখস্ত করত। যে পরিবার চারটে বেদকেই মুখস্ত রাখত তাদের বলা হত চতুর্বেদী, যারা তিনটে বেদ মুখস্ত করত তাদের ত্রিবেদী, দুটো বেদ মুখস্ত থাকলে তাদের দ্বিবেদী আর একটা বেদকেই মুখস্ত রাখছে তাদের উপাধি হয়ে গেল বেদী। শুধু বেদ মুখস্ত রাখলেই হত না, বেদের সঙ্গে আরও অনেক কিছু থাকত যেমন শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এগুলোকেও মুখস্ত রাখতে হত। এখান থেকেই উৎপত্তি হল বেদের বিভিন্ন শাখা। কেউ হয়ত সামবেদ মুখস্ত করেছে, সামবেদ মুখস্ত করার সাথে সে বেদাঙ্গের শিক্ষার ব্যাপারে এই এই জিনিষগুলো জানে, ব্যাকরণের এই জিনিষগুলো জানেন। আরেকজন সেও হয়ত সামবেদ মুখস্ত করেছে কিন্তু শিক্ষার অন্য দিকগুলোকে অন্য ভাবে জানে, কিংবা ব্যাকরণের বা ছন্দের এই ব্যাপারগুলো আরেক ভাবে জানে, এই করে সামবেদের কয়েকটা শাখা তৈরী হয়ে গেল। শাখা হল একই বেদ কিন্তু বেদের সঙ্গে অন্যান্য যে জিনিষগুলো অধ্যয়ণ করতে হয় সেগুলো পাল্টে যেত। যেমন একজন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়ছে কিন্তু ইতিহাসের পাস পেপারগুলো নানা রকমের থাকে। দশজন ইতিহাস অনার্সের ছাত্র আছে কিন্তু একজন হয়ত পাস পেপারে পলিটিক্যাল সাইন্স নিয়েছে, কেউ হয়ত বাংলা নিয়েছে, কেউ হয়ত জিওগ্রাফি নিয়েছে। মূল সবাই হিস্ট্রি অনার্স কিন্তু তার সঙ্গে গ্রুপটা পাল্টে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি হয়ত দশজনই সামবেদ মুখস্ত করেছে, কিন্তু বাকি আনুষাঙ্গিক বেদাঙ্গ গুলো পাল্টে যাচ্ছে। এগুলোকে বলা হয় শাখা। এইভাবে প্রত্যেক বেদের অনেক শাখা হতে শুরু করল। পতঞ্জলী এক জায়গায় লিখছেন সামবেদরই হাজারটি শাখা আছে। কিন্তু এখন কয়েকটা শাখা মাত্র পাওয়া যায়।

আমরা যে উপনিষদকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, এই মুণ্ডক উপনিষদ অথর্ব বেদের অন্তর্গত। এখন আমরা অথর্ব বেদের দুটি শাখা পাচ্ছি। আগে অথর্ব বেদের কোন শাখা ছিল কিনা, থাকলেও কটি ছিল আমাদের আর জানার উপায় নেই। যেখান থেকে শাখাগুলো বিভাজন করা হয়েছে সেই সময় যে ঋষি ছিলেন তাঁর নামে শাখার নাম দেওয়া হত। অথর্ববেদের শিক্ষা দিয়ে ব্যাসদেব সুমন্তকে অথর্ববেদের দায়ীত্ব দিয়ে দিলেন। অথর্ববেদের দুটি শাখার নাম পিপ্পলাদ শাখা আর শৌনক শাখা। একটা সময়ে পিপ্পলাদ আর শৌনক সুমন্তের কাছে অথর্ববেদ অধ্যয়ণ করেছিলেন। এগুলো এতই পুরনো যে ইতিহাসে তো কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যাবে না আর পরম্পরাতেও এগুলো আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে জিনিষটা মোটামুটি এই ভাবে দাঁড় করান যায় –

ব্যাসদেব

⇩

ঋগ্বেদ | সামবেদ | যজুর্বেদ | অথর্ববেদ

অথর্ববেদ ⇩ সুমন্ত (শিষ্য)

সুমন্ত (শিষ্য) ⇩ পিপ্পলাদ | শৌনক

অথর্ববেদের দুটি যে শাখা ছিল এরা দুজনেই প্রথমে সুমন্ত ঋষির কাছে মূল বেদ মুখস্ত করেছিলেন কিন্তু পরে একজন চারটে উপনিষদ মুখস্ত রেখেছেন। অন্য জন এর সাথে হয়ত সামবেদকেও মুখস্ত রেখেছেন আর অন্য ছটি উপনিষদকে মুখস্ত করেছেন। এই করেই শাখা আলাদা হয়ে গেল। এবার এনাদের যারা শিষ্য হবে তারা আবার ঐ জিনিষগুলোকেই মুখস্ত করে চলে যাবে। পরে যখন ভারতে বিধর্মীরা আসার পর হিন্দুদের নিধনপর্ব শুরু করল, তখন একটা জায়গায় দেখা গেল বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণের গলা কাটা গেল। সেখানেই হয়ত পাঁচটা শাখা বিলুপ্ত হয়ে গেল। কারণ এত কিছু মুখস্ত রাখাতো সবার ক্ষমতা ছিল না। গুরুর কাছে বাচ্চারা এসে বলত আমাকে শিক্ষা দিন। গুরু হয়ত জিজ্ঞেস করতেন শিক্ষা নিয়ে কি করবি? শিক্ষা নিয়ে আমি একটা চাকরি জোগাড় করব। কোথায় চাকরি করবি? রাজার কাছে। গুরু বললেন আমার কাছে কুড়ি বছর থাকতে হবে। কুড়ি বছর যদি এখানেই থাকি তাহলে চাকরি কবে করব? যা হয় হোক আমাকে তিন বছরের মধ্যে কিছু শিখিয়ে দিন যাতে চাকরিটা জোগাড় করতে পারি। তিন বছরে আর কতটুকু শেখাতে পারবেন। একটু ব্যকরণ শিখিয়ে দিলেন, মূল বেদের কিছু অংশ আর বেদের কয়েকটি অঙ্গ শিখিয়ে দিলেন। এই ভাবে বিদ্যা হ্রাস পেতে শুরু করল। তার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা তপস্যা, ত্যাগ ও মনের অদম্য শক্তিতে বেদ মুখস্ত করে বেদকে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন ম্যাক্সমূলারের দৌলতে বেদ ছাপা হয়ে গেছে বলে বেদ হারিয়ে যাবার আশঙ্কা চলে গেছে। যদিও সাতশ কি আটশ শতাব্দিতে বেদের অনেক কিছুই পুঁথি আকারে লেখা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেই সব পুঁথি শুধু যে যেই শাখাতে ছিলেন সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, শাখার বাইরে কেউ জানতে পারত না। ইদানিং কালে যদি কেউ বলে আমি বেদ জানি তাহলে বুঝতে হবে সে শুধু সংহিতাটুকুই জানে। পুরো বেদ এখন আর কেউ মুখস্ত করে না। আবার কিছু সংস্কৃতের পণ্ডিত আছেন যাদের যজুর্বেদীয় পণ্ডিত বলা হয়। এনারা আবার পুরো যজুর্বেদকে মুখস্ত করেছেন। পুরো যজুর্বেদ মানে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারটেই মুখস্ত। কিন্তু তাই বলে যে শিক্ষা কল্প ব্যকরণের সব কিছু মুখস্ত করেছেন তা নয়।

কোথাও কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় যে অথর্ব বেদে আটাশ খানা উপনিষদ ছিল। কিন্তু আচার্য শঙ্কর মাত্র দুটোর উপর তাঁর ভাষ্য দিয়েছেন। এই দুটো উপনিষদের নাম – প্রশ্নোপনিষদ আর মুণ্ডকোপনিষদ। সেইজন্য এই দুটো উপনিষদকেই প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়। মুণ্ডক শব্দের অর্থ মুণ্ডিত। মুণ্ডিত মস্তক, যা কিনা সন্ন্যাসীর চিহ্ন। অনেকের ধারণা যে ভগবান বুদ্ধের সময় থেকেই সন্ন্যাস প্রথা চালু হয়েছে, অথচ আমরা এখানেই পাচ্ছি সন্ন্যাস প্রথা অনেক আগে থাকতেই আমাদের মধ্যে ছিল। মুণ্ডকোপনিষদ পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের জন্য। তবে সব উপনিষদের বক্তব্য এক। মুণ্ডকোপনিষদের তথ্য হল – ব্যাসদেবের শিষ্য হলেন সুমন্ত। কোন একটা সময়ে সুমন্তের দুজন শিষ্য হয়েছিল একজন পিপ্পলাদ ও অন্য জন শৌনক। এমনও হতে পারে তাঁরা আদপেই সুমন্তের শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু শাখার নাম হল পিপ্পলাদ আর শৌনক। পিপ্পলাদের শাখাতে যাঁরা আছেন তাঁরা অথর্ববেদ মুখস্ত রাখবে আর যাঁরা শৌনক শাখার তাঁরাও মুখস্ত রাখবে। কিন্তু তাঁদের আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো পাল্টে যাবে।

সম্প্রদায় বিদ্যার গুরুত্ব

যে কোন বিদ্যাই যখন আমরা অধ্যয়ণ করতে যাই তখন আমাদের জানা উচিৎ এই বিদ্যার উৎসটা কি অর্থাৎ এই বিদ্যাটা কোথা থেকে এল, এর পরম্পরাটা কি। মুণ্ডোপনিষদেও প্রথমেই বিদ্যার উৎসটা বলে দেওয়া হয়েছে। এই বিদ্যা প্রথম ব্রহ্মা থেকে এসেছে। ব্রহ্মা এই বিদ্যা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে দিলেন। তিনি আবার তাঁর পুত্রকে দিলেন। যাঁরা বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নেন তাঁরাও ঠিক এইভাবে দেখেন, ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন। তাঁর সন্তান হলেন মহাপুরুষ মহারাজ। মহাপুরুষ মহারাজের সন্তান স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সন্তান আমি। যতক্ষণ কোন পরম্পরা সাক্ষাৎ ভগবান পর্যন্ত না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ ঐ পরম্পরার কোন মূল্য থাকে না। এখানেও ঠিক তাই করা হচ্ছে, এই যে উপনিষদের বিদ্যার কথা বলা হচ্ছে এই বিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন এখানে সম্প্রদায়ের স্তুতি করে উপনিষদ শুরু করা হচ্ছে। একদিকে ভাগবাতাদি গ্রন্থে যেমন গ্রন্থস্তুতি করে গ্রন্থের মাহাত্ম্যকে বড় করে দেখানো হয়, অন্য দিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল আমি যে বিদ্যাটা গুরুর কাছে শ্রবণ করতে যাচ্ছি, গুরুর কথার পেছনে শক্তিটা কি? একজন কবি খুব সুন্দর কবিতা লিখলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি আপনি এই কবিতাটা কোথায় পেয়েছেন? তিনি বললেন আমি ধ্যানের গভীরে এই কবিতা পেয়েছি। এখানেই তাঁর সব কিছু শেষ হয়ে গেল। মুণ্ডকোপনিষদ কিন্তু প্রথমেই বলে দেবে আমি যে কথাগুলো বলতে যাচ্ছি এগুলো আমি কোথায় পেয়েছি, আমাকে এই কথাগুলো কে বলেছেন? আমার গুরু আমাকে বলেছিলেন। তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? অমুক গুরুর কাছে। তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? শেষে গিয়ে যাঁর কাছে দাঁড়াচ্ছে তাঁর নাম অথর্বা। অথর্ব বেদ হয়তো সেইখান থেকেই এসেছে। আমরা অবশ্য জানিনা অথর্ব বেদ নামটা কেন দেওয়া হয়েছে। অথর্বা হলেন ব্রহ্মাপুত্র। ব্রহ্মার মুখ থেকে যখন এই বিদ্যা এসেছে তখন এই বিদ্যার মূল্য আছে। ব্রহ্মার কথা মানে ভগবানেরই কথা, এই কথার উপর আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এটাই ভারতের ঐতিহ্য। বিজ্ঞানের উপরও যদি কোন কিছু লেখা হয় তখন সেখানেও একেবারে শেষ পাতায় উল্লেখ থাকে এই বই লিখতে গিয়ে কোন কোন বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব কথা যখন আসে তখন সেই কথার পেছনে চাপরাশ থাকা চাই। কথামৃতে আছে পদ্মলোচন বলে একজন গ্রামের লোক একটা ভাঙা মন্দিরে যেখানে কোন পূজাদি হয় না, সেখানে গিয়ে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজাতে শুরু করেছে। গ্রামের সবাই ভাবল এই ভাঙা মন্দিরে কে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে? তখন সবাই গিয়ে দেখে পদ্মলোচন শাঁখ বাজাচ্ছে, তাই দেখে বলছে 'ওরে পোদো শাঁখ বাজিয়ে করলি তুই গোল'। মন্দিরে তোমার কিছুই নেই তোমার কথা কে শুনতে আসবে। হিন্দু ধর্মই হল সম্প্রদায় বিদ্যা, সম্প্রদায় ছাড়া বিদ্যার এখানে কোন মূল্য নেই। কাল হঠাৎ আমি বলতে শুরু করে দিলাম 'আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি, আমি ঈশ্বরীয় কথা বলতে চাই'। তখন প্রথমেই আমাকে বলবে 'আগে তোমার পরম্পরাটা কি বলতো'। 'না, আমার কোন পরম্পরা নেই, আমি নিজেই সাধনা করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করেছি'। 'তোমার কথা কেউ শুনবে না'। সম্প্রদায়কে টেনে সাক্ষাৎ ভগবান পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। ভগবান পর্যন্ত আমার সম্প্রদায়কে না নিয়ে যাতে পারলে আমার কথা কেউ শুনবে না।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য বলছেন এখানে সম্প্রদায়কে স্তুতি করা হচ্ছে। এই ধরণের বিদ্যার যখন শিক্ষা দেওয়া হয় তখন সম্প্রদায়কেই আসল গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানেও সম্প্রদায়কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভগবানের কাছে। শুধু তাই না, এই বিদ্যা অত সহজে পাওয়া যায়নি। এর আগের আগের ঋষিরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেক কষ্টসাধ্য তপস্যা, সাধনা করে এই বিদ্যা পেয়েছিলেন। যে বিদ্যা সহজে পাওয়া যায় সেই বিদ্যা আদপে বিদ্যা নয়। এখন অবশ্য আমরা সহজে পেয়ে যাচ্ছি। সহজে পেয়ে যাচ্ছি বলেই আমাদের কাছে কোন মূল্য নেই। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন তবলার বোল মুখে বলা খুব সহজ কিন্তু হাতে আনতে গেলে অনেক কষ্ট করে অভ্যাস করতে হয়। ঋষিরা অনেক মুণ্ডুকাটা তপস্যা করে এই মন্ত্রগুলো উদ্ধার করেছিলেন। উদ্ধার করেছিলেন মানে, বেদে জগতের যে সনাতন সত্যগুলো আছে সেগুলোকে উদ্ধার করেছিলেন। এই শাশ্বত সত্যগুলোকে উদ্ধার করে নিজের শিষ্য পরম্পরায় শিখিয়ে গেছেন। সেই শিষ্যরাও আবার অনেক পরিশ্রম করেছেন, শুধু মুখস্ত করার জন্য নয়, মাথায় ধরে রাখার জন্য। ইনি পেয়ে তাঁকে দিলেন, তিনি আবার এনাকে দিলেন। এতজন ঋষির কথা কেন উল্লেখ করা হচ্ছে? কারণ এনারা প্রত্যেকেই খুব নামকরা ঋষি। এনাদের নাম করে এত কথা বলা হচ্ছে যাতে এই শাস্ত্রের প্রতি মানুষের রুচি হয়। দ্বিতীয়তঃ যাতে আরও সম্মান দিয়ে এই বিদ্যাকে অধ্যয়ণ করা হয়। প্রথমেই এই সব বলে সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্যাকে তোমরা খেলো করে নিতে যেওনা। এই বিদ্যাকে ঋষিরা বহু কষ্ট করে উদ্ধার করেছিলেন। আর বহু ত্যাগ তপস্যা দিয়ে এই পরম্পরা বিদ্যাকে চালিয়ে গেছেন। এই সাত আট হাজার বছরের প্রাচীন বিদ্যাকে আজ তোমার কাছে খুব সহজেই হাজির করা হয়েছে বলে তুমি একে অসম্মান করে খেলো করতে যেও না। এর বিষয়ের প্রতি তোমার যাতে বিশেষ ভক্তি হয়। গীতাতেও ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমে এই সম্প্রদায় বিদ্যার মহত্ত্বকে তুলে ধরে বলছেন আমিই এই বিদ্যা শুরু করেছিলাম বিবস্বতকে বলে।

অনুবন্ধ চতুষ্টয়

যে কোন শাস্ত্র বা বিদ্যা অধ্যয়ণ করার আগে চারটে জিনিষ জানতে হয়। আমাদের হিন্দু পরম্পরাতে যখনই কোন গ্রন্থ লেখা হয় তখন এই চারটে জিনিষকে স্পষ্ট করে বলে দিতে হয়। এই চারটেকে একত্রে পরিভাষিত করে বলছেন অনুবন্ধ চতুষ্টয়। প্রথম হল অধিকারী, এই শাস্ত্রটা কার জন্য। সব শাস্ত্র সবার জন্য নয়। দ্বিতীয় বিষয়, এই শাস্ত্রের বক্তব্য কি, কি বিষয়ে বলতে চাইছে। তৃতীয় প্রয়োজন, বিষয় তো জানলাম কিন্তু এই বিষয়কে জেনে আমার কি উদ্দেশ্য সাধন হবে। সেইজন্য প্রয়োজনকে ব্যাখ্যা করতে হয়। আর চতুর্থ হল সম্বন্ধ, অনেক সময় বলা হয় এই যে শাস্ত্রের বিষয় আপনি বললেন, এই বিষয়ের সাথে অধিকারী আর প্রয়োজন এই তিনটের কি সম্পর্ক এটাকে একটু ব্যাখ্যা করুন। যে কোন শাস্ত্রের প্রথমেই এই চারটেকে ব্যাখ্যা করে বলে দিতে হত। আচার্য যখনই কোন ভাষ্য রচনা করেন তিনি প্রথমে এই চারটে জিনিষকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে দেন।

এই গ্রন্থের প্রয়োজনটা কি বলতে গিয়ে বলছেন, এই উপনিষদের শেষের দিকে বলা হয়েছে *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ*। হৃদয়ের গ্রন্থিগুলোকে এই বিদ্যা ভেদ করে যায়। হৃদয়ে নানা রকমের গ্রন্থি, মানে কামনা-বাসনা জমে আছে, এই গ্রন্থির জন্য আমি নিজেকে শরীরধারি এক মানুষ বলে মনে করছি। তার ফলশ্রুতিতে আমি নিজেকে শোক মোহগ্রস্ত মনে করছি। আমি মনে করছি আমি যদি অনেক দৌড়ঝাঁপ করে খাটাখাটুনি করি তাহলে কিছু টাকা পাব, সেই টাকা পেলে আমার সুখ আসবে। সুখ হলে আনন্দ হবে। সারাটা জীবন এই আনন্দের পেছনে আমরা ছুটে চলেছি। আর দুঃখ থেকে পালাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। যখনই মানুষ একটা সুখ পেয়ে গেল তখন সে আরেকটা সুখের পেছনে ছুটতে শুরু করে দেবে। একটা দুঃখ থেকে পালাচ্ছি তখন দেখছি আরেকটা দুঃখ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। সুখ আর দুঃখ সারা জীবন আমাকে নাচিয়েই চলেছে। শুধু এই জীবনেই নয়, এই মনুষ্য যোনি থেকে আবার অন্য কোন যোনিতে গিয়ে জন্ম নিচ্ছি, আবার সেখান থেকে আরেকটা যোনিতে চলে যাচ্ছি, এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে ঘুরপাক খেয়েই চলেছি।

কিন্তু পুনর্জন্মকে অনেকেই মানতে চান না, যারা মানে তাদেরও মনে অনেক সংশয়, সত্যিই কি পুনর্জন্ম আছে! বেশ কিছু দিন আগে আমেরিকার ভর্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের প্রধানের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল মৃত্যুর পর সত্যিই কিছু আছে কিনা জানার। এই নিয়ে তিনি একটা দুশ পাতার বই লিখেছেন। বইটি খুব বেশি পুরনো নয়, যদিও কিছু দিন আগে তিনি মারা গেছেন। আর খুব দুঃখ পেয়েই মারা গেছেন। কারণ বিজ্ঞান মহল তাঁর এই গবেষণা মূলক গ্রন্থটি গ্রহণ করেনি। তিনি খুব দুঃখ করেই বলে গেলেন বিজ্ঞানীরা আমাকে গ্রহণ করল না ঠিকই কিন্তু আমার বই না পড়েই অস্বীকার করে বসল। তিনি রীতিমত তথ্য দিয়ে, চিত্র দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় চার থেকে ছয় বছর বাচ্চাদের মধ্যে পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকে। উনি সেইভাবে এই ব্যাপারে একটাও নোট করেননি, উনি শুধু নোট করেছেন যাদের শরীরে জরুল আছে। উনি যদি শুনতেন কোন বাচ্চার শরীরে জন্ম দাগ আছে তিনি আমেরিকা থেকে ভারতে চলে আসতেন। ভারতে এসে তিনি বাচ্চার সঙ্গে কথাবার্তার সব টেপ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় আড়াই হাজার কেস স্টাডি করেছেন, তবে শর্ত হল বাচ্চার শরীরে জন্ম দাগ থাকতে হবে। একটা কেসে তাঁর বর্ণনা আছে, দেখছেন একটা বাচ্চার কপালে একটা দাগ আছে। তিনি বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কপালে দাগ হল কি করে? বাচ্চাটি নির্বিকার ভাবে বলছে আপনি জানেন না? আমি তো অমুক লোক, আমাকে কয়েকজন গুণ্ডা মিলে কপালে গুলি চালিয়েছিল সেই থেকে আমার কপালে দাগ। তোমার কোথায় বাড়ি ছিল? বাচ্চাটি হয়ত বলে দিল আমার পাঁচশ কিংবা হাজার কিলোমিটার দূরে। এরা তখন ওই জায়গাতে চলে যাচ্ছেন স্টাডি করার জন্য। সেখানে লোকেদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কয়েক বছর আগে এই রকম একটা ঘটনা এখানে হয়েছিল। তখন তার পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তাঁরা বার করে আনছেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখছেন গুলি যেখানে লেগেছিল, গুলির ঐ দাগ নিয়েই বাচ্চাটা জন্ম নিয়েছে। আরেকটি কেসে একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছেন তোর গলায় এই দাগটা কিসের? তোমরা জানো না, আমাকে ঐ দুজন গলাটা কেটে দিয়েছিল! ছেলেটি তাদের নামও বলে দিচ্ছে। ওরা কোথায় থাকে আর তুই কে? ওরাতো ঐ গ্রামে থাকে

আর আমার তো এই নাম। পরে তারা ঐ গ্রামে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ওখানে একটা বাচ্চা ছেলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। এখনও পুলিশ তার খবর পায়নি। বাচ্চাটি বলে দিয়েছিল আমাকে গলা কেটে ঐ জায়গাটায় কবর দিয়েছিল। এরাও ঐ জায়গাতে খনন করতেই একটা কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে। বাচ্চাটি নাম বলে দিয়েছিল কারা কারা তার গলাটা কেটেছিল। তারা গিয়ে ঐ লোক দুটিকে ধরেছে, তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হল। পরে পুলিশ কেস হয়ে গিয়েছিল। এই রকম প্রায় আড়াই হাজার কেস তিনি স্টাডি করেছেন।

আরেকটি ঘটনায় বলছেন। এক ভদ্রলোককে সম্মোহন করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তুমি কি অমুক লোক? হ্যাঁ আমি অমুক লোক। তুমি তো মারা গিয়েছিলে? হ্যাঁ, আমি তো মরেই গিয়েছি। তুমি আত্মহত্যা করেই তো মারা গিয়েছিলে? বলছে, না না, আমি আত্মহত্যা করতে কেন যাব। আমাকে আমার বউ মেরেছে। কি করে মারল তোমার বউ? দুধে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। তারপর কি হল? এরপর লোকটি সব বর্ণনা দিচ্ছে। কেন তাকে তার বউ মেরে ফেলল। আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার বউয়ের প্রণয় ছিল। এখন তুমি কি করবে? আমি কি আর করব, বদলা নেব। এরপর এরা সব খবরা খবর রাখছে। এই লোকটি এখন প্রেত হয়ে দুজনের ভেতরেই ঢুকে গেছে। তারপর দুজনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু হয়ে গেছে। ঝগড়া-ঝাঁটি দিন দিন বাড়তেই থাকল। একদিন ছোটভাই বলছে তুমি তো দাদাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিলে। বউটি বলছে, তুমিই তো বিষ খাওয়াতে বলেছিলে, তুমিই তো বিষ এনে দিয়েছিলে। সব কিছু ফাঁস হয়ে যেতেই একজনের ফাঁসি আরেকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। তারপর প্রেতটার শান্তি হল। এই ঘটনাগুলো একেবারে তথ্য দিয়ে সাজান হয়েছে, এমনকি ছবি, পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জেরক্স পর্যন্ত দিয়েছেন।

তবে এটাও দেখা গেছে যে সাত বছর পর্যন্ত পূর্বজন্মের স্মৃতিগুলো থাকে এরপর তার আর কিছু মনে রাখতে পারে না। যদিও বিজ্ঞান এগুলোকে মানবে না, না মানলে আমাদের কিছু যায় আসে না। মানুষের জন্ম-মৃত্যু কেন চলছে? হৃদয়-গ্রন্থিটা খুলছে না বলে। ঠাকুর বলছেন জীব আস্টেপৃষ্টে স্ক্রুপ দিয়ে বাঁধা। যার ফলে জীব জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে অনবরত ঘুরে চলেছে। এই জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে বেরোবার জন্য আমরা কি কোন চেষ্টা করছি? যদি চেষ্টা থাকে তাহলে কি চেষ্টা করছি? প্রথম কথা আমরা যে এই জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে আছি এই বোধটাই আমাদের মধ্যে এসেছে কিনা। শাস্ত্রে বলছে তপ্তশিরোবৎ, মাথায় যার আগুন লেগে গেছে সে চাইবে যে কোন জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবার আগে মাথার আগুনকে নেভাতে। আমার মাথায় যে আগুন জ্বলছে এই বোধটাই আমার নেই। ঠিক তেমনি আমার যে আবার জন্ম হবে এটাই আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের মধ্যে যাদের পুনর্জন্মে বিশ্বাস আছে তাদের কাউকে যদি বলা হয় আগামী জন্মে তোমার জন্ম হবে এক ভিখারীর বাড়িতে। এটা শোনার পর তার মনে কি রকম আতঙ্ক হবে! বলবে মহারাজ আগে বলুন এর থেকে কি করে বাঁচা যাবে।

এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে মানুষ কি কোন উপায় অবলম্বন করছে? আমাকে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে হবে। সেইজন্য বলা হয় জন্ম-মৃত্যুটাই সংসার ভয়। শাস্ত্র অধ্যয়ণে সংসার ভয়টা কাটে। সংসার ভয়ের প্রথমটা হল শোক আর মোহ। শোক মানে, একটা জিনিষ আমার কাছে ছিল সেটা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। এই নিয়ে দুঃখ করাকে বলছে শোক। মোহ হল, একটা জিনিষ আমি পেতে পারি কিন্তু পাচ্ছি না, পাওয়ার এই অদম্য ইচ্ছাকে বলে মোহ। জগৎ এই শোক আর মোহের জ্বালাতেই জ্বলে পুড়ে মরছে। খুব সাধারণ স্তরে এটাই হল সংসার দুঃখ। আরেকটু উচ্চস্তরে আসে মৃত্যু ভয়। অথচ আজ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাউকে কাঁদতে দেখা যায় না। বলে নাকি, মৃত্যুর সময় তার একটা সুখের অনুভব হয়। মৃত্যুর সময় সুন্দর একটা ঘুমের ঘোর এসে তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। সেই সময় কেউ কথা বললে তার ভালো লাগে না। বাস্তবিক মৃত্যু এইভাবে আসে যদি না কোন দুর্ঘটনা বা হিংসার বলিতে মৃত্যু না হয়। দুর্ঘটনা ও খুনখারাপিতে মৃত্যুর সাথে ব্যাথা যন্ত্রণার সম্পর্ক আছে। কিন্তু মানুষ মৃত্যুকে অকারণেই ভয় পায়। কিন্তু ঠিক ঠিক ভয় যেটা হয় সেটা পুনর্জন্মের ভয়। মাগো বাবাগো আবার আমাকে জন্মাতে হবে! পুনর্জন্মের আতঙ্ক

থেকেই ঠিক ঠিক মুক্তির ইচ্ছা শুরু হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা এই পুনর্জন্মের ভয় থেকেই শুরু হয়।

আমি চাইলেই কি আমার পুনর্জন্মকে আটকে দিতে পারব? কখনই পারব না। হৃদয়ের গ্রন্থিকে যতক্ষণ না ভেদ করতে পারা যাবে ততক্ষণ পুনর্জন্ম চলতে থাকবে। হৃদয়গ্রন্থিকেই রাজযোগে বলছে কর্মাশয়। কম্প্যুটারে যে চিপ্ ব্যবহার করা হয় তার সাইজ একই রকম কিন্তু কোনটাকে বলছে টু জিবি কোনটা থাউজেণ্ড জিবি। অথচ সাইজ এক। আমাদের যে মন তারও সাইজ এক কিন্তু তার মধ্যে আমরা যত খুশি মেমরি প্যাক করে যেতে পারি। এই মনের মধ্যে কত মেমরি আছে? সৃষ্টি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত মেমরি আছে সব ঐ মনের মধ্যে জমা আছে। পুরো মেমরির সবটাকে বার করতে গেলে ঠিক ততটাই সময় লাগবে। কিন্তু বার করতে গিয়ে আরও নতুন কিছু মেমরি এর মধ্যে জুটে যাচ্ছে। তখন একটা স্তরে গিয়ে আতঙ্ক আসবে, মাগো আমাকে এখনও এত জন্ম পেরোতে হবে! এর মধ্যে কখন কুকুর কখন শূকর হয়ে জন্মাতে হতে পারে, কখন মৌমাছি হয়ে জন্ম নিতে হতে পারে! তা নাহলে আমি চাইছি এই হৃদয়গ্রন্থিকে আমি ভেদ করতে। উপনিষদ অধ্যয়ণ করলে অর্থাৎ এই বিদ্যা অধ্যয়ণ করলে *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ*, হৃদয়গ্রন্থিকে ভেদ করে দেয়, অষ্টপাশে আবদ্ধ জীবের সমস্ত পাশ গুলিকে কেটে খুলে দেয়। এটাই হল মুণ্ডকোপনিষদের প্রয়োজন।

সম্বন্ধ কি? সাধ্য সাধন রূপ। সাধ্যটা কি? হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করা, পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি। প্রয়োজন আর বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? অজ্ঞান নাশ। অজ্ঞানকে এখানে বলা হচ্ছে হৃদয়গ্রন্থি। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করাটাই এখানে সাধ্য, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই উপনিষদ সাধ্যের সাধনা কি হবে সেটা বলে দিচ্ছে। তাহলে সম্বন্ধটা কি দাঁড়াল? সাধ্য সাধনার সম্বন্ধ। এই উপনিষদ দেখিয়ে দেবে সাধ্য আর সাধনার কি সম্পর্ক। সাধ্য আর সাধনার সম্পর্কে দেখাতে গিয়ে উপনিষদ প্রথমে দেখাবে অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যার কি তফাৎ। আচার্য অপরা বিদ্যার ব্যাখ্যা করছেন *বিধিপ্রতিষেধমাত্রপরায়া বিদ্যায়াঃ সংসারকারণাবিদ্যাদিদোষনিবর্তকত্বং নাস্তীতি...*, যে বিদ্যা শুধু মাত্র বিধি আর নিষেধের শিক্ষা দিচ্ছে সেই বিদ্যা দিয়ে কখনই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করা যায় না। বিধি মানে আমাকে কি কি করতে হবে আর নিষেধ মানে কোন্ কোন্ জিনিষ আমি করব না। যে কোন বিদ্যা যেটা বিধি আর নিষেধ শেখায় সেটা অপরা বিদ্যা। সেইজন্য জগতে যত রকমের বই আছে সবই অপরা বিদ্যা। কোনটা করণীয় আর কোনটা অকরণীয়, এই দুটোই কর্ম।

কর্মকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়, একটা হল নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম আমাদের প্রতিদিন করতে হয়, যেমন স্নান, মন্ত্রজপ, শাস্ত্র পাঠ, পূজা। সংস্কৃতে একটা কথা আছে *অকরণে প্রত্যবায়*, নিত্যকর্ম না করলে পাপ হবে আর করলে পূণ্য হবে না। যেমন আমি যদি খাওয়া-দাওয়া না করি আমার শরীর দুর্বল হয়ে রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করবে, খেলে কোন পূণ্য হবে না। ঠিক তেমনি পড়াশোনা করাটা খুব উচ্চ ব্যাপার নয় কিন্তু পড়াশোনা না করলে পরীক্ষায় ফেল করবে। সেই রকম নিত্যকর্ম না কর তাহলে জীবনে তুমি অকৃতকার্যই হবে, তাই নিত্যকর্ম তোমাকে করতেই হবে। দ্বিতীয় হল নৈমিত্তিক কর্ম, বিশেষ বিশেষ দিনে কিছু কিছু জিনিষ করা হয়, যেমন একাদশী, ব্রতোপবাস, চান্দ্রায়ণ, সন্তানের জন্ম হলে তার অন্নপ্রাশন করাতে হবে। এগুলো নৈমিত্তিক কর্ম। এগুলো নিত্য নিয়মিত ভাবে করতে হয় না, একটা কিছু নিমিত্ত করে পূজা, ব্রত ইত্যাদি করা হচ্ছে বলে একে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয়। তৃতীয় কাম্য কর্ম, তোমার মনে কোন একটা বাসনা বা ইচ্ছা জেগেছে সেটা পূরণের জন্য যখন কিছু করা হচ্ছে তখন সেই কর্মকে বলছেন কাম্য কর্ম। আমাদের বেশির ভাগ পূজাই কাম্য কর্মের মধ্যে পড়ে। ঠাকুরের কাছে পূজোর ডালি নিয়ে যাচ্ছি তার সঙ্গে বাসনার একটা বড় তালিকা জুড়ে দিচ্ছি, হে ঠাকুর আমার মেয়েটার যেন বিয়ে দিতে পারি, ছেলের যেন চাকরি হয়, আমার যেন প্রমোশন হয় ইত্যাদি হাজার রকমের বাসনা যুক্ত থাকে। এই পূজোগুলো যখন করা হয় তখন সেই পূজাকে বলা হচ্ছে কাম্য কর্ম। চতুর্থ একটা কর্ম আছে যাকে বলছেন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। আমরা সবাই অজান্তে বা জান্তে অনেক রকম পাপমকর্ম বা দোষ করি, এই ধরণের পাপযুক্ত বা দোষযুক্ত কর্মকে কাটাবার জন্য আমাদের আলাদা ধরণের কিছু কিছু কর্ম করতে হয়, এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। এই চার ধরণের কর্মকে বলা হয় বিধি।

পঞ্চম হল নিষিদ্ধ কর্ম। বেদ আমাদের এই চারটে কর্মই করতে বলছে। নিত্যকর্ম রোজ করবে, নৈমিত্তিক কর্ম বিশেষ দিনে করবে, কাম্য কর্ম তোমার ইচ্ছে হলে করবে তবে কাম্য কর্মে বেশি উৎসাহ দেওয়া হয় না। আর প্রায়শ্চিত্ত কর্ম অবশ্যই করবে। বিধি হয়ে গেল, এবার আসছে নিষেধ। যে কর্ম গুলো আমাদের করতে নিষেধ করছে সেই কর্মগুলোকে বলা হচ্ছে নিষিদ্ধ কর্ম। নদীতে থুতু ফেলবে না, থুতু ফেলাটা নিষিদ্ধ কর্ম। নদী বা জলাশয়ে থুতু ফেলার মধ্যে জলে জীবানু সংক্রামণের ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে কিন্তু এটাকে জুড়ে দেওয়া হল ধর্মের সাথে। ধর্মের সাথে সংযুক্ত করে না দিলে আমাদের দেশের লোকেরা মানবে না। এর সাথে বলছেন সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে কখন প্রস্বাবাদি করবে না। কারণ সূর্য আমাদের দেবতা, এটা নিষিদ্ধ কর্ম বা বলছেন বিষযুক্ত বাণ দিয়ে যে পাখিকে মারা হয়ে থাকে সেই পাখির মাংস খাবে না, এটাও নিষিদ্ধ কর্ম, এগুলো নিষেধ। সব বিধি নিষেধই বেদের মাধ্যমে এসে পরে স্মৃতিশাস্ত্রে আলাদা করে বিস্তারিত করা হয়েছে। কিন্তু যত রকমের বিদ্যা বিধি-নিষেধের কথা বলছে সবটাই অপরা বিদ্যা।

আচার্য বলছেন অপরা বিদ্যা দিয়ে কখনই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হবে না। কেন ভেদ হবে না? কারণ এই উপনিষদেই বলবে *অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ*, কর্ম হল অবিদ্যা। যেখানে অবিদ্যা সেখানেই বাসনা, যেখানেই বাসনা সেখানেই কর্ম। বেদাদি এই পাঁচ রকম কর্মের কথাই বলছে। তুমি তো তাহলে কর্মের মধ্যেই ঘুরছ তাই হৃদয়ের গ্রন্থি কাটবে কি করে! আমাকে একটা ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি যদি ঐ ঘরের মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকি তাহলে ঘর থেকে বেরোব কি করে! বিজ্ঞান বা যে কোন শাস্ত্র সবাই এই কাম কর্মের মধ্যেই ঘোরাচ্ছে। তাহলে এখান থেকে আমি বেরোব কি করে! হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করা মানেই হচ্ছে কর্মের এই ঘুরপাক থেকে বেরিয়ে আসা। তাই অপরা বিদ্যা আর হৃদয়গ্রন্থি ভেদ দুটো পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরা বিদ্যা অপরা বিদ্যার বিধি নিষেধের পারে নিয়ে চলে যায়। প্রথম হল যে বিদ্যা বিধি নিষেধ বলে দিচ্ছে সেটা অপরা বিদ্যা, আর যে বিদ্যা এই বিধি নিষেধের পারে নিয়ে যায় সেই বিদ্যাকেই বলে পরা বিদ্যা। বিধি নিষেধের আরকটা নাম ধর্ম ও অধর্ম। যখন বিধি পালন করা হচ্ছে তখন বলা হয় ধর্ম পালন করছে। যখন নিষেধ পালন করছে তখন বলা হয় অধর্ম করছে। ঠাকুর বলছেন ধর্ম-অধর্মের পারে, পাপ-পূণ্যের পারে যেতে। ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্যের পারে যাওয়া মানে পরা বিদ্যাকে আশ্রয় করা। পাপ-পূণ্য মানেই ধর্ম-অধর্ম, ধর্ম-অধর্ম মানেই বিধি-নিষেধ, বিধি-নিষেধ মানেই ভেদ, ভেদ মানেই অপরা বিদ্যা। এই অপরা বিদ্যাকে পার করতে হবে। পরা বিদ্যাই বিদ্যা, সেটাই বিদ্যা যে বিদ্যা মুক্তি প্রদান করে। কিসের থেকে মুক্তি প্রদান করে? এই হৃদয়গ্রন্থি থেকে মুক্তি প্রদান করে। হৃদয়গ্রন্থি থেকে মুক্তি পাওয়া মানেই হল বিধি-নিষেধের যে সীমা সেটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া। তাহলে মুণ্ডকোপনিষদের বিষয়টা কি? অপরা ও পরা বিদ্যার তফাৎটা বুঝে নিয়ে পরা বিদ্যাকে জানা। সেইজন্য প্রথমে অপরা বিদ্যাটা কি বলা হবে, তারপর পরা বিদ্যার ব্যাখ্যা করা হবে।

প্রথমে দুটো বিদ্যার তফাৎটা দেখিয়ে '*পরীক্ষ্য লোকান্*' এই বাক্যাদির দ্বারা সাধ্য সাধন রূপ সব বিষয় কর্মে বৈরাগ্যপূর্বক ব্রহ্মানুভূতির সাধনের কথা বলে দেবেন। বৈরাগ্য মানে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু যতক্ষণ কোন জিনিষকে আমার হেয় মনে না হবে ততক্ষণ সেই জিনিষে আমার কি করে বৈরাগ্য হবে, কি করে আমি ছেড়ে দেব! আমার শরীরকে কখনই হেয় মনে হয় না, তাই আমি কখনই দেহের নাশ হোক চাই না। মানুষের সব থেকে বেশি আসক্তি তার শরীরের প্রতি। তারপর তার বেশি আসক্তি হয় মনের প্রতি। মনের প্রতি আসক্তি আছে বলেই সূক্ষ্ম শরীর আবার তাকে শরীর গ্রহণ করিয়ে দেয়। এই আসক্তিটা তো শুধু গেল সূক্ষ্ম শরীর আর স্থূল শরীরের ব্যাপারে। কিন্তু এর বাইরে আরও কত হাজার হাজার রকমের জিনিষের প্রতি আমাদের আসক্তি – গাড়ি, বাড়ী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, গয়না, টাকা-পয়সা, শাড়ি তালিকা শেষ করা যাবে না। শাড়ি জামা-কাপড় পুরনো হয়ে গেলে গরীব কাঙালীদের দিয়ে দিই, নতুন কখনই দিতে যাই না। কারণ হেয় জ্ঞান না হলে আমরা কখনই কোন জিনিষকে ফেলে দিতে চাই না। শাস্ত্র কি করছে? এখানে মুণ্ডকোপনিষদ বলবে জগতের যা কিছু আছে সব হেয় আর তার সাথে এই জগতটাও হেয়। জগৎ আর জগতের সব জিনিষকে হেয় বোধ হলে আমার মধ্যে বৈরাগ্য আসবে। প্রথমে আসে বৈরাগ্য। উপনিষদও এই ধারাবাহিকতায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। এখানে প্রথমে অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যার তফাৎ বোঝান হচ্ছে। দ্বিতীয় বৈরাগ্য। যখন আমি বুঝে গেলাম এগুলো সব

অপরা, সব হেয় পদার্থ তখন আর এসবের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ থাকবে না। অপরা বিদ্যাতে বৈরাগ্য মানে প্রথমেই বিজ্ঞান, টেকনোলজি, ইতিহাস সব কিছু উড়ে যাবে তারপর বেদ উপনিষদও উড়ে যাবে। কিন্তু আমরা তো কত শাস্ত্র কথা শুনছি, উপনিষদের ক্লাশ করছি তাতেও জগতের প্রতি আমাদের আকর্ষণ চলে যাচ্ছে না, তার কারণ আমরা এগুলোকে সাধনা রূপে নিচ্ছি না। যতক্ষণ সাধনা রূপে না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এটাও অপরা বিদ্যাই হয়ে থাকবে। এটাই আমাদের বেদের বিশেষ বিশেষত্ব। একমাত্র হিন্দুধর্মই বলে *তত্রবেদা অবেদাঃ ভবতি*। এই কথা কোথায় বলছে? উপনিষদেই বলছে, অথর্ববেদেরই অঙ্গ এই উপনিষদ। উপনিষদ নিজেই বলছে আমরা ছোট আমাকে ধরে থাকলে হবে না, তুমি বড় হও, আমাকে ছাড়িয়ে যাও। গীতাতে ভগবানও বলছেন *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, হে অর্জুন! তোমাকে এই বেদকে অতিক্রম করে যেতে হবে, বেদও এই তিনটে গুণের মধ্যে বাঁধা, কারণ বেদ হল অপরা বিদ্যা। বাইবেল কখনই এই ধরণের কথা বলবে না, ইসলাম ধর্মে কেউ যদি বলে আমি কোরানকে ছাড়িয়ে গেছি তাহলে তো তার জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু হিন্দুধর্মে কেউ যদি বলে আমি বেদকে অতিক্রম করে গেছি, তখন তাঁকে প্রণাম করার জন্য ভক্তের বিশাল লাইন পড়ে যাবে।

সব বিদ্যাই অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যাকে তুমি পার করে চলে যাও। অপরা বিদ্যাকে পার করা মানে পুরো জগৎকে অতিক্রম করে যাওয়া। অপরা বিদ্যাতে যে আশ্রিত হয়ে আছে তার জন্য এই উপনিষদ নয়। কোন্ উপনিষদ? শুধু মুণ্ডকোপনিষদই নয়, কোন উপনিষদই এখন তার জন্য নয়, এর সঙ্গে গীতাও। গীতাতে বলছেন *জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্*, এই শ্লোকে ভগবান নিজের ও অপরের শরীরের প্রতি আসক্তিটা ছাড়তে বলছেন, কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদ বলছে অপরা বিদ্যাকে বৈরাগ্য দিয়ে দিতে, অপরা বিদ্যা মানে পুরো জগৎকে ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। *জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্* একজন বিজ্ঞানীও করতে পারেন, কিংবা একজন সৈনিকও করতে পারে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে একজন উচ্চতম ঋষি যদি এখনও বেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন তাহলে তাঁকেও এই জগতের মধ্যে ঘুরতে হবে।

তৃতীয় আসছে গুরুকৃপা। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হবে গুরু কে, গুরুর কি কি গুণ ও লক্ষণ। গুরুই ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য শিষ্যকে বলে দেবেন। ঐ বিদ্যাটা বলে দিলে কি হবে? পরমব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। জীবনের উদ্দেশ্য তাহলে কি হয়ে গেল? পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি। পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি আর হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ দুটো একই। তাহলে এই উপনিষদের প্রয়োজন বা সিদ্ধিটা কি হল? '*ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি*', যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন।

বাস্তবিক সত্তা হল নির্গুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। কিন্তু এই নির্গুণ ব্রহ্মই কার্য ব্রহ্ম রূপে প্রতীতি হয়, যেটাকে সংসার বলা হচ্ছে। এই দৃশ্যমান সংসারও কখনই ব্রহ্মের বাইরে নয়, এটাও ঈশ্বর কিন্তু কার্য ব্রহ্ম। নরক সেটাও ঈশ্বরেরই একটা রূপ। অন্য ধর্ম বিশেষ করে মুসলমানরা মানবে না। কিন্তু কোন কিছুই ঈশ্বরের বাইরে নয়। সুখটাও ঈশ্বরের রূপ আবার দুঃখটাও ঈশ্বরেরই আরেকটা রূপ। তবে হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরের ঐ রূপটা চাই না। এই সংসারটা নির্গুণ ব্রহ্মেরই প্রতীতি, একেই কার্য ব্রহ্ম বলা হচ্ছে। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন কার্য ব্রহ্ম হয়ে গিয়ে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে সংসার রূপে প্রতীতি হন তখন সেই নির্গুণ ব্রহ্মকেই আবার সংসারের জীব রূপে দেখায়। একটা জিনিষকে আমি দু টুকরো করে দিলাম, এখন দুটো জিনিষ হয়ে গেল। এবার একটা জিনিষ আরেকটা জিনিষের উপরে কার্য শুরু করে দিল।

এই রকম একটা কাহিনী আছে। এক রাজকুমার বড় হয়েছে, কিন্তু সে কোন মেয়েকেই বিশ্বাস করে না বলে বিয়ে হচ্ছে না। তাই রাজকুমারের ইচ্ছে হল তাকেই দুটো টুকরো করা হোক। যোগ বলে তাকে দুটো টুকরো করে দেওয়ার পর একটা টুকরোকে নারী আরেকটি টুকরোকে পুরুষ করে দেওয়া হল। তারই অংশের টুকরো থেকে যে নারী হল তাকেই সে বিয়ে করল। কাহিনীর অন্তিমে অবশ্য দেখান হয়েছে ঐ মেয়েটাও শেষে তাকে ধোকা দিয়েছে। বক্তব্যটা এটাই যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তিনিই কার্য ব্রহ্ম রূপে প্রকট হন। তখন এই কার্য ব্রহ্মই সংসার রূপে আমাদের সামনে প্রতীতি হন। আর যিনি পূর্ণব্রহ্ম তিনি সংসারী জীব হয়ে যান। আসলে সব

সময় পূর্ণব্রহ্মাই হয়ে আছেন, নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই, পূর্ণব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু মায়ার এমনই খেলা যে আমরা বোতল আলাদা দেখছি, এই গ্লাশ, টেবিল, মাইক্রোফোন, চেয়ার এত লোক জন সবাই আলাদা আলাদা দেখছি। এক কথায় দুটো জিনিষ দেখাচ্ছে – আমি আর এই জগৎ। আমি আর জগৎ রূপে যখন আলাদা দেখা শুরু হয় তখনই বুঝতে হবে অবিদ্যা এসে গেছে। অবিদ্যার জন্যই কাম। আমার এখন জলতেষ্টা পেয়েছে জল খেতে হবে। জল খেতে হলে আমাকে কলের কাছে যেতে হবে। কলের কাছে যেতে হলে আমাকে বাড়িতে জলের কানেকশান নিতে হবে। জলের কানেকশান মানেই আমাকে টাকা-পয়সা জোগাড় করতে হবে। টাকা জোগাড় করার জন্য কাজ করতে হবে। কিন্তু এই প্রত্যেকটা ধাপে আবার নানান রকম কাম জড়িয়ে যাচ্ছে, সেই কামের সাথে আবার নানান রকমের কর্ম জড়িয়ে যাচ্ছে। বেদ বলে দিচ্ছে সেই কর্মগুলো কিভাবে সম্পাদন করতে হবে। বেদ সমূহ যা বলছে সেটাই বিধি-নিষেধ রূপে আসে। অপরা বিদ্যার বিপরীত হল পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা এত কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবে না, সরাসরি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে দেবে। পূর্ণ জ্ঞান হয়ে গেলে এই সারা সংসার আর তার যত কামনা-বাসনা সব একসাথে খসে যায়।

এরপর আচার্য বলছেন অধিকারী কে হবে। অধিকারী সম্বন্ধে খুব সুন্দর কথা বলছেন *জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্বাশ্রমিণাম্ অধিকারঃ*, এই পূর্ণ জ্ঞানে সবারই অধিকার, সব আশ্রমের, সে সন্ন্যাসী হোক, গৃহস্থ হোক কিংবা ব্রহ্মচর্য্য বা বাণপ্রস্থী হোক সবারই অধিকার আছে। এখানে বর্ণ শব্দটা বলছেন না, আশ্রমের কথাই বলছেন। সবারই অধিকার যখন বলা হচ্ছে তখন বর্ণাশ্রম শব্দটাই হওয়া উচিৎ ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের এদেরও অধিকার থাকতে হবে। কিন্তু আশ্রমের দিক থেকে সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা জানিনা শুধু আশ্রম কথাটাই কেন বলা হল। সেইজন্য মেয়েদের অধিকার আছে কিনা, শূদ্রের অধিকার আছে কিনা এইসব ব্যাপারে কোন আলোচনাই করা হয়নি। সবারই অধিকার আছে, আলাদা করে আর কারুর নাম বলার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু এটা হয় না। কেন হয় না? এই বিদ্যা একমাত্র সন্ন্যাসীদের পক্ষেই পালন করার মত।

হিন্দু চিন্তাধারার যে গতিপ্রকৃতি তাতে এটা খুব পরিষ্কার, যেখানে এনারা বলছেন সমাজে দুই ধরণের লোক আছে। এক ধরণের লোক আছে যারা কামিনী-কাঞ্চন ছাড়াও নিজের জীবনের ভালো কিছু চায়। আর দ্বিতীয় ধরণের হল যারা শুধু কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশের পেছনেই ছুটে চলেছে। কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশের পেছনে যার ছুটছে তাদের জন্য এনারা কোন কথাই বলছেন না। যারা বলছে আমি ভালো কিছু চাইছি, তখন তাদের বলবেন তুমি যদি ভালো কিছু চাও তাহলে তোমার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি ঠিক করা আছে। তুমি যেখানেই জন্ম গ্রহণ করে থাকো না কেন, সেখান থেকেই তোমাকে আমরা তুলে নেব। কিভাবে তুলে নেওয়া হবে? কর্মের দ্বারা, তোমাকে কর্ম করে যেতে হবে। কি কাজ করত হবে? প্রথমে তোমার যা বংশগত কর্ম জন্মসূত্রে পেয়েছ সেই কর্মই করতে থাক। তুমি যদি শূদ্র বংশে জন্ম নিয়ে থাক সেখানে শূদ্রেরই কাজ করে যাও, তোমাকে ক্ষত্রিয় হতে হবে না। যে বৈশ্য বংশে জন্মেছে তাকে বৈশ্যের কাজই করবে, সেই রকম ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কাজই করবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মনের নির্দিষ্ট কর্মই করতে থাকবে। এখন কেউ যদি বলে আমি বংশগত বা জাতিগত পেশা পরিবর্তন করতে চাই। পরিবর্তন যে কেউ করতেই পারে, আর পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও অনেক পাওয়া যাবে। যেমন বিশ্বামিত্র, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। দ্রোণাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কাজই করতে থাকলেন। এই ধরণের পরিবর্তন হতেই পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এই ধরণের পরিবর্তনের অনুমোদন দেওয়া যায় না। কাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া যায় না? যাঁরা জীবনের পরমশ্রেয়সের দিকে এগোতে চাইছে। সাধারণের জন্য এগুলো বলা হচ্ছে না। প্রথমেই এদের এই সব কিছুর বাইরে রেখে দিয়েছে। কিন্তু ভারত ধর্ম দিয়ে সবাইকে বেঁধে দিয়েছে বলে অনেকের উপর গিয়ে এই চাপটা পড়েছে। মূল কথা হল যারা ধর্মের দিকে এগোতে চায় বর্ণাশ্রম ধর্ম তাদের জন্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হলে তোমাকে প্রাণপন দিয়ে কাজ করতে হবে। ভোগী ভোগ করার জন্য যে উদ্যম নিয়ে কাজ করে তুমিও ঠিক সেইভাবে কাজ কর। কাজ করতে করতে বুঝে নাও কোনটা তোমার কর্তব্য কর্ম আর কোনটা অকর্তব্য কর্ম। বুঝে নেওয়ার পর এইবার তুমি শুধু তোমার কর্তব্য কর্মের দিকে মনযোগ দাও। কর্তব্য কর্ম করতে করতে মন যখন শুদ্ধি হবে তখন বলবে এইবার তুমি এই কর্তব্য কর্মটাই নিষ্কাম ভাবে কর। ফলের আশা

করবে না। ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কর্ম করতে করতে মনটা যার একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে এবার সে কি করবে? তখন তাকে বলবে এইবার তুমি সন্ন্যাস নিয়ে নাও। সন্ন্যাস ধর্মে যখন এসে গেল তখন সে সব কিছুর বাইরে চলে এল। কামিনী-কাঞ্চন, মান-যশ তার আগেই চলে গেছে, সাথে সাথে কর্তব্য বোধটাও চলে গেছে। পরিবারের প্রতি তার কোন কর্ত্যব্য থাকবে না, সমাজের প্রতি কোন কর্তব্য থাকবে না। এখন সে কি করবে? সব সময় পরমার্থ চিন্তনে মনকে নিমগ্ন রাখবে। ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া সে আর কোন কাজ করবে না। যে কাজগুলো করবে সেটাও পরমার্থ চিন্তনের ভাব নিয়েই করবে। সব কাজই ঈশ্বরের সেবা করার ভাব নিয়েই করবে। পরমার্থন চিন্তন করাকে বলা হয় জ্ঞান বা জ্ঞানযোগ আর কাজ করাকে বলা হয় কর্মযোগ। ঈশ্বর চিন্তনই জ্ঞানযোগ আর বাকি সব কর্মযোগ। ভক্তিযোগও কর্মযোগ, রাজযোগও কর্মযোগ, জপ করাটাও কর্মযোগ আর ধ্যান করাটাও কর্মযোগ। দেহ, মন ও বাক্য দ্বারা যেটাই করা হবে সেটাই কর্মযোগ, সেদিক দিয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করাটাও কর্মযোগ।

সেটাই জ্ঞানের অবস্থা যেখানে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম থেমে যায়। আচার্য শঙ্কর বারবার বলছেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জ্ঞানপ্রাপ্তি, মানে পরমার্থ প্রাপ্তি, ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর দর্শন যেখানে সেখানে সমস্ত রকমের কর্ম থেমে যায়। যে কোন কাজ করতে গেলে কাজের আনুষাঙ্গিক উপকরণ অনেক কিছু লাগবে। বেদের সময় কাজ বলতে প্রধানতঃ যজ্ঞাদি কর্মকেই বোঝাত। যজ্ঞ করতে গেলে আবার অনেক কিছু লাগবে। যদিও যে কোন কাজ করতে গেলে একজন কর্তা থাকবে, তারপর দ্বিতীয়া, যেটাকে বলা হয় কর্ম, তৃতীয়া করণ, চতুর্থী সম্বন্ধ, কারকের যে বিভক্তিগুলো আছে তার সবটাই দরকার হয়। এই বিরাট আয়োজনের পর তার আবার কর্মফল আছে। এই যে বিরাট আয়োজন, কারকের সাতটা বিভক্তি, ক্রিয়া আর কর্মফল, যে কোন কাজ করার জন্য এই নয়টি আলাদা আলাদা উপকরণ দরকার হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর কোনটাই থাকে না, যেটাই ক্রিয়া সেটাই কর্তা সেটাই ফল। জ্ঞান হল কর্তা, জ্ঞানই ক্রিয়া আর জ্ঞানই হল ফল। এখানে কোন তত্ত্বের ব্যাপার নেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যিকারের এই রকমই হয়। একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যই শুদ্ধ চৈতন্যকে জানতে পারে। এটাই বোধে বোধ হওয়া। আমি যখন বই পড়ছি তখন আমি আছি বই আছে, বইয়ের শব্দগুলো আছে, পড়ার ক্রিয়া আছে, আর পড়ার ফলটা আছে। ফলটা কি? বইয়ের জ্ঞান হল। শুদ্ধ চৈতন্যের জ্ঞান এই জ্ঞান নয়, সেটা আলাদা জিনিষ। যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ তিনিই সচ্চিদানন্দকে বুঝছেন, বুঝছেন এর বাইরে আর কিছু বলা যাবে না। ঐ বোঝাটা কর্তা আর কর্ম এই দুটোতে যে তফাৎ হচ্ছে তা নয়। সাধারণতঃ একটা হল কর্তা আরেকটা হল যার উপর কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে দুটো একই, সেইজন্য এই অবস্থাকে বলা হয় নিজের স্বরূপে অবস্থান করা। আচার্য শঙ্কর তাই জোর দিয়ে বলছেন জ্ঞান আর কর্ম এই দুটো কখন মিল হতে পারে না। সেইজন্য গৃহস্থধর্ম আর সন্ন্যাসধর্ম কোন জায়গাতে গিয়েই মিলবে না, সম্ভবই নয়। গৃহস্থ ধর্ম মানেই বর্ণাশ্রম ধর্ম। আর বর্ণাশ্রম ধর্ম মানেই ক্রিয়া, ক্রিয়া মানেই কর্মের নটি পৃথক পৃথক অঙ্গ। অথচ জ্ঞানীর ক্ষেত্রে কোনটাই প্রযোজ্য নয়। জ্ঞান কে অনুশীলন করতে পারে? যে কেউই করতে পারেন। আচার্য এখানে এটাই বলছেন অধিকারি কে? যে কেউই হতে পারে কিন্তু সন্ন্যাসী ঠিক ঠিক উপযুক্ত।

দ্বিতীয় হল বিষয়। এই উপনিষদ দুটো বিদ্যার কথা বলবে, প্রথমে অপরা বিদ্যা পরে পরা বিদ্যার কথা বলবে। জগতে যত রকমের বিদ্যা আছে সব বিদ্যাকে বলা হয় অপরা। পরা বিদ্যা হল ঈশ্বর জ্ঞান। অপরা বিদ্যার কথা বলার পর বলবেন, জগতে যত রকমের বিদ্যা আছে সবটাই অপরা বিদ্যা, এই অপরা বিদ্যাকে জেনে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, অপরা বিদ্যাকে ছেড়ে দিয়ে পরা বিদ্যাতে জোর দিতে হবে। এটাই এই উপনিষদের বিষয়।

আচার্য শঙ্করই পরে বলছেন *সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং*, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন আর সর্বকর্ম ত্যাগ করেছেন তিনিই একমাত্র এই বিদ্যার সাধন করতে পারেন। সবারই অধিকার আছে কিন্তু সবাই এই বিদ্যা সাধন করতে পারবে না। ঠাকুরকে অনেকে প্রশ্ন করছেন গৃহস্থাশ্রমে থেকে কি হবে না? ঠাকুর বলে দিচ্ছেন কেন হবে না! কিন্তু তারপরই যা যা শর্ত আরোপ করে দিচ্ছেন তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা পারবে

না। আচার্যও বলে দিলেন এই বিদ্যাতে সবারই অধিকার কিন্তু যেসব শর্তাবলী বলে দিচ্ছেন সন্ন্যাসী ছাড়া এই শর্ত পালন করতে কেউ পারবে না। এই উপনিষদের প্রথমেই অপরা বিদ্যার নিন্দা করবে, কর্মের নিন্দা করবে। কর্মের নিন্দা করা মানেই বেদকে নিন্দা করা। গৃহস্থ আবার কর্ম ছাড়া থাকতে পারবে না। সেইজন্য ঠাকুর স্বামীজী যে বেদান্ত ধর্ম দিয়ে গেছেন এটা একেবারে আলাদা ধরণের। শুদ্ধ বেদান্ত অনুশীলন করা অত্যন্ত কঠিন, একমাত্র সন্ন্যাসীই এর সাধন করতে পারেন। এই শুদ্ধ বেদান্তকেই ঠাকুর স্বামীজী অন্য ভাবে উপস্থাপনা করে গেছেন। অন্য ভাবে দিলেও গৃহস্থরা তাও সাধন করতে পারবে না, কারণ একটা স্তরে গিয়ে সর্বস্য ত্যাগ করতেই হবে। আমার সন্তানাদি আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, গাড়ি-বাড়ি রেখেছি আর তার সঙ্গে আত্মজ্ঞানও লাভ করব, ঈশ্বর দর্শন করব, সম্ভব নয়। মুখে আমরা বেদান্তের কথা বলে দিতে পারব, কিন্তু হাতে কলমে অনুশীলন করা কখনই সম্ভব নয়। সন্ন্যাসী ছাড়া সম্ভবই নয়। সন্ন্যাসীকেও সেই রকম সন্ন্যাসী হতে হবে। মঠ বানিয়ে, সেবার নামে করে কোটি কোটি টাকার জড়িবুটির ব্যবসা হাঁকিয়ে ফলাও করে প্রচার করে যাচ্ছে, এই ধরণের সন্ন্যাসী হলে কোন ভাবেই সম্ভব হবে না। ব্রহ্মবিদ্যা আর কর্মের যে বিরোধ এটা স্বাভাবিক। যে কোন কর্ম করার জন্য অনেক কিছুর দরকার হয়। আগেই বলা হয়েছে কর্তা, কর্ম, দ্বিতীয়া, মানে যেটার উপর কর্ম করা হবে, তৃতীয়া, মানে যেটা দ্বারা করা হবে, চতুর্থী, পঞ্চমী আর তার সঙ্গে ক্রিয়ার দরকার। এরপর তার ফল আছে। কিন্তু ব্রহ্ম বিদ্যায় এর সব কিছুকে উড়িয়ে দেওয়া হয় – ব্রহ্ম বিদ্যায় যিনি কর্তা, তিনিই দ্বিতীয়, তিনিই তৃতীয়া। যিনি কর্তা তিনিই ক্রিয়া, যিনি ক্রিয়া তিনিই ফল। ব্রহ্ম বিদ্যায় সব কিছু মিলে এক হয়ে যায়। এই ভাবটাই আমরা গীতাতে পাই *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধনা।।*৪/২৪।। কর্মের ক্ষেত্রে এত কিছুর দরকার কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে সব কিছুকে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই কর্মের সাথে এই বিদ্যার বিরোধ স্বাভাবিক, খুব সাধারণ ব্যাপার। কর্ম আর জ্ঞান কখনই একসাথে চলতে পারেনা। গৃহস্থ ধর্ম মানে কর্মও করব অন্য দিকে পরা বিদ্যার সাধনা করব, এইভাবে হয় না, এটাই আচার্যের মত। ঠাকুর বলছেন তুমি পূজোর মনোভাব নিয়ে, এটা ঈশ্বরের সংসার এই ভেবে কর্ম করবে। তখন করা যায়। কিন্তু তখন আবার গৃহস্থ ধর্ম থাকবে না। কিন্তু তাই বলে বলছেন না যে এটা কখনই হবে না। হবে, কিন্তু কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ বেদে যেসব কর্মের কথা বলা হয়েছে সেই সব কর্ম কাল বিশেষে করতে হয় আর সেই কর্মের ফলের জন্য বিশেষ কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। যেমন ধান চাষ, গম চাষ একটা বিশেষে ঋতুতে করতে হয়, তার ফসলও একটা বিশেষ ঋতুতে দেবে। ঠিক তেমনি আমি যে কর্ম শুরু করব তার একটা নির্দিষ্ট ক্ষণ আছে, কর্মের ফলটাও একটা সময়ে আসবে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা শুরু করার কোন কাল নেই, তার ফলেরও কোন কাল নেই। যখন খুশি এই বিদ্যা শুরু করা যায়। যখনই মনে বৈরাগ্যের উদয় হবে তখনই তুমি সব কিছু ত্যাগ করে বেদান্ত সাধনে বেরিয়ে পড়বে। আর এরও কোন নিয়ম নেই যে এত দিন পরে ফল হবে। ধান চাষ করলে তিন মাস পরে ফল হবে, আম গাছ লাগালে ছ-বছর পর ফল দেবে। ব্রহ্মবিদ্যাতে আজকে যদি কেউ সাধনা করতে শুরু করে তার কালকেই ফল দিয়ে দিতে পারে, আবার অনেক দিন পরেও ফল দিতে পারে। যেমন যেমন সাধনা করবে তার ফলও সেই রকম হবে। সেইজন্য অপরা বিদ্যার ফল আর পরা বিদ্যার ফল দুটোই আলাদা ধরণের। তাদের কর্ম পদ্ধতিও পুরো আলাদা। পরা বিদ্যাতে সবটাই ত্যাগ আর অপরা বিদ্যাতে সবটাই গ্রহণ। সেইজন্য আচার্য বলছেন এই দুটো স্বাভাবিক ভাবেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতার দিক থেকেও পরস্পর বিরোধী।

অনেক সময় বলা হয় গৃহস্থদের মধ্যেও এই ব্রহ্মবিদ্যা দেখা যায় আর তাদেরও সম্প্রদায় আছে। আচার্য শঙ্কর এই ধারণাকে খুব কড়া ভাবে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পাই যেখানে কখন কখন রাজা বলছেন এই বিদ্যা আমাদের ক্ষত্রিয়দের কাছেই ছিল। আচার্য বলছেন কেউ কেউ এই রকম একটা দুটো দৃষ্টান্ত নিয়ে আসছেন কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দিয়ে এই ধারণা একেবারেই দাঁড়ায় না। এই বিদ্যা একমাত্র সন্ন্যাসীদেরই। সন্ন্যাসীরাই এই বিদ্যার অনুশীলন করতে পারেন, কারণ পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যার মধ্যে স্বভাবগত তফাৎ - কর্ম আর জ্ঞান এক সঙ্গে কখনই চলতে পারেনা। আচার্য বলছেন

কর্ম আর জ্ঞানের পাশাপাশি চলার যদি কোন লিঙ্গও পাওয়া যায়, অর্থাৎ অমুক লোক একজন ছিলেন শুনেছি, তবুও এটা কখন প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে না। বিধি বাক্য অর্থাৎ বেদের বাক্যেও যদি কোথাও থাকে তাও এটা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ, পরস্পর বিরোধীতার কারণে যেমন অগ্নি আর জল কখন এক সঙ্গে থাকতে পারেনা, ঠিক তেমন অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা, কর্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরোধী। যে সন্ন্যাসী নয় তাকে তো কর্ম করতেই হবে। সেইজন্য সন্ন্যাসী ছাড়া পরা বিদ্যা সাধনা করা সম্ভব নয়। এখন যদি কোন গৃহস্থ বলে আমি গৃহস্থ ধর্মে আছি কিন্তু আমি সব কিছুতে অনাসক্ত, এই ধরণের কিছু মানুষ থাকতে পারেন কিন্তু তাত্ত্বিক ভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে না। লিঙ্গকে দিয়ে একটা নিয়মকে কখনই বিচার করা যায় না। অনেকে রাজা জনকের দৃষ্টান্ত দিলেও কিন্তু কাহিনী দিয়ে আমরা বিচার করতে পারিনা। ঠাকুরও তাই একটা মীমাংসা করার জন্য বলে দিলেন সবাই রাজা জনক হতে চাইলেই পারবে না, রাজা জনক হেঁটমুণ্ড হয়ে কত মুণ্ডুকাটা তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করার পরে কর্মের প্রতি তার আসক্তিটা ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর যে কর্মটা করছেন সেটা শ্রীকৃষ্ণের মত। সেই দিক থেকে রাজা জনক গৃহস্থ নন। এখানেই তো মীমাংসা হয়ে গেল। তপস্যা কর, তারপর এসো। তপস্যা না করেই কি করে হবে!

মুণ্ডকোপনিষদেই যখন সম্প্রদায় বিদ্যার কথা বলা হবে তখন পর পর অনেক ঋষির নাম আসবে, এঁদের মধ্যে সবাই কিন্তু সন্ন্যাসী ছিলেন না, গৃহস্থও ছিলেন। সেটা নিয়েও শঙ্করাচার্য বলছেন, সম্প্রদায় বিদ্যাতে এনাদের নাম আছে বলে এই নয় যে গৃহস্থ হলেও এই বিদ্যা পাওয়া যায় না। মুণ্ডক উপনিষদে একটা পরম্পরা আছে, উনি একজনকে বলেছেন, তিনি আরেকজনকে বলেছেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিদ্যা ঠিক ঠিক পেয়েছিলেন, আবার অনেকে ছিলেন যাঁরা বিদ্যাটুকু মুখস্ত করে আরেকজনকে শিখিয়েছেন। মুণ্ডকোপনিষদে দুটো জিনিষ হয়েছে, এখানে একজন যিনি বিদ্যাটাকে ঠিক ঠিক লাভ করেছেন, আরেকজন হলেন যিনি বিদ্যাটাকে শুধু শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। সেটাই বলছেন এর মধ্যে অনেকে গৃহস্থ আছেন যাঁরা বংশপরম্পরাতে বিদ্যাটাকে ধরে রেখে যাচ্ছেন। এই দেখে কেউ যাতে ভুল না বোঝে যে, গৃহস্থরাও এই বিদ্যা লাভ করতে পারবে। এটাই আচার্যে মত।

এইসব কথা বলে আচার্য বলছেন এই হল মুণ্ডকোপনিষদের মোটামুটি ব্যাখ্যা। অধিকারী কে? যে কেউ হতে পারে। তবে সন্ন্যাসীরই ঠিক ঠিক অধিকার। এই জন্য এই উপনিষদের নাম মুণ্ডক। আসলে উপনিষদের নাম মুণ্ডক বলেই আচার্য ভূমিকার ভাষ্যটা এইভাবে দিয়েছেন। মুণ্ডক শব্দের দুটো অর্থ হয়, একটা অর্থ হল যাঁরা মুণ্ডন করে আছেন, তাদের জন্য এই উপনিষদ। তাই এর নাম মুণ্ডকোপনিষদ। মুণ্ডক শব্দের দ্বিতীয় অর্থ যে মুণ্ডন করে। মুণ্ডন কি দিয়ে হয়? খুড় দিয়ে। খুড় যেমন মাথার কেশরাশিকে কেটে উড়িয়ে সাফ্ করে দেয় ঠিক তেমনি এই উপনিষদ জগতের প্রতি যে আসক্তি সেটাকে কেটে উড়িয়ে দেয়। খুড়ের মত কেটে উড়িয়ে দেয় বলে এর নাম মুণ্ডক উপনিষদ।

উপনিষদ শব্দের অর্থ

বলা হয় সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিতদের ভাষা। সংস্কৃতের বাইরে পৃথিবীর অন্য যত ভাষা আছে সব ভাষাই তৈরী করেছে মুর্খরা। খুব সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে কম্প্যুটারের হিন্দী শব্দ করা হয়েছে সংগণক। সরকারি ভাষাতেও কম্প্যুটারের হিন্দী করা হয়েছে সংগণক। কিন্তু সম্প্রতি সরকার থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়েছে যেগুলো খুব প্রচলিত শব্দ সেই শব্দই ব্যবহার করতে হবে। তাহলে সংগণকের হিন্দী শব্দ হয়ে যাবে কম্প্যুটার। এই ভাবে কম্প্যুটার হিন্দী শব্দে ঢুকে গেল। অথচ সরকারি ভাষায় কম্প্যুটারের হিন্দী করা হয়েছিল সংগণক আগে যেখানে বলতো সংগণকোঁ সংখ্যা কিতনী হ্যায়, এখন এই বাক্যটাকে পাল্টে বলছে কম্প্যুটারকোঁ সংখ্যা কিতনী হ্যায়। সংস্কৃতে কম্প্যুটারকে বলা হচ্ছে সংগণক। সংস্কৃতে কম্প্যুটার শব্দকে ব্যবহার করার প্রশ্নই উঠবে না। সংস্কৃতে কোন শব্দকে ব্যবহার করার আগে বলবে এই শব্দ কোন ধাতু থেকে আসছে। সংগণক শব্দ কিভাবে আসছে? গণনা থেকে। গণনা থেকে গণক, গণক থেকে সংগণক। সংস্কৃতে কম্প্যুটার শব্দকে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। বাংলা, হিন্দীতে ঢুকবে। সারা দেশে ভাষার যতই বৈচিত্র্য থাকুক

কিন্তু বিড়ি সিগারেট শব্দের ব্যবহারে সবাই সমান। কিন্তু সংস্কৃতে কেউ বিড়ি সিগারেট বলতেই পারবে না। প্রথমেই বলবে তোমার এই শব্দের ধাতুটা কি বল। কেন ধাতুর কথা বলা হচ্ছে? ধাতু থেকে শব্দের অর্থটা বেরিয়ে আসে, তারপর উপসর্গ আর প্রত্যয় লাগাবে। ধাতু, উপসর্গ আর প্রত্যয়ের বাইরে সংস্কৃত ভাষাকে এক পাও এগোতে দেবে না, ঢোকা তো দূরের কথা। এই কারণে সংস্কৃতকে পণ্ডিতদের ভাষা বলা হয়। যার জন্য সংস্কৃত ভাষা একদিকে যেমন তার মৌলিকত্বকে ধরে রেখেছে কিন্তু অন্য দিকে সাধারণ মানুষ সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করতে পারল না। সংস্কৃত আর সংস্কৃতি এই দুটো শব্দ একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। সংস্কৃত মানে বিশেষ ভাবে যাকে সংস্কার করা হয়েছে। সাধারণ লোকের জন্য সংস্কৃত ভাষা নয়।

পাণিনি সংস্কৃতের সমগ্র ব্যাকরণকে কতকগুলি সূত্র দিয়ে বেঁধে দিলেন। উপনিষদ শব্দের দুটি উপসর্গ ‘উপ’ আর ‘নি’। উপ+নি+সদ্ = উপনিষদ। সংস্কৃতের প্রত্যেকটি শব্দের একট ধাতু থাকবে, ধাতুটাই শব্দের মূল। ধাতু থেকেই শব্দের অর্থ বার করা হয়। ধাতুর আগে ও পরে কিছু শব্দ যোগ করা হয়। ধাতুর আগে থাকলে তাকে উপসর্গ আর পরে থাকলে তাকে প্রত্যয় বলা হয়। উপসর্গ, প্রত্যয় আর ধাতু এই তিনটে মিলে সংস্কৃতের সমস্ত শব্দ তৈরী হয়েছে। যেমন সন্ন্যাস শব্দটার অর্থ করা হচ্ছে সম্ পূর্বক নি পূর্বক অস্ ধাতু। অস্ ধাতুর অর্থ হল নিক্ষেপণে, মানে ফেলে দেওয়া। নি মানে নিঃশেষে। সম্ মানে সম্যক রূপে, ভালো করে। সন্ন্যাসী কে? যিনি সংসারকে নিঃশেষে একেবারে ভালো করে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে মানে, সংসারের আর কিছু অবশিষ্ট সন্ন্যাসীর মধ্যে থাকবে না।

‘উপনিষদ’ শব্দের ধাতু হল সদ্, আর এর দুটি উপসর্গ ‘উপ’ আর ‘নি’। ‘সদ্’ ধাতুর তিন ভাবে অর্থ করা হয়। ধাতুপাঠে সদ্ ধাতুর তিনটে অর্থের মধ্যে প্রথম অর্থ করা যায় বিশরণ, বিশরণের অর্থ ছেদন করা। কি ছেদন করছে? জরা, ব্যাধি, জন্ম আর গর্ভবাস এগুলোকেই কেটে বাদ দিয়ে দেবে। তার মানে জন্ম-মৃত্যুর চক্রটাই কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, তার আর পুনর্জন্ম হবে না। জগতের ভালো-মন্দ কোন কিছুই তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। জগতে যা হওয়ার সব কিছুই হতে থাকবে, নিকট লোক মারা যাচ্ছে, প্রিয়জনের অসুখ হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছুই তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। দ্বিতীয় অর্থ হল গমন। যারা এই ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্বক পালন করছে তাদের ব্রহ্মবিদ্যা পরম ব্রহ্মে নিয়ে চলে যায়। পরম ব্রহ্মে নিয়ে চলে যাওয়া বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে ঈশ্বর যে বাইরের কোন বস্তু তা নয়, সাংসারিক দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখা হয় তখন মনে হবে আমার মধ্যে অজ্ঞান আছে, পরম ব্রহ্মে নিয়ে যাওয়া মানে এই অজ্ঞানী থেকে তাঁকে জ্ঞানী করে দিচ্ছে। গমন শব্দকে এই অর্থেই ব্যাখ্যা করা হয়। তৃতীয় অর্থ করা যায় অবসাদন্। অবসাদনের অর্থ বিনাশ করা। আমাদের মধ্যে যে সংসার ধর্মের প্রবাহ চলছে, কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি হেতু সব সময় আমরা চাই চাই করে যাচ্ছি, এর মূল কারণ হল সংসার। সংসারের মূল কারণ হল অবিদ্যা। অবসাদন্ হল এই ব্রহ্মবিদ্যা অবিদ্যাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। উপনিষদ যাঁরা অধ্যয়ণ করেন তাঁদের এই তিনটে জিনিষ হয় – ১) জন্ম-মৃত্যু চক্র, যার জন্য আমাদের গর্ভবাস, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বারবার আসা যাওয়া করতে হচ্ছে, এটাকে নাশ করে দিচ্ছে। ২) লোক ও পরলোক মিলে এই যে পুরো সংসার, তার যে মূল ভূত অবিদ্যা, সেটাকে নাশ করে দেয়। ৩) নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছে। অন্ধকার আর আলো যেমন একসাথে থাকতে পারেনা, ঠিক তেমনি অবিদ্যা আর বিদ্যা কখন এক সঙ্গে থাকতে পারেনা, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান আর অবিদ্যা দুটো কোন সময়ই একসাথে থাকে না। এই ব্রহ্মবিদ্যা অবিদ্যাকে পুরোপুরি নাশ করে দেয়। উপনিষদ পরম জ্ঞান দিয়ে দেয়। পরমজ্ঞান কিসের মত? আলোর মত, বন্ধ অন্ধকার ঘর, ঘরটা খুলে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। আলো জ্বালাতেই কি হল? আমি বলতে পারি অন্ধকার পালিয়ে গিয়ে আলো এসে গেল। একই জিনিষ হচ্ছে, অন্ধকার নাশ আর আলো আসা দুটো একই কথা কিন্তু আলাদা ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি এখানে বলছেন, অবিদ্যা নাশ ও পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি। ‘উপ’ উপসর্গের অর্থ হল সমীপে উপবেশন করা। এই বিদ্যার সমীপে কিভাবে যাবে? আচার্য শঙ্কর বলছেন *শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরা*, প্রথম শর্ত হল শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে এই বিদ্যার কাছে যেতে হবে। শ্রদ্ধা ভক্তিহীন ব্যক্তির কাছে এই উপনিষদ কখনই কার্যকর হবে না।

অনেক সময় উপনিষদের অর্থ করা হত এই মনে করে যে, আগেকার দিনে গুরুর কাছে উপবেশন করে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ণ করা হত তাই এই বিদ্যাকে উপনিষদ বলা হত। আচার্য শঙ্কর বিভিন্ন জায়গায় উপনিষদের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদ একেবারে সংসারকে ছেঁচেপুচে কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে বলে এখানে আচার্য উপনিষদের সদ্ ধাতুর অর্থ দিয়ে উপনিষদের সঠিক অর্থকে নিরুপণ করছেন। তিনিও সদ্ ধাতুর তিনটে অর্থ করছেন, বিশরণ, গতি ও অবসাদন। গতি মানে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যাচ্ছে, বিশরণ মানে নাশ করা আর অবসাদন্ মানে আত্যন্তিক নাশ। যদিও মুণ্ডকোপনিষদের ক্ষেত্রে উপনিষদের এইভাবে অর্থ করা হয়েছে কিন্তু অন্য উপনিষদও এই একই অর্থ প্রযোজ্য হবে।

যে কোন উপনিষদের সম্বন্ধ ভাষ্য খুব কঠিন হয়। সম্বন্ধ ভাষ্য একবার বুঝে গেলে মূল উপনিষদ বুঝতে আর ততটা অসুবিধা হয় না। মুণ্ডকোপনিষদের মূল উদ্দেশ্য হল পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি। পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি কি ভাবে হবে? ভেতরে যত হৃদয়গ্রন্থি আছে তার সব কটা গ্রন্থিকে কেটে নাশ করে দিতে হবে। কি ভাবে হৃদয়গ্রন্থিকে কাটতে হবে? তখন মুণ্ডকোপনিষদ দুটো বিদ্যার বর্ণনা করবে। যে বিদ্যাকে ধরে বুঝে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে সেই বিদ্যার কথা বলা হবে, আর যে বিদ্যাকে ধরে রেখে চিন্তন মনন করতে হবে সেই বিদ্যার বর্ণনা করে তার উপর জোর দিতে বলবে। এই বিদ্যাকে চিন্তন-মনন করলে কি হবে? এই জগতে যে আমাদের ওঠা-নামা, উত্থান-পতন ক্রমাগত হয়ে চলেছে এটার পুরো নাশ হয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে। আমি বলতে পারি আমি তো মুক্তি চাই না, আমি ভোগ করতে চাই। প্রথমেই বলে দেবে এই উপনিষদ তোমাকে অধ্যয়ণ করতে হবে না, এই বিদ্যা তোমার জন্য নয়। এবার যদি আমি বলি, না, আমি এমনি জানতে চাইছে উপনিষদ কি বলতে চাইছে। তখন বলবে, তুমি জানতে চাইছ যখন জান কেউ তোমাকে নিষেধ করবে না। কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক যতক্ষণ না জানতে চাইছ ততক্ষণ এই বিদ্যা এমনিতেও কোন কাজ করবে না। যখন শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক এই বিদ্যাকে অধ্যয়ণ না করা হয় তখন এই বিদ্যাই অপরা বিদ্যা হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন কল্পতরু বৃক্ষের কাছে গিয়ে কেউ লাউ কুমড়ো ফল চাইবে! এখন প্রথম মুণ্ডকের প্রথম অধ্যায়ের নটি মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।১/১/১।।

(নিখিল ভুবনের স্রষ্টা এবং পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদের মধ্যে প্রথম ও সকলের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি অথর্বা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন)

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রথম মন্ত্রের প্রথম শব্দ দিয়ে কোন উপনিষদ বা সুক্তমের নাম দেওয়া হয়। যেমন ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র শুরু হচ্ছে *ওঁ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং* দিয়ে। ঈশা থেকে উপনিষদের নাম হল ঈশাবাস্যোপনিষদ বা ঈশোপনিষদ্। ঠিক তেমনি *ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ*, কেন থেকে নাম হয়ে গেল কেনোপনিষদ্। তবে কঠোপনিষদের নাম অন্য ভাবে এসেছে। মুণ্ডকোপনিষদের নাম কেন মুণ্ডক হয়েছে সেটা একটু পরে বলবে। যদিও শুরু করা হচ্ছে *'ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং'* দিয়ে।

এই মন্ত্রের অর্থ হল যত দেবতারা আছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। *বিশ্বস্য কর্তা* তিনিই এই বিশ্বের রচয়িতা। তিনি এই সংসারের শুধু রচনাই করেননি, *ভুবনস্য গোপ্তা*, এই ত্রিভুবনকে তিনিই রক্ষা করেন এবং পালন করেন। যে বিদ্যা আমরা অধ্যয়ণ করতে যাচ্ছি এই বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, আর এই ব্রহ্মবিদ্যা *সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্*, সমস্ত বিদ্যার আকর। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অথর্বা। ব্রহ্মা এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যে বিদ্যার মধ্যে সমস্ত বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর পুত্র অথর্বাকে দিলেন। অথর্বা এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নিয়ে কি করলেন?

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হচ্ছে অথর্বা অঙ্গির্ নামে ঋষিকে এই বিদ্যা দিলেন। অঙ্গির্ আবার সেই বিদ্যা ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবহ ঋষিকে বললেন। সত্যবহ আবার এই বিদ্যা অঙ্গিরসকে বললেন। এইভাবে পর পর গুরু থেকে শিষ্যের মধ্যে পরম্পরাতে চলতে থাকল। ব্রহ্মা থেকে অথর্বা, অথর্বা থেকে অঙ্গির্, অঙ্গির্ থেকে সত্যবহ, সত্যবহ থেকে অঙ্গিরস। এইভাবে চলতে চলতে শেষে যেখান থেকে এই উপনিষদের মূল বক্তব্য শুরু হচ্ছে সেখানে তৃতীয় মন্ত্রে বলবে *শৌনক হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ*। অঙ্গিরস ঋষি যিনি ভরদ্বাজ বংশের সত্যবহ ঋষি থেকে এই বিদ্যা পেয়েছিলেন, তাঁকে গিয়ে শৌনক ঋষি প্রশ্ন করছেন। এটাই হল বিদ্যার পরম্পরা। এই বিদ্যা শুরু হয়েছে ভগবান থেকে, তারপর পর পর এই বিদ্যা গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে এগিয়ে গেছে।

ভারতে সম্প্রদায় বিদ্যার বাইরে কোন বিদ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যে কোন ব্যাপারে, তা ধর্মই হোক, কিংবা অধ্যাত্মের ব্যাপারেই হোক, দর্শনের ব্যাপারেই হোক অথবা বিজ্ঞানের ব্যাপারে বা ভূগোলের ব্যাপারে, যে কোন বিষয়ে কিছু বলার আগে প্রমাণিত করে দেখাতে হবে এই কথাগুলো ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। যে বিদ্যা ভগবানের কাছ থেকে আসেনি সেটা হয়ে যাবে সাংসারিক বিদ্যা। সাংসারিক বিদ্যা আজ যেমনটি আছে আগামীকাল তেমনটি থাকবে না। এর খুব সহজ দৃষ্টান্ত হল, নিউটনের আগে পর্যন্ত এ্যরিস্টটল যে তত্ত্বগুলো দিয়েছিলেন সেগুলোকে ভিত্তি করে পদার্থ বিদ্যা এক ভাবে চলছিল। সেখান থেকে সরে এসে নিউটন অন্য রকম তত্ত্ব নিয়ে হাজির হলেন। নিউটনের তত্ত্বকে আবার আইনস্টাইন অন্য ভাবে সংশোধন করলেন। আগামীকাল আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলো আরেকজন এসে পাল্টে যাবে। এটাই সাংসারিক বিদ্যা। মানুষের বুদ্ধি থেকে যে তত্ত্ব বেরিয়ে আসে তখন সেই তত্ত্বের ঐ ধরণের গুরুত্ব থাকে না। ভগবানের কাছ থেকে যখন আসবে তখন কিন্তু সেই বিদ্যার মধ্যে কোন গোল থাকবে না। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন – একজন বলছিল আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। তার মানে তার ঘোড়া নেই, কারণ গোশালায় ঘোড়া থাকে না। মানুষের বুদ্ধি থেকে যখনই কিছু বেরোয় তখনই কিন্তু গোয়ালে ঘোড়া রাখার কথা হয়ে যায়। মানুষের বুদ্ধি থেকে যেটাই বেরোবে হিন্দুরা সেটাকে কখন বিশ্বাস করবে না। সেইজন্য হিন্দুরা প্রথমেই যাচাই করে নেবে তুমি যে বিদ্যার কথা বলছ সেটা তুমি সম্প্রদায় থেকে পেয়েছ কিনা। সংস্কৃতের যত নিয়ম আছে সেগুলো পেয়েছিলেন পাণিনি। পাণিনি ব্যাকরণের এই নিয়মগুলো কোথা থেকে পেয়েছিলেন। বলছেন শিবের ঐ ডমুরুর বোল্ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম বেরিয়েছে। যখন বুঝে নিল পাণিনির যত সূত্র সব শিবের ডমুরু থেকে বেরিয়েছে তখন হিন্দুরা বলবে, এইবার তোমার সব বক্তব্য আমরা শুনতে রাজী আছে। অন্য দিকে হিন্দী ব্যাকরণের যত নিয়ম আছে সেখানে যত নিয়মের কথা বলবে তার থেকে বেশী অপবাদই আছে। যখন পুংলিঙ্গের নিয়ম ঠিক করে দিল, তখন আবার নিয়মের এক গুচ্ছ ব্যতিক্রমও দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যতিক্রমই বেশী, কারণ মানুষের তৈরী। কিন্তু যখন ভগবান তৈরী করবেন তখন সেখানে কোন ব্যতিক্রম হবে না। নৃত্য, সঙ্গীত, কলা বিদ্যাগুলো তাও কিছুটা লৌকিক বিদ্যা কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা পুরোপুরি সম্প্রদায় বিদ্যা।

প্রথম মন্ত্রের প্রথম লাইনে বলছেন যত দেবতা আছেন তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি সবার আগে হয়েছে। ব্রহ্মার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, ব্রহ্মা থেকে বাকি সব কিছু কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এর বর্ণনা আমরা পুরানে অনেক বিস্তারিত ভাবে পাই। কিন্তু এখানে পরম্পরা বিদ্যাকে স্তুতি করার জন্য বলা হল সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মার জন্ম প্রথম। উপনিষদের সার তত্ত্ব হল নির্গুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্মই শেষ কথা। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আমি আপনি সবাই সবাইকে আলাদা আলাদা দেখছি। এত রূপ এত নাম এগুলোকে আমরা অস্বীকার করতেও পারছি না। তাহলে যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম তাঁর এত রূপ কোথা থেকে এল? কোন একটা জায়গা থেকে, যে জায়গা থেকে প্রথম যিনি সৃষ্ট হলেন তাঁকে বলা হচ্ছে ব্রহ্মা। কিন্তু এখানে ব্রহ্মা ভগবান নন, তিনি একজন দেবতা। যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এনারা ভগবান নন, দেবতা। দেবতাদের ভগবান থেকে নীচে অবস্থান। প্রত্যেক দেবতার উপর কিছু নির্দিষ্ট কাজ অর্পিত করা আছে, এনারা সেই কাজগুলো করেন। বিষ্ণু, রুদ্র এনারা বেদেরই দেবতা। পৌরানিক কাহিনীতে এসে ত্রিমুর্তির ধারণার জন্ম হল। পুরানের মত হল, যিনি ভগবান তিনিই এই তিনটে রূপ ধারণ করেন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ। কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মা একজন দেবতা,

বিষ্ণু অতি সাধারণ এক দেবতা আর রুদ্র দেবতাদেরও নীচে। কিন্তু পরে পৌরানিক যুগে ঈশ্বরের তিনটে রূপে এনারাই হয়ে গেলেন ত্রিমুর্তি। কিন্তু উপনিষদের এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে দেবতা রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে, বলছেন যত দেবতা আছেন তাদের মধ্যে ব্রহ্মার প্রথম জন্ম, তিনিই আদি দেবতা।

এরপর ব্রহ্মার বৈশিষ্ট্য কি বলা হচ্ছে। তিনি যে প্রথম সৃষ্টই হলেন তা নয়, তিনিই আবার সৃষ্টির রচনা করলেন। এর অর্থ হল ভগবান সৃষ্টি করেন না। অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টি ভগবানই করেন, সে তিনি যেভাবেই করে থাকুন, সৃষ্টি ভগবান করেন। কিন্তু হিন্দু মতে ভগবান কখন সৃষ্টিকার্যে নামেন না। ভগবান আছেন, সেখান থেকে একটা স্বতঃস্ফুর্ত সৃষ্টি হয়ে যায়। কি রকম? তাঁর নাভিপদ্মে হঠাৎ ব্রহ্মার আবির্ভাব, আবির্ভূত হয়েই ব্রহ্মা ভাবছেন, আমার যখন সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমার কার্য আছে। যদিও পৌরানিক কাহিনী, কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে এগুলো খুব গূঢ় প্রশ্ন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল সমস্যাটা ঠিক এখানেই শুরু হয়, যে সমস্যাটা হিন্দুরা অনেক যুগ আগে সমাধান করে দিয়েছে।

যে কোন কার্যের পেছনে একটা কারণ থাকা অবশ্যম্ভাবি। বিনা কারণে বাচ্চা আর পাগলই সারা দিন নানা রকমের উদ্ভট কাজ করে বেড়ায়। ভগবান তো আর পাগল নন আর অবোধ শিশুও নন। ভগবান যখন কোন কার্য করেন তখন সেই কার্যের পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। পুরো পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন ভগবানের কার্যের কারণ ও উদ্দেশ্যের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই উত্তরের প্রথম ও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমাধান হল ক্রমবিকাশবাদ। ক্রমবিকাশবাদই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চিন্তাধারার পরিণতি, আমার অস্তিত্বের একটা অর্থ আছে, এই সৃষ্টির একটা তাৎপর্য আছে। হিন্দুরা এগুলোর কোন কিছুকেই গুরুত্ব দেয় না। কারণ ঈশ্বর তো সৃষ্টিই করেননি। ব্রহ্মার সৃষ্টি হচ্ছে স্বতঃস্ফুর্ত। কিন্তু ব্রহ্মা যখন একটা কালের সীমানাতে সৃষ্টি হয়ে গেলেন, তখন তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন আমি কেন এসেছি। চিন্তা করতে করতে ধ্যানের গভীরে গিয়ে দেখলেন আমি এসেছি সৃষ্টিকার্য করার জন্য। তারপরই তিনি সৃষ্টিকার্যে নেমে গেলেন। এই সৃষ্টি যদি ব্রহ্মার হয় তাহলে সেই অর্থে এই জগৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিছুই ভগবানের সৃষ্টি নয়। অন্যান্য ধর্মে ভগবানের সৃষ্টি যেই অর্থে বলা হয় হিন্দুরা সেই অর্থে ভগবানের সৃষ্টি বলবে না।

আমাদের কাছে ভগবান ছাড়া কিছুই নেই, একমাত্র ভগবানই আছেন। সৃষ্টিটাও তিনি। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে যে জগতে নাম-রূপের বিভেদ দেখছি, যদি এটাকে বাস্তবিক দেখি তাহলে এটা ব্রহ্মা থেকে শুরু। যদি মায়া রূপে দেখি তাহলে এই জগৎটা মায়া। আর ঈশ্বর বলতে তিনিই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে ব্রহ্মা কোথা থেকে আসছেন? যখন এই মায়ার আবরণ এসে যায়। যিনি ঈশ্বর, তিনি যে কোন কারণেই হোক, যে কারণটা আমরা কোন দিন জানতে পারব না, মায়াকে অবলম্বন করেন। মায়াকে অবলম্বন করতেই সেই নির্গুণ নিরাকার তিনি একটা সলিল রূপ ধারণ করেন, কিংবা সেই অনন্তের উপর শায়িত হয়ে আছেন। সেখান থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হল। এবার ব্রহ্মার সৃষ্টি হতেই তিনি ভাবলেন আমাকে কি করতে হবে? তখন তিনি দেখলেন আমাকে সব কিছুর সৃষ্টি করতে হবে।

এখানে বলছেন *ওঁ ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব*, দেবতাদের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মার সৃষ্টি হল। নাসদীয় সুক্তে বলা হচ্ছে সৃষ্টির প্রথমে কি হয়েছিল কে জানে। কারণ ইন্দ্রাদি যত দেবতা আছেন তাঁদের আগেই ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। ছেলে বাবার কথা কি করে জানবে? কোন ভাবেই জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা পরম্পরাতে শুনে আসছি দেবতাদেরও আগে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল ব্রহ্মার। ব্রহ্মা জন্ম নিতেই তাঁর উপর একটা গুরু দায়ীত্ব এসে গেল, ব্রহ্মার মাথায় আছে আমি কেন এসেছি, আমাকে কি করতে হবে। ভগবানের এই সমস্যা হয় না। যাই হোক, তখন ব্রহ্মা নিজে বুঝলেন আমাকে এই বিশ্ব রচনা করতে হবে, তিনি হয়ে গেলেন *বিশ্বস্য কর্তা*। শুধু তাই না, এই ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃ, পৃথিবী, স্বর্গ আর এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থান নিয়ে যে অন্তরীক্ষ এই সব কিছু যেন ঠিক ঠিক মত চলতে থাকে, সূর্য যেন ঠিক ভাবে প্রত্যেক দিন উদয় হতে পারে, চন্দ্রমা যেন তার নিয়মকে ঠিক ভাবে পালন করে চলে, অগ্নি যেন তার ধর্মকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করে এই সব কিছুর দায়ীত্ব ব্রহ্মা নিজের উপর নিয়ে নিলেন, তাই ব্রহ্মাকে এখানে বলা হল *ভুবনস্য গোপ্তা*। এই ধারণাকে আধার করেই পরে

বিষ্ণুকে পালয়িতা রূপে দেখা হবে। তত্ত্বের দিক থেকে এগুলোকে বেশী গুরুত্ব দিতে নেই, পৌরানিক সব ব্যাপারকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে অনেক গোলমাল হয়ে যাবে। আচার্য ব্রহ্মার অর্থকে এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন – *ব্রহ্মা পরিবৃদ্ধো মহান্ ধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যৈঃ সর্বাননন্যানতিশেত ইতি*। যিনি ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যে অন্য সবাইকে অতিক্রম করে গেছেন আর যাঁর সৃষ্টি সর্ব প্রথম তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মও সেখান থেকেই এসেছে, 'বৃ' ধাতু থেকে ব্রহ্ম। 'বৃ' ধাতুর অর্থ বৃহৎ, ব্রহ্মই আছেন তাই তাঁর থেকে বড় আর কেউ থাকতে পারে না। ব্রহ্মা শব্দেরও সেখান থেকেই উৎপত্তি, সবার থেকে যিনি বৃহৎ। যত দেবতা আছেন তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা বড় আর দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মার মাহাত্ম্যটা বেশী।

আচার্য দেবতার অর্থ করছেন *দ্যোতন-বতামিন্দ্রাদীনাং*। দিব্ ধাতু থেকে দেবতা এসেছে, দিব্ মানে আলোকিত বা প্রকাশিত। এরও আবার দুটো অর্থ হয়, যাদের ব্যক্তিত্ব দেদীপ্যমান। অন্য অর্থে বলা হয় যাঁরা দ্যোতন করেন, অর্থাৎ আলোকিত করেন। আলোকিত করা, এর অর্থ হতে পারে যত লোক আছে স্বর্গ, পৃথিবী, এই লোকগুলিকে আলোকিত করে রাখা। আবার এই অর্থও করা হয়, মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোতে আলো সঞ্চারের দ্বারা আলোকিত করে রাখা। দেবতার অর্থ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে করা হয়েছে। আচার্যই একটা অর্থ করেছেন যাঁরা আত্মবিদ্যায় নিজেদের আলোকিত করে রেখেছেন। এর বিপরীত অসুরের অর্থ আচার্য এই ভাবে করছেন, যারা অসুতে বেশী বিশ্বাস করে, অসু মানে প্রাণশক্তি। আর ইন্দ্রিয়াদিগুলিকে যাঁরা প্রকাশমান করছেন, মানে চৈতন্য থেকে যিনি শক্তি দিচ্ছেন তাঁদের বলা হচ্ছে দেবতা। আমাদের এই হাত, পা, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গুলি শুধু প্রাণশক্তি দ্বারাই চালিত হচ্ছে, যেমন পাশ্চাত্য জগৎ নিজের বাহুবল, দেহবলের উপর বেশী নির্ভরশীল। এরা এক ধরণের। আবার কিছু ধরণের লোক বলছে আমি ঈশ্বরের শক্তির উপর বেশী বিশ্বাস করি। ঠাকুর খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলছেন – দুজন কুস্তি লড়েছিল – হনুমান সিং আরেকজন পাঞ্জাবী মুসলমান। মুসলমানটি খুব হৃষ্টপুষ্ট। কুস্তির দিনে, আর আগের পনেরদিন ধরে, মাংস-ঘি খুব করে খেলে। সবাই ভাবলে, এ-ই জিতবে। হনুমান সিং – গায়ে ময়লা কাপড় – কদিন ধরে কম কম খেলে, আর মহাবীরের নাম জপতে লাগল। যেদিন কুস্তি হল, সেদিন একেবারে উপবাস। সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই হারবে। কিন্তু সেই জিতল। যে পনেরদিন ধরে খেলে সেই হারল। তা বলে কি সবাই জিতে যাবে, নাও জিততে পারে। ঠাকুর একটা উপমা দিচ্ছেন, কিন্তু ঠাকুর এটা একটা সত্যিকারের ঘটনাকে নিয়ে উপমা দিয়ে একটা ভাব আমাদের দিচ্ছেন। দেবতারা আত্মশক্তি বা আত্মবিদ্যার উপর বেশী জোর দেন। সেইজন্য তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলো অন্যান্যদের থেকে বেশী আলোকিত। কিন্তু অসুররা প্রাণশক্তির উপর বেশী নির্ভরশীল, এরা প্রাণশক্তিতেই চলে। রেলের ইঞ্জিনগুলো প্রাণশক্তিতে চলছে। যে ড্রাইভার ইঞ্জিনকে চালাচ্ছে তার অত প্রাণশক্তি নেই যে বিদ্যুৎ ছাড়া চালিয়ে দেবে। কিন্তু তার মধ্যে আত্মশক্তি থাকাতে ইঞ্জিনের প্রাণশক্তিকে সুসংহত করে অত বড় ট্রেনের গতি বেগকে নিজের নিয়ন্ত্রণের মুঠোয় ধরে রাখতে পারছে।

ঠিক তেমনি এই আত্মশক্তির তারতম্যেই মানুষে মানুষে এত তারতম্য। আবার মানুষের মধ্য থেকে যখন কেউ দেবতা বা অসুরের মধ্যে চলে যাচ্ছে তখন তারতম্যটা আরও বেশী হয়ে যায়। পরিষ্কার বোঝা যায় মানুষ আর মেশিনে যে পার্থক্য, দেবতা আর অসুরের মধ্যে এই একই পার্থক্য। প্রাণশক্তি সব সময় বেশী ক্ষমতাশালী হয়। কিন্তু আত্মশক্তি যখন এই প্রাণশক্তিকে চালনা করে তখন এই শক্তিই অন্য রকম হয়ে যায়। এই কথাই এখানে আচার্য বলছেন। দেবতা কারা? যাঁরা প্রকাশমান, যাঁদের ব্যক্তিত্ব সব সময় দেদীপ্যমান। আবার পুরানে দেবতাদের বর্ণনা করা হবে অন্য ভাবে, দেবতাদের শরীর তেজোময়। আমাদের শরীরে যেমন পৃথিবী তত্ত্ব অনেক বেশী, দেবতাদের শরীর আলোকিত, কারণ তেজতত্ত্বটা বেশী।

এই দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মার আগে জন্ম হয়েছিল বলে তিনি শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কেন বলতে গিয়ে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন *ন তথা যথা ধর্মাধর্মবাশাৎ সংসারিণোহন্যে জায়ন্তে*। এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিককে আমাদের বোঝার আছে। ভগবানের নাভিকমল থেকে যদি ব্রহ্মার জন্ম হয়ে থাকে তাহলে ব্রহ্মা আর ভগবান কি আলাদা হতে পারেন? এখানে কোথাও বলা হচ্ছে না ভগবান বাইরে থেকে আলাদা কিছু উপাদান সংগ্রহ করে ব্রহ্মাকে

সৃষ্টি করছেন। ভগবান তিনি তাঁর মন দিয়েই সৃষ্টি করুন আর যেভাবেই করুন বস্তুত ভগবান থেকে তিনি আলাদা হবেন না। উচ্চতর বিশ্লেষণের দিক থেকে আমি আপনি যাই হয়ে থাকি না কেন, কিন্তু তাৎক্ষণিক বিচারে যদি দেখি তাহলে পরমাত্মা আর ব্রহ্মা কখন আলাদা হতে পারেন না। ব্রহ্মার জন্ম আর আমার আপনার জন্মের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। আমাদের জন্ম কেন হচ্ছে? ধর্ম ও অধর্মের ফলে যে কর্মবন্ধন তৈরী হচ্ছে, এই কর্মবন্ধনই টেনে আমাদের জন্ম নেওয়াচ্ছে। আমি এর আগে আগে অনেক ভালো কাজ করেছি, অনেক মন্দ কাজও করেছি, এই ভালো-মন্দ সব কর্মই আমাদের একটা বন্ধন তৈরী করছে, যেটাকে হৃদয়গ্রন্থি বলা হচ্ছে। এই হৃদয়গ্রন্থিই টেনে আমাদের বিভিন্ন যোনির মধ্যে জন্ম নিতে বাধ্য করাচ্ছে। ব্রহ্মার জন্ম এই ভাবে হয় না। অন্যান্য সংসারী জীব যেমন ধর্ম-অধর্ম বশতঃ সমস্ত কর্মের ফলকে মিলিয়ে সেই অনুসারে জন্ম নিচ্ছে কিন্তু এই ধর্ম অধর্মের বন্ধনে ব্রহ্মার কখনই জন্ম হয় না। তিনি একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব। ব্রহ্মা জন্ম নিয়েই ধ্যানের গভীরে চলে যান। ধ্যানের গভীরে গিয়ে তিনি দেখেন জগৎএর সৃষ্টি কার্যের জন্যই তাঁর জন্ম। তখন তিনি সৃষ্টি কার্যে নেমে পড়েন। সৃষ্টি কার্যে প্রথমে তিনি তাঁর মন থেকে সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রথম সৃষ্টি হল সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনৎকুমার এই চারজন। ব্রহ্মার একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব মন থেকে প্রথম এই চারকুমারের জন্ম হওয়াতে এঁদের মনও একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব। জন্ম নিয়েই এই চারকুমার দেখছেন আমরা কোথায় এসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে তাঁরা তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন।

এই ব্রহ্মার বিশেষণ কি? তিনি *ভুবনস্য গোপ্তা*, এই ভুবনকে তিনি ধারণ করে আছেন। তিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা মানে পরমাত্ম বিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে পরমাত্মাকে জানা যায় বা যে বিদ্যাতে পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মা কে? *যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং*, মুণ্ডকোপনিষদেই পরে এই মন্ত্র আসবে, *যেনাক্ষরং*, যিনি অক্ষর, যাঁর কখন কোন ধরণের ক্ষয় বা নাশ হয় না, কোন ধরণের দোষ থাকে না। *পুরুষং*, বেদ উপনিষদে আমরা যে অর্থে ঈশ্বরকে বুঝি, সেই অর্থে ঈশ্বরকে নিয়ে আসা হয়নি, এখানে সব সময় পুরুষ বলা হয়। আজকে আমরা যাঁকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলি, বেদ উপনিষদে তাঁকেই পুরুষ নামে সম্বোধন করা হয়। পুরুষের নানান রকম ব্যাখ্যা আছে, তার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা হল যিনি পুরে শয়ন করেন। পুর মানে নগরী, এই দেহরূপী নগরীতে যিনি শয়ন করেন, দেহরূপী না বলে বলা যেতে পারে এই দেহের যিনি অন্তর্যামী। ঈশ্বর ছাড়া চেতনা আসে না। বলছেন *বেদ সত্যং*, এই পুরুষের আরেকটি বৈশিষ্ট্য কি? তিনিই আছেন। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। সৎ বলতে একমাত্র ঈশ্বর। যে বিদ্যা দিয়ে এই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। সত্য পুরুষ মানে সচ্চিদানন্দ, যিনি সৎ, তিনিই চিৎ তিনিই আনন্দ তিনিই সচ্চিদানন্দ। অনেক সময় সচ্চিদানন্দকে একটা শব্দে বলে দেয় সৎ। অনেক সময় তাঁকে বলা হয় অক্ষর, যাঁর কোন ক্ষর হয় না। এর খুব বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণও দেওয়া হয়, যাঁরই কোন অংশ আছে সেই অংশকে কেটে আবার আলাদা করা যায়। কিন্তু যিনি ঈশ্বর তিনি পূর্ণ, তাঁর কোন অংশ হয় না। পূর্ণের অংশ কি করে হবে, যাঁর কোন অংশ হয় না তাঁর কোন ক্ষয়ও হবে না। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সবই বিভিন্ন অংশ আর উপাদানের সংমিশ্রণ। যেটারই অংশ আছে সেটাই যৌগিক। যৌগিক পদার্থকে সব সময় কাটা যাবে, টুকরো করা যাবে, নাশ করা যাবে। কিন্তু যেটা যৌগিক নয় সেটাকে কি করে আমরা নাশ করব! আগেকার দিনে হাইড্রোজেনকে বলা হত অবিভাজ্য। তার মানে হাইড্রোজেন আত্মার মত হয়ে যাচ্ছে, তার কোন অংশ নেই। পরে জানা গেল হাইড্রোজনেরও ইলেক্ট্রন প্রোটন আছে, তারও আবার অংশ বেরিয়ে আসছে। ইলেক্ট্রন প্রোটন পরে আবার এণার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এণার্জির আবার অনেক রকম ফের আছে। ঈশ্বর সেই রকম নয়। ঈশ্বরের কোন অংশ হয় না। তিনিই আবার সর্বব্যাপী, অনন্ত, তিনিই আছেন। এগুলো ঈশ্বরের উপর বেদের ব্যাখ্যা।

এখন মনে প্রশ্ন হতে পারে আমি এই ব্যাখ্যাকে কেন মানব? এর কি প্রমাণ আছে। উপনিষদ বলবে এর কোন প্রমাণ নেই। এই তত্ত্ব পরম্পরায় চলে আসছে। ব্রহ্মা নিজে এই বিদ্যা দিয়েছেন। সেখান থেকে হয়ে হয়ে আজকে আমাদের কাছে এসেছে। এটাই মৌলিক নিয়ম যে, সম্প্রদায় বিদ্যাকে কখন প্রশ্ন করা যায় না। অনেক সময় বড় বড় তাত্ত্বিকরা প্রশ্ন করেন শঙ্করাচার্যের দর্শন কি? শঙ্করাচার্যের কোন দর্শন নেই। শঙ্করাচার্য

শুধু অর্থ বলে দিচ্ছেন, উপনিষদের অর্থ এই আর গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এই। নতুন দর্শন দেওয়া আচার্যের কোন কাজ নয়। তিনি নতুন দর্শনকে বিশ্বাসই করবেন না। কারণ নতুন দর্শন মানেই তোমার মস্তিষ্ক প্রসুত, আমি তো তোমার মস্তিষ্ককে বিশ্বাস করি না। আমি সম্প্রদায় বিদ্যাকে বিশ্বাস করি। এরপরও যদি কেউ বলে আমি মানি না। তাহলে বাপু এই বিদ্যা তোমার জন্য নয়। তখন বলবে আপনি আমার সাথে তর্ক বিচার করুন। আচার্য বলবেন ঠিক আছে এস বিচার কর আমার সাথে, তার আগে বল তোমার কি stand point। আমার stand point হচ্ছে মানুষ জন্মাচ্ছে আবার মরছে এর বাইরে আর কিছু নেই। বিগ্ ব্যাঙ, ব্ল্যাক হোলের বাইরে কিছু নেই। এবার আচার্য তাকে তুলোধূনো করবেন। আচার্য ধরে ধরে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবেন তোমার সিদ্ধান্ত কেন ভ্রান্ত। এই সব তর্ক বিচার আমরা ধরতেও পারব না, বুঝতেও পারব না, আর আমাদের এই সব বিচারে গিয়ে কোন কাজও নেই। তবে শেষে আচার্য সব ধর্ম তত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেবেন কিভাবে এগুলোকে দাঁড় করান যায় না।

আচার্য তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দেখিয়ে দেবেন উপনিষদের কথাই শেষ কথা। উপনিষদের শেষ কথা কি? উনি বলবেন অদ্বৈত। কোন্ অদ্বৈত? যেটা আমরা এখানে আলোচনা করছি। তাহলে তাঁর কাছে ঈশ্বরও সত্য, ব্রহ্মাও সত্য, দেবতাও সত্য, সৃষ্টিটাও সত্য, সবই সত্য। কিন্তু বলবেন সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। এগুলো যা দেখছেন সব তাঁরই রূপ। এই বোতল, গ্লাশ শুধু মাত্র বোতল বা গ্লাশ নয়, এগুলো সচ্চিদানন্দরই রূপ। এরপর যদি সম্প্রদায় বিদ্যাকেই সন্দেহ করে? তখন তিনি এক এক করে সব কটি দর্শনকে প্রথম থেকে শুরু করে কাটতে থাকবেন। তিনি তথাকথিত চার্বাক অর্থাৎ আজকের দিনের ভৌতিক বাদকে কিভাবে দুটো কথাতেই কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপর তিনি জৈন দর্শনকে ধরবেন, সেটাকেও কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। এই ভাবে পর পর বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশাষিক, সাংখ্য সব কটাকে কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপর বলবেন, আমি দেখিয়ে দিলাম তোমাদের সবটাই ভুল এবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কেন ঠিক। তারপর তিনি উপনিষদ দিয়ে শুরু করবেন। সেইজন্য সাধারণ মানুষকে প্রথমেই উপনিষদ পড়তে দেওয়া হয় না। প্রথমে তাকে বলবে আগে তুমি উপযুক্ত গুরুর কাছে বেদ বেদাঙ্গ ভালো করে অধ্যয়ণ করে, চিন্তন মনন যা করার করে এসে বলবে আমার সব বোঝা হয়ে গেছে। তখন বলবেন এবার তোমাকে আমি বেদান্ত অধ্যয়ণ করাব। যখন কাউকে উপনিষদাদি পড়ান হয় তখন আচার্যরা ধরেই নেন যে শিষ্য বেদ, বেদাঙ্গের সব কিছু ভালো করে বুঝে নিয়েছে আর তার সাথে বুঝে গেছে ভৌতিক বাদ বলে কিছু হতে পারেনা, অন্যান্য সব ধর্মীয় দর্শনগুলোতে কিছু নেই। এই সব কিছুকে আগাগোড়া যুক্তি তর্ক দিয়ে অধ্যয়ণ করে নিতে হবে। বেদের ক্রিয়া কর্মকাণ্ড ভালো করে জানতে হবে, বেদাঙ্গের সব কিছু জানা চাই। তার আগেই এসে যদি কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করে এটা কি করে হল? সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান থেকে বার করে দেবেন।

ব্রহ্মবিদ্যার দুটো অর্থ হয়। ব্রহ্ম মানে পরমাত্মা, যে বিদ্যাকে দিয়ে পরমাত্মাকে জানা যায় সেই বিদ্যাকে তাই বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা। আর দ্বিতীয় অর্থ বলছেন ব্রহ্মা এই বিদ্যার শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে এই বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। এই বিদ্যার বৈশিষ্ট্য কি? যত রকমের বিদ্যা আছে সব বিদ্যারই এই বিদ্যার আশ্রয়। কেন? যা কিছু বিদ্যা আছে সবই ভগবান থেকেই এসেছে। সেইজন্য অধ্যাত্ম বিদ্যা যিনি ঠিক ঠিক জেনে গেছেন সমস্ত বিদ্যাই তাঁর আয়ত্তে চলে আসে। আচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি এনে বলছেন *যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্* (ছা.উ. ৬/১/৩), যেটা শ্রুত হয়নি সেটাও তিনি জেনে যান, যে জিনিষটা মানুষ চিন্তা করতে পারে না সেটাও তাঁর উপলব্ধ হয়ে যায় আর অজ্ঞাত বিষয়ও জ্ঞাত হয়ে যায়। সেইজন্য বলা হয় ঋষিরাই ঠিক ঠিক নতুন নতুন জিনিষকে আবিষ্কার করে গেছেন। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী যখন চেন্নাইতে ছিলেন তখন সেখানে বিদগ্ধ পণ্ডিত, অধ্যাপকদের সামনে বক্তব্য রাখছিলেন। কি একটা কথা হতেই সবাই বলতে শুরু করলেন এর আগে শঙ্কর, রামানুজের মত কোন আচার্য এই কথা বলেননি। স্বামীজী তখন প্রত্যুত্তরে বলছেন This was waiting for me, এই মতটা আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। এই কথাই ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হচ্ছে *যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি*, যে জিনিষটা আগে কখন শোনা যায়নি সেটাই এখন শোনা যায়। ঋষিদের এটাই কাজ, যিনি ব্রহ্মবিদ্যা জেনে গেলেন তাঁর কাছে

সব বিদ্যাই জানা হয়ে যায়। এমন কি তবলা বাজান, সঙ্গীত বিদ্যা, ফুটবল খেলা সব কিছুতেই তিনি শ্রেষ্ঠ হয়ে যান। বুদ্ধি লাগালেই তিনি যে কোন বিদ্যাকে ধরে নেবেন। সেইজন্য বলছেন ব্রহ্মবিদ্যা পেয়ে গেলে সব বিদ্যাই পাওয়া হয়ে যাবে। যিনি পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানী তাঁকে এখন ব্রহ্মবিদ্যার জন্য অনেক জন্ম ঘুরতে হবে, কিন্তু স্বামীজী যখন যে বিদ্যার উপর বক্তব্য রাখছেন তখন মনে হবে তিনি ঐ বিদ্যাতেই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

যাই হোক, এখানে এরপর বলছেন ব্রহ্মা এই বিদ্যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে দিয়েছিলেন। আচার্য এখানে বলছেন ব্রহ্মা অনেক রকম সৃষ্টি করেছিলেন, কোন একটা সৃষ্টিতে অথর্বা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ব্রহ্মা সব কিছুই আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের কাছে ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব যেভাবে এসেছে, মানুষ প্রথম ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ছিল, সেখান থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রজাতিতে এসেছে, এগুলো আমাদের ঋষি মুনিরা বিশ্বাস করেন না। আমাদের পরম্পরাতে যোনিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে আসছে। যোনি মানে, ব্রহ্মা প্রথমে চারজন কুমার সৃষ্টি করলেন, তারপর এক এক করে বিভিন্ন জিনিষের সৃষ্টি করলেন, তিনি ঋষিদের সৃষ্টি করছেন, গন্ধর্বদের সৃষ্টি করলেন, সব আলাদা আলাদা যোনির সৃষ্টি করে গেছেন। আমরা তো শুধু এই স্থূল জগৎকেই দেখতে পাচ্ছি, সূক্ষ্ম জগত বলে যে কিছু আছে ডারউইনের এই ধারণাই ছিল না। স্থূল জগতের সাথে সূক্ষ্ম জগতের কিভাবে কি সম্পর্ক হবে? তাই বলছেন কোন একটা এই ধরণের সৃষ্টিতে অথর্বা হলেন প্রথম। ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায়, সেটা তিনি অথর্বাকে শিক্ষা দিলেন। সেই বিদ্যা অথর্বা পরে অঙ্গির্‌কে শিখিয়েছিলেন।

এর আগেও আলোচনা হয়েছে যে, অধ্যাত্ম বিদ্যাকে সব সময় সম্প্রদায় বিদ্যাতে নিয়ে যেতে হয়। সম্প্রদায় বিদ্যা মানে গুরু থেকে শিষ্য পর পর চলতে থাকে। এই নিয়ম সব ধর্মেই আছে। মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে যারা সুফি, তারাও ঠিক একই শব্দ ব্যবহার করে। আমরা যেমন বলি সম্প্রদায়, এটাকেই সুফিরা বলবে সিল্‌সিলা। সুফিরা বলবে তাদের কাছে যে বিদ্যা আছে এটা মহম্মদের কাছ থেকে এসেছে। মহম্মদ কোথা থেকে পেয়েছেন? সরাসরি আল্লার কাছে পেয়েছেন। কোন সুফিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার এই কথাগুলো কোথা থেকে এসেছে। সুফিরা বলবে খোদ্ আল্লা থেকে এসেছে। ঠিক তেমনি সমস্ত উপনিষদই কোন না কোন ভাবে সাক্ষাৎ ভগবানের সাথে জুড়ে দেবে। মুণ্ডকোপনিষদ প্রথম মন্ত্রেই বলা হচ্ছে যে বিদ্যার কথা বলা হবে এই বিদ্যা ব্রহ্মা থেকে এসেছে। তিনি এই বিদ্যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে বলেছিলেন। এরপর এই বিদ্যা পরম্পরাতে কি ভাবে এগিয়ে গেছে বলা হচ্ছে।

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাহ-
থর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্।।১/১/২।।

(ব্রহ্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা অথর্বাকে বলেছিলেন অথর্বা আবার তাই সর্বপ্রথম অঙ্গির নামে ঋষিকে বলেন। অঙ্গির তা ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে বলেন। এইভাবে গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে সত্যবহ অঙ্গিরস ঋষিকে বলেছিলেন।)

ব্রহ্মা অথর্বাকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলেছিলেন, অথর্বা *তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্*, সেই বিদ্যা অথর্বা অনেক আগে অঙ্গির্ নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন। এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি অঙ্গির্ অথর্বার শিষ্যই হবেন। অথবা তাঁর সন্তানও হতে পারেন, যদিও পরিষ্কার করে বলা নেই, কিন্তু ইনি নামকরা একজন খুব গুণী ঋষি। এই যে ব্রহ্মা অথর্বাকে বিদ্যা দিলেন, অথর্বা আবার সেই বিদ্যা অঙ্গির নামক ঋষিকে শিক্ষা দিলেন, আমরাও যে পদার্থবিদ্যা শিখেছি ঠিক এই ভাবেই শিখেছি। নিউটন একটা থিয়োরি আবিষ্কার করলেন, তিনি তাঁর ছাত্রদের শেখালেন, সেখান থেকে হয়ে হয়ে আজকে আমরা জানছি। কিন্তু আজকে আমরা মানি আর নাই মানি আমাদের মস্তিষ্ক, মন, ইন্দ্রিয় সমুদয় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। যারা নিউরোলজি নিয়ে গবেষণা করছেন

তারাও জানেন আমাদের সমস্ত অরগান গুলো খুবই ত্রুটিপূর্ণ। যে জিনিষগুলো মনের মনে রাখার কথা সেগুলো মনে রাখে না, যেটা মনে রাখার কথা নয় সেগুলোকেই মনে রাখে। যেগুলো হওয়ার কথা নয় বা হয়নি সেগুলোকে মাথার মধ্যে ঘোরাতে থাকে, যেগুলো হয়েছে সেগুলোকে ফেলে দেয়। মনের উপর আমরা একেবারেই ভরসা করতে পারিনা, সব কিছু সে ভুলে যায়। এই অসম্পূর্ণ মন যে বিদ্যাকে বার করবে সেটাও খুব ত্রুটিপূর্ণ হবে।

জার্মান দার্শনিক হেগেল যে দ্বন্দ্বাত্মমূলক দর্শন দিলেন সেই দর্শনের উপর আজকে কম্যুনিজম্ দাঁড়িয়েছে। হেগেলের ঠিক পেছনেই ছিলেন শ্যপেনহাওয়ার, তিনিও জার্মান ছিলেন। সেই শ্যপেনহাওয়ার হেগেলের নামে বলছেন Hegel stands as a monument of German stupidity। জার্মানরা যে কত মুর্খ হতে পারে তার মনুমেন্ট হলেন হেগেল। সেই হেগেলের থিয়োরিকে নিয়ে তৈরী হয়েছে মার্কিস্ট ফিলজফি। উইল ডুরাণ্ড তাঁর দর্শনে খুব দুঃখ করে লিখছেন 'হেগেল নিজের সময় এত বড় দার্শনিক ছিলেন আর দুশ বছর পর আজকে হেগেল দর্শনের ফুটনোটে চলে গেছেন'। হেগেলের দর্শনে এত অসঙ্গতি আর অসম্বদ্ধ ছিল যে হেগেলের মত দুরবস্থা আর কোন দার্শনিকের হয়নি। মূল কথা হল যাঁকে এক সময় পুরো বিশ্বের মধ্যে সেরা দার্শনিক বলা হত, দুশ বছরের মধ্যে তাঁর নামে এই মন্তব্য করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান রয়েছে এই অসম্পূর্ণতা মানুষকে কখনই কোন কিছুতেই নিখুঁত হতে দেয় না। সুতরাং মানুষ যে বিদ্যা দিচ্ছে সেই বিদ্যাতে যে কোথায় কি গোলমাল আছে আমরা ধরতেই পারব না, ধরার কোন পথও নেই।

বায়োলজিতে এর পরিভাষা ফ্যান্টম্ লিম্বস্। ফ্যান্টম্ লিম্বসের অর্থ হল, কোন দুর্ঘটনায় আমার একটা হাত কাটা গেছে। আমি দেখছি আমার হাত নেই। কিন্তু থেকে থেকে যে হাতটা নেই সেই হাতেই চুলকানি হয়। ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বলব, ডাক্তারবাবু আমার হাত খুব চুলকাচ্ছে। আমার হাতই নেই চুলকাব কি করে! লোকেরা ভাববে হাতটা কেটে যাওয়াতে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তারদের কাছে এই ধরণের শত শত রোগী আসতে থাকে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় কারুর হাত, কারুর পা কাটা গেছে। সবাই এসে বলছে ডাক্তারবাবু বাঁচান আমার পা খুব চুলকাচ্ছে। ডাক্তারবাবু দেখছেন এর পা নেই চুলকাবে কি করে। তখন তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে কোন রকমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।

ভি এস রামচন্দ্রন, খুব নামকরা নিউরো বিজ্ঞানী, তিনি আবিষ্কার করলেন ফ্যান্টম লিম্ব সত্যিই আছে। আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা দেওয়া থাকে। মস্তিষ্কের আশি শতাংশ জায়গা চোখের জন্য দেওয়া হয়েছে। বাকি কুড়ি শতাংশ জায়গা অবশিষ্ট চারটি ইন্দ্রিয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে। তার মধ্যে আবার হাত, পা, ত্বক সব মিলিয়ে বলতে পারি নয়টি ইন্দ্রিয়ের জন্য দেওয়া হয়। সেইজন্য আমরা চোখে যত ভাল কাজ করতে পারি অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে তত ভাল কাজ করতে পারি না। এখন যার হাত কাটা পড়েছে, সেই হাতের মস্তিষ্কের সেল অল্প একটু পড়ে থাকবে। এখন ঐটুকু জায়গাতো ফাঁকা পড়ে থাকবে না। সেই সেল তখন অন্য জিনিষের সঙ্গে জুড়ে দেয়। এটা খুব মজার ব্যাপার আমাদের হাতের যে সেল মস্তিষ্কে রয়েছে তার ঠিক পাশেই আছে আমাদের গালের সেল। যদি বলে আমার হাত চুলকাচ্ছে তখন তার গালটা যদি চুলকে দেওয়া হয় তখন সে বলবে আমার চুলকানি ঠিক হয়ে গেছে। আসলে তার গালটাই চুলকাচ্ছিল। গালের মেমরি সেলের পাশেই আছে হাতের মেমরি সেল। এখন যার হাত নেই, তার গালের মেমরি সেলে চুলকানি উঠেছে কিন্তু মনে করছে তার হাতে চুলকাচ্ছে। বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন মেমরি সেলগুলো কাছাকাছি থাকার ফলে একটা অঙ্গ কেটে বাদ হয়ে যাচ্ছে তখন সেই কাটা অঙ্গের মেমরি সেলটা পাশের সেলটা টেনে নিচ্ছে। ভি এস রামচন্দ্রন এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা করে বার করেছেন এটা কোন পাগলামি নয় সত্যিই এই রকমই হয়। তাই বলে আমার হাত আছে কিন্তু গাল চুলকালে কি হাতের চুলকানি কমে যাবে? না তা হবে না, কারণ আমার মস্তিষ্ক জানে যে আমার হাত আছে। হাত যদি না থাকত তখন এই গোলমালটা হত।

মস্তিষ্ক একটি খুব আজব গোলমেলে মেশিন। মস্তিষ্কের কিছু অংশ জানে আমার এই অঙ্গটা চলে গেছে, কিছু অংশ জানে যায়নি, এর সেল মেমরি ও নিয়ে নিচ্ছে, তার সেল আবার অন্য একটা সেল টেনে নিচ্ছে।

এই অবস্থান থেকেই বেরিয়ে আসে আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। ভি এস রামচন্দ্রনের এই থিয়োরি বিশ্বের চিকিৎসক মহল থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর এই থিয়োরিকে অবলম্বন করে শত শত রোগীকে সারিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটাই কি সত্য? আমাদের জানার কথা নয়, কি করে জানব? জানার কোন উপায় নেই। আগামীকাল আরেকজন বিজ্ঞানী এসে দেখাবেন অন্য কোন কারণ আছে। এটাই হল মানবিক অপূর্ণতা, Human Imperfection। আমার মস্তিষ্কে আজকে যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানে আমি বলছি এটা এই রকম, কিন্তু আগামীকাল আমার এই জ্ঞানটা পাল্টেও যেতে পারে তখন অন্য রকম বলব।

স্বামীজী নিজের গুরুভাইদের চিঠিতে বলছেন ম্যালেরিয়ার উৎস হল জল, জল ফুটিয়ে, ফিল্টার করে খেলে ম্যালেরিয়া হবে না। স্বামীজী এই জ্ঞানটা কোথায় পেলেন? তখনকার দিনের ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেছিলেন, সেটাই স্বামীজী চিঠিতে লিখছেন। আজকে আমরা জানছি ম্যালেরিয়া মশার কামড় থেকে হয়। স্বামীজী কক্ষণ বলবেন না জাগতিক বা লৌকিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছ থেকে নেবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছ থেকে নিতে হবে, চিকিৎসা করাতে হলে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে। কিন্তু মানুষ অসুখ হলে সাধু মহাত্মাদের কাছে গিয়ে বলবে আপনি একটু টোটকা টাটকি দিয়ে দিন। এবার বুঝে নিন অসুখ কি রকম সারবে! এখন স্বামীজীর কথা মত যতই জল ফুটিয়ে খাই তাও ম্যালেরিয়া হতেই থাকবে। এটাই হল Human Imperfection। স্বামীজীর শরীর চলে যাওয়ার দশ বছরের মধ্যে জানা গেল মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। আজকে স্বামীজী থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন অবশ্যই মশারি খাটাইয়া শয়ন করিবে।

অধ্যাত্ম বিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা, যে বিদ্যার উপর আমার আপনার সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই এখানে দেখাচ্ছেন এই বিদ্যাতে Human Imperfection নেই কারণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা থেকে এই বিদ্যা এসেছে। ব্রহ্মা কোথায় পেয়েছিলেন? তিনি ঈশ্বরের সন্তান, সরাসরি ভগবান থেকে পেয়েছিলেন, ভগবানের Imperfection থাকতে পারে না। ভগবানের Imperfection থাকলে তিনি আর ভগবানই থাকলেন না। ব্রহ্মা থেকে অথর্বা, অথর্বা থেকে অঙ্গির। তারপর এই অধ্যাত্ম বিদ্যা কে পেলেন? *স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ*। ভারদ্বাজ নামে এক মুনি ছিলেন, সেখান থেকে একটা গোত্র শুরু হয়। গোত্র দুই রকমের হয়। বংশের পুরুষ সন্তান পর পর যে পরম্পরায় নিয়ে চলছে সেখানে একটা গোত্র হয়। আবার অনেক সময় বংশের গোত্রটাকে পাল্টে নেয়। কোন ঋষি বা মুনির শিষ্য হয়ে গেলে তখন সে সেই মুনি বা ঋষির গোত্রে চলে গেল। আমি এনার শিষ্য হলাম, আজ থেকে আমার এই গোত্র। গোত্র দুই ভাবেই চলে। কিন্তু যিনি গোত্র পাল্টে নিলেন এর পর থেকে এটাই তাঁর গোত্র হয়ে যায়। শ্রীমা খুব দুঃখ করে বলছেন 'এমন পোড়ার দেশ যে দেশে মেয়ে জন্ম নিতে না নিতেই বলে এটাকে পর গোত্র করে দাও' মানে বিয়ে দিয়ে দাও।

এখানে ভারদ্বাজ একজন গোত্র কর্তা, এনার থেকে একটা গোত্র শুরু হয়েছিল। এই ভারদ্বাজ গোত্রে সত্যবহ নামে কোন এক ঋষি ছিলেন। তিনি ভারদ্বাজের পুত্র ছিলেন, নাকি শিষ্য ছিলেন সেটা এখানে পরিষ্কার করে বলা নেই। *ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্* - ভারদ্বাজ বংশের সত্যবহ তিনি আবার কোন এক সময় তাঁর পুত্র বা শিষ্য অঙ্গিরসকে এই বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। *পরাবরাম্* - মানে উপর থেকে নীচে এই বিদ্যা পরম্পরায় এইভাবে এসেছে, ব্রহ্মা হলেন সবার উপরে, তাঁর থেকে তাঁর পুত্র অথর্বা, অথর্বা থেকে অঙ্গির। *পরাবরমের* আবার দুটো অর্থ, একটা হল উপর থেকে নীচে। দ্বিতীয় অর্থ, পর ও অবর মিলে *পরাবরম্*, এই বিদ্যাতে পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা এই দুটো জড়িয়ে আছে। এটি এমন বিদ্যা যে বিদ্যাতে উৎকৃষ্ট বিদ্যা আর সাধারণ বিদ্যা দুটো মিলে আছে, সেই বিদ্যাটা তিনি দিলেন। উপর থেকে নীচে মানে খারাপ অর্থে বলা হচ্ছে না, বাবা থেকে ছেলে, আবার সেই ছেলে বাবা বা আচার্য হওয়ার পর তাঁর ছেলে বা শিষ্যকে দিলেন, এইভাবে পর পর নীচের দিকে নেমে এসেছে। আর অন্য অর্থ হতে পারে পর ও অবর, উৎকৃষ্ট বিদ্যা আর সাধারণ বিদ্যা দুটোই এক সঙ্গে দিলেন। সংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রথম ঋষিকে বলা হচ্ছে অঙ্গির আর দ্বিতীয় ঋষিকে বল হচ্ছে অঙ্গিরা। তিন নম্বর মন্ত্র থেকে মুণ্ডোকপনিষদ ঠিক ঠিক শুরু হচ্ছে।

শৌনক হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ - কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।।১/১/৩।।

(গৃহস্থদের অগ্রগণ্য শৌনক বিধিপূর্বক অঙ্গিরসের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন 'কোন্ বস্তুটি জানলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়'।)

শৌনক নামে একজন বড় ঋষির নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। ব্যাসদেবের শৌনক নামে একজন বড় শিষ্য ছিলেন। এই শৌনক ঋষি ব্যাসদেবের শিষ্য হওয়ার কথা নয়। কারণ ব্যাসদেবের সময়ই বেদকে বিভাজন করে সুসংগঠিত করা হয়েছিল, তাই এই শৌনক ঋষি ব্যাসদেবের অনেক আগের কোন ঋষি। তখনকার দিনে একই নামের একাধিক ঋষির নাম পাওয়া যায়, তবে এগুলো একই নামের নাকি গোত্র রূপে ব্যবহার করা হত বোঝা মুশকিল। উপনিষদে যেগুলো নাম বলে বোধ হয় আসলে সেগুলো গোত্রও হতে পারে।

শৌনক হ বৈ মহাশালঃ, মহাশাল মানে হয় মহাগৃহস্থ বা শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ। আগে বলা হয়েছিল, গৃহস্থের মধ্যে যদি এই বিদ্যা থাকে, ঐ লিঙ্গ যদি দেওয়া থাকে তার মানে এই নয় যে সেই গৃহস্থ এই বিদ্যার জ্ঞাতা, তিনি শুধু এই বিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মহাগৃহস্থের মধ্যে একটা অর্থ হতে পারে তিনি আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে গৃহস্থদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে তিনি খুব ধনী সচ্ছল গৃহস্থ ছিলেন। এখানে প্রথম অর্থটাই হওয়ার কথা, তা নাহলে তাঁর কাছে এই বিদ্যা থাকত না। শালা মানে আবার স্থান, যেমন পাঠশালা। শালা মানে তাঁর হয়ত একটা বড় বাড়ি ছিল, সেই কারণে হয়ত *মহাশালঃ* বলা হচ্ছে।

এখানে বলছেন *বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ*। *পপ্রচ্ছ* মানে বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করা, অঙ্গিরসের কাছে বিধিপূর্বক উপস্থিত হয় শৌনক বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। এখানে এমনি একটা কিছু কৌতহূল হল আর গিয়ে জিজ্ঞেস করছে তা নয়। ঠাকুরকে যেমন একজন গিয়ে বলছে 'মহাশয়! আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন তো'। শৌনক মুনি কিন্তু সমাধিটুকু শিখিয়ে দিনতো ঐভাবে বলছেন না। প্রথমে বলা হচ্ছে *বিধিবৎ উপসন্নঃ*, আচার্য বিধিবৎ উপসন্নের দুটো অর্থ করছেন। প্রথমটা বলছেন *যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ*, শাস্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছে। এখানে আচার্য একটা শব্দ নিয়ে এসেছেন *মধ্যদীপিকান্যায়ার্থং*, মধ্যদীপিকান্যায় ন্যায় শাস্ত্রের অনেক ন্যায়ের মধ্যে একটা ন্যায়। ন্যায় মানে যেমনটি। যেমন কাকতালীয় ন্যায়। তাল এমনিতে গাছ থেকে খসে পড়ে না, কিন্তু এমনই কপাল একটা কাক এসে তালে বসতেই তালটা খসে পড়ে গেছে। যেটা হবার নয় সেটাই যদি হয়ে যায়, আর যেটা হবার কথা সেটা হল না তখন বাংলায় বলবে কাকতালীয় ব্যাপার। সেখান থেকে ন্যায় শাস্ত্রের একটা নিয়ম করা হয়েছে কাকতালীয় ন্যায়। আসলে কাকতালীয় ন্যায়ে নিয়মের অপবাদ করা হচ্ছে, যেটা নিয়ম নয় সেটাই বাই চান্স হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি *মধ্যদীপিকান্যায়*। আগেকার দিনে রাতে তেলের প্রদীপ ব্যবহার করা হত। ঘর আছে ঘরের বাইরে উঠান আছে, তেল যাতে সাশ্রয় হয় সেইজন্য প্রদীপটা ঠিক মাঝখানে এমন ভাবে রেখে দেওয়া হত যার ফলে আলো ঘরের ভেতরেও যাবে আর কিছু আলো উঠোনেও যাবে। একটা প্রদীপের আলোতে দুদিকেই আলোর ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। মধ্যদীপিকান্যায় মানে হল মাঝে যদি একজন কোন ঋষির নাম বলে দেওয়া হয় তাহলে তাঁর আগের জনকেও বোঝাবে তাঁর পরের জনকেও বোঝাবে। এখানে আচার্য তাই বলছেন শাস্ত্র সম্মতভাবে গুরুর কাছে যাওয়ার এই পরম্পরা আগে থেকেই চলে আসছে। আবার অনেক আচার্য বলবেন এখান থেকেই পরম্পরাটা শুরু হচ্ছে। কিন্তু আচার্য এই ধরণের কোন ব্যাখ্যা করছেন না। যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করান তাঁরা অনেক সময় নিজেদের মত ব্যাখ্যা দেন।

আচার্য শঙ্কর বলছেন *বিধিবৎ উপসন্নের* অর্থ দুটোই হতে পারে। আচার্য এই ধরণের সাধারণ জিনিষের উপর জোর দেননা। এমন হতে পারে সেখান থেকেই এই পরম্পরা শুরু হল। কি পরম্পরা? গুরুর কাছে বিধিবৎ উপস্থিত হওয়া। বিধিবৎ মানে শাস্ত্রে যেভাবে গুরুর কাছে যাওয়ার বিধি বলে দেওয়া হয়েছে। গীতায় এই বিধিকে সংক্ষেপে খুব সুন্দর করে ভগবান বলে দিচ্ছেন *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেয় সেবয়া*। জানার আগ্রহ নিয়ে গুরুর কাছে গিয়ে আগে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁকে লম্বা একটা প্রণাম করবে আর বিভিন্ন ভাবে

তাঁর সেবা করতে থাকবে। তারপরেই তুমি প্রশ্ন করতে পারবে। মুণ্ডকোপনিষদেও পরে বলবে গুরুর কাছে কিভাবে যাবে – *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্*। সমিধ কাষ্ঠ নিয়ে গুরুর কাছে যাবে। তখনকার দিনে যজ্ঞই ছিল প্রধান কর্ম, যজ্ঞের বাইরে অন্য বিশেষ কিছু করতেন না। যজ্ঞ করতে সমিধ কাঠের খুব দরকার হত, তাই শিষ্য গুরুর সেবার জন্য সমিধ কাঠ নিয়ে গুরুর কাছে হাজির হত। এরপর বাকি গুণাবলীকে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে শিষ্যের মধ্যে এগুলো আছে, শ্রদ্ধা, বিনম্রতা, বিশ্বাস এগুলো সব থাকতে হবে। কিন্তু মূল কথা হল শিষ্যের জানার আগ্রহ থাকা চাই। জানার আগ্রহ যদি না থাকে তাহলে তুমি গুরুর কাছে কেন যাবে! আর *প্রণিপাতেন*, গুরুর কাছে গিয়ে তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয় প্রণাম করবে, এই ভাবে প্রণাম করা মানে বোঝা যাচ্ছে শিষ্যের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিনম্রতা আছে। গুরু তো তোমাকে বিদ্যা দেবেন কিন্তু ঐ বিদ্যা নেওয়ার যোগ্যতা কি তোমার আছে? এই যোগ্যতা থাকার জন্য *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন* ইত্যাদি প্রাথমিক শর্ত গুলো নির্ধারিত করে দেওয়া হচ্ছে। বিনম্রতা, জানার আগ্রহ আর সেবা করার ক্ষমতা এই তিনটে গুণ না থাকলে অধ্যাত্ম বিদ্যা পাঠ শুরু করা যাবে না। ঠিক তেমনি গুরুরও কিছু গুণাবলী থাকতে হবে – *শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, সব বেদ জানবেন আর তাঁর মন সব সময় ব্রহ্ম চিন্তনেই সংলগ্ন থাকবে। স্বামীজী বলছেন যে গুরু অর্থের বিনিময়ে অধ্যাত্ম বিদ্যার শিক্ষা দেয় সেই গুরুর কাছে কখনই যাবে না।

এখানে এইভাবে গুরুর সমীপে উপস্থিত হওয়াকেই বলা হচ্ছে *বিধিবদুপসন্নঃ*। শিষ্য গিয়ে গুরুকে প্রশ্ন করার আগে বিধিবৎ উপস্থিত হচ্ছে। নিজের মত হঠাৎ গিয়ে গুরুকে প্রশ্ন করছে না। বিধিবৎ যখন বলা হচ্ছে তখন এটাও বোঝাচ্ছে এই প্রথা আগে থেকেই ছিল। এত গুলো কথা বলার অর্থ হল, শুধু সম্প্রদায় বিদ্যা হলে হবে না, তোমাকে বিধিবৎ গুরুর কাছে যেতে হবে। তুমি যে মনে করবে তাঁর কাছে গিয়েই উপনিষদ পড়ে সব জেনে যাব, তা হবে না। ওটা টিয়া পাখির মত জানা হবে। কম্প্যুটারের ইন্টারনেটে সব উপনিষদ পাওয়া যাচ্ছে, তাই বলে কি সব কম্প্যুটার ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছে! শুধু বিদ্যা অর্জনের জন্যই নয়, গুরুর কাছে যখনই দীক্ষা নিতে বা প্রণাম করতে যাবে তখন এভাবেই যেতে হবে, বিনম্র চিত্তে যেতে হবে। যদিও মুণ্ডকোপনিষদে বিধিবৎ বলা হচ্ছে কিন্তু এই একই নিয়ম প্রত্যেক উপনিষদেই প্রযোজ্য হবে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তিন দিন অভুক্ত থেকে জল স্পর্শ না করে যমরাজার অপেক্ষায় পরেছিলেন। যমরাজ খুশি হয়ে যখন নচিকেতাকে তিনটে বর চেয়ে নিতে বললেন, তখন তৃতীয় বরে নচিকেতা যেটা চাইলেন যমরাজ বললেন এই বর দেওয়া যাবে না, তার বদলে তুমি অন্য কোন বর চেয়ে নাও। যমরাজও নচিকেতাকে পরীক্ষা করে ঘশে মেজে দেখে নিচ্ছেন এর পাত্রতা আছে কিনা। মাটির ঢেলাতে পাত্রতা থাকে না, কিন্তু কুমোরের যে ঘটি তাতে পাত্রতা থাকে, ওর মধ্যে জল ধরা যায়। এই পাত্রতা তৈরী করতে হয়। যদি বলে আমার পাত্রতা আছে তখন গুরু পরীক্ষা করে দেখে নেন সত্যিকারের পাত্রতা আছে কিনা।

এই ভাবে *বিধিবৎ উপসন্নঃ* হয়ে শৌনক অঙ্গিরা ঋষিকে প্রশ্ন করছেন *কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*। মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিটি বেদান্তের প্রাণ। কুমোরের বাড়িতে হাজার রকমের মাটির জিনিষ তৈরী করা থাকে, ঘটি, বাটি, কলসি, গ্লাশ, হাড়ি। আমি যদি আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি জিনিষকে জানতে চেষ্টা করি তাহলে আমি কোন দিন সব কিছু জানতে পারব না। ঠিক তেমনি কলকাতা শহরে হাজার হাজার গয়নার দোকান, সব দোকানে হাজার হাজার রকমের ডিজাইনের গয়না সাজান আছে। এখন প্রত্যেকটি গয়নাকে বিচার করে আমি কি করে বুঝব এগুলো আসল সোনার গয়না না নকল সোনার গয়না। আগেকার দিনে গিনিকে দাঁতে চাপ দিয়ে বুঝতে পারত এর মধ্যে কতটা সোনা আর কতটা খাদ মেশান আছে। এই সমস্যা অর্কিমিডিসের কাছেও এসেছিল। রাজার জন্য সোনার মুকুট তৈরী করা হয়েছে। রাজার সন্দেহ হয়েছে এতে সোনা কম দেওয়া হয়েছে। অর্কিমিডিসের কাছে পাঠান হয়েছে। তিনি স্নান করতে গিয়ে ল অফ বোয়েনসি আবিষ্কার করে দেখলেন আলাদা আলাদা জিনিষের আলাদা রকমের displacement হবে। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে ধরে ফেললেন মুকুটে খাদ মেশান আছে। একমাত্র ল অফ বোয়েনসির মারফৎ তিনি সব বার করে দিলেন। ল অফ বোয়েনসিতে কোন বস্তুকে যদি জলের মধ্যে রাখা হয় তখন জল সেটাকে ঠেলতে থাকে, বস্তুর যতটা ওজন ঠিক ততটা ঠেলবে না। এর মধ্যে

ঘনত্ব, পরিমাণ অনেক কিছু দিয়ে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা একটা অংশকে জেনে নিলে বাকিটা সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেবেন। এখন ইলেক্ট্রিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে সোনার গয়নাতে কতটা খাদ আছে বলে দেওয়া যায়। একবার যদি ইলেক্ট্রিসিটির প্রপার্টি বুঝে যাই আর সোনার প্রপার্টিটা বুঝে যাই তারপরের হিসাব গুলো বার করতে আর কোন সমস্যা হবে না।

বেদান্ত ঠিক এই একই কথা বলে। *কস্মিন্নু ভগবো*, গুরুকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হচ্ছে, হে ভগবান! কোন জিনিষটাকে জানলে এই জগতের সব কিছু জানা যায়? কোন বিদ্যাকে জানলে সব বিদ্যাই জানা হয়ে যায়? কেন এই পংক্তিকে বেদান্তের প্রাণ বলা হচ্ছে? ব্রহ্মবিদ্যাকে জানলে সব কিছুই জানা হয়ে যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলছেন মাটির যে এত রূপ এগুলো মিথ্যা, আসল হল মাটি। তুমি যদি মাটিকে জেনে যাও তাহলে মাটির যত রূপ আছে সবটাই জেনে যাবে। ঠিক তেমনি আমি সোনা জিনিষটাকে যদি বুঝে নিই তখন কলকাতার হাজার হাজার দোকানের হাজার রকমের ডিজাইনের গয়নাকে একটা একটা করে জানতে হবে না। এই জগতে এত রকমের বিদ্যা আছে, এত বিদ্যা কি করে জানব? আপনি আমাকে সেই বিদ্যাটা বলুন যে বিদ্যাটা জানলে সব বিদ্যাকেই জানা যাবে। এই ভাবটা আমাদের বেদের খুব পুরনো ভাব, কোনটা জানলে সব কিছু জানা যায়। সেইজন্য বলছেন মাটিই সত্য, মাটির বাসনগুলো শুধু নাম ও রূপ মাত্র।

আচার্য '*কস্মিন্নু*'র তিনটে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। প্রথম হতে পারে বিতর্ক ভাবে প্রশ্ন করছে। বিতর্ক ভাবেও প্রশ্ন করা যায়, এটাও প্রশ্ন করার একটা পদ্ধতি। দ্বিতীয় হতে পারে, কোথাও কারুর কাছে শুনেছে যে, এই রকম একটা বিদ্যা আছে যেটা জানলে সব বিদ্যাই জানা যায়। এটা জেনেই শৌনক জিজ্ঞেস করছেন। আচার্য সব কিছু অর্থের সম্ভবনাকে নিয়ে বেঁধে দিচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে এসেছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাটি বড়দের মুখে শুনেছে এখানে একজন পরমহংস আছেন, তিনি লোকদের উপদেশ দেন। বাচ্চাটি গিয়ে বলছে 'তুমি পরমহংস? আমাকে কিছু উপদেশ দাও না'। ঠাকুর শুনে একটু হাসলেন। রামলালকে ডেকে বললেন 'ওরে রামলাল! ঐ তাকের উপর কিছু উপদেশ রাখা আছে একে কিছু উপদেশ দে তো'। তাকে সন্দেশ রাখা ছিল। রামলাল বাচ্চাটির হাতে একটা সন্দেশ দিয়েছে। ঠাকুর বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করছে 'উপদেশ কেমন'। বাচ্চাটিও বলছে 'খুব ভাল উপদেশ'। সেই বাচ্চাটি বড় হয়ে খুব দুঃখ করে বলছে 'আমি ঠাকুরের কাছে উপদেশ চাইতে গিয়েছিলাম, আর ঠাকুর কেমন সন্দেশ খাইয়ে আমাকে ভুলিয়ে দিলেন'। আচার্যও বলছেন এখানে তাই হতে পারে, শৌনক কোথাও শুনেছিলেন যে এমন কোন বিদ্যা আছে যেটা জানলে সবটাই জানা যায়। তৃতীয় ব্যাখ্যা সমস্ত জগত জুড়ে সবার মধ্যে যে ভেদ ভাব, আমি আপনি সবাই সবার থেকে আলাদা আলাদা ভাবছি। নারী আলাদা, পুরুষ আলাদা এই যে সবাই সবার থেকে আলাদা, এই আলাদা ভাবটাকে দূর করে একটা একত্বে আনা যায় কিনা। স্বামীজী বেদান্তের উপর ভাষণ দিতে গিয়ে বলছেন unity in diversity। বহুর মধ্যে সেই এক। ব্রহ্মই আছেন কিন্তু মায়ার আবরণ যখন এসে যায় তখন সব কিছু আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে। এটা কি করে হচ্ছে? এর জন্যও *কস্মিন্নু* বলা হতে পারে। *কস্মিন্নু*কে সংস্কৃতের ব্যাকরণের দিক দিয়ে দেখলে মনে হতে পারে যেন অনেকগুলো বিদ্যা আছে তার মধ্যে কোন্ বিদ্যাটা জানলে সব বিদ্যাকে জানা যায়।

আচার্য ব্যাকরণ দিক থেকে যাতে কোন জটিলতা না হতে পারে তাই খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন। আচার্য সরাসরি বলে দিচ্ছেন ব্যাকরণের দিক দিয়ে এই প্রশ্নটা হয় না। এই মন্ত্রগুলো যাতে দীর্ঘায়িত না হয় সেই কারণে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। *ন, অক্ষরবাহুল্যাদায়াসভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব* – যখনই মন্ত্রে অক্ষর বেশী হয়ে যাবে তখন খাটনিটাও বেড়ে যাবে। শিষ্যদের মন্ত্রগুলো মুখস্ত করতে হত, শব্দ যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন মুখস্ত করার পরিশ্রমও বেড়ে যাবে, সেইজন্য সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এখানে *কস্মিন্নু* না বলে যদি সোজা বলে দেওয়া হত তাহলে ব্যাখ্যা করে বলতে হত অনেকগুলো বিদ্যা আছে কিন্তু এর মধ্যে একটা বিদ্যাই আছে যেটা জানলে সব বিদ্যাই জানা যায়, সেই বিদ্যাটা বলুন। এত ব্যাখ্যা করে যদি বলা হত তাহলে মন্ত্রটা লম্বা হয়ে যেত। মুণ্ডকোপনিষদ অথর্ববেদের অন্তর্গত আবার মুণ্ডকোপনিষদকে অনেক সময় মন্ত্রোপনিষদও বলা হয়।

মন্ত্রোপনিষদের একটা বৈশিষ্ট্য হল এখানে গদ্য ব্যবহার করা হয়। কঠোপনিষদ, ঈশাবাস্যোপনিষদ পুরোপুরি ছন্দে লেখা হয়েছে। যে উপনিষদে গদ্য ব্যবহার হয় সেই উপনিষদকে বলা হয় মন্ত্রোপনিষদে, যেমন কেনোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ ইত্যাদি। অল্প বয়সী শিষ্যদের মুখস্ত করতে হত বলে গদ্যে মন্ত্রগুলোকে খুব সংক্ষেপে বলতেন। খুব সংক্ষেপে বলার জন্য অনেক সময় শব্দের অর্থ অন্য রকম হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। সেইজন্য আচার্যের কাছে উপনিষদের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতে হয়। চতুর্থ মন্ত্র থেকে অঙ্গিরা এবার শৌনককে উত্তর দিতে শুরু করছেন। মুণ্ডকোপনিষদ শুরু হয়েছিল ব্রহ্মা থেকে, ব্রহ্মা থেকে অথর্বা, অঙ্গির, সত্যবহ বা ভারদ্বাজ, অঙ্গিরা এবং অঙ্গিরা শৌনককে বলছেন। এখানে আমরা অঙ্গিরার কাছ থেকে পাচ্ছি।

তস্মৈ স হোবাচ – দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি –পরা চৈবাপরা চ।।১/১/৪।।

(অঙ্গিরা শৌনককে বললেন ‘ব্রহ্মবিদ্‌রা বলেন, পরা ও অপরা এই দুটি বিদ্যা জানতে হয়’)

অঙ্গিরা শৌনককে বলছেন, এই জগতে জানার মত দুটি বিদ্যা আছে আর এই দুটি বিদ্যা সবাইকে জানতে হয়। এটা আমার কথা নয়, যাঁরা ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্ম বিদ্যায় যাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা বলে গেছেন। এই কথা আমি পরম্পরাতে পেয়েছি। কি সেই দুটি বিদ্যা? *পরা চৈবাপরা চ* – পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। যদিও এখানে বলছেন দুটো বিদ্যা জানার মত, পরের মন্ত্রে দুটো বিদ্যা কি কি বলবেন। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল *বেদিতব্যে*, জানার যোগ্য, শুধু জানার যোগ্যই নয় জানতে হবে। অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা ঠাকুরের দৃষ্টান্তকে টেনে এনে বলেন এত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে কি লাভ, ঠাকুর তো কোন শাস্ত্র পড়েননি। ঠাকুরকেও একজন বলছেন – আপনি মশাই কি জানেন, আপনি তো কিছুই পড়েননি। ঠাকুর বলছেন আমি শুনেছি কত। ঠাকুর শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেননি এটা দেখানর জন্য, পড়াশোনা না করলেও হয়। কিন্তু এটাই ঠাকুরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নয়। অন্য দিকে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদেরকেও পড়াচ্ছেন। এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন *দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে*, দুটো বিদ্যাই তোমাকে জানতে হবে। এর পরের মন্ত্রেই বলে দেবেন কি কি পড়তে হবে। কেন পড়তে হবে? এই ব্যাপারে প্রথমে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

যখন বলা হচ্ছে ঈশ্বর, যখন বলা হচ্ছে ব্রহ্ম, যখন বলা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আমি পুরো ব্যাপারটা যদি না পড়ে থাকি, না জেনে থাকি তাহলে আমি কোন্ জিনিষটাকে নিয়ে চিন্তা করব। শ্রবন-মনন-নিধিদ্যাসন্ করে যখন একটা মীমাংসায় বা নিষ্কর্ষে বা সমাধানে পৌঁছাতে চাইছি তার আগে সমস্যাটাকে বুঝতে হবে। সেখানে আমাকে দেখাতে হবে এতগুলো মত আছে আর সব কিছুর নিষ্কর্ষ এই – হাজার কথার এক কথা হল এই। কিন্তু তার আগে ঐ হাজার কথা আমাকে জানতে হবে। একবার একটি আশ্রমে সাধু সন্ন্যাসীদের শাস্ত্র পড়াবার জন্য এক পণ্ডিতকে আনা হয়েছিল। কয়েক দিন পড়ানোর পর পণ্ডিত মশাই বললেন আপনাদের দ্বারা শাস্ত্র অধ্যয়ণ হবে না। কেন হবে না? কারণ আপনারা পূর্বপক্ষ জানার আগেই সিদ্ধান্তকে জেনে গেছেন। পূর্বপক্ষ মানে আপত্তি। প্রথমে আসে শাস্ত্র বাক্য, শাস্ত্র বাক্যের পরে আসে পূর্বপক্ষ, এই শাস্ত্র বাক্যে আপত্তিজনক কি কি আছে বা থাকতে পারে, কোথায় কোথায় এর বিরুদ্ধে বলা যায়। এই দুটোর পর আসে সিদ্ধান্ত। কথামৃত হল সিদ্ধান্ত বাক্য। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নে যত রকম সিদ্ধান্ত হতে পারে তার সব কিছু কথামৃতে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ভক্ত, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রথম দিন থেকে কথামৃতই পড়ে। সিদ্ধান্তগুলো সবাই আগে জেনে গেল। এরপর সবাই বলছে কোন্ শাস্ত্রে কি আছে? কি করে বুঝবে কোন্ শাস্ত্রে কি আছে! আগেকার দিনে অঙ্ক বইয়ে কোন উত্তর দেওয়া থাকত না। এখন তো প্রত্যেক চ্যাপ্টারের শেষেই উত্তর দেওয়া থাকে। ছাত্ররা অঙ্ক করার আগে উত্তরগুলো মুখস্ত করে রাখে। আর পরীক্ষকরা খাতায় উত্তর দেখে নম্বর বসিয়ে যাচ্ছে। ফলে অঙ্ক কেউ শিখতে পারছে না। ভক্তদের ক্ষেত্রে ঠিক এই সমস্যাটা হয়। সবাই সিদ্ধান্ত বাক্য শিখে নিয়েছে। কি সিদ্ধান্ত বাক্য? ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে, শিব কে? বলে দিল তিনি সর্বলোকব্যাপী। সিদ্ধান্ত জানা হয়ে গেল। কিন্তু লোক কি, সর্ব কি, শিব কি এর সবটাই অজানা থেকে গেল। ফলে কি হয়? তুই যে কলু সেই কলুরে। একজন তেলি ছিল, গুরু কৃপায় সে এখন বিরাট বড়লোক হয়ে গেছে। আনন্দে সে এখন বাড়িতে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেখানে তার গুরুকেও আমন্ত্রন করে নিয়ে এসেছে। সে এখন

আনন্দে দু বাহু তুলে নাচছে – আমি কি ছিনু আর কি হনু। গুরু তখন তাকে বলছে তুই যে কলু ছিলি সেই কলুই আছিস। এই যে কত লোক রোজ হাজার হাজার জপ করছে কিন্তু কারুর কিছুই হচ্ছে না। কেন? কারণ গোড়ায় যে প্রস্তুতিটা নেওয়ার দরকার ছিল সেই প্রস্তুতিটাই নেওয়া হয়নি। *দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে*, দুটো বিদ্যা জানার মত, দুটোকেই জানতে হবে। গোলমালটা এইখানেই হয়ে আছে। যে বিদ্যাটা জানার কথা ছিল সেই বিদ্যাটাই জানা হয়নি। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রই হল *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, আমরা এইবার ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা করব। এইবার প্রশ্ন করা হচ্ছে এখানে অথাতো কেন আনা হয়েছে? তার মানে এর আগে আগে কিছু হয়েছে। ঠাকুরকে যেমন একজন এসে বলছে মশাই আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। এইভাবে হয় না। বরং তাকে বলতে হয় আমি প্রস্তুত এবার আপনি শেখান। প্রস্তুত মানে, আগে আগে কিছু হয়ে গেছে। কি কি হয়ে গেছে?

হিন্দু ষড়দর্শনের কোথাও না কোথাও ব্রহ্মসূত্রকে নিয়ে আসা হয়। আর যাঁরা বেদান্তী তাঁদের ব্রহ্মসূত্রের উপর অবশ্যই ভাষ্য বলতে হবে। ব্রহ্মসূত্রের উপর যতক্ষণ ভাষ্য না লেখা হবে ততক্ষণ সেটা বেদান্তের কোন দর্শন হবে না। তখন এই ব্রহ্মসূত্রের উপর অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেন। আচার্য ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলবেন যাঁরা বিধিবৎ মানে ঠিক ঠিক ভাবে বেদ উপনিষদাদি অধ্যয়ণ করে নিয়েছেন। কিন্তু মীমাংসকরা তাঁরা বলবেন উপনিষদের মন্ত্রগুলো উপাসনার জন্য। কর্মকাণ্ডীদের মতে এগুলো কাদের জন্য? যজ্ঞ-যাগ করা হয়ে গেছে, সংসার ধর্ম পালন করা হয়ে গেছে, নাতি-পোতা হয়ে গেছে, বয়স হয়ে গেছে, শক্তি কমে গেছে এখন আর যজ্ঞ-যাগ করার ক্ষমতা নেই, দাঁত পরে গেছে, মাংস খেতে পারবে না, এবার বসে বসে ব্রহ্ম চিন্তন কর। আর কারা উপনিষদের মন্ত্র দিয়ে উপাসনা করবে? ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছে কিন্তু কানা, খোড়া, বোবা এরা যজ্ঞ-যাগ করতে পারত না বলে বসে বসে উপাসনা করবে। বেদান্তের মূল প্রতিপক্ষ হল কর্মকাণ্ডীরা, কর্মকাণ্ডীর আরেকটা নাম পূর্বমীমাংসক, বেদের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে যুক্তি তর্কের দিক থেকে এরা সব থেকে শক্তিশালী। আচার্য শঙ্কর তখন আবার এদের যুক্তি তর্কগুলিকে কেটে তছনছ করে দেবেন। উপনিষদের বিদ্যা কাদের জন্য বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন যাঁরা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু, যাঁদের মধ্যে সেই তেজ আছে, আমি পরমাত্মাকে জানতে চাইছি। আচার্য বেদ উপনিষদ থেকেই উদ্ধৃতি নিয়ে এসে দেখাবেন উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র বুড়োবুড়িদের জন্য নয়, কানা, খোড়া বোবাদের জন্য নয়, যার রক্তে তেজ আছে। স্বামীজীও এই কথাই বলছেন যাদের মধ্যে রক্তের তেজ আছে তারা ত্যাগের পথে আসবে। কিন্তু তার আগে বিধিবৎ বেদ বেদাঙ্গ যদি না পড়ে থাক তাহলে তুমি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ধারণা করবে কি করে! তার আগেই সবাই বলছে আমি ব্রহ্মজ্ঞান চাই, আমি ঠাকুরের দর্শন চাই। কিন্তু তার আগে ব্রহ্ম কি, ঠাকুর কে এগুলো বোঝার চেষ্টা তো করতে হবে। আমরা বেদ পড়িনি, বেদাঙ্গ পাঠ করিনি, উপনিষদ অধ্যয়ণ করিনি, আমরা কি করে গুরুর কাছে শাস্ত্রের মীমাংসা করব। সেইজন বেদান্তের আরেকটা নাম উত্তরমীমাংসা।

যাঁরাই সাধনা করছেন সবারই আজ হোক কাল হোক কোন একটা স্তরে গিয়ে তাঁদের মনে সংশয় আসবেই। ঠাকুরের মনেও সংশয় উঠেছিল। এমনকি যখন তাঁকে অবতার বলা হচ্ছে সেই সময়ে নরেন এসে যখন ঠাকুরের অনুভূতি গুলিকে মনের ভ্রম বলছে তখন ঠাকুরও মার কাছে দৌড়ে চলে যাচ্ছেন। পরে ঠাকুর নিজেও বলছেন সিদ্ধির আগে একটা অবস্থা আসে যখন মনে সংশয় উদয় হয়। উচ্চতর সাধকদের ক্ষেত্রেই যখন এই অবস্থা হতে পারে তখন আমাদের মত সাধারণদের কি আর কথা! আমি একটা দিব্য ভাব নিয়ে চলছি, হঠাৎ কেউ একজন যুক্তিবাদী, যে ভালো বিজ্ঞান বোঝে, সে আমাকে এমন কিছু একটা বলে দিল যে তার কথা শুনে আমার পুরো আস্থাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে রাজা মহারাজকে স্বামীজী কিছু কথা বলেছিলেন। ঠাকুর শোনার পর স্বামীজীকে বলছেন – রাখালের ভেতরে ভক্তির ভাব, অদ্বৈতের কথা বলে তার ভক্তি ভাবকে নষ্ট করিস না। এগুলো বোঝা খুব কঠিন, কারণ আমাদের মধ্যে আদপে কোন ভাবই নেই। কাঁচা মনের অধিকারীকে তার ভাবের বিরোধী কিছু কথা বললে তার ভাবটা নড়ে যায়, নড়ে গিয়ে সংশয় এসে যায়, সংশয় এসে গেলে সব কিছুকে উপড়ে ফেলে দেয়, ছ'মাসের গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত। এখন আবার তাকে অনেক অপেক্ষা করতে হবে, হয়ত নতুন জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সেইজন্য পূর্বপক্ষ জানতে হয়, শাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ণ করে যেতে হয়। শুধু জানার জন্য শাস্ত্র পাঠ সেটা অন্য ব্যাপার।

কিন্তু যদি আমি মনে করি আমাকে সাধনা করে এগোতে হবে, আমাকে বুঝতে হবে, তাহলে নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে যেতে হবে। দিনে নিয়মিত ভাবে দু থেকে তিন ঘণ্টা শাস্ত্র অধ্যয়ন যদি না করা হয়, চিন্তন যদি না করে তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে কোন দিন এগোতে পারবে না। শাস্ত্র না পড়া থাকলে মীমাংসাতে পৌঁছান যায় না। আর পূর্বমীমাংসকরা যুক্তি তর্ক দিয়ে যে আপত্তি গুলো নিয়ে আসবে সেগুলো আমাদের শাস্ত্র ভালো করে পড়া না থাকলে উল্টে ফেলে দেবে।

যদিও আমাদের আগেকার মত ছিল যজ্ঞাদি করার পর, গৃহস্থ ধর্ম পালন করার পর, বাণপ্রস্থি পালন করার পর তোমার আর কিছু করার নেই তখন তুমি উপাসনা করবে। কিন্তু আচার্য এটাকে সম্পূর্ণ ভাবে পাল্টে দিলেন। উপনিষদেও আছে *যদহরেব বিরজে তদহরেব প্রব্রজেৎ*, যে মুহুর্তে তোমার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়ে যাবে তখনই তুমি ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়। তারপর কি করবে? চিন্তন একমাত্র ঈশ্বরেরই করবে, বয়স হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। ঠাকুরও বলছেন কখন কখন দেখা যায় ফল আগে ফুল পরে, যেমন লাউ কুমড়ো। তার মানে তাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আগে হয়ে যায়, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ পরে হয়। যেমন ঠাকুর, সব রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়ে যাওয়ার পর তিনি শাস্ত্র শুনছেন। এগুলো ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম দিয়ে সমগ্রকে বিচার করতে নেই। মূল কথা হল আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেতে হলে শাস্ত্র সবাইকে পড়তে হবে আর চিন্তন করে করে তার মীমাংসায় পৌঁছাতে হবে। শাস্ত্রের পাঁচটা বিষয়কে জানতেই হবে। আমি যে মীমাংসায় পৌঁছাচ্ছি এটা আমি কিভাবে পৌঁছালাম দেখাতে হবে। যেমন আমরা আগে থাকতেই কথামৃত পড়েছি, স্বামীজীর রচনাবলী পড়েছি, গীতা পড়েছি তখন বলা যেতে পারে আমি এখান থেকে মীমাংসাতে পৌঁছেছি। কিন্তু আগেকার দিনে ব্রাহ্মণের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা ব্রহ্মচারী হয়ে যারা গুরুগৃহে থাকত তারা প্রথম থেকে শুধু বেদ মুখস্তই করে যেত। সেখান থেকে আস্তে আস্তে তারা মুখস্ত বিদ্যার চিন্তন মনন করে করে, ধ্যান ধারণা করতে করতে তাদের মধ্যে শাস্ত্র বিচার করার শক্তিটা জেগে যেত। ফলে তাঁরাই ব্রহ্মজ্ঞানী হতেন। আমরা এখন সারা জীবন কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে বুড়ো বয়সে বেদান্ত অধ্যয়ণ করতে চাইছি। যার ফলে ভেতরে কামিনী-কাঞ্চন গিজ্‌গিজ্ করছে আর সেটারই ঢেকুর উঠছে, এক কান দিয়ে বেদান্তের কথা ঢুকছে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটাকে কাটাবার জন্য প্রথম থেকে নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী।

এখানে শিষ্যের প্রশ্ন ছিল কোন বিদ্যাটা জানলে সব কিছু জানা যায়। আর গুরু উদ্ভট একটা কথা বলে দিলেন – দুটো বিদ্যা জানার মত আছে। আসলে গুরু বলে দিলেন দুটো বিদ্যাই জানা দরকার। অপরা বিদ্যাটা অবিদ্যার মধ্যেই, কিন্তু অপরা বিদ্যা যতক্ষণ না জানবে সে জানবে কি করে তাকে কোনটা ফেলতে হবে। যদি বলা হয় এখানে তোমার শত্রু মিত্র উভয়ই জড়িয়ে আছে। তখন আমাকে তো জানতে হবে আমার শত্রু কারা। আমাকে আগে জানতে হবে এই জগতে কোন জিনিষগুলো আমার বন্ধনকারী আর কোন জিনিষ মুক্তিকারী। অবিদ্যা বলতে এখানে খারাপ কিছু বলা হচ্ছে না, মানে চুরি, ডাকাতি এই বিদ্যার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। যে কোন বিদ্যা যে আমাদের শিক্ষা দেয় এটা ধর্ম এটা অধর্ম, সেই বিদ্যাটা অপরা বিদ্যা। কিন্তু আমাকে দুটোই জানতে হবে। আমাকে বেদ জানতে হবে, বাইবেল জানতে হবে, কোরান জানতে হবে। তা নাহলে আমার যেটা তত্ত্ব সেটা নির্ধারিত হবে না। স্বামীজীকে জানতে হলে আমাদের ধর্ম জানতে হবে, বিজ্ঞান জানতে হবে, সাহিত্য জানতে হবে, ইতিহাস জানতে হবে। এত কিছু না জানলে স্বামীজীকে মূল্যায়ন করা যাবে না। এখানে কিন্তু অধর্মের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে না, লোকের বাড়ির তালা কি করে ভাঙতে হবে, খুন কিভাবে করতে হবে বলা হচ্ছে না। এখানে ধর্ম গ্রন্থেরই কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু যে ধর্ম গ্রন্থ আমাদের ধর্ম ও অধর্ম দুটোই শিক্ষা দেয়। পরের মন্ত্রে অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা কি কি বলা হচ্ছে।

তত্রাপরা – ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা – যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।।১/১/৫।।

(উপরোক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এসবই অপরা বিদ্যা। অতঃপর পরা বিদ্যা, যার সাহায্যে সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়।)

মুণ্ডকোপনিষদ এসেছে অথর্ববেদ থেকে। অথর্ববেদ হল মুণ্ডকোপনিষদের মা। নিজের মাকেই বলছে ফেলে দিতে। সন্ন্যাসী কিনা। শুধু মুণ্ডকোপনিষদই নয়, সব উপনিষদই বলে, গীতাও বলে – বেদকে অতিক্রম করে যেতে হবে। কি কি অপরা বিদ্যা? চারটে বেদই অপরা বিদ্যা – ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। তার সাথে বেদের যে কটি অঙ্গ আছে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। হিন্দুদের এই দশটি মূল গ্রন্থ – চারটে বেদ আর ছয়টি বেদাঙ্গ। ঋগ্বেদে যত মন্ত্র আছে সবটা ছন্দোবদ্ধ। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে বলা হয় ঋচা। যজ্ঞের সময় ঋগ্বেদ আবৃত্তি করা হয়। সামবেদ ঋগ্বেদরই মন্ত্র কিন্তু যজ্ঞের সময় গান করা হয়। যজুর্বেদের মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ করা হয়। এই তিনটের বাইরে বাকি যা কিছু আছে সব অথর্ববেদের অন্তর্গত। সেইজন্য অথর্ববেদে অনেক কিছু আছে। অথর্ববেদে ছন্দ ও গদ্য দুটোই পাওয়া যাবে, আবার এই শত্রুকে বধ করার মন্ত্র, একে বশ করার মন্ত্র মানে সব কিছুই আছে। বেদের কিছু মন্ত্র আছে যেগুলোকে বলা হয় গেয়মুক্ত, যেগুলো গান করা যায়। কবিতা হলেই যে গান করা যাবে তা নয়। গান করা যাবে না কিন্তু ছন্দোবদ্ধ সেগুলো হয়ে গেল ঋগ্বেদ। সেইজন্য ঋগ্বেদের কলেবর বৃহৎ।

বেদ পাঠ করার আগে বেদাঙ্গ পড়তে হয়, বেদাঙ্গ ঠিক ঠিক অধ্যয়ণ করা হলে বেদ পাঠের অধিকারী হয়। বেদাঙ্গের প্রথম হল শিক্ষা, বর্ণের উচ্চারণ কিভাবে হবে যে শাস্ত্র বলে দিচ্ছে সেই শাস্ত্রকে বলা হয় শিক্ষা। বেদ দাঁড়িয়েই আছে উচ্চারণ বিধির উপর, উচ্চারণ যদি ঠিক না হয় তাহলে সেটা আর বেদ থাকবে না। বেদের বর্ণের উচ্চারণ বিধিটাই পুরো একটা শাস্ত্র, এটাই শিক্ষা। দ্বিতীয় হল কল্প, শ্রৌতকর্ম অনুষ্ঠান বিধি সূত্রাদি। বেদে যত রকমের ক্রিয়া কর্মকাণ্ডাদি ছিল তার বিধিগুলো সব সময় সবার মনে থাকত না বলে বিধিগুলোকে সূত্রাকারে একটা হ্যাণ্ডবুকের মত করে রাখা থাকত। এটাকেই বলা হয় কল্প। পরে মনুস্মৃতি আদি সব স্মৃতিগ্রন্থ কল্প থেকে বেরিয়েছে। বেদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল যজ্ঞ, যজ্ঞের বিধি যদি জানা না থাকে যজ্ঞ তাহলে করবে কিভাবে? সেইজন্য সবাইকে কল্প মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হত। এই কারণে বেদ আর বেদাঙ্গ একসাথে চলত, একদিকে বেদ মুখস্ত করছে অন্য দিকে বেদাঙ্গও মুখস্ত করতে হত। তৃতীয় ব্যাকরণ, ব্যাকরণ পদসম্বন্ধ নির্ণায়ক। দুটো পদের যে সম্বন্ধ হবে যেমন সন্ধি, সমাস, অলঙ্কার, ক্রিয়া এই জিনিষগুলোর নিয়মগুলো ব্যাকরণ বলে দিচ্ছে। বৈদিক ব্যাকরণ আমাদের ইদানিং ব্যাকরণের অর্থ একই। চতুর্থ নিরুক্ত, বৈদিক শব্দার্থ জ্ঞাপক। বেদে যত রকম শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে তার অর্থটা কি, মূলতঃ নিরুক্ত হল বৈদিক অভিধান। একটা শব্দ সংস্কৃতেও আছে আবার বেদে আছে, সেই শব্দের সংস্কৃতে যে অর্থ হবে বেদের সেই শব্দের অর্থ আলাদা হবে। বেদে এই শব্দের কি অর্থ হবে সেটা নিরুক্তে বলে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম ছন্দ, বেদে যত রকমের ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে, গায়ত্রী, পংক্তি, অনুষ্টুপাদি ছন্দের আলোচনা যে শাস্ত্রে করা হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে ছন্দ। শেষে ষষ্ঠ হল জ্যোতিষ, যজ্ঞকাল নির্ধারণ। যজ্ঞটা কখন কোন সময় করতে হবে সেই সময়টা নির্ধারণ করে দিচ্ছে জ্যোতিষ শাস্ত্র। যজ্ঞের কাল নির্ধানরের ব্যাপারে ওনারা খুব সচেতন ছিলেন। দণ্ড, পল, কলা, কাষ্টা, মুহুর্ত সব বিচার করে যজ্ঞারম্ভের কালটাকে নির্ধারণ করে দিতেন।

চারটে বেদ আর এই ছটি বেদাঙ্গ আর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যত রকম বিদ্যা আছে সবটাই অপরা বিদ্যা। ঠাকুর এক কথায় বলে দিচ্ছেন চালকলা বাঁধা বিদ্যা। এটাই অপরা বিদ্যা। মূলতঃ সব বিদ্যাই অপরা বিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যত বিদ্যা আছে সবটাই অপরা বিদ্যার মধ্যে পড়ছে। আগেকার দিনে এত কিছু বিদ্যাকে নিয়ে আলোচনা করা হত না, তখনকার দিনে যা যা বিদ্যা ছিল চারটে বেদ আর তার সঙ্গে সব কটি বেদাঙ্গ সব অপরা বিদ্যা। অথচ মুণ্ডকোপনিষদ নিজেই অপরা বিদ্যার মধ্যে অবস্থান করছে।

তাহলে পরা বিদ্যা কোনটা? *অথ পরা – যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে*, যে বিদ্যা দিয়ে অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। তার মানে বেদ বেদাঙ্গ কোন দিন আমাকে অক্ষর পুরুষের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না, অথচ আমাকে জানতে হবে। এই উপমাটা অনেকবার ব্যবহার করা হয় – ছাদে উঠতে গেলে সিড়ির দরকার পরে কিন্তু সিড়ি ছাদ নয়। ছাদে উঠে সিড়িটাকে ছেড়ে দিতে হবে। পোলভল্টে একটা পোল নিয়ে কিছুটা দৌড়ে এসে

পোলটাকে ভর করে একটা উচ্চতাকে অতিক্রম করতে হয়। পোল না থাকলে জাম্প দেওয়া যাবে না, কিন্তু একটা অবস্থায় গিয়ে পোলটাকে ছেড়ে দিতে হবে, ছেড়ে যদি না দেয় তাহলে সে ঐ উচ্চতাটা অতিক্রম করতে পারবে না। বেদ বেদাঙ্গের এটাই মুখ্য ভূমিকা। বেদ বেদাঙ্গ প্রথমে আমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবে, তারপর সেটা খসে পড়ে যায় আর ঐ গতিবেগে আমাদের লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। সেইজন্যই বলা হয় বেদ বেদাঙ্গ আমাদের সবাইকে অবশ্যই জানতে হবে।

পরা বিদ্যা সম্বন্ধে পরের মন্ত্রে ঠিক ঠিক বলবেন। ঠাকুর বলছেন চালকলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাইনা, অর্থাৎ যে বিদ্যাকে জানলে চালকলা বাঁধাটা শেখা যায়। এখানে পরা বিদ্যাকে বলছেন *অক্ষরম্ অধিগম্যতে*। এই জায়গাতে এসে আচার্যের ভাষ্যের খুব গুরুত্ব বেড়ে যায়। আমরা প্রায়ই যখন বলি ঈশ্বর প্রাপ্তি বা ঈশ্বর দর্শন তখন আমরা মনে করি একটা স্থিতি থেকে আরেকটা স্থিতিতে যাচ্ছি, একটা লক্ষ্য পুর্তি হচ্ছে। কিন্তু এটা এই অর্থে হয় না। বলছেন জ্ঞানটাই প্রাপ্তি। যে কোন কর্মে কর্তা, করণ, ক্রিয়া, সম্প্রদান এগুলো সব আলাদা আলাদা, কর্মের ফলও আলাদা। কিন্তু পরা বিদ্যাতে এর কিছুই হচ্ছে না। পরা বিদ্যাতে যেটাই জ্ঞান, সেটাই লাভ, সেটাই ক্রিয়া – সব কিছ এক হয়ে যায়। তাহলে *অধিগম্যতে* কেন বলা হচ্ছে? অধি আর গম, গম্ ধাতুর অর্থ যাওয়া। তাহলে এখানে অর্থ দাঁড়াবে সাংসারিক অবস্থা থেকে মুক্তির অবস্থাতে যাচ্ছে। কিন্তু এই অর্থে এখানে বলা হচ্ছে না, ঐ শব্দটাকে বোঝানর জন্য *অধিগম্যতে* বলছেন, কিন্তু কর্মটা ঐ অর্থে নয় যে অর্থে আমরা বৈদিক কর্ম বুঝি। এখানে যেটাই জ্ঞান সেটাই তার ফল, জ্ঞান আর তার ফল আলাদা নয়। কিন্তু যজ্ঞাদির ক্ষেত্রে যজ্ঞের কর্ম আর সেই কর্মের ফল দুটোই আলাদা। যেমন চাষ করা হচ্ছে, চাষ করাটা কর্ম আর চাষ করে যে ফসল উৎপাদন হচ্ছে, চাষ আর ফসল দুটো আলাদা। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে বা ঈশ্বর দর্শনের ক্ষেত্রে দুটো আলাদা নয়, যদিও এখানে শব্দটা হল *অধিগম্যতে* তার মানে এই নয় যে আমি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় চলে যাচ্ছি। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, ঈশ্বর দর্শন হওয়া মানে কি তার দুটো শিং গজায়! ঈশ্বর জ্ঞানটাই ফল। তার মানে কারকের প্রথমা, দ্বিতীয়া বিভক্তি এখানে প্রযোজ্য হয় না।

বিরোধী পক্ষরা এর বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করে বলবে আমাদের এতদিনের ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী জানি বেদের বাইরে যাওয়ার কথা বলাটাই কুতর্ক। তুমি বলছ বেদের বাইরে যেতে এতে তো তুমি আমাকে ধর্ম বিরোধী করে দিচ্ছ। হিন্দুদের মূল শাস্ত্র বেদ আর তোমরা বেদকে অপরা বিদ্যা বলে তাকে ফেলে দিতে উপদেশ দিচ্ছ! তোমরা তো ধর্ম বিরোধী কথা বলছ। আমি যদি বেদ বেদান্তকে ছেড়ে দিই তাহলে তো আমি আর হিন্দুই থাকলাম না। কিন্তু আবার ঠাকুর বলছেন এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে।

আচার্য এই আপত্তিকে যুক্তি দিয়ে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। এখানে যেটা ফেলে দিতে বলা হচ্ছে সেটা শব্দরাশিকে ফেলে দিতে বলা হয়েছে। শব্দরাশি আর সেই শব্দ সম্পর্কিত জ্ঞান এই দুটো জিনিষ আলাদা। বেদের দুটি অর্থ – প্রথম অর্থ শব্দরাশি আর দ্বিতীয় অর্থ জ্ঞান। বেদ বলতে এখানে উপনিষদকেও ধরা আছে। শব্দরাশি অপরা বিদ্যা কিন্তু জ্ঞান পরা বিদ্যা। স্বামী স্ত্রীকে কোন কথা বলছে স্ত্রী শুনে 'হুঁম্' শব্দ করল। ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে মা কি বলল। বাবা বলছে – মা বলল এটা যদি করি তাহলে বাড়িতে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। শব্দটা হল 'হুঁম্'। স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে ছেলেকে নিয়ে একটু বাইরে যাব? স্ত্রী গম্ভীর গলায় বলল 'হুঁম্'। ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে – মা কি বলল বাবা? মা বলল এত রাত্রে যদি তোমাকে নিয়ে বাইরে যাই তাহলে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শব্দটা শুধু 'হুঁম্' কিন্তু তার অর্থটা আলাদা। আর জ্ঞান কি? এখন বাইরে যাবে না। বেদেরই ঠিক দুটি অঙ্গ একটা বাহ্যিক, যেটা শব্দরাশি – এটাকে বলা হচ্ছে অপরা বিদ্যা। সেই শব্দরাশির পেছনে যে জ্ঞান সেটাকে বলা হয় পরা বিদ্যা। বলছেন, এই শব্দরাশির পুরোটাই তোমাকে জানতে হবে। কিন্তু এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কি রকম বেরিয়ে আসতে হবে? আচার্য বলছেন জ্ঞান এমনি এমনি হয়ে যায় না। তার জন্য গুরুর কাছে যেতে হয়, প্রযত্নবান হতে হয়, বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হয়, সাধনা করতে হয় তবে গিয়ে জ্ঞান হয়। কত লক্ষ লক্ষ লোক গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে কিন্তু জ্ঞান হচ্ছে না কেন? প্রথম কথা তারা সবাই কতকগুলো শব্দরাশিকে উচ্চারণ করে যাচ্ছে,

আর দ্বিতীয়তঃ সেই রকম গুরুর কাছে যায়নি, বৈরাগ্যের অনুশীলন করেনি, যে ধরণের তপস্যা করতে হবে সেই তপস্যা নেই, সাধনা নেই। এতগুলো নেই নেই এর পর অর্থ কি করে আর স্পষ্ট হবে! সেইজন্য বলা শব্দ আলাদা আর জ্ঞান আলাদা। তাহলে কথামৃত? কথামৃতও অপরা বিদ্যা, যতক্ষণ শব্দরাশির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ সেটা অপরা বিদ্যা। যখন জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তখনই সেটা পরা বিদ্যা হয়ে যাবে। এই জ্ঞান কিভাবে হয়? যেটা আগে বলা হল বৈরাগ্য, প্রচেষ্টাদির দ্বারা। এই জ্ঞান অন্তঃকরণে একটা অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। যতক্ষণ অপরা বিদ্যাতে থাকবে ততক্ষণ তার পাণ্ডিত্যের আর শেষ নেই, নানা রকমের ব্যাখ্যা দিয়েই যাবে। যারাই দশ রকমের ব্যাখ্যা করছে তার মানে তার কাছে একটার অর্থও পরিষ্কার হয়নি, এখন সে শব্দের খেলা করে যাচ্ছে। যে পরা বিদ্যাতে চলে গেছে সে একটি কথা দিয়ে সব পরিষ্কার করে দেবে।

সৃষ্টি তত্ত্বে দুটি মতের ব্যাখ্যা করা হয় – পরিণামবাদ আর বিবর্তবাদ। পরিণামবাদে একটা জিনিষ আরেকটা জিনিষে পরিবর্তিত হয়ে যায় যেমন দুধ থেকে দইয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। পুরো বিজ্ঞান-জগৎ পরিণামবাদকে নিয়েই চলে। ঠাকুর যেমন খুব সহজ করে বলছেন – বিজ্ঞান শুধু বলে এটা থেকে ওটা আর ওটা থেকে এটা হয়। ভারতের ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শন পরিণামবাদের প্রবর্তক, সাংখ্যের থেকে বেশী পরিণামবাদের কথা বলে বৈশাষিকরা। আচার্য শঙ্কর পরিণামবাদের ব্যাপারে বলবেন এটা থেকে ওটা ওটা থেকে এটা কখন হতেই পারেনা। যে দুধের ব্যাপার জানতে চাইছে সে দইয়ের ব্যাপার কখনই জানতে পারবে না। বিবর্তবাদে জিনিষের কিছুই পরিণাম হচ্ছে না তার রূপটা শুধু পাল্টে যাচ্ছে। রূপ পাল্টাচ্ছে বলে তার নামটাও পাল্টে যায়। বিবর্তবাদ হল বেদান্ত দর্শনের স্তম্ভ। নাম ও রূপ সব কিছুকে আলাদা করে দিচ্ছে। তার মানে এই রূপান্তর যেটা হচ্ছে সেটা সত্য নয়, মনে হচ্ছে যেন রূপটা পাল্টে যাচ্ছে। যেমন মাটির ঢ্যালাকে ভেঙে জল দিয়ে নরম করার পর সেই মাটি দিয়ে একটা হাতি আর একটা ইঁদুর বানালাম। মাটির রূপ পাল্টে গেল আর তার নামটাও পাল্টে গেল। কিন্তু হাতি আর ইঁদুর আসলে মাটি, আগেও মাটি ছিল এখনও মাটিই আছে। শুধু নাম আর রূপ এসে গেছে। এই পরিবর্তনটাই বিবর্তবাদ, শুধু নাম আর রূপের পরিবর্তন হয়েছে আসল বস্তু মাটি। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে মৃত্তিকাই সত্য তার নাম ও রূপটা মিথ্যা। বেদান্ত বলছে নাম ও রূপটাই মিথ্যা। আমরা নাম ও রূপকেই সত্য দেখছি, এটাই একমাত্র সমস্যা।

আচার্য এখানে খুব স্পষ্ট করে বলছেন পরিণামবাদ যদি সত্য হয় তাহলে একটা জিনিষকে জানলে সব জিনিষকে জানা কখনই সম্ভব হবে না। তাই তিন নম্বর মন্ত্রে যে প্রশ্ন করা হয়েছে *কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*, এই প্রশ্নই করা যাবে না। যারা প্লাস্টিক ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করে তারা স্টীল ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারবে না। প্লাস্টিকের এই বোতলের ব্যাপারে স্টীল ইণ্ডাস্ট্রির কারিগর কিছু বলতে পারবে না, ঠিক তেমনি প্লাস্টিক ইণ্ডাস্ট্রির কারিগর এই স্টীলের গ্লাশের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না। দুটো আলাদা জিনিষ। কিন্তু যদি নাম ও রূপের খেলা হয়, মায়ার খেলা যদি থাকে তাহলে একটা জিনিষকে জানলে বাকি সব কিছুকে জানা যাবে। যে প্লাস্টিক ইণ্ডাস্ট্রির ইঞ্জিনিয়ার সে জানে কিভাবে প্লাস্টিককে গলিয়ে নানা রকমের খেলনা, নানা আকারের বোতল তৈরী করতে হয়। সে তখন প্লাস্টিকের একটা জিনিষকে জানলে সবটাই জানবে। আচার্যের মতে পুরো জগৎটা বিবর্ত। বিবর্ত হওয়াতে জগতের একটা জিনিষকে জানলে পুরো জগৎকে জেনে যাবে। কথামৃতে ঠাকুরের খুব সুন্দর একটা উপমা আছে, কিভাবে ঠাকুর জগৎকে প্রত্যক্ষ সত্যিকারের বিবর্ত দেখছেন। ঠাকুর আর হৃদয়রাম লাট সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। হৃদয়রাম ঠাকুরকে বলছেন 'মামা! এটা লাট সাহেবের বাড়ি'। ঠাকুর বলছেন 'আমি দেখলুম মাটির ঢিপি'। লাট সাহেবের বাড়ি মানে, কিছু ইটকে সাজান হয়েছে। ইট কোথা থেকে এসেছে? মাটি থেকে। আমরা তাজমহল দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। তাজমহল আসলে কতকগুলি মার্বেলের স্তূপ। মার্বেল জিনিষটা কি? রাসায়নিক ফরমুলার দিক দিয়ে মূলতঃ ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এটাই বিবর্ত। ঠাকুর বলছেন ভাত-ডাল একত্রে মিশিয়ে একটা জায়গায় রেখে দিলে দুদিন পরে সেটাই বিষ্ঠা হয়ে যায়। এই বিষ্ঠাই আবার ধাপার ক্ষেতে সার রূপে প্রয়োগ করে যে সব্জী উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো আবার আমরা খাচ্ছি। সবটাই বিবর্ত। ঠাকুর পদে পদে এই বিবর্তকে

প্রত্যক্ষ করছেন। আবার চরম স্তরে সেই বিবর্তকেই দেখে বলছেন আমি দেখছি সেই সচ্চিদানন্দই সব কিছু হয়েছেন। লাটু গালে হাত দিয়ে বসে আছেন দেখছি সেই সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

আচার্য ঠিক এই যুক্তি গুলোকে দিয়ে অন্যান্য দর্শনের মতবাদকে খণ্ডন করেন। ভারতের ষড়দর্শনের সবাই উপনিষদ থেকেই নিজেদের দর্শনের অর্থপুষ্টি করে। আচার্য তখন দেখান যদি তোমার মত ঠিক হয়, তাহলে তুমি ব্যাখ্যা করে দেখাও এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে। যখন উপনিষদ বলছে কোনটাকে জানলে সবটাকে জানা যাবে, তখন তুমি দুধকে জানলে দইয়ের ব্যাপারে জানবে না, কারণ দুধের প্রপার্টি আর দইয়ের প্রপার্টি আলাদা, ঘিয়ের প্রপার্টি আর দুধের প্রপার্টি আলাদা। তাহলে তো উপনিষদের কথাই মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দকে জানেন তিনি পুরো জগৎকে জানবেন। সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলা হয় সর্বজ্ঞ। তিনি সত্যিকারের সবটাই জেনে যান। কারণ আমরা যা কিছু পরিবর্তন রূপে দেখছি এটা সত্যিকারের পরিবর্তন নয়। খ্রীশ্চান, ইসলাম, জিউসরা যেমন বলে ভগবান আছেন, তিনি মাটি দিয়ে প্রথমে মানুষকে তৈরী করলেন। কিংবা ভগবান বললেন Let there be light and there was light। ছোটবেলা থেকে আমরা এই ভাবেই শুনে এসেছি। কিন্তু এভাবে সৃষ্টি হয় না। এটা মায়া। কিসের মায়া? নাম আর রূপের মায়া। কি করে এটা হয়? যেটা দিয়ে হচ্ছে সেটাকে কেউ বলছে শক্তি কেউ বলছে মায়া। মূল কথা এটাই, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ যে এই রকম বহু হয়ে যাচ্ছেন এটা শুধু নাম ও রূপের খেলা।

বায়োলজির দিক দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে এটাই আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। সত্তর বছর বয়সের যে লোকটি আজকে জীবনের একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাকে যদি পেছোতে পেছোতে সত্তর বছর দশ মাস পেছনে তার মায়ের গর্ভে ডিম্বাশয়ে ভ্রুন রূপে আবির্ভূত হওয়ার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাকে হয়ত আর চোখেও দেখা যাবে না, শুধু কয়েকটি কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এই তিন চারটে মলিক্যুলসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ সেই অবস্থা থেকে হাড়গোর, মাংস, চর্বি নিয়ে এই বিরাট একটা শরীর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর ঠিক এই কথা কথামৃতে বলছেন, সেই তরল শুক্র শোণি থেকে কিভাবে এই হাড়গোর শক্ত শরীর তৈরী হচ্ছে। ঠাকুর নিজের থেকেই বলছেন সেই সচ্চিদানন্দ থেকে এই সৃষ্টি কি করে হতে পারে? বলেই আবার নিজেই বলছেন তরল শুক্র থেকে কি করে এই হাড়গোরের মানুষ তৈরী হচ্ছে। এখানে থেকে যদি আরও পিছিয়ে যাই তখন দেখতে পাই এই পৃথিবীটা একশ দশ কি আটটা পদার্থ দিয়ে তৈরী। আরও যদি পিছিয় যাই সব কিছুর জন্ম হাইড্রোজেন থেকে, আরও পিছিয়ে গেলে দেখছি এণার্জি ছাড়া কিছু নেই। কোন বিজ্ঞানীও আজ পর্যন্ত এটাক অস্বীকার করছেন না। বিশ্লেষণের শেষ পর্যায়ে দেখাচ্ছে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এণার্জি ছাড়া কিছু না। এই এণার্জিই প্রথম এসে একটা জড়ের আকার ধারণ করে, যেটাকে কোয়ার্ক্স বলছে, সেটা আবার এণার্জি না জড় বোঝা যায় না। সেখান থেকে ইলেক্ট্রন প্রোটনের জন্ম হচ্ছে, ইলেক্ট্রন প্রোটন থেকে হাইড্রোজেন জন্ম নিচ্ছে। তারপর সৃষ্টির খেলা পুরোদমে চলতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরাও বলছেন ঐ একটা জিনিষই আছে। ঐ একটা জিনিষ যদি এণার্জিই হয়ে থাকে তার সাথে অন্য আরেকটা উপাদান না থাকে তাহলে পরিবর্তন হবে কি করে? দুধকে দইয়ে পরিবর্তন করতে হলে একটা আলাদা ধরণের রসায়ন লাগে, বাংলায় যাকে বলে সাজা, সেটা যাই হয়ে থাকুক, বাইরে থেকে একটা জিনিষ দিতে হচ্ছে। পরিবর্তন হওয়ার জন্য দুটো জিনিষের দরকার। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলে যাচ্ছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এণার্জি ছাড়া কিছু নেই। আইনস্টাইনের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা জানতেন জড় আছে আর তার সাথে এণার্জিও আছে। আইনস্টাইন আসার পর বিজ্ঞানীর মেনে নিয়েছেন এণার্জি ছাড়া কিছু নেই। যদি শুধুই এণার্জি থাকে তাহলে জড়টা এলো কি করে? দুটো শক্তি থাকলে তবেই না পরিবর্তন হবে! কিন্তু তোমরাই বলছ দুটো শক্তি নেই একটাই একক শক্তি রয়েছে। এণার্জি যখন জড়ে পরিবর্তন হচ্ছে তখন বেদান্তের দৃষ্টিতে এটাই নাম। এই নাম রূপ মানেই মিথ্যা। আচার্য শঙ্করও এই কথাই বলে যাচ্ছেন। আপনি যদি বুঝে জান সবটাই এণার্জির খেলা, তখন আপনি অনেক জিনিষ বুঝে নেবেন কিন্তু বাকি অনেক জিনিষের ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ থাকবে না। যদি একটু খাটাখাটনি করেন তাহলে সবটাই বলে দিতে পারবেন। এগুলো আমরা খুবই স্থূল স্তরে আলোচনা করছি। সূক্ষ্ম স্তরে যখন আলোচনা করা হবে তখন এটা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর যেমন বলছেন আমি দেখছি ইটের

স্তূপ। এটাই মায়া। বেদান্তের এটাই মৌলিক দর্শন। বেদান্ত বলছে এক সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। বিজ্ঞানীও তাই বলছে এণার্জী ছাড়া কিছু নেই। আমরা বিজ্ঞানীদের থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছি শুদ্ধ চৈতন্য।

এখন যে বিদ্যা এই শুদ্ধ চৈতন্যকে ব্যাখ্যা করছে সেই বিদ্যাকে বলছেন পরা বিদ্যা। এর আগে বললেন জগতে দুটি বিদ্যা আছে জানার মত। উপনিষদ এত পুরনো যে তখনও বিজ্ঞানের এত কিছু তত্ত্ও আসেনি, তখন একমাত্র বেদই বিদ্যার সব কিছু ছিল। তাই বেদ আর তার আনুষাঙ্গিক যত বিদ্যা আছে সব কটাকে বলে দেওয়া হল অপরা বিদ্যা। তাহলে এখানে তিন নম্বর মন্ত্রের *কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি* এই পংক্তিটি কি পরা বিদ্যার মধ্যে গণ্য করা হবে না অপরা বিদ্যা বলে ধরা হবে? বেদের দুটি জিনিষ, একটা হল শব্দরাশি আর দ্বিতীয়টি জ্ঞান। যোগশাস্ত্রেও পতঞ্জলী তিনটি শব্দ নিয়ে আসছেন শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান। একজন লোক কোর্টে গিয়ে আরেকজনের নামে মানহানির মামলা করে জজ সাহেবকে বলছে 'হুজুর! এই লোকটি আমাকে গণ্ডার বলেছে'। জজ সাহেব – কবে বলেছিল? লোকটি – স্যার বছর খানেক আগে বলেছিল। জজ সাহেব – তা, এত দিন পরে তুমি মামলা করতে এলে কেন? লোকটি – স্যার! গতকালই আমি চিড়িয়াখানায় গণ্ডার জন্তুটা দেখেছি। আজ তাই আমি মামলা করতে এসেছি'। এত দিন গণ্ডারটা তার কিছু ছিল শব্দমাত্র। গণ্ডার দেখার পর তার বোধ হল আমাকে এই জন্তু বলে গালাগালি দিয়েছিল! তার কাছে অর্থটা এখন স্পষ্ট। অর্থ আর জ্ঞান মিশে থাকে, আসলে দুটোর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কার্য পুরোপুরি আলাদা। গণ্ডার একটা শব্দ, এই শব্দের একটা অর্থ আছে আর এর জ্ঞান আছে। শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান এক সঙ্গে মিশে আমাদের প্রভাবিত করে। সেইজন্য তফাৎটা আমরা বুঝতে পারিনা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শব্দটা বলাই হয়নি কিন্তু জ্ঞান হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী যখন ঝগড়া করে তখন একজন বলবে 'আমি জানি তুমি এই কথা বলতে চাইছিলে'। মানে, শব্দ হওয়ার আগেই তার জ্ঞান হয়ে গেছে। অন্য ক্ষেত্রে শব্দটা ভেতরে আসছে কিন্তু জ্ঞান হয় না।

বেদ হল শব্দ মাত্র, আমাদের শব্দের জ্ঞান হয় না। বেদের শব্দের সম্বন্ধ যুক্ত জ্ঞান এটাই পরা বিদ্যা। শব্দ একই থাকবে কিন্তু এটা জ্ঞানে পরিবর্তন হয়ে যাবে। বেদ উপনিষদের শব্দরাশিকে জ্ঞানে পরিবর্তন করার জন্যই যত সাধনা। গুরুর কাছে যেতে হবে, যম-নিয়মাদি পালন করতে হবে, নিষ্ঠার সঙ্গে জপ-ধ্যান করবে, তখন শুদ্ধ মনে শব্দের জ্ঞানটা ভেতর থেকেই উদয় হয়। শাস্ত্রে আমরা যা যা জানছি, তারপর আমি যেমন যেমন সাধনা করব ঠিক ঠিক সেই রকমটিই দেখবে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে জিনিষটা ঠিক উল্টো হয়েছে। আগে তিনি সাধনা করে সব দেখে নিয়েছেন, তারপর শাস্ত্রের কথা শোনার পর বলছেন হ্যাঁগো, আমি এই রকমটিই দেখেছিলাম। ঠাকুর মথুরবাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে গেছেন। ঠাকুর তাঁকে বেদ থেকে কিছু বলতে বলায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ থেকে বলছেন – বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বিরাট ঝাড়বাতি আর প্রত্যেকটি জীব যেন সেই ঝাড়বাতির এক একটি বাতি। ঠাকুর শুনে বলছেন – আমি ঠিক এমনটিই দেখেছিলাম, ও তাহলে বিরাট লোক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বেদের এই কথাগুলো পড়েছেন কিন্তু উপলব্ধি ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়েছিল। তাতেই ঠাকুর বলছেন দেবেন ঠাকুর বিরাট লোক তিনি জানেন বেদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কিভাবে বলা হয়েছে। সাধনা করে যখন অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করে তখন শাস্ত্র যে রকমটি বলেছে ঠিক সেই রকমটি সাধক সাক্ষাৎ দেখতে পায়।

আচার্য বলছেন *উপনিষদ্বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি* – উপনিষদের যেটা বেদ্য, সেই ব্রহ্ম বা অক্ষর তার যে বিজ্ঞান, ব্রহ্মকে বিশেষ রূপে জানার যে অনুভূতি, এই সাক্ষাৎ দেখার পদ্ধতি যেটা, ঐ জিনিষটার জ্ঞান হয়ে যাওয়া, সেটাকে বলছে পরা বিদ্যা। ঠাকুর বলছেন শুধু বই পড়লে কি হবে সাক্ষাৎ দেখতে হবে। সেইজন্য উপনিষদও অপরা, বেদও অপরা বিদ্যা। কিন্তু অপরা বিদ্যারও রকম আছে, চুরি বিদ্যা সেটাও অপরা আবার বেদও অপরা বিদ্যা। যেমন বিজ্ঞানকে টেকনলজিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে ঠিক তেমনি উপনিষদের বিজ্ঞানকে যখন টেকনলজিতে প্রয়োগ করা হয় তখনই সেটা হয়ে যায় আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞানকেই তখন বলা হচ্ছে পরা বিদ্যা। যতক্ষণ উপনিষদের মন্ত্র মুখস্ত করে যাচ্ছি, পাঠ করে

যাচ্ছি, চিন্তন করে যাচ্ছি ততক্ষণ সেটা অপরা বিদ্যাতেই থেকে যাচ্ছে। এই বিদ্যাটাই যখন আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন পরা বিদ্যায় চলে যাচ্ছে। আধ্যত্মিকতা আর ধর্মের মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য। যেমন কথামৃত অপরা বিদ্যা কিন্তু যখন কথামৃতের বিদ্যাকে সাধনার মধ্যে প্রয়োগ করা হবে তখন কথামৃত পরা বিদ্যাতে চলে যাবে। শব্দরাশি যখন জ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করে তখনই পরা বিদ্যা হয়ে যায়। সেইজন্য বলছেন অপরা বিদ্যা তোমাকে জানতেই হবে। অপরা বিদ্যার জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কখন বুঝতেই পারবে না পরা বিদ্যাটা কি। পরা বিদ্যাটা হল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যদি তুমি পূর্বপক্ষ নাই জান, কি নিয়ে কথা হচ্ছে যদি নাই জানা থাকে, বা কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে ধরতে হবে না জানা থাকে তাহলে তোমার সব কিছু গুলিয়ে যাবে। সেইজন্য বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত এগুলো অধ্যয়ণ করতে হয়। আমার কথামৃত পড়া আছে বললেই হবে না, রীতিমত চিন্তন করতে হবে, মনন করতে হবে, চিন্তন মনন করে ধারণা করতে হবে। ধারণা করার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে যখন এগোন হচ্ছে তখন ঐটাকেই বলছে পরা বিদ্যা। ছোট্ট কথায় বলতে গেলে এটুকুই বলা যায় – যখন শব্দটুকু থেকে যাচ্ছে তখন অপরা বিদ্যা আর ঐ শব্দই যখন জ্ঞানে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন বলছেন পরা বিদ্যা। কিন্তু শব্দ থেকে জ্ঞানে পরিবর্তিত করতে গিয়ে প্রচুর খাটতে হয়। গণ্ডারের গল্পে এর আগে সে শুধু গণ্ডার এই শব্দটা শুনেছে, এরপর সে চিড়িয়াখানায় গেল, লাইনে দাঁড়িয়ে সে টিকিট কাটল, ভেতরে ঢুকল, জন্তুগুলো দেখল, তারমধ্যে গণ্ডারকে দেখল – এই যে সাধনাটা এটা পরিশ্রম সাপেক্ষ। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে এই শব্দ রাশিকে জ্ঞানে পরিবর্তিত করাটা অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ।

আগেকার দিনে দুই ধরণের ব্রাহ্মণ ছিল। এক ধরণের ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা পণ্ডিত হতেন তা নাহলে বড় জোর পুরোহিত হতেন। তাঁরা বাচ্চা বাচ্চা শিষ্যদের নিয়ে দশ বছর কি পনের বছর ধরে শুধু বেদ মুখস্ত করিয়ে যেতেন। শিষ্য খুব গর্ব করে বলত আমি বেদ জানি। না, তুমি বেদ জাননা, তুমি বেদ শুধু মুখস্ত করেছ। বেদকেও যখন মুখস্ত করছে তখনও বেদ অপরা বিদ্যাতেই থেকে যাচ্ছে। কিন্তু যখন তুমি বুঝে নিলে বেদে কি বলছে, বুঝে নেওয়ার পর এবার তোমার ভেতর থেকে বলতে শুরু করবে এটাকে আমার পেতে হবে। এবার সে পরা বিদ্যাতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – একজনের কাছে একটা চিঠি এসেছে, যাতে লেখা আছে একটা ধুতি, পাঁচ সের সন্দেশ আর পাঁচটি টাকা পাঠাতে হবে। এগুলো এখন শুধু শব্দ মাত্র। এখন চিঠিটা গেছে হারিয়ে। অনেক খোঁজাখুজির পর চিঠিটা পাওয়া যেতেই সে চিঠিতে কি লেখা আছে জেনে নিল। এরপর আর চিঠির কোন মূল্য নেই, চিঠিটা হয়ত ফেলেই দেবে। এবার সে আদাজল খেয়ে নেমে পড়বে জিনিষগুলো সংগ্রহ করতে। এই যে ভেতরে একটা জ্ঞানের ঝলক দিয়ে দিল আমাকে এগুলো পাঠাতে হবে, এটাকে বলা হয় জ্ঞান। সাধনা থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের অবস্থা এর প্রত্যেকটি অবস্থা আলাদা আলাদা। আমার ফোনে একটা মেসেজ এসেছে বাজার থেকে এক কিলো আলু নিয়ে আসবে। এটা একটা শব্দ মাত্র, কিন্তু আমার মধ্যে নাড়া দিল। আমাকে এক কিলো আলু নিয়ে আসতে হবে, এটা জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানের সঙ্গে আরও আনুষাঙ্গিক জিনিষ জড়িয়ে আছে, আমাকে বাজারে যেতে হবে, আলুর দরদাম করতে হবে, আলু বাছতে হবে, দাম দিতে হবে। দাম দিয়ে কিনে যখন থলেতে ভরা হয়ে গেল এটা হয়ে গেল বিজ্ঞান। তার আগে ফোনে কি বলছে সেটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল, এটাকে বলা হচ্ছে জ্ঞান। কোন শিষ্য যখন গুরুর কাছ থেকে শুনে নিয়ে বেদের বক্তব্যকে ধারণা করে নেয়, এই ধারণা যখন করে নিল তখন তার জ্ঞান হয়ে গেল। কিন্তু এই জ্ঞানটাও অনেক নিকৃষ্ট। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে।

গুরুর কাছে গিয়ে একজন বলল, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। গুরু তাকে বলে দিলেন তুমি 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র জপ করতে থাক। কিন্তু এই 'ওঁ নমঃ শিবায়' পুরো অপরা বিদ্যা। এরপর গুরু একদিন বলে দিলেন শিব ছাড়া কিছু নেই। তখনও শিষ্যের কাছে এই কথা অপরা বিদ্যা। হঠাৎ একদিন শিষ্যের চেতনার কেন্দ্র বিন্দুতে বিদ্যুতের চমক ঝলসে উঠল সত্যিই তো শিব ছাড়া কিছুই নেই, আমাকে এই জগতের বন্ধন থেকে বেরোতে হবে। এবার শিষ্যের প্রচেষ্টা শুরু হল। চেষ্টা করতে করতে একটা অবস্থায় গিয়ে যখন শিষ্য দেখছে সত্যিই শিব ছাড়া আর কিছুই নেই, তখন এটাই হয়ে গেল বিজ্ঞান। উপনিষদের মন্ত্রে বিজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে না, যখন ধারণা হয়ে গেল, ওঃ আমি বুঝেছি, এই বোঝার পদ্ধতিটাকে বলছেন পরা বিদ্যা। বোঝা

বা ধারণার জন্য রীতিমত খাটতে হয়। নিয়মিত ভাবে জপ-ধ্যান করে করে মন যখন শুদ্ধ হয় তখন শাস্ত্রে কি বলছে তার অর্থটা স্পষ্ট হয়। স্পষ্ট করার প্রচেষ্টার পুরো পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে পরা বিদ্যা। ঠাকুর ভাগবত পণ্ডিতের উপমা দিচ্ছেন। এক ভাগবত পণ্ডিত রোজ রাজাকে ভাগবত পাঠ করে শোনাত। পাঠ হয়ে যাওয়ার পর ভাগবত পণ্ডিত বলত 'রাজা মশাই বুঝেছ'! রাজা বলত 'আগে তুমি বোঝ'। ভাগবত পণ্ডিত প্রত্যেক দিন বাড়িতে এসে ভাবত রাজা কেন রোজ আমাকে বলে 'আগে তুমি বোঝ'। একদিন দুদিন তিন দিন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন থেকে রাজার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রাজার লোক খোঁজ নিতে এসেছে। এসে দেখে ভাগবত পণ্ডিত ভাগবত গ্রন্থ নিয়ে বসে আছে আর দু চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে। রাজার লোক জিজ্ঞেস করছে 'তুমি রাজাকে ভাগবত শোনাতে যাবে না'? পণ্ডিত বলছেন 'তুমি রাজা মশাইকে বলে দাও আমি বুঝেছি'। এটাই হল পরা বিদ্যাতে পরিবর্তিত হওয়া। তাই বলে কি পণ্ডিতের ঈশ্বর উপলব্ধি হয়ে গেছে? না, এখন হয়নি। এখান থেকে এবার সাধনার শুরু।

অপরা বিদ্যা পুরোপুরি অজ্ঞানের এলাকা। ঠাকুর বলছেন – যখন দেখি পণ্ডিতের জ্ঞান বৈরাগ্য নেই তখন তাকে খড়কুটো বলে বোধ হয়। শকুন অনেক উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে। পণ্ডিত অনেক শাস্ত্র জানে, ঝটপট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু তার দৃষ্টি কোথায়? কামিনী-কাঞ্চনে। কারুর মধ্যে পরা বিদ্যা হয়েছে কিনা বোঝা যাবে, যখন তাকে বেদ উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তিনি কখনই চার রকমের ব্যাখ্যা দেবেন না। তিনি একটাই অর্থ নিয়ে চলবেন। কিন্তু যে পণ্ডিত অপরা বিদ্যাতে পরে আছে সে চার পাঁচ রকমের ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে। বেশীর ভাগের লোকের কাছেই শাস্ত্রের কথাগুলো শব্দ মাত্র আর যারাই বলে আমার এই রকম দর্শনাদি হয়েছে, এগুলো ঠিক ঠিক দর্শন নয়। শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেলে তার চাল চলন কথাবার্তাই আলাদা হয়ে যাবে। গীতাতে বলা হচ্ছে তাঁর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সব খসে যাবে, তাঁর রাগ-দ্বেষ থাকবে না, কোন কিছুতেই চাঞ্চল্য থাকবে না। মানুষ মাত্রই অত্যন্ত নির্মম প্রকৃতির হয়, যদি তাকে ধাক্কা মারা হতে থাকে একটা জায়গা পর্যন্ত সহ্য করে যাবে তারপরই সে পিষে শেষ করে দেবে। এগুলোই দুর্বলতার লক্ষণ। যাঁরা সত্যিকারের শক্তিমান তাঁরা কখনই এই রকম করবে না। সবল পুরুষ অত্যন্ত নম্র ও মৃদু হন। যিনি ঈশ্বরের পথে নেমে পড়েছেন তাঁর ভেতর কি করে ক্রোধ আসবে! *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকং লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ*, তিনি জগতের কাউকে উদ্বিগ্ন দেন না আর তিনিও কারুর থেকে উদ্বিগ্ন হন না। তরকারিতে একটু নুন বেশী হলেই তুলকালাম করে দিই, আসলে আমরা দুর্বল বলেই এই ধরণের আচরণ করে বসি। শাস্ত্র যতক্ষণ শব্দ মাত্র হয়ে থাকবে ততক্ষণ এই সমস্যাগুলো হবে। কিন্তু এই শব্দগুলোই যখন অর্থ আর জ্ঞানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, সে যখন বুঝে গেলে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, ঈশ্বরই এই নানান রূপে খেলা করছেন, তখন আর কোন সমস্যা থাকে না। পওহারী বাবার নামে ঘটনা আছে, তাঁর কুঠিয়ায় সাপ এসেছে পওহারী বাবা দেখছেন ঈশ্বরের দূত এসেছেন। যদিও এগুলো অনেক উচ্চ অবস্থার কথা কিন্তু মূল কথা হল এনারা আর দুর্বল থাকেন না। আচার্য এটাই বলছেন *শব্দরাশ্যধিগমেহপি* শব্দরাশিকে যদি জেনেও যায় তাহলেও কিন্তু যতক্ষণ *গুর্বভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যং চ*, গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষা না নিচ্ছে, যদি তার বৈরাগ্য না আসে ততক্ষণ ওই শব্দ কিন্তু জ্ঞানে পরিবর্তিত হবে না। জ্ঞানে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াটাই শেষ কথা নয়, এরপর চেষ্টাটা শুরু হবে। চিঠিতে যা বলা হয়েছে সেটা জেনে নিয়ে বসে থাকলেই সব কিছু এসে যাবে না, এরপরে চিঠিতে যে জিনিষগুলো পাঠাবার কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে সংগ্রহ করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। জিনিষগুলো পাঠানো হয়ে গেল, মানে বিজ্ঞানের অবস্থায় চলে গেল।

এখানে আচার্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। বেদে নানা রকম কর্মের কথা বলা হয়েছে। এখন কর্ম করতে গেলে অনেক রকম আয়োজন করতে হবে। যেমন চিঠির কথা বলা হল, ধুতি, সন্দেশ আর টাকা পাঠাতে হবে। যখন আমি বুঝে গেলাম আমাকে এসব জিনিষ পাঠাতে হবে তখন সব কিছু সংগ্রহ করতে হবে, তার জন্য লোক লাগাতে হবে, পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানেই কত রকম কর্মের আয়োজন করতে হচ্ছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হয় না। বেদের কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে এটি একটি খুব বড় রকমের পার্থক্য। কর্মকাণ্ডে যখন বলে দেওয়া হল তুমি অগ্নিহোত্র কর্ম করবে, তখন তাকে অগ্নিহোত্র কর্মের

আয়োজন করতে হবে, তার জন্য সব জিনিষপত্র জোগার করতে নেমে পড়তে হবে। সব জোগার হয়ে যাওয়ার পর ক্রিয়াটা করতে হবে। আর তার ফল যে কবে দেবে তার ঠিক নেই। কর্ম করতে গেলে সাতটি কারক আর তার সঙ্গে ক্রিয়া আর তার ফল এই নটি জিনিষ লাগে। এই নটি অঙ্গ ছাড়া কোন কর্ম হবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলোর কিছুই দরকার পরে না। যেটা বাক্য সেটাই তার অর্থ, সেই অর্থটাই জ্ঞান আর জ্ঞানটাই তার ফল, সবটাই এক। যখন পরা বিদ্যাকে বুঝে নেওয়া হয় তখন নতুন করে আর অনুষ্ঠান করতে হয় না। কর্ম আর জ্ঞানের এটাই মূল পার্থক্য। আমাকে যখন গুরু 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র দিয়ে বলে দিলেন শিব ছাড়া কিছু নেই। এখন আমার তো আর কিছু করার নেই। শুধু এই মন্ত্রকে জপ করে শিবের ধ্যান করা। ধ্যান করা যখন হচ্ছে তখনও আমি অপরা বিদ্যার মধ্যে থেকে যাচ্ছি। কারণ এটাও একটা চেষ্টা আর কর্মের মধ্যেই থাকা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানোদয় যখন হচ্ছে তখন নতুন করে কোন ফল হচ্ছে না। গুরু বলে দিয়েছেন তুই সেই শিব। তখন দেখছে আমি সেই শিব, নতুন করে কিছু হচ্ছে না। পরা বিদ্যার মূল কাজ হল, যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলোর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা। ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রের যে অর্থ হবে সেটাতে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া। পরা বিদ্যার এতটুকু কাজ, এর বেশী কিছু না। অপরা বিদ্যাতে অনেক কিছু হতে থাকে।

এই যে পরা বিদ্যা আমাকে শব্দের জ্ঞানে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবে আর তার যে জ্ঞানোদয় হবে, সেখানে আমার কি অনুভব হবে ছয় নম্বর মন্ত্রে সেটাই বলে দিচ্ছেন। এটাই বেদান্তের শেষ কথা। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের এটাই প্রথা, শেষ কথাকে আগে বলে দেওয়া হয়। যেমন রাজযোগ, সেখানেও প্রথমেই বলে দিচ্ছেন *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*। আর তার ফল কি? *তদাদ্রুষ্টুস্বরূপে অবস্থানং*। এরপর বাকি যত কথা আছে বলতে থাকবেন। এখানেও সেই একই জিনিষ করা হয়েছে। যেখানে তুমি পৌঁছাবে, ওই জ্ঞানোদয় হলে তুমি কি দেখবে সেটারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে –

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।।১/১/৬।।

(সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, মূলরিহত, আকারহীন, চক্ষুকর্ণহীন, হস্তপদবিহীন, অবিনাশী, ব্যাপক, সর্বত্র অনুস্যুত, অত্যন্ত সুক্ষ্ম অবিকারী তত্ত্ব যিনি, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের, সর্বপদার্থের উৎপত্তিস্থল – সেই তত্ত্বকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বত্র সর্বকালে দেখেন।)

সেই পরম পুরুষের বর্ণনা করা হচ্ছে, *যত্তদদ্রেশ্যম*, তাঁকে চোখে দেখা যায় না, *অগ্রাহ্যম্*, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে ধরতে পারব না। আর *অগোত্রম্* তাঁর সমগোত্র আর কিছু নেই। যেমন গ্লাশ আর বাটি দুটোই স্টীলের, একই গোত্রের। ঈশ্বরের কোন গোত্র হয় না। *অবর্ণম্*, সেই পুরুষের কোন রং নেই। অন্য দিকে *অচক্ষুঃশ্রোত্রং*, তাঁর নিজের কোন চোখ নেই কান নেই, *তদপাণিপাদম্* তাঁর কোন হাতও নেই পাও নেই। ঈশ্বরের ব্যাপারে সবার সাধারণ ধারণা যে তিনি আমাদেরই মত কোন মানুষ, তবে আমাদের থেকেও তিনি ক্ষমতাবান, ঐশ্বর্যবান ইত্যাদি। কিন্তু এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। এটাই হল নেতি নেতির সাধনা, আমাদের দৃষ্টির দিক থেকে এই এই নেতি, তাঁর দিক থেকে এই এই নেতি। এরপর ইতির দিক বলা হচ্ছে। *নিত্যং*, তিনি চিরন্তন আর তিনিই আছেন। *বিভুং সর্বগতং*, সর্বত্রই তিনি বিচরণ করছেন। *সুসূক্ষ্মং*, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। *তদব্যয়ং*, তাঁর কোন ক্ষয় হয় না। *যদ্ভূতযোনিং*, সমস্ত প্রাণীবর্গের তিনি যোনি, মানে সবারই সৃষ্টির কারণ তিনি। *পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ*, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা ব্রহ্মকে এইভাবেই দেখেন।

প্রথমে আমাদের ধারণা করার জন্য বলে দিলেন কোনটা কোনটা তিনি নন। আবার অন্য ভাবে ধারণা করার জন্য বলে দিচ্ছেন তিনি কোনটা কোনটা। যেগুলো তিনি আছেন বলছেন সেগুলোও নেতি। তিনি যা যা, তার কোনটার সাথে আমাদের জগতের কোন কিছুই মিলবে না। কোন জিনিষই জগতে নিত্য হয় না, বিভু হয়

না, সর্বগতং হয় না, সুসূক্ষ্মং বলে আমরা তো কিছুই জানিনা, অব্যয় বলেও এই জগতে কিছু নেই, সব জিনিষেরই হানি হয়। আর ভূতযোনি, আমরা জানি কোন কোন প্রাণী দুটো তিনটে বাচ্চা দেয়, মৌমাছি হাজার হাজার বাচ্চা দেয় কিন্তু ভূতযোনি, সব কিছুরই জন্ম দেয় এটা কখন দেখা যাবে না। এটা কারা দেখতে পান? *পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ*, যাঁরা ধীর পুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানীরাই দেখতে পান।

*অদ্রেশ্যম্*এর মানে যে জিনিষ চোখে দেখা যায় না। জিনিষটা আছে কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে চোখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সব কটি ইন্দ্রিয়ের কথাই বলা হচ্ছে, কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই তাঁকে জানা যাবে না। আমি কর্ণ দ্বারা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনব, জিহ্বা দিয়ে তাঁর আস্বাদ করব, হাত দিয়ে ঈশ্বরকে স্পর্শ করব, নাক দিয়ে ঈশ্বরের ঘ্রাণ নেব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যাবে না। (ইন্দ্রিয়গুলো হল *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্* - ইন্দ্রিয়গুলো হল বাহ্য বিষয়কে জানার জন্য, সব সময় বহির্মুখী থাকে বলে অন্তরাত্মার দিকে এদের দৃষ্টি নেই)। তাহলে ঠাকুর যে মা কালীর কথা শুনতেন! একবার নয় তিন তিনবার ঠাকুরকে মা কালী বলছেন 'তুই ভাবমুখে থাক'। ঠাকুর একটা কথা অনেকবার বলছেন 'আমার সব কিছু আলুনি লাগে'। আলুনি লাগা মানে তরকারিতে নুন না দিলে তরকারির স্বাদটা বিস্বাদ হয়ে যায়। ঠাকুর এক এক সময় এক এক ভাবে থাকতেন। তিনি নিজেও ভক্তদের বলতেন আমার ভাব পরিবর্তন হচ্ছে। উপনিষদের শিক্ষা মূলতঃ নির্গুণ নিরাকারের সাধনা, উপনিষদ কখনই সগুণ সাকারের চিন্তার কথা বলবে না। সেইজন্য উপনিষদে ভক্তির কথা পাওয়াই যাবে না। গীতাতে আবার সগুণ সাকার ও নির্গুণ নিরাকার দুটো ভাবের কথাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যার জন্য গীতা হল পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। অথচ উপনিষদের দর্শনকে ভিত্তি করেই ভগবান গীতার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছেন যেখানে সগুণ সাকারকেও গ্রহণ করা হয়েছে। তাহলে কে ভুল? উপনিষদ এক রকম বলছে, গীতা আবার নতুন জিনিষ যোগ করছে অন্য দিকে ঠাকুর আরেক রকম বলছেন। কেউ ভুল বলছেন না, সবাই ঠিক কথাই বলছেন। এখানে একটা দিককে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঠাকুর আবার উল্টো দিক থেকে বলছেন আমি হলাম এক ডেলে গাছ। এক ডেলে গাছ মানে, ঈশ্বর ছাড়া আমি আর কিছু জানিনা। উপনিষদ হল এক ডেলে গাছ – নির্গুণ নিরাকার ছাড়া অন্য কোন দিকে নজর দেবে না। নির্গুন নিরাকার পরব্রহ্মে যখন লীন হয়ে যাব তখন তাঁর শক্তির খেলাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। গীতা কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি, তাঁর অপরা প্রকৃতিকে মানছে। সেইজন্য গীতা সগুণ সাকারের কথা বলছে, সগুণ সাকারের কথা বললে স্বাভাবিক ভাবে ভক্তিকেও মানতে হবে। ভক্তির উপাদান যুক্ত হওয়াতে গীতা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। উপনিষদ কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে কখনই গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। তবে হ্যাঁ, উপনিষদের মধ্যে কিছু কিছু জিনিষ আছে যেগুলো সাধারণ মানুষের জীবনকে পরিশীলিত করার পক্ষে খুবই উপযোগী। সেইজন্য স্বামীজী বারবার বলছেন উপনিষদকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু সাধনা হিসাবে উপনিষদ কখনই সর্ব সাধারণের জন্য উপযোগী হতে পারেনা। উপনিষদ হল তাদেরই জন্য যাদের বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। গীতার কিছু বক্তব্য তবুও সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের বলা যাবে।

আমাদের ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে পুরো আধ্যাত্মিক সত্তার শক্তির উপর। সেইজন্য আমাদের ঋষি মুনিরা বলে দিলেন – পুরান তুমি যত রচনা করবার কর, স্মৃতি যত রচনা করতে পার করে যাও, তুমি মনুস্মৃতি লেখ, মহাভারত লেখ কিন্তু উপনিষদে কোন নাক গলাতে যাবে না। উপনিষদ হল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ভিত্তি, ব্রাহ্মণ ছাড়া কারুর কাছে যাবে না। ধর্মকে নিয়ে যত খুশি এদিক ওদিক করার করতে পার কিন্তু আধ্যাত্মিক জিনিষকে সবার সামনে ফেলে দিয়ে কখন খেলো করতে নেই। আমাদের সবাই ছোটবেলায় ধর্মের প্রথম পাঠ নিই পরিবারের জ্যেষ্ঠদের কাছে। সেখানে ধর্ম বলতে শিখেছি – ঠাকুর দেবতা আছেন, সকাল সন্ধ্যে ধূপকাঠি দিতে হবে, ফুল বেলপাতা নৈবেদ্যাদি দিতে হবে। ঠাকুর স্বামীজীও কি আমাদের এই শিক্ষাই দিতে ছেয়েছিলেন? আদপেই না। বর্তমান ধর্মগুরুরা মিডিয়ার দৌলতে এখন এই শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছেন। এই করে তাঁরা ধর্মটাকে পপুলার করার চেষ্টার নামে নিজেকে পপুলার করে চলেছেন। কিন্তু অধ্যাত্ম কি কখন পপুলার হয় বা পপুলার করা যায়! একদিকে তুমি ভগবানকে বিশ্বাস করার কথা বলছ আর অন্য দিকে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে যাচ্ছ, এই করে কি ধর্ম হয়! অধ্যাত্মর তো কোন প্রশ্নই আসে না। ভগবানে বিশ্বাস কি

এতই সহজ! ঈশ্বর প্রেমে মানুষ উন্মত্ত হয়ে যায়। ভগবানে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হলে তার যা আছে সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভগবান যিশুর কাছে একজন ধনী ব্যক্তি এসে বলছে আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। ভগবান যিশু তাকে বলছেন 'আগে যাও, গিয়ে তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে সেই অর্থ গরীবকে দান করে আমার সঙ্গে বেরিয়ে চল'। যিশুর কথা শোনার পর লোকটি সেই যে পালাল আর ফিরে এল না। কবীর দাসও বলছেন – আগে নিজের বাড়িতে আগুন লাগাও তারপর আমার সাথে চল। ধার্মিক পথে কে আসতে পারবে? যে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ করে বেরিয়ে আসতে পারবে। তা তুমি বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ করে দিলে, তোমার সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দিলে এরপর তুমি সঞ্চয় কার জন্য করছ? কিসের জন্য করছ? এটা তো ধার্মিক জীবনের সাথে খাপ খাচ্ছে না। আসলে তোমার ভগবানে এক পয়সারও বিশ্বাস নেই। আধ্যাত্মিকতার নামে পয়সা রোজগার করাটা গুরুতর অন্যায়। তুমি ভাগবতের কথাকার হয়ে গিয়ে নাচ কর, গান কর কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু নিজেকে আধ্যাত্মিক গুরু বলে পরিচয় দিও না। সাধারণ মানুষ চায় সস্তার ধর্ম, যে ধর্ম করলে আমার জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ আসবে সেই ধর্মই মানুষ পালন করতে চায়। এটা খারাপ কিছু নয়, এও দরকার কিন্তু আধ্যাত্মিকতা আর জাগতিক সুখ এক সঙ্গে চলতে পারেনা, দুটো বিপরীত ধর্মী। উপনিষদ হল আধ্যত্মিকতার গোমুখ, এখান থেকেই সব সত্য বেরোচ্ছে। উপনিষদকে তাই এইভাবে অপবিত্র করা যায় না। উপনিষদকে সব সময় শুদ্ধ, পবিত্র, সাত্ত্বিক রাখতে হবে। উপনিষদের শিক্ষা আলাদা থাকের মানুষের জন্য। উপনিষদের শিক্ষাকে ধারণা করার জন্য মনের যে পবিত্রতার দরকার, যে শুদ্ধির দরকার, যে কুশাগ্র বুদ্ধির দরকার এগুলো খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই হয়। ঠাকুর একজনকে দেখিয়ে বলছেন – দেখেছ! এর কি বুদ্ধি, সব চটপট ধরে নেয়। তাহলে সাধারণ মানুষ কি করবে? তাই তাদের বলে দিচ্ছেন তোমরা দু-বেলা হরিনাম কর, পূজো কর, ঠাকুরকে খুব করে ভোগ দাও, প্রসাদ খাও, চরণামৃত খাও। এরা সাধারণ লোক যারা কিছুই করছে না তাদের থেকে কিছুটা তো উপরে আছে। যতক্ষণ সমস্ত বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে না ডুবে যায় ততক্ষণ এই হরিবোল হরিবোল করে যেতে হবে। যখন শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধি ডুবে যাবে সে তখন অন্য রকম হয়ে যাবে, যেটা আমরা গোপীদের প্রেমে দেখতে পাই। উপনিষদ ঠিক সেই রকম। যাদের মন অত্যন্ত বিশিষ্ট তাদের জন্যই উপনিষদ।

ঠাকুর বলছেন আমি যখন অদ্বৈত ভাবে সাধনা করতাম তখন আমার রূপটুপ উড়ে যেত, ঘর থেকে সব দেবদেবীর পট খুলে ফেলতে হয়েছিল। পরে ঠাকুরই বলছেন নির্গুণ নিরাকারও সত্য সগুণ সাকারও সত্য। কিন্তু উপনিষদ নির্গুণ নিরাকারের বাইরে কোন দিক দিয়েই যাবে না। কারণ তাঁর কাছে ঈশ্বরের শক্তি আর তাঁর শক্তির খেলাতে কোন আগ্রহই নেই। আবার যারা ঠিক ঠিক ভক্তিমার্গের সাধক তারা বলবে আমার নির্গুণ নিরাকারের দরকার নেই, আমার শ্রীকৃষ্ণ হলেই হল। কিন্তু উপনিষদের দুটি মন্ত্র *সর্বং খলিদ্বং ব্রহ্ম* আর *অহং ব্রহ্মাস্মি*, এই দুটি মন্ত্রে ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই আর আমিই সেই ব্রহ্ম, সমস্ত উপনিষদের সার তত্ত্বকে বলে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই – যা কিছু দেখছি বোতল গ্লাশ, মাইক্রোফোন, মেয়ে দেখছি কি ছেলে দেখছি, জীর্ণ কলেবরে বৃদ্ধ দেখছি আর সদ্য যৌবনাপ্রাপ্তা যুবতী দেখছি, সবই তিনি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলছেন *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।* ঈশ্বরের আরাধনা করে বলছে নারীও তুমি নরও তুমিই, কুমারও তুমি কুমারীও তুমি, তুমিই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে লাঠি নিয়ে স্খলিত পদে হেঁটে যাচ্ছ। আর তুমিই *বিশ্বতোমুখঃ*, সেই ঈশ্বরও তুমি। আর আমি কে? আমিও সেই তুমি।

স্বাধীন ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা, এই দুটো ইচ্ছার কথাই আমরা শুনে আসছি। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু আছে নাকি! স্বাধীন ইচ্ছা বলতে আমরা মনে করি ঈশ্বর বলে উপরে একজন একটা সুপার কম্প্যুটর নিয়ে দিব্যি বসে আছেন, আর তাঁর হাজারটা হাত, হাজারটা পা। এই হাজারটা হাত দিয়ে তিনি কম্প্যুটারের কীবোর্ডের উপর আঙুল চালিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বর কি কখন এই রকম হতে পারেন? খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মে এই সমস্যা হয়ে যায় কিন্তু হিন্দুদের কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়। হিন্দুদের কাছে তিনি ছাড়া কিছু নেই আর আমার ভেতরেও তিনিই আছেন। আমার যে ইন্দ্রিয়গুলো চলছে, আমি যে কথা বলছি, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছি, আমার যে শরীর মন নড়ছে, আমার যিনি অন্তর্যামী, জীব যিনি তিনিই এগুলো নাড়াচ্ছেন। এই অন্তর্যামী আর

সেই ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমি যখন দেহবোধে নিজেকে ভাবছি তখন তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই নড়ছে না। আর আমিই যখন ঈশ্বরের সঙ্গে এক বোধ করছি তখন আমার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই নড়ছে না। হয় পুরো স্বাধীন ইচ্ছা, কোন অর্থে? *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমিই সেই ব্রহ্ম আর তা নাহলে পুরোটা তাঁর ইচ্ছা। মাঝামাঝি কিছু হতে পারেনা।

একবার দিল্লীতে এক বিজনেসম্যান এক সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করছে 'বাবাজী! আপনার কি মনে হয়, স্বাধীন ইচ্ছা মানুষের কতটুকু আছে'? সাধুবাবা বলেদিলেন আমি তোমাকে পরে বলব। দিন সাতেক পর সেই বিজনেসম্যান এসে বলছে 'বাবাজী! আমি অনেক হিসাব করে দেখলাম মানুষের শতকরা ৩৬% স্বাধীন ইচ্ছা'। এই হিসাব কোথায় পেলেন কেউ বলতে পারবে না। হয় স্বাধীন ইচ্ছা বল আর তা নয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা বল। স্বাধীন ইচ্ছা কোন অর্থে? আমি শরীর মন বোধের অর্থে নয়, আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য এই বোধের অর্থে। এই শরীর, মন তো জড়। এই গ্লাশ বোতলের যেমন নিজের কোন ইচ্ছা হতে পারেনা, ঠিক তেমনি আমার এই শরীর মনের কোন ইচ্ছাই হতে পারেনা। কি করে হবে? এই মনটাও জড়। জড়ের কি করে ইচ্ছা হবে! জড়কে চালনা করার জন্য চৈতন্যের দরকার। সেই চৈতন্য কে? তোমার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী। সেই অন্তর্যামী যিনি, ঈশ্বরও তিনি। যিনি ঈশ্বর তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। এই শরীরকে যিনি চালাচ্ছেন তিনি ছাড়া আর কে চালাবেন। ঠাকুর তাই বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও পর্যন্ত নড়ে না। কিন্তু আমরা বলছি গাছের পাতাকে বাতাস নাড়াচ্ছে। তাহলে বাতাসটা কি? বাতাসটা মূলতঃ এণার্জি। এণার্জিটা কি? ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি। যেমন আমার ভেতরে অন্তর্যামী আছেন, ঠিক তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন আত্মা আছেন। সেই আত্মা ঈশ্বরের সাথে এক, আমার আত্মাও ঈশ্বরের সঙ্গে এক। আমরা যখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলি তখন মনে করি ভগবান ওপর থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। মুর্খদের ধর্মে এই রকমই হয়। ধর্মতো সবার জন্যই। শ্রীশ্রীমা বলছেন আমি সতের মা অসতেরও মা। কিন্তু একটা কাজের কথা বলেননি আমি মুর্খেরও মা আর বুদ্ধিমানেরও মা। এগুলো হল মুর্খদের ধর্ম, মুর্খদের ধর্মে ঈশ্বর উপরে বসে কলকাঠি নাড়েন। সেইজন্য শাস্ত্র পড়তে বলা হয়, পড়ে ধারণা করতে হয়।

অনেকে প্রশ্ন করেন পুনর্জন্ম যখন হয় তখন পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারে কিনা। তার মানে, জীবাত্মার মধ্যে নারী পুরুষের ভেদ আছে নাকি। আমার ভেতরে যে জীবাত্মা আছেন সে কি জানে আমি পুরুষ? আদপেই জানেন না। জীবাত্মার কাছে আছে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আছে মস্তিষ্কের কিছু স্নায়ু কেন্দ্র আর হাত, পা, চোখ, কান এগুলো হল টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, স্টেথোস্কোপ। জীবাত্মার কাছে এগুলোর কোন দাম নেই। আমি কখন টেলিস্কোপ লাগাচ্ছি কখন মাইক্রোস্কোপ লাগাচ্ছি। ঠিক তেমনি কখন পুরুষ হয়ে যাচ্ছে, কখন নারী হয়ে যাচ্ছে। ওর মধ্যে আবার কিছু জেনেটিক বিষয় এসে যায়। আসল যে জীবাত্মা তাঁর কোন লিঙ্গ নেই, আর যিনি শুদ্ধ আত্মা তাঁর তো কিছুই নেই। প্রথম হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, তারপর যিনি আসছেন তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি আছে। এরপর যেগুলো আসছে সেগুলো হল গোলক। গোলক মানে আমাদের ইন্দ্রিয়ের এই যন্ত্রগুলো হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি। এই গোলকগুলোর কোন গুরুত্বই নেই। একজন অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না কিন্তু তাই বলে কি তার দৃক্ ইন্দ্রিয় নেই! দৃক্ ইন্দ্রিয় তার থাকতেই হবে কিন্তু তার যে গোলক সেটা নেই। রেটিনা বসিয়ে দিয়ে এখন তো অনেকের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সম্ভব না হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা তার তো ইন্দ্রিয় আগে থাকতেই আছে। কিন্তু তার বাইরের ইন্দ্রিয়টা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভেতরের ইন্দ্রিয়তে যদি গোলমাল থাকে তাহলে বাইরের ইন্দ্রিয় কখনই সারান যাবে না। জীবাত্মা যদি একবার মনে করে আমি আর এই শরীরে থাকব না, তখন যে যাই করুক সে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলোর দৃষ্টি সব সময় বাইরের দিকে। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মত করে হাত পা তৈরী করে নেয়। যখন দেখে এই জৈব হাত দিয়ে সে কিছু কাজ করতে পারছে না তখন হাতের জন্য বড় বড় মেশিন বানিয়ে নিচ্ছে, চোখের জন্য টেলিস্কোপ, কানের জন্য স্টেথোস্কোপ বানিয়ে নিচ্ছে। তাতেও যদি না হয় তখন ইলেক্ট্রো টেলিস্কোপের আরও পাওয়ারফুল মেশিন বানিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এই সব সম্প্রসারিত ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে জানার জন্যই লাগান হচ্ছে। *নান্তরাত্মন্*, এগুলো দিয়ে অন্তরাত্মাকে জানা যায় না।

শুদ্ধাত্মার আরেকট বৈশিষ্ট্য হল *অগ্রাহ্যম্*। প্রথমে বলা হল অদৃশ্য, তাঁকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না। এবারে বলছেন অগ্রাহ্য, তাঁকে কর্মেন্দ্রিয় দিয়েও জানা যাবে না। একটা মজার গল্প আছে, একজন পায়েস খেয়েছে। তাকে এক গরীব অন্ধ জিজ্ঞেস করছে তুমি কি খেয়েছ। লোকটি বলছে পায়েস খেয়েছি। অন্ধ জানতে চাইছে পায়েসটা কি রকম। বলছে সাদা ধবধবে। অন্ধটি জিজ্ঞেস করছে সাদাটা আবার কি রকম? লোকটি বলল বকের মত সাদা। অন্ধ সে বক কোন দিন দেখেনি, বলছে বকটা আবার কি? তখন তাকে একটা বক ধরে এনে দেওয়া হয়েছে। অন্ধটি বকের গলায় হাত দেওয়ার পর বলছে – ও বুঝেছি পায়েস হল ব্যাঁকা। একে আর কখন বোঝান যাবে না পায়েস কি রকম। ব্রহ্মকে যেমন চোখ দিয়ে দেখা যাবে না, তাহলে হাত দিয়ে যে বুঝে নেবে সেটাও কারুর দ্বারা হবে না। ব্রহ্ম আবার *অগোত্রম্*, ব্রহ্মের কোন মূল নেই। আমাদের সবারই গোত্র থাকে, গোত্র দিয়ে আমাদের বংশ কোথা থেকে শুরু হয়েছে জানা যায়। কিন্তু ভগবান হলেন স্বয়ম্ভূ, তাঁর কোন মূল নেই। যেমন স্টীলের গ্লাশ আর স্টীলের বাটি, দুটোর একই গোত্র, এদের মূল স্টীল। ভগবানের কোন গোত্র নেই, তিনি নিজে থেকেই আছেন। ভগবানের মূল নেই বলে তাঁর কোন অন্বয় করা যায় না, অন্বয় মানে বিশ্লেষণ করা যায় না। যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করে করে যে ভগবানে পৌঁছে যাবে সেটা কখন সম্ভব হবে না। কেন হবে না? তাঁর কোন মূল নেই। দুভাবে অন্বয় করা হয়, প্রথমে একটা একটা করে ধরে ধরে ধাপে ধাপে মূলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, দ্বিতীয় পদ্ধতি হল তার উপাদানগুলিকে আলাদা আলাদা করে ভেঙে দেওয়া হয়। যে কোন জটিলকে তার উপাদানে ভেঙে দিয়ে যখন সরলীকরণ করে দেওয়া হয় সেখান থেকে বস্তুর মূলটাকে ধরা হয়। এটাকে বলে অন্বয়, অন্বয় করলে বোঝা যায় জিনিষটা আসলে কি।

আমাদের বড় বড় দার্শনিকরা বলছেন যে কোন compound কে simple দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু যে জিনিষটা simple সেটা চলে যায় ধারণার স্তরে, simple কে কখন অন্বয় করে পরিভাষিত করা যাবে না। যে জিনিষটা যত simple হয় সেই জিনিষকে define করা তত কঠিন হয়। কিন্তু যেটা জটিল সেটাকে ব্যাখ্যা করা হয় simple জিনিষের মাধ্যমে। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর হলেন সহজ। সহজ মানে simplest। ঈশ্বর হলেন সহজের শেষ কথা। সেইজন্য ঈশ্বরকে কোন দিন অন্বয় করা যাবে না। ইংরাজীতে প্রবাদই আছে God defined is no God।

অগোত্রমের পর বলছেন *অবর্ণম্*। ঈশ্বরের কোন বর্ণ নেই। জগতে যত জিনিষ আছে সবারই একটা না একটা রঙ থাকবে কিন্তু ভগাবনের কোন রঙ নেই। ঠিক তেমনি প্রত্যেক বস্তুর যেমন কোন না কোন একটা আকার আছে, মোটা, পাতলা, লম্বা, বেঁটে ইত্যাদি, ভগবানের এই ধরণের কোন আকার হয় না। যেটা দিয়ে অন্য বস্তু থেকে ভগবানকে আলাদা করা যাবে এই ধরণের কোন বর্ণ তাঁর মধ্যে নেই। এই যে অক্ষরের কথা বলা হল তিনি *অবর্ণম্*।

এতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিতে অক্ষরকে নেতি নেতি করে বলা হল। এবারে সেই অক্ষরের দৃষ্টিতে নেতি নেতি করে বলা হচ্ছে – *অচক্ষুঃশ্রোত্রং*। এর পরের দিকে মন্ত্রে বলা হবে *যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্*, এই ব্রহ্ম তিনি সর্বজ্ঞ। কেন তাঁকে সর্বজ্ঞ বলা হচ্ছে? তিনি শুদ্ধ চৈতন্য। আমরা কখন চৈতন্য কখন জড়, কখন জেগে আছি কখন ঘুমিয়ে থাকি। তিনি শুদ্ধ চৈতন্য ভাবলে তাঁকে পুরুষ ভাবতে হবে। যখন আমি কাউকে বলছি – তোমাকে আমি চিনেছি, তুমি একটা ঠগ্‌বাজ। আমি নিশ্চয়ই লোকটির কিছু দেখেছি বা শুনেছি বলেই তাকে এই কথা বলতে পারছি। ভগবান যদি সর্বজ্ঞ হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কোথাও থেকে জেনেছেন। জানা কিভাবে হয়? চোখ দিয়ে, কান দিয়ে। ভগবানের ব্যাপারে এই ধারণা যাতে না করা হয় তাই এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। এই ভুল করো না, তিনি *অচক্ষুঃ অশ্রোত্রম্* - তিনি চৈতন্যবান, তিনি সব কিছুই জানেন, সব জায়গায় বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর যে জ্ঞান হয় সেটা প্রত্যক্ষ ভাবে হয়, সেই জ্ঞান কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয় না। আমাদের কোন কিছু জানতে হলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানতে হয়। ভগবানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। যোগীদের ব্যাপারেও বলা হয়, তাঁরা মনের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, তাঁদেরও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমের দরকার পড়ে না। ঈশ্বরের সেই মনেরও দরকার পড়ে না। মনটাও একটা

মাধ্যম। ঈশ্বর হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর মধ্যেই হচ্ছে। ঈশ্বরের চোখ, কান, নাক কোন কিছুরই দরকার হয় না, তাঁর মন এমনকি বুদ্ধিরও দরকার হয় না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে এখানে যেটা বলা হচ্ছে এটাকে ধারণা করা বা বোঝা খুব কঠিন। Intuition বলে একটা জিনিষ হয় যেটাকে আমরা স্বজ্ঞা বলি, পেছন থেকে কেউ আসছে, আমি দেখিনি, কোন আওয়াজ নেই কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠছি।

জিম করবেটের লেখাতে এই রকম একটা বর্ণনা আছে। উনি একবার একটি বাঘিনীর শিকারে গিয়েছিলেন। সারাদিন ধরে তল্লাশ করে যাচ্ছেন। জিম করবেটও জানেন বাঘিনীটাও তাঁকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে, সেটা আবার নরখাদকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। উনি খুব সামলে ধীরে ধীরে পা ফেলে একটু একটু করে এগোচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মন বলছে এই সেই বাঘিনী এসে পড়েছে। উনি লিখছেন, কিছু হয়নি – চোখ দিয়ে আমি দেখিনি, কোথাও কোন আওয়াজ নেই। কোন পাখি ডাকেনি, গাছের কোন পাতা নড়েনি। কিন্তু আমার মন বলল এই বাঘিনী। যে মুহুর্তে মন বলল এই বাঘিনী দেখছি দু-ফুট উপরে একটা পাথরের উপর বাঘিনীটা বসে আছে আর ঝাঁপ মারল বলে। এক সেকেণ্ড একটু এদিক সেদিক হলে জিম করবেটের খেলা শেষ হয়ে যেত। মনের মধ্যে ওঠা আর এক সেকেণ্ডে সোজা ওর মুখের মধ্যেই গুলিটা চালিয়ে দিলেন। এই যে intuitive perception যেখানে চোখ, কান, নাক কিছুই কাজ করে না মন সেখানে সরাসরি বলে দিচ্ছে বাঘিনীটা ঝাঁপ মারছে। এখানে মন থেকে মনে সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে ঈশ্বরের চৈতন্য সত্তার কথা হচ্ছে, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাই তিনি সরাসরি সব কিছু জানেন, তাঁর ইন্দ্রিয়তো অনেক ছোট জিনিষ, মন বুদ্ধিরও দরকার হয় না। শিশু জানে মা আমাকে ভালোবাসে, মা জানে আমার শিশু আমাকে ভালোবাসে। এখানে তাও শরীর আছে, আর আগেই বলে দেওয়া হয়েছে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের শরীরও নেই।

অচক্ষুঃশ্রোত্রং বলা মানে সংসারী জীব যেরকম হয় সেটাকে নঞর্থক করা হচ্ছে। আচার্য তাঁর ভাষ্যে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ থেকে একটি মন্ত্র *'পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'* উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন এটাই একমাত্র মন্ত্র নয়, এই ধরণের মন্ত্র শ্রুতিতে অনেক জায়গায় আছে। তিন সব কিছু দেখছেন, সব কিছু শুনছেন, সব কিছু জানেন অথচ তিনি *তদপাণিপাদম্*, তিনি হস্তপদ বিহীন। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানেন্দ্রিয়ও নেই কর্মেন্দ্রিয়ও নেই।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনটে জিনিষ জড়িতে থাকে – জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান। এখানে যেমন আমি আছি, বোতল আছে আর জানার পদ্ধতি আছে, এটাকে বলছে জ্ঞান। আর শুধু এই জ্ঞানেও কিছু হয় না, এই জ্ঞানের পরে আবার কর্ম হয়। আমার জল তৃষ্ণা পেয়েছি। এখানে প্রথমে আসবে জ্ঞান, বোতলে জল আছে। এর পেছনে পেছনে সব সময় আসবে কর্ম। কর্ম এসে গেলে তার সাথে ঠিক ঠিক হিসেব করলে আবার নটি জিনিষ এসে যায়। জ্ঞানের এই চক্রে বারোটি জিনিষের দরকার, জ্ঞানের তিনটে বিষয় আর কর্মের নটি বিষয়। প্রত্যেকটি জিনিষে এই বারোটি ব্যাপার জড়িয়ে থাকবেই। এটাই অপরা বিদ্যার লক্ষণ। যেখানেই এই বারোটা জিনিষ জড়িয়ে আছে সেটাই অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যার ক্ষেত্রে কি হয়? যিনি জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয় আবার তিনিই জ্ঞান। আর এই জ্ঞানের পরে ঠিক উল্টোটা হয়, কোন কর্ম আর তার বাকি থেকে যায় না। কোন কর্ম আর সে করবেই না। তার নৈষ্কর্ম সিদ্ধি হয়ে যায়। শুধু এক থেকে যায় এটাও বলা যাবে না। সেইজন্য বলা হয় এক দুইয়ের পার। কারণ তখন আর কিছু নেই, ঐটাই আছে। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এই পরা বিদ্যাকে যে ধারণা করা হবে, যত শাস্ত্র শোনা হয়ে থাকুক, যত শাস্ত্র পাঠ করা হয়ে যাক, ধারণা হবে না। তাহলে কিভাবে হবে? যখন হবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে। লেগে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন ভেতর থেকেই দপ্ করে জানান্ দিয়ে দেবে – ও এটাই পরা বিদ্যা! সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – সময় না হলে হয় না, তবে শুনে রাখতে হয়।

যে কোন বিদ্যা যেটা লিখিত আকারে আছে, তা বেদ হোক, বেদাঙ্গ হোক বা বেদান্ত হোক শুধু তাই নয়, আমাদের যত বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা সম্বন্ধীয় যত বিদ্যা আছে সবটাকেই বলছেন অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা সংসার-সুখ বৃদ্ধি করে। স্বর্গের সুখটাও সংসার-সুখ। স্বর্গও এই সংসারের বাইরে নয়। জীবিত অবস্থায় এই সংসারে আমি কিভাবে আনন্দ উপভোগ করতে পারি এবং মৃত্যুর পরেও কিভাবে আমি আনন্দ

উপভোগ করে যেতে পারি – এই বিজ্ঞানকে বলে অপরা বিদ্যা। এর বাইরে যা সেটাই পরা বিদ্যা। এর বাইরে কিছু আছে কিনা সেটাই আমাদের জানা নেই। তবে এর বাইরে যা আছে তাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যার পার্থক্য এটাই। অপরা বিদ্যাতে প্রথমে তিনটে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান। তারপরে আসে নটি কর্মের ব্যাপার। পরা বিদ্যা হল, যেটা আছে সেটাই আছে। জ্ঞান মানেই একটা বস্তুকে আমার ভেতরে নিয়ে আসা হল। কর্ম মানে, একটা জিনিষ বাইরে ছিল সেটাকে আমি করায়ত্ত করে নিলাম। জ্ঞান মানে বাইরে থেকে মাথার ভেতরে নিয়ে আসা আর কর্ম মানে বাইরের জিনিষকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা। ব্রহ্মজ্ঞান কি এই ভাবে কখন হবে? প্রথম কথা হবে না। কারণ, ঠাকুর বলছেন এক সের ঘটিতে পাঁচ সের দুধ ধরবে না। দ্বিতীয়তঃ এর থেকে আরও বড় একটা সমস্যা আছে, যেটা অদ্বৈত জ্ঞানের একটা বৈশিষ্ট্য।

প্রথম কথা হল আমাদের মন এত ছোট তার মধ্যে ব্রহ্মকে ধরা যাবে না। কিন্তু তার থেকে আরও মারাত্মক বড় সমস্যা আছে যেখানে এই পরা বিদ্যার ভাবটা লুকিয়ে আছে। সেইজন্য আমরা যেই অর্থে জাগতিক জ্ঞান বলি সেই অর্থে আত্মজ্ঞান জ্ঞান নয়। ঈশ্বর দর্শন বললেও আমরা বুঝব না, ঈশ্বর দর্শনটা যে কি জিনিষ আমরা অনেকেই বুঝব না। আত্মজ্ঞান, ঈশ্বর দর্শন এই শব্দগুলো জাগতিক। অদ্বৈত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল, এই জ্ঞান বাইরে থেকে আসছে না, এই জ্ঞান আমাদের ভেতরে সব সময় বিদ্যমান। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের মধ্যে সব সময়ই আছে। একজন চাকরীতে ঢোকার পর সে ধাপে ধাপে প্রমোশন পেয়ে পেয়ে একটা উচ্চপদে পৌঁছাচ্ছে, তাতে তার মাইনে বাড়ছে, পদমর্যাদা বাড়ছে। এখানে একটা প্রাপ্যের ব্যাপার এসে যাচ্ছে, যেটা আগে ছিল না সেটার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। আত্মজ্ঞানে তা হয় না। আত্মজ্ঞান হয় আমার আছে আর তা নাহলে নেই, মাঝামাঝি কোন অবস্থা হয় না। কেউ যদি এসে বলে আমার শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তার মানে সে পুরোটাই মিথ্যা কথা বলছে। আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে হয় তার জিরো পার্সেন্ট থাকবে আর তা নাহলে হাণ্ড্রেড পারসেন্ট থাকবে। আত্মজ্ঞান হয় আছে আর নয়তো নেই, মাঝামাঝারি কিছু নেই। আত্মজ্ঞান যদি প্রাপ্য না হয় তাহলে একে বিদ্যা বলছে কেন? আমার গলায় একটা সোনার চেন আছে। আমি হঠাৎ ভুলে গেছি চেনটা কোথায় রেখেছি। আমি চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন কেউ আমার গলার দিকে নজর দিয়ে বলল, চেনটাতো তোমার গলাতেই আছে। এরপর আমি কি সোনার চেনটা পেয়ে গেলাম? পাওয়ার কি আছে, চেনটা তো কখন হারায়নি। তাহলে কি হয়েছিল? আমার মনে ভ্রান্তি এসেছিল। এটাকেই আমরা বলি ভ্রান্তি দূর করা। যখন আমার মনে হয়েছিল সোনার চেনটা হারিয়ে গেছে তখন সত্যিকারের ভ্রান্তি ছিল। অদ্বৈত জ্ঞানে যে ভ্রান্তিটা দূর হয় সেটা কিন্তু আসল ভ্রান্তি নয়, ওটা ভ্রান্তিরও ভ্রান্তি। এটাই মায়া, আছে আবার নেই। বিস্মৃতিটা আছে আবার নেই। এনারা বলেন মানুষ যে জিনিষটা জানেনা সেই জিনিষটার পেছনে কখন দৌড়াবে না। আমি যে অফিসে কাজ করছি, এমন কোন কি নিশ্চয়তা আছে যে আগামীকাল অফিসটা লক আউট হয়ে যাবে না। এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি যে রাস্তায় বেরোলে আমি গাড়ি চাপা পড়ব না। তাহলে কি আমরা ঘর থেকে কখন বেরোব না? মানুষের মনে কোথাও একটা আস্থা আছে যে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেই কাজটা করতে পারব। যারা জীবনে বড় হতে চাইছে, আত্মজ্ঞানের দিকে যারা এগোচ্ছে, কোথাও তার ভেতরে ঐ জিনিষটার একটা ধারণা আছে আর কোথাও তার এই বিশ্বাস আছে যে সেটা তার নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব। মানুষ যখন জীবনে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি পাওয়ার আশায় ছুটে মরছে তখন বলি আমরা সবাই মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছি। মরীচিকাকে এখানে সত্য বলেই সেই দৌড়াচ্ছে। মরীচিকাতে জল দেখছে বলেই সেই ছুটে যাচ্ছে, জলের ব্যাপারে যদি তার কোন ধারণাই না থাকত তাহলে সে মরীচিকার পেছনে দৌড়ে যেত না। ঠাকুর বলছেন পাঁচ বছরের বাচ্চাকে রমণ সুখ বোঝান যাবে না। পাঁচ বছরের বাচ্চার রমণ সুখের কোন ধারণাই নেই। ঠিক তেমনি আমাদের মনের মধ্যে কোথাও কোন ভাবে আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা ধারণা আছে, তা নাহলে মানুষ ঈশ্বরের জন্য দৌড়াত না। প্রত্যেক মানুষের মনে স্বাধীন হওয়ার একটা ইচ্ছা থাকে, কোথাও একটা নিজেকে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার প্রেরণা থাকে – আমাকে আরও বড় হতে হবে, আমাকে আরও অনেক উপরে উঠতে হবে, আমাকে আরও বিদ্যার্জন করতে হবে।

ঠিক তেমনি আমাদের সবারই ভেতরে আত্মজ্ঞান আছে এই বোধটা আছে। কিন্তু অজ্ঞান আত্মজ্ঞানের বোধটাকে আটকে দিচ্ছে। এটা বিস্মৃতিও নয়, বিস্মৃতিতে সে সব ভুলে যাচ্ছে কিন্তু এখানে ভুলে যাচ্ছে না, স্মৃতিতে হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক দিতে থাকে, নিজেও ঠিক বুঝতে পারেনা তার কি হচ্ছে। কোন কারণ নেই কিন্তু কিছুই ভালো লাগছে না, সংসারও ভালো লাগে না। পরা বিদ্যা হল, আমি যে পূর্ণ, আমার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান, আমার মধ্যে যে আত্মজ্ঞান লাভের ক্ষমতা আছে এটাকে মায়া বা অজ্ঞানের আবরণ ঢেকে রেখেছে, এই বোধটা তার পুরোপুরি সজাগ হয়ে যায়। এই মায়া বা অজ্ঞান সত্যিকারের নয়, এখানে আমার আর আপনার মাঝখানে যদি একটা পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয় তখন এই ব্যবধানটা বাস্তবিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই অজ্ঞান বা মায়াকে বেদান্ত কখনই মানবে না। আচার্য শঙ্কর এত কিছুর যে ভাষ্য লিখলেন, ব্রহ্মসূত্র লিখলেন, সমস্ত ভাষ্যে তিনি এটাই দেখাচ্ছেন এই বাধা বা ব্যবধানটা বাস্তবিক নয়। বাস্তবিক যদি হত তাহলে এই বাধাকে অপসারন করার প্রচেষ্টাটাও বাস্তবিক হবে। তখন যে অর্থে আমরা জ্ঞান হওয়া বলি সেই অর্থে আর জ্ঞান হবে না, তখন সেটাও অপরা বিদ্যার মধ্যে গণ্য হবে। কারণ তখন জ্ঞান, জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় তিনটেই আলাদা হয়ে যাবে। পরা বিদ্যাতে এই তিনটে আলাদা থাকে না। সেইজন্য এই ব্যবধানটা বাস্তবিক নয়, কল্পনা করে নিয়েছে। কল্পনাতে একবার সত্যি হচ্ছে আবার মিথ্যে হয়, মিথ্যে আবার সত্যি হয়। বিস্মৃতি যখন বলছেন তখন এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় বোঝানর জন্য, আসলে এটা বিস্মৃতিও নয়, কাল্পনিক একটা জগৎ তৈরী করে নিয়েছে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরে চেঁচিয়ে যাচ্ছি আমার বাঁ হাতা ছাড়াতে পারছি না। এই বন্ধনটাও একটা কাল্পনিক। পরা বিদ্যা আমাদের মনের অজ্ঞানরূপ পর্দাটা উড়িয়ে দেয়। পর্দা সরানোটা আমাদের অর্থে বিদ্যা, আসলে কিন্তু এটা বিদ্যা নয়। বিদ্যা হলেই তিনটে এসে যাবে – জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। সেই অর্থে পরা বিদ্যা জ্ঞান, জ্ঞাত ও জ্ঞেয় নয় কিন্তু অন্য দিকে একটা জিনিষকে সরিয়ে দিচ্ছে বলে এটাকে বিদ্যা বলা হচ্ছে, সেইজন্য একে পরা বিদ্যা বলা হয়। পরা বিদ্যা নতুন কিছু বিদ্যা নিয়ে আসছে না, আমাদের যে অজ্ঞানটা আছে সেটাকে সরিয়ে দিচ্ছে।

পরা বিদ্যা সম্বন্ধে আমরা যত আলোচনাই করি না কেন, এটা কেউ কাউকে বুঝিয়ে দিতে পারে না, যেদিন বোঝার সেদিনই বোঝা যাবে। তখন যা কিছু আলোচনা হয়েছে সবটাই এক সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা জানি বেদ, উপনিষদ মিথ্যা কথা বলছে না, গীতা মিথ্যা কথা বলছে না, ঠাকুর মিথ্যা কথা বলছেন না, বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট মিথ্যা কথা বলছেন না। এনারা সবাই তো বলছেন তুমিই সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি। এগুলো তো মিথ্যা কথা নয়। কিন্তু আমরা কি নিজেকে মনে করতে পারছি অহং ব্রহ্মাস্মি? পারছি না। কেন পারছি না? এটাই হল সংশয় বিপর্যয়, এটাই মায়া। সংশয়টা কি? স্বামীজীর রচনাবলী যখন পড়ছি তখন দেখছি তিনি বলছেন you are free, your eaternally free তুমি চিরন্তন মুক্ত, তোমার স্বভাবই হল শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-নিত্য-আত্মা। পড়েই আমাদের শরীর মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, সত্যিই তো আমি মুক্ত। তারপরই স্ত্রী চোখ-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল 'তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাজারে না গিয়ে এখন বসে বসে ধর্মের বই পড়ছ, আমার ভাই বিয়ে করে নতুন বউকে নিয়ে আসছে তাদের কি রান্না করে খাওয়াব'! ঐখানেই তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-নিত্য-আত্মা সব উড়ে যাবে। তখন মনে হয় আমি বন্ধনেই আছি, বিয়ে না করলেই হত। এটাই হল সংশয়। অহং ব্রহ্মাস্মিটা গেল কোথায়? তারপর আবার দু-তিন ঘন্টা পরে বই পড়তে শুরু করলাম, আবার তখন মনে হবে স্বামীজী ঠিকই বলছেন। এই যে দোদুল্যমানতা, এই বোধ হল আমি পূর্ণ ব্রহ্ম আবার এইক্ষণেই মনে হচ্ছে আমি তো সব দিক থেকে বদ্ধ জীব। খিদে পেলে খাবার দেবার জন্য একে তাকে বলতে হয়, অফিসে বসের গালাগাল শুনতে হয়, স্ত্রী-পুত্রের গঞ্জনা শুনতেই হয়। এই জ্ঞান এই অজ্ঞান, অজ্ঞান থেকে আবার জ্ঞান এটাকেই বলছে সংশয়।

উপনিষদ ও আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে তত্ত্বমসি, তুমিই সেই, এই জিনিষগুলো খুব মজা করে বর্ণনা করা আছে। একবার প্রজাপতির কাছে অসুরদের রাজা বৃত্রাসুর আর দেবতাদের রাজা ইন্দ্র দুজনেই গেলেন অমৃতত্ব পাওয়ার উপদেশের জন্য। প্রজাপতি শুধু তাদের বলে দিলেন তত্ত্বমসি, তুমিই সেই। এই তত্ত্বমসি শুনে দুজনেরই খুব আনন্দ। বৃত্রাসুর অসুরদের কাছে ফিরে এসে বলছে 'আমি জেনে গেছি আমিই সেই, খুব করে

খাও-দাও আনন্দ কর ফুর্তি কর’। সেই থেকে অসুররা ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থের জন্য, খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হল। যারাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারাই অসুর। অসুররা ব্রহ্মারই সন্তান, দেবতাদেরই ভাই, আলাদা কিছু নয়। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রও দেবতাদের মাঝখানে গিয়ে এই কথা বলাতে তারাও আনন্দ করতে শুরু করেছে। তারপরই ইন্দ্রের সন্দেহ হয়েছে, বেদেতো বলছে আত্মা অজর অমর কিন্তু আমার শরীরের বৃদ্ধি হচ্ছে ক্ষয় হচ্ছে, শরীর খারাপ করছে। এই বোঝার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে। ইন্দ্র আবার প্রজাপতির কাছে গেলেন। আপনি আমাকে অমরত্বের উপদেশ দিন। প্রজাপতি আবার সেই বলে দিলেন তত্ত্বমসি। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার সে অন্য রকম চিন্তা করতে করতে দেখছে প্রাণই তাহলে আত্মা। কিছু দিন পর ইন্দ্রের আবার সন্দেহ হল। আবার সে প্রজাপতির কাছে গেলেন। তিনি আবার ইন্দ্রকে বলে দিলেন তত্ত্বমসি। এই ভাবে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি একটা একটা করে চিন্তা করতে করতে চেতনার উন্মেষ হচ্ছে। শেষে দেখছে আমিই সেই শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা। সেই থেকে দেবতারা হয়ে গেলেন অমর। আর সেই থেকে দেবতারা সব কিছুতে অসুরদের থেকে হয়ে গেলেন শক্তিশালী। এটা একটা আখ্যায়িকা। আমি গুরুর কাছে গেলে গুরু একটা কথাই বলে দেবেন তত্ত্বমসি। যেমনি বলবেন তুমিই সেই আমার মনটাও চাঙ্গা হয়ে যাবে, ওঃ আমিই সেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভিড় বাসে ধাক্কাধাক্কি খেলেই মনের চাঙ্গা ভাবটা উবে গিয়ে সব উৎসাহ দমে যাবে। এটাকে বলে সংশয়।

বিপর্যয় হল বিপরীত জ্ঞান। বৃত্রাসুরের যেটা হয়েছিল। কি বিপরীত জ্ঞান? তত্ত্বমসি, তুমিই সেই বলতেই বৃত্রাসুর অনাত্ম দেহকেই আত্মা মনে করেছে। বিপর্যয়ে এই দৃশ্যমান জগতকেই ব্রহ্ম বলে বোধ হবে। সংশয় বিপর্যয় যা কিছু হচ্ছে শুধু মায়ার আবরণের জন্য। জ্ঞানের দ্বারা এই মায়ার আবরণকে পুড়িয়ে দিতে হয়। বস্তুত মায়ার আবরণ কখনই ছিল না, মায়ার আবরণ মানেই এই সংশয় বিপর্যয়। সন্দেহ হচ্ছে আর সেখান থেকে বিপরীত জ্ঞান জন্ম নিচ্ছে। অজ্ঞান নাশ মানে বারবার নিজের উপর সন্দেহ হওয়া আর বিপরীত জ্ঞান হওয়ার হেতু গুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। অজ্ঞানের নাশ হতে কতক্ষণ লাগে? তৎক্ষণাৎ। ঠাকুরের খুব সুন্দর উপমা আছে – হাজার বছর ধরে অন্ধকার ঘর বন্ধ হয়ে আছে। যদি আলো আনা যায় তাহলে অন্ধকার কি একটু একটু করে দূর হবে? এক্ষণে দূর হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে আমার নিরানব্বুই শতাংশ ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, একটু খানি এখনও বাকি আছে, বুঝতে হবে তার আদপেই কিছুই হয়নি। পরা বিদ্যাকে যিনি বোঝেন তিনিই বোঝেন পরা বিদ্যাটা কি, তাছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। গুরু যখন উত্তম শিষ্যকে উপদেশ দেন, গুরু তাকে বলে দিলেন তত্ত্বমসি, তক্ষুণি শিষ্য বুঝে নেবে ও আমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হয়ে যাবে। মধ্যম শিষ্যকে ঘষতে মাজতে হয়। অনেক শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করে যাচ্ছে, করতে করতে তারও যখন জ্ঞান হয় সেটা এক্ষণে হয়ে যায়, শতাংশের হিসাবে কখনই হবে না। আর অধম শিষ্য বিপরীত বুঝে নেয়। বৃত্রাসুরের মত তত্ত্বমসি শোনার পর অনাত্মকে আত্মা মনে কর ভোগের মধ্যে ডুবে যায়। শাস্ত্র বাক্য মুখস্ত করতে করতে মনের ধারণা করার ক্ষমতাটা বাড়ে। উপনিষদের মন্ত্রগুলোকে মুখস্ত করে যদি আবৃত্তি করা হয় তাহলে আশেপাশে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়ে যায়। প্রাথমিক স্তরে এগুলো আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে একটু উন্নত হলে বোঝা যাবে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের বাড়িতে, এমনকি সাধারণ ব্রাহ্মণদের বাড়িতেও আগে কখন কলহ হত না। যেখানে শাস্ত্র চর্চা হয়, ঈশ্বরের আরাধনা হয় সেখানে সচরাচর কখনই কোন অশান্তি হতে দেখা যায় না। শুভ কর্ম যেখানে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে একটা আলাদা ধরণের শান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়। পরিবারে কোন বধু যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকে সেখানে নিয়মিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রাদি পাঠ করতে হয়। এতে গর্ভের সন্তানের উপর একটা শুভ সংস্কারের ছাপ পড়ে। এটা কোন আজগুবি কথা নয়, শুধু হিন্দুদের কাছেই না, সারা বিশ্বে এটা আজ প্রমাণিত। গর্ভের সন্তানের শ্রোত্রিয়িন্দ্রগুলো যখন খুলতে শুরু করে, তখন তার কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু যাবে সেটাই তার ভেতরে সংস্কার তৈরী করবে।

আমরা ছয় নম্বর মন্ত্রের আলোচনা করছিলাম। নয় নম্বর মন্ত্রে একটা খুব সুন্দর কথা বলা হয়ে *যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্*। তিনি সর্বজ্ঞ আর সর্ববিদ্, এটাকে পরে ব্যাখ্যা করা হবে তিনি কিভাবে সর্বজ্ঞ হন। সর্বজ্ঞ মানে যিনি সব কিছু জানেন, ভগবানই একমাত্র সর্বজ্ঞ কারণ তিনি চৈতন্য স্বরূপ। যিনি ভগবান তিনি চৈতন্যস্বরূপ,

চৈতন্যটাই তিনি। আমরা নিজেদের দেহ মনের সাথে একাত্ম হয়ে আছি। কিন্তু আমাদের ভেতরে সেই শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন, শুদ্ধ চৈতন্যই পূর্ণ ব্রহ্ম যেন ছোট্ট আকারে আছেন। সেই শুদ্ধ চৈতন্য ভেতরে থাকার জন্য আমাদের মনটাও চৈতন্যের আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। যেমন এই টিউব লাইটের মাঝখান দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে মনে করছি টিউব লাইটের কাঁচটা আলো বিকিরণ করছে। কিন্তু আলো তো টিউব লাইটের নয়। আলোটি তাহলে কি? টিউব লাইটের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎএর স্পার্ক যাচ্ছে বলে টিউব লাইটটা আলোতে ঝলমল করছে। আর ঐ টিউব লাইটের আলোতে আমরা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা একে অপরকে যে দেখতে পাচ্ছি, এটা কার জন্য দেখতে পাচ্ছি? সাধারণ ভাবে বলব আমার চোখের জন্য দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় বলব টিউব লাইটের আলোর জন্য। কিন্তু আসল যে কারণ টিউবের কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ এর স্পার্ক যাচ্ছে এটা আমাদের মাথায় একবারও আসেনা। ইলেক্ট্রিসিটি ব্যাপার যে জানে না সে কোন দিন ভাবতেই পারবে না।

আমরা যখন কাজকর্ম করছি, চিন্তা-ভাবনা করছি তখন মনে করি আমি করছি। এখানেও সেই পেছনে ইলেক্ট্রিসিটি আছে বলেই সব করছি। আমার কি বুদ্ধি, আমি দেখতে কত সুন্দর এগুলো কিছুই না, পেছনে সেই শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই আমাদের এই বুদ্ধি। ইলেক্ট্রিসিটির সরবরাহ যদি অফ্ করে দেওয়া হয় তখন টিউব লাইট সব অন্ধকারে ডুবে যাবে। আমাদের ভেতর থেকে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তাকে সরিয়ে দিলে আমাদের সব অহঙ্কার, লাফালাফি সব ফাক্কা। মানুষ মরে যাওয়া মানে শুদ্ধ চৈতন্য ঐ দেহটাকে ছেড়ে দিয়েছেন বলে সব ফাক্কা, কিছুই নেই। যে শরীরকে নিয়ে এত ব্যস্ততা, ইন্দ্রিয়কে নিয়ে, বুদ্ধিকে নিয়ে যে এত লাফালাফি, এগুলো এই আছে এই নেই। তাহলে ঠিক ঠিক যে সব কিছু দেখছেন, শুনছেন, জানছেন তিনি কে? একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি সেই তিনিটা কখনই মন-বুদ্ধি হতে পারেন না। মন-বুদ্ধি সব সময় নিয়মের মধ্যে চলে, যে নিয়মের মধ্যে বাঁধা তার কোথা থেকে স্বাধীন ইচ্ছা হতে পারে। খিদে পেলে খেতে হবে, জলতেষ্টা পেলে জলের কাছে যেতে হবে তাহলে মন কি করে স্বাধীন হল। যিনি অনেক কিছু জানেন তাঁকে আমরা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ কত নামে সম্বোধিত করছি। সর্বজ্ঞ মানে যিনি সব কিছু জানেন। কোন বাচ্চাকে যদি বলা হয় ভগবান সর্বজ্ঞ, তিনি অন্তর্যামী, সব কিছুর খবর তিনি জানেন। বাচ্চা প্রথমে ধারণা করবে ভগবান একজন মানুষ। মানুষ হলেই তাঁর চোখ থাকতে হবে, কান থাকবে – এটাকে না করা হচ্ছে। উপনিষদ বাচ্চাদের জন্য নয়। যাঁরা অত্যন্ত উন্নত আত্মা তাঁদের জন্য উপনিষদ। এতদিন যাবৎ যে ধারণাটা করে আসা হয়েছে সেটাকে এখানে আটকান হচ্ছে। ভগবান সর্বজ্ঞ তো বটেই কিন্তু তুমি ভুল ভেবো না, তিনি চোখ, কান, হাত পা বিশিষ্ট নন। তাহলে কি রকম – *যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমবর্ণম্*। তিনি ইন্দ্রিয়মান পুরুষ নন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানার পর তিনি সর্বজ্ঞ হচ্ছেন না। তাহলে তিনি কিভাবে জানেন? তিনি সরাসরি জেনে যান। তাঁর না আছে হাত, না আছে পা, না আছে চোখ, কান ইত্যাদি। এই কথা বললে তিনি নেই এই অভাব বোধ এসে যাওয়ার ভয় আছে। সেইজন্য অনেকভাবে নেতি নেতি করে আটকে দেওয়া হচ্ছে। এবার তাঁর কি কি আছে সেটা বলা হচ্ছে। যে জিনিষগুলো নেতি নেতি করা হয়েছে ঠিক সেই জিনিষগুলোকেই ইতি ইতি করে বলা হচ্ছে কিন্তু অন্য ভাবে। কি ভাবে?

নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। মুণ্ডকোপনিষদের এই ছয় নম্বর মন্ত্র হল ঠিক ঠিক মন্ত্র যেখানে ঈশ্বরের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে নেতি নেতি করা হচ্ছে, ঈশ্বর এই নন, সেই নন। দ্বিতীয় ভাবে ইতি ইতি করে বলছেন, ঈশ্বরের এই এই বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের এই বৈশিষ্ট্য গুলোকে কারা দেখতে পান? *পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ,* ধীর পুরুষ যাঁরা তাঁরা দেখতে পান। ধীর পুরুষ কাকে বলে? ধীমান, যাঁদের বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি কাকে বলে? বুদ্ধি হল বিবেক, যে বলে দিচ্ছে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। আমরা অনেকে সময়ই জ্ঞানপাপী শব্দটা ব্যবহার কর। জ্ঞানপাপী মানে জানে কিন্তু করবে না। আদপেই এরা জ্ঞানপাপী নয়, শাস্ত্রের দৃষ্টিতে আসলে এরা বুদ্ধিহীন। কারণ বুদ্ধি মানে সৎ অসৎ দুটোকেই জানবে এবং অসৎকে ছেড়ে দিয়ে সৎকেই ধরে থাকবে, ভুলটাও জানবে ঠিকটাও জানবে ভুল থেকে সরে থাকবে ঠিকটাকে ধরে রাখবে। বুদ্ধির এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যিনি বলছেন আমি জানি কিন্তু করব না, যে ভক্ত মঠে আসছেন না তাকে কেন আসছে না জিজ্ঞেস করা হলে বলবে ঠাকুর টানছেন না তাই আসা হচ্ছে না, এরাই জ্ঞানপাপী। বুদ্ধিহীন পুরুষরাই জ্ঞানপাপী। যিনি ধীমান তাঁর প্রচণ্ড বুদ্ধি থাকবে। বুদ্ধি থাকা মানে? যিনি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল

এই তফাৎটা ধরতে পারেন। শুধু তফাৎ ধরলেই হবে না, ঠিক পথে দাঁড়িয়ে থাকেন। অফিসের এক কর্মচারী ঠিক করে নিয়েছে আমি ঘুষ নিয়েই বড়লোক হব। তার আদর্শটাই উড়ে গেছে, আদর্শহীন পুরুষে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু আরেকজন কর্মচারী জানে আমার ঘুষ নিতে নেই কিন্তু তাও নিচ্ছি। এ হল বুদ্ধিহীন, এর বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি মানেই হল ঠিক জিনিষে দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

এখানে বলছেন যাঁরা ধীর পুরুষ বিবেকবান, তাঁরা *পরিপশ্যন্তি*, পশ্যন্তি মানে আমরা জানি দেখা, কিন্তু *পরিপশ্যন্তি*, পরি মানে চারিদিকে দেখেন। ঠাকুরকে আমরা কোথায় দেখছি? বেলুড় মঠে মন্দিরের গর্ভগৃহে। ধীর পুরুষও কি মন্দিরের গর্ভগৃহে দেখছেন? না, ধীমান, বিবেকী পুরুষ সর্বত্র, সব জায়গাতে ঠাকুরকে বিদ্যমান দেখেন। তাই বলে তিনি ঠাকুরকে দাড়িওয়ালা আদুল গায়ে কাঁধের উপর ধুতির আঁচল ফেলা অবস্থায় দেখছেন? না, *নিত্যং*, নিত্যং মানে যিনি অবিনাশী, যাঁর কখনই নাশ হয় না। আজ আছেন কাল থাকবেন না, এই রকমটি হবে না। প্রজাপতি যখন তত্ত্বমসি বললেন, প্রথমে ইন্দ্র ভাবলেন শরীরকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। কিন্তু শরীরের তো নাশ হয়ে যায়। তাহলে শরীর কখন আত্মা হতে পারে না। অবিনাশী, তিনিই আছেন, তিনিই ছিলেন তিনিই থাকবেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই। সেইজন্য তিনি হলেন *নিত্যং*। *বিভুং*, এই বিভু শব্দটি আমাদের শাস্ত্রের একটি খুবই উল্লেখযোগ্য অবদান। ভগবানকে দুটো নামে সম্বোধিত করা হয়, বিভু আর প্রভু। প্রভু মানে যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনিই হলেন ঈশ্বর। আচার্য বিভুং শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন *বিবিধং স্থাবরাণাদিভির্ভেদৈ ভবতি ইতি বিভুং*। যাবতীয় যা কিছু মানে মাটির ধুলিকণা থেকে শুরু করে, পশুপাখি, মানুষ, দেবতা এবং সর্ব প্রথম সৃষ্ট ব্রহ্মা পর্যন্ত তিনিই হয়েছেন, সব কিছুর মধ্যে তিনিই বিদ্যমান, মানে সব জায়গাতে তিনিই ব্যপ্ত। বিশেষ রূপে যিনি ভূ, ভূ মানে হওয়া। কি হয়েছেন? যাবতীয় যা কিছু আছে, *ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত*। আচার্যও অনেকবার বলবেন *আব্রহ্মস্থাণুপর্যন্তম্* বা *আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তম্*, একেবারে যে একটা শুকনো ঘাসের টুকরো আছে তাতেও তিনিই আছেন, আর সর্বোত্তম ব্রহ্মা সেটাও তিনিই হয়েছেন, আমি আপনি সব কিছু তিনিই হয়েছেন। তখন তো ইলেক্ট্রন প্রোটন আবিষ্কার হয়নি তাই ঘাসের ছোট্ট ডগা থেকে শুরু করা হয়েছে, সব কিছুর মধ্যে তিনি ব্যপ্ত, তাঁর বাইরে কোন সত্তা নেই। সেইজন্য তিনি বিভুম্।

একদিকে বলা হচ্ছে তিনি অবিনাশী আবার অন্য দিকে বলা হচ্ছে তিনি সব কিছুতে ব্যপ্ত। আমার আপনার সবার মধ্যে অন্তর্যামী রূপে তিনিই রয়েছেন। আবার একটা ঘাসের মধ্যেও তিনিই আছেন। একবারে মূলে যদি যাওয়া যায় তাহলে এই বোধটাই হবে আমিও যা ঘাসের ডগাটাও তাই। কিন্তু ঘাসের ডগা রূপে নয়, বিভু রূপে। গীতাতেও ভগবান বলছেন *বিদ্যাবিনয়েসম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি*, একেবারে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ তাঁর মধ্যে সেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, আর *গবি* মানে গরুর মধ্যে, হাতির মধ্যেও তিনিই বিরাজমান। তাই না, *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*, অস্পৃশ্য কুকুর আর সব থেকে নীচ জাত চণ্ডালের মধ্যেও তিনিই বিরাজিত। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের খুব নামকরা মন্ত্র *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ* – তুমি সেই নারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার আবার তুমিই কুমারী, লাঠি নিয়ে যে বৃদ্ধ হেঁটে যাচ্ছে তুমিই হেঁটে যাচ্ছ, তুমিই ভগবান সর্ব রূপে বিদ্যমান, তুমিই সব কিছু হয়েছ। এগুলো কোন কবির কল্পনা নয়, এটাই বাস্তবিকতা। অপরা বিদ্যা আমাদের ধরে রেখেছে বলে আমরা বুঝতে পারছি না। পরা বিদ্যা কি করছে, আমি আলাদা আর কুকুর আলাদা, এই ভেদ বোধটাকে নাশ করে দেয়। ঠাকুর বলছেন আমি কুকুরের যোনিতে দেখছি সেই ব্রহ্ম জ্যোতি লক্ লক্ করছেন। যে জিনিষকে অত্যন্ত নোংরা, ঘৃণ্য মনে করা হয় ঠাকুর দেখছেন সেখানেও সেই ব্রহ্ম লক্ লক্ করছেন, এগুলো আমরা কখন কল্পনাও করতে পারি না। তাঁর বাইরে যে কিছুই নেই।

সেইজন্য এই ব্রহ্মজ্ঞানী কখন উপদেশ দিতে পারেন না। যাঁকে উপদেশ দেবেন তাঁর মধ্যেও তিনি সেই ব্রহ্মকে দেখছেন, ব্রহ্মকে কি উপদেশ দেবেন! রাজা মহারাজের একটা ঘটনা আছে। একবার তাঁর একজন শিষ্য বলছেন 'মহারাজ! আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেননা'। রাজা মহারাজ বলছেন 'কি উপদেশ দেব! দেখছি তোমার মধ্যে সেই সচ্চিদানন্দই বিরাজ করে আছেন। সেইজন্য কাকে উপদেশ দেব'।

অবতার পুরুষ, জ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে সেইজন্য একটা অজ্ঞানের আবরণ দিয়ে দেওয়া হয়। এই অজ্ঞান আবরণ দেওয়ার জন্য এই জগৎকে তিনি জগৎ রূপেই দেখেন। তখন তিনি উপদেশাদির কার্য করেন, তা নাহলে তিনি উপদেশই দিতে পারবেন না। যদি দেখেন তিনিই পণ্ডিত, তিনিই চণ্ডাল, তিনিই কুমার তিনি কুমারী হয়েছেন তখন কাকে উপদেশ দেবেন! জ্ঞানী পুরুষের কাছে এটা বাস্তবিক সমস্যা, জ্ঞানী তাই মৌন হয়ে চুপ মেরে যান। ভগবান তাই ঐ আবরণটা দিয়ে দেন। কিন্তু ঐ আবরণটা ইচ্ছা মত সরিয়েও দিতে পারেন। যেমন স্বামীজী সব সময় সমাধিতে লীন হয়ে থাকতে চাইছেন। কিন্তু ঠাকুর বলছেন তোর সমাধিতে ডুবে থাকা চলবে না, তিনি স্বামীজীর মধ্যে জোর করে ঐ আবরণটা দিয়ে দিলেন, তুই জগৎকে জগতের মত দ্যাখ্। তখন স্বামীজী প্রচারকার্য শুরু করলেন। কিন্তু তখনও তাঁর মন সমাধির জন্য ছটফট করত, জ্ঞানটা তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকত কিনা। এটাই বাস্তব, তিনি যে কল্পনা করছেন তা নয়, তিনি দেখছেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। আমাদের মনে হচ্ছে না আমি সেই ঈশ্বর, তাই আমরা দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি। কারণ আমরা ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছি। অবতার পুরুষরা তাই মাঝে মাঝে দেহধারণ করে আমাদের ধাক্কা দিয়ে বলেন কেন তোরা কষ্ট পাচ্ছিস, এই জগৎ থেকে বেরিয়ে আয়। আমরা অবতারের কথায় কর্ণপাত করিনা বলে এত যন্ত্রণা পাই।

দক্ষিণেশ্বরে একজন বলছেন যাই একবার নাতির চাঁদমুখটা দেখে আসি। ঠাকুর শুনে বলছেন চাঁদমুখ না পোড়ার মুখ। আমি তো বলতে পারি আমার নাতির মধ্যে আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে দেখছি। খুব ভালো, কিন্তু কাল যদি নাতির কিছু হয়ে যায় তখনও তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম দেখ কিনা বোঝা যাবে। সাধারণ মানুষ পারেনা, সংসারের যে কোন বিপর্যয়ে তারা প্রচণ্ড কষ্ট পায়। সেইজন্য বলছেন টাকা আয় করতে কষ্ট, টাকা সঞ্চয় করতে কষ্ট, ভয় থাকে এই বুঝি ইনকামট্যাক্স ওয়ালারা এসে ধরে। টাকা থাকলে গরীব, কাঙাল, আত্মীয়স্বজনরা এসে উত্যক্ত করবে। টাকা যখন আয় করতে যায় তখন মানুষ একটা আনন্দ বোধ করে আর টাকা যখন চলে যায় তখন কাঁদে।

তিনি *সর্বগতম্*, সর্বগতম্ হল ব্যাপকতার শেষ অবস্থা। সব জায়গাতে তিনিই ব্যাপ্ত। অন্য জায়গায় এটাকেই ঠিক উল্টো ভাবে বলা হবে। তিনি নড়াচড়া করেন না। নড়াচড়া কোথায় হয়? আমি হাতটা বাড়াচ্ছি এই বোতলটাকে ধরার জন্য। কারণ আমার আর বোতলের মধ্যে একটা খালি জায়গার ব্যবধান আছে। কিন্তু যেখানে কোন জায়গা নেই সেখানে নড়াচড়া কিভাবে হবে! সেইজন্য তিনি স্থানু, তিনি চলেন না। কিন্তু এখানে কি বলছেন? *সর্বগতম্*, সব জায়গাতে তিনি যাচ্ছেন। একই কথা বলছেন। শুদ্ধ চৈতন্য তো সর্বত্রই আছেন। চৈতন্যকে আমি ধরছি না, শুধু মনকে নিয়েই চিন্তা করা যাক। মনে করা যাক এখান থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের শেষ যে বিস্তৃতি সেখান পর্যন্ত মন ছড়িয়ে আছে। মনের কাজ হল সব কিছু সংগ্রহ করা। এখন চাঁদে যা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে নেব, কারণ একটাই মন জালের মত ছড়িয়ে আছে। আর যদি দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে কোন নক্ষত্রে যা হবে সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ধরা পড়ে যাবে। কারণ কল্পনা যতক্ষণ সময় নেবে ততক্ষণে এই খবরটাও এসে যাবে। এই জগৎ যেটা সৃষ্ট হয়ে আছে আর যে জগৎটা এখনও সৃষ্টি হয়নি সব জায়গাতেই শুদ্ধ চৈতন্যই আছে। যেখানেই যা কিছু হবে সেখানেই এই শুদ্ধ চৈতন্য হাজির হয়ে গেছে। ঈশাবাস্যোপনিষদে ঠিক এই কথাই বলছে *তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি*, যদি দৌড়ায় আত্মা সবার থেকে আগে পৌঁছে যায়। কারণ *তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি*, তিনি আছেন বলেই বাকি সব কিছু চলছে। আমরা জানি মন সব থেকে বেগবান, সবার আগে মন পৌঁছে যায়। কিন্তু এই মন যখনই যেখানে পৌঁছে যায় সেখানে দেখে আত্মতত্ত্ব আগে থাকতেই বিরাজমান। কারণ 'আমি' চেতনা ওখানে আগে থেকেই আছে। আত্মতত্ত্ব কি করে পৌঁছে যাচ্ছে? কারণ তিনি সব জায়গাতেই বিদ্যমান। এখানে তাই বলছেন *সর্বগতম্*, সব জায়গাতে তিনি ব্যপ্ত হয়ে আছেন। আবার সব জায়গায় যেতে পারেন এই অর্থেও নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন তাই যেখানে যা কিছু হচ্ছে সব তিনি জানতে পারেন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, মন থেকেও এগিয়ে থাকেন, সেইজন্য সবটাই তিনি জানেন।

তিনি আবার *সুসূক্ষ্মম্*, শুধু সূক্ষ্ম নন, *সুসূক্ষ্মম্*। সাংখ্য দর্শনানুসারে প্রথমে আসে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে আসে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে পাঁচটি সূক্ষ্ম তন্মাত্রার জন্ম। ঐ পাঁচটি তন্মাত্রা নিজেদের মধ্যে সংমিশ্রণ হয়ে এই জগতের সৃষ্টি হচ্ছে। আর ঐ তন্মাত্রার স্তর থেকেই সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়াদির – দশটি ইন্দ্রিয় আর মন, এই এগারোটি ইন্দ্রিয়। এই পুরো সৃষ্টির তালিকার কোথাও আত্মতত্ত্ব নেই। কারণ আত্মতত্ত্ব এদেরও পারে। তাহলে সব থেকে স্থূল কোনটি? বোতলের প্লাস্টিকটা সব থেকে স্থূল। প্লাস্টিক থেকে আরও সূক্ষ্ম কার্বন, কার্বন্ থেকে আরও সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রন প্রোটন। সেটা থেকেও সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ তন্মাত্রা থেকেও সূক্ষ্ম অহঙ্কার। সমষ্টি অহঙ্কার থেকেও সূক্ষ্ম সমষ্টি মন, সব জায়গায় ব্যপ্ত। তার থেকেও সূক্ষ্ম তিনটে গুণ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটে গুণই প্রকৃতি। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ আর পদার্থ নামে থাকছে না, গুণের মধ্যে চলে আসে। আত্মতত্ত্ব তার থেকেও সূক্ষ্ম। শুধু সূক্ষ্ম নয়, *সুসূক্ষ্মম্*। আত্মতত্ত্ব কত সূক্ষ্ম হতে পারে সেটাকে ধারণা করার জন্য *সুসূক্ষ্মম্* বলছেন। সূক্ষ্ম জিনিষ দিয়েই একটা স্থূল জিনিষের পরিমাপ করা হয় – এই দুটি সূক্ষ্ম জিনিষ দিয়ে এই স্থূল বস্তুটা তৈরী হয়েছে। কিন্তু আত্মার থেকে সুক্ষ্ম জিনিষ আর কিছু নেই, সেইজন্য *সুসূক্ষ্মম্* বলছেন।

তদব্যয়ম্, অব্যয় মানে যার কোন ব্যয় হয় না। এর আগে অক্ষর পুরুষের যা যা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, আর যাঁর এই ধরণের বৈশিষ্ট্য, তাঁর কি করে ব্যয় হবে! যে জিনিষের অংশ থাকে, তার যে কোন অংশ খারাপ হয়ে যেতেই পারে। অংশ খারাপ হয়ে গেলে জিনিষটার ব্যয় হয়ে অন্য জিনিষে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আত্মার কোন অংশ হয় না, আত্মাই আছেন। তাই আত্মার কখন হ্রাস বৃদ্ধি হবে না। হ্রাস হয়ে যাবেই বা কোথায়, সব কিছু তো তাঁরই ভেতরে। সেইজন্য আত্মাতত্ত্ব অব্যয়। উপনিষদ, গীতার আলোচনায় এই জিনিষগুলো বারবার আসবে। *অব্যয়ম্*এর তিনটে অর্থ করা হয়েছে – প্রথম অঙ্গরূপ অক্ষয়, মানুষের যেমন একটা শরীর আছে, শরীরের অনেক অঙ্গ আছে, এই শরীরের কোন অঙ্গ যেমন হস্ত অঙ্গের হানি হয়ে গেল। আত্মার অঙ্গরূপ ক্ষয় হয় না। দ্বিতীয় কোশ ক্ষয়ঃ, যেমন রাজার অনেক ধন রত্ন আছে, এগুলো তার শরীরের অঙ্গ নয়, বাইরের জিনিষ। প্রজা প্রতিপালন করতে, যুদ্ধ করতে গিয়ে তার ধন রত্ন ব্যয় হয়ে গেল। এইভাবে ক্ষয় হয়ে গেল। এগুলো আমি নই, কিন্তু আমারই জিনিষ। আমি টাকা-পয়সা উপার্জন করেছিলাম, কিন্তু কঠিন ব্যাধির চিকিৎসাতে সব শেষ হয়ে গেল, বাড়ি ছিল সেটা ভেঙে গেল। আত্মার এই ব্যয়টাও হবে না। তৃতীয় *গুণক্ষয়ঃ*, আমার যে স্বভাব সেটা চলে যেতে পারে। আমার বন্ধুকে জানতাম তিনি সত্যি কথা বলতেন কিন্তু পরে মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছেন। সত্যবাদী থেকে মিথ্যাবাদী হয়ে গেছেন, এটা *গুণক্ষয়ঃ*। আচার্য এই তিন রকম ক্ষয়ের কথা উল্লেখ করছেন – স্থূল অঙ্গের নাশ, যেটা আমি অর্জন করেছি সেটার নাশ আর যেটা দিয়ে আমি তৈরী সেটার নাশ। আত্মার এই তিনটের কোনটাই নাশ হয় না, সেইজন্য তিনি *অব্যয়ম্*।

যদ্ভূতযোনিম্, যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুর তিনি যোনি। আমি কোথা থেকে এসেছি? আমার মায়ের গর্ভ থেকে। আমার মা কোথা থেকে এসেছে? তার মায়ের গর্ভ থেকে। এই করে করে কত দূর যেতে পারব? সব শেষে দেখছি পৃথিবী থেকে সব কিছু এসেছে। পৃথিবী কোথা থেকে এসেছে? সূর্য থেকে। সূর্য কোথা থেকে এসেছে? ব্রহ্মাণ্ড থেকে। এই করে করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বলবে সব কিছু এসেছে এনার্জি থেকে। এণার্জি কোথা থেকে এসেছে? ঈশ্বর থেকে। ঈশ্বর কোথা থেকে এসেছেন? এরপর আর প্রশ্ন করা যাবে না, তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনিই শেষ কথা। তাই তিনি হলে ভূতযোনি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুর যোনি তিনি, তাঁর থেকেই সব কিছুর জন্ম। এগুলো হল ঈশ্বরকে বোঝানর জন্য। গীতায় ভগবান বলছেন *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, আমিই জগতের মা, আমিই জগতের বাবা, ধাতা, আমিই জগতের ঠাকুর্দা। কারণ প্রকৃতি থেকেই সব কিছু বেরোয়, তিনি প্রকৃতিরও বাবা সেইজন্য জগৎটা তাঁর নাতি। ঈশ্বরের এইসব বর্ণনা করে বলছেন, যিনি ধীর পুরুষ তিনি এই রকমই দেখেন। এই পুরুষকে যে বিদ্যা দিয়ে জানা যায় সেটাই পরা বিদ্যা।

সৃষ্টি তত্ত্বকে বিভিন্ন শাস্ত্র বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করছেন। এখানে উপনিষদ সব কটা ধারণাকেই না করে দিচ্ছেন। কিন্তু সৃষ্টির শেষ কথা কি? *যদ্ভূতযোনিম্*, তিনি, সেই ঈশ্বরই সমস্ত ভূতবর্গের যোনি। ঐ যোনি

থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে সৃষ্টির ব্যাপারটা বুঝতে পারে তার জন্য এবার তিনটে উপমা দিয়ে বোঝান হচ্ছে। এগুলো উপমা দিয়ে একটা ভাবকে বোঝান হচ্ছে, উপমার সব কিছুকে আক্ষরিক ভাবে নেওয়া যায় না। পর পর দুটি মন্ত্রে সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে –

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।।১/১/৭।।

(মাকড়সা যেমন নিজেরই শরীর থেকে জাল সৃষ্টি করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, জীবন্ত পুরুষের দেহে কেশলোমাদি উৎপন্ন হয় সেইরকম অক্ষর থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়।)

এই মন্ত্রে সৃষ্টি তত্ত্বকে বোঝানর জন্য তিনটে পৃথক ভাবকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা যেভাবে সৃষ্টি তত্ত্বকে মনে করি, একটা বীজ বপন করলাম, কিছু দিন পর সেখান থেকে ছোট একটা অঙ্কুরোদ্‌গম হল, সেই অঙ্কুর থেকে গাছ বেরিয়ে আস্তে আস্তে বিরাট মহিরুহে পরিণত হয়ে গেল। জগতের সৃষ্টি তো ঠিক এভাবে হয় না। *যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ*, প্রথমে ঊর্ণনাভির উপমা নিচ্ছেন, ঊর্ণনাভি মানে মাকড়সা। মাকড়সা কিভাবে সৃষ্টি করে? মাকড়সার ভেতর থেকে মুখ দিয়ে জাল বেরোয়, ঠিক সেই রকম অক্ষর থেকে অনায়াসে সৃষ্টিটা বেরিয়ে আসে। মাকড়সা ভেতর থেকে জালটা বার করে ছড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে বাস করে, কিছু দিন পর সময় মত সেই জালটাকে আবার গিলে নিজের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। যখন সৃষ্টির লয় হয় তখন ঈশ্বরও সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে টেনে নেন। এই কারণে সৃষ্টি তত্ত্বে মাকড়সার উপমাকে খুব প্রকৃষ্ট উপমা বলে গ্রহণ করা হয়। তাহলে কি মাকড়সার মতই ঈশ্বর? না, শাস্ত্রে সব সময় উপমা নেওয়া হয় একটা ভাবকে সুস্পষ্ট করার জন্য হয়। ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি আবার ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টির সব কিছু লয়, এই ভাবটাকে ঊর্ণনাভির উপমা দিয়ে বোঝান হল।

দ্বিতীয় উপমা, *যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি*, এই পৃথিবীর মধ্যে যেভাবে গাছপালা জন্ম নেয়, ওষধি মানে গাছপালা। তৃতীয় উপমা, *যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি*, জীবিত পুরুষ মানুষের শরীরে যেভাবে চুল, দাড়ি, লোম গজিয়ে বড় হতে থাকে। *তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্*, সেই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঠিক এইভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু এখানে বলা যাবে না যে তিনটে আলাদা উপমা নিয়েছেন, কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টির সাথে আমাদের এখানে যেভাবে সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে সেইভাবে মিলবে না। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে, মাকড়সা সবাই দেখছে, মাটি থেকে গাছপালা হয় সবাই জানে আর সব মানুষেরই চুল-দাড়ি আছে দেখতে পাচ্ছে এই তিনটে আলাদা ধরনের উপমা দিচ্ছেন।

উপমা সব সময় একদেশীয়। অর্থাৎ যে জিনিষটার উপমা দেওয়া হচ্ছে ওটাকেই বরাবর নিতে হবে, তার বাইরে যাওয়া যাবে না। যেমন মাকড়সার আটটি পা তাহলে ভগবানেরও কি আটটি পা? এখানে মাকড়সা আর ভগবানের সাধারণ বিষয়টা হল, বাসা তৈরী করতে মাকড়সা যেমন অন্য কোন উপকরণের অপেক্ষা রাখে না, যেমন আমরা যখন বাড়ি করি তখন আমাকে ইট, বালি, সিমেন্ট জোগার করতে হচ্ছে। মাকড়সা ছাড়া আর যত প্রাণী আছে সবাইকে বাসা তৈরী করতে বাইরে থেকে উপকরণ নিয়ে আসতে হয়। মাকড়সার ভেতর থেকেই বাসার উপকরণ বেরিয়ে আসে। তারপর কি করছে? জালের মধ্যে কোন পোকামাকড় ফেঁসে গেল দিনের শেষে বা দুদিন পর পুরো জালটাকে পোকা সমেত গিলে ফেলছে। সেটাই আবার পরে উপকরণ হয়ে বেরোবে। তাহলে কি ভগবানও এই রকম করেন? না, না, এখানে সাধারণ বিষয়টা হল অন্য কোন উপকরণের অপেক্ষা রাখে না। ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে – একটা হল efficient cause, আরেকটা হল material cause । Efficient cause মানে যিনি এর কর্তা, আর material cause মানে উপকরণ। ভগবানই কর্তা আবার ভগবানই উপকরণ। Efficient cause আর material cause এই ধারণা আমাদের এখানে

খুব বেশী প্রচলিত নয়, বিদেশীদের মধ্যে খুব প্রচলিত। সৃষ্টির ব্যাপারে ছোটবেলা থেকে আমরা মাথার মধ্যে বসিয়ে নিয়েছি, ভগবান হাতে মাটি নিলেন, মাটি নিয়ে একটা আকৃতি দিয়ে সেটাকে আবার উনুনে দিলেন, ইট যেভাবে তৈরী হয়। বলা হয় প্রথমবার যখন করলেন তখন কাঁচা থেকে গেল, কাঁচা থেকে যাওয়াতে পাশ্চাত্যে সব সাদা চামড়ার লোক বেরোল। ভগবানের ঠিক পছন্দ হল না, তাই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করলেন। এবার উনুনে বেশীক্ষণ রাখলেন। তখন আবার বেশী পুড়ে গিয়ে কালো হয়ে গেল, এইভাবে সব নিগ্রোরা বেরোল। তৃতীয়বার তিনি আবার চেষ্টা করলেন তখন প্রাচ্যের আমাদের গায়ের মত রঙের মানুষ বেরোল। এটা ভারতেরই 'মিথ'। এটাকে আবার উল্টো দিকে দিয়েও বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের লোকেরা বলবে প্রথমে ভগবান উনুনে দেওয়াতে বেশী পুড়ে গেল, সেখান থেকে নিগ্রো বেরোল, তারপর দ্বিতীয়বার দেওয়ার পর ব্রাউন রঙের বেরোল তৃতীয়বার তিনি পারফেকশান নিয়ে আসলেন, যার জন্য সাহেবদের সাদা চামড়া। উপমা কখন এইভাবে চলে না। উপমা যে বানাল সেটা তারই থাকে।

মাটি থেকে যদি ভগবান সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে মাটিটা কোথায় ছিল বা ঈশ্বর মাটি কোথায় পেলেন। বাচ্চা বয়সে যে গল্প গুলো শুনে আসছি সেই গল্প দিয়ে উপনিষদ চলবে না। এখানে এটাই বলা হচ্ছে তিনিই efficient cause আর তিনিই material cause। ভগবানের অন্য কোন উপকরণ লাগে না। কুম্ভকার যখন ঘট তৈরি করছে তখন তার মাটি দরকার, একটা চাক দরকার আর একটা ডাণ্ডা দরকার। চাকের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে মাটির একটা আকার দিয়ে দেয়। ভগবান এইভাবে কখনই সৃষ্টি করেন না। যেমন মাকড়াসই কর্তা আবার মাকড়সা নিজেই উপকরণ। ঠিক তেমনি ভগবান নিজেই কর্তা আবার নিজেই উপকরণ। সেইজন্য গীতায় ভগবান বলছেন *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*। গীতার এই শ্লোকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান শ্লোক। এইসব শ্লোকে ভগবানকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, ভগবান কি রকম। তিনি পিতা, তাঁর গর্ভ থেকে সব বেরোচ্ছে, ধাতা তিনি এই সৃষ্টকে আবার ধারণ করে আছেন। আসল যেখান থেকে সৃষ্টি হয় ভগবান সেটারও বাবা। সেইজন্য ব্রহ্মাকে অনেক সময় বলা হয় পিতামহ, কারণ ঠিক ঠিক সৃষ্টিটা হয়েছে ব্রহ্মার পর থেকে। তাই বাবা হলেন সব প্রজাপতিরা, প্রজাপতিদেরও বাবা হলেন ব্রহ্মা তাই ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়। ভগবান কিন্তু তাদের পিতামহ নন, তিনি প্রপিতামহ। মূল কথা হল সৃষ্টির তিনিই কর্তা তিনিই সৃষ্টির উপকরণ, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।

এই উপমাতে সব থেকে গুরুত্ব বিষয় হল যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে সবটাই স্বতঃস্ফুর্ত, পুরো সৃষ্টিটাই প্রচেষ্টাহীন ভাবেই হচ্ছে। প্রচেষ্টা কোথায় হয়? যখন আমি রান্নাবান্না করতে যাচ্ছি তখন কত কিছু জোগার করতে হচ্ছে। আর সব কিছু যদি জোগারও করা থাকে কিন্তু রান্না করতে গেলে একটা চেষ্টা লাগে। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁকে কোন চেষ্টা করতে হয় না, স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সৃষ্টিটা হয়ে চলে। মাকড়সাকেও জাল তৈরী করতে কোন চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু পাখি যখন বাসা তৈরী করে তখন তাকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতে হয়।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হল এই সৃষ্টি তাঁর থেকেই শুরু হয়, তাঁর মধ্যেই থাকে আর তাঁর মধ্যেই শেষ হয়। মাকড়সার উপমা দিয়ে দুটো জিনিষকে বোঝান হচ্ছে, প্রথম হল ভগবান সৃষ্টির কর্তা এবং সৃষ্টির উপকরণও তিনি। দ্বিতীয়, তারপরেই বলছেন সৃষ্টি তাঁর থেকেই বেরিয়ে আসে, তাঁর মধ্যেই থাকে আর তাঁতেই লয় হয়, যেখানে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। তৈত্তরীয় উপনিষদে বলছেন *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি*। প্রথম উপমাতে শরীর থেকে অভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবী থেকে গাছপালা জন্ম নেওয়াটাকে দ্বিতীয় উপমাতে নেওয়া হয়েছে। আসলে গাছপালা কি, এরাও তো পৃথিবী থেকে অভিন্ন। বিচার করলে দেখা যাবে পৃথিবী মানে জল, বাতাস, মাটি। এগুলো আবার সবই পৃথিবীলোকের। তার মধ্যে আবার একটা বীজ দেওয়া হল, এই বীজটা কি পৃথিবীর বাইরে নাকি! পৃথিবীরই জিনিষ। এই বীজ যখন মাটিতে পড়ছে তখন বীজটার একটা পরিবর্তন হচ্ছে। ছোট্ট জেনেটিক পদার্থটা মাটির সংস্পর্শে আসছে তাতেই একটা আম গাছ আর একটা কাঁঠাল গাছ হয়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবীটাই

পুরো পাল্টে গিয়ে কোনটা আম গাছ আর কোনটা কাঁঠাল গাছ হয়ে যাচ্ছে। এই গাছপালা পৃথিবী ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। যেমন গাছপালা পৃথিবীতেই আছে *ঠিক* তেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে যে সৃষ্টি সেটা ঈশ্বরতেই আছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে গাছপালা পৃথিবী থেকে অভিন্ন, কিন্তু তাই বলে আমরা মাটি খেতে পারিনা। আসলে আমরা সবাই এই গাছপালা, পৃথিবীর সব কিছু সূর্য থেকেই এসেছি। সূর্যে হাইড্রোজেন আর হিলিয়মা ছাড়া কিছু নেই, ঐ হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম এক অপরে যখন পরিবর্তন হচ্ছে তখন তেজ সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে আসছে। শুধু সূর্যকে নিয়েই চিন্তা করি তখন যাবতীয় সব কিছু এই সূর্য থেকেই এসেছে। আর ঐ হাইড্রোজেন একটু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাই হিলিয়াম হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের রশ্মির খেলা মানে হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের খেলা। হাইড্রোজেন হিলিয়মা হচ্ছে, হিলিয়াম হাইড্রোজেন হচ্ছে, তাতেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ হচ্ছে, সেই বিস্ফোরণের রশ্মিগুলো আসছে পৃথিবীতে। পৃথিবীটা এসেছে আবার সেই সূর্য থেকে। এই পৃথিবীতে আবার সূর্যের রশ্মি থেকে ফটো সিন্থেসিস হচ্ছে। সেই ফটো সিন্থেসিসের এমনই খেলা যার জন্য আমরা বলি আমার আম ভালো লাগে, কাঁঠাল ভালো লাগেনা। সেই সূর্যের রশ্মি, সেই পৃথিবীতে এসে ফটো সিন্থেসিস হয়ে কত রূপে পাল্টাচ্ছে, সেইখানে আবার আমার আপনার পছন্দ অপছন্দ পাল্টে যাচ্ছে। এটাই আশ্চর্যের। সেটাই বলছেন এগুলো সৃষ্ট হয় সেই অক্ষর পুরুষের থেকে, থাকেও ওখানে – এটাই দ্বিতীয় উপমাতে বলছেন।

তৃতীয় উপমাতে বলছেন জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে আবার চুল দাড়ি বেরোচ্ছে। চুল দাড়িকে কিন্তু জীবন্ত মানছেন না। আমাদের ঋষিরা এই সব ব্যাপারে খুব স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ছিলেন, চুল-দাড়িকে কখনই তাঁদের কাছে জীবন্ত বোধ হয়নি, এগুলো সবই জড় পদার্থ। মানুষ জীবন্ত, চৈতন্যবান সত্তা থেকে বেরিয়ে আসছে জড় পদার্থ। ঠিক তেমনি অক্ষর হলেন চৈতন্যবান কিন্তু সেখান থেকেই এই জড় জগতের সৃষ্টি। ঠাকুর বলছেন 'যদি জিজ্ঞেস কর এই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ থেকে এই রকম জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হল'। তখন তিনি উপমা দিচ্ছে সমুদ্রের ফেনা থেকে কিভাবে শাঁখ হয়। আর তরল শুক্র শোণি থেকে কিভাবে এই হাড়-মাংসের মানুষ তৈরী হচ্ছে। কাঠ থেকে আমরা টেবিল বানালাম চেয়ার বানালাম। টেবিল আর চেয়ার দুটো আলাদা বস্তু, কিন্তু এদের দুজনের কাষ্ঠত্বটা সমান থাকছে। কিন্তু একটা মুরগীর ডিম আর মুরগীর ঠ্যাংএর হাড় এই দুটো কখন একই জিনিষ হবে না। মুরগীর ডিম একটা তরল পদার্থ, কোথাও শক্ত কিছু নেই, কিন্তু তা থেকেই একটা সময়ে হাড় মাংস ডানা বিশিষ্ট একটা ছোট্ট পাখি বেরিয়ে আসছে। তারপর বড় হতে হতে তার হাড় মাংস বাড়তে থাকে। এগুলো কোথা থেকে আসছে? যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে সেই অক্ষর পুরুষ থেকে সব কিছুর জন্ম হওয়াটা কেন সম্ভব হবে না। এটা ঠিক সেইভাবে বলছেন না যে এই কারণে হচ্ছে, ঐটা যদি সম্ভব হয় তাহলে এটাও সম্ভব। এই তিনটে উপমা দিয়ে বলছেন *তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্*, ঠিক এইভাবেই সেই অক্ষর থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর উৎপন্ন হচ্ছে।

প্রথম উপমাতে বলা হয়েছিল অক্ষর ব্রহ্ম অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা রাখেন না। সৃষ্টিটা আসলে কোন রূপান্তরণ নয়, সৃষ্টি এখানে পরিণমিত হচ্ছে না। দুধ যেমন দই হয়ে যায়, কার্য কারণের সম্পর্কে দুধ এখানে দইয়ে পরিণমিত হচ্ছে কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পরিণাম হয় না। আমি মনে করতে পারি সৃষ্টিতে ব্রহ্ম একটা জিনিষ থেকে আরেকটা জিনিষে পরিণমিত হয়ে গেলেন, কিন্তু এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, ব্রহ্মের কোন পরিণাম হয় না। স্বভাবতঃ এটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, আবার সেখানেই মিশে যাবে। দুধ থেকে দই হচ্ছে, দই হওয়ার পর সেই দই কোন দিন দুধে পরিণত হবে না। পরিণামী মানে এটাই, একটা জিনিষ 'A' থেকে 'B' তে চলে গেলে। 'B' আর কোন দিন 'A' হতে পারবে না। এখানে তা হবে না, 'A' টা 'B' তে যায় 'B' আবার 'A'তে ফিরে আসবে। আমরা যতই বলি মা আর ছেলে এক, কিন্তু ছেলে কি কোন দিন মায়ের সাথে এক হতে পারবে? কোন দিন হবে না। কিন্তু মাকড়সা আর তার জাল যেমন আলাদা হয়েছে আবার তারা একটা সময়ে এক হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি এই অক্ষর পুরুষ থেকে সংসারমণ্ডলের নিখিলবস্তু উৎপন্ন হয়ে আবার সেই অক্ষর পুরুষে এক হয়ে যায়। তাহলে এই সৃষ্টিটা কি? এটাই মায়া। যখন মাকড়সার উপমা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে মাকড়সার জালটা যেন বাইরে চলে আসছে। আমরা মাকড়সা আর

মাকড়সার জালকে আলাদা দেখছি। সৃষ্টিটা সেভাবেও হয় না। তাহলে কিভাবে হচ্ছে? সচ্চিদানন্দই আছেন। তিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ আর আনন্দস্বরূপ। ঐ জ্ঞানের মধ্যে যেন ইচ্ছা উদিত হয়, এই ইচ্ছাটাকে উপনিষদেই খুব সুন্দর ভাবে বলা হচ্ছে *সোহকাময়ত – বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি* – সেই পরমাত্মা ইচ্ছা করলেন আমি এক আমি বহু হব। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম, যিনি আপ্তকাম তাঁর মধ্যে কি করে সেই ইচ্ছাটা জাগবে! বলছেন আমি বহু হব, তাহলে সেই অখণ্ড খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছেন। আর যখন হবেন তখন তাঁর বাইরে কিছু থাকতে হবে, তাঁর বাইরে যদি খালি জায়গা না থাকে তাহলে সৃষ্টিটা করবেন কোথায়। একজন সম্রাট পুরো বিশ্বকে জয় করে নিয়েছেন, তারপরও বলছেন আমি জয় করব। এখন তিনি কোথায় জয় করবেন, জায়গায় নেই জয় করার। সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের আগে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম আসার পর অনেক সমস্যা হয়ে গেছে। এই দুটো ধর্মের চিন্তাধারা অন্য রকমের, আর তাদের মধ্যে যাঁরা খুব প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন তাঁরাও সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারেননি। সাধারণরা রাজাকে বোঝে, জমিদারকে বোঝে। সেইজন্য এরা Personal God এর idea থেকে বেরোতে পারেনা। তখন ভগবান আছেন, আমি আছি, জগৎ আছে, সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আর বলছেন ভগবান বললেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বেদান্তে এই ধরণের কোন idea নেই। বেদান্তে কি বলছে? তিনি নিত্যং। যিনি নিত্য তাহলে তিনি পরিবর্তনশীল কি করে হয়ে যাচ্ছেন? এই বলছে জগৎ হচ্ছে আবার এই বলছে জগৎ নেই। কি করে হবে? বিভুং, তিনিই সব জায়গায় হয়েছেন, সর্বগতং, সর্বব্যাপী তিনি। তাহলে সৃষ্টিটা হবে কোথায়? সৃষ্টি হওয়ার জন্য তো কোন জায়গায় নেই। তাহলে আমি আর আপনি কি করে আলাদা হয়ে গেলাম? এটাই মায়া।

তাহলে এবারে প্রশ্ন হবে, মায়াটা কোথা থেকে আসে? মায়াকে বলছেন জ্ঞানের অভাব, অজ্ঞান। এই অজ্ঞানকে তিনি নিজের উপরে আরোপ করে নিচ্ছেন। যিনি পূর্ণজ্ঞানী, জ্ঞানস্বরূপ তাঁর কি কখন অজ্ঞান হতে পারে! কখন কি সম্ভব! অন্ধকার বলতে আমরা সব সময় মনে করি আলোর অভাব, ঠিক তেমনি অজ্ঞান বলতে জ্ঞানের অভাব। তাহলে কি ভগবানের মাঝে মাঝে জ্ঞানের অভাব হয়ে যায়? কখনই তা সম্ভব নয়। এই কারণেই একে বলা হয় মায়া। মায়াকে কখন বলা হয় দৈবী শক্তি। এই মায়াশক্তিই পরের দিকে তন্ত্রে শক্তি হয়ে গেছে। মায়াশক্তি ঈশ্বরেরই একটা বিশেষ শক্তি। যে জিনিষটা নেই সেটাকে দেখিয়ে দিচ্ছে, দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। কে মুগ্ধ হচ্ছেন? তিনি নিজেই। মুগ্ধ হয়ে হয়ে যখন বিরক্তি এসে যায় তখন বলেন ধ্যুৎ সব বন্ধ কর। তারপর কিছু দিন বন্ধ থাকল। কিছু দিন পর আবার খেলা শুরু হল। আমরা যা বলছি এগুলো সব সত্য, কিন্তু ধারণা করা অসম্ভব। একের পরে যদি চৌদ্দটা শূন্য বসান হয়, কম করে এত বছর ধরে সৃষ্টি চলতে থাকে। এইভাবে খেলা চলতে থাকে, আবার সব শান্ত হয়ে যাবে। কিছু দিন শান্ত হয়ে থাকার পর আবার চলবে। মানুষ যখন কোন কিছু করে আনন্দের জন্যই করে। যে মানুষটি আত্মহত্যা করছে, সে কেন করছে? সে দেখছে আমি এখানে বেঁচে থেকে প্রচুর কষ্ট পাচ্ছি, এই জীবন দিয়ে আমি আর সুখ পাবো না। যদি মরে যাই তাহলে এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাব। এই যে কষ্ট থেকে মুক্তির কথা বলছে, সেটাও আনন্দের আশায় বলছে। মানুষ যেটাই করে একমাত্র আনন্দের দিকে ছুটে যাওয়ার জন্যই করছে। আত্মহত্যাটাও আনন্দের সন্ধান। ভগবান তো পূর্ণ আনন্দ, তিনি যে সৃষ্টি করে নতুন করে কোন আনন্দ পাচ্ছেন তা নয়। এই কারণে সৃষ্টি কেন হচ্ছে, কোথা থেকে আসছে, কিভাবে আসছে এইসব প্রশ্নের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। যাঁর মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান তিনি তো অজ্ঞানের কোন কাজ করতে যাবেন না। আর যিনি পূর্ণ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁকে তো নতুন করে কিছু করার দরকারই নেই। আর যদি সৃষ্টি বলে কিছু হয়ে থাকে তখনও তাঁর আনন্দ, যখন সৃষ্টি নেই তখনও তিনি আনন্দে কারণ তিনি পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। এইভাবে চিন্তা করার পর বেদান্ত বলছে সৃষ্টিটাই মায়া। এখানে আচার্য বলছেন *অনেকদৃষ্টান্তোপাদানং তু সুখাব-বোধনার্থম্* - এই যে তিনটে পর পর আলাদা আলাদা উপমা দিয়েছেন, অন্য কোন কারণ নেই যে তিনটে আলাদা আলাদা ধরণের সৃষ্টি হয়েছে। উপমাগুলো দেওয়া হয়েছে মানুষ যেন সহজে বুঝতে পারে।

এই হচ্ছে সৃষ্টি তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সংক্ষেপে হল, ঈশ্বরের এই বিশেষণগুলো দিয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা ধারণা করা যায়। আমরা যদি কোন কিছু ধারণা করতে না পারি তাহলে তাঁর দিকে এগোব

কিভাবে! নেতি নেতি ঠিক আছে, কিন্তু একটা ধারণা তো করতে হবে, তাই বললেন *নিত্যং বিভুং সর্বগতং*, এই বিশেষণ গুলোই ইতিবাচক। আর তিনি *ভূতযোনিম্*, সব কিছুর স্রষ্টা। এই কথাই বলতে চাইছেন, যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ যিনি নিত্য, তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব সৃষ্টি করা। তখন বলা হল এই তিন ভাবে সৃষ্টি হয়, তিনটে উপমা দিয়ে বোঝান হল। শুধু এই তিনটে ভাবেই সৃষ্টি হয় না, এর পরে আরও কিছু ধাপ আছে যার কথা পরের মন্ত্রে বলা হচ্ছে।

মুণ্ডকোপনিষদের অষ্টম মন্ত্রে যেটি এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এই একটি মন্ত্রে সমগ্র সৃষ্টিটা কিভাবে হয় বলে দেওয়া হয়েছে। আচার্যের ভাষ্য যদি না পড়া হয় আর গুরুমুখে যদি এর অর্থ না শোনা হয় মন্ত্রের সমস্ত অর্থ উলোট-পালট হয়ে যাবে। সপ্তম মন্ত্রে উপমা দিয়ে বোঝান হয়েছে কিভাবে ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। অষ্টম মন্ত্রে কোন উপমার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না, সরাসরি বলে দেওয়া হচ্ছে এই ভাবেই সৃষ্টিটা হয়।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্।।১/১/৮।।

(তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম স্ফীত হন, সেই স্ফীত ব্রহ্ম থেকে অব্যাকৃত প্রকৃতি (অন্ন) জাত হয়, প্রকৃতি থেকে হিরণ্যগর্ভ (প্রাণ), হিরণ্যগর্ভ থেক মন, মন থেকে পঞ্চভূত(সত্যম্), পঞ্চভূত থেকে ক্রমে লোকসমূহ এবং লোকসমূহ থেকে কর্মসকল ও কর্মসকল থেকে কর্মফল উৎপন্ন হয়।)

প্রথম মুণ্ডকের এই অষ্টম মন্ত্রটি অত্যন্ত কঠিন একটি মন্ত্র। পুরো সৃষ্টি তত্ত্বকে এই একটি মন্ত্রের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দর্শন এই মন্ত্রের ভাবকে নানান দিকে দিয়ে আপত্তি করতে পারে। যাঁরা উপনিষদকে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁরাও এই মন্ত্রের অর্থকে অনেক সময় এদিক-ওদিক করে দেন। সাধারণ দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ হল – *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, চীয়তে মানে স্ফীত হওয়া বা বিস্তার করা, ব্রহ্ম তপস্যা করে নিজেকে বিস্তার করলেন। তাহলে প্রথম অর্থটা কি হল? *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, তার মানে ব্রহ্ম তপস্যা করেন আর তপস্যা করে তাঁর শরীরটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। বায়োলজিতে যারা সেল ডিভিশন পড়েছেন তাঁরা জানেন যখন সেল ডিভিশন হয় তখন সেলটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, যেমন এ্যমিবা, এ্যমিবা বড় হতে হতে একটা অবস্থায় টুকরো হয়ে যায়। ব্রহ্মও যেন ঠিক সেই ভাবে তপস্যা করে করে বড় হতে শুরু করেন। *ততঃ অন্নম্ অভিজায়তে*, সেই স্ফীত ব্রহ্ম থেকে প্রথমে অন্নের জন্ম হয়। অন্ন থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের জন্ম হয়, আমরা এই ভাবেই অর্থ করব। কিন্তু এইভাবে অর্থ করলে মন্ত্রের অর্থের ল্যাজা মাথা কিছুই দাঁড়াবে না। কারণ পরের দিকে অন্যান্য যে মন্ত্র আসবে তাদের সঙ্গে এই অর্থের কোন সঙ্গতি পাওয়া যাবে না।

যেমন ঠাকুরের একটি উপদেশ আছে একটি-দুটি সন্তান হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে। এরপর কেউ যদি এসে কোন সন্ন্যাসীকে গিয়ে বলে ঠাকুর বলেছেন একটি-দুটি সন্তানের পর ভাই-বোনের মত থাকতে, তাহলে আপনি বিয়ে কেন করেননি? আপনার একটা-দুটি সন্তান নেই কেন? ঠাকুর আবার বলছে স্বদারায় গমনে দোষ নেই। তাহলে ঠাকুর কি কোথাও বলছেন যে তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। পুরো কথামৃত যদি কারুর পড়া থাকে তাহলে সে কখনই ঠাকুরের এই উপদেশ গুলোকে এইভাবে অর্থ করতে যাবে না। এই উপদেশের মাধ্যমে ঠাকুর একটা জিনিষকে ব্যাখ্যা করছেন, কিন্তু ঠাকুরের মূল দর্শন হল ত্যাগের। শ্রীশ্রীমা বলছেন ঠাকুর ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। ঈশ্বর দর্শন হল মূল উদ্দেশ্য আর তার পথ হল ত্যাগ। যারা পারবে না, তারা বিয়েথা করবে। বিয়েথা করলে এবার দুটি সন্তান হয়ে যাওয়ার পর থেমে যাবে। বাইরে থেমে গেলে হবে না, মন থেকে থেমে যেতে হবে, যা করার ছিল হয়ে গেছে, এবার আমার কর্তব্য পূর্ণ, ব্যস্ আর নয়। তারপর সে কি করবে? সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়বে। পারলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেরিয়ে যাবে, না পারলে স্বামী একাই বেরিয়ে যাবে। এটাই হল ঠাকুরের মূল দর্শন।

মন্ত্রের অর্থের জটকে ছাড়াতে গিয়ে আচার্য বলছেন *তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যতে*, এই *ক্রমেণোৎপদ্যতে* বিবর্তনের কথাই বলছেন। তবে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন তত্ত্বকে যে অর্থে বলা হয় সেই অর্থে কিন্তু উপনিষদ গ্রহণ করছে না। *ক্রমেণোৎপদ্যতে*, মানে একটার পর একটা জন্ম হয়। তাহলে অন্যান্য দর্শনের কোন্ কোন্ তত্ত্বকে এখানে মানা হচ্ছে না? বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদ, শূন্য থেকে উৎপত্তির তত্ত্বকে না করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিজ্ঞানের বিগ্ ব্যঙ থিয়োরিকেও বাতিল করে দেওয়া হল। বিগ্ ব্যঙ কোথা থেকে হচ্ছে বিজ্ঞানের কাছে পরিষ্কার নয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদের গাণিতিক ফরমুলেশন ওখানে গিয়ে থেমে যায়, যার জন্য বিগ্ ব্যঙের আগে কি হয় আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আচার্য বলছেন *ন যুগপদ্‌বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবদিতি*, বদর মানে কুল, এক বস্তা কুল আছে, সেই বস্তা থেকে এক মুষ্টি কুল শূন্যে ছুড়ে দিলাম, তাতে কুলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। এভাবে সৃষ্টি হয় না। ভগবান কি এই রকম সব লোককে ধরে ছুঁড়ে দেন? এই যে অনন্ত সৌরমণ্ডল তিনি সব বস্তা থেকে বার করে ছুঁড়ে দিয়েছেন? এভাবে সৃষ্টি হয় না। এমন কি নিজে থেকে বুম্ করে সব কিছুর জন্ম হচ্ছে এই থিয়োরিকেও এখানে আটকে দেওয়া হয়েছে। খ্রীশ্চান ধর্মে বলছে ভগবান বললেন সৃষ্টি হোক, বলতেই সৃষ্টি হয়ে গেল – এই মতকে এখানে একেবারে আটকে দেওয়া হয়েছে, এই ভাবে সৃষ্টি হবে না।

বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে যত লড়াই ঝগড়া সব খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মের সাথেই, হিন্দুধর্মের সাথে বিজ্ঞানের কোথাও কোন বিরোধ নেই। বিজ্ঞান বলতে আমরা এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বলি, আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কেউ বেদান্ত পড়েই না। খ্রীশ্চান ও ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্বকে শুধু বিজ্ঞানই নয় বেদান্তও কখন মানবে না। তারা বলতে পারে আপনাদের যুক্তি কি? আমাদের কাছে কোন যুক্তি নেই, আমাদের ঋষিরা এই রকম বলেছেন, ব্যস্ এটাই যুক্তি। তোমাদের বাইবেলে বলছে ঈশ্বর বললেন সৃষ্টি হোক আর সৃষ্টি হয়ে গেল তাই তোমরা মানছ, আমরাও সেইজন্য মানছি। কিন্তু আমাদের মন্ত্র হল এটাই *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*। এরপরেও একটা সৃষ্টির তত্ত্ব আছে যেটা আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কথাতেই পাই। ঈশ্বর যেটা সৃষ্টি করেন সেটা ক্রম অনুযায়ী হয়, একটা একটা করে নয়। একটা একটা করে সৃষ্টি হওয়াটা হল চিত্রকরের ছবি আঁকার মত, যেমন চিত্রকর একটা গাছ আঁকছেন। চিত্রকর ছবি আঁকতে গিয়ে প্রথমেই ফুল আঁকলেন, তারপর ডাল, তারপর পাতা, পাতার পর গাছের কাণ্ড, হয়ত বা শেকড়টা আঁকলেনই না। চিত্রকর অত না এঁকে শুধু পাতা ও ফুল আঁকছেন, প্রথমে তিনি দুটি পাতা আঁকলেন তারপরে ফুল আঁকলেন। এভাবেও সৃষ্টি হয় না। কারণ আমি যদি ইচ্ছে করি একটা পাতাকে বাদ দিয়েও দিতে পারি, সৃষ্টি একটু বাদ পড়ে গেল। একজন মানুষ জন্ম নেওয়ার সাথে দেখছে তার একটা চোখ নেই, এরা বলবে জন্ম নেওয়ার সময় ভগবান চোখটা দিতে ভুলে গেছেন। কারুর উপর রেগে গেলে বলি ভগবান কি তোমাকে একটুও বুদ্ধি দেননি! তার মানে ভগবান বুদ্ধিটা দিতে ভুলে গেছেন। আমাদের মাথায় কোথাও বসে আছে সৃষ্টিটা যেন চিত্রকরের সৃষ্টির মত। তিনি হাত বানালেন, পা তৈরী করলেন কিন্তু বুদ্ধি দেওয়ার সময় ভুলে গেলেন। কিন্তু ভগবান এই ভাবে সৃষ্টি করেন না। ক্রমানুসারে ভগবান সৃষ্টি করেন। যেমন বীজ, বীজ থেকে যখন গাছ বেরিয়ে আসবে তার আগে বীজটা অঙ্কুরিত হয়। পুরো গাছটা বীজের ভেতরেই থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিটা ঠিক এই ভাবে হয়। আমরা মনে করতে পারি ঋষিরা বীজকে অঙ্কুরিত হতে দেখেছেন তাই সৃষ্টির এই ধারণাটাও সেই ভাবে তাঁরা কল্পনা করেছেন। তাহলে ঋষিরা তো চিত্রকরের সৃষ্টিকেও দেখেছেন কিন্তু চিত্রকরের উপমা কেন নিচ্ছেন না! ঋষিরা এই ব্যাপারে খুব দৃঢ় ছিলেন সৃষ্টিটা একটার পর একটা ক্রম অনুযায়ীই হতে থাকে।

বেদান্তে কার্য কারণ সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানেও তাই। প্রত্যেক কার্যের পেছনে একটা কারণ থাকবে, যেখানেই কারণ থাকবে সেইখানেই কার্য হবে। দুম্‌দাম্ করে কিছু হবে না, একটা জিনিষ আরেকটা জিনিষকে নিয়ে যাবে। সেইজন্য স্বাধীন ইচ্ছা বলে আমাদের কাছে কিছু নেই। স্বাধীন ইচ্ছা অন্যান্য ধর্মের সমস্যা, বেদান্তে এই নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। স্বাধীন ইচ্ছা হতেই পারে, না হওয়ার কিছু নেই। কারণ একটা স্বাধীন ইচ্ছার পেছনে আরেকটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তার পেছনে আরেকটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তাহলে স্বাধীন ইচ্ছাটা থাকল কোথায়। আমার পেট খালি হয়ে গেলে আমার খিদে পাবে, খিদে

পেলে আমাকে খেতে হচ্ছে, তাহলে স্বাধীন থাকল কোথায়! স্বাধীন ইচ্ছা বলে কোন শব্দই হয় না। বেদান্ত পুরুষকার শব্দকে অন্য অর্থে নিয়ে আসে। সব কিছুর পশ্চাতে এনারা কার্য কারণ সম্পর্ককে নিয়ে আসেন।

সেইজন্য অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টির যত রকমের সম্ভবনা ও চিন্তার কথা বলা হয়েছে সবটাকে এনারা বাদ দিয়ে রেখেছেন। এনাদের কাছে সব থেকে কাছের উপমা হল বীজ থেকে যে পদ্ধতিতে গাছ বেরিয়ে আসছে, সৃষ্টি ঠিক সেই পদ্ধতিতে হয়। এখানে আরেকটি ব্যাপার আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যখনই বীজ থেকে গাছের উপমা নেওয়া হচ্ছে, তখন একটা ব্যাপার আমরা প্রায়ই ভুল করে বসি। আমরা ভাবি যখন বীজ থেকে গাছ হয় তখন তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, মানুষ যখন চাষ করে তখন তার একটা উদ্দেশ্য থাকে – হয় সৌন্দর্যের জন্য, নয়তো পরিবেশ দূষনকে প্রতিরোধ করার জন্য নয়তো ফসল উৎপাদনের জন্য। তাহলে ভগবানের সৃষ্টি কার্যের পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য থাকবে। ভগবানের কি উদ্দেশ্য? তখন বলবে মানবজীবন হল একটা কিছুর পরিবর্তি। কি পরিবর্তি? মানবজীবনের পরে একটা সুপার ম্যান আছে, এটাই মানবজীবনের পরিবর্তি। বেদান্তে এসব কিছুই বলা হয় না, এই সৃষ্টি নিজের থেকেই হচ্ছে। এর কোন যে উদ্দেশ্য আছে তা নয়। কারণ বেদান্ত মতে সৃষ্টিটা বাস্তব নয়।

এত কিছু বলার পর যদি বলা হয় সৃষ্টি আদপেই হয়নি, এটা আমাদের মনের ভ্রম, তখন আমাদের সব কিছু গুলিয়ে যাবে। সেইজন্য বেদান্ত দুটো সত্তার কথা বারবার বলা হয় – পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা। বেদান্তের এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। পারমার্থিক সত্তাতে একমাত্র সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই। ওই পারমার্থিক সত্তার যে কোন কারণেই হোক, যদি ইচ্ছা জাগে, কেন জাগে, কি ইচ্ছা জাগে আমরা এর কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু মূল একটা বাক্যে বলে দেন – *একোহম্ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি*, আমি এক আমি বহু হব। এই ইচ্ছাটাই মায়া। স্বামীজী অনুবাদ করছেন Time, Space and Causation, সময়ের জন্ম হয়, দেশের জন্ম হয় আর কার্য-কারণ সম্পর্কের জন্ম হয়ে যায়, মায়া মানে এই তিনটে – কাল, দেশ ও কার্যকারণ সম্পর্ক। পারমার্থিক সত্তা মায়ার বিভাজন রেখার পারে। এই বিভাজন রেখার পারে কি আছে তার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, শুধু মাত্র আভাসটুকু পাওয়া যায়। আভাসমাত্র এই শব্দটাই বার বার ব্যবহার করা হয়, ওখানে কোন যুক্তি-তর্কও কাজ করবে না। তাহলে কি এটা অযৌক্তিক? একেবারেই নয়। যার জন্য এনারা সূর্যের উপমা নিয়ে আসেন – যেমন সূর্যে আমরা দিন ও রাতের কল্পনাই করতে পারিনা। যেখানে রাত হবে সেখানে দিন হবে, যেখানে দিন আছে সেখানে রাত হবে। কিন্তু সূর্যে কি কখন রাত হয়? রাত যদি না হয় তাহলে দিন হওয়ারও কোন প্রশ্নই আসেনা। সূর্যের এই উপমাটা যদি মাথায় রাখি তাহলে বেদান্ত বুঝতে আমাদের অনেক সহজ হবে। বেদান্তের এই যুক্তিটা খুব পরিষ্কার – যারই রাত বোধ আছে তারই দিন বোধ থাকবে, যারই দিন বোধ থাকবে তারই রাত বোধ হবে। কিন্তু সূর্যলোকে যাঁরা আছেন তাঁদের দিন বোধও নেই রাত বোধও নেই, তাঁরা দিন-রাতের পারে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন যার জ্ঞান বোধ আছে তার অজ্ঞান বোধ থাকবে, কিন্তু বিজ্ঞানী জ্ঞান অজ্ঞানের পারে। বিজ্ঞানী যিনি, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর কাছে জ্ঞান অজ্ঞান বলে কিছু নেই, তিনি ধর্ম অধর্মের পারে। সূর্যের উপমাতে এই ব্যাপারটা বোঝা যায়।

সূর্যের উপমা ছেড়ে আমরা আরও জাগতিক উপমাতে নিয়ে আসতে পারি। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা হচ্ছে। হয়তো তখনও কোন পক্ষেই কোন গোল হয়নি। কেউ জিজ্ঞেস করল কটি গোল হয়েছে? আমরা কি বলব? শূন্য শূন্য। খেলা শেষ হয়ে গেলে একপক্ষ জিতবে একপক্ষ হারবে আর হারা-জেতা না হলে বলব খেলা ড্র হয়েছে। কোন কারণে হয়ত বৃষ্টির জন্য খেলাই শুরু করা যায়নি, তখন খেলার কি ফলাফল বলব? খেলা শুরুই হয়নি তাই জেতা-হারা বা অমীমাংসিত হওয়ার কোন প্রশ্নই আসবে না, এটা শূন্য-শূন্যও নয়। গণিতে এটাকে বলে ফাইসেট। এই থিয়োরিত একটা হয় শূন্য, শূন্যের বাইরে একটা হয় তাকে বলে নালসেট, ফাই মানে শূন্য নয়। ফাই মানে এখানে কিছু নেই, কিছু নেই মানে শূন্যও নেই। খেলা হয়নি বলে কোন স্কোর নেই আর খেলা শুরু হওয়ার পর শূন্য শূন্য এই দুটো আলাদা। খেলা না হওয়ার জন্য দুজনকে সমান পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ড্র হলে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট, খেলা না হলে ওয়ান ওয়ান

পয়েন্ট ভাগাভাগি করে দেওয়া হল, কিন্তু দুটো আলাদা ব্যাপার। যদি রেফারি হুইসেল দেওয়ার পর খেলা শুরু হয়ে গেল, কিন্তু পরে বৃষ্টির জন্য খেলা পরিত্যক্ত হয়ে গেল। খেলা বন্ধ হওয়ার আগে তখনও গোল না হয়ে থাকলে স্কোর শূন্য শূন্য হয়ে গেল। কিন্তু এখানে খেলাই হয়নি। ঠিক তেমনি নিত্যতে যা আছে তা জিরোও নয়, এক-একও নয়, এই কথাই আসবে না। এগুলো শুনলে কিছু হবে না, ধারণা করতে হয়। যখন ধারণা হয়ে যাবে তখন বুঝে যাব – ও, এটা এই! সেইজন্য শাস্ত্রের কথা প্রথমেই প্রশ্ন না করে শুধু শুনে যেতে হয়। গুরু বা আচার্য যতই আমাদের বলতে থাকুন আমরা সূক্ষ্ম ব্যাপার গুলো কিছুতেই ধরতে পারব না। কিন্তু যেদিন ধরতে পারব তখনই ধারণা হয়ে যাবে – ও আচ্ছা, এটা এই! যেমন সূর্যে দিন ও রাতের কল্পনা করা যায় না। সূর্যে সব সময় কি আছে ওটা মুখে বলা যাবে না। যদি বলি সব সময় দিন, সেটাতো পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়ে গেল, পৃথিবীর বাসিন্দারা জানে দিন কাকে বলে রাত কাকে বলে। কিন্তু সূর্যের বাসিন্দারা তো জানে না দিন কাকে বলে আর রাত কাকে বলে।

নিত্যে কোন নিয়ম নেই। তাই বলে সেখানে সব কিছু বেনিয়ম? আদপেই না, সব কিছুর পারে, ধর্মাধর্মের পারে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে। কিন্তু যখনই মায়ার আবরণ এসে গেল তখনই আপেক্ষিক জগৎ শুরু হয়ে গেল, যেটাকে বলছি ব্যবহারিক জগৎ। এখান থেকেই অপরা বিদ্যা শুরু হয়ে গেল। তখন আরও কিছু কিছু ব্যাপার শুরু হয়ে যাবে, প্রথম আসবে দেশ ও কাল। দেশ বা স্থানকে পরিমাপ করার জন্য সময় বা কাল ও দূরত্বের দরকার হবে। সেখান থেকে কার্য-কারণ সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেল। একজন খুন হয়েছে। পুলিশের কাছে খবর দিতে গেলে পুলিশ প্রথমে জিজ্ঞেস করবে 'ঘটনাটা কোথায় হয়েছে?' অমুক জায়গায়। তারপর জিজ্ঞেস করবে কখন হয়েছে? অমুক সময়। প্রথমে এসে গেল স্থান তারপর এসে গেল সময়। যা কিছু এই তিনটের মধ্যেই ঘুরপাক করবে, বাকি যা কিছু এর মধ্যেই থাকবে। কার্য-কারণ সম্পর্ক হলেই তার একটা পরিণতি আছে, কার্য-কারণ থাকলেই তার কর্তা থাকবে, কারকের বাকি বিভক্তিগুলো থাকবে, তার ক্রিয়া থাকবে আর তার একটা ফল থাকবে, সবটাই অপরা বিদ্যার এলাকা। নিত্য, যাঁকে পারমার্থিক সত্তা বলা হচ্ছে, তিনি এই সব কিছুর পারে। সেখানে এসব ব্যাপারে কোন প্রশ্নই চলে না, কোন কথাও চলবে না।

কিন্তু যখন মায়ার এক্তিয়ারে চলে আসবে তখন সব কিছু পুরো এই প্রক্রিয়াতে চলতে থাকবে। আসলে ভগবান হলেন নিত্য, তিনি কেন মায়ার এলাকার নিয়মকে অনুসরণ করতে যাবেন! এখানেই অনেকের প্রচুর সমস্যা হয়ে যায়, যখন বলে তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে। যিনি ভগবান তিনি তো আর কোন নিয়মে আবদ্ধ নন, তিনি সব কিছুর বাইরে, তিনি যেরকম খুশি করতে পারেন। কিন্তু যেমনি মায়া এসে গেল, তাঁর জ্ঞানশক্তিতে ইচ্ছা জেগে গেল। ইচ্ছা মানেই অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে ভগবানের তো আমাদের মত অজ্ঞান হবে না, একটা divine ignorance এসে যায়। এরপর কিন্তু ভগবানও মুক্ত নন, তাঁরও কিন্তু সীমাবদ্ধতা এসে যাবে। এখান থেকে যা কিছু হবে পুরোটাই একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলতে থাকবে। কি পদ্ধতিতে? সেটাই অষ্টম মন্ত্রে বলা হয়েছে।

আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য রচনার প্রথমেই একটা প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করছেন। সেই প্রণাম মন্ত্রটি আবার তিনি পুরান থেকে নিয়েছেন। পুরান থেকে নিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের উপনিষদের যা বক্তব্য, গীতারও তাই বক্তব্য আর পুরানেরও একই বক্তব্য। তফাৎটা হল উপনিষদ একটা দুটো মন্ত্রে সূত্রাকারে বলে বেরিয়ে গেছে। সেটাকেই পুরানাদিতে লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। উপনিষদ তার বক্তব্যকে উপস্থাপনা করার জন্য কোন কাহিনীর সাহায্য নেয় না, কিন্তু পুরান কাহিনীর মাধ্যমেই যা কিছু বলার বুঝিয়ে দেবে। উপনিষদ আর পুরানের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। পুরানে সৃষ্টির সম্বন্ধে কি বলছে?

নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।।(গীতাভাষ্য, আচার্য শঙ্কর)

নারায়ণই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। সেই নারায়ণ থেকেই অব্যক্ত, অব্যক্ত মানে মায়া আর এই অব্যক্ত থেকে হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয়। হিরণ্যগর্ভের যখন উন্মোচন হতে শুরু হয় তখন তাঁর গর্ভ থেকে এক

এক করে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ইত্যাদি এই লোকসমূহের সৃষ্টি হয়, সপ্তদ্বীপের সৃষ্টি হয়, তারপর এই পৃথিবীর জন্ম হয়, সব কিছু এই ক্রমে হতে থাকে। প্রভু আছেন, তাঁর থেকে অব্যক্ত মানে মায়া অর্থাৎ দৈবী শক্তি বা মায়া, দৈবী মায়া থেকে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ থেকে এই লোকসমূহ, লোকসমূহ থেকে সাতটি দ্বীপ, এই সাতটা দ্বীপের পৃথিবী একটা দ্বীপ, এইভাবে সৃষ্টি হয়। ঠিক একই কথা এখানে বলছেন।

আচার্য গীতায় যে প্রণামমন্ত্র দিয়ে শুরু করছেন বা অন্যান্য শাস্ত্রে যা বলা হচ্ছে তার সাথে এই মন্ত্রের বক্তব্য আলাদা কিছু নয়। নারায়ণ অব্যক্তের পারে। কিন্তু এখানে বলছেন *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম যদি তপস্যা করে বড় হতে থাকেন, তাহলে তো ব্রহ্মকে মাপা হয়ে গেল। বড় তিনি কোথায় হবেন? বড় হতে হলে তাঁকে একটা spaceএ মানে জায়গাতেই বড় হতে হবে। কিন্তু এর আগের মন্ত্রে বলে দিলেন *নিত্যং বিভুং সর্বগতং*, তিনি তো সব জায়গাতেই ব্যপ্ত তাই তিনি বড় কোথায় হবেন! তাহলে মন্ত্রে মন্ত্রে দ্বন্দ্ব হয়ে যাচ্ছে। উপনিষদে এক মন্ত্রের সাথে অন্য মন্ত্রের সংঘাত হয় তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ সব মন্ত্রে একই কথা বলতে হবে। এসব জটিল জায়গায় এসে আচার্যের ভাষ্য না পড়া থাকলে সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। এই মন্ত্রের তপসা শব্দের ব্যাখ্যা করে বলছেন, আমরা যে অর্থে তপস্যা মনে করি, যেমন উপবাস, তীর্থাদি, চান্দ্রায়ণ, একাদশী এগুলোর মত এই তপস্যা নয়, এই তপস্যার অর্থ আয়াস, আয়াস মানে চেষ্টা করা। কিন্তু ব্রহ্মের তপস্যা হল জ্ঞানময়, তাঁকে চেষ্টা করতে হয় না, *জ্ঞানেন*। যখন উনি ভাবছেন – আমি এক বহু হব, এটাই তাঁর তপস্যা। তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি ভাবতেই পারেন। তিনি কি ভাবলেন? আমি এক বহু হব। এটাই তপস্যা। আচার্য এখানে বলছেন *উপচীয়তে*, মানে বড় হওয়া, এটাকে বলছেন স্থূলতা প্রাপ্ত করা। তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি মন, বাণীর বিষয় নয়। শুদ্ধ চৈতন্যের কোন স্থূলতা নেই, তাঁর দেশ, কাল, কার্য-কারণও নেই। যেমন পিওর এণার্জি যখন কোন কিছুর মধ্যে যাচ্ছে তখন সে স্থূলতা প্রাপ্ত করছে। এণার্জি যখন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে স্থূলতা প্রাপ্ত করে, ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দ স্থূলতা প্রাপ্ত করেন। আচার্য এখানে বীজের উপমা দিচ্ছেন, বীজ কত ছোট্ট, বটবৃক্ষের ঐ ছোট্ট একটা বীজের মধ্যে ঐ বিশাল বৃক্ষ সুপ্ত হয়ে আছে। সেই বীজকে যখন মাটিতে রোপণ করা হয় তখন তার থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম্ হয়, সেই সূক্ষ্ম এখন স্থূলতা প্রাপ্ত করছে।

আচার্য আরেকটি উপমাতে বলছেন *পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ*, যখন মানুষের মধ্যে ইচ্ছা জাগে আমার সন্তান হোক, তখন তার মধ্যে আনন্দ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে একজন নারীর সন্ধান করতে হবে, তাকে বিয়ে করতে হবে ইত্যাদি। বিয়ে হওয়ার পর এবার তার সন্তান পাওয়ার ইচ্ছা যখন জেগে উঠল তখন তার মধ্যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দে তখন সে ফুলে ওঠে। সেখান থেকে তার একটি সন্তান উৎপত্তি হল, পুরুষ যেন একটা স্থূলত্ব প্রাপ্ত করছে। আর সেই আনন্দ যেটা হয়, আমার সন্তান হোক, সেই আনন্দ একটি পুত্র রূপে দাঁড়িয়ে যায়। বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়ে গাছে পরিণত হয় তখন আমি প্রশ্ন করতে পারি বীজকে যদি মাটিতে রোপণ না করা হয়, জল আলো-বাতাস যদি না পায় তাহলে বীজতো অঙ্কুরিত হতে পারবে না। তখন তার জন্য অন্য উপকরণ দরকার হবে। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে অন্য কোন উপকরণের দরকার হয় না। সেইজন্য এগুলোকে বলা হয় উপমা, একটা জিনিষকে বোঝানর জন্য উপমা দেওয়া হচ্ছে। কি বোঝাচ্ছেন? বীজ এত সূক্ষ্ম কিন্তু আস্তে আস্তে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দ স্থূলত্ব প্রাপ্ত করেন। *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, যিনি ব্রহ্ম তিনি তপস্যা করে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হলেন। তপস্যা মানে আমরা যেভাবে কত কষ্ট করে আসনে বসছি, উপোস করছি এইভাবে ব্রহ্ম কষ্ট করে কিছু করছেন না, তিনি যে ইচ্ছা করছেন এটাই তাঁর *উপচীয়তে* অর্থাৎ তিনি স্থূলত্ব প্রাপ্ত করে বৃদ্ধি পাচ্ছেন।

কিন্তু সেই নির্গুণ শুদ্ধ চৈতন্যের যখন ইচ্ছা জাগে তখন তিনি কিভাবে স্থূলত্ব প্রাপ্ত করে জগৎ হন কোন শাস্ত্র এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আর যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি কেন সৃষ্টি করেন আরে কোন্ জায়গা থেকে সৃষ্টি শুরু হয় এটাকেও কোন ধর্মই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেনা, ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। এটাই বেদান্তের দৃঢ় মত। শুদ্ধ চৈতন্যের চিতি যেখানে আছে সেখানেই তাঁর জ্ঞান আছে। তখন এই জ্ঞানের মধ্যে আসে আমি এক বহু হব। কিন্তু যিনি অনন্ত তাঁর মধ্যে কি করে বিভাজন হবে? এটা সম্ভব নয়। তাই বলা হয় যেন একটা

মায়ার আবরণ এসে যায়। মায়া যখন এসে যায় তখন নির্গুণ ব্রহ্ম হয়ে যান কার্য ব্রহ্ম। মায়া যেন একটা বিভাজন রেখা। এই বিভাজন রেখারে এই দিকটা কার্য ব্রহ্ম, আর সৃষ্টিটা এখান থেকেই আরম্ভ হচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে প্রথমে নানান ধরণের যে বিচার ভাবনার উদয় হয় সেগুলো তখন সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। যখন এই বিচার ভাবনাগুলো কার্যে পরিণত হয় তখন সেই সূক্ষ্মই স্থূলত্ব প্রাপ্তি করে। ঠিক তেমনি যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি হলেন *সুসূক্ষ্মম্*, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গূঢ়। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ সূক্ষ্ম, কিন্তু তিনি তার থেকেও সূক্ষ্ম। মানে তাঁর সূক্ষ্মত্ব স্থূলত্বের পারে।

কিন্তু আমি সামনে এত কিছু দেখছি, বোতল, গ্লাশ, টেবিল, চেয়ার যা দেখছি এগুলো সবই তো স্থূল রূপেই দেখছি। কিন্তু এগুলো তো একটি ধাপেই তো স্থূলত্ব রূপ নিচ্ছে না, যিনি *সুসূক্ষ্মম্* তিনি দুম্ করে এত কিছু স্থূল হয়ে যাননি! ক্রমানুসারে হচ্ছে, *সুসূক্ষ্মম্* থেকে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের জন্ম। এই গুণগুলো যখন পরস্পরে সংমিশ্রণ হতে থাকে তখন তাঁর সূক্ষ্মত্ব কমতে থাকে। আস্তে আস্তে সেই স্থূলত্ব থেকে আরও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হতে থাকে, এইভাবে হতে হতে শেষে এমন অবস্থায় আসেন যেখানে তাঁকে এবার ইলেক্ট্রন প্রোটনের আকার ধারণ করতে হবে। এইভাবে একটার পর একটা অনেক স্তর পেরিয়ে সৃষ্টি এগোতে থাকে। বৈশাষিকরা এখানেই অনুবাদ নিয়ে এসেছেন, অনুবাদ মানে এ্যটম্। ওনারা বলেন প্রথম এণার্জি থেকে ছোট ছোট অনু হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা যেটাকে এ্যটম বলছেন তার সাথে বৈশাষিকদের এই অনু এক নয়। বৈশাষিকরা বলেন যখন দুটো অনু এক হয়ে যায় তখন এক রকম জিনিষ হয়। যখন ঐ দুটো অনু আবার বিভিন্ন ভাবে মিশ্রণ হয় তখন আরও বড় হয়ে যায়। এই ভাবে তিনটে অনু হয়ে যাওয়ার পর এদের মধ্যে যে খেলা শুরু হয় সেখান থেকে এই সৃষ্টিটা হতে থাকে। আচার্য অবশ্য বৈশাষিকদের এই তত্ত্বকে মানছেন না। আচার্য শঙ্করের পরিষ্কার বিশ্লেষণ – যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম তাঁর মনে ইচ্ছা জাগল, মনে এই ইচ্ছা জাগাটাই মায়া। ব্রহ্ম হলেন সর্বজ্ঞঃ, পরের মন্ত্রেই এই ব্যাপারে বলা হবে, কারণ তিনি শুদ্ধ চৈতন্য কিনা। তিনি নির্গুণ নিরাকার কিন্তু তাঁর মধ্যে হঠাৎ বিজ্ঞান এসে যায়। কি বিজ্ঞান? আমি সৃষ্টি করতে পারি, আমি সংহার করতে পারি আর আমি স্থিতি করতে পারি। যখনই তাঁর মধ্যে এই বিজ্ঞানটা এসে গেল, যেটাকে বলা হচ্ছে আমি এক আমি বহু হব, তাঁর মধ্যে জ্ঞান এসে গেল আমি সৃষ্টি করতে পারি, এটা হল একটা ধাপ, তিনি বৃদ্ধি পেয়ে গেলন।

এই জ্ঞান তাঁর মধ্যে বাইরে থেকে আসেনি, তাঁর মধ্যেই আছে। আমি এটা পারি, এই জ্ঞানটা কেন জন্মায়? এটাই রহস্য। যাঁরা মায়ার জগতে বাস করছেন তাঁরা এই রহস্যের উন্মোচন কোন দিন করতে পারবেন না। কিন্তু এই কথাগুলো ঋষিরা বলছেন, তাই এগুলো মানতে হয়। আচার্যও বলছেন একটা জায়গার পর বুদ্ধি এটাকে আর ধরতে পারেনা। তাই শাস্ত্রে যে রকমটি আছে সেটাই মেনে নিতে হয়। তাই কি বলছেন? আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করতে পারি এই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। আচার্য এটাই বলছেন *সৃষ্টিস্থিতিসংহারশক্তি-বিজ্ঞানবত্তয়োপচিতাৎ*। তাঁর মধ্যে এই বিজ্ঞানটা এসে যাচ্ছে আমি এটা পারি। এই ব্যাপারে বাল্মীকি রামায়ণে আমরা খুব সুন্দর একটা উপমা পাই। হনুমানকে যখন সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় যেতে বলা হল, তখন তিনি জানেন আমার এই ক্ষমতা নেই। তখন জাম্ববান হনুমানকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, না তোমার মধ্যে ক্ষমতা আছে, তুমি পারবে। জাম্ববান মনে করিয়ে দিতেই হনুমান ভাবতে শুরু করে হঠাৎ তাঁর মনে হল, তাই তো আমার মধ্যে তো সত্যিই ক্ষমতা আছে। তখন তার শরীরের আয়তন বাড়াতে শুরু করে দিলেন। যত তাঁর শক্তি বাড়ছে ততই তাঁর শরীরের কলেবরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপর তিনি এক ঝাঁপ দিলেন। এখানে ঠিক তাই বলা হচ্ছে, হনুমানের ওটাই জ্ঞান, ওখানে যেমন জাম্ববান হনুমানকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এখানে অক্ষরকে কেউ মনে করাচ্ছে না, যদিও ভাগবতে আছে যখন সৃষ্টির সময় হয় তখন বেদ ভগবানকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন যেভাবে রাজাকে চারণরা স্তুতি গান করে ঘুম ভাঙায়। বেদ মানেই জ্ঞান, জ্ঞান থেকে তাঁর এই বোধ আসে আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করতে পারি।

তখন ব্রহ্ম থেকে *ততোহন্নমভিজায়তে*, অন্ন জন্ম নেয়। যাঁর ইচ্ছা হয়েছে কিছু করার তখন সেই ইচ্ছা পুর্তি করার জন্য তাঁর ভোগ্য বস্তুর দরকার। ভোগ্য বস্তু না হলে কখন ইচ্ছা পুর্তি হয় না। যেটাই ভোগ্য বস্তু

সেটাকেই অন্ন বলা হয়। সংসারে সব সময় দেখা যায় যখনই কোন কিছু ইচ্ছা জাগে তখনই তার জন্য একটা বিষয় দরকার হয়, যেটাকে কারকের দ্বিতীয়া বলা হয়, এটাকেই এখানে বলা হচ্ছে অন্ন। অন্ন বলতে এখানে মূলতঃ বোঝাচ্ছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির আরেকটি পরিভাষা হল অব্যক্ত। অব্যক্ত মানে অবিভক্ত, যার মধ্যে এখনও কোন বিভাজন আসেনি। প্রকৃতি আবার সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটে গুণের সমাহার। এই তিনটে গুণ প্রকৃতির মধ্যে সাম্য অবস্থায় থাকে। সাম্য অবস্থা মানে ওর মধ্যে এখনও কোন বিকৃতি হয়নি, পুরো অব্যাকৃত। সাম্য অবস্থায় যখন আছে তখন কোন সৃষ্টি হবে না। সাম্য অবস্থাটা ভাঙতে শুরু করলেই সৃষ্টি শুরু হতে থাকে। সাংখ্যবাদীরা ঠিক এই অবস্থা থেকেই তাদের সব কিছু আলোচনা শুরু করে। প্রকৃতিকে তাঁরা মনে করেন চিরন্তন। শাক্তবাদীরা প্রকৃতি না বলে শক্তি বলে। প্রকৃতি ঈশ্বর থেকেই জন্ম নিয়েছে, তাই প্রকৃতিও চৈতন্য সত্তা, তাই তাকে বলছে শক্তি।

বেদান্ত বলবে এই সত্তাগুলিকে যদি ঈশ্বরের থেকে আলাদা মনে করা হয় তাহলে ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমিত হয়ে যাবে। এই নিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক আছে। কিন্তু মূল কথা হল এই প্রকৃতিই হল মায়া, পরিষ্কার চোখের সামনে দেখছে আছে কিন্তু যখন বিচার করতে যাচ্ছে তখন দেখছে কিছুই নেই। ঠাকুর সেইজন্য পেঁয়াজের উপমা দিচ্ছেন। পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে যাও, দেখবে খোসার পরে আবার খোসা তারপর দেখবে কিছুই নেই। ঠিক তেমনি বিচার করতে করতে শেষে দেখবে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছুই নেই। সেইজন্য প্রকৃতিকে অনন্ত মনে করা, শক্তিকে অনন্ত মনে করাকে বেদান্ত কখনই মানবে না। তিনিই আছেন, তাঁর মধ্যে ইচ্ছা জাগল, তারপরেই লাগ্ ভেলকি লাগ্, খেলা শুরু হয়ে গেল। শ্রীশ্রীমা সেইজন্য বলছেন ঠাকুর ছিলেন অদ্বৈতী তাই তোমরাও অদ্বৈতী। যখন ব্যবহারিক সত্তাকে গ্রহণ করা হয় তখন সব কিছুই বাস্তব সত্য বলে মনে হবে। ঠাকুরও বাকি যত কথা বলছেন তখন তিনি এই ব্যবহারিক সত্তাকে গ্রহণ করার পরই বলছেন। শঙ্করাচার্যও ব্যবহারিক সত্তাকে গ্রহণ করছেন, ঠাকুরও সেইভাবেই নিয়েছেন।

যখনই মনে কোন ইচ্ছা জাগে, যে ইচ্ছাকে ব্যক্ত করা যায় তখনই সামনে একটা ভোজ্য এসে যায়। ইচ্ছা মানেই ভোগ। এখানে ভোজ্যকে অন্ন বলা হচ্ছে। যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁর মধ্যে এখন ইচ্ছা জেগেছে, তাঁর এখন একটা ভোজ্য পদার্থ চাই, এই ভোজ্য পদার্থকেই অন্ন বলছেন। অন্ন মানে প্রকৃতি। যদিও আমরা প্রকৃতি বলছি কিন্তু মজার ব্যাপার হল ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, বেদান্ত দুটো সত্তা বলছেন না। ব্রহ্মের মনে যখন ইচ্ছা জাগে আমি সৃষ্টি করব, সেই ব্রহ্মকেই এখন দেখাচ্ছে প্রকৃতি রূপে। তাঁরই যেন দুটো রূপ হয়ে গেল, একটা হয়ে গেলেন পুরুষ আরেকটা হয়ে গেলেন প্রকৃতি। তিনিই ভোক্তা তিনিই ভোজ্য। গীতাতেও ভগবান বলছেন আমার দুটো প্রকৃতি একটা পরা প্রকৃতি আরেকটি অপরা প্রকৃতি, একটা পুরুষ আরেকটি প্রকৃতি। তাঁর মধ্যে যখন ইচ্ছা জাগছে আমি সৃষ্টি করব তখন চৈতন্য সত্তাতে জড় সত্তা এসে যাচ্ছে। প্রকৃতি আলাদা কিছু নয়, সেই ব্রহ্মকেই এখন প্রকৃতি রূপে দেখাচ্ছে। প্রকৃতি এখন হয়ে গেল ভোগ্যা। কে ভোগ করছেন? পুরুষ।

এরপর এই প্রকৃতি থেকে হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি হয়। *অন্নাৎ প্রাণো*, এখানে প্রাণ মানে হিরণ্যগর্ভ। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে, পুরান ও উপনিষদাদিতে হিরণ্যগর্ভের বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে হিরণ্যগর্ভকে প্রাণ নামে সম্বোধিত করা হয়েছে, এছাড়া হিরণ্যগর্ভকে কোথাও সূত্রাত্মা বলা হয়, কোথাও ব্রহ্মা আবার কোথাও প্রজাপতি নামে সম্বোধিত করা হয়। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের যে কোন শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন, এই জিনিষটা সবার ক্ষেত্রেই সাধারণ থাকবে – ব্রহ্ম, ব্রহ্ম থেকে মায়া, কোথাও মায়াকে প্রকৃতি বলছে, কোথাও বা শক্তি বলা হচ্ছে – এইবার প্রকৃতি থেকে প্রথম যাঁর সৃষ্টি হচ্ছে বেদান্তে তাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলছে। হিরণ্যগর্ভ মূলতঃ সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি। পুরানাদি গ্রন্থে কখন হিরণ্যগর্ভ বললেও বেশির ভাগ সময় ব্রহ্মাই বলছে। ব্রহ্মা হলেন জড় আর চৈতন্যের মিশ্রণে প্রথম সৃষ্ট প্রাণী, ব্রহ্মাকে তাই পিতামহ বলা হয়, ব্রহ্মার পেছনে আর কেউ নেই। সৃষ্টি এখন সবে হয়েছে তাই ব্রহ্মা একেবারে শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থায়। তাঁর মধ্যে কোন কামনা-বাসনাই নেই, যার জন্য ব্রহ্মার কোন বিয়ে হয়নি। সেই শুদ্ধ সত্ত্ব ব্রহ্মা থেকে এবার সৃষ্টি এগোতে থাকবে। পুরানে ব্রহ্মার এই সৃষ্টির বর্ণনা অনেক বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে। ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন থেকে সৃষ্টি করতে শুরু

করলেন। মন থেকে সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখছেন সৃষ্টি খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে। তিনি তখন নিজেকে পুরুষ আর নারী এই দুটো ভাগে বিভক্ত করে নিলেন। ব্রহ্মাই হয়ে গেলেন মনু আর শতরূপা। সেখান থেকে এবার সৃষ্টি এগোতে থাকল।

হিরণ্যগর্ভের বিশেষত্ব হল এঁর মধ্যে ক্রিয়াশক্তি থাকে, তিনি হলেন জগদাত্মা। জগদাত্মা মানে, এখানে জগৎকে সত্য রূপে মেনে নেওয়া হয়েছে। আমরা বলতে পারি ভগবানই তো জগদাত্মা, হ্যাঁ ঠিকই বলছেন। কিন্তু এই আপেক্ষিক জগৎ থেকে অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা থেকে যখন দেখছি তখন যাবতীয় সব কিছু মিলিয়ে সামগ্রিক রূপে যেটা দেখা হচ্ছে তাঁকেই বলবেন জগদাত্মা। এই হিরণ্যগর্ভের মধ্যে কি কি থাকে – অবিদ্যা, কাম, কর্ম আর ভূত সমুদয় রূপী বীজের অঙ্কুর। ভেজানো ছোলা থেকে যেমন সাদা ছোট্ট অঙ্কুর বেরিয়ে আসে, ব্রহ্মা হলেন ঠিক এই অঙ্কুরিত ছোলার মত। বীজ ভগবান নিজেই। এই ভগবান নির্গুণ ব্রহ্ম নন, সেই ভগবান যাঁর মধ্যে ঐ ইচ্ছাটা জেগেছে, জ্ঞানশক্তিটা জেগেছে সেই ভগবান নিজেই বীজ। সেই বীজ থেকে এই সংসারবৃক্ষ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এখনও সংসারবৃক্ষ বেরোয়নি, শুধু হাল্কা একটু অঙ্কুর বেরিয়েছে। এই অঙ্কুরিত অবস্থাটাই হিরণ্যগর্ভ। এখনও পরিষ্কার গাছের রূপ ধারণ করেনি আবার বীজের অবস্থাতেও নেই। বীজের মধ্যে আমাদের বায়োলজিতে যেমন বলছে ডিএনএ, আরএনএ, ক্রোমজোম সব ঠাসা রয়েছে, ঠিক কি রকম গাছ বেরোবে সেটা এই বীজের মধ্যেই এইভাবে জেনেটিক কোডে দেওয়া আছে। এই সংসারবৃক্ষের বীজের মধ্যেও ঠিক তেমনি জেনেটিক কোড দেওয়া আছে। জেনেটিক কোডে কি কি দেওয়া আছে? অবিদ্যা, কাম, কর্ম আর তার সাথে ভূত সমুদয়, কোন্ কোন্ আত্মা জন্ম নেবে সব ওর মধ্যে ঠিক করা আছে। এই যে আমরা জন্ম নিয়েছি, আমাদের সবার সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মা প্রথম যখন হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে রাখা ছিল। এগুলোর সাথে রাখা আছে অবিদ্যা, নিজের স্বরূপকে ভুলে যাওয়া, কাম মানে ইচ্ছা, নানা রকমের ইচ্ছা, আর ওই ইচ্ছা পুর্তির জন্য কর্ম। সব এক সঙ্গে ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে। ভগবানই সব বীজগুলো সরবরাহ করে যাচ্ছেন। যখন সৃষ্টি নাশ হয়, তখন কি হয়? ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন বাড়ির গিন্নীর হাড়িতে পুটলির মধ্যে শশার বীচি, কুমড়োর বীচি, সমুদ্রের ফেনা সব রাখা থাকে। যখন যেটা দরকার পড়ে তখন ঐ পুটলি থেকে বার করে দেয়। প্রকৃতিও ঠিক সেই রকম। সৃষ্টির সময় হয়ে গেছে, এবার সৃষ্টি হবে? ঠিক আছে। এই বলে প্রকৃতি বীজ বার করলেন। এখন এই বীজ কুমড়োর বীজ হতে পারে, শশার বীজও হতে পারে, আমরা জানিনা। তাহলে কি বেরোবে? এই যে সংসারবৃক্ষ বেরিয়েছে, এটাই বেরোবে।

এবার আমরা এটাকে অন্য দিকে দিয়ে কল্পনা করতে পারি। মনে করুন এই পুরো ক্রমটা শেষ হয়ে গেল, অর্থাৎ ব্রহ্মা শেষ হয়ে গেলেন। এর পরে আবার কবে সৃষ্টি হবে কেউ জানে না। পুরান এই ব্যাপারে নীরব। কারণ দেশ, কাল ও কার্য-কারণ নেই, সময় পরিমাপের বাইরে চলে গেছে। তাও আমরা মেনে নিলাম এরপর আবার একটা সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেই সৃষ্টি কি রকম হবে আমরা বলতে পারব না। ঐ সৃষ্টিতে শশার বীজ বেরোবে নাকি কুমড়োর বীজ বেরোবে আমরা জানিনা। কিন্তু বলছেন, এই কল্পে যে রকম শশা ছিল, কুমড়ো ছিল, যে রকম মানুষ ছিল সেই রকম সব কিছু পরের কল্পে হবে। কিন্তু অন্য লোক, স্বর্গলোক, দেবতালোক, গন্ধর্বলোক, কিন্নরলোক, এই সব লোকের জীবদের কেমন দেখতে আমরা জানিনা। আসলে ব্রহ্মার দিন মানে সৃষ্টি আর ব্রহ্মা যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়েন তখন সৃষ্টি শেষ হয়ে গেল। ভোর হতেই ব্রহ্মার যখন আবার ঘুম ভাঙবে তখন আবার সৃষ্টি হবে। তাহলে এই সৃষ্টিটা ব্রহ্মার জীবদ্দশার মধ্যে চলছে। ব্রহ্মার জীবন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পর্যন্ত চলে। ব্রহ্মার যখন তাঁর হিসাবে একশ বছর আয়ু শেষ হয়ে যাবে তারপর কিন্তু আর কিছু হয় না। এরপরে আবার কবে কি হবে আমরা কিছুই জানিনা। তাঁর মনে আবার কবে ইচ্ছা জাগবে কি করে জানব! আমরা যদি বলি আবার এতদিন পরে সৃষ্টি। এর কোন অর্থই হয় না। কেন অর্থ হয় না? ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয়ে গেলে সময়েরও নাশ হয়ে গেল। তিনিই কালী, যিনি কালকেও গ্রাস করে নেন। কালী কালকে গ্রাস করে শিবের সঙ্গে মানে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। এরপর কি হবে আর তো বলা যাবে না। এমনও হতে পারে পরক্ষণেই হয়ত আবার সৃষ্টি হয়ে গেল। আবার এমনও হতে পারে কোটি কোটি বছর পর আবার হয়ত সৃষ্টি শুরু হবে। জানার কোন পথই নেই। এই প্রশ্নই হয় না। যেমন সূর্যে দিন আর রাত হয় না,

ঠিক তেমনি এই প্রশ্নও হয় না। কিন্তু একবার যখন ব্রহ্মা এসে যাবেন তখন আবার এক এক করে নির্দিষ্ট নিয়মে সৃষ্টি হতে শুরু করবে। এখন বীজ এসে গেছে, এই বীজ থেকে এবার সৃষ্টি হবে। বীজের জেনেটিক কোডটা হল অবিদ্যা, কাম ও কর্ম আর তার সাথে ভূত সমুদয়। জীব সমুদয় আছে আর তার সাথে এই তিনটে লক্ষণ। অবিদ্যা মানে সে ভুলে গেছে সে কে। এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটিকে, যদি কাম-বাসনাকে কেটে দেওয়া যায় বা কর্মকে কেটে দেওয়া যায় বা অবিদ্যাকে নাশ করে দেওয়া যায় তাহলেই জীব মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দের সাথে এক হয়ে যাবে।

গীতাতে ভগবান এই সংসারবৃক্ষকে বর্ণনা করে বলছেন *ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখামশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্*। ভগবানই হলেন মূল, সেখান থেকে এই বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ বেরিয়ে আসছে। এরপর বলছেন সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে অর্থাৎ প্রাণ থেকে মন জন্ম নেয়। এই মন আমার আপনার ব্যষ্টি মন নয়। এই মন হল সমষ্টি মন। প্রথমে হল সমষ্টি অস্তিত্ব, যাকে বলা হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ। সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে সমষ্টি মন আলাদা হয়ে গেল। সমষ্টি মনকে বলছেন মহৎ। অনেক সময় দেখা যায় আমি যেটা চিন্তা করছে সেটা অনেকেই চিন্তা করছে। একেই অনেকে টেলিপ্যাথি, প্যারাসাইকোলজি ইত্যাদি বলে। অনেক সময় দেখা যায় মা কোন একটা জিনিষ দেখছে, এই দৃশ্যটা তার গর্ভের শিশুর উপর প্রভাব ফেলে। সেইজন্য গর্ভাবস্থায় মাকে সৎ চিন্তন করতে বলা হয়, ভালো ভালো বই পড়তে বলা হয়। মা এমন কিছু দেখেছিল যেটা দেখে মনে একটা আঘাত পেয়েছিল, ঐ আঘাত পাওয়ার জন্য তার গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে কোন একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এই কারণে গর্ভবস্থায় মাকে খুব সাবধানে রাখতে বলা হয়। তা নাহলে পরবর্তি কালে শিশুর অনেক সমস্যা হয়ে যায়। অন্য সমস্যাও থাকবে, কারণ যে শিশু আসছে তার নিজস্ব কর্ম আছে, তাছাড়া অন্য কোন আত্মা সেখানে ঢুকে আসতে পারে। কিন্তু মায়ের চিন্তা-ভাবনা শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাহলে কোথাও মা ও শিশুর মন এক হয়ে আছে। আসলে সবারই মন এক হয়ে আছে, আমরা ধরতে পারিনা। এই সমষ্টি মনকেই বলছেন মহৎ। যাঁদের খুব শুদ্ধ মন তাঁরা কিন্তু অপরের মনে কি চিন্তা-ভাবনা চলছে বুঝতে পারেন। যেমন ঠাকুর, তিনি বলছেন আমার কাছে যখন কেউ আসে কাঁচের আলমারিতে রাখা জিনিষ যেমন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় আমি তার ভেতরে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই। তার মানে ঠাকুরের মন তার মনের ভেতর প্রবেশ করে যাচ্ছে। কি করে প্রবেশ করছে? কোথাও এটা এক হয়ে আছে। কোথাও তো বলছে না ঠাকুরের শরীর অপরের শরীরে প্রবেশ করে যাচ্ছে। কারণ শরীর কখন অপর শরীরে প্রবেশ করে না। মন ঢুকবে কি করে, একটাই তো মন। কিন্তু বিভাজন রেখা আলাদা করে রেখেছে, ঐ বিভাজন রেখাটা অতিক্রম করে গেলে ঐ এক মন। স্বামীজী এই সমষ্টি মন নিয়ে বলছেন, আপনি যখন কোন চিন্তা ভাবনার তরঙ্গ ছাড়ছেন সেই তরঙ্গ সমষ্টি মনে পৌঁছে যাচ্ছে, সেই সমষ্টি মন থেকে কেউ সেই তরঙ্গটাকে ধরে নেবে।

বিজ্ঞানের একটা পরিভাষা আছে spontaneous discovery। বিশ্ব ইতিহাসে দেখা গেছে যখন একজন বৈজ্ঞানিক কোন একটা চিন্তা ভাবনা করছেন, ঠিক সেই সময় আরেকজন বৈজ্ঞানিক যে তার নামও কোন দিন শোনেনি, তার কাজের বিষয়ও জানে না, সেও একই জিনিষ নিয়ে চিন্তা করছে। যার জন্য অনেক সময় দেখা যায় একই সাথে দুজন বৈজ্ঞানিক দুদিকে চার থেকে পাঁচ বছর তফাতে কিংবা এক সঙ্গেই বলে যে এই থিয়োরিটা আমি বার করেছি। যেমন ডারউইন যখন ক্রমবিবর্তনবাদ আবিষ্কার করলেন তখন অন্য দিকে লা মার্ক এই নিয়ে প্রথম চিন্তা করেছিলেন। ঠিক তেমনি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যখন বেরোচ্ছে তখন আরেকজন বিজ্ঞানী ফ্রান্সে এই নিয়েই চিন্তা করছিলেন। সেইজন্য একজন খুব নামকরা বিজ্ঞানী তাঁর ছাত্রদের বলছেন 'তুমি যে গবেষণাটা করছ তুমি জেনে নাও তোমার অজান্তায় বিশ্বের আরও চারজন বিজ্ঞানী এই নিয়ে গবেষণা করছে। যে আগে পৌঁছাবে তারই নাম হবে আর সেইই নোবেল প্রাইজ পাবে। চারজন যদি কাজ না করে থাকে তাহলে বুঝে নাও তোমার এই বিষয়টি গবেষণা করার মত বিষয় নয়'।

ইনফোসিসের নারায়ণ মুর্তির এত নাম। তিনি মাত্র দশ হাজার টাকা সম্বল করে ইনফোসিস কোম্পানি শুরু করেছিলেন। আজকে যদি নারায়ণ মুর্তিকে বলা হয় আপনি এই ইনফোসিস বন্ধ করে দিন। আজকে

আপনি সবাইকে বলছেন দশ হাজার টাকা দিয়ে এই ইনফোসিস দাঁড় করিয়েছেন, যেটা আজ বিশ্বের একটা নামকরা কোম্পানি। আপনি ইনফোসিস ছেড়ে দিন, আর আপনাকে দশ কোটি টাকা দিচ্ছি, আরেকবার একটা ইনফোসিস দাঁড় করান। কখনই তিনি পারবেন না। কারণ ঐ যে আইডিয়াটা ছিল সেটা কার্যকর করার সময় হয়ে গিয়েছিল, যে ঐ আইডিয়াকে নিয়ে দাঁড়াবে সেই কৃতকার্য হয়ে যাবে। ঐ আইডিয়াটা কাজ করে বেরিয়ে চলে গেছে, আর ঐ আইডিয়া কাজ করবে না। কেউই পারবে না। সেইজন্য বলা হয় মানুষ খুব বেশী কাজ জীবনে করতে পারেনা, একটা কি দুটো মহৎ কাজ করতে পারে। কারণ যে World of Idea আছে, সেখান থেকে একটা আইডিয়া নেমে এসে কাউকে ধরে নিল। ধরে তাকে দিয়ে যন্ত্রের মত কাজ করিয়ে নিজেকে work out করে বেরিয়ে চলে গেল। আপনি যদি বলেন আরেকবার ওটা করে দেখাও তো, পারবে না। এটা কিন্তু সবারই ক্ষেত্রে সমান। কারণ যে আইডিয়াকে নিয়ে সফল হয়েছেন সেই আইডিয়াটা হয়ে শেষ হয়ে গেছে। অন্য আইডিয়া আসবে। সেইজন্য যাঁরা মহান চিন্তাবিদ্ হন তাঁরা বুঝতে পারেন বিশ্বে এই আইডিয়াটা এখন কার্যকর হওয়ার সময় হয়েছে। যখন কেউ নিজের মনকে তৈরী করে নেবে, তখন ঐ আইডিয়াটা যেটা চিন্তা করে সমষ্টি মন থেকে ছাড়া হয়েছে সেটাই এখন এসে তাকে ধরবে, এরপর সেই আইডিয়াটা তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। এইজন্য এটাকে বলে মহৎ, সমষ্টি মন। আমরা মনে করছি এটা আমি চিন্তা করছি, কিন্তু তা নয়, অন্য মন যেটা আমার থেকে আরও সূক্ষ্ম মন, সেই মন এটা আমার আগে থাকতেই চিন্তা করে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা এখন সমষ্টি মনে এসে পড়েছে। যখন আমার মন এই আইডিয়াটাকে নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল তখন ঐ আইডিয়াটা এসে আমাকে ধরে নেবে। তাহলে আমাকে আপনাকে কেন ধরছে না? আমাদের মনের মধ্যে এত আবর্জনা জমে আছে যার জন্য ঐ আইডিয়া কেন, অন্য কোন কিছুই ঢুকতে পারেনা। ন্যাশানাল হাইওয়ে দিয়ে সব সময় ছোট বড় গাড়ি হুশ্হাশ্ করে ছুটে যাচ্ছে, সেখানে আমি যদি একটা বিরাট বড় ট্যাঙ্কার নিয়ে চলতে যাই, চলতেই পারব না। আইডিয়া সব সময় এসে আমাকে ধাক্কা মারছে, সেও চাইছে আমার মধ্যে ঢুকতে। কিন্তু হাইওয়ের মত আমার মধ্যে এত গাড়ি চলছে যে সে বেচারা সুযোগ পাচ্ছে না, জোর করে ঢুকতে গেলে দুর্ঘটনা হয়ে যাবে, বাকি সবাইকে পিশে দেবে। আইডিয়া বলছে আপনি রাস্তাটা ফাঁকা করুন আমি চালিয়ে দিচ্ছি। আমি বলব রাস্তা ফাঁকা আমি করতে পারব না ভাই, আমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আমার মা আছে। নরেনকে ঠাকুর ছুঁয়ে দিতে চমকে উঠে বলছেন – আপনি আমার এ কি করলেন আমার বাবা মা ভাইবোন আছে। ঠাকুরও একটা আইডিয়াকে নরেনের মধ্যে ঢোকাতে গিয়েছিলেন কিন্তু রাস্তা ফাঁকা পেলেন না বলে, এখন এই পর্যন্ত থাক পরে হবে।

আমরা আট নম্বর মন্ত্রের সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনার মধ্যেই রয়েছি। মুণ্ডকোপনিষদ অধ্যয়ণ করার সময় এর মূল প্রশ্নটাকে আমাদের কখন ভুলে গেলে চলবে না। মুণ্ডকোপনিষদের মূল প্রশ্ন ছিল কোনটা জানলে সব কিছুকে জানা যায়। এই প্রশ্নের মধ্যেই একটা সত্যকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা হল, এই জগৎটা যদি সত্য হত তাহলে একটা জিনিষকে জানলে সব জিনিষকে জানা যেত না। এটাই হল বিবর্ত, বিবর্তে নাম ও রূপেরই শুধু পার্থক্য আর বিবর্তে সত্যিকারের কোন পরিবর্তন নেই। এখন যদি আমাকে বলে দেওয়া হয় ব্রহ্মকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, এটুকু বুঝলেই তো সব কিছু হয়ে গেল। বলছেন না, এতটুকু জানাতে হবে না। ঠাকুরও বলছেন শুধু বই পড়লে কি হবে, ঈশ্বরকে চিন্তা করে বুঝলে এক রকম, তাঁর সাক্ষাৎ হলে আরেক রকম বুঝবে। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানার পর জগৎটা স্পষ্ট হয়ে যায়। জগৎ স্পষ্ট হয়ে গেলে তখন *নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন*, তখন আর তাঁর কৃত ও অকৃত বলে কোন বোধ অবশিষ্ট থাকে না। আমরা সবাই এই জগৎকে নিজের মত করে দেখছি আর সব কিছুই আলাদা আলাদা দেখছি। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁর সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়েছে তিনি জগতকে দুই ভাবে দেখেন। প্রথম দেখছেন সব কিছুর পেছনে যে সত্তা রয়েছে সেটা সেই ব্রহ্মেরই সত্তা, দ্বিতীয় দেখেন তিনিই সব হয়েছেন। তখন আর সত্তা বলে দেখছেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন, দেখছেন লাটু গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। ঠাকুর বলছেন আমি দেখছি সেই সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। যাঁর এই বোধ হবে যে সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছেন, আর সচ্চিদানন্দই খুন করছেন। কাকে খুন করছেন? সচ্চিদানন্দকেই খুন করছেন। তখন তিনি কি আটকাতে

যাবেন? কাকে আটকাবেন! এনাকে দিয়ে আর সংসার চলে না। রাজা মহারাজের একটা ঘটনা আমরা এর আগেও বলেছিলাম। রাজা মহারাজকে তাঁর শিষ্য বলছেন মহারাজ আপনি আমাদের কেন কোন উপদেশ দেন না। রাজা মহারাজ বলছেন আমি কি আর উপদেশ দেব আমি তো দেখছি সবাই সেই সচ্চিদানন্দই। যখন তিনি দেখছেন সব সচ্চিদানন্দ তখন তিনি সচ্চিদানন্দকে কি করে উপদেশ দেবেন! এঁদের দিয়ে আর জগৎ কার্য হয় না। ঠাকুর বলছেন নুনের পুতুল যখন সমুদ্র মাপতে গেল তখন সমুদ্রে নামতেই সে গলে গেল, আর খবর দেওয়া হল না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়। ঠাকুর বলছেন কে যেন তাঁকে গলে যাওয়া থেকে আটকে দিল। তখন সেই দিয়ে লোকশিক্ষার কার্য হবে। যখন লোকশিক্ষার কার্য হয় তখন তিনি দুজনকে আলাদা দেখেন। তখন উপদেশ কার্য করা যাবে। এটাও আবরণ কিন্তু সত্যিকারের নয়। অসুখের সময় ঠাকুর বলছেন মা আমাকে এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, হয় সবারই কথা বিশ্বাস করি আর না হয় কারুরই কথা বিশ্বাস করিনা। তখন একটা বাচ্চা ছেলেও যদি বলে দেয় এটা করলে ভালো হবে তখন তাঁকে ওটাই করতে হবে। আর যদি বিশ্বাস না করার থাকে তখন কারুর কথাই বিশ্বাস করবেন না।

বিদ্যা মানে যা দিয়ে একটা জিনিষকে জানা হয়। কি জানা হয়? তোতাপুরি যখন ঠাকুরকে অদ্বৈত জ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন মা কালীর মুর্তি এসে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। এখন এই মা কালীর মুর্তিকেও দ্বিখণ্ডিত করে দিতে হবে, এটাও একটা বিদ্যা। সেইজন্য তোতাপুরি ঠাকুরের ভ্রুর মাঝখানে কাঁচের টুকরো দিয়ে আঘাত করে বলছেন 'এই ব্যাথার মাঝখানে তুমি ধ্যান কর'। এই যে মনকে ব্যাথার কেন্দ্রে গুটিয়ে এনে ধ্যান করার উপদেশ দিচ্ছেন এই উপদেশটাই কিন্তু পরা বিদ্যার মধ্যে গণ্য কর হচ্ছে। এখানে কারুর কারুর মনে সন্দেহ হতে পারে তাহলে ঠাকুর এর আগে যে সকল পথে সাধনা করেছিলেন আর সেই সেই পথের চরম লক্ষ্যের যে উপলব্ধি হয়েছিল বা তিনি যা যা দর্শনাদি পাচ্ছিলেন সেগুলো কি সব অপরা বিদ্যা ছিল! না, এগুলোও পরা বিদ্যার মধ্যেই পড়বে। তোতাপুরি দক্ষিণেশ্বরে আগমনের বহু আগে থাকতেই ঠাকুর দেখছেন কোশাকুশি থেকে শুরু করে সব কিছু চিন্ময়। তোতাপুরির কাছে অদ্বৈত জ্ঞানের শিক্ষা পাওয়ার আগে থাকতেই এই অদ্বৈত জ্ঞান ঠাকুরের কাছে অন্য ভাবে এসে গিয়েছিল। অদ্বৈত জ্ঞান মানে যেখানে কোন দ্বৈত বোধ নেই, আমি তুমি ভেদ নেই। ঠাকুর এই চিন্ময়কে আগে থাকতেই সব কিছুর মধ্যে দেখতেন কিন্তু অখণ্ডে মন লয় হয়ে যাওয়ার বর্ণনা সেইভাবে আমরা কোথাও পাইনা। তবে এগুলো এত উচ্চ কথা যে সব কিছু ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবও না।

নিত্য বা অখণ্ড ছাড়া কিছু নেই, সবই নিত্য, অখণ্ড। অথচ আপেক্ষিকটাই আমাদের কাছে সত্য। উপনিষদের মতে এটা সেই তাঁরই শক্তি। সেটাই এখানে বর্ণনা করছেন *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*। একটা পর্দা এসে সেই অখণ্ডকে বিভাজিত করে দিচ্ছে। অখণ্ড যিনি তাঁকে পর্দা এসে খণ্ডিত করে দিচ্ছে এটাই একটা ভুল কথা। কারণ অখণ্ডকে যদি খণ্ডিত করে দেওয়া হয় তাহলে তো অখণ্ডের পরিভাষাটাই ভুল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য একে বলা হয় মায়া বা অবিদ্যা। মায়া যদি বলা হয় তাহলে সত্যিই অখণ্ড খণ্ডিত হচ্ছেন না, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন খণ্ডিত হলেন। এই পর্দাকে কি করে সরাতে হবে সেটাই হল পরা বিদ্যা, পর্দার এই দিকে যা কিছু আছে সবটাই অপরা বিদ্যা। উপনিষদের মূল উদ্দেশ্যই হল অখণ্ডে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দেওয়া। অখণ্ড জ্ঞান মানে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি* বা *তত্ত্বমসি* এটুকু বলে দেওয়া নয়, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দেওয়া। প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরা বিদ্যা হবে না। তাহলে মায়া বলতে কি আমরা পুরোটাই মৃগমরীচিকা মনে করব। মায়ার সবটাই কি কল্পনা বা মিথ্যা? না তা নয়, চিনির যেমন খেলনা বানান হয়েছে। চিনির খেলনা বানাবার আগে চিনিকে গলিয়ে দিতে হবে, গলানোর পর পৃথক পৃথক ছাঁচে ফেলতে হবে। সেই জিনিষটা কিভাবে হয় সেটা এই অষ্টম মন্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে।

এর আগে বলা হয়েছিল তিনি হলেন *সুসূক্ষ্মম্*, এতই সূক্ষ্ম যে, যে আকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম তিনি সেই আকাশ থেকেও এত সূক্ষ্ম যে তারও মধ্যে ঢুকে আছেন। সেই *সুসূক্ষ্মম্* থেকে তিনি কি করে এত কিছুতে রূপান্তরিত হচ্ছেন, তাই বলছেন যেন স্থুলত্ব প্রাপ্ত হন। এই স্থুলত্ব কিন্তু বাস্তবিক স্থুলত্ব নয়। ঠাকুর মায়া শব্দটা

কম ব্যবহার করতেন, করেছেন কিন্তু তিনি ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ এই কথাটাকে বেশী বলছেন। এতে অনেকেরই মনে হতে পারে এটা যেন ঠাকুরেরই অবদান। গীতার ভাষ্যেই আচার্য বলছেন শক্তি আর শক্তিমান অভেদ, এর অর্থ ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শাস্ত্রের বাইরে ঠাকুর কোন কিছু বলেননি। যিনি পূর্ণকাম, যিনি শুদ্ধ আত্মা কোন এক রহস্যের কারণে যেটা আমরা কেউই বলতে পারিনা, তাঁর যেন কোথায় একটা স্ফুরণ হয়। আমি লীলা আস্বাদন করব। কিন্তু দ্বিতীয় বলে তো কেউ নেই, তাই কার এবং কিসের লীলা আস্বাদন করবেন? নিজের লীলা নিজেই আস্বাদন করবেন। নিজের লীলা আস্বাদন করার জন্য সেই যিনি চিৎ তাঁর মধ্যে একটা ভাবের উদয় হয়। এই ভাব যখন উদয় হয় তখন তিনি নিজে স্থূল হতে শুরু করেন।

মুরগীর ডিমে যদি একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় তড়িৎ প্রবাহ দেওয়া হয় তখন ডিমের মধ্যে একটা সংবেদন শুরু হয়। প্রথম সংবেদনে ডিমের ফার্টিলাইজেশনটা শুরু হয়ে যায়। মূলতঃ ডিম হল কতকগুলি সেল, সেই সেলের বিভাজনটা করাতে হবে। বাকি সব কিছু মুরগী থেকে এসেই গেছে। তাই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বিশেষ পদ্ধতিতে তড়িৎ প্রবাহের সংবেদন দিলে ডিমের সেল বিভাজনটা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে অনেক রকম সমস্যা হয়। যদি এইভাবে করা যায় তাহলে তো পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। তাহলে সব প্রজাতিতে প্রকৃতি পুরুষ কেন তৈরী করল? তার কারণ পুরুষ থাকলে বৈচিত্র্য আসে, এই বৈচিত্র্যতাই রেসেসিভ জিনকে চাপা দিয়ে দেয়, তা নাহলে সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু চাইলে যে কেউ কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন ক্রিয়া করিয়ে নিতে পারে।

এর পেছন মূল ভাবটা হল, সঠিক পদ্ধতিতে একটা শক্তির স্ফুরণ যদি দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যে জিনিষটা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক সেটা হয়ে যাবে। আচার্য শঙ্করের এটাই বৈশিষ্ট্য তিনি এমন কোন কথা বলবেন না, যেটা হাজার বছর পরে পাল্টে যেতে পারে। আচার্য শুধু বলছেন বীজ থেকে গাছ হওয়াটা কোন ম্যাজিক নয়, তিনি জানেন এর একটা পদ্ধতি আছে। বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, বীজের ঠিক এই অবস্থাটার কথা আচার্য বলছেন। ছোলাকে যখন জলে ভেজানো হয়, তখন জলটা ছোলারা দানার মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ছোলার আকারটা বড় হতে থাকে। প্রথমে বোঝা যায় না, বেশ কয়েক ঘন্টা পরে বড় হওয়াটা বোঝা যায়। কিন্তু একটা অবস্থার পর আর জলের শক্তিটা নিতে পারেনা। তখনই ছোলাটা ফেটে পরে। ঐ ফেটে পড়ার অবস্তায় সে অঙ্কুরিত হয়, ঐ অবস্থায় যদি সে মাটি, আলো, বাতাস পেয়ে যায় তখন সেখান থেকে পুরো গাছ দাঁড়িয়ে যাবে। ছোলার ঐ বীজের মধ্যেই গাছটা রয়েছে। বটবৃক্ষের বীজ আরও ছোট, সেখানে অত বিশাল বটবৃক্ষ আরও সূক্ষ্ম অবস্থায় রয়েছে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হচ্ছে। এখানে বটবৃক্ষ বা ছোলার বীজের মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণের কথা বলা হল এই শক্তি বাইরে থেকে আসছে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে শক্তি বাইরে থেকে আসে না, এই শক্তি ব্রহ্মের ভেতরেই থাকে। এই শক্তি কখন সুপ্ত কখন জেগে ওঠে। কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত হওয়ার জন্য কোন শাস্ত্রকার বা অবতারের পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয় এটা কেন হয়, কিভাবে হয় বা কখন হয়।

সেইজন্য কি বলছেন? *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম* – সেই ব্রহ্ম, ছয় নম্বর মন্ত্রে যাঁর বর্ণনা করা হচ্ছে তিনি সর্বব্যাপী, সব জায়গাতে তিনিই আছেন আর *সুসূক্ষ্মম্*, আকাশের থেকেও তিনি সূক্ষ্ম, *যদ্ভূতযোনিং*, যেখান থেকে সব কিছুর জন্ম, তিনি ইচ্ছা করলেন নিজেকে বিস্তার করবেন। তিনি চিত্রকরের মত সৃষ্টি করেন না, চিত্রকর ইচ্ছে করল ফুল আঁকলেন পাতা দিলেন না, অথবা পাতা আঁকলেন ফুল দিলেন না। একটা বস্তা থেকে বীজ ছুড়ে দিলেন আর সৃষ্টি হয়ে গেল, এইভাবেও তিনি সৃষ্টি করেন না। খ্রীশ্চান মতে ভগবান ছয় দিনে সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলেন। ছয় দিনে সৃষ্টি কিভাবে হতে পারে? ভগবান বললেন সৃষ্টি হোক অমনি সৃষ্টি হয়ে গেল। বেদান্ত মতে এভাবে সৃষ্টি হতে পারেনা। বেদান্ত মতে সম্পূর্ণ বিবর্তগত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট ক্রমপর্যায়কে অনুসরণ করে সৃষ্টি হয়। বেদান্ত মতে বলবে প্রথমে শুদ্ধ ব্রহ্মই আছেন, সেখানে ব্রহ্মের শক্তি প্রকাশ পাবে। ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি আলাদা হয়ে যাওয়া মানে সৃষ্টির খেলা শুরু হয়ে গেল। খেলা শুরু হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে যাবে না। খেলা শুরু হওয়ার অনেক দিন পর জন্ম নেবে তিনটে গুণ – সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। এবার এই তিনটে গুণ পরস্পর নিজেদের মধ্যে খেলা করতে শুরু

করে দিল। এই খেলাটাও অনেক দিন চলতে থাকবে। এখান থেকে জন্ম নেবে মহৎ, এই মহৎ থেকে এরপর একটা দুটো করে এক এক করে সৃষ্টি এগোতে থাকবে। পুরানের মতে বলা হয় তিনটে গুণ যখন সৃষ্টি হল সেই জায়গাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা থেকে আবার পর পর সব কিছু বেরোতে থাকে।

যেদিন সচ্চিদানন্দের মনে হল সৃষ্টি হোক, সেদিন থেকে এই অবস্থায় সৃষ্টিকে আসতে কত বছর লাগবে? কয়েক শত কোটি বছর। খ্রীশ্চান ধর্মে যেমন বলা হয় ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেল। এইভাবে কোন দিন সৃষ্টি হবে না। বেদান্তের মতে সৃষ্টি একটা দীর্ঘকালীন পদ্ধতি। আবার যখন সৃষ্টি লয় হতে শুরু করবে তখন ঠিক এই ভাবে ধীরে ধীরে সৃষ্টি পেছনের দিকে যেতে শুরু করবে। মাঝে মাঝে কাগজে খবর ছাপা হয় পৃথিবী অমুক সালের অমুক মাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। এগুলো বেদান্তের মত নয়, বেদান্তে সৃষ্টি এভাবে দুম্ করে একদিনেই লয় হয়ে যায় না। বিদেশী ধর্মীয় নেতারা কিছু একটা বলে দিলে এরা সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিচ্ছে। এরা ধর্মের কিছুই জানে না। একজন অবতার নিয়ে কখন ধর্ম চলে! একজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে কি কখন পুরো বিজ্ঞান জগৎ চলতে পারে, একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য চলতে পারে! ধর্ম কখন একজন মহাপুরুষকে দিয়ে চালান সম্ভবই নয়। যে কোন ধর্মের পুষ্টির জন্য একাধিক অবতারের প্রয়োজন। যার ফলস্বরূপ সব উদ্ভট ধরণের চিন্তা-ভাবনা বেরিয়ে আসছে – এই দিন পৃথিবী ধ্বংস হবে। বেদান্ত কখনই এই ধরণের কথা বলবে না। সৃষ্টি একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। সৃষ্টির লয় যেটা হবে তারও একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। দুম্ দাম্ করে কিছু হয় না। যখন সচ্চিদানন্দের মনে হল তিনি এবার লীলা করবেন। লীলা মানেই হল কর্তা আর কর্মের খেলা।

খেলা হওয়ার জন্য চাই একজন খেলোয়াড় আর খেলার একটি বস্তু। লীলা যখন হবে তখন তার জন্য চাই একজন কর্তা আর চাই ভোগ্য বস্তু, যেটাকে বলা হয় কর্ম। ভগবানের যখন ইচ্ছা হল তিনি লীলা করবেন তখন তাঁর কারকের দ্বিতীয়া অর্থাৎ কর্মের দরকার, তাই বলছেন *ততোঽন্নমভিজায়তে*। *অন্নম্* হল যেটাকে আস্বাদ করা যায়। এখানে অন্ন মানে অব্যক্ত প্রকৃতি। অব্যক্ত প্রকৃতি, যার এখনও প্রকাশ হয়নি, যার মধ্যে এখন বিভাজন হয়নি, অব্যাকৃত অবস্থায় আছে। অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতির তিনটে গুণ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ সাম্য অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির সাম্য অবস্থার মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ। কারণ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক চাঞ্চল্য রয়েছে, আর তিনটে গুণ পরস্পরকে নিজের গুণে পরিবর্তিত করে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়, এটাই এই তিনটে গুণের স্বাভাবিকত্ব। কুকুরের বাচ্চাগুলো চোখ ফোটার পর থেকে নিজেদের মধ্যে অনবরত কামড়া-কামড়ি করে যাবে। কুকুরের বাচ্চার এটাই স্বভাব। ফলে প্রকৃতি যখনই সৃষ্টি হয়ে যাবে তখনই সৃষ্টিটা দুম্ করে এগিয়ে যেতে শুরু করবে। প্রকৃতি হল সাইকেলের মত, সাইকেল যদি দাঁড় করিয়ে রাখা হয় সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ সাইকেল চলতে থাকে ততক্ষণই ওর ব্যালেন্স থাকে। প্রকৃতি যদি একবার থেমে যায় তাহলেই সৃষ্টি শেষ। অন্নম্ বলতে এখানে এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছে।

সচ্চিদানন্দ যে এইবার খেলা করবেন তার কর্ম তৈরী হয়ে গেল। এই প্রকৃতি কোথা থেকে এসেছে? বলছেন পুরুষই প্রকৃতি হন – এটাই অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতিই জড় আর পরা প্রকৃতি চৈতন্য। চৈতন্য থেকে কেন অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ জড় হয় কেউ বলতে পারবে না। আচার্যও এই নিয়ে কোন মন্তব্য করছেন না। শুধু বলছেন যখন সৃষ্টি হয়, এইভাবেই হয়। একটা প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া যায় না, সচ্চিদানন্দের মনে কেন ইচ্ছা হল। তারপর যা কিছু হবে তার সব কিছুই ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে, সেখানে কোন সমস্যা হবে না।

অব্যক্ত প্রকৃতির জন্ম হয়ে গেল। এরপর সেই প্রকৃতি থেকে জন্ম নিচ্ছে *অন্নাৎ প্রাণো*, অন্ন থেকে প্রাণের জন্ম হল। এখানে প্রাণ মানে হিরণ্যগর্ভ। বিভিন্ন শাস্ত্রে আবার এই হিরণ্যগর্ভের অর্থ বিভিন্ন ভাবে করা হয়েছে। পুরানে হিরণ্যগর্ভকেই ব্রহ্মা বলা হয়। উপনিষদের এত উচ্চ কথা বিশেষ করে প্রকৃতি কি, অব্যক্ত কি, সাধারণ মানুষ বুঝবে না। সেইজন্য পুরানে বলবেন তিনিই ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত নাগের উপর শুয়ে ছিলেন। অনন্তের উপর শয়ন করে আছেন মানে বুঝবে, তুমি অনন্ত বলে যেটুকু ধারণা করে রেখেছ তিনি তাঁরও মালিক, তিনি ঐ অনন্তের প্রভু। তিনি সেই অনন্তের উপর শয়ন করে আছেন। শয়ন করে আছেন মানে, এখন কোন

সৃষ্টি হচ্ছে না। এরপর সৃষ্টি হবে। তিনি কোথায় শয়ন করে আছেন? ক্ষীর সমুদ্রে, কারণ সলিলকেই ক্ষীর সমুদ্র বলা হচ্ছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই কারণেরও পারে তিনি শয়ন করে আছেন, তিনি মহা কারণ। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। হঠাৎ তিনি দেখলেন তাঁর নাভি থেকে একটা পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। তিনি নির্বিকার, নিজে থেকেই বেরিয়ে এসেছেন। নিজে থেকে না বেরোলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। কিংবা বলবে, সেই কারণ সলিলে দেখা গেল একটা সোনার ডিম ভাসছে। সেই সোনার ডিম যখন ফাটল, সেখান থেকে তখন ব্রহ্মা আবির্ভুত হলেন। এই কাহিনীগুলো বলার উদ্দেশ্য হল একটা অতিন্দ্রীয় কঠিন তত্ত্বকে সাধারণ মানুষকে তাদের মত করে বোঝাবার প্রচেষ্টা। উপনিষদের এই গভীর তত্ত্বগুলিকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বলে আমাদের ঋষিরা পৌরানিক কাহিনীর মাধ্যমে অতি সহজ ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। প্রথমে তিনিই ছিলেন, তিনিই নারায়ণ, তিনি কারণ সলিলে অনন্তের উপর শায়িত ছিলেন। তাঁর নাভি থেকে একটা পদ্ম ফুটে উঠল, সেই পদ্মের মধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভুত হলেন। ব্রহ্মা নিজেই বুঝতে পারছেন না আমি কোথায় আছি, কেন আছি। তিনি একবার পূর্ব দিকে অবলোকন করলেন, একবার পশ্চিম দিকে, দক্ষিণ দিকে তাকালেন, উত্তর দিকে তাকালেন এ আমি কোথায় এলাম। সেইজন্য তাঁর চারটি মুখ হয়ে গেল। চারটে মুখ হয়ে যাওয়া মানে, যত দিশা হবে সমস্ত দিশার তিনিই দ্রষ্টা, তাঁর দৃষ্টির বাইরে কিছুই থাকবে না। এটাই হিরণ্যগর্ভের বিশেষত্ব। কোথাও হিরণ্যগর্ভ আর ব্রহ্মাকে আলাদা ভাবে দেখা হয়, কোথাও হিরণ্যগর্ভকে বলা হয় সোনার ডিম্ব আবার কোথাও বলে হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভকে আবার বলা হয় সমস্ত জীবের সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। একটা পুকুরের জলকে আলাদা করে দেখলে কতকগুলি জলের বিন্দু রূপেই দেখা হবে আবার অন্য দিকে জলবিন্দুর সমষ্টি নিয়েই পুকুর। ঠিক তেমনি আমার আপনার এবং সমস্ত প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরগুলো আলাদা, সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরকে যখন সমষ্টি রূপে দেখবে তখন তাঁকেই বলবে হিরণ্যগর্ভ।

হিরণ্যগর্ভের আরেকটি অন্যতম বিশেষত্ব হল ব্রহ্মের জ্ঞান আর ক্রিয়াশক্তি তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে। আগে বলা হল ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্মের এই শক্তিটা তাহলে কি? জ্ঞানশক্তি আর ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্মের এই জ্ঞানশক্তি আর ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মার মধ্যে সর্বদা অধিষ্ঠিত। তাহলে ব্রহ্মার কি কি বৈশিষ্ট্য দাঁড়াচ্ছে? ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তাঁর মধ্যে থাকবে, ছোট্ট পোকা থেকে দেবতা পর্যন্ত যত রকমের শরীর ও জীবাত্মা হতে পারে তার সমষ্টি ব্রহ্মা আর অবিদ্যা, কাম ও কর্ম আর যত জীব তার বীজ রূপ। এই বীজ রূপ থেকে সৃষ্টি এবার বিস্তার পাবে। একটা বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুরিত হয়ে এবার যখন বৃক্ষটা ডালপালা ছড়াবে, এই অঙ্কুরিত মুহুর্তটাকেই ব্রহ্মা বলা হচ্ছে।

সৃষ্টির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হলেন উপকরণ আর চৈতন্যের দৃষ্টিতে যখন দেখব তখন ব্রহ্ম হলেন কর্তা – একটা হল Material Cause আরেকটা হল Efficient Cause। শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় কার্য ব্রহ্ম ও কারণ ব্রহ্ম। চৈতন্যের দিক থেকে ব্রহ্ম কারণ আর সৃষ্টির দিক থেকে তিনি কার্য। মাকড়সাই কার্য আবার মাকড়সাই কারণ, যা কিছু বেরোচ্ছে তার পেট থেকেই বেরোচ্ছে আর তৈরী করছে মাকড়সা নিজে। সচ্চিদানন্দের চৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখছি ব্রহ্মই এই সব কিছুর কারণ আর সৃষ্টির দিক থেকে যখন দেখছি তখন ব্রহ্মই সেই উপকরণ বা কার্য যেখান থেকে সমস্ত পদার্থ বেরিয়ে আসছে। তিনিই তাঁর উপর যখন আঘাত করেন তখন সৃষ্টি হচ্ছে।

এই প্রাণ থেকে মনের জন্ম হয়, মন মানে মহৎ এর সৃষ্টি হয়। মহৎ মানে সমষ্টি অন্তঃকরণ। আমার একটা মন আছে, আপনার একটা মন আছে, এই রকম সবারই একটা মন আছে – এই সমস্ত মনকে যখন সমষ্টি রূপে দেখা হবে তখন তাকে বলছেন মহৎ। সমস্ত জীবের সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টিকে বলা হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ আর সমস্ত জীবের মনের সমষ্টিকে বলা হচ্ছে মহৎ। আসলে আমাদের ঋষিদের কাছে পুরো জিনিষটাই এক, তারপর যখন সৃষ্টি হয়ে যায় তখনও সেই একই থাকে। পাশ্চাত্য দর্শন জগতে যখন হেগেলের আবির্ভাব হল তখন তিনিই প্রথম এই মহৎ বা Cosmic Mind এর ধারণা নিয়ে এলেন। খ্রীশ্চান ধর্মে Cosmic Mind বলে কোন ধারণাই নেই। কিন্তু আমাদের কাছে এই ধারণা অনেক আগে থেকেই আছে। বিদেশীরা কোন নতুন

আইডিয়া পেলে সেটা নিয়ে প্রচুর সোরগোল তৈরী করে। তারপর যখন প্রাচ্যের দর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে তখন দেখে এই আইডিয়াটা অনেক আগে থাকতেই সেখানে আছে। মহৎ মানে সমস্ত মনের সমষ্টি বলা হচ্ছে, তাহলে আমার আপনার সবার মন এক সুরে বাঁধা হয়ে থাকার কথা। এই তথ্যটা আমরা মানতে চাইনা বা ধারণা করতে পারিনা। কিন্তু সত্যিই তাই। শুধু আমাদের শাস্ত্রই বলছে না, বিশ্বের সমস্ত কাহিনীতেই বলছে যে যাকে ভালোবাসে সে তার মনের সাথে এক হয়ে যায়। স্বামীজীও এক জায়গায় বর্ণনা দিচ্ছেন – একটা ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসত। মেয়েটি অনেক দূরে থাকত। ছেলেটি স্বামীজীর কাছে বসে বলছে আমার বান্ধবী আজকে এই রঙের গাউন পড়েছে। যখন মেয়েটি আসছে তখন দেখছেন সত্যিই মেয়েটি ঐ রঙের গাউন পড়ে এসেছে। লায়লা-মজনুর কাহিনীতেও আছে, যখন লায়লাকে মারা হচ্ছে তখন মজনুর হাতে দাগ পড়ছে। যেখানে ভালোবাসায় একাত্ম হয়ে পড়ে তখন দুটো মন পরস্পরের সব কিছুর খবর জানতে পারে। কিন্তু এই মনকে নিয়েই যদি সব সময় পড়ে থাকে তার দ্বারা আর কিছু করা হবে না। সেইজন্য একটা পর্দা দিয়ে দেওয়া হয়। লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণনা আছে, দুই মাঝি ঝগড়া করতে করতে একজন আরেকজনের গালে কষিয়ে এক চড় মেরেছে। সেই চড়ের পুরো হাতের দাগটা ঠাকুরের পিঠে এসে পড়ে লাল হয়ে গেল। এটাই কসমিক মাইণ্ডের খেলা। ঠাকুর নিজের ঘরে বসে আছেন, দূরে গঙ্গাবক্ষে দুই মাঝিতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, ঠাকুরের মন মহৎ মনের সাথে এক হয়ে আছে। এক অপরকে চড় মেরেছে সেই চড়ের দাগটা ঠাকুরের পিঠে এসে পড়ল। এই কসমিক মাইণ্ডকে যদি পাশ্চাত্য জগৎ মেনে নেয় তাহলে পুরো খ্রীশ্চান ধর্মে তোলপাড় হয়ে যাবে, আর ইসলাম ধর্মতো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম বলছে ভগবান আমাদের সবাইকে আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমরা সবাই এক সুরে বাঁধা এই তত্ত্ব যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে পুরো খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মের কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। মহৎ এর বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিলে এই সব ধর্মে সৃষ্টি তত্ত্বের পুরো ধারণাটাই পাল্টে যাবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের এটাই মৌলিক – আমি তুমি সবাই মনের দিক থেকে এক অপরের সাথে সংযুক্ত। ঠিক তেমনি সব জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম শরীর একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। যে ভেদ আমরা দেখছি এটা বাস্তবিক নয়, একত্বটাই আমাদের কাছে সত্য। এই মহৎ ও হিরণ্যগর্ভের পেছনেও যদি যাই সেখানে তো কোন ভেদ নেই, সেই এক অভেদ ব্রহ্ম। এটাই বাস্তব।

আমাদের কাছে এগুলো কোন কালেই সমস্যা ছিল না। ভারতে চিরদিনই অপরকে গালাগাল দেওয়াটা শুধু দোষ বলে ছেড়ে দেওয়া হতো না, পাপ বলেই গণ্য করা হত। কারুকে খুন করা ভারতে আগে কল্পনাই করতে পারত না। এখনও সারা বিশ্ব মানে ভারতের লোকেরা সহজে কারুকে খুন করতে চায় না। যারা খুনী, দাগী অপরাধী ছিল এদের জাতিচ্যুত করে রাখা হত। ক্ষত্রিয়রা ধর্মযুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধের আহ্বাণ করত। যুদ্ধে কারুকে বধ করার পর আবার প্রায়শ্চিত্তও করে নিত। তারা জানত আমরা সবাই সেই এক। কারুর ক্ষতি করা মানে নিজেকে ক্ষতি করা। আধুনিক যুগে সব ধারণাই পাল্টে যাচ্ছে। আমরা নৈতিক আচরণ কেন করি? তা নাহলে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে একটা খবর ছাপা হয়েছিল, এক ফাইভ স্টার হোটেলে এক ভদ্রলোক খাওয়া-দাওয়া করছিলেন তখন একজন ফিল্মস্টার এসে সেই লোকটার নাকে এক ঘুষি মেরে দিল। আগেকার দিনে মানুষ এগুলো কল্পনাই করতে পারত না। দেশ সমাজ কোন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে আমরা টের পাচ্ছি না। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুরের আগমনের আগে আমাদের দেশে যে প্রচণ্ড অধঃপতন হয়েছিল এই অধঃপতন এর আগে কখন হয়নি। সমাজ এখন তার থেকেও এমন অধঃপতন হয়েছে কল্পনাই করা যায় না। স্বামীজী গর্ব করে বলছেন – আমার ভারতবর্ষের লোকেরা মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না, ভারতের লোকেরা সজ্জন। কিন্তু এখন দুর্জন ছাড়া কিছুই নেই। কেন তাহলে আগেকার মানুষরা সজ্জন ছিলেন? অথচ এনারা যুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত। কারণ ঋষিরা যেটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন সেটা সাধারণ মানুষ জানতেন যে সবাই এক, বিভেদ যেটা দেখা যাচ্ছে সেটার কোন বাস্তবিকতা নেই। হিরণ্যগর্ভ, যাঁকে বলছেন সমস্ত জীবের সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্ট, যে মহৎকে বলা হচ্ছে সমস্ত প্রাণীর মনের সমষ্টি এরই স্থূল নিদর্শন হল মা ছেলের কান্নার সাথে এক হয়ে যাচ্ছে, যে যাকে ভালোবাসে সে তার মনের সাথে একটা কোথাও এক হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন আমার কাছে যখন কেউ আসে কাঁচের আলমারিতে রাখা

দ্রব্য যেমন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় আমি তার ভেতরে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই। ঠাকুর যে কোন মানুষের মনকে পরিষ্কার দেখতে পেতেন। কারণ সব মন এক অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে, যাঁর শুদ্ধ পবিত্র মন তাঁর সেই শুদ্ধ মনের ভেতরেও অপর মনের চিন্তাগুলো আসতে শুরু হয়ে যাবে।

এই মহৎকে আচার্য বলছেন *সঙ্কল্পবিকল্পসংশয়নির্ণায়াদ্যাত্মকমভিজায়তে*। মনের চারটি রূপ – চিত্ত, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। মনের চিত্ত অংশকে বলা হয় সংগ্রহাত্মিকা, চিত্তের কাজ হল কর্মেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বাইরে থেকে সব কিছু সংগ্রহ করা। মনের মন যে অংশ তার কাজ হল সংশয় তৈরী করা, সঙ্কল্প ও বিকল্পের সংশয়। এটা করব, না ওটা করব। প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করা হল, মন এবার সে তথ্যগুলোকে বাছাই করার কাজটা করছে। তৃতীয় হল বুদ্ধি, বুদ্ধির কাজ হল নির্ণয় করা। শেষে অহঙ্কার, অহঙ্কার হল ক্রিয়া। একজন ডাক্তার কম্প্যুটারে যত ডাটা আসছে সব ডাটা কম্প্যুটারে ঢুকিয়ে রাখছেন, এটা হল চিত্তের কাজ। এবার ডাটার যখন প্রসেসিং হচ্ছে, এই ডাটা কি কাজে আসবে, এই ডাটাকে রাখা উচিৎ কিনা, এটা হল মন। এরপর বুদ্ধি বলে দিচ্ছে এই ডাটাটা ক্যান্সারের, এটা এই রোগের। এরপর হচ্ছে ক্রিয়া, অপারেশন করব কি করব না – এটাকে বলা হচ্ছে অহঙ্কার। একটাই মন কিন্তু তার চার ধরণের আলাদা আলাদা ভূমিকা। এই চারটে মিলিয়ে বলা হয় মন, আর সমস্ত জীবের মনের সমষ্টিকে বলছেন মহৎ।

এই মহৎ থেকে *সত্যং* এর জন্ম। সত্যং মানে আকাশাদি পঞ্চভূত – আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল ও জল থেকে পৃথিবী, এইভাবে সৃষ্টি এগিয়ে চলে। এই পঞ্চভূতে এসে ব্রহ্মের সত্তা প্রথম অনুভব করা যায়। এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল তার মধ্যে সত্তা পাওয়া যাবে না, কারণ প্রকৃতি হল গুণ, গুণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়াতে কিছুই বোঝা যাবে না। সেখান থেকে যখন মহৎএ এল তখনও সূক্ষ্ম, যদিও মন জড় পদার্থ কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কিন্তু জড় পদার্থের প্রথম অনুভব হয় পঞ্চভূতে এসে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে এর অনেক মিল আছে। ইলেক্ট্রন প্রোটন পর্যন্ত পদার্থের প্রথম স্পর্শ পাওয়া যাবে। ইলেক্ট্রন প্রোটনের পেছনে যেখানে কোয়ার্কস্ আছে তখন আর কিছু বোঝা যাবে না। বিজ্ঞানীরা গাণিতিক ফরমুলা অনুসারে বুঝতে পারছেন কোয়ার্ক আছে কিন্তু জিনিষটা কি, কিভাবে এসেছে এই ব্যাপারে তাঁদের কাছে কোন ধারণাই নেই। কিন্তু তাঁরা জানেন কোয়ার্ক হচ্ছে building blocks of matter। মহৎ এই কোয়ার্কেরও অনেক পেছনে। বিজ্ঞানীর বলছেন কোয়ার্কের পেছনে রয়েছে পিওর এণার্জি। যাই হোক, আমাদের উপনিষদ বলছে মহৎ থেকে, অর্থাৎ সমষ্টি মন থেকে আসছে সত্য, মানে পঞ্চ মহাভূত। পঞ্চ মহাভূতকে সত্য কেন বলা হচ্ছে? কারণ ওখানেই প্রথম সত্তার বোধ হয়। এইখান থেকে সৃষ্টি ঠিক ঠিক পুরো দমে শুরু হয়ে গেল। এই পঞ্চভূত, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যে পঞ্চভূত যাকে সত্যসংজ্ঞক বলছে, তাকেই সত্য বলা হচ্ছে।

উপনিষদের পরিভাষা সম্পূর্ণ আলাদা, উপনিষদের ভাষাকে সরাসরি অনুবাদ করতে গেলে পুরো তালগোল পাকিয়ে যাবে। যেমন বলা হল *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, এর অনুবাদ করলাম ব্রহ্ম তপস্যা করে বড় হলেন। সেখান থেকে *অন্নমভিজায়তে*, মানে চাল-গম খাদ্য শস্যের জন্ম হল, *অন্নাৎ প্রাণো*, যখন খাওয়া-দাওয়া করল তখন তার প্রাণের বিকাশ হল, তারপর সেখান থেকে মন, মন থেকে সত্য জন্ম হল। এবার সব বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এইভাবে অর্থ করলে হবে না, আচার্য সব শব্দের অর্থকে একটার সাথে আরেকটার সামঞ্জস্য করে দিচ্ছেন। মানুষ কষ্টসাধ্য করে যে তপস্যা করে ব্রহ্মের তপস্যা সেভাবে হয় না। তিনি ইচ্ছা করলেন এটাই ব্রহ্মের তপস্যা। ব্রহ্মের সেই তপস্যা থেকে *অন্নম্* মানে প্রকৃতির জন্ম হল। যেটা খাওয়া যায় সেটাই ভোগ্য, ব্রহ্মের ভোগ্য হল প্রকৃতি। সাংখ্য দর্শনও এই কথাই বলছে, প্রকৃতি হল পুরুষের *ভোগার্থম্*। প্রকৃতি থেকে মহৎ, সমষ্টি মন। সমষ্টি মন থেকে জন্ম নিচ্ছে সত্যম্, সত্যম্ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে পঞ্চ মহাভূত। কেন তাকে সত্য বলা হচ্ছে? কারণ এখানে ঠিক ঠিক ব্রহ্মের অনুভূতি হয়, বোঝা যায় যে ব্রহ্ম আছেন। এর আগে পর্যন্ত ছিল অব্যাকৃত, সত্যমে এসে সব কিছু ব্যকৃত হয়ে গেল। সূক্ষ্ম মন দিয়ে যখন ধ্যান করা হয় তখন স্থূল চোখ দিয়ে এই স্থূল জগৎকে দেখছি, সূক্ষ্ম দিয়ে সূক্ষ্ম জগৎ দেখা যায়। আমরা বিজ্ঞানে যেমন চেষ্টা করলে এ্যটম্ ইলেক্ট্রন প্রোটনাদি দেখতে পারি, ঠিক তেমনি যোগীরা ধ্যানে সূক্ষ্ম জগৎ যে উপকরণ দিয়ে নির্মিত

হয়েছে সেই উপকরণগুলোকে দেখতে পান। কিন্তু তারপরে যে মহৎ মানে সমষ্টি মন সেটাকে আর দেখতে পান না। মহৎ এত সূক্ষ্ম যে ধ্যানের গভীরেও আলাদা করে দেখা যাবে না, মহৎ এর সাথে তিনি একাত্ম হয়ে যান। যোগীরা ধ্যানের গভীরে শেষ যেটা দেখেন, যেখানে তাঁর বোধ হয় জগৎটা আছে, সেটা হল পঞ্চভূত, যাকে বলছেন সত্যম্। এই সত্যম্ থেকে *লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্*, এরপর লোকের আর কর্মের জন্ম। লোক মানে চতুর্দশ ভুবন।

অন্ন থেকে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে শুরু করে লোক পর্যন্ত যে সৃষ্টির পর্যায়ক্রমের কথা বলা হয়েছে এটা যে কোন চিন্তা-ভাবনা বা কল্পনা করে এনারা দাঁড় করিয়েছেন তা নয়, যোগীরা ধ্যানের গভীরে বাস্তবিক এভাবেই দেখেন। মহাভারতে এবং যোগশাস্ত্রেও বর্ণনা আছে ধ্যানের গভীরে যোগীরা কিভাবে এই জিনিষগুলোকে অনুভব করেন। প্রথমে যোগীরা স্থূল জগতের অনুভূতি লাভ করেন। স্থূল জগতের অনুভূতির বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, মন যখন খুব একাগ্র ও তীক্ষ্ণ হয় তখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে কোন তথ্য আসে, যেমন কর্ণের মাধ্যমে একটা শব্দ এল। সেই শব্দের একটা আপেক্ষিক অর্থ থাকবে, সেই অর্থের একটা জ্ঞানও থাকবে। আমাদের ক্ষেত্রে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান এক হয়ে থাকে। কিছু দিন আগে বাবা-মায়ের উপর একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল, সন্তানদের কি ধরণের প্রশ্নকে বাবা-মারা ভয় পান। সমীক্ষায় বলা হচ্ছে বাচ্চাদের আকাশ নীল কেন, এই প্রশ্নকে বাবা-মারা খুব ভয় পায়। বাচ্চাদের মনে নানান বৈচিত্র্যের প্রশ্ন আসে, এটা কি? গ্লাশ। গ্লাশটা কিসের তৈরী? প্লাস্টিকের। বোতলটা কিসের তৈরী? প্লাস্টিকের। এটা বোতল কেন হল আর ওটা গ্লাশ কেন হল? কিন্তু যখন বাচ্চাকে বলা হল এটা গ্লাশ, তখন প্রথমে এটা তার কাছে একটা শব্দ রূপেই আসে। তার সঙ্গে আসে অর্থ। বাচ্চা তখন ভাবে, বোতলটা এই রকম হয়, গ্লাশ এই রকম হয়। আবার কোথাও গিয়ে সব কিছু গুলিয়ে যায়। বাচ্চারা প্রথমের দিকে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান মিলিয়ে মিলিয়ে শেখে। আর যখন কোন নতুন শব্দ শেখে তখন সেই শব্দটাই সব জায়গাতে না বুঝেই লাগাতে থাকবে। যখন বড় হয় তখন শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান এক সঙ্গে চলে আসে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরাও এই একই ভাবে গ্রহণ করি। যোগীদের কাছে যখন কোন ধ্বণি আসে তখন তাঁরা পরিষ্কার আলাদা করে নিতে পারেন, এই ধ্বণির শব্দ আলাদা, অর্থ আলাদা ও জ্ঞান আলাদা। এমনকি শব্দ ও অর্থ ছাড়াও জ্ঞান বুঝে নিতে পারেন। যেমন পাখির আওয়াজ, পাখি অন্য পাখিকে কিছু বলছে, সেটা আমাদের কাছে শব্দ হয়ে আসছে। ঐ শব্দের একটা অর্থ আছে যেটা আমরা ধরতে পারিনা। কিন্তু যোগীর কাছে যখনই সেই পাখির আওয়াজটা এল তখনই সেই অর্থের সম্বন্ধিত যে জ্ঞান সেটা যোগীর কাছে এসে যায়। দ্বিতীয় হল, মনে যখন কোন বিচার উঠল, ওই বিচারটাই আবার শব্দে পরিবর্তিত হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে, যোগীদের কাছে সেটার আর দরকার হয় না। আমার মনে বিচার উঠেছে সেখান থেকেই যোগীরা বুঝে নেন।

এতো গেল স্থূল জগতের ব্যাপার। যখন যোগীরা ধ্যানের খুব গভীরে চলে যান তখন স্থূল জগৎ থেকে তাঁর মন সরে সূক্ষ্ম জগতে চলে যায়। ঐ অবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের সব কিছুকে তিনি জয় করে নেন। মহাভারতেও বর্ণনা আছে আকাশ তত্ত্বকে কেউ জয় করে নিলে যোগীর কি ক্ষমতা আসে, জল তত্ত্বকে জয় করলে কি ক্ষমতা হয়। এই অবস্থায় যোগীর কাছে জগৎটা অন্য ভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু যে স্থূল জগৎকে আমরা দেখছি এই জগৎ তাঁদের কাছে ওখানেই শেষ হয়ে যায়।

এই সত্যম্ সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে তৈরী হচ্ছে মানুষের স্থূল শরীর, মানুষের মন। কিন্তু তার সাথে তৈরী হচ্ছে যত রকমের লোক – ভূঃ ভূবঃ স্বঃ। ভূঃ হল পৃথিবী, ভূবঃ মাঝখানে আর স্বঃ হল স্বর্গ। ভূঃ ভূবঃ স্বঃ বলতে যদিও সব কিছুই বোঝায় কিন্তু তারপরেও তাঁরা উপরে সাতটা লোক আর নীচের দিকে সাতটা লোক এই চৌদ্দটা লোকের নামকরণ করলেন। এই চোদ্দটা লোকের নাম – ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সাতটি উপরের দিকের। ঠিক তেমনি সাতটি পাতাল লোক আছে, এই পাতাল লোক মানে নরক নয়, নীচের দিকে থাকে, এদেরও সমৃদ্ধি আছে কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা তাদের নেই। যেমন রাজা বলিকে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হল তার আধ্যাত্মিক চেতনাকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু বলা হয় পাতাললোকের

ভোগ্য বস্তু স্বর্গ থেকেও বেশী। এই সাতটি পাতাল লোকের নাম – তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল। সাতটা নীচে আর সাতটা উপরে এই কটি লোককে চতুর্দশ ভুবনও বলা হয়।

মূল কথা হল জীবের যে অস্তিত্ব এই সত্যম্ এসে অনুভব হয়। এগুলো ঋষিরা প্রত্যক্ষ দেখেছেন। আমরা যেসব দেবতাদের নাম শুনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি – ঋষিরা সাক্ষাৎ দেখতে পেতেন দেবতারা এসে যজ্ঞের আহুতি নিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর যখন তাঁর গর্ভধারিনী চন্দ্রামণি দেবীর গর্ভে অবস্থান করছেন তখন চন্দ্রামণি দেবী স্বচক্ষে কত রকমের দেবী দেবতাদের দর্শন করতেন। হাঁসের পিঠে করে ব্রহ্মা যাচ্ছেন। চন্দ্রামণি দেবী আবার তাঁকে বলছেন, আমার ঘরে পান্তা ভাত আছে তুমি খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও। ব্রহ্মা হেসে চলে গেলেন। আগেকার ঋষিরা দেবী-দেবতাদের দেখেছেন। চন্দ্রামণি দেখেছেন, ঠাকুরও দেখেছেন। তাই দেবী-দেবতাদের অস্তিত্বকে আমরা এক কথায় অস্বীকার করতেও পারছি না। যদি তাঁদের অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাঁরা কোথায় থাকেন? আমাদের শাস্ত্র বলছে তাঁরা সূর্যলোক, চন্দ্রলোকাদিতে থাকেন।

আকাশে প্রতিদিন যে সূর্য চন্দ্র দেখছি এখানে সেই সূর্যলোক বা চন্দ্রলোকের কথা বলা হচ্ছে না। এই লোকগুলো হল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম অবস্থার অস্তিত্ব। আমাদের এই পৃথিবী স্থূলতম লোক, আমাদের বুদ্ধিটাও তাই স্থূলতম। সূক্ষ্ম জিনিষ স্থূল জিনিষের মধ্যে ঢুকে যায়। পৃথিবীর ঠিক বাইরে ভূবঃ লোক, যেটা এই পৃথিবী থেকে আরেকটু সূক্ষ্ম কিন্তু এর পরিধিটা অনেক বিস্তৃত। যারা ভূবঃ লোকের বাসিন্দা তারা খুব সহজেই ভূঃ লোকে চলে আসতে পারে। ভূঃ লোকের বাসিন্দা কখনই ভূবঃ লোকে যেতে পারবে না। এটা ঠিক অনেকটা জালির উপর জালি বেছান। একটা জালি আছে যার ফুটোগুলো বড় বড়। ওর মধ্যে পাথর রাখা আছে। ঐ মোটা জালির বাইরে আরেকটা জালি আছে, সেটা আবার বালি আটকানোর জালি, তারও বাইরে আরেকটা জালি আছে তাতে জল আছে। জল পাথরের কাছে চলে আসতে পারবে আবার বালির মধ্যেও চলে যেতে পারবে। পাথর কিন্তু বালির মধ্যে যেতে পারবে না, সেই রকম বালি জলের মধ্যে যেতে পারবে না। এই ভূঃ ভূবঃ স্বঃ লোকগুলো অনেকটা এই রকম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। এই পৃথিবীলোকে, অর্থাৎ ভূঃ লোকে ভূবঃ, স্বঃ, জনঃ, তপঃ, মহঃ ও সত্যলোকের সবাই আসতে পারবে। কারণ এই লোকগুলো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা ভূঃ লোক থেকে কোন লোকেই যেতে পারব না। যেতে পারব, মৃত্যুর পর যখন স্থূল দেহটা নাশ হয়ে যে সূক্ষ্ম শরীরটা থাকবে সেই সূক্ষ্ম দেহটা এবার ভূবঃ পর্যন্ত যেতে পারবে। আরও সূক্ষ্ম হলে আরও উপরে অন্য লোকে যেতে পারবে। এইভাবে তার যাতায়াতে পরিধিটা বেড়ে যায়। মানুষ মারা গেলে আমরা কত কান্নাকাটি করি, কিন্তু যে মারা গেল জীবিত অবস্থায় তার যে সীমানা ছিল সেটা মৃত্যুর পর বেড়ে গেল। জেলে যে বন্দী ছিল সেখানে তার এক কয়েদীর সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেলে তার তো আনন্দ হবে। কিন্তু যে বন্ধু এখনও বন্দী হয়ে আছে সে এখন দুঃখে কাঁদছে তার সঙ্গী চলে যাচ্ছে বলে। কিন্তু তার তো আনন্দ হওয়ার কথা, এই জেল থেকে তার বন্ধু মুক্তি পেয়ে গেল। মৃত্যু মানে এই স্থূল শরীরের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়া।

এই চোদ্দটি লোকের মাঝখানে যে লোক আছে সেটাই হল সব থেকে স্থূলতম। এর মধ্য দিয়ে অনবরত জীব আসা যাওয়া করছে। এই যে আমরা এখানে বসে আছি এখানে কত যে ভূত প্রেত সূক্ষ্ম শরীরে বসে আছে আমরা কল্পনাও করতে পারব না, এটা একেবারে সত্য, একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। সূক্ষ্ম শরীর হওয়াতে এদের জায়গাও অনেক কম লাগে। এখন কি হবে, যেগুলো দুষ্ট আত্মা তারা এখানে ঢুকতে পারবে না, কারণ এই ধরণের কথাবার্তা তাদের ভালো লাগবে না। কিন্তু অনেক শুদ্ধ আত্মা এই জায়গাতেই থাকবে, কারণ এটাই হবার কথা। এই মুহুর্তে এই ঘরে হাজার হাজার সুক্ষ্ম জীব অবস্থান করছে। কিন্তু খুব শক্তিমান না হলে তারা আমাদের সাথে কথাবার্তা চালাতে পারবে না। রামকথায় বলে, যেখানেই শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা আলোচনা হয় সেখানেই হনুমান সশরীরে বিদ্যমান থাকেন। যদি একই সাথে পঞ্চাশ জায়গায় রামকথা হয় তাহলে পঞ্চাশ জায়গাতেই হনুমান থাকবেন? অবশ্যই থাকবেন। হনুমানের সূক্ষ্ম শরীর আর তাঁর দেবশরীর।

উনি চাইলে তাঁর একটাই শরীরকে অনেকগুলো শরীর করে নিতে পারবেন। হনুমানের কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়। তিনি যদি চান বিশেষ ভক্তকে তাঁর স্থুল শরীরটাও দেখিয়ে দিতে পারেন।

বলছেন, এই সব লোক পঞ্চভূত দিয়ে নির্মিত। দেবতাদের শরীরও এই পঞ্চভূত দিয়েই তৈরী। শুধু আমাদের শরীরে পৃথিবী তত্ত্বটা বেশী। বলা হয় কলিতে অন্নগত প্রাণ, স্থূল শরীর মানেই অন্নগত প্রাণ। প্রেতাত্মাদের শরীরে বায়ুতত্ত্ব বেশী, তাই তাদের বায়ুগত প্রাণ। দেবতাদের শরীরে তেজ অংশটা বেশী থাকে, অর্থাৎ অগ্নি তত্ত্বটা বেশী। আবার যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের মধ্যে আকাশ তত্ত্বটা বেশী, সেইজন্য তাঁরা আরও বেশী ছড়িয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা আরও উপরে অবস্থান করেন তাঁদের এই শরীরটাও থাকে না, তাঁরা সেখানে মহৎ রূপে অবস্থান করেন। মহৎ মানে সমষ্টি মন, তাই এনারা সব মনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকেন। যিনি মনের স্তরে চলে গেলেন এখন তিনি যখন যেখানে খুশী পঞ্চাশটা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। এগুলো কোন কল্পনা নয়, এটা আক্ষরিক ভাবে ঠিক এই রকমই হয়। যিনি সিদ্ধ পুরুষ কিন্তু জ্ঞান লাভ হয়নি, কিন্তু সিদ্ধিতে তিনি এত এগিয়ে গেছেন যে মহৎএর সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। এখন তিনি আর সূক্ষ্ম শরীরও নন। সব সূক্ষ্ম শরীরের উপরে তিনি চলে যান। একজন যোগী এমন সাধনা করলেন যে, সেই সাধনার জোরে তিনি উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছে গেলেন। কিন্তু তাঁর মুক্তি হল না। তিনি হয়ত সাকার সাধনা করেছিলেন, বা কর্ম এত সুন্দর ভাবে করেছেন যে তিনি হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। তিনি যদি হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে এক হয়ে যান বা ব্রহ্মার সঙ্গে এক হয়ে যান, তাহলে তো অনেক ব্রহ্মা হয়ে যাবে। হতেই পারে, একটা সৃষ্টি কল্পে অনেকেই শুভ কর্ম করে থাকবেন। হিরণ্যগর্ভের যখন মুক্তি হবে, ব্রহ্মার দেহ যখন লীন হবে তখন তাঁরও মুক্তি হবে। তাহলে এতজন ব্রহ্মা কোথায় যাচ্ছেন, এগুলো কিছুই নয়, সব মিলে এক হয়ে যাচ্ছে – এটাই সমষ্টি। যেমন জলের মধ্যে জল দিলে পুরো জলটাই এক হয়ে গেল এখন এই জলের কোন আলাদা সত্তা নেই। ওঁর একাত্ম বোধ আর কোন শরীরের সঙ্গে থাকে না, কোন প্রাণের সঙ্গে থাকবে না, কোন মনের সঙ্গেও নেই। হিরণ্যগর্ভের যে সূক্ষ্ম শরীর তার সাথে তাঁর এবার একাত্মবোধ হয়ে গেছে। তাঁকে দিয়ে আর কেউ শরীর ধারণ করাতে পারবে না। যখন ব্রহ্মার মুক্তি হবে তখন তাঁরও মুক্তি হয়ে যাবে। তাই মৃত্যুতে মানুষের শোকগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ সেতো মুক্ত হয়ে গেল, তার আসল সত্তা তার শরীরের ভেতর থাকে। এতক্ষণ এই শরীরে আবদ্ধ ছিল এখন মুক্ত হয়ে গেল। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর সুদূর মাদ্রাজে শশীমহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) স্বপ্ন দেখছেন স্বামীজী এসে তাঁকে বলছেন 'শশীভাই! আমার শরীরটাকে আমি থুতুর মত ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম'। তারপর তিনি তার মারফৎ খবর পেলেন বেলুড় মঠে স্বামীজী দেহ রেখেছেন। ভেতরে যিনি জীবাত্মা আছেন তিনি এই শরীরটাকে থুতুর মত ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যাচ্ছেন কোথায়? কিছুই নয়, এতক্ষণ যে অন্নগত শরীর ছিল বা যে অন্নময় শরীর ছিল সেটা খসে পড়ে গেল। এবার একটা বায়ুর শরীর নিয়ে ঘুরতে শুরু করবে। অন্নময় শরীর থেকে এই শরীর অনেক ভালো। কিন্তু বায়ু শরীরে একটা সমস্যা হল, এই শরীরে নতুন কোন কর্ম করা যায় না। ফলে সেখানেও আবদ্ধ থাকতে হয়, এটাও আরেকটা জেলখানা। এই অন্নময় শরীর থেকে যদি কেউ মুক্তি পেয়ে যায়, সরাসরি তার মুক্তি হয়ে যাবে। তাঁকে আর ক্রমমুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। গীতায় ভগবান বলছেন *ইহৈব তৈর্জীতঃ সর্গো*, এইখানে এই শরীরেই মুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু বায়ু শরীরে এই মুক্তি হবে না। ফলে বেচারিকে আবার এই অন্নময় শরীরে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু এই ভেবে যদি কেউ দুঃখ প্রকাশ করে – আহা! এই কম বয়সে শরীরটা চলে গেল! আবার কোথায় গিয়ে জন্ম নিতে হবে, এই সুযোগটা আর পাবে কিনা কে জানে। এই শোক করা যেতেই পারে।

স্বামীজী গুরুভাইদের বলছেন দ্যাখো ভাই! এই জন্মে যদি আমরা মুক্তি লাভ না করতে পারি তাহলে এই সুযোগ আর কি পাওয়া যাবে! কারণ মনুষ্য জন্ম পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ, মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা আরও দুর্লভ আর মহাপুরুষের আশ্রয় আরও গভীর দুর্লভ। আমরা আবার মনুষ্য জন্ম হয়ত পাব, মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও হয়ত হবে কিন্তু ঠাকুরের মত মহাপুরুষের আশ্রয় তো আর পাওয়া যাবে না। সেইজন্য যা করার এক্ষুণি করে নাও। স্বামীজী খুব মারাত্মক কথা এখানে বলছেন। আমার আপনার মত মানুষ মরে গিয়ে সাপ, বিছে, মশা, মাছি হব না, এসব হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। মানুষই হব, আর যখন এত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করছি তখন মুক্তির ইচ্ছাটাও

থাকবে। কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে আজ বেলুড় মঠের বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ণের যে সুবিধাগুলো আমাদের কপালে জুটেছে সেই কপাল নিয়েই আসব। সেইজন্য বলা হয়, এই জন্মে যে সুযোগ এসেছ সেই সুযোগটাকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে নাও।

বলছেন এই ভূলোকে বর্ণাশ্রমানুযায়ী নানা রকমের কর্মের সুযোগ তৈরী হয়। আমি যে বংশে জন্ম নিয়েছি, যে পরিবারে জন্ম নিয়েছি, যে পরিবেশে জন্ম নিয়েছি সেই অনুসারে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্ম স্বাভাবিক ভাবে আমার কাছে এসে যাবে। এই নির্দিষ্ট কর্ম আমি ইচ্ছে করলে করতেও পারি নাও করতে পারি, কেউ আমাকে বাধ্য করবে না। কিন্তু আমি যদি কল্যাণকামী হই, যদি শ্রেয়কে পেতে চাই, তখন আমাকে দেখতে হবে কোন কর্মটা করলে সব কিছু সহজে হয়ে যাবে। যেমন একটি মেয়ে, কোন মেয়ের মুক্তিই যদি উদ্দেশ্য হয়, তখন তার সহজ পথ হল ভেতরে মাতৃভাবকে জাগ্রত করা। সে এখন বাবা-মা, সন্তান, স্বামী, পরিবারের সবাইকে, এমনকি সারা জগতের সবাইকে সে সন্তানের মত দেখছে। এটাই একটি মেয়ের জীবনের Path of least resistance। বর্ণাশ্রম ধর্ম হল এই Path of least resistance। এনারা কখনই বলবেন যে এটাই তোমাকে করতে হবে, না করলে তোমাকে সমাজচ্যুত করে দেওয়া হবে। দ্রোণাচার্যতো নিজের বর্ণই পাল্টে নিলেন। পরশুরাম যে কত বার নিজের বর্ণ পাল্টেছেন বোঝাই যায় না। বর্ণ পরিবর্তন আগেও ছিল, এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। শাস্ত্র নিষেধ করছে না, কিন্তু এটা সহজ পথ নয়। যারা কল্যাণকামী, যারা কল্যাণের পথে চলতে চায়, নিঃশ্রেয়সের মার্গকে যারা অবলম্বন করতে চাইছে তাদের জন্য এটা হল সহজ পথ।

যারা ভোগ করতে চাইছে, বর্ণাশ্রম যদি ঠিক ঠিক পালন করে চলে তাহলে তারা ভোগও করতে পারবে। কিন্তু ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে ভোগ কর। কিন্তু তুমি যদি বল আমি একাই ভোগ করতে চাই, বাকি সবাই নিপাত যাক, তখন এই বর্ণাশ্রম প্রথার সুফল পাওয়া যাবে না। যদি তুমি বল আমারও লাভ হোক, তোমারও লাভ হোক, আর আমরা সবাই মিলে ভোগ করব। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম ছাড়া কোন গতিই নেই। যদি বলে আমিই একমাত্র ভোগ করব আর বাকি সবাইকে দাবিয়ে রাখব, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম এই চিন্তাধারার সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্মকে আগে মেরে উড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু এটাই তখন হয়ে যাবে আসুরিক ধর্ম। আসুরিক ধর্মতে কি হবে? ভারতে এখন প্রতি ছয় মিনিটে একজন করে আত্মহত্যা করে। কিন্তু আগে ভারতে কেউ আত্মহত্যা করত না। প্রতি ছয় মিনিটে একটা করে লোক আত্মহত্যা করছে সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই, সব অন্ধ আর বধির হয়ে গেছে। কেন করছে? সমাজের রক্ষাকবচ গুলো গুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অন্য কেউ বাঁচল কি মরল তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমাকে আমার ভোগ করতে দিতে হবে। এই হল আজকের ভারতবর্ষ। কোথায় নেমে গেছে! চারিদিকে অপচয় হয়ে চলেছে। দিল্লী মুম্বাই শহরে বাবার একটা গাড়ি, স্ত্রীর আরেকটা গাড়ি আর ছেলের আলাদা একটা গাড়ি। কেন সবাই আলাদা গাড়ি রাখছে? আমার কথা কেউ শুনতে চায় না, অশান্তি বাড়িয়ে কাজ নেই তার চেয়ে বরং একটা গাড়ি কিনেই দাও। কোথা থেকে আসছে এই গাড়ি? গাড়ির জন্য স্টীল দরকার। স্টীল কোথা থেকে আসবে? খনিজ সম্পদ বাড়াতে হবে। খনিজ পদার্থ কোথা থেকে আসবে? বন সম্পদকে কেটে আগে বনহীন করতে হবে। বন সম্পদ নষ্ট হলে কে মারা যাবে? কিছু পশুপাখি মরবে আর কিছু আদিবাসী যারা কষ্ট করে জীবন-যাপন করছে তারা মরবে। তখন তারা কি করবে? তারাই পরে মাওবাদী হবে। তার তো আর কোন উপায় নেই। তোমার দিনের পনের মিনিট সুখ ভোগের জন্য একটা গাড়ি দরকার, আর ঐ একটা গাড়ির জন্য কত স্টীল লাগছে! এই নিয়ে কারুর কোন বিচার নেই, কোন চিন্তা ভাবনা নেই। শুধু ভোগ আর ভোগ।

মানুষ যখন কোন কর্ম করে তখন ঐ কর্মের একটা ফল হয়। এই ফলটাকে এখানে বলছেন *কর্মসু চামৃতম্*। কেন অমৃত ফল বলা হয়? আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন *কল্পকোটি-শতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎফলং ন বিনশ্যতীতামৃতম্* - আজ যে কর্ম তুমি করছ ব্রহ্মার এক শত কোটি কল্পেও সে কর্ম নাশ হবে না, যখন সময় হবে সেই কর্ম তোমাকে ঘিরে ধরবে। কর্মবাদ কোন তত্ত্ব নয় এটাই বাস্তব, কর্মবাদ নিজেই একটা সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত দিয়েই সব কিছু চলে। বিজ্ঞানের যত শাখা আছে পদার্থ, রসায়ন, গণিত সব কিছু যেমন কতকগুলি

নিয়মে বা ফরমুলা তে চলে, ঠিক তেমনি মন চলে কর্মের ফরফুলা অনুযায়ী। যারা মন জিনিষটাকেই মানে না তাদের কাছে কর্ম বলেও কিছু নেই। কিন্তু তুমি মান আর নাই মান, তোমার কর্ম তোমাকে ছাড়বে না। নিউটন যত দিন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করেননি তার আগে কি গাছের ফল আকাশের দিকে যেত? তুমি এখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে মান আর নাই মান আম গাছ থেকে আম পড়লে আকাশে না গিয়ে মাটিতেই পড়বে। গ্যালিলিও যখন বললেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে তখন চার্চের ফাদাররা বললেন হয় তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও তা নাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এরা তার আগে ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল, গ্যালিলিওকে তাই করবে। গ্যালিলিওর তখন বিজ্ঞানী হিসাবে নাম হয়ে গিয়েছিল তাই তাঁকে সাবধান করে দিল, নাহলে সোজা পুড়িয়ে দিত। গ্যালিলিও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে দিলেন আমি যা কিছু লিখেছি সব ভুল। এই হল পাশ্চাত্য জগৎ। যখন কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছেন তখন গ্যালিলিও তাঁর নিজের লোকদের খুব আস্তে করে বললেন, ওরা যাই বলুক পৃথিবী সূর্যের চারিদিকেই প্রদক্ষিণ করে। গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অঙ্ক কষে কষে দেখছেন এটাই সত্য, কিন্তু তিনি কি করবেন! কয়েকটি মুর্খের হাতে পড়ে বেঘোরে কেন প্রাণটা দেবেন! তাই বলে কি খ্রীশ্চান পাদ্রিদের ফর্মানে পৃথিবীকে সূর্য প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে দেবে! বিজ্ঞানের যে নিয়ম সেটাকে স্বয়ং বিধাতাও পাল্টাতে পারবেন না। ঠিক তেমনি যতই তুমি যুক্তিবাদী হও, যতই তুমি বড় বড় কথা বল কর্ম তোমাকে ছাড়বে না। এক দিন কি দুদিনের জন্য কর্ম তোমার জন্য অপেক্ষ করে থাকবে না, তুমি ভাবলে যাক এই যাত্রায় আমি বেঁচে গেলাম। কিন্তু না, শত কোটি কল্প যাবৎ অপেক্ষা করে থাকবে, তুমি তোমার কর্মকে ভুলে যেতে পার, কর্ম কিন্তু তোমাকে ভুলবে না। আচার্য এটা কোন গল্পের ছলে কোন আজগুবি তত্ত্বের কথা বলছেন না, একেবার সত্যি কথা বলছেন। তুমি যে কর্ম করে ফেলেছে এটাকে যদি কাটিয়ে না নিতে পার, তা প্রায়শ্চিত্ত করেই হোক বা অন্য কোন শুভ কর্ম দ্বারাই হোক, এই কর্মের কখন নাশ হবে না। নাশ কিভাবে হবে? একমাত্র জ্ঞান হয়ে গেলে সব কর্ম পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যাবে। গীতায় এটাই ভগবান বলছেন – *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা*।।

আমরা আগের আগের জন্ম কখন কুকুর হয়ে জন্মেছি, কখন শূয়োর হয়ে জন্মেছিলাম। মানুষ হয়ে জন্মাবার পর এখন সেই আগের আগের জন্মের জৈব সংস্কারগুলো থেকে গেছে। সেই সংস্কার বশতঃ যখন কোন নারীকে দেখছি তখনই আমার মধ্যে ভোগের উদ্রেক হচ্ছে। সেই ভোগকে চরিতার্থ করতে আমি একজনকে বিয়ে করলাম। বিয়ের পর সন্তান হল। সেখান থেকে আবার নতুন কর্ম শুরু হয়ে গেল। সন্তানকে বড় করতে গিয়ে পাঁচটা ভুল কর্ম করছি পাঁচটা ঠিক কর্ম করছি। সেগুলো থেকে আরও কিছু কর্ম হতে থাকল। এইভাবে কর্ম থেকে কর্ম, সেই কর্ম থেকে আরও কর্ম হতে হতে যে অবস্থাটা দাঁড়ায় তা হল একটা যেন কাঠের স্তুপাকার পাহাড়। কাঠের এই বিশাল স্তুপাকার পাহাড়টার নাশ হবে কি করে? একটাই পথ, দেশলাইয়ের একটা কাঠি ঘষে ফেলে দাও, সবটাই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই। দেশলাইয়ের কাঠি ঘষা মানে আত্মজ্ঞান। যত কাঠই থাকুক না কেন একবার আগুন লাগলে সব কাঠ সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এই কথাই আচার্য বলছেন শত শত কল্প অতিবাহিত হয়ে যাক, কর্ম যা করা হয়েছে সেই কর্ম আমাকে মেরে ছাড়বে। সেইজন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলা হয়। আমি যত সাবধান হই না কেন বেঁচে থাকতে হলে জীবহত্যা হবেই। যত ভালো কাজই করি না কেন আমার থেকে অপর কষ্ট পাবেই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি তাতেও কত জীবহত্যা হচ্ছে। সেইজন্য বলছেন পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে। অতিথিকে খাওয়াবে, পশুপাখি কিছু খেতে দেবে, নিজের আত্মীয়স্বজনকে খাওয়াবে, দেবতার পূজো করবে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করবে। মহাভারতে বলছে যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে না সে বেঁচে থেকেও মৃত। যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন নিঃশ্বাস নিয়েও কে মৃত? যুধিষ্ঠির তখন এই উত্তর দিয়েছিলেন যে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে না সেই গৃহস্থ বেঁচে থেকেও মৃত।

কর্মসু চামৃতম, কর্ম অমৃত, কর্ম কখন নাশ হয় না, ভালো হোক আর খারাপই হোক সব কর্ম সঞ্চিত থেকে অপেক্ষা করতে থাকবে। এই কর্মচক্র থেকে আমরা কোন ভাবেই বেরোতে পারব না। কর্মকে অতিক্রম

করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। কর্ম আমাদের বিভিন্ন দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সমাজের টানাপোড়েন থেকেও বাঁচতে পারব না। আমার একটা ভাঙা সাইকেল আছে, পাশের বাড়িতে ভালো গাড়ি আছে, আবার বছর বছর পুরনো গাড়ি পাল্টে নতুন গাড়ি কিনছে, ভেতরের এই জ্বালাকে নিয়ন্ত্রণ করাও দুঃসাধ্য। ইদানিং আবার নতুন একটা শব্দ এসেছে লাইফ স্টাইল ডিজিজ্। আগেকার দিনে পঞ্চাশ বছর থেকেই মৃত্যুর দিন গোণা শুরু হত। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের গড় আয়ু অনেক বেড়ে গেছে। ফলে নানান রকম নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। এটা একটা সমস্যা। অন্য দিকে ক্যান্সার রোগাক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। ক্যান্সার রোগেরই নতুন নামকরণ হয়েছে লাইফ স্টাইল ডিজিজ। আমাদের খাবারের উপকরণে নতুন নতুন খাদ্য সংযোজন হচ্ছে, পরিবেশের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হচ্ছে, যার ফলে আমাদের শরীরে যে সুপ্ত জিনগুলো রয়েছে সেগুলো জেগে উঠছে। আগেকার দিনে যক্ষ্মা ছিল লাইফ স্টাইল ডিজিজ। নোংরা পরিবেশ, পুষ্টির অভাব যক্ষ্মা রোগের কারণ। ভালো আলো-বাতাস, ভালো পুষ্টিকর খাবার যেখানে ছিল সেখানে যক্ষ্মার প্রকোপ কম ছিল। ডাক্তাররা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন ওষুধে যক্ষ্মার সঠিক প্রতিরোধ হয় না। কিন্তু ইদানিং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ কমে গেছে। আমি যদি যক্ষ্মা আক্রান্ত পরিবেশে থাকি তাহলে আমারও যক্ষ্মা হবে, এর সঙ্গে কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এই দুটোর উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, প্রথমতঃ যে কর্মকে আমরা টেনে নিয়ে এসেছি আর সমাজের যে পরিবেশে বাস করছি তার যে প্রভাব – এই দুটো থেকে কোন ভাবেই আমরা বাঁচতে পারব না।

এই দুটি সত্তার সাথে তৃতীয় একটি সত্তাকে মাথায় রাখতে হয়, এই তৃতীয় সত্তাটি হল আধ্যাত্মিক সত্তা। এই দুটি যেমন বাস্তব সত্য ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সত্তা, যাকে আমরা আধ্যাত্মিক সত্তা বলছি, সেটিও বাস্তব সত্য। ঈশ্বরীয় সত্তাকে আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারিনা। প্রথম দুটি সত্তা আমাকে অনবরত নাচিয়ে চলেছে, অন্য দিকে আধ্যাত্মিক সত্তা আমার অন্তঃশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সৎ পুরুষের যত সঙ্গ করা যাবে, পরিবার ও সমাজে পরিচিতদের সাথে গ্রাম্য কথা যত কম বলা যাবে ততই আধ্যাত্মিক সত্তা পুষ্টি লাভ করবে। শিষ্যরা গ্রাম্য কথা বললে চৈতন্যদেব খুব অসন্তুষ্ট হতেন। গ্রাম্য কথা মানে, জাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে যত রকমের লৌকিক কথাবার্তা হতে পারে। বৈষয়িক কথাবার্তা মানুষকে তার আধ্যাত্মিক সত্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। নিয়মিত জপ-ধ্যান, শাস্ত্রাদি শ্রবণ, অধ্যয়ণ ও মনন, মন্দিরে যাওয়া, উপাসাদি করা যদিও এগুলো কখনই আমাদের আধ্যাত্মিক বানাবে না, কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তত আমাদের এই গ্রাম্য কথা থেকে সরিয়ে রাখে। আর দীর্ঘ দিন ধরে এগুলোকে নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তা জেগে উঠবে। এই আধ্যাত্মিক সত্তার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলে তখন নিয়মিত তাকে ইন্ধন দিয়ে যেতে হয়। আধ্যাত্মিক স্ফুলিঙ্গের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পাবে তত সে আমাদের ভেতর কর্মের যত রকম আবর্জনা জমে আছে সেটাকে পুড়িয়ে দিতে থাকবে, তার সাথে সাথে আশেপাশে যা কিছু হচ্ছে সেগুলোকেও পুড়িয়ে দেয়। তখন এই শরীর চালনার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুর জন্যই চেষ্টা করে মনকে শান্ত রাখতে হয়। এতে ভোগ-বাসনা গুলো খসে গিয়ে মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি ভাবের উদয় হয়। এজন্যই বলা হয় শাস্ত্রের মন্ত্র, শ্লোক সব কণ্ঠস্থ করে সুযোগ পেলেই আবৃত্তি করে যেতে হয়। শুধু মুখস্ত করে রাখলে হবে না, নিয়মিত পাঠ করে যেতে হবে। এইভাবে চলতে চলতে একটা সময়ে আধ্যাত্মিক সত্তা নিজে এসে আমাকে ধরে নেবে। যে কর্ম ও সমাজের প্রভাবে আমরা সব সময় উদ্দাম নৃত্য করে যাচ্ছি, যে কর্মচক্রের প্রভাবে কাটা ঘুড়ির মত আমরা ভেসেই চলেছি, সেখানে এই আধ্যাত্মিক সত্তা আমাদের স্থিতি দিচ্ছে।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের ছয় নম্বর মন্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। সেই নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে কিভাবে সৃষ্টি হয় তারই বর্ণনা করা হয়েছে আট নম্বর মন্ত্র। পুরো বক্তব্যকে উপসংহার করা হয়েছে নয় নম্বর মন্ত্রে। এর আগে সাত নম্বর মন্ত্রে সৃষ্টি কিভাবে হয় সেটাকে কয়েকটি উপমার সাহায্যে বর্ণনা করছেন। উপমার সাহায্যে কোন গূঢ় তত্ত্বকে বোঝালে সেটা ধারণা করতে আমাদের সহজ হয়। এই ছয়, সাত ও আট নম্বর মন্ত্রের উপসংহার হল নয় নম্বর মন্ত্র। আগের তিনটে মন্ত্রের সাথে নয় নম্বর তফাৎটা হল,

ছয়, সাত ও আট নম্বরে খুব বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু নয় নম্বর মন্ত্রে খুব সংক্ষেপে জিনিষটাকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করে নয় নম্বর মন্ত্রই আমি মুখস্ত করে যাব আর এর অর্থের উপরে জোর দিলেই আমার হয়ে যাব, কিন্তু তা করলে হবে না। গুরুর কাছে শিষ্যরা ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে আসতেন, গুরুও শিষ্যের মাথায় যাতে ব্যাপারটা স্থায়ী ভাবে বসে যায় সেইজন্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা দিক দিয়ে বোঝাতেন। নয় নম্বর মন্ত্রে বলছেন –

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে।।১/১/৯।।
ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ

(যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, জ্ঞানময় যাঁর তপস্যা, সেই ব্রহ্ম থেকে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জন্মায়।)

উপনিষদের এই মন্ত্রগুলো এত কঠিন, এর অর্থ বুঝিয়ে দিলেও ধারণা করা যায় না, এতই কঠিন। দিনের পর দিন পাঠ করতে করতে আর এর অর্থকে চিন্তন করতে করতে হঠাৎ করে একদিন অর্থটা নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন আমরা এর আগেও পরা বিদ্যা কাকে বলা হয় এই নিয়ে অনেক বিস্তৃত আলোচনা করেছি কিন্তু পরা বিদ্যা আসলে কি সেটা আমরা এখনও ধারণার মধ্যে আনতে পারিনি। এই জিনিষগুলো ধারণা করাটাই কঠিন। যে কোন বিদ্যাই হল কোন কিছুকে জানা, কিন্তু আত্মা হলেন স্বতঃসিদ্ধ, আত্মাকে জানার জন্য কোন বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। প্রমাণ করা মানে জ্ঞান, আত্মাকে জানার জন্য কোন জ্ঞানের দরকার পরে না। কিন্তু বিদ্যা, যেটাকে পরা বিদ্যা বলা হচ্ছে সেটা কিসের জন্য প্রয়োজন হয়? যে জ্ঞানটা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে আছে পরা বিদ্যা সেই অজ্ঞানটাকে নাশ করে দেয়। যে কোন বিদ্যাই হয় আমাকে আরও অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে নয়তো অজ্ঞানকে নাশ করে দেবে। অজ্ঞান যেটা দূরিভূত হচ্ছে সেটা একটু একটু করে কাটে না, যখন নাশ হবে তখন এক মুহুর্তেই নাশ হয়ে যাবে। যে মুহুর্তে এই অজ্ঞান নাশ হচ্ছে ঐ মুহুর্তটাই পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা কিন্তু আত্মজ্ঞান দেয় না, ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেনা।

গণিতবিদ্যা দিয়ে আমরা সংখ্যার জ্ঞান লাভ করি। একটি বাচ্চা ছেলেকে বলা হল পাশের ঘরে কটা চেয়ার আছে দেখে এস। বাচ্চাটি এসে বলল অনেকগুলো চেয়ার আছে। কিন্তু আমাকে যদি কটি চেয়ার আছে দেখে আসতে বলা হয়, আমি এক, দুই, তিন, চার গুণে গুণে এসে বললাম পাশের ঘরে সাতটি চেয়ার আছে। যে জ্ঞানের দ্বারা আমি বললাম এটি হল গণিতবিদ্যা। গণিতবিদ্যা পরিষ্কার করে আমাকে বলে দিচ্ছে এখানে এত গুলো চেয়ার এত গুলো মানুষ। গণিতবিদ্যা আমার একটা বিশেষ অজ্ঞানকে নিবারণ করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি আমাদের মধ্যে একটা বিশেষ অজ্ঞান আছে, যে অজ্ঞানবশতঃ আমরা এই বহুত্ব দেখছি। এই অজ্ঞানকে যে নাশ করছে সেটাই পরা বিদ্যা। আলাদা আলাদা ঘরের চেয়ার, মানুষের সংখ্যা জানার জন্য গণিতবিদ্যাকে বার বার প্রয়োগ করতে হবে। তাই না, গণিতবিদ্যাতে নানান জায়গায় প্রভেদ ধরা পড়বে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায় কোন প্রভেদ নেই, যেটা হবে সেটা মুহুর্তে হয়ে যাবে। ছেলের কলেজের ফাংশানে বাবা নাটক দেখতে গেছে, ছেলেও অভিনয় করছে। বাবা ধরতে পারছে না কোনটা তার ছেলে, হঠাৎ একজনের মুখে একটা সংলাপ শুনতেই বাবা বলছে 'ওইতো আমার ছেলে'। ছেলেকে চিনতে না পারার যে অজ্ঞানটা এতক্ষণ ছিল সেটাই পাল্টে গেল জ্ঞানে। এখন আর কোন সংশয় থাকবে না। পরা বিদ্যা ঠিক এইভাবে মুহুর্তে অজ্ঞানকে নিবারণ করে দেয়। হঠাৎ করে একটা মুহুর্তের মধ্যে এই অজ্ঞানটা নিবারণ হয় না।

গণিতবিদ্যা অর্জনের জন্য অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়, গণনা শিখতে হবে, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি অনেক শিখতে হবে, ঠিক তেমনি পরা বিদ্যা লাভের জন্য অনেক কিছু করতে হয়। গণনা শিখে নিয়ে আমি কিছু জিনিষকে গুণে নিচ্ছি। পরা বিদ্যা দিয়ে কি আমি ব্রহ্মকে জেনে নিচ্ছি? না, ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ, তিনিই আছেন। একটা বিশেষ অজ্ঞান আমাকে ঘিরে রেখেছিল সেই অজ্ঞানটা চলে গেল। এর অর্থ দাঁড়াল, ব্রহ্মবিদ্যার সাথে

ব্রহ্মের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মবিদ্যার কাজ হল মায়া নিবারণ। ব্রহ্মবিদ্যা বলা হচ্ছে বটে কিন্তু এর কাজ হল মায়া নিবারণ। পরা বিদ্যার কাজ অবিদ্যা নিবারণ। অবিদ্যা নিবারণ হলে বহু দেখার ভ্রমটা চলে যায়। ব্রহ্মই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই কিন্তু অবিদ্যার জন্য তাঁকে বহু রূপে দেখাচ্ছে। বহু দেখাটাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞানকে নিবারণ করা হল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ বহু দেখাটা থাকবে, কিন্তু যখন অবিদ্যা চলে যাবে তখন সেটা এক মুহূর্তে চলে যাবে। কিন্তু এর জন্য যে প্রস্তুতি নিতে হয় সেটা বিশাল। এই প্রস্তুতি আবার শুরু হয় অপরা বিদ্যা থেকে। তার জন্য আমাদের চারটে বেদকে জানতে হবে। গুরুর কাছে মন্ত্র নিতে হবে, সেই মন্ত্র জপ করে যাচ্ছি, সব অপরা বিদ্যার মধ্যেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যে বিদ্যা অজ্ঞানকে নিবারণ করবে সেটাই পরা বিদ্যা। গণিতবিদ্যা শিখতে হলে প্রথমে যোগ বিয়োগ শিখতে হবে, সেখান থেকে আরও অনেক দিন পর আমি কঠিন কঠিন অঙ্ক করতে শিখছে, তারপর বীজগণিত শিখছি, তারপর আরও অনেক দিন পর ক্যালকুলাস শিখছি। প্রথম দিনেই যদি বলি আমাকে ক্যালকুলাস শেখান, শেখান যায় না। ক্যালকুলাস শিখতে হলে ধাপে ধাপেই আসতে হবে। পরা বিদ্যার যে কাজ অজ্ঞান নিবারণ করা, সেটা এক সেকেণ্ডের কাজ। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতিটা বিশাল ও দীর্ঘকালীন। অপরা বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু তার প্রয়োগটা পুরোপুরি অন্য দিকে হয়।

পরা বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বোধে বোধ করা যায়, সেইজন্য এই বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। আর এই বিদ্যা সাধারণ মানুষের থেকে দূরে, সব কিছুর বাইরে তাই এই বিদ্যাকে পরা বিদ্যা বলা হয়। চিনি দিয়ে নানান খেলনা তৈরী করা হয়েছে, যাকে মঠ বলে। মঠ যেটা দেখছি সেটাও সত্য আর তার পেছনে যে চিনি আছে সেটাও সত্য। চিনিটাই সত্য। যে জ্ঞান আমাকে দেখিয়ে দেবে এগুলো চিনিই, তখন দেখবে সবটা একই জিনিষ। চিনি তো সব সময় সেখানে আছে আর চিনিই আছে কিন্তু তার মধ্যে কতকগুলো নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা হাতি, এটা ঘোড়া, এটা ইঁদুর – আর এর সবটার একটা সাধারণ নাম দিয়ে দেওয়া হল মঠ। এখানে মঠ দেখাটাই স্বাভাবিক, ওর মধ্যে চিনি দেখাটা অস্বাভাবিক। যখন চিনির জ্ঞান হয়ে যাবে তখন হাতি খাব, না ঘোড়া খাব এই তফাৎটা থাকবে না। বাচ্চাদের মধ্যে এই তফাৎটা থাকবে। একই জিনিষ নানান রূপে আসছে। এই যে এত নানান রূপে আসছে, এত লোক, এত প্রাণী, গ্লাশ, টেবিল, চেয়ার, জগৎ, ভালো, মন্দ, প্রিয়, অপ্রিয়, এই নানান দেখাটাই অজ্ঞানের কার্য। এর আসলটা এক, এই আসলটাকে দেখিয়ে দেয় পরা বিদ্যা। কিভাবে দেখায়? অজ্ঞান নিবারণ করে। পরা বিদ্যার কার্যই হল অজ্ঞান নিবারণ। ডাক্তারি বিদ্যা শিখে আমি অপারেশন করতেও পার নাও করতে পারি, আবার দশ রকমের অপারেশনও করতে পারি। কিন্তু পরা বিদ্যা সেভাবে হয় না। পরা বিদ্যার একটাই কাজ অজ্ঞান নিবারণ। একবারই করে আর ওটা চিরতরে নিবারণ হয়ে যায়। সেইজন্য এর উপমা নেওয়া হয় চিনির বা মাটির খেলনা বা সোনার গয়না দিয়ে। একবার যখন জেনে গেলে সোনা দিয়ে গয়না হয়, তখন সব গয়নাই সোনা।

পরা বিদ্যার মূল কথা হল অজ্ঞান নিবারণ। অজ্ঞান তো অনেক কিছুতেই থাকতে পারে, এই ঘরে কটি চেয়ার আছে জানিনা, এটাও অজ্ঞান। দাঁত কিভাবে ব্রাশ করতে হয় জানিনা, এটাও অজ্ঞান। এক একটা জিনিষ শিখে সেই অজ্ঞানটাকে দূর করা মানে এক একটা বিদ্যা। বিদ্যার শেষ নেই। যে কোন বিদ্যাকে উন্নত করা যায়, সংশোধন করা যায়। পরা বিদ্যাতে এগুলো হয় না। যার কাছে পরা বিদ্যা আছে, সেই বিদ্যাতে তার একবারই অজ্ঞানটা চিরতরে চলে যাবে। অজ্ঞান চলে যাওয়াতে সে চিনিও দেখবে মঠও দেখবে। কিন্তু মঠের খেলনার নানান রকম রূপে আর সে মুগ্ধ হবে না। খেলনার শিল্প, তার মেহনতের প্রশংসা করবে, বাহাবা দেবে কিন্তু জানে সব খেলনার মূল বস্তু সেই চিনি।

এর আগের মন্ত্রে সাকার ব্রহ্মের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, তারও আগের মন্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। এখন উপসংহারে অষ্টম মন্ত্রে বলছেন *যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্*, তিনি সর্বজ্ঞ, একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞ কে? আচার্য বলছেন – *সামান্যেন জানাতীতি সর্বজ্ঞঃ*, সামান্য রূপে যিনি সব কিছুকেই জানেন, সামান্য রূপে মানে in totality। পুরো জিনিষটাকেই তিনি জানেন, ভারতকেও জানেন,

আমেরিকাকেও জানে, চাঁদকেও জানেন আবার গ্যালাক্সিকেও জানেন আর যার জন্ম হয়নি তাকেও জানেন, যেটা চলে গেছে সেটাকেও জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শি। শুধু ত্রিকালদর্শি নন, যাবৎ যা কিছু হতে পারে সবটাই তিনি জানেন। তার সাথে তিনি সর্ববিদ্। আসলে বিদ্ আর জ্ঞান দুটোর একই অর্থ, জানা। যেমন জ্ঞানী আর বিদ্বান, এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যখন 'জ্ঞ' দিয়ে বলছে সেটার অর্থও জানা, আর বিদ্ ধাতুর অর্থও জানা। উপনিষদের মন্ত্রে কদাচিৎ কখন দেখা যায় ছন্দ পূরণ করার জন্য এই ধরণের একই শব্দের ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সচরাচর এই রকম করা হয় না। কখন সখন হলে আচার্য বলে দেন এই শব্দটা ছন্দ পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যদি ছন্দ পূরণ না করা হয়ে থাকে, তাহলে তার একটা বিশেষ অর্থ থাকবে। আমাদের মত সাধারণ কেউ যদি সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ লিখি তাহলে বলবে প্রতিশব্দ পায়নি তাই লিখেছে। উপনিষদে তা হয় না। উপনিষদে কোন শব্দকেই উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

আচার্যের মতে *সর্ববিদ্* এর অর্থ হচ্ছে *বিশেষেণ সর্বং বেত্তীতি সর্ববিৎ*, বিশেষ ভাবে জানা। একটা জিনিষকে সামগ্রিক ভাবে জানা আর একটা জিনিষকে বিশেষ ভাবে জানা। বিশেষ ভাবে জানা মানে একক ভাবে। আমি একজনকে ব্যক্তি রূপেও জানছি আর তাকে মানব প্রজাতি রূপেও জানছি। তিনি মানব প্রজাতিকে জানেন বিশেষ ভাবে আবার পুরো প্রাণী জগৎকে জানেন সামান্য রূপে। আবার প্রাণী জগৎকে জানেন বিশেষ রূপে আর পুরো সৃষ্টিকেই জানেন সামান্য রূপে। সামান্য রূপে জানা মানে in totality, আর বিশেষ রূপে মানে indivuduually। এই ঘরটা মাটির খেলনাতে ঠাসা, তিনি ঘরের সব খেলনাগুলোকে জানেন, কি কি ধরণের, কি কি আকারের খেলনা আছে সবটাই জানেন। দোকানে কোন মাল কিনতে গেলে প্রত্যেক মালের প্যাকের গায়ে বার কোড দেওয়া থাকে, বার কোডটা কম্প্যুটারে দিয়ে দিলেই বলে দেবে মালটা কোথায় তৈরী হয়েছে, কবে তৈরী হয়েছে, কত পরিমাণ তৈরী হয়েছে, কত বিক্রী হয়েছে, কত দাম, কত ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে, পুরো ছবিটা বেরিয়ে আসবে। আর এই মালটি কোন্ দোকান থেকে বিক্রী হচ্ছে, কবে বিক্রী হচ্ছে সব তথ্য দিয়ে দেবে। যিনি ব্রহ্ম তিনি পুরো সৃষ্টির ব্যাপারে সবটাই জানেন, সৃষ্টি থেকে শুরু করে সৃষ্টির পরে যা যা হবে, এর আগের সৃষ্টিতে যা কিছু হয়ে গেছে সব কিছুকে সামান্য ভাবে জানেন।

তার সঙ্গে তিনি বিশেষ রূপেও জানেন? কি করে তিনি individually জানেন? এটাই বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত। আমি যা কিছুই করি না কেন, আমি হাত নাড়ছি, মাথা ঘোরাচ্ছি, এর পেছনে আছে বুদ্ধি। এই বুদ্ধির পেছনে আছেন অন্তর্যামী, তিনিই চৈতন্য সত্তা। চৈতন্য সত্তা অন্তর্যামী রূপে ভেতরে আছেন বলেই সব কিছু করছি। ইনি হলেন দ্রষ্টা, আমার যা কিছু হচ্ছে তিনি তার সব কিছুই জানেন। আমার যিনি অন্তর্যামী তিনি হলেন আত্মা, যিনিই আত্মা তিনিই ঈশ্বরের সঙ্গে এক, যিনি ঈশ্বর তিনিই ব্রহ্ম। আমার ভেতরে যেমন চৈতন্য সত্তা আছেন, ঠিক তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতরেও সেই একই চৈতন্য সত্তা রয়েছেন। আর এর বাইরে সেই নির্গুণ নিরাকার শুধু তিনিই আছেন। এই তিনটিই এক। শুধু অজ্ঞানের জন্য আবরণ পড়ে আছে। এই আবরণের জন্য আমি একটা আবরণ, আপনি একটা আবরণ, জগৎ একটা আবরণ। সমস্ত আবরণের পেছনে আছেন চৈতন্য, চৈতন্যের কাজই হল জানা, চৈতন্যের কাজই হলে চালনা করা। সেইজন্য একদিকে তিনি *সর্বজ্ঞ*, কারণ ব্যক্তি থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে তিনিই আছেন, তাই তিনি সবটাই জানেন। আবার তিনি *সর্ববিদ্*, কারণ ব্যক্তির পেছনেও তিনিই আছেন।

তিনি আর কি? *যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ*। আমাদের কাছে তপস্যা হল কষ্টসাধ্য, যে কোন বস্তুকে প্রাপ্ত করার জন্য খুব কষ্ট করে খাটতে হয়, খাটা মানেই ভেতরে তাপ সৃষ্টি হওয়া। এই যে বলা হল *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, তপস্যা করে ব্রহ্ম বড় হলেন। তপস্যা মানেই পরিশ্রম, কিন্তু যিনি ব্রহ্ম তিনি পরিশ্রম করেন না। ব্রহ্মও তপস্যা করছেন কিন্তু তাতে আয়াস নেই, তাঁর তপস্যা নিরায়াস, কোন খাটনি নেই। তাহলে কিসের তপস্যা? বলছেন *জ্ঞানময়ং তপঃ*, তাঁর মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে, কি জ্ঞান? *সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্* এই যে জ্ঞান এটাই তাঁর তপস্যা। এর আগের মন্ত্রে একটু আভাস দেওয়া হয়েছে এখানে এসে সেটাই আরও পরিষ্কার করে বলছেন। এই ভুলটা যেন আমাদের মধ্যে না হয় যে, তিনি হলেন *সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্*, তাঁর হঠাৎ ইচ্ছা হল সৃষ্টি হোক, তখন

তিনি বাড়তে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি কোথায় বাড়তে শুরু করবেন, কেননা তাঁর বাইরে তো কিছুই নেই? অথচ বলছেন *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*। পুত্র কামনা যেমন মানুষের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি করে, সেই আনন্দের অনুভূতিতে সে ফুলে ওঠে। ঠিক সেই রকম তিনি যেন ফুলে ওঠেন, তাঁর যে আকার বৃদ্ধি হচ্ছে তা নয়, এটা একটা উপমা আনা হচ্ছে। বীজ যখন অঙ্কুরিত হচ্ছে, ছোলাকে যখন ভেজান হয়েছে তখন তার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হল, এখনও পুরো অঙ্কুরটা বেরিয়ে আসেনি, মাঝামাঝি অবস্থা – এই ধরণের উপমা থেকেই বিভিন্ন দর্শন বেরিয়ে আসে। কেউ বলবেন ইনি কালী, শক্তি এখান থেকেই শুরু হয়। কেউ বলবেন এটাই মায়া – এই ধরণের নানান রকমের দর্শনের জন্ম হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলো উপমা মাত্র।

যে জায়গাটায় ইচ্ছা হল, ঐ জায়গাতেই এসে গেলেন সগুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। অন্যান্য ধর্মে ইসলাম, খ্রীশ্চান, জুদাইজিম্, আমাদের মাধ্বাচার্য এদের ঈশ্বরের ধারণা এই জায়গা থেকে শুরু হয়। অদ্বৈত বেদান্ত এর থেকে আরেকটা ধাপ এগিয়ে যায় – *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম বড় হন। কি তপস্যা? *জ্ঞানময়ং তপঃ*, তাঁর যে জ্ঞান, সচ্চিদানন্দের যে চিৎ, এটাই তাঁর তপস্যা। তিনি সামগ্রিক ভাবে জানেন আবার বিশেষটাকেও জানেন। অবতার আর সাধকের মধ্যে এটাই তফাৎ, অবতার পুরো বইটাই পড়ে নেন, সাধক সেখানে একটা পাতাই পড়তে পারে। আমরা হলাম বিশেষ, বিশেষ একটা পরিভাষা, বইয়ের একটাই পাতা আমার কাছে খোলা কিন্তু অবতারের কাছে পুরো বইটাই উন্মুক্ত। জীবনটা হল একটা পুস্তক, অবতারের সামনে দাঁড়ালে তাঁর কাছে আমার ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সবটাই খোলা। নরেনকে দেখতেই ঠাকুর তাঁর পুরোটাই দেখতে পাচ্ছেন। নরেন যখন ঠাকুরকে দেখছেন তখন বিশেষ ভাবে জানছেন। কি রকম বিশেষ ভাবে? মশাই আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? বিশেষ ভাবে জানছেন। ঠাকুর পুরোটাই জানেই আবার বিশেষ ভাবেও জানেন। ভগবান মায়ার রাজ্যে এসে নিজের ইচ্ছায় আমাদের মতই আচরণ করছেন, ঈশ্বরকে সেটাও করতে হচ্ছে না। তিনি সব সময় পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই যে পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এটাই তাঁর তপস্যা। ভগবানের এই তপস্যাকে সাধারণ মানুষকে বলে বোঝান যায় না। আমরা যে এত কথা বলছি, একই কথা কতবার করে বলছি, এর কারণই হল আমরা বুঝতে পারিনা, শুনতে শুনতে যাতে একটু ধারণা করতে পারি তাই একই কথা বারবার বলতে হয়। এই যে বলা হয় ভগবান নারায়ণ ঋষি হয়ে বদ্রিকাশ্রমে তপস্যা করে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে তপস্যা করছেন তাঁরই অঙ্গ রূপে নরঋষি। যখন দরকার হয় তখন এই নর-নারায়ণ ঋষি মানব কল্যাণে নেমে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে নরঋষি হলেন অর্জুন। নরেনের সঙ্গে যখন ঠাকুরের দেখা হয়েছে তখন তিনি নরেনের সামনে হাত জোড় করে বলছেন 'আমি জানি আপনি সেই নরঋষি'। অথচ তিনি নিজেই নারায়ণ ঋষি। নর ও নারায়ণ অভিন্ন। শুধু পৌরানিক কাহিনী রূপেই যে আছে তা নয়, ঠাকুরও বলছেন আপনি সেই নরঋষি।

স্বামী প্রেমেশানন্দ একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর উপর অনেক গান রচনা করেছেন। তাঁর যখন কম বয়স ছিল তখন যাকেই পারতেন ধরে মায়ের কাছে দীক্ষার জন্য নিয়ে যেতেন। যখন তাঁর বয়স হয়েছে তখন তিনি বলতেন 'কি বোকাই তখন ছিলাম'! বয়স যত বাড়বে ঠাকুরের কথামৃত পড়তে পড়তে হতবাক হয়ে যেতে হয়। অনেক সুবক্তা বলেন 'আধ ঘন্টা যদি বক্তৃতা দিতে হয় তখন পনের মিনিট তো বলে দিই, তারপর কি বলব ভেবে পাইনা'। অথচ স্বামীজী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যাচ্ছেন কোথাও কোন পুনরাবৃত্তি নেই। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামীজীর রচনাবলী পড়তে শুরু করলেই হতবাক হয়ে যেতে হয়। সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ আর ঋষি না হলে এই কথাগুলো বেরোবে না।

ব্রহ্মকে নতুন করে কোন তপস্যা করতে হয় না, *জ্ঞানময়ং* এটাই তাঁর তপস্যা। জ্ঞান দিয়েই সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি ইচ্ছা করলেন আমি এক বহু হব, এটাই তাঁর তপস্যা। আমার আপনার ক্ষেত্রে হবে না। একটা বাড়ি করতে গেলে – আগে ইচ্ছা হতে হবে, তারপর টাকা জোগাড় করতে হবে, জমি কিনতে হবে, তারপর ইট, বালি, সিমেন্ট কিনতে হবে, নক্সা বানাতে হবে, মিউনিস্যাপালিটি থেকে অনুমতি নিতে হব, এত কিছু করতে হবে। তাঁর ক্ষেত্রে এসব করতে হয় না, *জ্ঞানময়ং*। বাড়ি করার ক্ষেত্রে এটাও তপস্যা আর তিনি যেটা

করছেন সেটা তাঁরও তপস্যা। তফাৎ হল আমাদের ক্ষেত্রে পরিশ্রম আছে, খাটতে হচ্ছে কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে কোন খাটনি থাকে না। ঠাকুর বলছেন ভক্ত হল রাজার ব্যাটা, তার মাসে মাসে মাসোয়ারা আপনা থেকেই এসে যায়। এটাকেই গীতায় বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, আমার ভক্তের যা কিছু দরকার আমি নিজেই বহন করে নিয়ে আসি। ঠাকুর একই কথা বলছেন কিন্তু গীতায় অন্য ভাবে ও অন্য ভাষায় বলছেন। তাহলে আপামর সাধারণ মানুষকে কে সব কিছু জোটাচ্ছেন? সেটাও ভগবান জোটাচ্ছেন কিন্তু খাটিয়ে নেন। ভক্তের অনায়াসে আসে, তাঁকে খাটতে হয় না। কিন্তু যারা অভক্ত তাদের খাটিয়ে নেন। তাকে চাকরি করতে হবে, মজুরি করতে হবে। তপস্যা দুটোই, একটাতে আয়াস আছে আরেকটাতে আয়াস নেই। *জ্ঞানময়ং*, জ্ঞানটাই তাঁর তপস্যা।

এই রকম যখন তপস্যা হয় তখন কি হয়? *তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম*, সেখান থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়! এই জায়গাতে এসে দ্বৈতবাদীরা বিশেষ করে মাধ্বাচার্যরা ঝাঁপিয়ে পড়বে – দেখ! এই ব্রহ্মের কে জন্ম দিচ্ছেন? মা কালী। এই ব্রহ্মের কে জন্ম দেন? শ্রীকৃষ্ণ। যাঁরা গোঁড়া বৈষ্ণব তাঁরা উপনিষদের এই মন্ত্র দেখিয়ে বলবে এই দেখ, ব্রহ্মের কে জন্ম দেয়? *তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মের জন্ম হয়। যুক্তিতে কোন ভুল নেই, উপনিষদেই বলা হচ্ছে। কিন্তু আচার্য কি বলছেন? না, এটা হল কার্য ব্রহ্ম। আগে যে ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন কারণ ব্রহ্ম, আগে যেটা বলা হয়েছে সেটা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। এখানে সগুণ সাকার ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে। আচার্যের ভাষ্য নিয়ে উপনিষদ না পড়লে পুরো দর্শন ওলট-পালট হয়ে যাবে। আমাদের যদি শাস্ত্র পুরো ঠিক ঠিক অধ্যয়ণ না করা থাকে তাহলে যে কোন তুখোড় পণ্ডিত আমাদের এই কথাকে কেটে উড়িয়ে দেবে।

স্বামী ভূতেশানন্দজী গুজরাতে থাকাকালীন একবার তাঁকে একটা সভাতে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে পরবর্তি কালের একজন নামকরা খুব বড় ধর্মীয় নেতা প্রধান বক্তা ছিলেন। তখনও তাঁর সেই রকম নামডাক হয়নি। তিনি তাঁর ভাষণে শাস্ত্রের এই ধরণের অনেক ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিলেন। ভূতেশানন্দজী বিরাট বড় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন, শাস্ত্রের এই সব ব্যাখ্যা শুনে চমকে উঠেছেন। মহারাজ তারপর একটা কাগজ নিয়ে তাতে এক দুই করে সব পয়েন্ট গুলো নোট করতে থাকলেন। সভাপতির ভাষণের জন্য ভূতেশানন্দজীকে আহ্বাণ করা হয়েছে। তখন তিনি শুরুতেই আরম্ভ করলেন ‘আমাদের প্রধান বক্তা অনেকগুলো কথা উপনিষদ থেকে বলেছেন আর এইভাবে তিনি সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। জিনিষটা কিন্তু তা নয়’। এরপর তিনি একটা একটা করে পয়েন্ট ধরে ধরে উপনিষদে কি পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলা হয়েছে, এর প্রকৃত অর্থ কি সব পরিষ্কার করে বলতে শুরু করলেন। প্রধান বক্তার পুরো বক্তব্যটাকে তিনি কেটে উড়িয়ে দিলেন।

উপনিষদের এটাই সমস্যা, উপনিষদ হল সম্প্রদায় বিদ্যা, এই সম্প্রদায় বিদ্যাকে যতক্ষণ উপযুক্ত আচার্যের কাছে বিধি সম্মত ভাবে অধ্যয়ণ না করা হয় উপনিষদের সব মন্ত্রের অর্থে গোলমাল হয়ে যাবে। *তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম*, এখানে যে ব্রহ্মের জন্ম হল, তিনি হলেন কার্য ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ বা বলা যায় ব্রহ্মার জন্ম হল বা সগুণ ঈশ্বর। এনাকে আমি হিরণ্যগর্ভ বলব, না কার্য ব্রহ্ম বলব, না ব্রহ্মা বলব, না সগুণ ঈশ্বর বলব, এটা যার যার ব্যাপার। যদি কেউ বলেন *তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মের* এই অর্থ আমি কেন এই ভাবে নেব? যদি এই অর্থ না নেওয়া হয় তাহলে উপনিষদের অন্যান্য মন্ত্রের অর্থের সাথে মেলান যাবে না। যেখানে যেখানে উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু হয় না, সেখানে গিয়ে এই অর্থকে আর মেলান যাবে না। এই আপাত বিরোধকে সামঞ্জস্য করার জন্য আচার্য মন্ত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা ঠিক ঠিক অর্থ করে মিলিয়ে দেন – এই যে এখানে ব্রহ্ম শব্দ আছে এই ব্রহ্ম আসলে হলেন ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। তাহলে ব্রহ্ম কেন বলা হল? হ্যাঁ, এও ব্রহ্ম কিন্তু কার্য ব্রহ্ম। এর আগের ব্রহ্ম হলে কারণ ব্রহ্ম। সবটাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বাইরে কিছু নেই। এই কার্য ব্রহ্ম থেকে তখন কি হচ্ছে? নাম, রূপ আর অন্নম্ এর জন্ম নেয়। আট নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছিল *ততোঽন্নমভিজায়তে*, তখন অন্ন মানে বলা হয়েছিল অব্যাকৃত প্রকৃতি। কিন্তু নয় নম্বর মন্ত্রে যে অন্নম্ এর কথা বলা হচ্ছে এই অন্ন হল চাল,

গম, ডাল ইত্যাদি। এবার বুঝুন এই অর্থ সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষমতা কোথায়! এই কারণেই ভাষ্যের দরকার হয়। গুরু ছাড়া উপনিষদ অধ্যয়ণ করা একবারেই অসম্ভব।

নাম রূপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন – *কিঞ্চ নাম অসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ ইত্যাদিলক্ষণম্*। এই কার্য ব্রহ্ম থেকে জন্ম নেয় দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি নামধারী ব্যক্তি বিশেষ। কার্য ব্রহ্ম থেকে আর কি জন্ম নিচ্ছে? *রূপম্ ইদং শুক্লং নীলমিত্যাদি* – বিভিন্ন রূপ, কোনটা সাদা রঙ, কোনটা নীল রঙ। আর অন্নম্ চাল, ডাল, গম। আচার্য যদি এই ভাবে ব্যাখ্যা না করেন তা নাহলে অর্থ যুক্তিপূর্ণ হবে না। অন্ন মানে যেটা ভোগ করা হয়। যার সৃষ্টি হয়েছে তার ভোগের জন্য উপকরণ দরকার। আট নম্বর মন্ত্রেও যে অন্ন বলা হয়েছে তার অর্থ অব্যাকৃত প্রকৃতি, পুরুষ যেটাকে ভোগ করেন, পুরুষ মানে আত্মা। এই পুরুষ আর প্রকৃতির এই ধারণাকে নিয়ে আবার যোগ এগিয়ে গেছে। যোগ দর্শন বলছে পুরুষ আর প্রকৃতি সব সময় চিরন্তন। এই সব মন্ত্র থেকেই আলাদা আলাদা দর্শনের জন্ম হয়। যাঁর ভেতরে খুব গভীর প্রজ্ঞা আছে, তিনিও যদি চান এদের মত একটা নতুন দর্শন দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এখানে সমস্যা যেটা হবে সেটা হল, অন্য জায়গায় যে অন্য রকম কথা আছে তার সাথে তাঁর দর্শনকে মেলাতে পারবেন না।

ভারতে এই ধরণের অনেক বাবাজী নতুন নতুন দর্শন নিয়ে হাজির হচ্ছেন, সেখানে তাঁরা উপনিষদের কথাই বলছেন। কিন্তু এই সর্বজ্ঞ আর সর্ববিদ্ এর অর্থ করতে গিয়ে এনারা অংশটাকে মিলিয়ে দেবেন কিন্তু in totalityতে যখন যাবেন তখন আর মেলাতে পারবেন না। আমরাও অংশটাকে বুঝে নেব কিন্তু সামগ্রিক ব্যাপারটা ধরতে পারব না। সংস্কৃত একটু জানা থাকলে মন্ত্রের অর্থ করে দেওয়া যাবে, কিন্তু যদি বলা হয় আগের মন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য করে দিন, তখন আর তার ক্ষমতায় কুলাবে না। রামানুজম, মাধ্বাচার্য মন্ত্রের শব্দ নিয়ে এমন ভাবে খেলা করবেন, ব্যাকরণের নিয়মগুলো এমন ভাবে দাঁড় করাবেন সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারবে না কি বলতে চাইছেন। কিন্তু আচার্য এই ব্যাপারে একেবারে পরিষ্কার, তিনি শব্দ দিয়ে বাক্যজালও তৈরী করতে যাবেন না, আর ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে গোঁজামিল দেবেন না, তাঁর কাছে একটাই কথা নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। এই নির্গুণ ব্রহ্ম থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি।

এখানে আবার একটা জিনিষ আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে – এই উৎপত্তিকে যদি আমি সত্য বলে মনে করি তাহলে বেদান্তের দিক থেকে অনেক সমস্যা এসে যাবে। কারণ সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই তাহলে সৃষ্টি হবেটা কোথায়। স্বামীজী এর একটা খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন। আমেরিকাতে একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করছে পৃথিবীটা পড়ে যায় না কেন। বাচ্চা মেয়েটা পাল্টা জিজ্ঞেস করছে পড়ে যাবেটা কোথায়? সেতো পৃথিবী ছাড়া আর কিছু দেখছে না, তাই পৃথিবীটা পড়ে যাবেটা কোথায়। সচ্চিদানন্দের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। সৃষ্টি একটা হবে বুঝলাম, কিন্তু হবেটা কোথায়? কোন্ জায়গাটাতে সৃষ্টিটা হবে? কারণ সচ্চিদানন্দের বাইরে কিছু নেই কিনা। সেইজন্য বেদান্ত বলছে এটাই হল মায়া, নাম ও রূপের খেলা। যেখানে *জায়তে* বলছেন এটা বাস্তবিক জন্ম নয়, এটাই মায়া। সেইজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে সৎকার্যবাদ। এটা পরিণামবাদ নয়, দুধ থেকে যেমন দই হয় এই সৃষ্টিটা সেই ভাবে হয় না। মাটি থেকে যেমন নানা রকমের খেলনা তৈরী হয়, সৃষ্টিটা সেই রকম। জিনিষটা মাটি কিন্তু মাটির নাম, রূপ ও রঙ সব পাল্টে যাচ্ছে।

এই নয় নম্বর মন্ত্রের সাথে আট নম্বর মন্ত্রের কোন পার্থক্য নেই। অক্ষর ব্রহ্ম থেকেই কার্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয়। এইভাবে নয় নম্বর মন্ত্রের অর্থ করতে হবে। এই ভাবে ব্যাখ্যা না করা হলে দুটি মন্ত্রের মধ্যে বিরোধ এসে যাবে। আচার্যও তাই এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আর এটাই সঠিক অর্থ। আমাদের ভাষায় খুব সংক্ষেপে মূল কথা হল, ব্রহ্মই আছেন। তিনিই আছেন, তিনিই আনন্দময়, তিনিই জ্ঞানময় – তাই তিনি সচ্চিদানন্দ। এই জ্ঞানময় যেটা এটাই তাঁর তপস্যা। তাঁর মনে মনেই সব সৃষ্টি হবে। তিনিই নানান রূপ ধারণ করে নেন। তিনি যখন নানান রূপ ধারণ করেন, তখন এই রূপ ধারণ করাটাও পুরো একটা নির্দিষ্ট নিয়মেই হবে। বাচ্চা ছেলে বেড়াল আঁকল কিন্তু তার ঠ্যাংটা আঁকল না, কিংবা একটা কুকুর এঁকেছে, তার মুণ্ডুটাই আছে

আর কিছু নেই। ব্রহ্মের সৃষ্টি এভাবে হবে না, পুরো একটা বিজ্ঞানসম্মত নিয়মের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সৃষ্টি এগিয়ে চলবে। কি সেই বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম? প্রথমে আসবেন প্রকৃতি। প্রকৃতি বলতে এখানে মায়াকেই বোঝাচ্ছেন। প্রকৃতি থেকে কার্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ থেকে এবার পর পর আসতে থাকবে – মন, পঞ্চ মহাভূত ইত্যাদি। এই আট নম্বর মন্ত্র থেকে পরের মন্ত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন *নাম-রূপমন্নং চ জায়তে*। এই যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডে নানান রকমের বৈচিত্র্য দেখছি এগুলো কিভাবে হচ্ছে? প্রথমে নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম থেকে এই সৃষ্টি হচ্ছে।

নয় নম্বর মন্ত্র অত্যন্ত কঠিন একটি মন্ত্র। এখানে বলছেন *তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম*, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্, যিনি জ্ঞানময়, তাঁর থেকে ব্রহ্মের সৃষ্টি হল আর নাম-রূপের জন্ম হল। এখানে কিন্তু সৃষ্টির ব্যাখ্যা নেই। সৃষ্টির ব্যাখ্যার ব্যাপারে উপনিষদ নীরব। পৌরানিক ঋষিরা এই জায়গায় এসে ঢুকে পড়েন আর সৃষ্টির বিচিত্র বিচিত্র ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। কিন্তু উপনিষদের বক্তব্যকে তাঁরাও কখন বিরোধিতা করবেন না। উপনিষদে শুধু সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ ব্রহ্মের কথাই বলা হয়েছে। ছয় নম্বর মন্ত্রে যেটা বলা হয়েছে এটাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সেই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে কার্যব্রহ্মের জন্ম হয়। সেই কার্যব্রহ্ম থেকে আট নম্বর মন্ত্রে বলে দিচ্ছেন কিভাবে পর পর সৃষ্টিটা হয়। সেখান থেকে আরও যখন সৃষ্টিটা এগিয়ে চলে তখন দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত এই নামধারী ব্যক্তির জন্ম হল, লাল-নীল রঙ এসে গেল আর ভোগের যত রকমের উপকরণ হতে পারে সব কিছুর সৃষ্টি হয়ে গেল। যজ্ঞদত্ত দেবদত্ত এগুলো আচার্যের খুব প্রচলিত নাম। এই নামগুলো তিনি উপমার সময় ব্যবহার করেন। দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত এদের কে সৃষ্টি করেছেন? ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। লাল-নীল যত রঙ? ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। ধান, গম? এও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। এবার সৃষ্টি পুরোদমে বেরিয়ে এল। পরা বিদ্যার যখন সাধন হয় তখন সে দেখতে পায় সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, যাঁর স্বরূপ হল *যত্তদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রবর্ণম্*। তিনি কি তাহলে ঠুঁটো জগন্নাথ? তা নয়, সৃষ্টিটা তাঁরই আর তাঁর মধ্যেই সৃষ্টি এই পদ্ধতিতেই হয়।

প্রথম মুণ্ডকে হাল্কা করে বলে দেওয়া হল অপরা বিদ্যা কি আর পরা বিদ্যা কি। এরপর বেদের চারটি যে অংশ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ – এগুলোকে সংক্ষেপে বলা হবে। বেদের কাজ হল যজ্ঞ করা তাই চারটি বেদেরই প্রধাণ অঙ্গ হল মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। মন্ত্র অংশে বলা হয়েছে কি কি মন্ত্র কোন্ কোন্ যজ্ঞে ব্যবহার করা হবে আর ব্রাহ্মণ অংশে বলা হয় কিভাবে এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে হবে। আরণ্যকে এসে এই যজ্ঞই মানসিক ভাবে করা হয়। আর উপনিষদ পুরোপুরি আত্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে।

মুণ্ডক উপনিষদের কাছে সমস্যা হল – কোনটা জানলে সব কিছুকে জানা যায়। সরাসরি এর উত্তর না দিয়ে ঋষি বললেন জগতে জানার মত দুটো বিদ্যা আছে। প্রথমে পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যার কথা বললেন। অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা কি বলে দেওয়ার পর বলবেন তুমি অপরা বিদ্যাটাকে জেনে নিয়ে ফেলে দাও, তা নাহলে ব্রহ্মবিদ্যার রহস্যকে ভেদ করতে পারবে না। শৌনক মুনিকে এখানে বিশেষণ দিয়ে বলা হচ্ছে তিনি মহাশালো, মহাশাল মানে তিনি বিরাট বড় গৃহস্থ ছিলেন বা তাঁর বিরাট পাঠশালা ছিল। তিনি হয়ত তখনকার দিনে কোন বিশ্ববিদ্যালয় চালাতেন। শৌনক মুনি সারা জীবন যজ্ঞ-যাগ করে এসেছেন। এরপর তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি অঙ্গিরসের কাছে শিক্ষার জন্য গেছেন। প্রথমেই শৌনক পরা বিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তখন শৌনক মুনিকে গুরু বলে দিলেন তুমি এতদিন যা কিছু শিখেছ সব বেকার। কোন যুক্তিবাদী এসে যদি বলে আপনাদের এই ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্যা এগুলো সব কাল্পনিক। তখন আমিও বলতে পারি, যে মন বুদ্ধি দিয়ে আপনি অধ্যাত্মবিদ্যাকে কাল্পনিক বলছেন সেই মন বুদ্ধি দিয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনাগুলোকেও তো কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। বুদ্ধি তো সেই একই। যে বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে আফিং বলছে সেই বুদ্ধি দিয়ে এই জগৎকেও তো কল্পনা বলা যায়, টাকা-পয়সা সেটাও কাল্পনিক। অঙ্গিরসও শৌনককে বলে দিলেন তুমি এতদিন যা কিছু করেছ এগুলো সব ফালতু। কিন্তু তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, শুধু বলে দিলেই তো হবে না। এই যে এতদিন ধরে শৌনক মুনি অপরা বিদ্যার সাধন করে এসেছেন, জীবনে এই অপরা বিদ্যা কি ভূমিকা পালন করে এটাকে এবার দ্বিতীয় মুণ্ডকে ব্যাখ্যা করা হবে। তুমি যে এতদিন যত যজ্ঞ-যাগ করেছ এগুলো

আসলে কি এবং কোথায় এর ব্যর্থতা, এই ব্যাপারে আমি তোমাকে এবার সব বলব। ছয় থেকে নয় নম্বর পর্যন্ত পরা বিদ্যা দিয়ে কি জানা যায়, যাঁকে জানা যায় তাঁর কি লক্ষণ, তাঁর কি কার্য এই সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা হল। তার আগের মন্ত্রে অর্থাৎ পাঁচ নম্বর মন্ত্রে বলা হল অপরা বিদ্যা কোন গুলো, যেমন *তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহর্থববেদঃ*। পাঁচ ও ছয় নম্বর মন্ত্রে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে এই এই অপরা বিদ্যা আর এটা পরা বিদ্যা। শুধু চারটে বেদকেই অপরা বিদ্যা বলছেন তা নয়, বেদের যত অঙ্গ, যাকে বেদাঙ্গ বলা হচ্ছে তাকেও অপরা বিদ্যা বলে দিলেন।

এখন দ্বিতীয় খণ্ডে এসে বলছেন অপরা বিদ্যার বিষয় হল সংসার। যে কোন বিদ্যা, যে বিদ্যা আমাকে সংসারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে সেটাই অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যার বিষয় হল মোক্ষ, মানে আত্মজ্ঞান। সংসার কি, মুক্তি কি, এর যে বিবেক, এটাই এখন শুরু করতে যাচ্ছেন। এই সংসার হল হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত, ব্রহ্মা অবধি এই সংসার। বেদান্তের দিক দিয়ে বৈকুণ্ঠধামও সংসারের মধ্যে। নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া আর সবটাই সংসার। প্রকৃতির এলাকায় যা কিছু আছে সবটাই সংসার। মোক্ষ হল ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানেরও চূড়ান্ত শর্ত থাকে – সংশয়-বিপর্যয় রহিত ব্রহ্মজ্ঞান হল মোক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান মানে একত্ব জ্ঞান, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। উপনিষদ থেকে, আচার্যের মুখ থেকে বা শাস্ত্রাদি থেকে আমরা কতবার পড়ছি শুনছি যে ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই, ঈশ্বরবই আর কিছু নেই। এই তো আমার জ্ঞান হয়ে গেল। না, পড়া বা শোনার পরেও আমাদের সংশয় থেকে যাচ্ছে, বিপর্যয়ও থেকে যাচ্ছে।

কথামৃতে ঠাকুর এতবার বলছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, উপনিষদে কতবার পাঠ করছি *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বহু দেখছি, এই জগৎ দেখছি, দেখছি নারী-পুরুষের বিভেদ, দেখছি জীবনে আমার একটা লক্ষ্য আছে, সেটাকে কিভাবে পাওয়া যাবে তার জন্য উঠে-পড়ে লাগছি – এটাই বিপর্যয়। জিনিষটা আছে কিন্তু বিপরীত দেখাচ্ছে, বেদান্তে এটাকেই বলছে রজ্জুতে সর্প ভ্রম। একটা দড়ি পড়ে আছে কিন্তু জ্ঞান পরিষ্কার নেই বলে দড়িকে সাপ দেখাচ্ছে। ব্রহ্মকে আমরা সবাই দেখছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন মানুষ তার সন্তানকে সন্তানের জন্য ভালোবাসে না, সন্তানের মধ্যে নিজের আত্মার ছবি দেখে তাই সন্তানকে এত ভালোবাসে। কোন পুরুষ নিজের স্ত্রীকে সেইজন্য ভালোবাসে না যে সে তার স্ত্রী, স্ত্রীর মধ্যে নিজেরই আত্মার প্রতিবিম্ব দেখে। কোন মানুষ সোনা-গয়নাকে সেইজন্যই ভালোবাসে না যে এগুলো অমূল্য বস্তু, সোনাকে ভালোবাসে কারণ সোনার মধ্যে নিজেরই আত্মার ছবি দেখে। জগতের এই বিষয়গুলোর কোন মূল্যই নেই।

আজকাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কত রকমের পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে, কত রকমের কোর্স আসছে কিন্তু ম্যানেজমেন্টের শেষ কথা হচ্ছে Self Actualisation যেখানে নিজের প্রকৃত রূপটা বেরিয়ে আসছে। সবাই জীবনে বড় হতে চাইছে, আমার প্রমোশন হোক, আমার আরও নাম-যশ হোক, আমার আরও টাকা-পয়সা হোক। এর মধ্যে শুধু যে ক্ষমতার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে তা নয়, ওখানেও নিজের আত্মার ছবিকে দেখছে। আত্মার স্বভাব হল নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত, আত্মার কোন বাঁধন নেই। তাই কোন মানুষ যখনই দেখে আমাকে কারুর অধীনে কাজ করতে হচ্ছে, কারুর কথা মত আমাকে ওঠা-বসা করতে হচ্ছে, আমি পরাধীন, তখন তার ভেতরে অজান্তেই একটা ছটফটানির ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন সে চায় আমি যেন আরও বড় হয়ে যাই। আমরা যে সব সময় মনে করি মানুষ মাত্রই ক্ষমতালোভী, আসলে ক্ষমতা লোভের জন্য এই জিনিষ হয় না, আত্মার স্বাভাবিক স্বভাবের জন্য সে নিজেকে বিস্তার করতে চাইছে। স্বামীজী আমাদের দেশবাসীকে প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে বলতেন, সব তমোগুণীতে দেশ ভরে গেছে, কিছু না করে শুধু দোহাই দিয়ে যাবে ঠাকুরের ইচ্ছে হলে হবে। ঠাকুরের ইচ্ছে বলে কি কিছু হয়! সব তো তোমারই ইচ্ছা। তোমার ভেতরে যে আত্মার অনন্ত শক্তি আছে সেটাকে প্রকাশ কর। তার জন্য আমাকে কি হতে হবে? আমাকে বড় হতে হবে। বড় তো অসুররাও হয়। অসুরদের মত বড় হওয়া নয়, তার সাথে আত্মার যে অন্যান্য গুণগুলো রয়েছে, যেমন অপরকে নিজের মতই দেখবে, এই গুণকেও বড় করতে হবে। মানুষের মধ্যে ভালোবাসা আছে, কিন্তু সেই ভালোবাসা

নিজের সন্তানের প্রতি, নিজের স্ত্রীর প্রতি, নিজের সম্পদের প্রতি। এই ভালোবাসার পরিধিটা যখন আরও বিস্তার হতে শুরু হয় তখন আত্মার প্রকাশ আরও বেশী হতে থাকবে। তা না হয়ে এর বিপরীত অনাত্মার প্রকাশ হচ্ছে। জীবনের উদ্দেশ্য হল আত্মার প্রকাশ, সেইজন্য বলে *যোগৈ ভূমাঃ তৎ সুখম্*। তাই জগতের যে কোন কিছুতে বড় হওয়াতেই মানুষ আনন্দ পায়, প্রমোশন হলে আনন্দ পায়, সন্তান হলে মানুষ আনন্দ পায়।

কিন্তু এই আনন্দের সমস্যা কোথায়? ভালোবাসাটা আমার স্ত্রীর প্রতিই আটকে আছে, আমার নিজের টাকার প্রতিই আনন্দটা আবদ্ধ হয়ে আছে। পাশের বাড়ির লোকের শ্রী বৃদ্ধিতে আমার আনন্দ হচ্ছে না। এটাই হল বিপর্যয়। আমার নিজের কাছে যখন টাকা থাকছে তখন আনন্দ হচ্ছে। এই যে নিজেকে সীমিত করে দিচ্ছে, ব্রহ্মকে ভালোবাসার পরিবর্তে ব্রহ্মের উপর যেটা আরোপিত এই জগৎ, সেটাকেই ভালোবাসছে – এটাই বিপর্যয়। নাম-রূপের খেলাটাকেই ভালোবাসছে। আরেকটা হল সংশয়। একটা জিনিষের ব্যাপারে আমি শুনেছি কিন্তু যতক্ষণ সাক্ষাৎ অনুভূতি না হয় সেই জিনিষের ব্যাপারে একটু না একটু সংশয় থাকবে। স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) একজন মহাপুরুষ ছিলেন, আবার তিনি খুব বুদ্ধিমানও ছিলেন। একবার একজন ব্রহ্মচারী নতুন জয়েন করার পর একদিন ভরত মহারাজকে এসে বলছেন 'মহারাজ আমার কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে'। ভরত মহারাজ বলছেন 'ব্রহ্মজ্ঞান তোমার যখন হয়ে গেছে সেতো খুবই ভালো খবর। কিন্তু এতে কি তোমার একটুও সন্দেহ আছে'? 'না, একটুও সন্দেহ নেই'। 'এই এতটুকুও কি সন্দেহ আছে'? এইভাবে ভরত মহারাজ কয়েকবার বলাতে শেষে ব্রহ্মচারী মহারাজ বলছেন 'অল্প একটু সন্দেহ থাকলেও থাকতে পারে'। ভরত মহারাজ তখন বলছেন 'দূর হ ব্যাটা এখান থেকে'। কারণ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হল সংশয়রহিত। আমরা যতই শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে থাকি না কেন, যতই জ্ঞান বিচার, ধ্যান জপ করি না কেন, কোথাও একটা সংশয় থেকে যায়। সংশয় কিসে যায়? প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে, যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে যায় তখন সংশয় পুরোপুরি চলে যায়।

পরা বিদ্যা প্রথমে বিপর্যয়টাকে নাশ করে। বিপর্যয় নাশটা বিচার দিয়েও করে নেওয়া যায়। বিপর্যয় মানে বিপরীতে জ্ঞান। শাস্ত্র চর্চা, জপ-ধ্যান দিয়ে বিপর্যয়টা দূর করা যায়। কিন্তু সংশয়টা অল্প একটু থেকে যাবে। সেইজন্য ঠাকুর জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীর তুলনা আনছেন। বিজ্ঞানী তিনিই যিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করে নিয়েছেন, তাঁর কাছে সংশয় বলে কিছু থাকবে না। অপরা বিদ্যার দ্বারা এই জগতের যত রকম জ্ঞান আছে সবটাই পাওয়া যাবে, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এটাকেই বলছেন Doing। আর পরা বিদ্যাকে বলছেন Being মানে হওয়া, যা আছি তাই। যা কিছু করার মধ্যে থাকবে, চিন্তা-ভাবনা করা, জপ করা, ধ্যান করা সব অপরা বিদ্যা। তাই বলে জপ করা, ধ্যান করা ছেড়ে দিতে হবে না, কারণ ঐখান থেকেই পরা বিদ্যাতে নিয়ে যাবে। পরা বিদ্যা মানে আমি যা আছি তাই আছি। কি আছি সেটা আবার মুখে বলা যাবে না, মুখে যেই বলে দেব সেটা আবার অপরা বিদ্যাতে চলে যাবে।

আচার্য এখানে এই ব্যাপারে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বিরাট বড় দার্শনিক ছিলেন ঠিকই কিন্তু একজন বড় কবিও ছিলেন। অপরা বিদ্যাটা কি রকম? *তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কর্ত্রাদিসাধনক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোহনাদিরনন্তো দুঃখ-স্বরূপত্বাদ্ধাতব্যঃ প্রত্যেকং সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদ-বিচ্ছেদরূপসম্বন্ধঃ*। অপরা বিদ্যার বিষয় হল সংসার। যে কোন কর্মের নয়টি অঙ্গ – কারকের সাতটি বিভক্তি ও তার সাথে ক্রিয়া আর কর্মফল। অপরা বিদ্যার মধ্যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, কর্মফলাদি ইত্যাদি নয়টি কর্মের অঙ্গ অনাদি অনন্ত, নদীর সাথে নদীর প্রবাহের যেমন অনন্তকাল ধরে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, অপরা বিদ্যার সাথে এই নয়টির ঠিক সেই রকম অনন্তকাল অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। অপরা বিদ্যার যে বিষয়, সেই সংসার কোন দিন শেষ হবে না, অনাদি অনন্ত কাল ধরে প্রবাহিত হয়েই চলেছে। অপরা বিদ্যার সম্বন্ধ কর্মের সাথে। সংসার আছে বলেই কর্ম আছে, কর্ম আছে বলেই সংসার আছে। সংসারটা কি? অনন্ত দুঃখ স্বরূপ, সংসারের চরিত্র হল অনন্ত দুঃখ। ঠাকুর বলছেন যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই বলে তার স্ত্রী খুব ভালো। সবাই নিজের স্ত্রীর সুখ্যাতি করে। যার সঙ্গেই কথা বলা যাবে, দু-মিনিট কথা বলার পরই বোঝা যায় তার কষ্টের শেষ নেই। ঠাকুর বলছেন – মা বলে, ছেলেটা সারাদিন

খেটেখুটে তেতেপুরে আসে বিয়ে দিলে একটা গাছের ছায়া পাবে। কিন্তু ঐ ছায়াটাই যে একটা সুপ্ত আগুন সেটা প্রথমে বুঝতে পারেনা। আচার্য সেটাই বলছেন এই সংসার অনন্ত দুঃখ স্বরূপ। যদি বিয়ে থা নাও করে, সন্ন্যাসীও যদি হয়ে যায় বা অবিবাহিতই থেকে যায়, কিন্তু সংসারের সাথে একটু সম্পর্ক যদি থেকে যায় তারও জীবন অনন্ত দুঃখ সাগরে হাবুডুবু খাবেই। যেখানেই আমাকে কর্ম করতে হচ্ছে সেখানেই অনন্ত দুঃখ হবেই। আচার্য বলছেন সেইজন্য দেহধারী মাত্রকেই সর্বথা ত্যাজ্যঃ। কি ত্যাজ্য? দুঃখ ত্যাগ করা, মানে সংসার ত্যাগ। সংসার ত্যাগ মানে কর্ম ত্যাগ, সহজ যুক্তি। অথচ সবাই চাইছে দুঃখকে ত্যাগ করতে। সংসারে থাকলে অনন্ত দুঃখ থাকবে। তাহলে সংসার ত্যাগ করা মানে কি আত্মহত্যা করা? তাড়াতাড়ি মরে যাওয়া? না, কারণ মরে গেলে এই জগৎ থেকে আমি আরেকটা জগতে যাব। কর্ম ত্যাগ। কর্ম ত্যাগ মানে কি আলস্য করে শুয়ে বসে দিন কাটান? না, তাও নয়। আলস্য থাকলে তো সংসার ত্যাগ হচ্ছে না। শুভকর্ম করলে তাও স্বর্গে যেতে পারব, একটু সুখে থাকা যাবে, কিন্তু আলস্য করলে আরও নীচের দিকে যাব। কিন্তু এখানে কর্ম ত্যাগ মানে, মানুষের যখন আত্মজ্ঞান হয় তখনই কর্ম ত্যাগ সম্ভব হয়।

আমাদের যাঁরা শাস্ত্র রচনা করেন প্রথমে তাঁরা দুঃখ দিয়েই শুরু করেন। ভগবান বুদ্ধও বলছেন দুঃখ, শুধু দুঃখই আছে। আচার্য শঙ্করও বলছেন দুঃখই আছে, ঠাকুরও বলছেন, এই সংসার হল আমড়া, আঁটি আর চামড়া, খেলে আবার অম্লশূল। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে তাও সে কাঁটা গাছ চিবিয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ থেকে তিরিশ বছরের যুবকরা ভাবে আমার জন্মই হয়েছে বিশেষ কিছু করার জন্য। বিশেষ কিছুটা কি? বেশীর ভাগ মানুষের বিশেষ কিছু হওয়াটা একটা কোম্পানীর চীফ হওয়া, ভালো বাড়ি গাড়ি হওয়া, সুন্দরী বউ পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সবাই এইই চাইছে। কাউকে যদি বলা হয় তোমার বিশেষ কিছু হবে কিন্তু তার বদলে তোমার একটা অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যাবে তাতে তুমি রাজী আছ? কেউ রাজী হবে না। একজন মুক্তিকাঙ্খী পুরুষকে যদি বলা হয় তুমি বিছানায় পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে কিন্তু তোমার মুক্তি হয়ে যাবে, তুমি রাজী আছ? সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যাবে। ঠাকুর যখন তীব্র সাধনা করছেন তখন তাঁর শরীরের দিকে কোন হুঁশ নেই। আমরা যখন বিশেষ কিছু করতে চাইছি, নতুন কিছু চাইছি তখন আমাদের পুরো মন শরীরের দিকে। শরীরের দিকে যার মন পড়ে থাকে সে কি কখন বিরাট কিছু করতে পারে? ভালো চাকরি, ভালো বাড়ি-গাড়ি, প্রচুর টাকা-পয়সা, ভালো স্ত্রী সে তো সবাই চাইছে। এখানে বিশেষ কোথায়? মনের মধ্যে জাগতিক ইচ্ছাগুলো উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে। চারিদিকে শুধু হতাশা, উদ্বেগ আর পান থেকে চুন খসলেই আত্মহত্যা। ভগবান বুদ্ধ থেকে আচার্য শঙ্কর, ঠাকুর সব্বাই একই কথা বলছেন এই সংসার শুধু দুঃখ আর দুঃখই, সেইজন্য এই সংসার হল ত্যাজ্য।

কিভাবে এর উপশম হবে? আচার্য তাই বলছেন *তদুপসমলক্ষণো মোক্ষঃ*, একমাত্র মুক্তির দ্বারাই এই সংসারের নিবৃত্তি হবে। মুক্তি কি? *পরা বিদ্যাবিষয়ো*, এটাই পরা বিদ্যার বিষয়। গণিত বিদ্যা শিখলে যেমন গণিত বিষয়ক জ্ঞান হবে, পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা নিলে স্থূল জগতের কারণকে জানা যাবে কিন্তু পরা বিদ্যার বিষয় মোক্ষ। মোক্ষ জিনিষটা কি বলতে গিয়ে আগে বলা হয়েছে সংশয় বিপর্যয় রহিত জ্ঞান। মোক্ষের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আচার্য এবার বলছেন *অনাদ্যনন্তোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাত্মপ্রতিষ্টা-লক্ষণঃ*, মোক্ষের কিছু লক্ষণ আছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয় যেমন একটা প্রদীপের শিখাকে নিবিয়ে দেওয়া হয়, সেই রকম। এখানে বলছেন মোক্ষ এই রকম নয়। বেদান্ত মতে মোক্ষ হল অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, শুদ্ধ, প্রসন্ন এই যে আত্মস্বরূপের লক্ষণ, যেটাকে বলছেন *স্বাত্মপ্রতিষ্ঠা*, নিজের যে ঠিক ঠিক স্বভাব সেই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে কিন্তু যে লক্ষণ গুলো বলা হয়েছে তার বিপরীত লক্ষণ গুলোর মত আচরণ করছে। তার স্বভাব অনাদি কিন্তু সেখানে এসে যাচ্ছে আদি। আমরা জন্মদিন পালন করি, কিন্তু আমাদের কত জন্মই তো এর আগে হয়েছে, সাপ, বিড়াল, কুকুর কি ছিলাম কেউ জানিনা অথচ জন্মদিন করছি। আমরা অনন্ত, কিন্তু মৃত্যু হলেই আমরা কান্নাকাটি করব, শ্রাদ্ধ করব। আমরা অজর, অমর অথচ বুড়োবুড়িরা হাঁটতে পারছে না, বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলছে, মৃত্যু

ভয়ে কাতর হচ্ছে, সবটাই বিপরীত আচরণ করে যাচ্ছি। আমরা যা কিছু করছি, ভাবছি, দেখছি আমাদের স্বভাব তার ঠিক উল্টো। আমার স্বভাব শুদ্ধ। কেন শুদ্ধ? আত্মার কোন অংশ নেই। খণ্ডিত হলে সেই জিনিষটা খারাপ হয়। আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নেই, কে তাকে আর অশুদ্ধ করবে। *প্রসন্নঃ*, আত্মা আনন্দস্বরূপ। আত্মার এই যে স্বভাব নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, এর সাথে তিনি *পরমানন্দোঽদ্বয়ঃ*, শুধু যে স্বাত্মপ্রতিষ্ঠা তা নয়, তিনি পরমানন্দ। আত্মার আনন্দের সাথে কোন আনন্দের তুলনা করা যায় না। তার *অদ্বিতীয়*, আত্মা ছাড়া অন্য দ্বিতীয় কিছু নেই। যেখানে দুই এসে যায় সেখানেই এই স্বভাবের উল্টো গুলো এসে যায়। নিত্য অনিত্য হয়ে যায়, অজন্মা জন্মা হয়ে যায়, শুদ্ধ অশুদ্ধ হয়ে যায়, আনন্দ নিরানন্দ হয়ে যায়। আমাদের মনে হতে পারে এগুলো ঋষিরা কল্পনা করে বলছেন। কিন্তু তা নয়, এটাই বাস্তব।

আমরা জেনেছি অপরা বিদ্যার বিষয় সংসার আর পরা বিদ্যার বিষয় মোক্ষ। সংসার বিষয়ের বৈশিষ্ট্য কি? সংসার হল অনাদি অনন্ত, তার মূল লক্ষণ হল কর্ম, যার নটি অঙ্গ আর তার ফল সব সময় দুঃখ স্বরূপ। হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুঃখই দেবে, আর তা নাহলে খাটনির সময় দুঃখ দেবে আর তাও না হলে পরে দুঃখ দেবে। দুঃখ তিন ভাবে আসে – হয় কোন কিছু পাওয়ার জন্য দুঃখ পেতে হবে, তা নাহলে যখন থাকবে তখন দুঃখ দেবে আর তাও না হলে চলে যাওয়ার পর দুঃখ দেবে। এই দুঃখ থাকবেই, সংসারে সুখ বলে কিছু নেই। আজকে যে ডাক্তার হয়েছে, এই ডাক্তার হওয়ার জন্য অল্প বয়স থেকে তাকে কত খাটতে হয়েছিল। তারপরে দেখবে তার থেকে একজন বড় ডাক্তার এসে গেছে, তার প্র্যাক্টিস এখন আর ঠিক মত জমছে না, তখন তার দুঃখ আসবে। সবাই টাকার পেছনে ছুটছে, এই টাকা অর্জন করতে সে কত কষ্ট করছে। যখন টাকা এসে যায় তখন দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এই বুঝি চোর ডাকাত এসে লুট করে নিয়ে যাবে, এই বুঝি ইনকামট্যাক্স ওয়ালার নিয়ে যাবে। আর শেষে যখন টাকা চলে যায়, টাকা তো একদিন যাবেই, তখন আবার হতাশা এসে গ্রাস করে নেয়। অন্য দিকে আমাদের টাকা সঞ্চয় করতেও হবে, কারণ টাকা না হলে জীবনধারণ হবে না। কিন্তু একটা সীমাকে অতিক্রম করে যখন টাকার পেছনে দৌড়াচ্ছি, একটা সীমার বাইরে সঞ্চয় করে যাচ্ছি তখন বিপদ আসে। টাকা কিসে যায়? মামলা-মোকদ্দমাতে যায়, একটা অসৎ ছেলে জন্ম নিয়ে সব উড়িয়ে দেবে আর তা নাহলে অসুখ বিসুখে যাবে। ক্যান্সার রোগের উপর গবেষণাতে কত হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু এত অর্থবহুল গবেষণার নীট ফল কি? ক্যান্সার রোগীর কষ্টের দিনগুলিকে আরও দীর্ঘায়িত করে দেয়। যে রোগী আজকে মারা যাবে, তাকে আরও ছ'মাস টেনে তার কষ্টটাকে আরও বাড়িয়ে দিল, আর এর পেছনে কত অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেই হিসাবটাও ধর্তব্যের মধ্যে নিতে হবে। এই তো জগৎ! এটাই জগতের খেলা। এখানে দুঃখ আমরা বাড়িয়েই চলেছি। একটা শৃঙ্খলের উপর আরেকটা শৃঙ্খল, সেই শৃঙ্খলের উপর আর একটা শৃঙ্খল, শৃঙ্খলের শেষ নেই।

মোক্ষ ঠিক তার বিপরীত। সেইজন্য বলছেন প্রথমে অপরা বিদ্যার যে শ্রেষ্ঠ ফল সেটা অর্জন করবে। অপরা বিদ্যার খারাপ ফলগুলোকে অর্জন করতে বলা হচ্ছে না, টাকা অর্জন করতে কষ্ট, টাকা চলে গেলে কষ্ট এখানে এগুলোর কথা বলছেন না। যেটা করলে ভালো হবে সেটাই করবে। এরপর দেখাবে এই ভালো ফলগুলোও অনর্থক। কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে এই চাকরিটা কে নেওয়া যাবে, তখন তাকে বিচার করে দেখতে হবে এই চাকরিটা আমাকে ভালোর কত দূর নিয়ে যাবে। আমি একটা চাকরি করছি সেখানে বলা হয়েছে আমাকে তিরিশ হাজার টাকা মাইনে দেবে। এই কোম্পানিতে যদি থেকে যাই তাহলে শেষ হবে পয়ত্রিশ হাজারে গিয়ে। এটা তেমন বিরাট কিছু নয়। আরেকটি কোম্পানিতে শুরু হচ্ছে দশ হাজারে কিন্তু অবসরের আগে সত্তর হাজারে গিয়ে শেষ হবে। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এই চাকরিটাই নিতে হবে। কিছু দিন কম থাকবে কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। সেইজন্য প্রথমে দেখতে হবে সব থেকে ভালোর কত দূর যেতে পারব আর যদি খারাপ হওয়ার থাকে কত খারাপ হতে পারে, এই দুটো দিককেই ভালো করে বিচার করে দেখতে হবে। এমন একটা চাকরিতে গেলাম যেখানে যদি আমাকে এমন কাজ করতে হয় যাতে অনেক বিপদ হতে পারে, হয়ত পথে বসে যেতেও পারি, তাহলে ঐ রকম কাজে না যাওয়াই উচিৎ। সব সময় এমন কাজেই

যেতে হয় যাতে সেই কাজ আমাকে পথে না বসিয়ে দেয়। এমন একটা পরিবারে মেয়েকে বিয়ে দিলাম, ছেলে যদি কোন কারণে মারা যায় তাহলে মেয়ে পথে বসে যাবে, খাওয়া-পড়ার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। অন্য একটা পরিবারে বিয়ে দিলে ভবিষ্যতে মেয়ের এই ধরণের কিছু বিপদ হবে না, এগুলোকেও মাথায় রেখে চলতে হবে।

এনারা প্রথমে অপরা বিদ্যার বর্ণনা করে দেখাচ্ছেন এই অপরা বিদ্যা তোমাকে সব থেকে কত ভালোর দিকে নিয়ে যাবে দেখে নাও। যতক্ষণ এটা তুমি জেনে নিতে না পারছ ততক্ষণ তোমার পরা বিদ্যার সম্বন্ধে আগ্রহই হবে না। এই খণ্ডে পরের দিকে একটা মন্ত্র আসবে *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো*, তুমি এই অপরা বিদ্যার সব কর্মগুলোকে ভালো করে বিচার করে দেখো। আজকাল ভালো ভালো ডিগ্রী নিয়ে সব সেরা ছেলেরা এক সাথে অনেকগুলো কোম্পানীর চাকরীর অফার পাচ্ছে। বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে 'বাবা, দেখ তো এই দুটো চাকরির মধ্যে আমি কোন চাকরীটা নেব'? বাবা তখন বিচার করে দেখেন পে প্যাকেজ কি রকম, পার্কস্ কেমন, অন্যান্য কি কি সুবিধা আছে, যদি চাকরি থেকে বসিয়ে দেয় তাহলে কি অবস্থা হবে। এটাই হল পরীক্ষা। তখন দুটো অফারকেই পরীক্ষা করবে। বাবা তখন বিচার করে বলবেন তুমি এটি কর। তেমনি অপরা বিদ্যাকেও বিচার করে দেখতে হবে এই বিদ্যার কর্মে তুমি কত দূর উন্নতি করতে পারবে আর এর খারাপ যদি কিছু হয় তখন কত খারাপ হতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিদ্যার বর্ণনা করে শেষে এই পরীক্ষার কথাই বলবেন –

দ্বিতীয় খণ্ড

তদেতৎ সত্যম্ - মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে।।১/২/১।।

(বশিষ্ঠাদি মেধাবি ঋষিরা ঋগ্বেদাতে যে সকল কর্ম প্রত্যক্ষ করেছিলেন – অপরা বিদ্যার বিষয় সেই কর্মই সত্য। সেই কর্মসমূহ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে বহু প্রকারে বিহিত আছে। তোমরা যথাভূত কর্মফলকামী হয়ে নিত্য ওই কর্ম সমুদয়ের আচরণ কর। তোমাদের স্বকৃত কর্মের ফল লাভের জন্য এটাই উপায়।)

তদেতৎ সত্যম্ - অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে যা বলা হবে এটাই সত্য, এটা কোন মিথ্যা নয়। কর্ম সম্বন্ধে যেটা বলা হচ্ছে এটাই সত্য। বেদের ঋষিরা ধ্যানের গভীরে মন্ত্রের দ্বারা কর্মের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। বেদ হল মন্ত্র প্রধান, ঋষিরা এই মন্ত্র দিয়ে কোন্ কোন্ কর্ম, কোন্ কোন্ যজ্ঞ করতে হবে তার সাক্ষাৎ করেছিলেন। এটাই সত্য। কেন সত্য? এই মন্ত্রগুলো এমনই সত্য যে মন্ত্র ফল দেবেই। এই মন্ত্রগুলো *সত্যকামা*, তোমার মনে যদি সত্যের কোন কামনা থাকে, অর্থাৎ যদি তুমি জীবনে কর্মফল চাও, তাহলে আগের আগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা যে মন্ত্র গুলি পেয়েছিলেন এবং সেই মন্ত্রের দ্বারা যে যে কর্মের আচরণ করতে বলে গেছেন, সেটাই কর্ম। সেই কর্মগুলো পালন কর আচরণ কর। এটাই জীবনের সুকৃতির পথ, এই দিয়েই সুকৃতি পাওয়া যায়। জীবনের যা কিছু সাফল্য এই কর্ম দিয়েই আসে।

কাকে এই কর্ম করতে বলা হচ্ছে? সত্যকামাকে। কে সত্যকামা? যিনি জীবনে কর্মফল চাইছেন। এর আগে আট নম্বর মন্ত্রে যেখানে বলা হয়েছে *অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং*, সেখানে এই সত্যের অর্থ করা হয়েছিল আকাশাদি পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূতের খেলা যেখানে চলছে, যা দিয়ে কর্ম চলে, সেই কর্ম হয়ে যায় অমৃত। কামের প্রতি যদি তোমার সত্য ভাব থাকে, হ্যাঁ আমি ফল চাইছি – তাহলে তুমি ঐ আচরণ কর। *তদেতৎ সত্যম্*। এগুলো কেন সত্য? ঋকবেদাদি মন্ত্রে যে কর্মের কথা উদ্ভাসিত হয়েছে সেগুলোই সত্য। ঋকবেদে অগ্নিহোত্রাদির কর্মের কথা বলা হয়েছিল। এখন আর বেদের অগ্নিহোত্রাদির কর্ম করা হয় না, অগ্নিহোত্রাদির

জায়গা নিয়েছে জপধ্যানাদি, পূজো-পাঠ ইত্যাদিতে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করলে কেন আমরা ফল পাব? কারণ এই কথা ঋকবেদে আছে। ঋগ্বেদ পালন করতে যাব কেন? কারণ ঋগ্বেদ হল চিরন্তন সত্যের ধারক, এগুলোই ভগবানের কথা, তাই এর কর্মফল বৃথা হবার নয়। এই মন্ত্রগুলোকে কারা দেখেছিলেন? *কবয়ো*, কবি মানে ঋষি। কবি শব্দের একটা অর্থ ভগবান আবার কবি মানে ঋষিও হয়। আচার্য এখানে বশিষ্ঠাদির নাম উল্লেখ করছেন। ঋকবেদের যে বিভিন্ন মণ্ডল আছে এগুলো আলাদা আলাদা ঋষিদের পরিবাররা ধরে রেখেছিলেন – যেমন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এই রকম আরও অনেক ঋষিরা ছিলেন, যাঁদের কাছে এই মন্ত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তাঁরা দেখলেন এই মন্ত্রগুলোকে এই এই যজ্ঞে কাজে লাগান যাবে। এটাই পুরুষার্থের একমাত্র সাধন।

পুরুষার্থ সাধন হল যে জিনিষটাকে আমি পরিশ্রম করে পেতে চাইছি। মানুষ জীবনে যখন কোন জিনিষকে প্রাপ্ত করতে চাইছে তখন তার জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয়। এই পুরুষার্থ সিদ্ধির একমাত্র সাধন হল কর্ম। এখানে কিন্তু বৈদিক কর্মের কথাই বলা হচ্ছে। বৈদিক কর্ম মানে বেদে বশিষ্ঠাদি ঋষিরা দেখেছিলেন ঋকবেদাদিতে যে মন্ত্রগুলো আছে সেই মন্ত্র গুলো বিশেষ বিশেষ কর্মের বিধান করে। যেমন *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ* মন্ত্র, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে এইসব মন্ত্রের তাৎপর্যগুলো দেখেছিলেন, তাঁরা আবার নিজের শিষ্যদের ব্যাখ্যা করে দিতেন। তুমি যদি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটের মধ্যে কোন একটাকে চাও, ধর্ম বলতে বোঝাচ্ছে স্বর্গলোকাদি, অর্থ মানে টাকা-পয়সা, ভোগ্য সামগ্রি আর কাম হল যেখানে ভোগ তৃপ্তি পায়। এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটি যদি চাও তাহলে এই মন্ত্রগুলো যত আছে আর মন্ত্র সম্পর্কিত যত যজ্ঞ আছে সেগুলো কর। তুমি যদি রাজা হতে চাও, তাহলে রাজা হবার জন্য যে যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে সেই যজ্ঞ কর। বৃষ্টি নেই, চাষবাস হচ্ছে না, তাহলে পর্জন্য যজ্ঞ কর। পর্জন্য যজ্ঞের জন্য কিছু নির্দিষ্ট মন্ত্র আছে।

আমরা ভুল করে মনে করি যজ্ঞ আছে তার জন্য কিছু মন্ত্র আছে, কিন্তু তা নয় মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রের জন্য যজ্ঞ আছে। আমি একটা যজ্ঞ করব, যে কোন কিচু প্রাপ্তির জন্যই যজ্ঞ হতে পারে, মনে করুন একটা চাকরীর জন্য যজ্ঞ করব। এবার ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলা হল, আপনি একটা প্রার্থনা লিখে দিন যেটা পাঠ করলে আমার চাকরী হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ একজন ঋষি তিনি খুব সুন্দর একটা মন্ত্র ঠিক করে বলে দিলেন তুমি এই মন্ত্রের জপ করে যাও তোমার চাকরী হয়ে যাবে। কিন্তু এটা এভাবে হয় না। বেদে ঠিক উল্টো ভাবে বলা হচ্ছে। মন্ত্র আগে পেয়েছেন, মন্ত্রের তাৎপর্য কি সেটা ঋষিরা ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। আমার মনে একটা ভাব এল এবার আমি সেটাকে লিপিবদ্ধ করে দিলাম। বেদে কিন্তু তা হচ্ছে না, বেদে ঠিক উল্টো হয়। মন্ত্র আগে প্রকাশিত হচ্ছে, যজ্ঞটা এরপরে ব্যাখ্যা হচ্ছে। এই মন্ত্রের এই যজ্ঞ হবে। কঠোপনিষদে নচিকেতার ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই হয়েছিল। নচিকেতা যমরাজকে দ্বিতীয় বরে বলছেন স্বর্গপ্রাপ্তির পথটা আমাকে বলুন। তখন যমরাজ নচিকেতাকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যে যজ্ঞ হয় এটা নচিকেতা কোথা থেকে জানলেন? একটা বিশেষ ধরণের যজ্ঞের কথা নচিকেতা জানতে চাইছেন। পরে যজ্ঞের ব্যাখ্যা করে দিয়ে যমরাজ যজ্ঞের নাম নচিকেতার নামে রাখলেন। মন্ত্রটা আগে থাকতেই ছিল কিন্তু যজ্ঞের বিধিটা জানা ছিল না। এই বিধিটা ঋষিরা বার করেছেন। *মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো* – মন্ত্র তো আগে থাকতেই আছে, ভগবানের সাথেই মন্ত্র বেরিয়ে এসেছে। প্রথমে বেদ পুরো মন্ত্রগুলোকে দিয়ে দিল। এবার এই মন্ত্রগুলো কি কাজে লাগবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়। আইনস্টাইন দিলেন $E = MC2$ । এর প্রয়োগ রবার্ট ওপেনহ্যামার এ্যটম বোম বানালেন। এ্যটম বোমের ইক্যুয়েশান আগে এসেছে বোমা পরে এসেছে। বেদেও ঠিক তাই হয়েছে মন্ত্র আগে এসেছে আর সেই মন্ত্রের ব্যবহার যে যজ্ঞে হবে তার বর্ণনা পরে এসেছে। কবি একটা জিনিষকে দেখছেন, সেটা দেখার পর তার মনে যে ভাব আসছে সেটাকে তিনি কবিতায় লিপিবদ্ধ করছেন। বেদ সেইভাবে আসেনি, মন্ত্র আগে এসেছে যজ্ঞ তার পরে এসেছে। এটাই বেদের বিশেষত্ব।

মুণ্ডকোপনিষদের মূল উদ্দেশ্য হল অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যার আলোচনা করার পর সাধককে পরা বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া। অপরা বিদ্যাতে যে কোন লোক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু পরা বিদ্যা খুব উচ্চমানের সাধকদের জন্য। উপনিষদের বক্তব্যই হল উচ্চমানের সাধকদের জন। শুধু সাধক হলেই হবে না,

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকতে হবে। বুদ্ধি যদি খুব সূক্ষ্ম না হয় তাহলে উপনিষদের বক্তব্যকে ধারণা করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। যখন শৌনক মুনি এসে জিজ্ঞেস করছেন কোনটা জানলে সবটাই জানা যায়, তখন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলা হল পরা বিদ্যাকে জানা হয়ে গেলে সবটাই জানা হয়ে যাবে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ জানে অপরা বিদ্যাই সব কিছু। কথামৃতে আছে প্রতাপ একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। ঠাকুর প্রতাপকে জিজ্ঞেস করছেন – তুমি তো বিলেত গেছ, কেমন দেখলে সেখানে। প্রতাপ ঠাকুরকে বলছেন আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন সেখানে সবাই কাঞ্চনের পূজাই করে। ঠাকুর শুনে বলছেন – সেটা শুধু বিলেতেই নয়, এখানেও সবাই কাঞ্চনেরই পূজা করে। তখন প্রতাপ বলছেন, ওরা কর্মকে খুব প্রাধান্য দেয়। ঠাকুর বলছেন কর্মই আদিকাণ্ড। কর্মই আদিকাণ্ড এই কথা কথামৃতে ঠাকুরে বেশ কয়েকবার বলেছেন। প্রথমে সবাইকেই কর্ম করতে হয়। কিন্তু শেষেও যে কর্মকে নিয়ে থাকতে চায় তাহলে বুঝতে হবে তার আধ্যাত্মিক বিকাশ এখনও হয়নি। যে মানুষ বলে আমি কাজ করতে করতেই মরতে চাই, বুঝতে হবে তার ভেতরে কিছু গোলমাল আছে। আধ্যাত্মিক বিকাশ যার হয়েছে সে আর কাজের পেছনে ছুটবে না। যতটুকু না করলেই নয়, তার বেশী কিছু করতে যাবে না। আধ্যাত্মিক বিকাশ মানে তার কার্য ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না, তার কার্য ক্ষমতা পুরোপুরি আছে, যখন কাজ করবে দেখে সবাইর চমক লেগে যাবে। যেমন স্বামীজী, তাঁর কার্য ক্ষমতা ও কুশলতা দেখে সবাই চমকে উঠছে। কিন্তু মনটা তাঁর ধীর, স্থির ও শান্ত।

ঠাকুর যেমন বলছেন কর্ম হল আদিকাণ্ড, এই অপরা বিদ্যা হল আদিকাণ্ড। কেউ যদি মনে করে আমি আদিকাণ্ড না করেই শেষ কাণ্ডে চলে যাব, তা কখনই হবে না। ভারতের এটাই দুর্ভাগ্য, ভারতের লোকেরা কাজ করতে চায় না, অলস হয়ে বসে থাকবে আর ফাঁকিবাজি করে নিজের চাওয়া-পাওয়াটা মিটিয়ে নিতে সচেষ্ট। এদের থেকেও নিকৃষ্ট হল কাজ না করে ফল চাইছে। প্রথম শ্রেণীর কিছু লোক আছে যারা কাজই করতে চায় না, এরা অধম। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হল কাজ না করেই ফল চায়। ঘুষ নেওয়াটা কর্ম না করেই ফল নেওয়া। চাকরীতে কর্ম করছি তার জন্য সরকার মাসের শেষে মাইনে দিচ্ছে। কিন্তু অফিসে কারুর কাছ থেকে আমি উপহার নিচ্ছি তখন প্রকারন্তরে ঘুষ নেওয়াই হয়ে গেল। এরা হল অধমাধম। যারা কর্ম করেনা তারা অধম আর যারা কর্ম না করে ফল গ্রহণ করে বা ফলের আশা করে তারা অধমাধম। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন কর্ম হল আদিকাণ্ড।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হচ্ছে তোমাকে আগে জানতে হবে অপরা বিদ্যাটা কি, অধ্যয়ণও করতে হবে। কিন্তু একটা অবস্থায় এসে এই অপরা বিদ্যাকে ছেড়ে দিতে হবে। অপরা বিদ্যা থেকে যতক্ষণ কেউ না বেরিয়ে আসতে পারছে ততক্ষণ সে পরা বিদ্যায় প্রবেশ করতে পারবে না। পরা বিদ্যাতে যতক্ষণ না প্রবেশ করছে ততক্ষণ শান্তি আসবে না। এর আগের অধ্যায়ে অপরা বিদ্যা বলতে গিয়ে বলেছিলেন চারটে বেদ আর ছটি বেদাঙ্গ এগুলো সব অপরা বিদ্যা। যে কোন বিদ্যায় যখন 'to do' আসবে সেটাই অপরা বিদ্যা আর 'to be' পরা বিদ্যা। যে কোন বিদ্যা যেটা আমাকে করাচ্ছে সেটাই অপরা বিদ্যা। যে নিজের মধ্যে প্রতির্ষ্ঠিত, সে তো আত্মারাম হয়ে গেছে তার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে যায়। বিজ্ঞানের যত সাবজেক্ট আছে সব করাচ্ছে, তার সাথে বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যা, বেদ অপরা বিদ্যা। To do আর Not to do একই সঙ্গে চলে দুটো একই জিনিষ। কিন্তু যে অর্থে To be বলা হচ্ছে ওখানে Not to be ওই অর্থে আসবে না। Not to be মানেই হয়ে গেল to do। To be মানে যেমনটি আছে, স্থিতি। এখন কেউ পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক উচ্চ শিক্ষা পেয়ে যাওয়ার পর বলছে আমি আর পদার্থ বিদ্যা নিয়ে থাকব না। তাহলে এখন তুমি কি নিয়ে থাকবে? আমি এখন শাস্ত্রাদি নিয়ে থাকব, বেদ বেদাঙ্গ পড়ব। সেটাই এখানে বলা হচ্ছে, এগুলোও অপরা বিদ্যা, কারণ এটাও করা। বেদ যজ্ঞ করতে বলছে আর বেদাঙ্গ বেদকে সাহায্য করছে।

আমরা সবাই জানি পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা সব বিদ্যাই মানুষের মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে। এখানে তাই এর কোন আলোচনা করা হচ্ছে না। অর্কিমিডেসের প্রিন্সিপ্যাল, নিউটনের সূত্র, আইনস্টাইনের থিয়োরি এগুলো সব তাঁদের বুদ্ধি থেকে বেরিয়েছে। বিজ্ঞানের কিছু নিয়ম বুদ্ধি থেকে বেরিয়েছে আর কিছু ঘটনাকে

দেখে তার অনুকরণে কিছু নিয়মকে দাঁড় করান হয়েছে। কিন্তু এই নিয়মের মধ্যে আগামী দিনে অন্য কেউ এসে কিছু অপবাদ দেখিয়ে দেবেন বা ব্যতিক্রম পেয়ে যাবেন। তখন থিয়োরিটা অন্য রকম হয় নিয়মটা পাল্টে যাবে। তাহলে বেদ কি অনেকটা এই ধরণের? না, বেদ কোন দিন পাল্টাবে না। যে ফলের জন্য যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞের মন্ত্র কোন দিন পাল্টাবে না। শ্রাদ্ধের সময় কিছু মন্ত্রের কথা বলা আছে। আগামীকাল হঠাৎ একজন এসে বলল শ্রাদ্ধের মন্ত্র এভাবে হবে না, এটাকে পাল্টাতে হবে। না, তা করা যাবে না, শ্রাদ্ধের মন্ত্র বেদে যেভাবে আগে থাকতে দেওয়া আছে হঠাৎ কেউ এসে তা পাল্টে দিতে পারবে না। কেন হবে না? *মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি*, বেদের মন্ত্রগুলো কোন চিন্তা-ভাবনা করে রচনা করা হয়নি। যাঁরা শুদ্ধ, পবিত্র, চরিত্র যাঁদের নির্মল, সেই ঋষিরা এই মন্ত্রগুলোকে সাক্ষাৎ স্পষ্ট দর্শন করেছেন।

তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করে অনেক কিছুই দর্শন করেছেন – মা কালীর দর্শন পেলেন, মা ভবতারিণীকে কত রূপে দর্শন করলেন, মা কালীর লীলা দর্শন করলেন। তারপর বৈষ্ণব মতে, তন্ত্র মতে, অদ্বৈত ভাবে সাধনা করলেন, সব রকম ধর্মের সাধনা করলেন। এত কিছু দর্শনের পর আজ একশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এবং আজকে ঠাকুরের ভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। ঠিক তেমনি *ত্রেতায়াং* ঋষিরা যে মন্ত্রগুলোর দর্শন পেয়েছিলেন, ত্রেতা যুগে এসে সেই মন্ত্র গুলি বিরাট প্রসার প্রচার পেয়ে গেল। আচার্য শঙ্কর ত্রেতাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম অর্থ হল যদিও এখানে উল্লেখ করা নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে সত্য যুগে ঋষিরা খুব উচ্চমানের ঋষি ছিলেন, তাঁরা বেদের এই মন্ত্রগুলো দেখেছেন, সেইজন্য তাঁদের বলা হয় মন্ত্রদ্রষ্টা। পরে পরে ত্রেতা যুগে এই মন্ত্রগুলোর খুব প্রসার প্রচার হয়ে গেল। ঠাকুরের ভাব যেমন পরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যিশুর কথা, মহম্মদের বাণী সময়ের সাথে সাথে ছড়িয়ে গেল। ঠিক তেমনি বেদের এই মন্ত্রগুলোও পরে ছড়িয়ে গেল।

বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন মন্ত্র দেখেছেন। আচার্য যোগ করে বলছেন *যত্তদেতৎসত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ* - যদি কেউ জীবনে ধর্ম, অর্থ ও কাম পেতে চায় তাহলে তা পাওয়ার একমাত্র পথ হল এই মন্ত্রগুলো। পুরুষার্থের একমাত্র সাধন বেদের মন্ত্র। এখানে এসে অনেকেই প্রচণ্ড আপত্তি তুলবে। বেদ অধ্যয়ণ, সাধন করলেই টাকা-পয়সা হবে, এটাকে আমরা মানতে পারছি না। কারণ বেদের সময়কার বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণরা তো সারা জীবন কাঙালীই থেকে গেলেন। ছ-সাত হাজার বছরের ইতিহাসেও আমরা জানি ব্রাহ্মণরা চিরকাল কাঙালিই ছিল। তাহলে কি করে বলছেন যে বেদের সাধন করলেই টাকা-পয়সা হবে? এখানে এই আপত্তিটা খাটবে না। কারণ ব্রাহ্মণরা কখনই ওই স্বার্থ নিয়ে বেদ অধ্যয়ণ করতেন না বা করাতেন না। বেদের ব্রাহ্মণরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ, সরল, নিষ্ঠাবান। সারা জীবন বেদ অধ্যয়ণ করে করে একটা সময় তাঁদের সমস্ত রকমের জাগতিক বস্তু থেকে মন সরে আসত। যতক্ষণ না একটা উচ্চ অবস্থায় পৌঁছান যাচ্ছে ততক্ষণ এগুলো কাউকে বোঝানো যাবে না। বাল্মীকি রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনির বর্ণনা আছে। ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে চিত্রকূট পাহাড় থেকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। ভরদ্বাজ মুনি ভাবছেন ভরত এত সৈন্য লোকজন নিয়ে এখানে রাত্রিবাস করবে, আমি এদের আপ্যায়ন করব কিভাবে! তখন তিনি বেদ থেকে মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করতেই দেখা গেল স্বর্গ থেকে ভালো ভালো খাবার, ভালো পানীয় নিয়ে সুন্দরী অপ্সরাগণ এসে হাজির হয়ে গেছে। এক একজন সৈন্যের সেবার জন্য দুজন করে অপ্সরা নিযুক্ত। সব সৈন্যরা বলছে 'ভাই! অযোধ্যার রাজা ভরতই হোন আর শ্রীরামচন্দ্রই হোন তাতে আমাদের কি! আমরা এখানে দিব্যি আছে, ভালো ভালো খাওয়া, সুস্বাদু পানীয় আর এই রকম সব সুন্দরী অপ্সরা, এসব ছেড়ে আমরা আর কোথাও যাচ্ছি না'। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখে কোথাও কিছু নেই, সব উধাও। ব্রাহ্মণরা যদি চাইতেন তাহলে এই মন্ত্রশক্তি দিয়েই পেয়ে যেতে পারতেন। তাই এখানে বলা হচ্ছে ঠিক ঠিক পুরুষার্থের একমাত্র সাধন এই মন্ত্রগুলো, যে মন্ত্রগুলো ঋষিরা দেখেছেন। সেইজন্যই বলা হচ্ছে *তদেতৎ সত্যম্*, এটাই সত্য, পুরুষার্থ এই মন্ত্র দিয়েই পাওয়া যায়। মোক্ষকে এখানে পুরুষার্থের মধ্যে ধরা হচ্ছে না।

ত্রেতায়াং শব্দের আরও দুটো অর্থ হতে পারে। বেদে যা বলা হচ্ছে এটাই ঠিক ঠিক সত্য। কিন্তু এর প্রকারভেদ হয়ে যায়। প্রকারভেদ মানে, যখন মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করা হয় তখন তিনজন আলাদা আলাদা ভাবে করেন – প্রথম হোতা, দ্বিতীয় অদ্বর্জু ও তৃতীয় উদ্‌গাতা। যজ্ঞের সময় চারজন পুরোহিত বসেন। এর মধ্যে এই তিনজনেরই ঠিক ঠিক ভূমিকা থাকে। যাঁরা ঋকবেদের ব্রাহ্মণ তাঁরা যজ্ঞের সময় ঋগ্বেদ থেকে মন্ত্রগুলো পাঠ করতে থাকেন, এনারা হলেন হোতা। যাঁরা যজুর্বেদ জানেন তাঁরা যজ্ঞে আহুতিটা দেন, এঁদের বল হয় অদ্বর্জু। যাঁরা সামবেদ জানেন তাঁরা যজ্ঞের সময় সামগান করতে থাকেন, এনারা হলে উদ্‌গাতা বা উদ্‌গীত। সমগ্র যজ্ঞের একজন পর্যবেক্ষক থাকেন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মা, তিনি আবার অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ। এখানে কিন্তু ব্রহ্মার উল্লেখ না করে শুধু এই তিনজনের কথা মাথায় রেখে বলা হচ্ছে *ত্রেতায়াং* – হোতা, অদ্বর্জু ও উদ্‌গাতা। এই তিনজনকেই যজ্ঞে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ঋকবেদের পাঠ করা হয় স্তুতির জন্য, যজুর্বেদ যজন করার জন্য, যে মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হয় আর যজ্ঞের শক্তি বাড়ানর জন্য সামবেদ থেকে সামগান করা হয়।

ঋষিরা সেই মন্ত্র দেখেছেন যে মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ করা হবে, কিন্তু সেই মন্ত্রের প্রকারভেদ হয়ে গেল। কিন্তু বেদ সেই একই, চারটে বেদ নিয়েই একই বেদ। কিন্তু তিনটে প্রকার হয়ে গেল ঋক, সাম ও যজুর্বেদ – এটাকেই এখানে বলছেন *ত্রেতায়াং*। সেইজন্য অনেক সময় বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। অথর্ববেদের যজ্ঞের সাথে সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু অথর্ববেদের ব্রাহ্মণকেও যজ্ঞে উপস্থিত থাকতে হবে তা নাহলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। ব্রহ্মার কাজ হল যজ্ঞে সবাই নিজের নিজের দায়ীত্ব ঠিক ভাবে পালন করছে কিনা লক্ষ্য রাখা। এইভাবে বেদের মন্ত্রের প্রকারভেদ হয়ে গেল। তার সাথে বেদ হয়ে গেল তিন, সেইজন্য পূজারী বা পুরোহিত হয়ে গেল তিন। এইভাবে আচার্য *ত্রেতায়াং* শব্দের তিনটে অর্থ দিয়েছেন – প্রথম হল সত্যযুগে ঋষিরা এই মন্ত্রগুলো দেখেছিলেন ত্রেতাযুগে গিয়ে সেই মন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি হল, দ্বিতীয় তিনজন পুরোহিতের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয় সেইজন্যও এটাকে ত্রেতা বলা হতে পারে বা বেদের তিনটে বিভাজন হয়ে যাওয়ার জন্যও বলা হতে পারে *তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি*, এই মন্ত্রগুলো এইভাবে ছড়িয়ে গেল। কিভাবে ছড়িয়ে গেল? তিনজন পুরোহিতের মধ্যে ছড়িয়ে গেল, তিনটে বেদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল কিংবা ত্রেতা যুগে এসে এই মন্ত্রগুলো আরও ছড়িয়ে গেল। এক সময় মন্ত্রগুলো আবদ্ধ ছিল পরে এক সময় এইভাবে ছড়িয়ে গেল।

তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা, তুমি যদি সত্যকামা হও অর্থাৎ তুমি যে কর্মফল পেতে চাইছ, তুমি যেটা কামনা করছ সেটা যদি পেতে চাও, তাহলে তুমি ঠিক সেই রকমটিই কর যে রকমটি বেদে বলা হয়েছে। তুমি অবশ্যই ফল পাবে। এই কারণে দেখা যায় বেদে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক ঠিক সেই ভাবে যদি কোন যজ্ঞ করা হয় তখন সেই যজ্ঞের ফল অবশ্যম্ভাবি। বেদে যেভাবে বলা হয়েছে, যা কিনা ঋষিরা দেখেছিলেন, সেটাকে তুমি সেইভাবে সম্পন্ন কর। তাঁরা কোন সাধারণ ঋষি ছিলেন না, সবাই মেধাবী ঋষি ছিলেন, তাঁদের মন একেবারে শুদ্ধ ও পবিত্র। কর্মফলের পুর্তির রহস্যগুলো তাঁরা দেখেছেন, যেমন নিউটন, আইনস্টাইন পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে দেখেছিলেন। ঠিক তেমনি ঋষিরা নিয়মগুলো দেখেছিলেন কর্মফল প্রাপ্তি কিভাবে করা যেতে পারে। ওই নিয়মগুলো তুমি পালন করে চল তাহলে তুমিও কর্মফল প্রাপ্তি করতে পারবে। চুম্বকত্বের যে ধর্মগুলো আছে, আলোর যে ধর্ম আছে, ফেরাডে বিদ্যুতের যে নিয়মগুলো দেখে বিদ্যুতের কার্যকরী দিকটাকে আবিষ্কার করলেন। আজকে যদি আমি কোন মেশিন বানাতে চাই তাহলে তাদের নিয়মকে অনুসরণ করে চললে বিদ্যুৎকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। ঠিক তেমনি যদি আমি কোন ফল পেতে চাই, কোন সিদ্ধি পেতে চাই তাহলে এরকমটিই করতে হবে।

শৌনককে এই কথাই বলছেন, এটাই তোমার জন্য সুকৃত। তুমি নিজে থেকে যে কর্মগুলোকে বেছে নিয়েছ, সেই কর্মের জন্য যে তোমার স্বর্গলোক প্রাপ্তি হবে তার জন্য এটাই একমাত্র পথ। সুকৃত মানে, যখন মানুষ উঠে পড়ে লেগে থেকে কোন কর্ম করে সে কর্মের যে সিদ্ধি পায় সেটাকেই সুকৃত বলে। যখন কোন কিছুই ফল পায় না তখন তাকে দুষ্কৃত বলে। দুষ্কৃতি কেন বলে? সম্পত্তি অপরের, কিন্তু লুট করে নিয়ে এল। এই সম্পত্তি তাকে পরিশ্রম করে অর্জন করতে হয়নি। সুকৃতি হল সঠিক পথ অবলম্বন করে পরিশ্রম দ্বারা সিদ্ধি

অর্জন করা। তাই লোকপ্রাপ্তি অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক যদি পেতে চাও তাহলে বেদে যে রকমটি বলা হয়েছে তুমি সেই রকমটি কর।

এখানে বলা হচ্ছে *সুকৃতস্য লোকে*, আচার্য লোকের ব্যাখ্যা করে বলছেন – *লোক্যতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্মফলং লোক উচ্যতে*। মানুষ যখন একটা ফলকে নিমিত্ত করে কোন একটা জিনিষকে অবলোকন করে, কিংবা অনুভব করে অথবা ভোগ করে তখন তাকে বলে লোক। যে কোন কর্মফলকে যখন ভোগ করা হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে লোক। কোন কিছুকে যদি তুমি ভোগ করতে চাও তার জন্য তোমার কর্মফল চাই, কর্মফলের জন্য তোমাকে কর্ম করতে হবে। এই কর্ম তুমি কিভাবে করবে? বেদে যে রকমটি করতে বলা হয়েছে তুমি সেই রকমটিই করবে। কারণ বেদে যে কর্মবিধির কথা বলা হয়েছে, যে মন্ত্রগুলো বলা হয়েছে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদির মত মেধাবী ঋষিরা এই বিধি ও মন্ত্রগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই এই মন্ত্রগুলো সিদ্ধ মন্ত্র। বর্তমান যুগে আমরা গুরুর কাছে দীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়ে বলছি আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই। তখন গুরু আমাদের বলে দিলেন এই সিদ্ধ মন্ত্র তোমাকে দেওয়া হল, এই মন্ত্র তুমি রোজ এইভাবে জপ করে যাও তাহলেই তোমার ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাবে। এই সিদ্ধ মন্ত্র গুরু আবার তাঁর গুরুর কাছে পেয়েছিলেন, তিনি আবার হয়তো কোন মন্ত্রদ্রষ্টা গুরুর কাছে এই সিদ্ধ মন্ত্র পেয়েছিলেন। এই মন্ত্রই সত্য। যদি তুমি ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটে যদি ভোগ করতে চাও, তাহলে বেদে যে মন্ত্রগুলো বলা হয়েছে সেই রকম যজ্ঞ কর তাহলেই হবে।

এখানে অগ্নিহোত্রের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। আগেকার দিনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র কর্ম বাধ্যতামূলক ছিল। অগ্নি স্থাপন করে সকাল-বিকাল দুবার সেই অগ্নিতে আহুতি দিতেন। অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে অত্যন্ত শুদ্ধ পবিত্র ভাবে রাখা হত। এমনকি ওই অগ্নিকে কেউ স্পর্শ করে দিলে ব্রাহ্মণরা খুব রেগে যেতেন। কিছু গার্হ্যপত্য অগ্নি ছিল, যেগুলো বিবাহাদি শুভ কার্যে স্থাপনা করা হত, স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ছিল এই গার্হ্যপত্য অগ্নিকে পালন করা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ মারা গেলে সেই আগুন থেকেই অগ্নি নিয়ে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হত। অর্থাৎ এরপর ঐ অগ্নি আর প্রজ্বলিত করা হবে না। বৈদিক যুগ থেকেই বৈবাহিক বন্ধনকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হত। তাছাড়া ভারতে চিরদিনই নারীদের প্রচুর সম্মান ছিল, সেইজন্যই স্ত্রীকে বলা হত অর্ধাঙ্গিনী। একজন যদি না থাকে অন্যজন যজ্ঞ করতে পারত না। কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টে গেছে, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, লোলুপতা বেড়ে গেছে তার প্রভাব স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও এসে পড়ছে। অগ্নিসাধ্য রূপে যত রকমের কর্ম ছিল, নানা রকমের যত যজ্ঞ ছিল তার মধ্যে অগ্নিহোত্রই প্রধান বলে স্বীকৃত ছিল। বর্তমান যুগে যেমন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভক্তদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সকাল বিকাল জপ-ধ্যান করা। আমরা যত যা কিছু কর্মই করি না কেন সকাল বিকাল জপ-ধ্যান করাটা বাধ্যতামূলক। ঠিক তেমনি বেদের সময় যত রকম উপাচার করা হোক না কেন অগ্নিহোত্র কর্ম বাধ্যতামূলক ছিল। দ্বিতীয় মন্ত্রে এসে এই অগ্নিহোত্র কর্মের কথা বলা হচ্ছে –

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ।।১/২/২

(সম্যক প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে যখনই শিখা সমূহ লেলিহান হয়, তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতি অর্পণ করবে।)

এই মন্ত্রে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের সামান্য একটু বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। অঙ্গিরস শৌনককে বলছেন, যখন আগুন প্রজ্বলিত করা হল, আগুনের শিখা প্রদীপ্ত হয়ে লেলিহান হয়ে উঠল। সাপের জিহ্বার মত অগ্নির লকলকে লেলিহান শিখাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কোন কোন যজ্ঞে উত্তর দিকে একটা অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করা হত, সেই অগ্নিকুণ্ডে অগ্নেয় স্বাহা বলে আহুতি দেওয়া হত। দক্ষিণ দিকে আহুতি দেওয়ার সময় বলবে সোমায় স্বাহা। এখনও কোথাও কোথাও এই মন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বেদের যজ্ঞের অনেক বিবর্তন হয়ে যাওয়াতে মন্ত্রগুলোও আর বেশী ব্যবহার হয় না। আর ইদানিং অগ্নিহোত্র তো কাউকেই বিশেষ করতে দেখা যায় না।

তদা আজ্যভাগৌ অন্তরেণ, মাঝখানে যে জায়গাটাতে আসল আগুন প্রজ্বলিত হয়েছে অগ্নিহোত্রের ঠিক ঠিক আহুতিটা ওই জায়গাতে দেওয়া হত। এই যে দুই দিকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যে আহুতিটা দেওয়া হল এটাকে বলা হয় আজ্যভাগ আর মাঝখানে যে আহুতিটা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় আবাপস্থান, মানে মধ্যভাগ। এখানে অগ্নিহোত্রের বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যখন অগ্নিহোত্র করবে তখন *মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ*, দেবতাদের উদ্দেশ্যে ওই অগ্নির মাঝখানে আহুতি দেবে। ধরুন আমি ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্য আহুতী দিচ্ছি, তখন প্রথম উত্তর দিকে অগ্নেয় স্বাহা দক্ষিণ দিকে সোমায় স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দেবে আর মাঝখানে যে দেবতা বা ইষ্টের নামে যজ্ঞ হচ্ছে তাঁর নামে আহুতী দেওয়া হবে। এইভাবে অনেকদিন ধরে এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করে, ওই ভাবে আহুতী দেওয়ার পর ওই সিদ্ধিটা প্রাপ্ত হয়। আহুতি আসলে 'ই'কার হয়, কিন্তু এখানে 'ঈ'কার দিয়ে বলতে চাইছেন অনেক দিন ধরে করতে হয়।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় মন্ত্রের বক্তব্য হল যদি তুমি কর্মফল চাও, বা কোন সিদ্ধি চাও, অথবা পুরুষার্থ সাধন করতে চাইছ তাহলে যজ্ঞ সাধন কর। কি রকম যজ্ঞ সাধন? যে রকম অগ্নিহোত্রে করা হয়। অগ্নিহোত্রে আহুতি দেওয়া হয়, তারই একটা কাব্যিক বর্ণনার দ্বারা এই মন্ত্রে বলা হল। *আজ্যভাগ*, উত্তর ও দক্ষিণে আহুতি দেওয়া হচ্ছে আর মাঝখানে মূল আহুতিটা দেওয়া হচ্ছে। যে দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিহোত্র করা হচ্ছে সেই দেবতার নামে মাঝখানে আহুতি দেওয়ার জন্য তুমি সেই দেবতার কাছে যেমনটি কামনা করবে তিনি সেই কামনা তেমনটি পূর্ণ করে দেবেন। বর্তমান কালে যে হোমাদি ক্রিয়া করা হয় সেখানেও এইভাবেই সঙ্কল্পাদি করে নিয়েই আহুতি দেওয়া হয়। অনেক সময় সঙ্কল্প করা হয় সমাজের যেন কল্যাণ হয়। তখন ঠাকুরের নামে অগ্নি স্থাপন করা হয়, *রামকৃষ্ণনামাগ্নৌ*, এই অগ্নির নাম রামকৃষ্ণ। এরপর ওই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। যদি তুমি এইভাবে কর তাহলে তুমি সিদ্ধি পাবেই পাবে।

এখানে অগ্নিহোত্রকে নিয়েই বলা হচ্ছে। এরপরেই আবার বলবে এগুলো সব বেকার, ফালতু, এগুলো সব অপরা বিদ্যা। তুমি তো যজ্ঞাদি করে যাচ্ছ, কিন্তু কোন কারণে যদি বিধিহীন কর্ম কর, কোথাও যদি তুমি কিছু ভুলভাল করে থাক তাহলে কিন্তু তোমার সব কিছু নাশ হয়ে যাবে। তন্ত্রে আবার প্রণাম মন্ত্র আছে যেখানে পূজো হয়ে যাওয়ার পর সাধক মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বলে মা আমি বিধি জানিনা, ক্রিয়া জানিনা, মন্ত্র জানিনা তোমার পূজার ক্রুটি গুলো আমাকে ক্ষমা করে দিও। বেদে এই রকম ক্ষমা-টমার কোন ব্যাপারই নেই। বিধিহীন যদি হয়, মন্ত্রের উচ্চারণে সামান্যতম ভুল যদি হয় তাহলে সব বৃথা পরিশ্রম হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন কলিতে বেদমত চলে না। কারণ বেদের যজ্ঞের জন্য যে নিয়ম-নিষ্ঠা, তার জন্য যে উপকরণ সামগ্রী, তার জন্য যে দান দক্ষিণাদির দরকার কলিযুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কঠোপনিষদ এই জায়গা থেকেই শুরু হচ্ছে। নচিকেতা দেখছে বাবা এত বড় যজ্ঞ করল, কিন্তু দানে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য না দিয়ে ঘাটের মড়া গরুগুলো ব্রাহ্মণদের দান করছেন। ঠিক ঠিক আহুতি দেওয়া হলে আমি যা চাইব তাই পাব, মন্ত্রে যেমন বর্ণনা আছে তা দেবেই দেবে। কিন্তু যদি ঠিক ঠিক বিধি সম্মত ভাবে যজ্ঞ করা না হয় তাহলে কিন্তু অনেক রকমের ঝামেলা চলে আসবে। শুধু তাই নয়, বেদের যজ্ঞের নিয়ম পালন করা খুব কঠিন। আচার্য শঙ্কর নিজেই বলছেন *সম্যক্‌করণং দুষ্করম্*। ঠিক ঠিক ভাবে যজ্ঞ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ঠাকুর বলছেন এখন বদ্যির পাচন খেলে হবে না, এখন চাই ফিভার মিকশ্চার। এই যুগে যজ্ঞ সাধন করতে গেলে জীবনের অর্ধেক সময়ই চলে যাবে। ঠাকুর তাই অনেকবার বলছেন কলিতে বেদ মত চলে না। আমরা অনেক সময়ই ভাবি ঠাকুর এটা নতুন কিছু বললেন। ঠাকুর নতুন কিছু বলছেন না, উপনিষদেই আছে যজ্ঞ সাধন চলবে না, বেশীর ভাগ মানুষই পারবে না।

তবে কেউ কেউ পারতেন। তখনকার দিনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধি পাওয়ার জন্য ভালো পুরোহিত এনে যজমানরা তাঁকে যজ্ঞের কাজে লাগিয়ে দিতেন। রাজা দশরথের সন্তান হচ্ছিল না, সন্তান প্রাপ্তির জন্য এক যজ্ঞ করার আদেশ পেলেন। তখন রাজা দশরথ সেই যজ্ঞের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে নিয়ে এলেন। তিনি এত উচ্চ ক্ষমতাবান ঋষি যে যজ্ঞ করে আহুতি দিতেই অগ্নি দেবতা স্বয়ং নিজে পায়েসের বাটি নিয়ে উপস্থিত হয়ে

গেলেন। সেই পায়েস রানীদের খাইয়ে দিতেই তাদের সন্তান হয়ে গেল। কিন্তু সবার দ্বারা এই জিনিষ হবে না। ঠাকুর বারবার বলছেন চাপরাস না পেলে লোকশিক্ষা হয় না। ঠিক তেমনি ভালো পুরোহিত না হলে যজ্ঞ সফল হয় না। এই বিধিগুলো পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছেন। বাকি যত যজ্ঞ আছে তার কথা এখানে একবারও বলা হচ্ছে না, শুধু ছোট্ট অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, যে যজ্ঞ সমস্ত ব্রাহ্মণদের জন্য বাধ্যতামূলক, যেদিন তোমার উপনয়ন হয়ে গেলে সেদিন থেকেই তোমাকে অগ্নিহোত্র করতে হবে। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে গুরু দেখবেন শিষ্য ঠিকমত অগ্নি সেবা করেছে কিনা। গুরু শিষ্যকে অগ্নি দিয়ে বলে দিতেন আজ থেকে তুমি এই গরুগুলোর দেখভাল করতে থাক। শিষ্য সকাল বিকাল অগ্নিহোত্র করত আর গরুর দেখাশোনা করতে থাকত। এই একটা অগ্নিহোত্র কর্মকে উল্লেখ করে বলছেন –

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্
অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্
আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি।।১/২/৩।।

(যাঁর অগ্নিহোত্র দর্শ ও পূর্ণমাস রহিত, চাতুর্মাস্য কর্মশূন্য, আগ্রয়ণ কর্মবর্জিত, অতিথিসেবা শূন্য, আহুতি বর্জিত, বৈশ্বদেব কর্ম-শূন্য, অবিধিপূর্বক হুত – সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম যজমানের সপ্তলোক বিনষ্ট করে।)

অগ্নিহোত্র তো করছে কিন্তু এই অগ্নিহোত্রের কিছু বিধি যদি না পালন করা হয় তাহলে তার সাত পুরুষ নষ্ট হয়ে যাবে, আগে তিন পুরুষ পরের দিকে তিন পুরুষ আর মাঝখানে সে নিজে। কি কি অনিয়ম হলে সাত পুরুষ নষ্ট হয়ে যাবে? এটা শুধু অগ্নিহোত্রের ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে। তুমি তো মনে করছ দিব্যি অগ্নিহোত্র করে যাচ্ছ কিন্তু যিনিই অগ্নিহোত্র করবেন তাকে দর্শযাগ আর পৌর্ণমাস যজ্ঞ করতে হবে। এগুলো বেদের সময়কার নিয়ম। এত কঠিন ছিল বলে এগুলো সব উঠে গেছে। দর্শযাগ অমাবস্যার দিনে বিশেষ যজ্ঞ করতে হয় আর পৌর্ণমাস পূর্ণিমার দিনে বিশেষ যজ্ঞ করতে হয়। যারাই এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করেন তাদের সবাইকে এই দর্শযাগ আর পৌর্ণমাস যজ্ঞ করতে হত। তুমি এখন অগ্নিহোত্র করে যাচ্ছ কিন্তু দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ করলে না, তাহলে বুঝে নাও তোমার কি অবস্থা হবে। তুমি এতদিন ধরে যা কিছু করে এসেছ সব বৃথা হয়ে গেল। বর্তমান যুগে এসে এই অগ্নিহোত্রাদিই সকাল-বিকাল জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিকে দাঁড়িয়েছে।

ঠাকুর বলছেন লোকেরা তো লক্ষ লক্ষ জপ করছে কিন্তু কিছু হয় না কেন! বাগবাজারে যখন শ্রীমা ছিলেন তখন মায়ের অনেক মজার মজার ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। একজন মহারাজ প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার সময় দেরী করে আসতেন। শ্রীমা তাঁর কাছে রোজ দেরী করে আসার কারণ জানতে চাইলেন। মহারাজ তখন বলছেন 'মা! শরৎ মহারাজ বলেছেন জপ করার সময় যদি ইষ্ট থেকে মন সরে যায় তাহলে জপের সব ফল বাঘে খেয়ে ফেলে'। মহারাজ ইষ্টের ধ্যান করে জপ করছেন, মনটা একটু চঞ্চল হতেই আবার প্রথম থেকে জপ শুরু করতেন। এই করে তাঁর একশ আট বার জপ আর শেষ করতে পারতেন না। মহারাজের কথা শুনে শ্রীমা খুব হাসছেন। ঠিক তেমনি বলা হয় জপ করার সময় যদি হাতের আঙুল ফাঁক থাকে তাহলে জপের ফল ঐ ফাঁক দিয়ে গলে যায়। আমি ঠাকুরের নাম করছি তার ফল কি করে বেরিয়ে যাবে? আসলে বলতে চাইছেন জপ করার সময় হাতের আঙুল ফাঁক থাকা মানে বোঝা যাচ্ছে তোমার মন একাগ্র নয়। জপের সময় মন যদি একাগ্র না থাকে তাহলে ঐ জপের ফল কোথা থেকে আসবে! শরীর, মন, প্রাণ সব সজাগ থাকতে হবে। লক্ষ লক্ষ জপ করেও তাই আমাদের কিছু হচ্ছে না। জপ করতে বসলেই আমাদের সব কাজের কথা মনে পড়বে। জপটা যেন আমাদের কাছে অবসর। ধ্যান জপ হল ভগবানের কাছে যাবার জন্য। কিন্তু ওই সময় আমি অবসর সময় যাপন করছি। কিভাবে অবসর কাটাচ্ছি? মনের যত রকমের আবর্জনা আছে সেই সময়তেই সব সজাগ হয়ে কাজ করতে শুরু করবে। যাকে যত গালাগাল দেওয়ার, যাকে যত ভালোবাসা দেওয়ার, কাকে টাইট দিতে হবে, কি করলে ভালো হত, আজকে কি মাছ আনব। ঘুমোলে মানুষ যেমন বিশ্রাম

পায়, জপ করতে বসাটাও মনের একটা ভালো বিশ্রাম, কিছুক্ষণ পরেই ঢুলুনি এসে পড়ে। এই জপে কি আর ফল পাওয়া যাবে!

যদি দর্শযাগ আর পৌর্ণমাস না করে তাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের ফল তো নষ্ট হবেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও নাশ করে দেবে। তার সঙ্গে আছে *অচাতুর্মাস্য*, যখন আমাদের দেশে চাতুর্মাস্য চলে, অর্থাৎ বর্ষার সময় তখন আবার বিশেষ যজ্ঞ করতে হয়। ক্ষেতে থেকে যখন নতুন ফসল উঠবে তখন আবার বিশেষ যজ্ঞ করতে হয়। এখন আমরা যাকে নবান্ন বলি, এটা বেদের সময় থেকেই চলে আসছে। নবান্ন ভারতে তিনটে ঋতুতে করা হত, একটা বর্ষাকালে, একটা শরৎকালে আরেকটি বসন্ত ঋতুতে। তিন বার করে ঋতুর পরিবর্তন হবে তিনবার করে নতুন ভাবে যজ্ঞ করতে হত, এতেই বোঝা যায় সামান্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞই কত কঠিন সেখানে অন্যান্য যজ্ঞের কথা আর বলার অপেক্ষা লাগে না। শুধু অগ্নিহোত্র যজ্ঞকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য এত রকমের বিধি পালন করতে হত। এরমধ্যে একটা বিধিও যদি কোন ভাবে ভুল হয়ে যায় তাহলে সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

আর কি নিয়ম? *অতিথিবর্জিতম্*, রোজ একজন অতিথিকে আপ্যায়ন করে তৃপ্তি করে খাওয়াতে হবে। একদিন যদি অতিথি পূজন না করা হয় তাহলে পুরো অগ্নিহোত্রম্ যজ্ঞটাই মাটি হয়ে যাবে। তাই নয় *অবিধিনা*, বিধিপূর্বক যদি না করা হয়। অর্থাৎ ঠিক যে সময় অগ্নিহোত্র করার কথা সেই সময় যদি না করা হয়, আর এর সাথে কিছু কিছু কর্ম আছে যেমন বৈশ্বদেব কর্ম ইত্যাদি না করা হয় তাহলে সবটাই বিফল হয়ে যাবে। মূল কথা হল যত রকম রীতি নীতি আছে, যত নিয়ম-কানুন আছে তার মধ্যে একটি মাত্র নিয়ম যদি না করা হয় তাহলে সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আচার্য বলছেন *আয়াসমাত্রফলত্বাৎ*, এতে তোমার খাটনিই হল কোন ফল হল না। কলকাতা আর তার আশেপাশে এত দূর্গাপূজা হচ্ছে, কালীপূজা হচ্ছে এই মন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এগুলো শুধু খাটনিই মাত্র, কিছু অর্থের ধ্বংস কিন্তু কোন ফল হয় না। আমরা বলতে পারি – কেন কিছু লোকের এই কদিনের জন্য কিছু অর্থ রোজগার হচ্ছে। অর্থ রোজগার হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এটাতো পূজোর উদ্দেশ্য তো অর্থ কামান নয়, কাজ করানোর জন্য তো আরও অনেক উপায় আছে। কিন্তু ধর্মের দিক থেকে সব বেকার। চ্যারিটি করা, কিছু লোকের কর্মসংস্থান করা এগুলো পূজার উদ্দেশ্য নয়, এগুলো আয়াসমাত্র।

এতে কি হয়? *আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি* – পূজার যে কর্তা, অর্থাৎ যজমানের সাতটি লোক নষ্ট করে দেয়। স্বর্গলোক তো আর কোনদিন তুমি পাবেই না। শুধু যে পরিশ্রমই সার হল তাই নয় তোমার ভূঃ, ভূবঃ স্বঃ ইত্যাদি সাতটি লোক নষ্ট হয়ে যাবে। অথবা এর অর্থ হতে পারে যজমানের সাত পুরুষ নষ্ট হবে। এখানে বলছেন পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ আর পুত্র, পৌত্র আর প্রপৌত্র এই তিন অধঃস্তন পুরুষ আর যজ্ঞকর্তা নিজে এই সাতটি পুরুষ নষ্ট হয়ে যায়। এই আশঙ্কা শুধু সকাম কর্মেই থাকে, নিষ্কাম কর্ম যখন করছে তখন এই ভয় থাকে না। আমি ব্রাহ্মণ আমাকে অগ্নিহোত্র করতে হবে তাই করছি, কোন কামনা করে করছি না, এই নিষ্কাম মনোভাব নিয়ে যাঁরা অগ্নিহোত্র করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমি এই কর্ম করছি আমার শত্রু বধের জন্য বা আমার স্বধন প্রাপ্তির জন্য তখন এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

এই দুই নম্বর আর তিন নম্বর মন্ত্রকে মিলিয়ে অপরা বিদ্যার আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন তুমি জীবনে যদি ভোগ করতে চাও, তাহলে বেদে যে মন্ত্রগুলো বলা হয়েছে সেগুলো পালন কর। তবে মনে রেখ যদি এই মন্ত্রগুলো ঠিক ভাবে সাধন না করা হয় আর ঠিক ভাবে পালন করা খুবই কঠিন ও কষ্ট সাধ্য, তাহলে তুমি জেনে রাখ ফল তো তুমি পাবেই না বরঞ্চ তোমার নিজের সাতটি লোকের নাশ হয়ে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি সুদূর পরাহত হবে আর তোমার ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষ আর অধঃস্তন তিনপুরুষের সাথে তোমার নিজেরও নাশ হয়ে যাবে।

এই যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, এই অগ্নির সাতটি জিহ্বা। পুরানে অগ্নির এই রূপের বর্ণনা করে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাথে সাথে নানা রকমের কাহিনীও নিয়ে এসেছেন। অগ্নির সাতটি জিহ্বার বর্ণনা করে চার নম্বর মন্ত্রে বলছেন –

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গীনি বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা।।১/২/৪।।

(অগ্নির এই সাতটি লেলায়মান জিহ্বা – কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরুচী।)

যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হবে সেই অগ্নির সাতটি জিহ্বা, তাদের আলাদা আলাদা নাম। আলাদা আলাদা নামের আলাদা আলাদা অর্থ। অর্থাৎ অগ্নির যে রূপ তারই বর্ণনা অগ্নির সাতটি জিহ্বার মাধ্যমে কবির কল্পনায় বর্ণিত হচ্ছে। কালী শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ – অগ্নিকে যখন প্রথম প্রজ্বলিত করা হয় তখন তার চারিদিকে কালো ধুয়োর রঙ থাকে। এই কালো রঙের জন্য তাঁকে বলা হচ্ছে কালী। করালী মানে ভয়ঙ্করা – আগুন সব কিছুকে ভস্ম করে দেয়, তাই তাকে বলা হচ্ছে ভয়ঙ্করা। পশু জগৎ আগুনকে প্রচণ্ড ভয় পায়। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং এর জঙ্গল স্টোরিসে যেখানে মৌলির কাহিনী আছে, সেখানে জানোয়ার গুলো আগুনকে বলে রেড ফ্লাওয়ার। এই রেড ফ্লাওয়ারকে জানোয়ারগুলো প্রচণ্ড ভয় পায়। মৌলি যখন জানোয়ারদের মধ্যে বড় হচ্ছে তখন তারা মৌলিকে বোঝাচ্ছে তুমি হলে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ তুমি এই রেড ফ্লাওয়ারকে ব্যবহার করতে জানো, যেটা আমরা একেবারেই পারিনা। আগুনের শক্তি যার হাতের মুঠোয় আছে সেই হল সব থেকে শক্তিমান। এ্যাটম্ বোমা, এটাও আগুনের শক্তি, যার হাতে এই এ্যাটমের শক্তি আছে সেই বিশ্বের শক্তিমান।

গ্রীক পৌরানিক কাহিনীতে বলা হয় অগ্নি আগে স্বর্গেই ছিল। কিন্তু প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে অগ্নিকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল। সেইজন্য দেবতারা প্রমিথিউসকে স্বর্গ থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করে দিলেন। কিন্তু মানবকল্যাণের জন্য তিনি এটা করেছিলেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন অঙ্গি বা অঙ্গিরা বা অঙ্গিরস যাঁরা ছিলেন এনারাই হয়তো অগ্নির আবিষ্কার করেছিলেন। আসলে এনার হয়তো জানতেন অরণি মন্থনাদি করে কিভাবে অগ্নির জন্ম দেওয়া যায়। অগ্নির সাথে এদের নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে তাই নামের সাথে কোথায় যেন একটা মিল পাওয়া যায়। অগ্নিকে তখন সবাই দেখতেন, জঙ্গলে দাবানল লাগতে দেখছেন কিন্তু অগ্নিকে আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে আমার প্রয়োজন অনুসারে এর ব্যবহার করব, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এই কাজ একমাত্র মানুষই পারে, পশুজগৎ পারে না। অগ্নিকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে একমাত্র মানুষই পারে। আবার এই আগুনের নানা রকম রূপ আছে। বৃটিশরা যে ভারতে এসে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার পেছনে একটাই কারণ তাদের গুলি-গালার শক্তিটা বেশী ছিল। তাই আমাদের রাজারা কেউ বৃটিশ সৈন্যদের সামনে দাঁড়াতে পারল না। নেপোলিয়ন যখন ইউরোপ জয় করতে শুরু করলেন তখন জার্মানীর রানী একটা শান্তিবার্তাতে নেপোলিয়নকে বলেছিলেন আপনি বড্ড বেশী গুলিগালা ব্যবহার করেন। যার হাতে অগ্নির এই শক্তি আছে সেই কিন্তু বেশী ক্ষমতাবান। কম্যুনিস্টরা বলে শক্তির উৎস হবে বন্দুকের নল। বন্দুকের নল মানেই আগুন। এই আগুনকেই বলা হচ্ছে করালী, ভয়ঙ্করা। আগুনের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। সূর্যের যে তাপ এটাও অগ্নি। তার সাথে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা সবই অগ্নির রূপ।

অগ্নির আরেকটি জিহ্বা হল *মনোজবা*, মনোজবার অর্থ হল গতিশীল। মন যেমন চলে অগ্নিও সেই রকম মনের মত গতিশীল, সেইজন্য বলছেন *মনোজবা*। আগুনের শিখা চলতে থাকে। আগুনের শিখার এই ধর্মকে কি করে বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের এখন জানা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আমরা জানতে পারছি, কয়লা বা কাঠ যখন জ্বালান হয় তখন দাহ্য থেকে কিছু গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যায় না। যে গ্যাসটা জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে আসে সেটাকেই বলা হয় শিখা, এই শিখা

গতিশীল। সেইজন্য এর নাম *মনোজবা*। অগ্নির শিখার আরেকটি নাম *সুলোহিতা*। ঠিক ঠিক অগ্নি যখন প্রজ্বলিত হয় তখন তার শিখার খুব সুন্দর লাল রঙ হয়, এই সুন্দর লাল রঙের শিখাই *সুলোহিতা*, লোহিত মানে লাল, শুধু লাল নয়, সুন্দর লাল। *যা চ সুধূম্রবর্ণা* এবং যিনি সুধূম্রবর্ণ, তাঁর ধুয়োর রঙ। আর বলছেন *স্ফুলিঙ্গীনি*, এই শিখা থেকে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে এবং *বিশ্বরুচী* – বিশ্বরুচী মানে দেদীপ্যমানা, তাঁর চারিদিকে থেকে, যেদিক দিয়ে অগ্নিকে দেখা হোক না তাঁর শিখা যেন সৌন্দর্যময়ী দেদীপ্যমানা। সব দিকে তাঁর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে।

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ, লেলায়মানা, তাঁর এই সাতটি শিখা সব সময় চঞ্চল। এগুলোকে শিখা বলা হচ্ছে না, এই সাতটি হল অগ্নি দেবতার জিহ্বা, আমাদের আহুতি গ্রহণ করবার জন্য অগ্নি দেবতার জিহ্বা যেন সব সময় লক্‌লক্ করছে। অগ্নি হলেন একজন দেবতা কিন্তু এখানে অগ্নিকে দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কালী থেকে বিশ্বরুচী পর্যন্ত অগ্নির এই সাতটি জিহ্বা সব কিছুকে গ্রাস করে। আমরা যে অর্থে শিখা বলি, যে অর্থে আগুন বলি, যজ্ঞের অগ্নি ঐ অর্থে আগুন নয়, এগুলো যজ্ঞে অগ্নি দেবতার সাতটি জিহ্বা। যজ্ঞে যখন আমরা আহুতি দিচ্ছি তখন অগ্নি দেবতার এই সাতটি জিহ্বা সেটা গ্রহণ করেন। একে কখন আগুন বলে দেখতে নেই, এগুলো অগ্নিদেবতার জিহ্বা। এই দীপ্তিমন্ত অগ্নির জিহ্বাতে আহুতি দিলে কি হয়?

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
যত্রদেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ।।১/২/৫

(দেদীপ্যমান ওই অগ্নিজিহ্বাসমূহে যে অগ্নিহোত্রী যজ্ঞ করেন, সেই আহুতি সকল তাঁকে যথাকালে গ্রহণপূর্বক সূর্যরশ্মির দ্বারে অবশ্যই নিয়ে যাবেন, যেখানে সর্বাগ্রণী অধিপতি বাস করেন।)

যে পুরুষ, এই যে অগ্নির সাতটি জিহ্বার কথা বর্ণনা করা হল, এতে আহুতি দিতে থাকে মৃত্যুর পর সূর্যের রশ্মি তাকে যেখানে দেবতাদের বাস সেখানে নিয়ে যায়। অর্থাৎ যজ্ঞের সময় যজ্ঞের পুরোহিত যখন যজমানের হয়ে এই সাতটি জিহ্বাতে আহুতি দিতে থাকেন তখন সূর্যের রশ্মি এই আহুতির সারভাগ দেবতাদের কাছে নিয়ে চলে যায়। সেখানে তার পূর্বপুরুষরা দেবতাদের পতি ইন্দ্রের সঙ্গে বাস করেন। ঈশাবাস্যোপনিষদে বর্ণনা আছে যিনি সারা জীবন যজ্ঞ করে এসেছেন মৃত্যুর আগে তিনি বলবেন *ওঁ ক্রতো স্মর কৃতগং স্মর* ইত্যাদি, হে মন! সারা জীবন ব্যাপী আমি যে ভালো কাজ করেছি সেগুলোকে স্মরণ কর। তখন সে যে আহুতিগুলো দিয়েছিল সেই আহুতিগুলো যেখানে চলে গেছে সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাবে। বক্তব্য হল অগ্নিতে যখন আহুতি প্রদান করা হচ্ছে অগ্নি দেবতা সেই আহুতি গ্রহণ করছেন। অগ্নি দেবতা সেই আহুতিকে গ্রহণ করে সূর্যের রশ্মির সাহায্যে তার সূক্ষ্ম অংশকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছেন। উপনিষদের ঋষিরা এইভাবেই এগুলো দেখেছেন বা কল্পনা করেছেন। কারণ যে কোন আহুতিই দেবতাদের নামে অর্পণ করা হয়। এখন এই আহুতিগুলো দেবতাদের কাছে কিভাবে যাবে? তখন ঋষিরা বলছেন এই ভাবে যায়।

শ্রীমাকে এক জায়গায় জিজ্ঞেস করা হয়েছে – ঠাকুরকে যে ভোগ নিবেদন করা হয় ঠাকুর কি তা গ্রহণ করেন? শ্রীমা তার উত্তরে বলছেন – হ্যাঁ, তিনি গ্রহণ করেন, ঠাকুরের ছবি থেকে একটা জ্যোতি নির্গত হয়ে নিবেদিত বস্তুর সার অংশকে গ্রহণ করেন। ঠিক তেমনি স্বর্গে যে দেবতারা আছেন তাঁরা সূর্যের রশ্মির সাহায্যে যজ্ঞে অর্পিত বস্তুর সারটুকু গ্রহণ করেন। এতেই দেবতারা প্রসন্ন হন। এই ভাবকে গীতায় ভগবান বলছেন তোমরা এক অপরের সাহায্যকারী হও। তোমরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান কর তার প্রতিদানে দেবতারাও তোমাদের মঙ্গলসাধন করবেন। যেমন ইন্দ্রকে আহুতি দিলে ইন্দ্র ঠিক সময়ে তোমাকে বৃষ্টি দেবে। এই আহুতি কি পদ্ধতিতে দেওয়া হয় সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। অগ্নিকে প্রজ্বলিত করা হল। তার দক্ষিণ আর বাম পার্শ্ব আছে, মাঝখানে মূল অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিলে তার সার অংশ সূর্যের রশ্মিকে ধরে

পৌঁছে যাবে স্বর্গলোকে, যেখানে দেবতারা বাস করেন। যে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়েছে তখন সেটা সেই দেবতার কাছে চলে যাবে।

আহুতিগুলো তো দেবতাদের কাছে চলে গেল। এবার যিনি আহুতি দিয়েছিলেন তাঁর যখন মৃত্যু হচ্ছে, তখন সেই যজমানকে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা ফাঁক রেখে বলছেন – প্রথমে বললেন আহুতির কথা তারপরই বলছেন যজমানের কথা। যিনি আহুতিগুলো দিয়েছেন এবার তাঁকেই স্বর্গলোকে নিয়ে চলল। অর্থাৎ পরের মন্ত্রে বলছেন তাঁর শরীর ত্যাগ হওয়ার পর তাঁকে কিভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় –

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ।।১/২/৬।।

('এস এস' এই রূপ আহ্বাণ করতে করতে এবং 'এই তোমার পূণ্য, এটাই তোমার স্বকর্মচিত মার্গ এবং এটাই তোমার কর্মফলস্বরূপ স্বর্গ' এইভাবে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে করতে ও পূজা করতে করতে ওই দীপ্তিমান আহুতি সকল সূর্যরশ্মির অবলম্বনে সেই যজমানকে বহন করে নিয়ে যায়।)

এই মন্ত্রটি উপনিষদের কাব্যিক সৌন্দর্য। উপনিষদে কাব্যিক সৌন্দর্যের বর্ণনা বা কাব্যাত্মক কল্পনা ততটা দেখা যায় না। কারণ উপনিষদের ঋষিরা তথ্যের ব্যাপারে কিছু বলবেন না, তত্ত্বের দিকে অর্থাৎ মূল কথা থেকে একটুও সরবেন না। মূল কথাকেই একটু এদিক সেদিক করে সাজিয়ে ছন্দের মাধ্যমে বর্ণনা করছেন। সেইজন্য ঋষিরা কাব্যিক সৌন্দর্যের দিকে খুব একটা নজর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। কিন্তু এই ছয় নম্বর মন্ত্রটি ব্যতিক্রম, এখানে পুরোপুরি কাব্যিক সৌন্দর্যের রস পাওয়া যায়।

এহি এহি ইতি, এস এস এইভাবে আহ্বাণ করা হচ্ছে। কারা আহ্বাণ করছেন? *সুবর্চসঃ আহুতয়ঃ*, যে আহুতিগুলো আমি আগে দিয়েছি, সেই দীপ্তিবিশিষ্ট আহুতিগুলো জ্যোতির্ময় মুর্ত রূপ ধারণ করে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমার শরীর চলে গেছে। আমার সূক্ষ্ম শরীরকে আহ্বাণ করে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে সম্মান করে বলছেন এস এস, তুমি যজ্ঞ করে যে পূণ্য অর্জন করেছ তার ফল স্বরূপ এই ব্রহ্মলোক তোমার। আচার্য এখানে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যদিও ব্রহ্মলোক বলা হচ্ছে কিন্তু এটা আসলে স্বর্গলোক। কারণ একটা বিদ্যা যখন অনেক দিন ধরে চর্চা করা হয় তখন ধীরে ধীরে সেই বিদ্যার সূক্ষ্ম রূপটা স্পষ্ট হতে শুরু হয়। আমরা পরে পরে উপনিষদ বা গীতাতে পাই যাঁরা এই ধরণের যজ্ঞাদি করেন তাঁরা স্বর্গলোক পর্যন্তই যেতে পারেন। আর ব্রহ্মলোক বলতে যেটা বোঝায় তার সার অন্য রকম হয়। উপনিষদে তখন সব কিছু মিলে মিশে ছিল সেইজন্য স্বর্গলোক আর ব্রহ্মলোক দুটোর জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর সাত থেকে দশ নম্বর মন্ত্র আর এগার নম্বর মন্ত্রের কিছু অংশে কিছুটা স্বর্গ, কারা ভোগ করেন, ভোগ করার পর কি হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই চারটি মন্ত্রের বিষয়বস্তু সব মিলে মিশে রয়েছে। এই মন্ত্রগুলো আলোচনা করার আগে ভারতীয় হিন্দু ধর্মের পরম্পরাতে স্বর্গ বলতে কি বোঝায় আর অন্যান্য ধর্মে স্বর্গকে কিভাবে দেখা হয়েছে এই নিয়ে ছোট্ট একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

বিভিন্ন ধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন ও স্বর্গের ধারণা

উপনিষদে আমরা স্বর্গের বিশেষ কোন বর্ণনা পাইনা। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণার ভালো একটা বর্ণনা পাই যেখানে কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে বলছেন – *স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি* – হে যমরাজ! আমরা শুনেছি স্বর্গলোকে নাকি কোন ভয় নেই। ভয় বস্তুটা একমাত্র ইহজগতেরই বিষয়। এই জগতে সব কিছুতেই ভয় – টাকা চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়, প্রিয়জনের মৃত্যু হয়ে যাওয়ার ভয়, আমার নিজেরই মৃত্যু হবে, বার্ধক্যের ভয়, ব্যাধির ভয়, মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়, দারিদ্রতার ভয়, নানান রকমের ভয়

আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। নচিকেতা বলছেন স্বর্গে তো কোন ভয় নেই। সব থেকে কিসের থেকে ভয়? *ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি* আপনিও নাকি সেখানে নেই, মানে স্বর্গে নাকি মৃত্যু হয় না, আর স্বর্গে জরা আসেনা, ওখানে সবাই চিরযৌবনই থাকে। শুধু তাই নয় *উভে তীর্ত্বাহশনায়াপিপাসে*, স্বর্গে নাকি খিদে পায়না, জল তেষ্টা পায়না। সেখানে শুধু আনন্দই আনন্দ। স্বর্গের এই বর্ণনাকে বিপরীত করে দিলে সেটাই মর্ত্যলোক হয়ে যাবে, যেখানে আমরা বাস করি আর এই চিন্তা-ভাবনা করছি। মর্ত্যলোক তাহলে কোন্ জিনিষটা বেশী কষ্ট দিচ্ছে? মানুষ যে জিনিষটার জন্য অভাব বোধ করে সেটাকে পাওয়ার জন্যই ছুটে মরে। কঠোপনিষদের এই মন্ত্রে নচিকেতা যখন যমরাজকে স্বর্গের বর্ণনা করছেন সেখানে কিন্তু নচিকেতা যমরাজকে আগেই ছোট করে দিচ্ছে। যমরাজ একজন দেবতা, কিন্তু নচিকেতা বলছেন আপনিও সেখানে নেই। *শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে*, যে স্বর্গে যায় সে শুধু আনন্দই উপভোগ করে। তার মানে মর্ত্যলোকে এই জীবনে আনন্দের গন্ধ মাত্র নেই। তার আগে বলছেন স্বর্গলোকে মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে যায়। তার মানে ক্ষুধা তৃষ্ণা হল মানুষের এক বিশাল জ্বালা। ক্ষুধা নিবারণ আর তৃষ্ণার শান্তি অর্থাৎ সমস্ত কামনার পুর্তি যদি হয়ে যায় তাহলে জীবনের সব কিছুই তো তার হয়ে গেল। আর সেখানে কোন ধরণের ভয় নেই। মানুষের সব থেকে ভয় সে একদিন মারা যাবে আর তার বৃদ্ধাবস্থা হবে, এই দুটোর কোনটাই স্বর্গে নেই। স্বর্গে সবারই বয়স পঁচিশ তিরিশের মধ্যে। মানুষ মাত্রেই সুখের সন্ধানে ছুটে চলেছে। সে ভাবে এখন আমি যে পরিস্থিতিতে আছি, এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবো স্বর্গলোকে। সেই স্বর্গলোকে যাওয়ার কি পথ? এখানেও নচিকেতার প্রশ্নে পরিষ্কার নেই। তিনি আলাদা স্বর্গের কথা বলছেন, মুক্তির কথা বলছেন। প্রথম দিককার উপনিষদ বলে নচিকেতা সাধারণ মানুষের ধারণাকে অবলম্বন করেই প্রশ্নটা করেছেন। সাধারণ মানুষ মারা যাবার পর কি চাইতে পারে? এই কটি জিনিষই সে চাইবে। সেখানে যেন ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট না হয়, জরা-মৃত্যুর কোন ভয় যেন সেখানে না থাকে আর সব সময় যেন আনন্দই থাকে। আশাবাদী মানুষ এই ধরণের চিন্তা-ভাবনাই করে।

স্বর্গ নরকের বর্ণনা করে দেশ-বিদেশের অনেক কবি সাহিত্যিকও অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। বেশীর ভাগ রচনায় দেখা গেছে যখন স্বর্গের বর্ণনা করছেন তখন খুব বেশী বর্ণনা দিতে পারেন না। আর নরকের বর্ণনায় ভাষার ফুলঝুরি ঝরতে থাকে। মিল্টনের Paradise Lost কবিতায় বা ইলিয়ড ওডিসিতে বা আমাদের পুরানে নরকের বর্ণনা সবার কাছেই খুব আকর্ষণীয়। যখনই নরকের বর্ণনা শুরু করেন তখন সাহিত্য প্রতিভাকে উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছেন। পাঠক পাঠ করতেই শিহরিত হয়ে পড়ে। সেই তুলনায় স্বর্গের বর্ণনা ঠিক যেন জমে না। এর কারণ হল স্বর্গের অনুভূতিটা কারুরই নেই। অন্য দিকে এই জগৎটা এতই নরকতুল্য যে এখানে এত দুঃখ একটু বর্ণনা করলেই সেটা নরকের মত হয়ে যায়। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে বলছেন এই জগতে সুখের গন্ধ মাত্র নেই। তাই সুখের বর্ণনা কি আর করবে। খুব বেশী হলে বলবে ইন্দ্রসুখ যে কি তা তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। কিন্তু নরক যন্ত্রণার সময় দারুণ বর্ণনা করে যাচ্ছেন। কারণ এই জগৎটা পুরো নরক। আবার যারাই নরক যন্ত্রণার বর্ণনা করে তাদের বলা হয় নিরাশাবাদী, এদের নৈরাশ্যের ভাব। না, না, এখানে নৈরাশ্যের কোন ভাব নেই, এটাই বাস্তব, এরাই প্রকৃত বাস্তববাদী।

আমরা এখানে স্বর্গের কথাই বলব, কারণ উপনিষদে নরকের কোন কথা বলা হয় না। উপনিষদ স্বর্গের কথাই বলে। বিভিন্ন ধর্মে স্বর্গের ধারণা কি রকম জানলে এই চারটে মন্ত্রের সাথে স্বর্গের কি সম্পর্ক সেটা বুঝতে সুবিধা হবে। বিশ্বে চারটে পুরনো সভ্যতার ইতিহাস জানা যায়। এর মধ্যে সব থেকে পুরনো সভ্যতা হল ঈজিপ্ট, এর সাথে আছে চীন সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা আর চতুর্থ গ্রীসের সভ্যতা। এই চারটে সভ্যতাই ঠিক ঠিক প্রাচীন সভ্যতা। এর মধ্যে ঈজিপ্টের সভ্যতা আর নেই, গ্রীস সভ্যতা অন্য সভ্যতার সাথে মিশে গেছে, চীন সভ্যতা অন্য দিকে ঘুরে গেছে। ভারতীয় সভ্যতাই একমাত্র প্রাচীন সভ্যতা যে নিজের পরম্পরাকে এখনও ধরে রেখেছে। ঈজিপ্ট বা মিশরীয় সভ্যতা, যাদের সব থেকে বড় অবদান মিশরের পিরামিড, মমি, এরা মৃত্যুর পরের জীবনকে খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন। এমন কি তাদের পাশাপাশি যে জুহুদিরা ছিল তারাও মৃত্যু অতীত জীবনকে এত বেশী গুরুত্ব দেয়নি। এদের কাছে স্বর্গ বলে যে ধারণা ছিল সেটা পৃথিবী থেকে

একটু উপরে। সেটা আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা মানে আকাশে যে তারা আছে, সেটা তারও উপরে। এটা একেবারে বাস্তব Physical Space। এদের ধারণা, মানুষ মারা যাবার পর তার আত্মা physical journey করে ঐ space এ যায়। এবার মনে করুন আত্মা মৃত শরীর থেকে বেরিয়ে, আমাদের ভাষায় সূক্ষ্ম শরীর এবার যাত্রা করে যাবে সেই স্বর্গে, যেটা অনেক দূরে। এই যাত্রা পথের ধারে বিভিন্ন প্রাণী বা জীব দাঁড়িয়ে থাকে আর তারা সব সময় চেষ্টা করে তার যাত্রা পথটাকে আটকে দিতে, যাতে স্বর্গ পর্যন্ত না যেতে পারে। এই বাধাকে অতিক্রম করে যে আত্মাগুলো স্বর্গে পৌঁছে যায় তাদের হৃদয় বা বলা যেতে পারে মনকে সত্যের পালক (Feather of Truth) দিয়ে ওজন করা হয়। আসলে এই ভাষা এতই পুরানো যে আমাদের ভাষায় এগুলো সঠিক অনুবাদ হয় না। যদি দেখে কোন আত্মার পাপ দাড়িপাল্লার ওজনে ভারী হয়ে গেল, তখন সেই আত্মাকে সঙ্গে সঙ্গে অশুভ শক্তি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। আসলে বলতে চাইছেন তুমি যদি বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে স্বর্গে পৌঁছেও যাও তাহলে সেখানে আগে তোমার কর্মগুলোকে মাপা হবে। খারাপ কর্ম যদি একটুও থাকে তাহলে তোমার স্বর্গে আসাটাই বিফল হয়ে যাবে, তোমাকে এরা স্বর্গে থাকতে দেবে না। স্বর্গে থাকতে হলে তোমার মধ্যে একটুও পাপের লেশ পর্যন্ত যেন না থাকে। এখান থেকেই মিশরীয় সভ্যতাতে মমির ধারণা এসেছিল।

কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ স্বর্গ নরকের ধারণা আমরা যেটা পাই সেটা ইসলাম, খ্রীশ্চান ও জুহুদি ধর্মে। এমনকি জুহুদি ধর্ম আর এই তিনটে ধর্মের যে প্রভাব সেটা নিয়ে বর্তমান কালে অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা অনেক মতামত দিচ্ছেন, যেখানে বেশীর ভাগ পণ্ডিতরাই বলছেন পার্সি ধর্মের প্রভাব এই তিনটে ধর্মের উপর সব থেকে বেশী পড়েছে। জুহুদিদের মূল ভূখণ্ড ছিল বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্র ইরান। ইরান ছিল আসলে পার্সিদের দেশ। ঐতিহাসিকদের একটা অংশ মনে করেন পার্সি আর হিন্দুরা ভাই ভাই, একই জাত। কোন ভাবে দুটো জাতি আলাদা হয়ে গেছে। এই নিয়ে নানা রকমের তত্ত্ব ও তথ্য দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলে এরা সবাই নর্থ পোলের কাছাকাছি অঞ্চলে একসাথেই ছিল। অত্যধিক তুষারপাতের ফলে এরা নীচের দিকে সরতে সরতে একটা জায়গায় এসে দুটো ভাগে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। একটা ভাগ ইরানের দিকে চলে গিয়েছিল আরেকটা ভাগ ভারতের ভুখণ্ডে আশ্রয় নিল। পার্সিদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনেক আচার ব্যবহার হিন্দুদের সঙ্গে এক। যেমন অগ্নি দেবতার পূজা, পার্সিদের এখনও Fire Temple আছে। পার্সিদের এখনো মূল পূজা অগ্নির উপাসনা। হিন্দুরাও অগ্নির উপাসক, এখানে উপনিষদেই আমরা দেখছি অগ্নিকে নিয়েই চলছে। ধর্মের অনেক ধারণা পার্সি আর হিন্দুদের মধ্যে এক। পার্সিরাই হিন্দুদের সঙ্গে সব থেকে বেশী মেলে।

পার্সিদের ভগবান হলেন অহুর মাজদা (Ahura Mazda)। মাজদা মানে আলো। পার্সিদের যে ঋষি জরাথুষ্ট্র, জরাথুষ্ট্রের যদি সংস্কৃতের অনুবাদ করা হয় তখন এর অর্থ হয়ে যাবে যার কাছে অনেক উট আছে। যেমন অশ্বপতি মানে যার কাছে অনেক ঘোড়া আছে, গজপতি, যার কাছে অনেক হাতি আছে। উষ্ট্র মানে উট সেখান থেকে জরাথুষ্ট্র মানে যার কাছে অনেক উট আছে। এই রকম পার্সি ধর্ম আর হিন্দু ধর্মে অনেক সাধারণ ব্যাপার আছে। এই জরাথুষ্ট্রকে একবার অহুর মাজদা স্বর্গে নিয়ে গেলেন। এই ধারণা ইসলামেও গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে জরাথুষ্ট্রকে অহের মাইনুকে দেখান হল। এই অহের মাইনু হল দুষ্টদের দেবতা। হিন্দুদের যেমন অসুর আর দেবতা আছে। মজার ব্যাপার হল অহুর মজদার অহুর শব্দটা এসেছে অসুর থেকে। হিন্দুদের কাছে অসুর হল অশুভ, কিন্তু পার্সিদের কাছে অসুর হল ভালো। অসুরের ক্ষেত্রে কিভাবে দুই ভাইয়ের চিন্তাধারা পাল্টে গেছে। পৌরানিক দৃষ্টিতে দেখলে ব্যাপারটা সহজেই মিলে যায়। পৌরানিক দৃষ্টিতে অসুর আর দেবতারা ভাই ভাই। কৌরব আর পাণ্ডবরা যেমন একই বংশের দুটো ধারা অসুর আর দেবতারাও দুটো ধারা।

যাই হোক আহুর মাজদা জরাথুষ্ট্রকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে বললেন এই অহেন মাইনু হল অশুভ শক্তির দেবতা, এ কিন্তু মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে। তাই পৃথিবীলোকে গিয়ে মানুষকে এর হাত থেকে বাঁচাও। এটাই হয়ে গেল যিশু বা মহম্মদের মত প্রফেটের ধারণা। অনেকে বলেন জরাথুষ্ট্র যিশু খ্রীষ্টের প্রায় চৌদ্দশ বছর আগের। জরাথুষ্ট্রের মতাদর্শ বা পার্সিদের যে ধর্ম জহুদিদের সব থেকে বেশী প্রভাবিত করেছিল। মুসলিমরা পুরোদমে

পার্সিদের ধর্মকে গ্রহণ করেছে আর খ্রীশ্চানরাও পুরোপুরি নিয়েছে। এই নিয়ে এই ধর্মগুলোর মধ্যে খুব বিতর্ক চলছে। এমনকি অনেক খ্রীশ্চনরা বলছে আমাদের পুরনো অনেক যে ধারণা বিশেষ করে স্বর্গ নরক সম্বন্ধে এগুলো মূল খ্রীশ্চান ধর্মে ছিল না, এগুলো পার্সিদের প্রভাবে খ্রীশ্চান ধর্মে ঢুকে পড়েছে। আসলে খ্রীশ্চানরা দেখাতে চাইছে খ্রীষ্ট ধর্ম খুবই মৌলিক ও পবিত্র ধর্ম। প্রথম দিকে খ্রীশ্চানরা এগুলোকে নিয়েই খুব বাড়াবাড়ি করেছিল, পরে যখন লোকেরা সমালোচনা করতে শুরু করেছে তখন এরা খুঁজে বার করছে কার ঘাড়ে এই জিনিষগুলোকে ফেলা যায়, কাউকে না পেয়ে শেষে পার্সিদের উপর ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু পার্সিদের খুব বেশী প্রভাব এই ধর্মগুলোর উপর পড়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তাদের একজন দেবতা আছেন যিনি আলোর দেবতা, আরেকজন দেবতা তিনি হলেন অন্ধকারের দেবতা। এদের মধ্যে একজন প্রফেট, তিনি হলেন জরাথুষ্ট্র। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল স্বর্গে, মহম্মদের মত তাঁরও উপলব্ধি হয়েছিল। সেখানে তাঁকে বলা হল তুমি পৃথিবীলোকে গিয়ে লোকেদের শিক্ষা দাও যাতে তারা শুভ কর্ম করে, শুভ চিন্তন করে আর শুভ কথা বলে। এগুলো যদি তারা না করে তাহলে তারা কিন্তু অহের মইনু, যে অন্ধকারের দেবতা, তার রাজ্যে চলে যাবে।

দ্বৈতবাদ বলতে ভালো ও মন্দকে যেভাবে পরিষ্কার করে দেখান হয়ে থাকে, জুরুথ্রিজিম্ ধর্ম ঠিক সেইভাবে দ্বৈতবাদ নয়। এখানে ভালো যিনি তিনি হলেন আহুর মাজদা আর মন্দের দেবতা হলেন অহের মইনু। কিন্তু দুপক্ষের যে লড়াই সেটা অসম লড়াই। অসম লড়াইতে ভালো সব সময় জয়ী হয়। ওঠা-নামা চলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালোর জয়ই হবে। এই ব্যাপারটা পুরোপুরি হিন্দু মতের সঙ্গে এক। হিন্দুদের সত্যনাশ, মানে সব কিছু শেষ হয়ে গেল, এই পরিস্থিতি কখন হয় না। নরকে কিছু দিন হয়ত পড়ে থাকবে কিন্তু আবার সেখান থেকে সে উঠে আসবে। নাশ বলে হিন্দুধর্মে কিছু হয় না। পার্সিদের মধ্যেও ঠিক এই ধারণা। কিছু দিন হয়ত পড়ে থাকবে কিন্তু সেখান থেকে সে আবার উঠে দাঁড়াবে, বিনাশ বলে কিছু নেই। জুরুথ্রিষ্ট ধর্ম পুরোপুরি Ethical Religion, এখানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল পরিষ্কার করে বলে দেওয়া আছে। পুরানেও ঠিক এইভাবে এটা ভুল এটা ঠিক পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। বেদান্ত কিন্তু তা নয়, বেদান্তে সত্ত্বগুণের কথা বলবে, বলে বলবে ভালো মন্দ দুটোকেই তোমাকে পেরিয়ে যেতে হবে। পৃথিবীর সব ধর্মই ভালো ও মন্দকে আলাদা করে দিয়ে ভালোকে ধরে থাকতে বলবে, একমাত্র বেদান্তই বলছে তোমাকে ভালো ও মন্দ এই দুটোকেই পেরিয়ে যেতে হবে।

পার্সি ধর্মে বলা হয় তুমি যদি অশুভ কর্ম কর, অশুভ চিন্তন কর আর অশুভ কথা বল তাহলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার দুটো পথ তোমার জন্য রাখা হয়েছে। একটা হল তুমি যদি দোষ স্বীকার করে নাও তাহলে কিন্তু তুমি বেঁচে যাবে। আর দ্বিতীয় হল পূণ্যকে হস্তান্তর করা যায়। তুমি যদি তার বদলে কোন পূণ্য কর্ম করে নাও তাহলে তোমার অশুভ কর্মজনিত পাপ কেটে যাবে। এটাই কিছুটা হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্তের মত। পরের দিকে এই ধর্মের নামই হয়ে গেল Ethical Monotheism। সৎ হওয়া আর একেশ্বরবাদ, স্বর্গ, নরক পার্সিদের এই ধারণাগুলো সবই খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্ম নিয়েছে।

এরপর আসছে গ্রীক সভ্যতা। আজকে পাশ্চাত্যের যে স্বর্গ নরকের ধারণা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এর মধ্যে সব থেকে বেশী প্রভাব রয়েছে গ্রীকদের। অ্যারিস্ট্যটল, প্লেটো এনাদের দর্শন আজকের দিনের পাশ্চাত্য সভ্যতাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। গ্রীকরা ছিল Master of Mythology। তাঁরা প্রচুর মিথস্ দিয়ে গেছেন। ইলিয়াড ওডিসি সব ওনাদেরই লেখা। গ্রীকরা অত্যাধিক চিন্তাশীল জাতি, অন্য দিকে রোমানরা ছিল অত্যন্ত বর্বর জাত। রোমানদের আক্রমণের সামনে তাই গ্রীকরা দাঁড়াতেই পারল না। জগতের এটাই নিয়ম, ধর্মপ্রাণ লোক কখনই দুষ্ট লোকদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। বর্বর শক্তির সামনে সভ্য সমাজ দাঁড়াতে পারেনা। ফলে বর্বর শক্তি তো ক্ষমতার সিংহাসনে বসে পড়ে কিন্তু তারপর তাদের মনে হয় আমরা ঠিক সুবিধার নয়। আলেকজাণ্ডারও ছিলেন বর্বর। সে যখন ইরানে পৌঁছাল, ইরানে তখন পার্সিরা থাকত। ইরানের সভ্যতা তখন খুবই উন্নত ছিল আর তাদের সংস্কৃতি তখন বিশ্বসেরা। ইরানিদের ওই উন্নত সংস্কৃতি দেখে আলেকজাণ্ডারের সব দলবল সেখানে বসে গেল। ইরানের লোকের যেভাবে মানবিক সুখভোগ করতে আলেকজাণ্ডারের

লোকেরাও সেইভাবে সুখভোগ করতে শুরু করে দিল। এত প্রাচুর্য ছিল যে একটা প্রচলিত ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে ইরানের রাজার লোকেরা প্রস্বাব করার পাত্রটাও সোনার ব্যবহার করত। আলেকজাণ্ডারের কমাণ্ডাররাও ওই রকম করতে শুরু করে দিয়েছে। এর আগে সবাই ছিল বর্বর।

রোমনরা গ্রীক দেশে এসে তাদের সমস্ত সংস্কৃতি, দর্শনকে নিজের করে নিয়ে নিল। ইতালি তখন হয়ে গেল পাশ্চাত্য জগৎ। রোমে যখন গ্রীস দেশের সভত্যার প্রভাব ঢুকে গেল সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুরো পাশ্চাত্য জগতে গ্রীস সভ্যতার প্রভাব ছড়িয়ে গেল। খ্রীশ্চান ধর্ম যখন পাশ্চাত্য জগতে ঢুকতে শুরু করেছে তখন বাইবেলের যে আধ্যাত্মিক বাণী আর গ্রীক দার্শনিকদের মতাদর্শ এই দুটো মিলে মিশে গিয়ে একটা নতুন ধরণের ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি তৈরী হল। যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা সবাই বানরের মত নকল করছি আসলে এটা কোন সংস্কৃতিই নয়। কারণ এরা কিছু জিনিষ নিয়েছে অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস থেকে, কিছু জিনিষ নিয়েছে গ্রীক পৌরানিক থেকে, কিছু জিনিষ নিয়েছে যিশু খ্রীষ্টের থেকে আর নিজেরা যে আগে থাকতেই বর্বর ছিল এই সব কিছু মিলেমিশে এক উদ্ভট বিচিত্র সংস্কৃতির জন্ম নিল। আর ভারত এখন এটাকেই নকল করছে।

গ্রীসদের যেটা সমস্যা ছিল গ্রীক পরিভাষায় হেভেনের দুটো অর্থ করা হত। প্রথমটার অর্থ আকাশ অর্থে করা হত। হেভেনের আরেকটি অর্থ যেখানে দেবতাদের বাস। আমাদের এখানেও আকাশ দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয় – একটা হল আকাশ অর্থে, যেটাকে আমরা স্পেস বলছি, আরেকটি অর্থ খুব সূক্ষ্ম উপাদান, যেটাকে বলা হয় পঞ্চ মহাভূত। গ্রীকদের হেভেনের একটা অর্থ আকাশ আরেকটি অর্থ স্বর্গ। আর এই দুটোর মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান হত। পদার্থ বিজ্ঞানে এখনও স্টারস বলতে গিয়ে বলা হয় heavenly body। নক্ষত্র, সূর্য এগুলোকে কেন heavenly body বলছে? কারণ আকাশ গ্রীসদের কাছে অর্থ ছিল হেভেন আবার আকাশ মানে তাদের কাছে স্বর্গ। গ্রীসদের থেকে এই চিন্তাধারা রোমানর নিল, পরে রোমানদের থেকে যখন পুরো ইউরোপ নিয়ে নিল তখন এই দুটো গেল মিশে আর পরস্পর আদান-প্রদানে পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু গ্রীকদের নিজেদের যেটা ভাব ছিল – একটা হল স্বর্গ যেখানে দেবতারা বাস করেন আর তার সাথে আকাশ, মাথার উপরে খোলা আকাশ যেখানে গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেখা যাচ্ছে, যদিও বলছে হেভেন কিন্তু এটা আকাশ। ঐ হেভেন শব্দটাই ব্যবহৃত হত যেখানে দেবতারা বাস করেন। এটা শব্দের জন্যই হয়েছে। মৃত্যুর পর কি হয় এর আসল গ্রীক শব্দ হল হ্যডেস (Hades)। মিশরীয় সভ্যতা বা ঈজিপ্সিয়ান সভ্যতায় স্বর্গ যেমন ছিল বাস্তব আকাশ এই Hadesটাও ছিল একটা বাস্তবিক জায়গা, যেখানে মানুষ মারা যাবার পর তার আত্মা চিরদিনের জন্য বাস করে। এই Hades জায়গাটা এরা বলে পৃথিবীর ভেতরে মাঝখানে। আমাদের পাতাললোকের মত। এই Hades কোন নরক-ফরক কিছু নয়, এটা আত্মার বাসস্থান, সবার আত্মাই এখানে এসে বাস করে। ওখানে আত্মার কোন দুঃখ কষ্ট নেই, পেছনে যারা থেকে গেছে তারাই তার জন্য কাঁদছে।

মজার ব্যাপার হল হেভেনে সব সময় দেবতারাই থাকে, কোন মানুষ কোন দিন হেভেনে যেতে পারবে না। এটা হল গ্রীক পৌরানিক মত। আমাদের যেমন নাগলোক, গন্ধর্বলোক সব আছে, গ্রীক পৌরানিকেও এই ধরণের বিভিন্ন লোকের ধারণা পাওয়া যায়। একটা লোকে অন্য ধরণের লোকের বাসিন্দারা থাকতে পারবে না। হেভেনে শুধু দেবতারাই থাকবেন। মানুষ মৃত্যুর পর তার আত্মা ঐ Hades গিয়েই থাকবে, আর এখানে চিরদিনের মতই থাকবে। এই ধারণাটা গিয়ে জায়গা করে নিল ইসলাম আর খ্রীশ্চান ধর্মে, যা কিছু হবে সবই চিরদিনের মত, স্বর্গটাও চিরদিনের মত হবে আর নরকটাও চিরদিনের মত হবে। মজার ব্যাপার হল ওডিসিতে যখন এই কাহিনীটা নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে একটা জায়গায় দেখান হয়েছে আত্মাগুলো সব হ্যডেসে আছে, তারা আবার ফেরত চলে আসবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেরোবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটা ফুটনোট আছে যেখানে বলা হচ্ছে গ্রীকদের মধ্যে আগে এই বিশ্বাস ছিল আত্মা ওখানে থাকবে, কিছু দিন থাকার পর আবার তারা পৃথিবীলোকে ফিরে যাবে। কিন্তু এই বিশ্বাসটাকে তারা পাল্টে দিল। হিন্দুদের এই ধারণাটা প্রথম থেকেই চলে আসছে।

এখন যদি গ্রীক দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই – তাদের মতে হ্যাডেস, এটা কোন কাল্পনিক নয় একেবারে ভৌগলিক অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থিত, দিল্লী, কলকাতার মত। পৃথিবীর ভেতরে মাঝখানে হ্যেডস্ বলে একটা জায়গা আছে যেখানে মৃত আত্মারা বাস করে। একদিকে উপরে যেখানে হেভেন অন্য দিকে হ্যেডস্ একটা শব্দ ছিল যেখানে আত্মা থাকবে। গ্রীক পৌরিনিকে তাকে বানিয়ে দেওয়া হল পৃথিবীর গর্ভ, পৃথিবীর গর্ভ নীচের দিকে। এইভাবে হেভেন হয়ে গেল উপরে আর হ্যেডস্ হয়ে গেল নীচে। এইখান থেকে পরের দিকে হেভেন আর হেইলের যে ধারণার জন্ম হল সেখানে সব ভালোগুলো হয়ে গেল উপরে আর খারাপ যা কিছু সব নীচের দিকে চলে গেল। হিন্দুদের ক্ষেত্রে পাতালের সব কিছুই খারাপ নয় বরঞ্চ বলা হয় পাতালের ঐশ্বর্য নাকি স্বর্গ থেকেও বেশী। আর বেদান্তের দৃষ্টিতে পাতাল আর স্বর্গ সমান। একেই উপর নীচ ধারণা আগে থাকতেই ছিল তার উপর আবার এসে গেল জহুদিদের বিশ্বাস। জহুদিদের বিশ্বাস আর গ্রীক বিশ্বাস মিশে গিয়ে যে খ্রীশ্চান বিশ্বাসের জন্ম নিল সেখান থেকেই সব কিছু উলোট-পালোট হয়ে গেল।

এর মধ্যে আছে আবার একটা চৈনিক মত। চৈনিক ভাব-ধারণা আমরা বেশী পাই কনফুসিয়াস থেকে। কনফুসিয়াসের মতাদর্শ যেটা চীন দেশে খুব প্রচলিত তার আঞ্চলিক পরিভাষা হল টিয়ান্। টিয়ান্ মানে স্বর্গ। আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্যুর পর এই টিয়ানে থাকেন। টিয়ান্ জায়গা থেকেই সবাই শক্তি পায়, এমনকি রাজারা যে শক্তি, ক্ষমতা পায় এই টিয়ান্ থেকেই তা পায়। টিয়ান্ একটা শুধু ভৌগলিক স্থানই নয়, এই টিয়ান্ মানে স্বর্গ সব কিছু দেখতে পায়, সব কিছু শুনতে পায় আর সব কিছুই বুঝতে পারে। মানুষ যা কিছু করছে, ভাবছে সেটা গিয়ে টিয়ানে গিয়ে একটা প্রভাব পড়ে। এই টিয়ান্ যখন রেগে যায় তখন পৃথিবীতে নানা রকমের উৎপাত হতে শুরু হয় – বন্যা, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ইত্যাদি। আর এই টিয়ান্ যখন মানুষের উপর খুশি হয় তখন পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।

চৈনিক বিশ্বাস আর ভারতীয় বিশ্বাসে দুটো জিনিষ আসছে। প্রথম হল পিতৃলোকের বিশ্বাস, দ্বিতীয় হিন্দুদের স্বর্গে যে দেবতারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দিলে তারা প্রসন্ন হয়ে ভালো দেন আর রেগে গেলে খারাপ দেন। গ্রীকদেরও অনেক দেবতা ছিল। গ্রীক দেবতাদের রাজা হলেন জুপিটার, হিন্দুদের মত তাদেরকেও অনেক পূজাদি নিবেদন করতে হয়। এই দেবতাদের সবার কাজ নির্দিষ্ট ছিল, এরা আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করে, কিছুটা হিন্দুদের মতই। কিন্তু গ্রীকদের পিতৃপুরুষরা সবাই যাবে হ্যেডসে, পিতৃপুরুষরা কোন দিন দেবতাদের মধ্যে যেতে পারবে না। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয় না। আমাদের এখানে সাধারণ পিতৃরা পিতৃলোকে থাকবেন, কিন্তু পিতৃদের মধ্যে যাঁরা আরও উচ্চ স্তরের তাঁরাও দেবতা হয়ে দেবলোকে চলে যেতে পারেন। হিন্দুদের মধ্যে সব রকম ধারণাই একটু আধটু পাওয়া যাবে, কিন্তু হিন্দুধর্ম পুরোপুরি স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়িয়েছে, কারুর কাছে কিছু ধার করেনি।

চৈনিক বিশ্বাসে এটা খুব দৃঢ় হয়ে আছে – কনফুসিয়াস এমন কথাই বলছেন, যে টিয়ানকে অসন্তুষ্ট করে তার আর কোথাও যাবার স্থান থাকে না। আমাদের ভাষায় হবে – যে ইষ্টকে অসম্মান করে তার আর কোথাও যাবার জায়গা থাকে না। বিভিন্ন জায়গাতে এই ভাবগুলো বিভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে।

জুদাইজিম্ হল খ্রীষ্টান আর ইসলাম ধর্মের ঠিক ঠিক মা। যদিও এখন ইসলাম মানতে চায় না কিন্তু জহুদিদের অনেক বিশ্বাস ও মত ইসলামকে প্রভাবিত করেছে। মদিনাতে জহুদিরা প্রচুর সংখ্যায় বাস করত। মহম্মদ যখন মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনাতে ছিলেন, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সেই সময় অনেক কিছু কথা মহম্মদ মদিনাতে থাকাকালিন জহুদিদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। যার জন্যে পরের দিকে ইসলামে এমন অনেক ধারণা পাওয়া যায় যেগুলো আগে থাকতেই জহুদের মধ্যে ছিল। জহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তোর্হাতে কিন্তু পরিষ্কার করে বলা নেই মৃত্যুর পর কি হয়। ঠিক ঠিক পুরনো ধর্ম বলতে তিনটে ধর্মকেই ধরা হয়, যাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে – হিন্দু, পার্সি আর জহুদি। কিন্তু জহুদি ধর্মে পরিষ্কার করে বলা নেই মরার পর কি হয়।

জহুদিরা আবার দু দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছিল, একটা হল গ্রীকদের থেকে। গ্রীকদের থেকে এল আমাদের ভেতরে যে আত্মা রয়েছে সেই আত্মার কখন নাশ হয় না। পার্সিদের থেকে এসেছে পুনর্ভ্যুত্থানের ধারণা। এটা হিন্দুদেরও বিশ্বাস। মৃত্যুর পর আবার নতুন করে জন্ম নেয়। তোর্‌হা গ্রন্থে এসবের কোন উল্লেখ না থাকলেও জহুদিরা ধীরে ধীরে এই দুটো বিশ্বাসকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়েছিল – আমাদের ভেতরে যে আত্মা আছে সেটা অবিনাশী আর মৃত্যুর পর সেই আত্মার আবার পুনর্ভ্যুত্থান হতে পারে। ভৌতিকবাদীরা যেমন বলে তুমি মরে গেলে সব শেষ। জহুদিরা মেনে নিল মৃত্যুর পর আত্মা আবার বেরিয়ে আসে। মানুষ মারা যায় এটা সত্য কিন্তু মারা যাওয়ার পর তার কি হয় এটা আমরা কেউই জানিনা। এই দুটো বিশ্বাস যখন জহুদিদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গেল তখন তারা ভালো কাজ মন্দ কাজ নিয়ে বিচার করতে শুরু করে দিল। এগুলো বিচার করার পর জহুদিরা বলতে থাকল এই জীবনে যদি তুমি খারাপ কাজের শাস্তি না পাও, তাহলে পরের জন্মে তার শাস্তি হবে। একজন মানুষ মরে গেলেই যদি সব শেষ হয়ে যায় তাহলে তার খারাপ কাজের জন্য কোন শাস্তি আর থাকল না। জুদাইজম্ প্রথমে তাই ধরে রেখেছিল আর পরিষ্কার করে বলছে না মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়। ইতিমধ্যে তার কাছে গ্রীকদের চিন্তা-ভাবনা আসতে শুরু হয়ে গেল। গ্রীকদের বিশ্বাস হল আত্মা অমর। অন্য দিকে পার্সিদের কাছ থেকে এসে গেল পুনর্ভ্যুত্থানের ধারণা, আবার নতুন করে যেন একটা শরীর পেয়ে যায়। হিন্দুদের পুনর্জন্মের মত এটা নয়, হিন্দুদের মতে যেমন পুরোপুরি নতুন জন্ম গ্রহণ করে, এখানে ঠিক সেই ভাবে হচ্ছে না। জহুদিদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা ছিল, একটা লোক যদি পাপ করে তাহলে সে কিভাবে শাস্তি পাবে। ওরা তখন এই দুটোকে মিলিয়ে দিয়ে বলে দিল, পাপ করে যদি তুমি এখন বেঁচে যাও, তাহলে মৃত্যুর পর তুমি এই পাপের শাস্তি পাবে। কিভাবে পাবে? নতুন শরীর তোমাকে দেওয়া হবে। জহুদিরা কিছু এখান থেকে কিছু ওখান থেকে নিয়েছে, ফলে যুক্তির ক্ষেত্রে অনেক ফাঁক থেকে গেছে। গ্রীকদের যেমন বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর সব আত্মা হ্যেডসে চলে যায়, তেমনি জহুদিদেরও একটা বিশ্বাস ছিল আত্মারা সিওল বলে একটা জায়গা আছে সেখানে চলে যায়। গ্রীকদের যেমন হেভেনের দুটো অর্থ ছিল একটা মানে আকাশ আরেকটা মানে স্বর্গ, ঠিক তেমন সিওলের দুটো অর্থ, একটা অর্থ জায়গা যেখানে সব আত্মাগুলো গিয়ে থাকে, আবার সিওল মানে কবর। কবর মানে মাটির নীচে মৃত শরীরকে সমাধিস্থ করা, তার মানে হয়ে গেল আত্মারা সব পৃথিবীর নীচের দিকে চলে যাচ্ছে। এখানে আবার গ্রীকদের বিশ্বাসটা ঢুকে গেল। এই সব বিভিন্ন সভ্যতার নানা রকমের বিশ্বাস মিলে মিশে একটা সাধারণ ধারণার জন্ম নিল। নরক আছে, নরকটা আবার নীচের দিকে। যারা পাপ কাজ করে, খারাপ কাজ করে তাদের শাস্তি দিয়ে নীচে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে প্রথম হেল অর্থাৎ নরকের ধারণার জন্ম হল। কবরের শব্দ মানে সিওল, কবর দেওয়া হচ্ছে মাটির নীচে, সিওলে আবার সব মৃত আত্মাগুলো বাস করে। এই করে নরক মানে নীচের দিকে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে এসে গেল খ্রীশ্চান ধর্ম। যিশু একটা নতুন ভাবাদর্শকে সামনে নিয়ে এলেন। এই ভাবাদর্শের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল যিশু যেটা বলছেন – Heaven is the place of eaternal life। হেভেন হল অনন্ত জীবনের আবাসভূমি। এই হেভেন বৈশিষ্ট্য কি? সেখানে ভগবান দেবতাদের পরিমণ্ডলের মাঝখানে সাক্ষাৎ সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর উপস্থিতিতে মুষ্টিমাত্র কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিই যেতে পারবেন। এই কথা বলছেন যিশু। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আধ্যাত্মিক পুরুষ ছাড়া ভগবানের কাছে কেউ যেতে পারবে না। এবার সব ভাবগুলোকে এক সঙ্গে নিলে সব ধারণাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। একদিক থেকে এল জুরুথ্রিষ্টদের ভাব, আরেকদিক থেকে এল জহুদিদের ভাব, অন্য দিক থেকে এল গ্রীকদের আইডিয়া এদিকে এল যিশুর আধ্যাত্মিক বাণী। এই সব কিছু মিলে ধর্মীয় বিশ্বাস একটা দৃঢ়ভূমির উপর দাঁড়িয়ে গেল – সর্ব উপরে ভগবান সিংহাসনে বসে আছেন। যারা শুভ কর্ম করবে যিশু যাদের স্বীকৃতি দেবেন – হ্যাঁ, এরা ভালো কাজ করেছে, তারা চলে যাবে ভগবানের কাছে। কত দিনের জন্য যাবেন? চিরন্তন কালের জন্য। কারণ, গ্রীকদের কাছে হেভেন চিরন্তন, জিউসদের কাছে হেভেন চিরন্তন খ্রীশ্চানদের কাছে তাই স্বাভাবিক ভাবেই হেভেন হয়ে গেল চিরন্তন। অথচ যিশু কোথাও সেই অর্থে হেভেনের ব্যাপারে কিছু বলেননি যে অর্থে পরিবর্তি কালে খ্রীশ্চান ধর্ম

নিয়েছে। বর্তমানে খ্রীশ্চান ধর্ম বলতে আমরা যেটা পাচ্ছি এটি একেবারে বিচিত্র ধর্ম। বর্তমান খ্রীশ্চান ধর্মে কিছুটা এসেছে রোমানদের প্রভাব, রোমানরা প্রভাবিত হয়েছিল গ্রীকদের থেকে, এর সাথে মিশেছে তাদের আগেকার বর্বর স্বভাব আর সব শেষে এসে মিশেছে যিশু খ্রীষ্টের অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা। এই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের সাথে এসে মিশেছে কিছুটা মিথ, কিছুটা কাল্পনিক কল্প কাহিনী আর কিছুটা বর্বরোচিত মনোভাব – সব মিলে খ্রীশ্চান ধর্ম হল এক বিচিত্র ধর্ম। স্বামীজী এই খ্রীশ্চান ধর্মকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

খ্রীশ্চান ধর্মে হেভেন মানে যেখানে ভগবান নিজে বাস করে, এটা যিশু নিজেই বলেছেন। আমরা যদি গ্রীক মতাদর্শকে দেখি, সেখানে বলছেন এখানে মানুষরা কেউ যেতে পারবে না। যিশু কিন্তু এই ভাবটাকে পাল্টে দিলেন। মানুষের মধ্যে যাঁরা ভক্ত তাঁরা অবশ্যই সেখানে যেতে পারবে। সেখানে আবার কিভাবে যাবে? সে একটা নতুন দেহ পাবে (Resurrection)। এই শরীরে সে যাবে না, এখন তোমাকে কবর দেওয়া হল। এটা আবার নেওয়া হল পার্সিদের থেকে। যেদিন Judgement Day আসবে, সেদিন কবর থেকে মৃত আত্মা বেরিয়ে আসবে। কারা বেরিয়ে আসবে? তোমার আত্মা, যেটা immortal soul, এখানে আবার immortal soul কে নিয়ে আসা হচ্ছে। এটা আবার নেওয়া হয়েছে গ্রীকদের থেকে। যিশু তখন বলবে 'হ্যাঁ, এ ভালো জীবন-যাপন করেছিল'। এবার তারা যাবে ভগবানের উপস্থিতিতে স্বর্গে। কত দিন সেখানে থাকবে? অনন্তকাল। এটাও আবার গ্রীকদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

শুধু যে তারাই ঈশ্বরের কাছে থাকবে তা নয়। এর পরের দিকে আরও যোগ হল, যাদেরকে তুমি ভালোবাসতে তারাও তোমার সঙ্গে থাকবে। এখানে আবার অনেক গোলমাল হওয়ার অবকাশ থাকতে পারে। আমি হয়ত খুব ভালো কাজ করে স্বর্গে গেলাম। আর আমার এক ভাইপোকে আমি খুব ভালোবাসতাম, এবার সেও স্বর্গে আমার কাছে থাকবে। ভাইপো আবার তার মাকে খুব ভালোবাসত, আমি আবার আমার ভাইয়ের বউকে একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না। তখন তো স্বর্গে এক বিচিত্র কাণ্ড হবে। এই সব কারণে ইদানিং পাশ্চাত্যে খ্রীশ্চান ধর্মের উপর এত আক্রমণ হচ্ছে যে চার্চগুলোতে লোক যাওয়া বন্ধই করে দিচ্ছে। অথচ যিশু ছিলেন ঠিক ঠিক উপনিষদের ঋষি। অঙ্গিরস যে স্তরের ঋষি তাঁর থেকে অনেক উঁচু স্তরের ঋষি যিশু। যে ঋষি বলছে I and my father in heaven are one। এটাই তো অহং ব্রহ্মাস্মি, যিনি নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক দেখছেন তিনি কি এই ধরণের অযৌক্তিক কথা বলবেন – তুমি যাকে ভালোবাসতে তার সঙ্গে স্বর্গে থাকবে। এটা কি কখন সম্ভব! এটাই হয়ে থাকে – যখন কোন উৎকৃষ্ট জিনিষ একটা বর্বর অশিক্ষিত, অসংস্কৃত লোকের হাতে চলে যায় তখন সেই শ্রেষ্ঠ জিনিষের এই দুরবস্থাই হয়। একই জিনিষ হয়েছে ইসলাম ধর্মে। উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কিছু বর্বর লোকেদের কাছে চলে গিয়েছিল। ইসলাম ধর্মকে বুঝেছিল ইরানিয়ান পার্সিরা যারা পরে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেছিল।

হেভেনের ব্যাপারে খ্রীশ্চানদের আরেকটি খুব প্রচলিত ধারণা হল সেখানে জীবনকে খুব উপভোগ করতে পারবে আর জীবনের নেতিবাচক কিছু জিনিষ সেখানে থাকবে না। এখন আমি আগে কাউকে পছন্দ করতাম কাউকে ভালোবাসতাম, তাহলে কি সেখানে আমি কাউকেই অপছন্দ করব না! গ্রীক পৌরানিকে তা হবে না, ওখানে মৃত আত্মার যার যার প্রতি রাগ, ক্রোধ ছিল সেগুলো সবই থেকে যাবে। দ্বৈতবাদীদের কাছে এটাই বড় সমস্যা, যেখানে আত্মাকে ভৌতিক রূপে দেখা হয় সেখানে এই সমস্যাগুলো আসবেই আসবে।

খ্রীশ্চান ধর্মের সাতশ বছর পর যখন ইসলাম ধর্ম এল তখন মহম্মদ যে কোন কারণেই হোক ভারতের ধর্মীয় ভাবাধারার কিছুই জানতেন না। আর আজকের যে ইসলাম তাতে শুধুই যে মহম্মদের একার প্রভাব রয়েছে তা নয়, এতে আরও অনেক অন্যান্য ভাবধারা থেকে প্রভাব এসে পড়েছে। তাতে গ্রীক প্রভাব অবশ্যই আছে, আর জুরুথ্রিজিম্ মারাত্মক ভাবে পড়েছে। মাঝে মাঝে মনে হবে জুরুথ্রিজিম্‌কে অন্য ভাষায় অনুবাদ করে ইসলাম ধর্মকে দাঁড় করান হয়েছে। কিন্তু দুটো ধর্মের ব্যবধান প্রায় বাইশ'শ বছরের। ইসলামে এসে

জন্নৎ মানে হেভেনের ধারণা আরও পাকাপোক্ত হয়ে গেল। মানুষের মন যত স্থূল হয় তত তার ধারণার বিষয়গুলোও তত স্থূল দরকার। যার জন্য ইসলামের জন্নৎ, জাহান্নমের ধারণাগুলো একেবারে শক্তপোক্ত।

খ্রীশ্চানদের আদিপাপের ধারণাটা এসেছে জুদাইজিম্ থেকে। মানুষ আগে স্বর্গেই ছিল। আদম আর ইভ স্বর্গের ফল খেয়েছিল বলে তাদের পতন হয়ে গেল। আমরা আগে স্বর্গেই ছিলাম, সেখান থেকে আমাদের পতন হয়ে গেল। ভালো কাজ করে আমি আবার স্বর্গে যেতে পারব। এই জিনিষটাকে যিশু প্রচলিত করে দিলেন। তার সঙ্গে দিলেন অপরের উপর পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়। কিভাবে চাপিয়ে দেওয়া যাবে? যিশু যখন ক্রুশবিদ্ধ হলেন তখন তিনি জগতের সব পাপ নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন। যিশু কাঁধে নিয়ে নেওয়ার জন্য যারাই যিশুর শরণাপন্ন হবে তারা আবার স্বর্গে চলে যেতে পারবে। এই ধারণাটা খ্রীশ্চানদের মধ্যে খুব প্রচলিত। তারা বলে আমরা যেন আমাদের পাপকে আর না বাড়তে দিই। একেই তো আমাদের উপর একটা বৃহৎ পাপ আগে থাকতেই আছে, কারণ আমরা আদম আর ইভের বংশধর। আদম আর ইভ ভগবানের প্রতি পাপ করেছিল, সেই পাপের বোঝা আমাদের উপরও চেপেছে। অন্য দিকে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, যিশুর রক্তপাত হয়েছে, সেই পাপের বোঝাও আছে। ঠাকুরও বলছেন একবার খ্রীশ্চানদের বই পড়লাম, দেখলাম তাতে শুধু পাপ আর পাপ। যে শালা নিজেকে পাপী পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়। এখন অনেক খ্রীশ্চানরা বলতে শুরু করেছে খ্রীশ্চান ধর্মে আগে পাপের কোন ধারণাই ছিল না, এটা জুরুথ্রিজিম্ থেকে খ্রীশ্চান ধর্মে প্রবেশ করেছে।

ইসলাম খ্রীশ্চান ধর্মের কিছু কিছু ধারণাকে গ্রহণ করে না। খ্রীশ্চান ধর্মে একটা বড় সমস্যা হল, কোন খ্রীশ্চান পণ্ডিতকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় একজন নবজাতক শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে ট্যাঁ করে একবার কেঁদেই মারা গেল, এবার এই বাচ্চাটি স্বর্গে যাবে, না নরকে যাবে? সেতো যিশুর নামই শুনতে পারল না, তার ব্যাপটিজিম্ হলই না, এবার বাচ্চাটি কোথায় যাবে? খ্রীশ্চানদের কাছে এর কোন উত্তর নেই। খ্রীশ্চান ধর্মে এই ধরণের অনেক সমস্যা হয়ে যায়। কোন কারণে যদি কেউ পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে তো তার শরীর থাকল না, resurrection কি করে তার হবে? আর কবর খুঁড়ে যদি দেখা যায় শরীরটাকে তো পোকা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে, তাহলে resurrection তার কোথা থেকে হবে। এখন অনেক পাদ্রীরা বলছে এগুলো আমাদের খ্রীশ্চান ধর্মে ছিলই না, পরের দিকে সব ঢুকেছে। মহম্মদ কিন্তু প্রথমেই বলে দিলেন আদিপাপ বলে কিছু নেই, যে কোন বাচ্চা যদি মরে যায় সে স্বর্গে যাবেই যাবে। তাই না, তার বাবা যদি অন্য ধর্মেরও হয়, তাও সে জন্নৎএ যাবে। ইসলামে আবার অনেকগুলো উচ্চ ও নীচ ভেদে হেভেন আছে। স্বর্গের সাতটি দ্বার, সব থেকে নিম্ন স্বর্গের সুখ হল পৃথিবীতে সব থেকে ভালো সুখ যেটা আমরা কল্পনা করতে পারি সেই সুখের একশ গুণ বেশী। কিন্তু সপ্তম স্বর্গ হল আল্লার খুব কাছে। এই ধারণা দিয়ে খ্রীশ্চান আর অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামকে মিলিয়ে দেওয়া হল। খ্রীশ্চান ধর্মের শেষ স্বর্গে ভগবানের উপস্থিতি। ইসলামে যারা ভালো কাজ করেছে আর যারা শুদ্ধ পবিত্র আত্মা, এরা দুজন কখনই সমান হতে পারেনা। সেইজন্য ইসলাম স্বর্গের সাতটা স্তর তৈরী করে দিল। সব থেকে যে নীচের স্বর্গ সেটাও পৃথিবীর যেটা শ্রেষ্ঠ সেটার একশ গুণ বেশী শ্রেষ্ঠ। আর সর্বোচ্চ জন্নৎকে বলা হয় ফিরদৌস, প্যারাডাইসেরই অপভ্রংশ হয়ে ফিরদৌস হয়েছে। ফিরদৌসে গেলে আল্লার কাছাকাছি থাকতে পারবে। সাতটি স্বর্গের স্তরগুলো নির্ধারিত করা হয়েছে, যেমন যেমন তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে সে তেমন তেমন উঁচু স্বর্গে গিয়ে থাকবে। আর যেমন যেমন নীচের দিকে আসবে এই জন্নৎ তেমন তেমন physical হয়ে যায়। ভৌতিকে এসে গেলে খুব আনন্দ থাকবে, সবারই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, এক একজনের সেবার জন্য চারজন করে হুরী থাকবে। এই resurrection এসেছে পার্সিয়ানদের থেকে। Resurrectionএর পরে যেটা হবে সেটা eaternal, তিনি সৃষ্টি করেছেন, যেদিন Judgement Day হবে সেদিন তার ভালো মন্দের বিচার হবে, বিচারের পর কাউকে জাহান্নমে পাঠাবে কাউকে জন্নতে। জন্নৎএর আবার সাতটি স্তর আছে। যারা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক তারা আল্লার কাছে থাকবে। যেমন খ্রীশ্চানদের মতে তারা ভগবানের কাছাকাছি থাকবে। এই হল ভারত বাদে অন্যান্য চিন্তা ধারায় স্বর্গ ও নরকের ধারণা।

ভারতীয় ভাবধারায় মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও স্বর্গাদির ধারণা

এরপর আমরা দেখব ভারতীয় চিন্তাধারায় বিশেষ করে হিন্দুধর্মে স্বর্গ ও নরকের ধারণা কি রকম। গীতাতে সব থেকে ভালো স্বর্গের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের চিন্তা ভাবনা বলতে আমরা মোটামুটি বুঝি বেদান্তের চিন্তা-ভাবনা। বেশীর ভাগ সময় আমরা মনে করি বেদান্তে বলতে অদ্বৈত বেদান্ত বোঝায়, যদিও বেদান্তে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত দুটোই আছে। আচার্য শঙ্কর দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের মতগুলোকেও অদ্বৈত বেদান্তে সমন্বয় করে নিয়েছেন।

অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে গ্রীক, চাইনিজ, ঈজিপ্সিয়ান আর জুরুষ্ট্রিয়ান আর জুরুষ্ট্রিয়ানদের থেকে জুদাইজিম্ এবং তার থেকে খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মে পাচ্ছি স্বর্গ হল সুখ ভোগের জায়গা, স্বর্গ চিরন্তন। স্বর্গ থেকে পতনের কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু বেদান্ত একটা মতের উপর স্থির ও দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মতটা হল – যে কোন জিনিষ যার জন্ম হয়েছে তার মধ্যে ষড়বিকার হবেই হবে – (১) জায়তে – জন্ম নিচ্ছে, (২) অস্তি – সেটি আছে, (৩) বর্ধতে – বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, (৪) বিপরিণমতে – একটা থেকে তার পরিণমিত হয়, খাওয়া-দাওয়া করছে, সেই খাদ্যটা রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, দুধ থেকে যেমন দইয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়, (৫) অপক্ষিয়তে – ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, জিনিষটার আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে এবং সব শেষে (৬) বিনশ্যতে – জিনিষটার বিনাশ হবেই। এই ছটি বিকার যে কোন জন্মপ্রাপ্ত বস্তুতে হবেই হবে। আত্মার যদি জন্ম হয় তাহলে তার মধ্যে এই ছয়টি বিকার হবে। তেমনি স্বর্গ যদি ঈশ্বর তৈরী করে থাকেন তাহলে স্বর্গেরও এই ছটি বিকার হবেই। আর স্বর্গ যদি ভালো কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তখন তারও এই ছটি বিকার হবে। ভালো কর্ম করে স্বর্গে যাব, স্বর্গ সুখ অনুভব হবে আর একদিন স্বর্গ থেকে আমার পতন হবেই, এই পতন থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ঠিক তেমনি মুক্তি যদি কর্মের দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহলে সেই মুক্তি থেকে অবশ্যই একদিন তার পতন হবে, যদি মুক্তি কেউ প্রাপ্ত করে থাকে তাহলে সেই মুক্তি আবার বন্ধনে পরিণত হতে বাধ্য। মুক্তি যদি আমার স্বভাব না হয়, মুক্তি যদি চিরন্তন সত্য না হয় তাহলে কিন্তু আমি আবার বন্ধনে পড়ব। আমরা যে সচরারচর মুক্তির কথা ভাবি ও বলি, সেখানে বেশীর ভাগ সময় খ্রীশ্চানদের যে মত মানে স্বর্গে যাওয়া, এটাই যেন আমাদের কাছে মুক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য বেদান্তে স্বর্গ কখনই অনন্ত হতে পারেনা। সুখ, দুঃখ এগুলো কখনই অনন্ত নয়। যারই জন্ম হবে তার এই ছটি বিকার হবেই। এই ষড়্বিকারের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি জিনিষকে যেতে হবে। মুক্তির ক্ষেত্রেও ভক্তি দ্বারা যদি মুক্তি পাওয়া যায়, জ্ঞান দ্বারা যদি মুক্তি প্রাপ্ত হয় তাহলে সেই মুক্তিকেও এই ষড়্বিকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। দ্বৈতবাদীরা ও ভক্তিমার্গীরা এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আনবে, তর্ক করবে। এগুলো নিয়েই তো লড়াই চলছে। আচার্য শঙ্কর কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে অবিচল – যারই জন্ম হবে তারই এই ছটি পরিণাম হবেই।

তাহলে ভক্তি হলে কি মুক্তি হবে না? কোন দিন হবে না। ভক্তিতে যদি মুক্তি হয় তাহলে কোন না কোন দিন সে আবার বন্ধনে পড়বে। বেদান্তের মুক্তি স্বরূপ জ্ঞানে। স্বরূপ জ্ঞান মানে, এটাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ। জ্ঞানের বাধক হল অজ্ঞান, অর্থাৎ তার নিজের প্রকৃত স্বভাবকে ভুলে গেছে। ভক্তি একটা মাধ্যম। ভক্তির মাধ্যমে এই অজ্ঞানটাকে ছিঁড়ে দিচ্ছে, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে যাচ্ছে। সেখানে নতুন করে তাকে কিছু প্রাপ্ত করতে হচ্ছে না। অজ্ঞান যেটার জন্ম হয়েছিল, সেটা বর্ধিত হয়েছিল তারপর একদিন তার বিনাশ হয়ে গেছে, এবার সে স্বরূপে অবস্থিত হয়ে গেছে। স্বরূপে অবস্থিত হওয়া আর কোন জিনিষকে প্রাপ্ত করা এক জিনিষ নয়। এটাই আমার স্বরূপ।

সেইজন্য হিন্দুদের, বিশেষ ভাবে বেদান্তে মুক্তির ধারণা অন্যান্য সব ধর্ম থেকে পুরোপুরি আলাদা। আমরা বেশীর ভাগই হলাম প্রচলিত বিশ্বাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া মানুষ। প্রচলিত বিশ্বাস মানে, অপরিণত মানসিকতা। গ্রীক, ঈজিপ্সিয়ান, পার্সিদের যাঁরা চিন্তক ছিলেন, খ্রীশ্চানদের যাঁরা চিন্তক ছিলেন, এখানে যিশু খ্রীষ্টকে আনা হচ্ছে না, তাঁর চিন্তা ভাবনা দিয়ে জিনিষটাকে যে জায়গায় নিয়ে গেলেন, ওই মানসিকতায় আমরাও সেখানেই পৌঁছাব। কিন্তু ওই ধরণের চিন্তা-ভাবনার উপর যখন আঘাত পড়তে শুরু হবে তখন এদের

ধারণাগুল আর দাঁড়াতে পারবে না। সেইজন্য বেদান্তকে আঘাত করে কেউ কিছুই করতে পারল না। বেদান্তের কাছে এসব নিয়ে কোন সমস্যাই নেই। বেদান্ত বলবে তুমি যে স্বর্গের কথা বলছ, সে যত বড় স্বর্গই হোক, এমন কি ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়েও যদি বসে থাক অর্থাৎ সপ্তম স্বর্গেও যদি পৌঁছে যাও, সেখান থেকেও তোমার পতন হবে। যদি শুভ কর্ম দিয়ে সেখানে পৌঁছে থাক, যদি ভক্তি দিয়ে পৌঁছে থাক তাহলে আবার তোমার পতন হবে। কিন্তু যদি তুমি জেনে যাও তুমি আর ঈশ্বর এক, ঈশ্বরের সাথে তোমার একাত্ব বোধটাই তোমার স্বভাব, তা যে কোন ভাবেই জানা হোক না কেন, দাস্য ভাবে, সখ্য ভাবে, সন্তান ভাবে আত্ম ভাবে তখন আর পতন হবে না, এটা আলদা জিনিষ হয়ে গেল।

হিন্দুধর্মে সাতটি লোকের কল্পনা পাওয়া যায় – ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ আর সত্য। এরমধ্যে ভূঃ হল পৃথিবীলোক আর স্বঃ হল স্বর্গলোক আর ভূবঃ হল এই দুটোর মাঝখানে। এবার আমাদের অবস্থানের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে আছি, আমাদের মাথার উপরে আছে আকাশ। কিন্তু এই আকাশের পরে একটা নীরেট লোকের কথা বলা হচ্ছে। এই নীরেট লোক হল স্বঃ আর ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হচ্ছে ভূবঃ। ঠিক ঠিক স্বর্গ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হল এই ভূবঃ আর স্বঃ। এখানে মনে রাখতে হবে শুধু এই পৃথিবীকেই ভূলোক বলা হচ্ছে না, সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব মিলিয়ে যে পুরো ব্রহ্মাণ্ড তাকে বলছেন ভূলোক। এই ভূলোকের বাইরে যে খালি জায়গাটা তাকে বলা হচ্ছে ভূবঃ, ভূবঃ লোকের ওপরের জায়গাটাকে বলছেন স্বঃ বা স্বর্গলোক। ভূবঃ কোন একটা স্থায়ী জায়গা নয়। যদি কল্পনা করা হয় স্বর্গে অনেক বড় বড় বাড়ি আছে, তাহলে সেটা স্বঃ তেই আছে ভূবঃতে নেই। ভূবঃ হল ভূলোক আর স্বঃ এর মাঝখানটা। এই স্বঃ এর পরে আবার একটা জায়গা আছে একে বলছেন মহঃ। মহঃ কিন্তু কোন লোক নয়। এরপর জনঃ, তপঃ আর সত্য এই তিনটে লোককে একসাথে মিলে ব্রহ্মলোক বলা হয়। আসলে ব্রহ্মলোক বলে কিছু আছে কি নেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এগুলো আমাদের আচার্যদের মত।

ভূবঃ আর স্বঃ এই স্বর্গলোক আমি শুভ কর্ম দিয়ে পেতে পারি, বৈধী ভক্তি দিয়ে পেতে পারি, ভালো আচার-আচরণ দিয়েও পেতে পারি। আর সমস্ত প্রাণী এই তিনটে লোকের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে, মরছে আবার জন্মাচ্ছে। কিন্তু মহঃকে যদি পার করতে হয় তাহলে কিন্তু শুধু শুভ কর্ম বা ভক্তি দিয়ে পার করা যাবে না। এর জন্য চাই আলাদা ধরণের সাধনা। যারা এই ধরণের বিশেষ সাধনা করেছে তারা এই ভূঃ, ভূবঃ আর স্বঃকে ছাড়িয়ে মহঃ তে চলে যাচ্ছে। মহঃ তে স্থায়ী বলে কিছু নেই, সেখানে সব সময় ভাসমান থাকবে। কিন্তু যদি সাধনা করে ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ জনঃ, তপঃ আর সত্য এই তিনটে লোকে যারা পৌঁছে যায় সেখান থেকে তারা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। যারা সাধারণ সাধক তারা পরে শুভ সংস্কার নিয়ে খুব ভালো বংশ জন্ম নেবে গীতায় যেমন বলছেন *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে*। আরেক শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁরা নিষ্কাম ভাবে সাধনা করে গেছেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর মুক্তি হয়ে যায়নি, তাঁরা কিন্তু কালে মুক্তি পেয়ে যাবেন। এটা হল আমাদের আচার্যদের মত। জনঃ, তপঃ আর সত্য এই তিনটে লোক সাধারণ স্বর্গ নয়, এই তিনটে হল আধ্যাত্মিক পুরুষের স্বর্গ। আধ্যাত্মিক পুরুষের স্বর্গে মুক্তি দুই রকমের হয়। একটা সদ্যমুক্ত, সদ্যমুক্ত মানে – সাধনা করেছেন, জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে গেলেই মুক্ত, তার কাছে এইসব লোকের কোন ব্যাপারই থাকে না। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর সাথে এক হয়ে গেল, বৌদ্ধ ধর্মে যাকে নির্বাণ বলছে। দ্বিতীয় হল যারা তাদের থেকে একটু সাধারণ মানের, এরাও খুব উচ্চমানের কিন্তু তারা সগুণ সাকারের সাধনা করেছে। এদের কেউ হয়ত শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেছেন, সাধনা করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। এখন তিনি সগুণ সাকারের সঙ্গে লীন হয়ে ব্রহ্মলোকে ঈশ্বরের সঙ্গেই থাকবেন। যখন এই কল্পের নাশ হয়ে যাবে তখন তাঁর মুক্তি হয়ে যাবে, তিনি আর দ্বিতীয়বার জন্মাবে না। এদের থেকেও যারা নীচে, সাধনা যার শেষে হয়নি, কিন্তু ভালো সাধনা করেছে তারা কিন্তু ভূঃ লোকে জন্মাবে না, ভূবঃ লোকে বনবন্ করে ঘুরবে না, স্বঃ লোকে গিয়ে ভোগ করবে না, কিন্তু জনঃ বা তপঃ এই দুটোর যে কোন একটা লোকে থাকবে। অনেক দিন থাকার পরে আবার জন্ম গ্রহণ করবে *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে*। সেখানে সে আবার তার সাধনা শুরু করবে কিন্তু ভোগে লিপ্ত হবে না। আবার যদি সাধনা শেষ না

করতে পারে আবার সে সেই মহঃ বা তপঃতে গিয়ে থাকবে, এইভাবে হতে হতে শেষে হয় সত্যলোকে গিয়ে পড়বে, সেখানে ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া তার আর কিছু থাকবে না। যদি জনঃ, মহঃ বা তপঃ এই তিনটের মধ্যে কোথাও মৃত্যুর পরে চলে যায় সেখান থেকে তার মুক্তি হবে না, মুক্তি যে কোন অবস্থায় তখনই হবে যখন এই ব্রহ্মার দিনটা শেষ হবে। ব্রহ্মার দিন শেষ হওয়া মানে একটা কল্প যখন শেষ হবে, তখন তাকে আর দ্বিতীয় বার আসতে হবে না। আর যদি জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যাবে তখন তার তৎক্ষণাৎ মুক্তি। যদি কেউ সত্যলোকে চলে যায় তখন হয় তার মুক্তি হবে, কিন্তু মুক্তি হবে সেই ব্রহ্মার কল্প যখন শেষ হবে। তত দিন সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে সেখানে থাকবে, সেখানে সে সর্বজ্ঞ হয়ে থাকবে, সর্বশক্তিমান হয়ে থাকবে, কিন্তু যেহেতু সে শুদ্ধাত্মা তাই কারুর কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করবে না। আর যদি ঠাকুর আদেশ করেন তুমি এখন পৃথিবীতে গিয়ে বিশ্ববাসীদের একটু সাহায্য কর, তখন তারা পৃথিবীতে আসবেন। এরা হলেন নিত্যসিদ্ধ, এঁরা আর সাধনার বন্ধনে পড়বে না, ঠাকুরের কাজটুকু করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্রহ্মলোকে চলে যাবেন, সেখান থেকে তারপরে এই কল্পের শেষে মুক্তি হয়ে যাবে। এগুলো আমাদের আচার্যদের মত, কতটা সত্যি আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু মূল হল সাধক আর কর্মি। কর্মি মানে জপ-ধ্যানও কর্ম, দান-ধ্যানও কর্ম। যাঁরা এগুলো করেন তাঁরা ওই স্বঃ পর্যন্ত যেতে পারেন। সাধারণ ভাবে এই সাতটিকে স্বর্গ বলা হয়। আবার মুণ্ডকোপনিষদে সব কটিকে সাধারণভাবে ব্রহ্মলোক বলছে, *এহ্যেহীতি* করে বলা হচ্ছে।

পরবর্তি কালে যেসব আচার্যরা এসেছেন তাঁরা এগুলোকে আরও সুন্দর করে স্পষ্ট ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। এই সাতটা লোকের সাথে আবার সপ্ত চক্রের মিল আছে। ঠাকুর যে তিনটি নিম্নভূমির কথা বলছেন সেটা হল এই ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ চতুর্থ হল মহঃ, যাকে অনাহত চক্র বা হৃদয় বলা হয়। মহঃ তে যদি মন চলে যায় তাহলে পতন হওয়ার সম্ভবনা থাকে কিন্তু খুব কম। কিন্তু যেই কণ্ঠদেশে মন চলে এল তখন ঈশ্বর ছাড়া তাঁর আর কোন চিন্তা নেই। খ্রীশ্চানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা প্রশ্ন তুলছে, তোমরা তো বলছ ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তাহলে নরক কোথা থেকে আসছে। খ্রীশ্চানদের কাছে এটা এক বিরাট সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। স্বর্গ নরক এগুলো Metaphorical জিনিষ, মানুষকে বোঝানর জন্য। এই যে লোকের কথা বলা হচ্ছে সত্যিই এই লোকগুলো আছে কিনা আমরা জানিনা। কিন্তু চক্রের কথা যেটা বলা হচ্ছে, কুণ্ডলীনি জাগ্রত হলে চেতনার স্তরের পরিবর্তন হয়, হৃদয়ে চেতনার স্তর উন্নীত হলে এক রকম অনুভব হয়, কণ্ঠে চেতনা জাগ্রত হলে আরেক রকম দেখছে তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলছে না, ভ্রুর মাঝখানে চেতন উঠলে ঈশ্বরকে ছুঁই ছুঁই অবস্থা আর সহস্রারে এলে জীব ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেল। এই যে বেদে সপ্তভূমির কথা বলছে, তন্ত্রে একেই সপ্ত চক্র বলছে আর এখানে সপ্ত লোকের কথা বলা হল, এগুলোর মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে। এ সবই ঋষিদের মত।

মানুষ যখন কর্ম করে তখন সেই কর্মের ফল তিন রকমের হয়। গীতাতে ভগবান বলছে *অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্*, অনিষ্ট মানে অশুভ, ইষ্ট মানে শুভ আর মিশ্র, ভালো-মন্দ মেশানো। যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁরা সব সময় ইষ্ট কর্মই করেন, দুষ্ট লোক অনিষ্ট ছাড়া কিছু করে না। ঠাকুর বলছেন দুষ্ট লোককে যদি এখানে প্রস্বাব করতে বলা হয় সে করবে না, সে ভাববে পাছে কারুর মঙ্গল হয়ে যায়। যারা ইষ্ট কর্ম করে তারা স্বর্গে জন্ম নেয়, অনিষ্ট কর্ম যারা করে তার নিম্ন যোনিতে জন্ম নেয়। যারা ভালো-মন্দ মিশিয়ে কর্ম করে তার মানুষ রূপে জন্ম নেয়। ইষ্ট কর্ম আবার দু ভাবে করা হয়, সকাম ভাবে আর নিষ্কাম ভাবে। আমি এই আশায় দান করছি দান করলে আমি ভালো ফল পাবো, আমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আবার ভালো কর্ম করছি কারণ ভালো করাটাই আমার স্বভাব, এটাই হয়ে গেল নিষ্কাম কর্ম। এই ইষ্ট কর্ম সাধারণ ইষ্ট কর্ম নয়, এটাই হয়ে যাবে অনাসক্ত ইষ্ট কর্ম। অনাসক্ত ইষ্ট কর্ম করা মানেই আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে সে এগিয়ে গেল। আর সকাম ভাবে ইষ্ট কর্ম করলে দেবতা হয়ে জন্মাবে। কিন্তু দেবতা ও পশুপাখিদের চেতনার অবস্থাতে কোন তফাৎ নেই। কারণ পশুপাখি তারা ঈশ্বর চিন্তন করতে পারেনা আর দেবতারা ঈশ্বর চিন্তা করে না। করতে পারে না তা

নয়, করবে না। বড়লোকদের ক্ষমতা আছে কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করবে না, আর সাধারণ লোকের দুটি রুটি সংগ্রহ করতেই তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, তারা আর কি ঈশ্বর চিন্তা করবে!

উইল ডুরাণ্ড খুব নামকরা ঐতিহাসিক ছিলেন। মহাভারতের মত মোটা মোটা আট দশটি খণ্ডে তিনি একটা বই লিখেছেন যার নাম Story of Western Civilisation। এটি একটি বিশ্ব বিখ্যাত বই। যারাই বিশ্ব ইতিহাস জানতে চায় তাদের সবাইকে একবার অন্তত এই বইটি পড়তে হবে। উইল ডুরাণ্ডের আরেকটি বই আছে Story of Western Philosophy। এটিও একটি দুর্ধর্শ বই, পাশ্চাত্য দর্শন জানার জন্য এর থেকে ভাল বই আর নেই। তাঁর স্ত্রীও ঐতিহাসিক ছিলেন, খুব সুখী দম্পত্তি ছিলেন। সারা জীবন তাঁরা শুধু বই লিখেই গেলেন। Story of Western Civilisation লেখার পর উইল ডুরাণ্ডের মনে অনুশোচনা হল, ভারত আর চীন এত প্রাচীন সভ্যতা কিন্তু এদের উপর কিছুই লিখলাম না। তারপর তিনি একটা ছোট্ট খণ্ডে ভারত আর চীন সভ্যতার উপর লিখলেন। তার প্রথম পাতায় স্বামীজীর কোটেশান দিয়ে শুরু করলেন। এই বইটিরও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর তাঁর আট দশটি খণ্ড আছে, অথচ ভারত আর চীন মিলিয়ে একটা ছোট্ট খণ্ডে লিখলেন। প্রথমেই তিনি ক্ষমা চেয়ে লিখছেন – আমি ক্ষমাপ্রার্থি, আমার আর সেই শক্তি নেই যে এর থেকে আর বেশী কিছু লিখতে পারব, এটা অন্যায় করা হয়েছে। তখন তাঁর একবার মনে হল, ভারতের উপর যখন বই লিখছি তখন একবার ভারতে গিয়ে স্বচক্ষে সব কিছু দেখে আসি। আমেরিকা থেকে ১৯২৮-২৯ সালে তিনি ভারতে এলেন।

তারপর তিনি শুধু এক পাতায় লিখছেন – ভারতে এসে দেখলাম দারিদ্র, অশিক্ষা, দেখলাম পীড়া, নির্যাতন। আর দেখলাম একটা সভ্য জাতিকে বর্বর আর পশু বানাতে কোন প্রচেষ্টাই বাকি থাকেনি। এদের উপর আর কোন বই লেখা যায় না। তখন তিনি একটা বই লিখলেন The Case for India। বইটা বাজারে বেরোতেই তৎকালীন ইংরেজ সরকার বাজায়েপ্ত করে নিল। বইটি প্রথম অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন ইস্ট ইণ্ডিয়া যবে থেকে ভারতে এসেছে তবে থেকে কিভাবে ভারতকে লুট করা হয়েছে। বইটি ১৯৩০ সালে বেরিয়েছিল। পুরো তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। প্রথমেই তিনি লিখছেন – এই বই লেখার জন্য আমি কোন ভারতীয়র সঙ্গে কথা বলিনি, কোন হিন্দুর সঙ্গে কথা বলিনি, কোন হিন্দু শাস্ত্র আলোচনা করিনি, শুধু বৃটিশদের কাগজপত্র আর বৃটিশ সরকারের তথ্য পড়েছি। এদের একটা করে পাতা পড়ছি আর আমার চোখ দিয়ে শুধু ঝরঝর করে জল পড়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ইংরেজরা কি অমানবিক কাজ করে গেছে ভারতে। সেইজন্য ইংরেজ সরকার বইটাকে banned করে দিয়েছিল।

একটা জায়গায় তিনি গান্ধীজীর উপর বলতে গিয়ে বলছেন – আজ থেকে কয়েক শত বছর পরে গান্ধীজীকেই মানুষ মনে রাখবে। আর গান্ধীজীর সময়কার যত নামকরা লোক আজকে আছে সবাইকে ইতিহাস স্মৃতির গর্ভে ফেলে দেবে। গান্ধীজীর সাথেও তিনি দেখা করেছিলেন। তিনি লিখছেন – আজকের ভারতের জনগণ দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি বৃটিশকে যদি টুটি ছিঁড়ে শেষ করে দেয়, তাহলে সারা বিশ্বে যাদের মধ্যে নিজের নিজের দেশের প্রতি একটু সম্মান বোধ আছে, স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা আছে, তাদের উচিৎ সবাই যেন দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করে যে ভারতের মানুষ আবার জেগে উঠেছে, তাদের পৌরুষ ফিরে এসেছে, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জেগে উঠেছে। একটা জাতিকে ইংরেজরা নির্বীজ করে দিয়েছে। কিভাবে বৃটিশরা ভারতকে নির্বীজ করেছে তিনি পুরো তথ্য দিয়ে সাজিয়ে দেখিয়েছেন – কিভাবে তারা দেশের অর্থ সম্পদকে লুট করেছে, কিভাবে শিক্ষাকে শেষ করেছে, কিভাবে ভারতীয়দের আত্মসম্মানকে শেষ করেছে। ইংরেজদের পেপার আর তথ্য দিয়েই দেখিয়েছেন, নিজের থেকে কিছু লেখেননি।

গান্ধীজী এক জায়গায় বলছেন ভারত যত দিন স্বাধীন না হয় আমি প্রার্থনা করি আপনারা সন্তান জন্ম দেবেন না। এই রকম কাপুরুষ নির্বীজ মানুষ পৃথিবীতে এনে কাজ নেই, গোলামের সংখ্যা বাড়িয়ে ইংরেজদের সুবিধা করে কোন কাজ হবে না, আপনারা প্রজনন বন্ধ করুন। উইল ডুরাণ্ড লিখছেন, ঠিক এটাই এখন

ভারতের জন্য জরুরী। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কারণ যে চাষ করে ফসল উঠছে তার উপর ৫০% কর চাপান হচ্ছে। চাষের জন্য বীজ লাগবে, সার লাগবে, জল লাগবে – এরপর সে খাবে কি! আর যখন তারা কর দিতে পারছে না, তখন শত শত প্রজন্ম ধরে যে জমিতে তারা চাষ করে এসেছে সেই জমি তার হাত থেকে চলে যাচ্ছে। যারা ভাগ্যবান তার গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। কি কাজের জন্য? সাহেবদের পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য, আর কারখানায় কাজ করার জন্য। যতদিনে সেই কারখানাতে কাজ করে দুটো অন্ন পেটে যাবে তত দিন তাকে কারখানগুলোতে এমন দুরবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে যে তার মৃত্যুর সময় এসে যায়। উইল ডুরাণ্ড পুরো তথ্য দিয়ে বলছেন এক বছরে বৃটিশদের এক হাজার জনের মধ্যে তের জন লোক মারা যায়, আমেরিকায় হাজার জনে বছরে এগার জন মারা যায় সেখানে ভারতে বছরে হাজারে তেত্রিশ জন মরে। কেন? মানুষ খেতে পায় না। ভারতের উপর এই অন্যায় তো মুসলমানরাও করেনি। ভারত কোন দিন এই রকম ছিল না। কিভাবে ইংরেজ ভারতকে লুট করেছে ভাবা যায় না। মানুষকে এমন করে দিয়েছে কোন সভ্য মানুষ কল্পনাই করতে পারবে না। ভারত থেকে তুলো বৃটেনে নিয়ে গিয়ে কাপড় তৈরী হয়ে ভারতে আসছে কিন্তু তার উপর কোন শুল্ক নেই। কিন্তু ভারত থেকে যখন অনেক উন্নত মানের বস্ত্র বৃটেনে যাচ্ছে তখন তার উপর ৮০% থেকে ৯০% শুল্ক ধার্য করে দিচ্ছে, যাতে ঐ দেশে কেউ ভারতের বস্ত্র কিনতে না পারে। উইল ডুরাণ্ড লিখছেন – আজ যদি ভারত স্বাধীন হত তাহলে এক কথায় বলে দিত তুমি ওখানে শুল্ক লাগাও আমিও তোমার আমদানি বস্ত্রে শুল্ক লাগাচ্ছি, তারপর দেখ! কেউই তখন ইংরেজের কাপড় কিনবে না। পরে ঠিক তাই হয়েছিল। যেদিন ইংরেজ ভারত ছেড়েছে সেদিন থেকেই বৃটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ল। এখনও পুরো ইউরোপের অর্থনীতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, একমাত্র ভারত আর চীনকে লুট করতে পারছে না বলে।

মানুষের পেটে অন্ন যাচ্ছে না, সে কিনা করবে ঈশ্বর চিন্তন! গরীব লোক পারে না ঈশ্বর চিন্তন করতে। আর বড়লোকেরা ঈশ্বর চিন্তন করে না। ঠিক তেমনি অনিষ্ট কর্ম করে যখন পশুপাখি বা তির্যক যোনিতে গিয়ে জন্ম নেই তখন তারা ঈশ্বর চিন্তন করতে পারেনা। দেবতারা ভোগে এমনই মত্ত যে তাঁরা ঈশ্বর চিন্তন করেন না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে বলছেন দেখো ভাই হাতি এত বড় জীব কিন্তু ঈশ্বর চিন্তন করতে পারেনা, মানুষই ঈশ্বর চিন্তন করতে পারে। আমি আপনি মরে কোন দিন দেবতা হব না, এই ভূঃ ভূবঃ স্বঃ এখানে আমরা জন্মাব না। আমাদের মনে হতে পারে তাহলে তো ভালো কাজ করা ঠিক নয়। আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে দেবতা হয়ে জন্মাব। দেবতা হয়ে যদি জন্মাই তাহলে ঈশ্বরকে ভুলে যাব, সেখানে আমি হাজার হাজার বছর ভোগ করে যাব। তত দিন আমার মুক্তিটাও পিছিয়ে যাবে। তার থেকে বরং আমি এখন খারাপ কাজ করতে থাকি তাহলে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারব। না, এইভাবে হবে না, এটা হল যারা সকাম কর্মই করে। যারা নিষ্কাম কর্ম করছে, ঠাকুরের কাছে নিষ্কাম ভাবে প্রার্থনা করছে এরা এইভাবে দেবতাদের কাছে জন্মায় না। এরা তখন মহঃ, জনঃ, তপঃ এই লোকগুলিতে চলে যায়। যে চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এরা সেখানে যাবে তারা সেখানে সেই চিন্তা-ভাবনা নিয়েই থাকবে। এইভাবে অনেক দিন থাকার পর তারা ভাল বাড়িতে জন্ম নিয়ে সেখান থেকে আবার সাধনা শুরু করে। যারাই নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে তাদের জীবনের গতিই আলাদা।

তবে নিষ্কাম কর্মেও মুক্তি দেরী হয়। আমাদের সদ্যমুক্তি না হওয়ার পেছনে কারণটা কি আমাদের একবার গভীর ভাবে ভাবা উচিৎ। এই মুহুর্তে আমাদের মুক্তি হচ্ছে না তার একমাত্র কারণ আমাদের এখনও বাসনা আছে। বাসনার পুর্তি না হওয়া পর্যন্ত তো কারুর মুক্তি হবে না। বাসনা পুর্তি হওয়ার একমাত্র জায়গা হল স্বর্গ। যার মনে ইচ্ছা আছে আমার বড় বড় বাড়ি হবে, আমি যেখানে খুশি যেতে পারব, যত বড় সাধকই হোন না কেন মৃত্যুর পর কিছু দিন স্বর্গে গিয়ে তাঁকেও সুখভোগ করতে হয়। এই বাসনার জন্যই সদ্যমুক্তি হচ্ছে না। কিন্তু এদিকে শুভ কর্ম করছে, তার জন্য তাকে তো স্বর্গে যেতেই হবে। সেখানে গিয়ে ভোগ করতেই হবে। আর যত দিন ভোগ করবে তত দিন মুক্তিও বিলম্ব হবে। এখানে কারুর কিছুই করার নেই। স্বর্গে ভোগ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার তাকে জন্ম নিয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। সেইজন্য বলা হয় যত

তাড়াতাড়ি এই ভোগের ব্যাপারগুলো মিটিয়ে নিতে। যারা খারাপ কাজ করে তাদের নিম্ন যোনিতে জন্ম হতে থাকে, শুভ কাজ যারা করে তারা দেবতা হয়ে জন্মায়, নিষ্কাম ভাবে কর্ম যদি করতে থাকে তাহলে তার আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত থাকবে। সকাম যদি হয় তাহলে পুরোপুরি ভোগে যাবে, আর মিলে মিশে যদি কর্ম করে, কিছু ভালো কিছু মন্দ, তখন মানুষ হয়ে জন্মাবে।

মানুষ হয়ে জন্মালেই যে সে ঈশ্বর চিন্তন করবে তা নয়। এই যে স্বর্গের কথা বলা হল, এই স্বর্গের পেছনে রয়েছে কর্ম, কর্মের দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন *যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্* - হে অর্জুন তুমি যদি তোমার স্বধর্ম পালন কর তাহলে তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার অবারিত। ভগবান কোন্ স্বর্গদ্বারের কথা বলছেন? এই স্বঃ এর কথা বলছেন, মহঃ জনঃ তপঃর কথা বলছেন না। এই স্বঃ পর্যন্তই যাবে, এখানে তুমি ইন্দ্রের মত সুখে থাকবে। কিন্তু এখানে তোমার আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হবে না। তারপর কি হবে? তুমি আবার জন্ম নেবে, কোথাও আবার রাজা হয়েই জন্মাবে, তার নীচেও যেতে পার তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ তোমার যা কিছু শুভ কর্ম ছিল সেগুলো তোমাকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল। এবার অশুভ কর্মগুলো যখন কাজ করবে তখন তোমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। কিন্তু এই গীতাতে আবার বেদের কর্মকে প্রশংস করছে না, দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভগবান বলছেন *যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।।* এর পরের মন্ত্রেই এই জিনিষটাকে অন্য ভাবে বলা হবে। একটা হল স্বধর্ম পালন আরেকটি হল বেদের যজ্ঞাদি করে স্বর্গপ্রাপ্তি। বেদের ব্রাহ্মণরা যারা যজ্ঞাদি করাতেন তারা যজ্ঞের প্রশংসা করে শুধু যজ্ঞ করতেই বলে যেতেন, কারণ এদের কাছে স্বর্গের উপরে আর কিছু নেই। *কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি।।* ভোগ আর ঐশ্বর্যই শুধু ভোগ করা যাদের মনের মধ্যে থাকে এই কাম-বাসনাই তাকে বেদের যজ্ঞে আকৃষ্ট করবে। কারণ যজ্ঞ করলে স্বর্গে এই ভোগের শেষ নেই। কিন্তু স্বর্গে গিয়েও এদের শান্তি নেই। সেখানেও উঁচু স্বর্গ নীচু স্বর্গাদি আছে, সেখানেও হিংসা আছে। সেখান থেকে আবার পতন হবে। এই যজ্ঞকে গীতায় আবার অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বলছেন *সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ*। মুণ্ডকোপনিষদের যে আলোচনা করছি গীতার এই পরিপ্রেক্ষিতেই মুণ্ডকোপনিষদও বলছে, যজ্ঞ করাটা তোমার কর্তব্য। আমি যে যজ্ঞ করে আহুতি দেব এই আহুতিই আমাকে আহ্বাণ করে নিয়ে যাবে *এহ্যেহীতি*, আসুন আসুন। কেন? কারণ *সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্।।* এই যে যজ্ঞ এগুলো কামধেনু তুল্য, তুমি যা যা চাইবে সবই তোমাকে দেবে – এই জগতের সুখ আর মৃত্যুর পর স্বর্গ দেবে আর *দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।* মুণ্ডকোপনিষদ এই অপরা বিদ্যাকে নিন্দা করে বলছে অপরা বিদ্যাকেই যদি তুমি ধরে রাখ তাহলে আবার তোমাকে জন্ম নিতে হবে। তবে মুণ্ডকোপনিষদ এটাও বলছে অপরা বিদ্যাকে যতক্ষণ না করা হবে ততক্ষণ পরা বিদ্যার দিকেও মন যাবে না। এটাকেই ঠাকুর বলছেন ভোগান্ত না হলে ঈশ্বরের দিকে মন যায় না।

মূল কথা হল বিশ্বে যত ধর্ম আছে সব ধর্মকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় – ভারতীয় পরম্পরা আর অভারতীয় পরম্পরা। ভারতীয় পরম্পরার ধর্ম কর্মবাদ প্রধান। এখানে মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই চিরন্তন নয়। মুক্তি মানে নিজের স্বরূপে অবস্থান করা, এই মুক্তি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পুনর্জন্ম চলতে থাকবে। এই মতবাদ যেমন হিন্দুদের তেমন বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মও এই মতবাদে বিশ্বাসী। এরা হল Indic Religions। আর Non-Indic Religion দের মত হল আমার এই একবারই জন্ম হয়েছে। আমরা কোথা থেকেও এসেছি। কুম্ভকার একটা ঘট একবারের মত তৈরী করে দিল, একবার ভেঙে গেলে ঘটটা ঐখানেই নাশ হয়ে গেল, আর ফিরে আসবে না। শরীরের নাশ হয়ে গেলে সব শেষ। উপমা দিয়ে তো সত্যকে বোঝা যায় না। মৃত্যুর পর কিছু আছে এই বিশ্বাস যদি কারুর নাই থাকে তাহলে তো ধর্মের কোন প্রয়োজনই নেই। যে কোন ধর্মের প্রথম শর্তই হল আমার এই অস্তিত্ব মৃত্যুর পরেও কোন না কোন ভাবে চলতে থাকে। খ্রীশ্চান যদি হই তাহলে মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে থাকব, যদি মুসলিম হই তাহলে জন্নৎএ গিয়ে থাকব, যদি হিন্দু হই

তাহলে আমার আবার পুনর্জন্ম হবে। সব ধর্মেই মৃত্যুর পরও আমি কোন না কোন ভাবে চলতে থাকব। আর আমার এই জন্মের সব কর্ম মৃত্যুর পরের জীবনকে কোন না কোন ভাবে পরিচালিত করবে। এটাই মূল, একদিক থেকে কর্মবাদকে প্রকারন্তরে সব ধর্মই মেনে নিচ্ছে। মুসলমান বলছে যখন আল্লা বিচার করবেন তখন ভালো লোককে স্বর্গে পাঠাবেন। তার মানে আমি ভালো কাজ করলেই স্বর্গে যেতে পারব। খ্রীশ্চানরাও একই কথা বলছে, কর্মবাদের বাইরে কেউই কিছু বলছে না। আমাদের সাথে তফাৎ হল, আমরা বলছি তুমি স্বর্গেই থাকো আর নরকেই থাকো যেখানেই তুমি থাকো না কেন কিছু দিন পরে সেখান থেকে তোমাকে আবার ফেরত আসতে হবে। এই আসা-যাওয়া তত দিনই চলতে থাকবে যত দিন না তোমার মুক্তি হচ্ছে। পুরো এই জিনিষটাকেই এর পরের মন্ত্রগুলোতে আলোচনা করা হবে। উপনিষদেই এই ভাবটা এসে গিয়েছিল কিন্তু বেদে মুক্তির ভাবটা অত জোরাল ভাবে আসেনি, বেদে স্বর্গপ্রাপ্তিই শেষ কথা। স্বর্গে যাবে আবার স্বর্গ থেকে নেমে আসতে হবে, আবার ভালো কাজ করে স্বর্গে যাবে। কিন্তু মুক্তির ধারণা আমরা এখন যেভাবে বুঝছি বা উপনিষদে মুক্তির ধারণা যেভাবে এসে গিয়েছিল, বেদে ঠিক এই ভাবটা ছিল না।

এর আগে আমরা স্বর্গের কথা আলোচনা করেছি, সেখানে স্বর্গের ব্যাপারে একটা কথা বলা হয়েছিল *এষ বঃ পূণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ*। যখন কোন নতুন একটা ধারার প্রবর্তন হয় তখন প্রথমের দিকে সেই ধারাটা সুসংবদ্ধ না থেকে এলোমেলোই থাকে। কিন্তু আস্তে আস্তে ধারাগুলো একটা সুসংবদ্ধ হয়ে প্রথারূপে মজ্জাগত হয়ে যায়। অন্য দিকে নতুন ধারাতে প্রথমের দিকে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হত, সেখানে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরের দিকে যুক্তি তর্কের প্রয়োজনে সেই শব্দগুলো আলাদা করে দেওয়া হয়। এখানে ব্রহ্মলোক বলা হচ্ছে, এর আগে বলা হয়েছিল *পতিরেকোহধিবাসঃ*, অর্থাৎ যেখানে ইন্দ্রের বাস। ইন্দ্রের বাস কখনই ব্রহ্মলোকে হতে পারেনা। কিন্তু অন্য দিকে তখন বেদের যুগ চলছিল, বেদের যুগ হওয়াতে ইন্দ্রই হলেন শ্রেষ্ঠ। তাই কিছুটা এই শ্রেষ্ঠত্বের অর্থে ব্রহ্মলোক বলা হয়েছে আবার ব্রহ্মলোক বলতে স্বর্গলোককেও বোঝাচ্ছে। সেইজন্য এই ব্রহ্মলোক শব্দ দু ভাবেই পাল্টে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজকের দিনের বিচারে ব্রহ্মলোককে কখনই স্বর্গলোক বলে মানা হবে না। ব্রহ্মলোক হল শ্রেষ্ঠ লোক, মুক্তির ঠিক নীচের স্থান। মুক্তির সঙ্গে ব্রহ্মলোকের কোন তুলনাই করা যায় না, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম যোগী যেখানে যাবেন সেটাকেই ব্রহ্মলোক বলছেন, আর এই ব্রহ্মলোক কোন কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। এখানে যেমন বলছেন *এহ্যেহীতি*, যে আহুতি দেওয়া হয়েছে সেই আহুতিগুলোই যেন পূণ্যের জোরে সাদর আমন্ত্রণ করে যজমানকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে এই অর্থ হবে না। কারণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য যে সাধনার দরকার, সেটা পুরো আলাদা ধরণের সাধনা। একটু পরেই মুণ্ডকোপনিষদেই আমরা দেখব আবার অন্য একটি সাধনার কথা বলছেন, যে সাধনা ঠিক ঠিক ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। সব দিক বিচার করে বলা যায় এখানে ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ হবে স্বর্গলোক। পরের মন্ত্রে বলছেন –

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয় যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।।১/২/৭।।

(যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে অবলম্বন করে জ্ঞানরহিত কর্ম সম্পন্ন হয়েছে, যজ্ঞ-নির্বাহক সেই ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও যজমানপত্নী – এই অষ্টাদশ জনই বিনাশী, কারণ তাঁরা অনিত্য। এই কর্মকে যে মুর্খগণ শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে সমাদর করে, তারা কিছুকাল স্বর্গভোগের পর পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।)

প্লবা মানে বিনাশী। বন্যা হলে যেমন বলা হয় জলপ্লাবন, প্লাবন শব্দটা এই *প্লবা* থেকেই এসেছে। যেমন বিপ্লব, এটিও প্লবা থেকে। বেদে যত বড় বড় যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, অগ্নিহোত্রাদির থেকেও বড় যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এগুলো অবিনাশী নয়, কিন্তু তুমি করেছ বলে তোমাকে কিছু বলা হচ্ছে না, করে

ভালই করেছ। কেউ তোমাকে খারাপ বলছে না। কিন্তু এই যজ্ঞের দ্বারা তুমি যে স্থায়ী কিছু চাইবে তা হবে না। গিরিশ ঘোষের একটা বিখ্যাত গান – জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই। মানুষ সব সময় চাইছে এমন একটা জায়গা যেখানে নিজেকে একটু জুড়াতে পারে, একটু শান্তি পেতে পারে। কিন্তু এই জগতের সবটাই *প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা*। মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক, মানুষে মানুষে ভালোবাসার যে সম্বন্ধ এগুলোকে ফেলে দিন, এমন কি দেবতাদের যে ভালোবাসা, এত কষ্ট করে, বিশাল আয়োজন করে যে যজ্ঞ করে দেবতাদের ভালোবাসা পাচ্ছেন এটাও অদৃঢ়, সবটাই প্লবা মানে বিনাশী। এখানে বিপ্লবের অর্থে হবে না, বিনাশের অর্থে বলছেন। আমি রোজ ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করে ঠাকুর দেবতার পূজো করি, তারপর দু-ঘণ্টা ঠাকুরের ধ্যান করি, তারপর ফুল তুলছি, ঠাকুরের বাসন মাজছি, ঠাকুরকে সাজাচ্ছি, ভোগ নিবেদন করছি – এত কিছু করে কি হবে! সবটাই *প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া*। এগুলোও যজ্ঞরূপা, এগুলোও বিনাশী। এরাও আমাকে টানতে পারবে না।

কেন পারবে না? *অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম*। অগ্নিহোত্র বা বড় কোন যজ্ঞ যখন হয় বেদের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে যজ্ঞ কুণ্ডের চার পাশে চার চার করে ষোলজন পুরোহিত বসে। যেমন আহুতি দেওয়ার জন্য একজন, ঋগ্বেদ পাঠ করার জন্য একজন, সামগান করার জন্য একজন তার সঙ্গে ব্রহ্মা, যিনি পুরো যজ্ঞটা পর্যবেক্ষণ করবেন। এই রকম চারজন করে চার পাশে বসবে। চার গুণিতক চার ষোল জন হল, এর সাথে যজমান যিনি স্বর্গে যাবেন আর তার সাথে যজমানের পত্নি। আমাদের কোন যজ্ঞই স্ত্রী ব্যতিরেকে পূর্ণ হয় না। শ্রীরামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন তখন বলা হল স্ত্রী ছাড়া এই যজ্ঞ করা যাবে না, আপনি দ্বিতীয় বিবাহ করুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন তোমাদের কথায় আমি সীতাকে বনবাসে পাঠালাম কিন্তু মন-প্রাণ আমার সীতার উপরই আছে, দ্বিতীয় বিবাহ হবে না। তাহলে এখন কি করা যাবে? সীতার সোনার মুর্তি বানান হোক। সীতার সোনার মুর্তি তৈরী করে যজ্ঞের পাশে রেখে তখন যজ্ঞ করা হল। যজ্ঞ করতে যদিও স্ত্রীর কোন ভূমিকা থাকত না, কিন্তু যে কোন যজ্ঞে যজ্ঞস্থলে যজমানের স্ত্রীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। এখনও বাড়িতে যদি পূজাদি হয় তখন স্বামী স্ত্রীকে পাশাপাশি বসতে হয়। যারা অবিবাহিত বা স্ত্রীর বিয়োগ হয়ে গেছে এখনও তাদের অনেকগুলো পূজো করতে বারণ আছে। সেইজন্য যারা ব্রহ্মচর্যে আছেন তাঁদের যজ্ঞ অন্য রকম হয়। আর যারা গৃহস্থ তাদের যজ্ঞ ক্রিয়াদি অন্য রকমের হয়। যখন পুরো জাঁকজমক করে যজ্ঞ হচ্ছে তখন সেখানে এই ষোলজন পুরোহিত আছেন আর তাঁদের সাথে আরও দুজন বসে আছেন – যজমান আর তার পত্নি। এখানে তাই বলছেন, এই আঠারোটি যজ্ঞরূপ, যজ্ঞরূপ মানে যজ্ঞে যে জিনিষগুল দরকার হয়। কি করে বুঝব যে যজ্ঞ হচ্ছে? এই ষোলজন পুরোহিত আর যজমান ও যজমান পত্নী বসে আছেন। এদের ছাড়া যজ্ঞ হবে না। এরাই যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

এই আঠারোজন আর এই যজ্ঞ, এদের মধ্যে কি বিশেষত্ব? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন *জ্ঞাননবর্জিতং কর্ম*, যে যজ্ঞ হচ্ছে, এই যজ্ঞের সাথে আত্মজ্ঞান কোন ভাবেই জড়িত হয়, আত্মজ্ঞানের সাথে এই যজ্ঞকর্মের কোন সম্পর্কই নেই সবটাই শুষ্ক কর্ম। যেহেতু শুষ্ক কর্ম, তাই এই কর্ম অদৃঢ়। যে কর্ম জ্ঞানরহিত সেই কর্মের ফল *অদৃঢ়*। রিচার্ড ফাইনম্যান একজন বড় পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন, পরে তিনি নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। আণবিক বোমা তৈরীর টিমে তিনিও একজন অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। আণবিক বোমা তৈরী খুব কঠিন কাজ, সুপার কম্প্যুটার দিয়েও সে কাজ করে ওঠা যায় না, আর সেই টিমে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকদের কাজ করতে হয়েছিল। সেই টিমের আবার একটা বিশেষ গ্রুপ ছিল যারা পাইপের নক্সা তৈরী করার দায়ীত্বে ছিল তাদেরকে একটা গাণিতিক সমস্যা দিয়ে বলা হল আপনারা এর উপর কয়েকজন মিলে কাজ করুন। গ্রুপের সদস্যরা কাজ শুরু করতে গিয়ে ভাবছে এটা হয়ত কোন মিউনিসিপ্যালিটির জল নিষ্কাশনের নক্সা বানাতে বলেছে, অন্য কেউ ভাবছেন হয়ত এটা কোন নর্দমার পাইপের নক্সা বানাতে বলা হয়েছে। এরা কাজ করে যাচ্ছে। কিছু দিন বাদে রিচার্ড ফাইনম্যানকে বলা হল – তুমি ভাই ওদেরকে গিয়ে বল তাড়াতাড়ি শেষ করতে ওদের জন্য আমাদের সব কাজ আটকে যাচ্ছে। ফাইনম্যান বললেন – আমি কিন্তু গিয়ে ওদের বলব আমরা আসলে কি তৈরী করতে চলেছি। তখন তাঁকে বলা হল – এটা খুব সিক্রেট প্রজেক্ট,

এর সম্বন্ধে এক্ষুনি কাউকে কিছু বলা যাবে না। ফাইনম্যান বললেন তাহলে কিন্তু কাজটা সময় মত হবে না। শেষ পর্যন্ত ফাইনম্যানের প্রস্তাবে রাজী হল। উনিও গিয়ে পরিষ্কার বললেন 'দেখো! আমরা এখানে এ্যটমিক প্রজেক্টে বোমা তৈরীর কাজ করছি, ব্যাপারটা খুব সিক্রেট, তোমরাও খুব সতর্ক থাকবে যাতে পুরো ব্যাপারটা গোপন থাকে, কাউকে কিছু বলতে যাবে না। আর তোমরা যে নক্সাটা করছ এটা হল এ্যটম বোমার এই অংশটা'। এরপর দুদিনের মাথায় এরা এই ড্রয়িংটা সমাধান করে দিল। যে ড্রয়িংয়ের পেছনে এরা মাসের পর মাস লাগিয় দিচ্ছিল দুদিনের মাথায় পুরো সমস্যাটাকে সমাধান করে দিল। এই হল জ্ঞানরহিত কর্ম আর জ্ঞানযুক্ত কর্মের তফাৎ। আমি জিনিষটাকে জানলাম না, বুঝলাম না, এটা আমি কেন করছি, এই সন্দেহ ও জ্ঞানবর্জিত কর্ম যখন হয় তখন কর্মের আউটপুট অন্য রকমের হয়। না বুঝে যে কর্ম করা হয় তার ফলও ওই রকমই হবে। বাচ্চা 'র' আকার 'ম' 'রাম' পড়েই যাচ্ছে কিন্তু মাথায় আর কিছুতেই বসছে না। কারণ এটা হল জ্ঞানবর্জিত কর্ম। অজ গ্রাম থেকে বুড়িগুলো সব্জী বিক্রী করতে যায়, ওদেরকে আজ পর্যন্ত কেউ হিসাবে গোজামিল করে ঠকাতে পারেনি। কিন্তু ওদের যদি অঙ্ক শিখতে বলা হয়, কিছুতেই তাদের শেখান যাবে না, কিন্তু সব্জীর হিসাবটা খুব ভালো ভাবে জানে।

মানুষ যখন জেনে যায় এই কর্ম আমার এই কাজে লাগবে, তখন এটাই জ্ঞানসহিত কর্ম হয়ে যাবে। তখন তার কর্ম একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কর্মের ফলটাও ভালো হবে। কিন্তু যখন কর্মের জ্ঞান তার কাছে স্পষ্ট নয়, তখন তার দ্বারা ওই কর্ম করা হবে না। জ্ঞানসহিত কর্ম যখন হবে তখন ওই কর্মই খুবই কুশলতা পূর্বক সম্পন্ন হবে। জ্ঞানরহিত কর্মও হবে কিন্তু তার ফল সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না, যতটা জ্ঞানসহিত কর্মতে পৌঁছাবে। নিজের বাড়িতে এক ফালি জমিতে যখন ফুলের চাষ বা অন্য কিছুর চাষ করা হয় তখন তার ফলন সব সময় ভালো হয়। এটাই লোক দিয়ে করালে ভালো ফলন হবে না। এখানে এই জ্ঞান আছে এই জমি আমার, আমার ব্যক্তিত্ব এখানে জড়িয়ে আছে, এরপর জ্ঞান যখন তাতে প্রয়োগ হয় তখন অন্য রকম হবে। ঠিক তেমনি যখন জিনিষটা জানা থাকে এই কর্ম আমি করছি আমার আত্মোদ্ধারের বা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, জ্ঞান বলতে এটাই। বাকি জ্ঞান স্বর্গপ্রাপ্তি এগুলো যন্ত্রের মত। যান্ত্রিক কাজগুলো ঠিকা কাজের মত। মানুষ সব সময়ই সর্বোৎকৃষ্ট সেরা জিনিষটা পেতে চায়। এর পেছনে রয়েছে সেই *যোগৈ ভূমাঃ তৎ সুখম্*। উচ্চ সেরা জিনিষটা কিসে পাব, কর্মের এই কৌশল জেনে নেওয়ার পর যে কাজ করা হবে তার ফল সব সময় অন্য মাত্রায় চলে যাবে। একটা গাধা মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর একজন কুলিও মাল বুঝে নিয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিক ভাবেই দুটো অন্য রকম হবে।

এই *অষ্টাদশ*, আঠারো জন জ্ঞানরহিত কর্মের মধ্যে আশ্রিত আর অত্যন্ত অদৃঢ়। এই কর্মগুলিকে বলা হয় আশ্রিত কর্ম। আঠারো জন যে বলা হল এই যজ্ঞরূপ তাদের উপর আশ্রিত। এই কর্মগুলোকে আবার সাধ্য কর্ম বলা হয়, মানে এই কাজগুলোকে সম্পাদন করা হয়। যে কর্মটাই আশ্রিত কর্ম, যে কর্ম অদৃঢ় কর্ম, যে কর্ম পুরোপুরি নির্ভর করছে নিষ্পাদনের উপর, নিষ্পাদন মানে যে জিনিষটা করা হয় সেটা কখনই চিরস্থায়ী হতে পারেনা, এইভাবে যার মূলেই গোলমাল তার ফল কি করে ভালো হবে! একটা বোতলে তেল রাখা হয়েছে, বোতলটা ভেঙে গেল তেলটাও নষ্ট হয়ে গেল। কর্মটাই যদি অদৃঢ় হয় তার ফলটা আর কত দৃঢ় হবে। তাহলে স্বর্গটাও অদৃঢ়। যজ্ঞ করলে স্বর্গে আমি ঠিকই যাব, কিন্তু সেই স্বর্গ কখন চিরন্তন হবে না।

স্বামীজী আমেরিকাতে এই ধরণের বক্তৃতাতে নিউটনের Laws of Motionএর কথা উল্লেখ করে বলতেন একটা জিনিষ ততটুকুই কাজ করবে যতটুকু তাতে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। অনন্ত শক্তি কখনই দেওয়া যায় না, সেইজন্য সেটা কখনই অনন্ত ফল হবে না। প্রকাশের গতিতে কোন জিনিষকে চালিত করা যায় না। আইনস্টাইন হিসাব করে দেখাচ্ছেন বিশ্বের পুরো শক্তিকে প্রয়োগ করা হলেও প্রকাশের গতিতে চালান যাবে না। আমি যদি চাই চকের গুড়োকে প্রকাশের গতিতে চালিয়ে দেব, তার জন্য যে শক্তির দরকার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই তত শক্তি নেই। ঠিক তেমনি অনন্ত স্বর্গের জন্য যে শক্তির দরকার, সেই শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হয় না। কারণ এগুলো আশ্রিত কর্ম। এই যে আঠারো জন রয়েছেন তাদের উপর এই কর্ম আশ্রিত রয়েছে।

আশ্রিত কর্ম সব সময় ঠিকা মজুরের কাজ। তাই এর ফল কখনই দৃঢ় হতে পারে না। ঋষিরা এগুলো দেখেছেন, বুঝেছেন তারপর বলছেন আর যুক্তিতেও তাই হবে।

এতচ্ছ্রেয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া, এই যজ্ঞাদি কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম এই মনে করে যারা খুব উৎফুল্লিত হয়ে বলে এই কর্মই আমরা করব, এরা জরা আর মৃত্যুর ভয়কে কখন অতিক্রম করতে পারে না। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে কিন্তু আবার সেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে ফেরত চলে আসবে। আমি একটা বিরাট যজ্ঞ করলাম, যজ্ঞ করার পর আমার পুরোহিত বলল আমার স্বর্গ নিশ্চিত। সত্যিই হয়ত স্বর্গ নিশ্চিত হয়ে গেল কিন্তু জীবনের ভীতিতো আমার জীবন থেকে চলে যাচ্ছে না, জরা মৃত্যুর ভয় সেটাও যাবে না। স্বর্গে আমি যাব ঠিকই, কিন্তু কিছু দিন পর স্বর্গ থেকে আমাকে নেমে আসতে হবে। আর যেখান থেকে ছেড়ে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। হিন্দী সিনেমার একজন নামকরা লেখক জাভেদ আখতার কিছু দিন আগে একটা ভাষণ দিচ্ছিলেন যেখানে রবিশঙ্কর, যিনি আর্ট অফ লিভিং শেখান, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। জাভেদ আখতার তার ভাষণে আধ্যাত্মিকতার পুরো ব্যাপারটাকে খুব কড়া ভাবে নিন্দা করে গেছেন। তাতে তিনি বলছেন আধ্যাত্মিকতাকে আমরা যেভাবে বুঝি সেটা পুরোটাই একটা ধাপ্পা, এগুলো কোন কাজে লাগে না, শুধু যারা বড়লোক আছে, আর বড়লোকদের বাড়ির বউগুলো যারা হতাশায় ভুগছে, বাড়িতে কোন কাজ করে না তারাই এই সব আধ্যাত্মিক গুরুদের কাছে গিয়ে আর্ট অফ লিভিং শিখছে। আধ্যাত্মিকতা কি শুধু কিভাবে শ্বাস নিতে হবে আর শ্বাস ছাড়তে হবে জানা! এইসব বলার পর জাভেদ আখতার তাঁর নিজের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন অপরের সেবা করা, অপরের মঙ্গলের জন্য কিছু করা এগুলোই কিছুটা আধ্যাত্মিকতা। জাভেদ আখতার যা বলতে চাইছেন আসলে আধ্যাত্মিকতা তাও নয়। ঠাকুর বলছেন মানুষ যখন অজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে চায় তখন বলে ফেলে আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান কি দিচ্ছে? আমাদের পরকালে যাই হোক, সেতো আমরা জানিনা কি হবে, এই জীবনে দেখব কি হচ্ছে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে সে এই জীবনেই ভয়কে অতিক্রম করে যায়, আর শোক ও মোহকে অতিক্রম করে যায়। শোক আর মোহটাও ভয়। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের এটাই একমাত্র কাজ। যে কোন ধরণের শোক আর মোহকে মানুষ পার করে যায়, আর যে কোন ধরণের ভয়কে অতিক্রম করা যায়। কিসের থেকে আমাদের ভয়? জরা, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে ভয়। আমাদের মঠে ছিলেন স্বামী শিক্ষানন্দ, খুবই প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী। ইদানিং তিনি ঘোর বেদান্তী হয়ে গিয়েছিলেন। ওনার পেটে ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। কিন্তু তাতে ওনার কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। সেবার জন্য একজন ব্রহ্মচারী সব সময় তাঁর কাছে থাকত। শেষের দিকে উনি খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ করে দিলেন। সেবক ব্রহ্মচারী খাবার নিয়ে তাঁকে খুব করে বলতেন 'মহারাজ! একটু খান। শরীরের জন্য অন্তত একটু খেয়ে নিন'। মহারাজ শুনে বলছেন 'শরীর! আমি তো শরীর নই'। সেবক হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন 'এই তো আপনার শরীর'। 'ঠিক বলছ, এটা আমার শরীর কিন্তু আমি তো শরীর নই, আমি শুদ্ধ আত্মা'। ডাক্তার এসে তাঁর অবস্থা দেখার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। কিন্তু তিনি হাসপাতালে যেতে চাইছেন না। 'আপনার কষ্ট হচ্ছে হাসপাতালে গেলে আরাম দেওয়া যাবে'। 'তোমরা কি বলতে চাইছ! আমি ব্রহ্ম আমার আবার আরাম কিসের'! ওই অবস্থায় তিনি নিজের দেহ ছাড়লেন। এই শরীরের যা কাজ ছিল হয়ে গেছে, একে আর খাওয়া দিয়ে কোন কাজ নেই। ডাক্তাররা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। শরীরের ওই কষ্ট তার মধ্যেও বলে যাচ্ছেন 'আমি শরীর নই আমি ব্রহ্ম, আমি শুদ্ধ আত্মা'।

যাঁর এই জরা আর মৃত্যুর ভয় চলে গেছে, যাঁর এই শোক ও মোহ চলে গেছে, তিনি যে জিনিষটা চলে গেছে তার জন্য কোন হা হুতাশ করবেন না, যে জিনিষটা তাঁর কাছে নেই সেই জিনিষটাকে পাওয়ার জন্য কোন ইচ্ছাও করবেন না। এটাই আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিকতার নামে হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে বলছে আমি নিষ্কাম অনাসক্ত এরাই হল কপট ও দ্বিচারী। এই ব্যাপারে জাভেদ আখতার কোন ভুল কিছু বলছেন না। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে নিজের শরীরের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে দিচ্ছেন, জরা, মৃত্যু, শোক মোহকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন এর পেছনে কত সাধনা, কত কৃচ্ছতা,

কত ত্যাগ তপস্যা আমরা ধারণাই করতে পারবো না। এক সামান্য যজ্ঞ করাই আমাদের কাছে কত কষ্ট সাধ্য, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়নাদি অনুষ্ঠানে যে যজ্ঞ ও বিধি পালন করতে হয় তাতে কি প্রাণান্তক পরিশ্রম লেগে থাকে। আর এক অগ্নিহোত্র করতে ষোলজন পুরোহিত বসে আছেন, সেটাকে একটা বাক্যে উড়িয়ে দিয়ে বলছেন এগুলো তোমার কাছে কিছুই নয়, তোমাকে আরও উপরে যেতে হবে।

ঠাকুর বলছেন আগেকার ঋষি মুনিরা কত খাটতেন, সকালবেলা কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে যেতেন আর তপস্যা করতেন। সন্ধ্যে বেলা ফিরে একটু ফলমূল খেতেন। এই তপস্যা করে করে এনারা শোক আর মোহকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন, জরা মৃত্যুকে জয় করে নিচ্ছেন। আর যারাই তাঁর কাছে আসছে তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য কায়দা করে মিষ্টি কথা বলে বিদায় করে দিচ্ছেন। এখনও যে এই ধরণের সন্ন্যাসী যে একবারেই নেই তা নয়। জাভেদ আখতার বলছেন কেউ হয়ত বিদেশে যেতে পারছে না, কারুর হয়ত ব্যবসা যে রকম ভালো হওয়ার কথা হচ্ছে না, এরা আবার বাবাজীদের কাছে হাজির হয়ে যাচ্ছে। তাদের থেকে বাবাজীরা আবার অর্থ রোজগার করছে। এগুলোও যেমন আছে কিন্তু অন্যটাও তেমন আছে। মহারাজরা উত্তরকাশীতে তপস্যা করতে গিয়ে দেখেছেন সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে কত সাধুরা ঐ রকম হিমশীতল জায়গায় পড়ে থেকে দিনের পর দিন কি কঠোর তপস্যা করে যাচ্ছেন। কারুর কাছ থেকে প্রণামী পর্যন্ত নেবেন না। কোন ভোগের সাধনই নেই। দু চারজন গোলমেলে সাধুদের সাথে ত্যাগনিষ্ঠ সাধুদের এক করে দেওয়াটা ঘোরতর অন্যায়। সব ক্ষেত্রে দু চারজন গোলমেলে লোক থাকবেই। কয়েকজন এলেমেলো লোককে দেখে সামগ্রিক বিচার হয় না। আদর্শকে বিচার করতে হলে দুই একটা পচা ফলকে দেখে বিচার হয় না, শ্রেষ্ঠ ফলগুলো দেখেই আদর্শের বিচার হয়।

আধ্যাত্মিক পুরুষের একমাত্র কাজ যে কোন রকমের ভয়কে উড়িয়ে দেওয়া আর শোক ও মোহের পারে নিয়ে যাওয়া। এ ছাড়া আধ্যাত্মিকতার অন্য কোন কাজ নেই। এর পরের যে কাজ তা হল আত্মজ্ঞান, সাক্ষাৎ আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন যদি নাও হয়, তত্ত্বগত ভাবেও যদি বুঝে নেয় – হ্যাঁ, আমিই সব কিছু হয়েছি। তখন আমি কাকে নিয়ে মোহ করব, কার জন্যই বা শোক করব, কাকেই বা ভয় করব। যখন আমি দেখব সাপ যে ছোবল দিতে আসছে সেটা আমারই একটা রূপ, যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে সেও আমারই রূপ, তখন আর আমার কি নিয়ে অশান্তি হবে! এটা তাত্ত্বিক ভাবে বুঝে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, আর যিনি সত্যিকারের আত্মদর্শন করে নিয়েছেন, তাঁকে তো আর চেষ্টা করেও বিচলিত করা যাবে না। তাঁকে যদি কেউ লাখ টাকা দিয়ে দেয়, তিনি সবাইকে চেঁচিয়ে দেখাতে থাকবেন দেখো দেখো আমাকে লাখ টাকা দিয়েছে। তারপর প্রথম যাকে পাবেন তাকে বলবেন তোমার টাকা লাগবে? আচ্ছা এই নিয়ে নাও। কারণ তাঁর আর সেই মোহটাই নেই যে আমার কাছে টাকাটা থাকুক। আত্মজ্ঞানের কথা থাকুক, সেতো অনেক উঁচু কথা, আমি আপনি বুঝতে পারব না কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ এটাই, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বাস্তবিকতা কি? তখন এই একটাই উত্তর – শোক, মোহ আর ভয় এই তিনটের পারে নিয়ে চলে যাবে। ভয় হল সব কিছু থেকে, কিন্তু সাধারণ ভয় হল জরা ও মৃত্যু।

যজ্ঞের কথা বলা বা অপরের সেবার কথা বলা এগুলো সবই এক। ভক্তিও সেই একই জিনিষ, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ছি, চারবার মন্দিরে যাচ্ছি, গঙ্গা স্নান করছি, সারাদিন সব ভোগ করে সন্ধ্যেবেলা আরতি করছি, সবই যজ্ঞ কিন্তু সব *প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা*। এর ফল সবই বিনাশী, কোনটাই কাজে আসবে না। জ্ঞানচর্চা কাজে দেবে না, ভক্তি কাজে দেবে না, যজ্ঞ কাজে দেবে না। এখানে এটা বলতে চাইছে না যে আপনি যজ্ঞ বন্ধ করে ঠাকুরের নাম করতে থাকুন। তা বলা হচ্ছে না, বৈধী ভক্তিরও একই অবস্থা। যারা বৈধী ভক্তি করছে তাদের ক্ষেত্রেও *প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা*। আর আমরা যত কর্ম করছি, যত রিলিফের কাজ করছি, যত গরীবদের খাওয়াচ্ছি, যত বিধবার চোখের জল মুছে দিচ্ছি, সব ক্ষেত্রে একই ফল, যজ্ঞ করাও যা এগুলো করাও তাই। স্বামীজী বলছেন তুমি যে যজ্ঞটা করছ সেটা নিজের স্বার্থেই করছ, তার থেকে বরং কিছু বিধবার চোখের জল মুছে দাও, যার শিক্ষা নেই তাকে শিক্ষা দাও, এতে মঙ্গল তোমারও হবে তারও হবে।

যজ্ঞ করলে শুধু তোমারই মঙ্গল হবে, এইটাই তফাৎ। নিষ্কাম ভাবে যদি কর তাহলে এই কর্ম তোমাকে অনেক উপরে নিয়ে যাবে। কিন্তু যজ্ঞ কখনই নিষ্কাম ভাবে করা যাবে না, কারণ যজ্ঞ করাই হয় স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। সেইজন্য সব সময় যজ্ঞের থেকে সেবামূলক কর্ম মহৎ। কারণ সেবাকর্ম নিঃস্বার্থ ভাবে করা যায়, যজ্ঞ কখনই নিঃস্বার্থ ভাবে হবে না। ইদানিং যারা বলছেন মানুষের সেবা কর, কেউ বলছেন কর্ম কর, অনেকে আবার বলছেন যজ্ঞ কর, কেউ বলছেন কিছু করতে হবে না শুধু ভক্তি করে যাও আর হরিনাম করে যাও, হরিনাম ছাড়া আর কিছু নেই। তাদের জন্য পরের মন্ত্রে বলছেন –

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।১/২/৮।।

(অজ্ঞানের মধ্যে থেকে মুগ্ধ ব্যক্তিরা 'আমরাই ধীমান্ ও আমরা সব কিছু জেনেছি' এইভাবে নিজেদের পণ্ডিত ও সম্মানীত মনে করে অনর্থপরম্পরায় পীড়িত হয়ে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করতে থাকে।)

সবাই বলে আমার মতটাই ঠিক। বৈষ্ণবরা বলছে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাই, পূর্বমীমাংসকরা বলছে যজ্ঞ ছাড়া গতি নাই। এখন নতুন প্রজন্মে বলা হচ্ছে সেবা কর, সেবা ছাড়া গতি নাই। সেবার নামে কত এনজিও খোলা হচ্ছে আর একটি এনজিও পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতি ধরা পড়েনি। উপনিষদ যখন আমরা অধ্যয়ণ করছি এখানে প্রথমেই আচার্য বলছেন দেখো ভাই এখানে আমার তোমার বুদ্ধির কোন খেলা নেই। পুনের এক নামকরা বাবাজীর আশ্রমে দরজায় নোটিশ ছিল Leave your shoes and mind here। এটি একটি খুব বিখ্যাত প্রবাদ কথা। আশ্রমের বাইরের দরজার গায়ে নোটিশে লেখা আছে 'এখানে আপনার জুতা আর বুদ্ধি খুলিয়া রাখুন'। মানে, বাবাজী এমন এক বিপ্লবী কথা বলছেন যদি তুমি নিজের বুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে যাও তাহলে বাবাজীর কথা কিছুই ধরতে পারবে না। কোন আগন্তুক কিছু শাস্ত্রীয় কথা মাথায় নিয়ে আশ্রমে এসেছে, তাকে বলা হচ্ছে সেগুলো ফেলে দিতে। ফেলে দেওয়া হল। এবার কি করতে হবে? এবার বাবাজীর কথাগুলো মাথায় নিয়ে চলতে হবে। আপনি বলতে পারেন তাহলে আমাকেও আচার্য শঙ্করের কথা কেন শুনতে হবে? আচার্য কিন্তু বলছেন, আমার কথা তো তোমাকে একবারও শুনতে বলছি না। আমার কথাকে সত্যের মাপকাঠিতে ফেলে পরীক্ষা করে নাও।

একটা জিনিষ সত্য কিনা তা বোঝার জন্য তিনটে মাপকাঠি আছে – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। আপনি কি অনুভূতি সম্পন্ন? আপনি কি এই জিনিষটাকে উপলব্ধি করেছেন? যদি বলেন, না। তাহলে আপনার কথা শুনব না। ঠাকুর বলছেন – মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি কিছু জানিনা। এখানে কোন কপটতা নেই, তিনি জানেন এটাই সত্য। স্বামীজীও বারবার বলছেন, যে ঈশ্বর দর্শন করেনি তার তো ঈশ্বরকে নিয়ে বলার কোন অধিকারই নেই। তাহলে এই যে যিনি বলছেন আপনার মতামত বাইরে ছেড়ে আসুন, আমি যদি আমার মতামত বাইরে ছেড়ে আসি তাহলে আপনার আর বিশেষত্ব কোথায়! আপনি সামনা সামনি আসুন, এসে আমার মতকে পাল্টান। কার মতকে পাল্টাচ্ছে? যারা কাঁচা লোক, অল্প দু চারটে কথা শুনেছে, শাস্ত্রের জ্ঞান সেই রকম নেই, সাধনা নেই, সহজে একটু শান্তি পেতে চায়, বাড়িতে শান্তিতে ঘুমোতে চায় এই ধরণের লোকদের নিয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছে। ঠাকুর অজ গ্রামের পণ্ডিতদের বলছেন, কলকাতায় এসো ওখানে অনেক হনুমান পুরী আছে। ঠাকুর বলতে চাইছেন, গ্রামের পালোয়ান গুলো নিজের গ্রামে খুব ওস্তাদি দেখায়। তাই বলছেন কলকাতায় অনেক বড় বড় পালোয়ান আছে এখানে ছোট্ট জায়গায় তুমি নিজের ওস্তাদি দেখাচ্ছ, কলকাতায় এসে যদি ওস্তাদি দেখাত পার তখন বোঝা যাবে তুমি কত বড় পালোয়ান। এইসব বাবাজীরা নিজের কুঠিয়ায় বসে খুব ওস্তাদি দেখাচ্ছে, যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের লোক তাঁদের পাল্লায় পড়লে এদের সব ওস্তাদি এক মিনিটে উড়ে যাবে।

যখন যুক্তি তর্ক হবে তখন তুমি একটা যুক্তি দেখাবে তিনিও একটা যুক্তি দেবেন, এইভাবে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধানের একটা আধার ঠিক করতে হবে। এই আধারটা কি হবে? আচার্য শঙ্কর যখন যুক্তি নিয়ে চলবেন তখন তিনি বেদকে নিয়ে চলছেন না, আমার উপনিষদ এই কথা বলছে বলে তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে আক্রমণ করবেন না। কারণ তারা তো বেদ উপনিষদ মানেই না। একজন খ্রীশ্চান বা মুসলমানের সঙ্গে যখন বিচার চলবে তখন সেখানে তারা তো বেদকে মানবে না, আবার আপনিও তো বাইবেল কোরানকে মানবেন না। এই যুক্তিতর্ক কোন দিন থামবে না। কারণ আমি আজকে যুক্তিতর্কে একজনকে হারিয়ে দিতে পারি কিন্তু আগামীকাল আরেকজন আসবে যে যুক্তিতর্কে আমার থেকেও বড় পণ্ডিত হবে, তখন সে বলবে আমি যা বলে গেছি সব ভুল। সেইজন্য যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করা যায় না।

তখন শ্রুতি দিয়ে বিচার করতে হবে। আগেকার যাঁরা ঋষিরা ছিলেন দেখতে হবে তাঁরা কি বলে গেছেন। তাঁরাও তো ভুল বলে যেতে পারেন। কিন্তু তাঁদের জীবনটা দেখুন। যিশু বলছেন আমি আর আমার পিতা স্বর্গে এক। তার জন্য তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হল। যিশু বললেন তুমি যদি আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাও করে দাও। মানুষের কাছে তার জীবন সব থেকে প্রিয়, সে এই একটি কথার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যাবে! এরপরেও যদি তাঁকে বিশ্বাস না করি তবে কাকে বিশ্বাস করব! ভগবান বুদ্ধ রাজসুখ, সাম্রাজ্য ছেড়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁকে বিশ্বাস করব না, আর যে ভিক্ষাপাত্র হাতে জন্ম নিয়ে পরে সাম্রাজ্য গড়ে তুলল তাকে বিশ্বাস করব! এইসব বাবাজীরা কেউ কোন গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করত, কারুর হয়ত কিছু ছিল না আর এখন বাবাজী হয়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, আমি এদের বিশ্বাস করব! না ভগবান বুদ্ধের কথা বিশ্বাস করব! ঠাকুরের গলায় কঠিন ব্যাধি, খেতে পারছেন না কিন্তু এক মুহূর্ত ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া থাকছেন না আর ভাবছেন কিসে জগতের সবার মঙ্গল হয়, কিসে তাঁর শিষ্যরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাঁর কথা শুনব নাকি এদের কথা শুনব! যাঁরা ঈশ্বরের জন্য নিজের সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন তাঁরই কথা তো আমাকে শুনতে হবে। আর তার সঙ্গে দেখব যুক্তি আছে কিনা। সব শেষে, আমার নিজের অনুভূতি কি রকম। এই তিনটে হল Taste of Truth।

উপনিষদের ঋষিরা দেখছেন গুরুর অভাব নেই, শিষ্যের অভাব। গুরুগুলো কি করছে? *অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ*, সব গুরুগুলো অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এটা কে দেখবে? ঠাকুর বলছেন দাবা খেলায় দাবুড়ে ঠিক চাল দিতে পারেনা কিন্তু বাইরে থেকে যে দেখছে সে কিন্তু বুঝতে পারে। নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে কত রকম ভাবে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেছেন। এত পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার পরেও স্বামীজী ঠাকুরের কোন দোষ খুঁজে পেলেন না। দেখছেন ঠাকুরের মধ্যে শোক, মোহ আর ভয় এগুলো কিছুই নেই। যাঁর শোক, মোহ ও ভয় এই তিনটে নেই তখন তার কি পরিণাম হয়? শোক, মোহ ও ভয় যখন খসে পড়ে তখন এদিকে কামিনী-কাঞ্চন-নাম-যশও স্বাভাবিক ভাবেই খসে পড়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রেই সাধকদের উদ্দেশ্যে বলে দিচ্ছে শরীর ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই রাখবে। এনারা সেটুকুও রাখবেন না, শরীর ধারণের জন্য যেটুকু সঞ্চয় করতে হবে সেটাও করবেন না।

এই রকম পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে গুরুকে শিষ্য দেখে নিয়ে গুরুর সমীপে হাজির হয়ে গেল। এখন যদি শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞেস করে অমুকের ব্যাপারে আপনার কি মত। তখন তিনি বলবেন *অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ*, এরা অবিদ্যার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর ঠিক কয়েকটি মন্ত্রের পরেই আসবে যেখানে দেখাবেন কেন এটাকে অবিদ্যা বলা হচ্ছে। আর *স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ*, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। তাকে কেউ মানছে না, কিন্তু নিজেকে মনে করছে আমার মত পণ্ডিত আর কে আছে। ঠাকুর বলছেন – আমার মত কি আর কাউকে দেখেছ? ঠাকুর সরল মনে একটা প্রশ্ন করছেন কিন্তু বাকীরা প্রশ্নও করে না, এতটাই আত্মপ্রত্যয়। পায়ে পা তুলে গোঁফে চাড় দিয়ে বলছে – বল! তোমার কি জিজ্ঞাস্য। আত্মজ্ঞান হল স্বসংবেদ্য, যাঁর জ্ঞান হয়েছে সেই জানে আর কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু আমাকে আপনাকে বুঝতে হলে এই শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে। আর শোক, মোহ আর ভয় এই তিনটে তাঁর থাকবে না। ভয়টাও মোহের কারণ, শরীরের

প্রতি যখন মোহ হয় তখনই ভয় আসে। কিসের ভয়? ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভয়, শরীরে ব্যাধির ভয় হবে, জরার ভয় হবে আর এই শরীরের মৃত্যু হবে এই ভেবে ভয় হবে। আসলে শেষ পর্যন্ত সব কিছু শোক আর মোহ থেকেই জন্ম নেয়, শোক মোহের বাইরে কিছু নেই। কিন্তু বোঝানর জন্য ভয় শব্দটা ব্যবহার করা হয়। যিনি এই শোক আর মোহকে অতিক্রম করে গেছেন তাঁর আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি হবে না। শ্রীমাকে সঙ্ঘ চালাতে হত, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কিভাবে একদিকে নিজের সংসার আরেকদিকে সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘকে চালিয়ে গেছেন ভাবতে গেলে হতবাক হয়ে যেতে হয়। কোথাও কোন এতটুকু আসক্তি তাঁর ছিল না। ঠাকুরের সঙ্ঘকে চালানর জন্য তাঁকে কিছু কিছু সঞ্চয়ও করতে হয়েছিল। ঠাকুর তো সঞ্চয়কে একেবারে পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। পাগলের পর্যায়ে না নিয়ে গেলে হয়ও না। কিন্তু শ্রীমা ছিলেন অন্য মুর্তি।

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ, আমিই ঠিক বুদ্ধিমান, আমিই ঠিক ঠিক বুঝেছি। ঠাকুর হৃদয়রামের সাথে কোন্নগর যাচ্ছেন। ঘাটে নামতেই দক্ষিণেশ্বরের পুরনো পূজারী ঘাটে বসেছিল ঠাকুরকে দেখে বলছে 'ও ভট্‌চাজ্জি! বলি আছ কেমন'! সে নিজেকে বিরাট কিছু মনে করছে। তার বলার ভঙ্গি দেখেই ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন। হৃদয়রামকে বলছেন 'ওরে হৃদু! এর টাকা হয়েছে রে'! যাদের কিছু শিষ্য জুটে যায় আর কিছু টাকা-পয়সা হয়ে যায় এর সাথে যদি কিছু বিদ্যাপ্রাপ্তি হয়ে যায়, এগুলোও ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হলেই মনে করে *স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ*। বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিদেরও এই এক সমস্যা। এরা নিজেকে তো বিরাট কিছু মনে করে অথচ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর মধ্যে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। নিজেকে বলছে ধীর পুরুষ, পণ্ডিত, নিজের নামে সবই বলছে কিন্তু নিজে যে ঘুরে ঘুরে মরছে আর জন্মাচ্ছে বুঝতে পারছে না। স্বামীজীরও এই সমস্যা হয়েছিল। স্বামীজী যখন বিদেশে কাজ করছিলেন তখন স্টার্ডির সাথে ঝামেলা লেগে গিয়েছিল। স্টার্ডির অভিমত ছিল যিনি যোগী তাঁর কেন শরীর খারাপ হবে। স্টার্ডি বুঝতেই পারছিল না, যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল স্বামীজীকে যার জন্য তাঁর শরীরের এই ভগ্নদশা প্রাপ্তি। কিন্তু তাই বলে এই নিয়ে কি স্বামীজী কোন দুঃখ করছেন! না কি কোন কান্নাকাটি করছেন! আদপেই নয়।

জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া, সংসার তাপের জ্বালার মধ্যে বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে। স্বামীজী তাঁর 'ভাববার কথা' বইতে বলছেন – বলে আমি আমার সব কিছু ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু দক্ষিণা যদি ঠিক মত না পায় তখন গালাগাল দিতে শুরু করে। আধ্যাত্মিক পুরুষদের কিছু কিছু গুণাবলী আছে। কিন্তু যতক্ষণ আপনার মধ্যে দুর্বলতা আছে ততক্ষণ আপনি নিজেকে গুটিয়ে পেছনের দিকে রাখুন। আপনি বলুন আমার দুর্বলতা আছে, আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু এই অবস্থাকে লুকিয়ে যখন নিজেকে সামনে প্রকাশ্যে নিয়ে বলছেন আমি যা বলব সেটাই ঠিক, তখনই *অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ*। আপনি অবিদ্যার মধ্যে ভাসমান, আপনি বিদ্যা পাননি। বিদ্যা যদি পেয়ে থাকতেন তাহলে *জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি*, এই জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর মধ্যে ঘুরপাক করতেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা, তাহলে আপনার এই বোধ হত না, আর বলতেন না যে আমার মত আর পণ্ডিত নেই।

সক্রেটিস এথেন্সে থাকাকালীন একদিন ওরাকেলের কাছে গেছেন, জিজ্ঞেস করছেন এথেন্সের সব থেকে বড় পণ্ডিত কে? ওরাকেল উত্তরে বলছেন – সক্রেটিস। সক্রেটিস শুনে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন, উনি আমাকে কেন এথেন্সের সব থেকে বুদ্ধিমান বলছেন! এথেন্সে দেবীদের যে মন্দির ছিল সেখানে ওরাকেলরা থাকত, ওদের উপর দেবী যেন ভর করতেন। সেই ওরাকেলরা শহরের বাইরে পাহাড়ের উপরে থাকে, ওরাকেলের উপর দেবী ভর করেছেন। সক্রেটিস পাহাড়ে খুব কষ্ট করেই গিয়েছিলেন। সক্রেটিস শুনে হতাশ হয়ে বসে পড়ে ভাবছেন, আমি এত কষ্ট করে এতদূর এলাম জানতে আমার শহরের সব থেকে বিজ্ঞ পুরুষ কে, আর তার উত্তরে বলছে কি না সক্রেটিস! ওরাকেলরা কখন ভুল বলবে না, সেটাও সক্রেটিস জানতেন। ওরাকেলরা দৈববাণীই করত। দৈববাণী তো কখন ভুল হয় না। সক্রেটিস অনেক চিন্তা করে বুঝলেন – হ্যাঁ ঠিকই বলেছে, বাকিরা সবাই মনে করে তারা সব জানে আর আমি মনে করি আমি কিছুই জানিনা। সেইজন্যই আমাকে বিজ্ঞ বলছে। এটাই কেনোপনিষদে বলছেন *যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ*, যে জানে আমি

সব জানি সে জানে না, যে জানে আমি জানিনা সেই জানে। যারা মনে করে জগৎকে বুঝে ফেলেছি, এই আরেকটু বাকী আছে। কিন্তু এই জানাটা হবে সংশয় বিপর্যয়রহিত। এই জ্ঞানে কোথাও কোন সংশয় থাকবে না আর কোথাও কোন রকমের বিপরীত জ্ঞান থাকবে না।

এই ধরণের লোকেদের দ্বারা কি হয়? *অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ*, ঠাকুর খুব সুন্দর অথচ অনাভিধানিক শব্দ দিয়ে বলছেন হেগো গুরুর ইত্যাদি চেলা। মানে যেমন গুরু তার তেমন চেলা। গুরু যদি অন্ধ হয় তাহলে চেলাদের তিনি আর কতদূর নিয়ে যাবেন? এক অন্ধ আরেক অন্ধকে হাত ধরে বলছে চল আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাবে? বুঝে নিন বাকিটা কি। গুরুর কাছে শিষ্য প্রশ্ন নিয়ে এসেছে, শিষ্য তো স্বাভাবিক ভাবেই অজ্ঞান অন্ধকারে পড়ে আছে, সে অন্ধ। আর যে গুরু, সে আরও অন্ধ। এই রকম ঘটনা আগেকার দিনে অনেক আছে। এক জায়গায় শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু গুরু জানেন না। গুরু তখন বলছেন 'বাপু! তোমার এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই, তবে শুনেছি অমুক জায়গায় একজন গুরু আছেন উনি খুব বড় জ্ঞানী। চল আমরা দুজনেই তাঁর কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই'। আবার এই রকম গুরুও আছে যারা বলে, আমি যেটা বলছি এটাই ঠিক। দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্র নাথ দত্তের এই নিয়েই ঝামেলা হয়েছিল। নরেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে দিলেন কেন? কারণ এখানে চেলাটি অন্ধ ছিল না। গুরু যদি অন্ধ হয় তাহলে তারা কি ধরণের চেলাকে চালাতে পারবে? যারা অন্ধ। কিন্তু নরেন্দ্র নাথ দত্ত অন্ধ ছিল না। অন্ধ না হওয়ার জন্য সে বেরিয়ে গেল। এরপর দক্ষিণেশ্বরে চোখওয়ালা গুরুর সাথে চোখওয়ালা চেলার সাক্ষাৎকার হল। তারপর শুরু হল তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা।

গুরুরা নিজেদের দুরবস্থা থেকে বাঁচার জন্য অনেক রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, *যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ*। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার কপাল, ভবিষ্যৎ তোমার উজ্জ্বল, স্বর্গে তোমার নিশ্চিত গমন। আর শিষ্যকে কি করতে বলে? যেগুলো করতে বলছেন সেগুলো শাস্ত্র বিরুদ্ধ, সেই জিনিষগুলো করতে বলছেন যেগুলো করলে মানুষের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হবে না। এগুলো সবই অপরা বিদ্যা। কিন্তু যারা স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন তারা এইভাবে অন্ধকূপে গিয়ে পতিত হয়। এই প্রসঙ্গকেই টেনে নিয়ে পরের মন্ত্রে আবার বলছেন –

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।।১/২/৯।।

(অজ্ঞানের মধ্যে বহুপ্রকারে থাকা বালস্বভাব অজ্ঞানীরা 'আমরা কৃতার্থ' এই রূপ অভিমান করে থাকে। যেহেতু কর্মিগণ আসক্তিহেতু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান রহিত, সেই হেতু তারা কর্মফলভোগ (পূণ্য) শেষ হলে দুঃখার্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়।)

সব লোক অবিদ্যার মধ্যে পড়ে আছে। অবিদ্যা কি? এমন এমন কর্ম করছে যে কর্ম মানুষকে জ্ঞান দেবে না উপরন্তু কামনার জন্ম দিতেই থাকবে। কামনা আবার কর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অবিদ্যা, কাম আর কর্ম এই তিনটে এক সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেখানে অবিদ্যা সেখানেই কামনা বাসনা আর কামনা থাকলেই কর্ম হবে, কর্ম থাকলেই অবিদ্যা থাকবে। এটা হল বেদান্তের মত। আগেকার দিনে অনেক পণ্ডিতরা এই মতটাকে পুরোপুরি মানতেন না। আচার্য শঙ্কর প্রথমে যুক্তি দিয়ে দেখালেন অন্যান্য যত মত আছে সেগুলো চলে না। সাথে সাথে উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিনটে মূল গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করে দেখালেন এদেরও উদ্দেশ্য এটাই বলা যে তুমি এই অবিদ্যা জনিত কর্ম করা থেকে বিরত হও, তা নাহলে তুমি আরও অবিদ্যাতে ডুবে যাবে। হিন্দুরা বলে বেদ হল ভগবানের মুখের কথা। গভীর সাধনায় নিমগ্নরত ঋষিদের কাছে যে সত্যগুলো উদ্ভাসিত হয়েছিল, সেই সত্যগুলোকে ছন্দোবদ্ধ করে যেখানে সংরক্ষণ করা হল, সেটাই বেদ।

সেখানেও এই কথাই বলছে *অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা*, পূর্ণভাবে সবাই নানান রকম অবিদ্যার মধ্যেই পড়ে আছে – কেউ জ্ঞানের অহঙ্কারে, কেউ সাহিত্যের অহঙ্কারে, কেউ যুক্তিবাদী সেই অহঙ্কারে নিমগ্ন হয়ে আছে। আর *বয়ং কৃতার্থা ইত্যাভিমন্যন্তি বালাঃ*, আধ্যাত্মিকতায় যাদের বালবুদ্ধি তারা একটু কিছু হলেই চিৎকার করে বলবে আমরা ধন্য হয়ে গেছি। একটা কোন সিদ্ধি লাভ হলে, বাড়ি করার পর গৃহপ্রবেশের সময় তার কি আনন্দ, আমি কি ধন্য, মেয়ের বিয়ে দিল তারপর মনে করে আমি ধন্য হয়ে গেলাম, সন্তান যখন হল, মনে করে আমি কি ধন্য। ঠিক তেমনি মানুষ যখন কোন বিদ্যা অর্জন করে, নিজের চিন্তার জগতে তখন সে মনে করে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। *বয়ং কৃতার্থা*, আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে, আমার থেকে বেশী আর কে বুঝতে পারে! কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছেন এরা হল *বালাঃ*, বালবুদ্ধি সম্পন্ন। স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর চেন্নাইতে বক্তৃতা দিচ্ছেন, শ্রোতাদের মধ্যে সব অধ্যাপকরা আছেন। স্বামীজী বলছেন তোমরা হলে সবাই মোচওয়ালা শিশু। তুমি পদার্থ বিজ্ঞান জেনে গেলে বলে কি হল!

আবার বলে আধ্যাত্মিক জগতে গুরুর কিসের দরকার। এররকজনকে নার্স তৈরী করতে পাঁচ বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তারও আগে যে সে এত বছর স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেছে সেটা আলাদা। যদি কেউ কামারের বা ছুতোরের কাজ করতে চায় তার জন্য আগে তাকে একজন কামার বা ছুতোরের পেছনে পেছনে ঘুরতে হবে। আর আধ্যাত্মিক বিদ্যা অর্জনের সময় বলে এ আমি নিজেই করে নিতে পারব। যে চুরি করতে নামে তার আগে তাকে একজনের কাছে হাত পাকাতে হয়। যে কোন সাধারণ কাজেই একজন গুরুর দরকার হয় কিন্তু যখন অধ্যাত্ম বিদ্যার কথা আসে তখন বলে এর জন্য আবার গুরুর কি প্রয়োজন। যে বিদ্যা সব থেকে কঠিন, যে বিদ্যা অর্জন করতে সব থেকে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন সেই বিদ্যার জন্য নাকি কোন গুরুর প্রয়োজন হয় না। গুরু ছাড়া, প্রশিক্ষণ ছাড়া অধ্যাত্ম বিদ্যা কি কখন আয়ত্ত হয়! এরা সবাই বালবুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু মনে করে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি, ভেতরে ভেতরে এই অহঙ্কার কাজ করে। মনে করে আমার মত আর কেউ বোঝে নাকি!

যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ, এখানে কর্মি বলতে সকাম কর্মিদের কথাই বলছেন, যারা যজ্ঞাদি করছে। যদিও উপনিষদ এখানে যজ্ঞের কথাই বলতে চাইছেন, কিন্তু পরে একটু সেবা কাজের কথাও বলবেন। বলছেন, এর সবটাই সকাম, সব কর্মের পেছনে লোকমান্যের ইচ্ছা বিদ্যমান। এই সকাম বুদ্ধিতে এরা অভিভূত হয়ে আছে, পুরো মনটা সেখানেই পড়ে আছে। সেইজন্য এরা কখনই তত্ত্বকে জানতে পারেনা। তত্ত্ব মানে জিনিষটা যে রকমটি আছে, সে রকমটি জানতে পারেনা। চোখের উপর যদি একটা রঙিন চশমা লাগিয়ে দিই তখন আমি জগৎটাকে সেই রঙেরই দেখব। আমাদের মনটাও কামনা-বাসনা দিয়ে রাঙানো, এই রাঙানো মন দিয়ে আমরা দেখছি ঈশ্বরকে, দেখছি ব্রহ্মকে। ঈশ্বর আর জগৎকেও তাই রঙিন দেখছি, যে যেমন রঙের চশমা পড়েছে সে সেই রঙে সারা জগৎকে, ঈশ্বরকে, ব্রহ্মকে দেখছে। ফলে সুখভোগটাই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে যায়। তারজন্য এই সকাম কর্মিরা কি করে? আচার্য বলছেন *রাগাৎ কর্মফলরাগাভিভবনিমিত্তম্*, যে কোন কাজের আগে দেখবে নিজের স্বার্থ কতটা চরিতার্থ করা যাবে। যদি তপস্যাও করে তার আগে সে চিন্তা করবে এই তপস্যা করলে আমি কি ফল পাব, জপ করার সময়ও ভাববে আমি কি রকম ফল পাব। ঠাকুর বলছেন, এখানকার জন্য দু পয়সার বাতাসা নিয়ে আসে তাতেও এত এত কামনা বাসনা লাগিয়ে নিয়ে আসবে। সব কাজেই কামনা-বাসনাকে জড়িয়ে রাখে, কামনা-বাসনার বাইরে কোন কিছুর চিন্তাও করতে পারছে না। কামনা-বাসনার মধ্যে জড়িয়ে আছে বলে তত্ত্বকে জানতে পারেনা।

ফলে কি হয়? *আতুরাঃ*, নানান রকমের দুঃখ কষ্টে শোকার্ত হয়ে পড়ে। *আতুরাঃ* মানে দুঃখার্ত বা শোকার্ত। আর কি হয়? *ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে*, স্বর্গে তো যাবেই, কারণ যজ্ঞ করেছে। কামনা-বাসনা নিয়ে কাজ করেছিল। স্বর্গে গিয়ে সেই কর্মফল ভোগ করতে করতে সেই ফল গেছে ক্ষয় হয়ে। এরপর কি হবে? স্বর্গ থেকে পতন হয়ে যাবে। যখন স্বর্গ থেকে খসে পড়বে তখন কি খুব আনন্দে খসে পড়বে? না, দুঃখার্ত হয়েই পড়তে থাকবে। মহাভারতে এই স্বর্গ থেকে কিভাবে জীবাত্মারা খসে পড়ে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমাকেও

প্রশ্ন করা হয়েছিল কিভাবে স্বর্গ থেকে পতন হয়। বলছেন স্বর্গে সবারই একটা সূক্ষ্ম শরীর থাকে, সবাই দিব্যি স্বর্গে আছেন হঠাৎ দেখল যে তার সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যাকর্ষণটা বেড়ে যাচ্ছে। শরীর মানেই মাধ্যাকর্ষণ, এই মাটির শরীর না হয়ে যদি হাল্কা শরীর হয় তাহলে উপরে চলে যাবে, আরও হাল্কা হলে আরও উপরে যাবে। যখন শরীরটা পুরোপুরি তেজাংশতে চলে যাবে তখন আরও উপরে চলে যাবে। এর পর যখন কর্মফল শেষ হতে থাকল, মানে পূণ্যটা কমতে থাকে, পূণ্য কমতে শুরু করে বলে তখন আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামতে শুরু করে। এখন যদি বড় বাড়ি ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয় তখন মনতো একটু খারাপ হবেই। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে যদি ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকতে হয় তাহলে মন আরও একটু খারাপ হবে। ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়ি ছেড়ে যদি টালির বাড়িতে নামতে হয় তখন আরও মন ভেঙে পড়বে।

গীতাতে স্বর্গ থেকে পতন হয়ে যাওয়ার উপর অনেকগুলো শ্লোক আছে। বলছেন মানুষ মৃত্যুর পর দুটো পথ দিয়ে গমন করে, একটা উত্তরায়ণ আরেকটি দক্ষিণায়ণ। দক্ষিণায়ণ পথকে বলা হয় পিতৃমার্গ, যেখানে পিতৃরা বাস করেন। উত্তরায়ণ পথকে বলা হয় দেবমার্গ। পিতৃমার্গ দিয়ে গমন হলে আরও তাড়াতাড়ি ফেরৎ আসে, তার মানে খুব বেশী পূণ্যের পথ নয়। উত্তরায়ণের পথ আরও উচ্চ পথ, সেই পথ দিয়ে গেলে আরও উচ্চ লোকে যায়। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ*।।৮/১৫।। ভগবান বলছেন, আমাকে যদি না পাও, ঈশ্বরের জ্ঞান যদি তোমার না হয় তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে। এই কথাই উপনিষদে বলছেন শোকাতুর হয়ে নেমে আসে। পরের শ্লোকেই ভগবান বলছেন *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যা কিছু আছে, এই কল্পের যখন নাশ হবে তখন সব কিছুর নাশ হয়ে যাবে। আবার যখন কল্প শুরু হবে তখন সেগুলোই আবার ফিরে আসবে। বলছেন *সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*। ব্রহ্মজ্ঞরা বলে গেছেন সহস্রযুগ, সহস্রযুগ বলতে বোঝাচ্ছে চতুর্যুগ, এত দিন সব শুয়ে থাকে এত দিন আবার জেগে থাকে। ব্রহ্মা যখন ঘুমোতে যান তখন সহস্রযুগ পর্যন্ত সব কিছু ঘুমিয়েই আছেন। যখন ব্রহ্মা ঘুম থেকে জাগবেন তখন যে জিনিষগুলো ছিল সব আবার বেরিয়ে আসে। যেমন, আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ছি তখন আমার যত রকমের চিন্তা ভাবনা, কামনা-বাসনা, রাগ, বিদ্বেষ সব ঘুমিয়ে পড়ল। আমি যখন ঘুম থেকে জাগব তখন ওগুলোও আমার সঙ্গে জেগে উঠবে। ঠিক তেমনি ব্রহ্মা যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন যত জীব সব ঘুমিয়ে পড়বে, আবার ব্রহ্মা যখন জাগবেন তখন আবার তারা নতুন করে ফিরে আসবে। আর যে অবস্থায় জীব ছেড়ে গিয়েছিল ঠিক সেই অবস্থা থেকে আবার শুরু করবে। এটাই গীতাতে ভগবান বলছেন *ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*, এই পুরো ভূতগ্রাম, যাবতীয় জীবকুল যে অবস্থায় ছিল যে অবস্থায় তার নাশ হয়েছিল, সেই অবস্থায় আবার তাকে ফিরে আসতে হবে।

ভগবান গীতায় বলছেন *সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্*।।৯/৭।। যখন কল্পের নাশ হয় তখন সব জীবের বিনাশ হয়ে যায়। যখন কল্প আরম্ভ হয় তখন আবার সবাই এসে হাজির হয়ে যায়। আর এটা এত লম্বা একটা পরিক্রমা যে এ চলতেই থাকবে, এর কোন শেষ নেই। কোথা থেকে শুরু আর কোথায় শেষ হচ্ছে কেউ জানতেও পারবে না। সবাইকে আবার ফিরে আসতে হবে, কেউ ছাড়া পাবে না। কিন্তু যারা যজ্ঞাদি করেছেন, শুভ কাজ করেছেন, সমাজে যাদের আমরা প্রতিষ্ঠা দিই, বলছেন *ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে*। মুণ্ডকোপনিষদে ঠিক একই কথা বলা হচ্ছে। গীতায় বলছেন যাঁরা যজ্ঞাদি করেছেন, শুভ কর্ম করেছেন, এই যে বৈধী ভক্তি করছেন এগুলো তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে? কোথাও নিয়ে যাবে না। যাঁরাই যজ্ঞ করেছেন, তাঁরা নিজেদের পবিত্র করে নিয়েছেন এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরই বলছেন *তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্*।। তাঁরা যজ্ঞ করে পূণ্য অর্জন করছেন এতে কোন সন্দেহ নেই, এই পূণ্যে তাঁরা ইন্দ্রলোকে চলে যান। মুণ্ডকোপনিষদে এই কথাই এর আগে বলছেন *পতিরেকোঽধিবাসঃ*। গীতা নতুন কিছু বলবে না, উপনিষদের কথাই ঘুরে গীতাতে আসছে। যারা এই ধরণের যজ্ঞ করছেন তাঁরা খুব উচ্চলোকে চলে যাবেন, ইন্দ্রলোক পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছেন। কিন্তু গীতার মতে ইন্দ্রলোক অনেক নীচের লোক, উপনিষদে ইন্দ্রলোক

উচ্চলোক, কারণ বেদে ইন্দ্র হলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা, ইন্দ্রের উপর আর কেউ ছিলেন না। উপনিষদ তাই বলছেন তুমি এই সর্বোচ্চ লোকে চলে যাবে। আর *অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্*, ওখানে গেলে ভোগের কি বিশাল ব্যাপার। *দেবভোগান্*, দেবতারা যা ভোগ করেন সেই ভোগ তোমার সামনে এসে যাবে। দেবতারা কি ভোগ করতেন আমরা কি করে জানব। ঠাকুর যখন ভোগের কথা বলতেন তখন হদ্দ বলতেন সন্দেশ। কামারপুকুর গ্রামে বড় হয়েছেন, গরীব ব্রাহ্মণ। সন্দেশ জিলিপি ছাড়া ভোগ্য বস্তু আরও কিছু হতে পারে কিনা জানতেন না। আমরা আজকে যা খাচ্ছি সেটাও তিনি দেখেননি। তাই তাঁর উপমাও খুব সহজ। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে দেবভোগ, এই দেবভোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। কত খাবে খাও।

কিন্তু *তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে*।।৯/২১।। বিশাল এই স্বর্গলোকে সুখ ভোগের শেষ নেই। স্বর্গলোকের কথা ছেড়ে দিন, এই মর্ত্যলোকেই মানুষের যখন মৃত্যু আসে তখন ভাবে আমার আমার করে সারা জীবন যত কিছু জড়ো করেছি তার সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে! মৃত্যুর প্রস্তুতি যদি না থাকে তাহলে সেই মুহুর্তে তার কষ্টের শেষ থাকবে না। ঠিক তেমনি স্বর্গলোকেও এই একই দৃশ্যের অবতারণ হয়, সেখানে তো মর্ত্যলোক থেকেও কোটি গুণ সুখ, সেই সুখকে ছাড়তে হচ্ছে। যে যজ্ঞাদি করেছে সে জানে মৃত্যুর পর আমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, স্বর্গপ্রাপ্তি মানে আমি এখানে থেকে বেশী ভালো থাকব, কিন্তু একটা সময় এটাকেও ছাড়তে হচ্ছে, এটা কি কম কষ্টের! স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ি যখন অধিগ্রহণের কাজ চলছিল তখন যাদের খুপচি খুপচি ঘর ছিল তাদের তিন বেডরুম ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে তার সাথে কয়েক লাখ টাকা, তাও যাওয়ার সময় বেলুড় মঠের মহারাজদের গালাগাল দিতে দিতে গেছে। আপনারা আমাদের তাড়িয়ে ছাড়লেন! কিন্তু তারা ভাবছে না, জীবনে তারা কোন দিন পারত না এই টাকা অর্জন করে ওই রকম ফ্ল্যাট আর নগদ টাকা পেতে, অথচ একটা খুপচি ঘর ছাড়তে পারছে না। মানুষের এত মোহ মায়া যে কোন কিছুকেই সে ছাড়তে চায় না। বাবার যদি চাকরিতে বদলি হয়ে যায় তার বাচ্চা ছেলে কেঁদে আকুল হয়, তার যে বন্ধু বান্ধব ছিল এদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে। পূণ্য শেষে হয়ে গেলে স্বর্গলোক থেকে ওই সুখ ভোগ ছেড়ে নামার সময় যে কষ্টটা হবে সেটা যে কি মারাত্মক বেদনাদায়ক সেই একমাত্র বুঝতে পারে। বেদের এই ত্রয়ী ধর্ম যারা পালন করে তাদের এই অবস্থাই হয়। এই উপরে যাবে, এই নীচে নেমে আসবে। সেইজন্য অর্জুনকে ভগবান বলছেন – *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্*।।২/৪৫।। বেদ যা কিছু বলছে সব এই সত্ত্বঃ, রজঃ আর তমঃ কে নিয়েই বলছে। এই সত্ত্বঃ রজঃ আর তমের মধ্যে যা কিছু আছে সবটাই অস্থায়ী। হে অর্জুন! এই তিনটে গুণের পারে চলে যাও, নির্দ্বন্দ্বো হও, নিত্যসত্ত্বস্থঃ হও, অস্থায়ীকে ছেড়ে চিরন্তনের দিকে যাও। যেটাকে আমরা ধরছি, যেটাকেই অবলম্বন করছি সেটাই সাময়িক। এই *তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং* এই ভাবটাই পরের মন্ত্রে ফুটে উঠেছে। অপরা বিদ্যার আশ্রিত হয়ে যারা নিজেদের বিরাট মনে করে তাদের বারবার আক্রমণ করে বলা হচ্ছে –

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।।১/২/১০।।

(সংসারপ্রমত্ত অজ্ঞানীরা ইষ্টাপূর্তকে প্রধান মনে করে অপর কোন শ্রেয়োমার্গ জানতে পারে না। তারা ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে কর্মফল ভোগ করে এই মনুষ্যলোক বা হীনতরলোকে প্রবেশ করে।)

এখানে শুধু যজ্ঞাদি কর্মকে নিয়েই বলছেন না। *ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং* যজ্ঞের আনুষাঙ্গিক কর্ম হল ইষ্ট আর পূর্ত, এটাই সমাস হয়ে গেলে ইষ্টাপূর্ত হয়ে যায়। ইষ্ট মানে যজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম আর পূর্ত মানে স্মার্ত কর্ম, জনসাধারণের জন্য পুকুর কাটান, বৃক্ষাদি রোপণ করা ইত্যাদি। জনসাধারণের জন্য যে কর্ম করা হয় সেই

কর্মগুলোকে স্মার্ত কর্ম বলা হয়। পুরুষার্থ সাধনের জন্য ইষ্ট আর পূর্ত কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম। ইষ্টাপূর্ত কর্মের উপরে আর কোন কর্ম নেই, এটাই প্রধান। একদিকে মনে করছে এই ইষ্টাপুর্ত কর্ম শ্রেষ্ঠ অন্য দিকে যারা এই কর্ম নিয়ে পড়ে আছে তারা একেবারে *প্রমূঢ়াঃ*, একেবারে মুর্খ। কেন এদের *প্রমূঢ়াঃ* বলা হচ্ছে? আচার্য বলছেন *পুত্রপশুবান্ধবাদিষু প্রমত্তয়া মূঢ়াঃ*। নিজের সন্তানাদির প্রতি যে প্রীতি, এই আসক্তি থেকে বেরোতে পারছে না, আর পশু, গরু, মোষ, ছাগল, হাতি, ঘোড়া এই যে সম্পত্তির সে অধিকারী, সেই সম্পত্তির আসক্তি তাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখছে। আমার এত গাড়ি আছে, আমার এই বাড়ি আছে, আমার এত গয়না আছে আর তার সঙ্গে ভালোবাসার লোক, যারা আমার বন্ধু বান্ধব, তাদের প্রতি প্রীতি ভালোবাসায় একেবারে আবদ্ধ হয়ে আছে। এরা শুধু মূঢ় নয় একেবারে *প্রমূঢ়াঃ*, মহামুর্খ। এই তিনটে, সন্তান, সম্পত্তি আর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবে একেবার প্রমত্ত হয়ে আছে। মদ খেলে যেমন মানুষ মত্ত হয়ে যায়, পাগলের মত আচরণ করতে থাকে, প্রমত্তের মত এরা মূঢ়, কারণ এরা আসক্ত। কিসে আসক্ত? ধন সম্পত্তিতে, বন্ধু-বান্ধবে আর স্ত্রী-পুত্রাদিতে। এরাই আবার মনে করে ইষ্টাপুর্ত কাজই হল শ্রেষ্ঠ কাজ, এর উপরে আর কিছু নেই। ইষ্ট আর পূর্ত, শ্রৌত আর স্মার্ত কর্মের বাইরে যে কিছু একটা আছে, আত্মজ্ঞান নামে যে একটা বিদ্যা আছে সেটা তারা জানতেই পারেনা।

তারপর বলছেন *নাকস্য পৃষ্ঠে তে*, খুব মজার একটা ব্যাপার বলছেন, নাককে এখানে বলছেন স্বর্গ। নাকের উপরে, মানে উচ্চতম স্বর্গ। এটা অবশ্য আচার্যের ব্যাখ্যা। ইষ্টাপুর্ত কর্মের দ্বারা যে উচ্চতম স্বর্গে নিয়ে যাবে, সেখানে গিয়ে নিজে যে সুকৃত অর্থাৎ যত শুভ কর্ম করেছে সেগুলো ভোগ করবে। তবে এই দেহ দিয়ে সে ভোগ করবে না, ওই ভোগের জন্য যে রকমটি দেহ দরকার, সেই রকম দেহ দিয়েই সে ভোগ করবে। ত্রিশঙ্কু নামে এক রাজা পার্থিব শরীরেই স্বর্গসুখ ভোগ করতে চেয়েছিল। বিশ্বামিত্র তাকে নিজের তপস্যার জোরে এই শরীরেই স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাকে স্বর্গে ঢুকতে দেবেন না, স্বর্গ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বামিত্রও খুব রেগে গেছেন। ত্রিশঙ্কুকে বলে দিলেন তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, তোমার জন্য আমি নতুন করে একটা স্বর্গই দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। মূল কথা হল, এই শরীর দিয়ে স্বর্গের কিছুই ভোগ করা যাবে না। কিছু কিছু ভোগের জন্য অন্য ধরণের শরীর দরকার। যদি কেউ মরা জীবজন্তুর কাঁচা মাংস ভোগ করতে চায় তাহলে সে এই মনুষ্য শরীর দিয়ে পারবে না, তার জন্য তাকে শকুন হয়ে জন্মাতে হবে। কেউ যদি অপরের পেছনে নিন্দা করে সুখভোগ করতে চায় তাহলে এই শরীর দিয়ে হবে না। তার জন্য তাকে ছারপোকা হয়ে জন্ম নিতে হবে। বিভিন্ন রকম ভোগের জন্য বিভিন্ন রকম শরীর দরকার।

উচ্চতম স্বর্গে গিয়ে অন্য শরীর দিয়ে যে শুভ কর্মের ভোগ হবে, তারপর সেই সঞ্চিত শুভ কর্মগুলো শেষ হয়ে গেলে কি হবে? *ইমং লোকং*, এই পৃথিবীতে আবার ফেরত চলে আসবে, অথবা *হীনতরং বা বিশন্তি* মানুষ যোনি থেকে আরও নীচ যোনিতে গতি হতে পারে। সাপ, ব্যাঙ বা বিছে এগুলো কিছু একটা হয়ে জন্ম নেবে। গীতায় ভগবান বলছেন *তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, এখানে শুধু *মর্ত্যলোকং*ই বলছেন কিন্তু উপনিষদে বলছেন *ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি*। সাধারণতঃ এটাই সবাই প্রত্যাশা করে যে স্বর্গলোকের মেয়াদ শেষে কেউ নীচে যোনিতে, মানে হীনতর যোনিতে যাবে না। এমন হতে পারে তার এমনি কোন বিশেষ শুভ কর্ম ছিল যার জোরে সে স্বর্গে চলে গেল, কিন্তু অন্য দিকে তার অনেক অশুভ কর্ম আছে। এখন স্বর্গে থেকে নেমে সে হয়ত মানুষ যোনিই পেল কিন্তুর তারপর যখন দেহ পাল্টাবে তখন সে নিম্ন যোনিতে যেতেও পারে।

অনেক মনে করেন উপনিষদের মন্ত্রের অর্থ ও বক্তব্য বুঝে নিলেই হয়ে গেল। কিন্তু না, উপনিষদ শুধু বুঝে নিলে হবে না, মন্ত্রগুলো মুখস্ত করতে হয়। মুখস্ত করাটা একটা তপস্যা, সাধনা। আর বুঝে নেওয়াটা হল, ঠাকুর যেমন বলছেন – বাড়ির খুড়ি জ্যেঠিদের কোন্দল শুনে বাচ্চারা যেমন বলে তোর ঈশ্বরের দিব্যি। সংসারি লোকেদের ঈশ্বর মানে তাইই, মনে করে ঈশ্বরকে বুঝে ফেলেছি, মনে করে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। কিন্তু এই বুঝে ফেলাটা কোন কিছুই নয়। না খাটলে হবে না, তপস্যা যদি পেছনে না থাকে বিদ্যা কখনই তাকে গ্রহণ করবে না। যখন শৌনক গুরুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করছেন কোনটা জানলে সব কিছু জানা যায়, তখন আমরা অপরা

বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। তখন গুরু বলছেন দুটো বিদ্যা আছে – অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা। যেখানে কার্য কারণ সম্পর্ক থাকবে সেটাই অপরা বিদ্যা। যে কোন কার্য কারণ সম্পর্ক, তার মানে এক দিকে যেমন পদার্থ, রসায়ন বিদ্যা এগুলোও অপরা বিদ্যা আবার অন্য দিকে যজ্ঞ-যাগের বিদ্যা সেটাও অপরা বিদ্যা। যখন পূজো অর্চনা করছি, ধ্যান করছি সেটাও অপরা বিদ্যা – এখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। যোগের যত গুরু আছেন তাঁরাও বলছেন যোগ কর তুমি শান্তি পাবে, যোগ কর তোমার ভুড়ি কমবে, সব কার্য-কারণ সম্পর্কে এসে যাচ্ছে, তাই সবটাই অপরা বিদ্যার মধ্যে। এই অপরা বিদ্যার কথা বলতে বলতে গুরু তাঁর শিষ্যকে দেখাচ্ছেন এই অপরা বিদ্যাতে তুমি কিভাবে উচ্চতম স্বর্গে যেতে পারবে। যজ্ঞ-যাগ করে করে যে উচ্চতম স্বর্গ লাভ হবে যেটাকে উপনিষদে এখানে যদিও ব্রহ্মলোক বলছেন, আসলে এটা ব্রহ্মলোক নয় কিন্তু উচ্চতম। এই স্বর্গলোক তা যতই উচ্চতম হোক না কেন, এটাও কার্য-কারণ সম্পর্ক। একটা যজ্ঞ করেছেন তার জন্য আপনাকে উচ্চ স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপর কি হবে?

সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি। যেটা ভগবান গীতায় বলছেন *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, যখনই আমি কোন পূণ্য কর্ম করলাম, গরীবকে আমি রুটি খাইয়েছি, গরুকে দু মুঠো ঘাস খাইয়েছি, যে কোন শুভ কাজের জন্য যে পূণ্য হবে, সেই পূণ্য ফলে আমি অবশ্যই একটা স্বর্গ পাব, সেখানে অবশ্যই সুখভোগ হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে পূণ্য ক্ষয় হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে স্বর্গ থেকে আবার আমাকে নেমে আসতে হবে। যখন সেই সুখভোগ থেকে নামতে হবে তখন সবাইকে দুঃখার্ত হয়ে নামতে হবে। এর আগের মন্ত্রে বলছেন *তেনাতুরাঃ, আতুরাঃ* অত্যন্ত দুঃখার্ত হয়ে, মানুষ মৃত্যুর সময় যেমন কান্নাকাটি করে আমার সব চলে যাচ্ছে বলে, ঠিক তেমনি স্বর্গলোক থেকে যখন পতন হয় তখন এইভাবে ক্রন্দন করতে করতে নামে।

গুরু এত কথা বলে শিষ্যের এই সাংসারিক বুদ্ধি, যে বুদ্ধি দিয়ে সুখভোগ করছে সেই বুদ্ধিকে একেবারে তাচ্ছিল্য ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন, বলছেন তুমি যে বিদ্যা অর্জনের জন্যে আমার কাছে এসেছ তার কাছে এগুলোর কোন মূল্যই নেই। এর ঠিক পরের ধাপে গিয়ে বলছেন সারা জীবন ব্যাপী তুমি বেদের যে সব কর্মের কথা শুনে এসেছ – যজ্ঞ-যাগ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, শ্রৌত কর্ম, আর স্মৃতির শাস্ত্রের স্মার্ত কর্মের কথা শুনে এসেছ, এগুলো নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ভাবে করলে ভালো। কিন্তু নিঃস্বার্থ ভাবে আমরা কোন কর্মই করতে পারিনা। কথামৃতে বর্ণনা আছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ভগবতী দাসী এসেছে। ঠাকুর তাকে বলছেন – কি গো! বয়স তো হল, কিছু শুভ কর্মটর্ম করেছ? ভগবতী দাসী বলছে 'হ্যাঁ, আমি ওখানে পাথর বসিয়েছি'। ঠাকুর খুব খুশী হয়ে বলছেন – তাই নাকি! ভগবতী দাসী বলছে 'হ্যাঁ, তাতে লেখা আছে শ্রী ভগবতী দাসী'। ঠাকুর শুনে ভেতরে ভেতরে খুব মর্মাহত হয়েছেন, কিন্তু বলছেন – তাই নাকি! পাথর দিয়ে একটা সিঁড়ি বাঁধিয়েছে তাতে আবার নিজের নামটি খোদাই করে দিয়েছে। এখন সাহস করে ভগবতী দাসী ঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করেছে। ঠাকুরেরে মনে হল কাঁকড়া বিছে যেন তাঁকে ছোবল দিয়েছে। চিৎকার করে ঠাকুর তাঁর চরণ টেনে নিয়েছেন। একেই সে এক গোলমেলে মহিলা, তার উপর একটা স্মার্ত কর্ম করেছে সেটাও আবার স্বার্থ জড়িত মন নিয়ে। এখন এই স্মার্ত কর্ম করেছে বলে স্বর্গে যাওয়াটা নিশ্চিত। কিন্তু এই পূণ্যের ফলটুকু তো শেষ হতে বেশি সময় নেবে না। যতটুকু পূণ্য করেছে ততটুকুই স্বর্গে সুখভোগ করবে। তারপর যখন স্বর্গ থেকে বার করে দেবে তখন *আতুরাঃ*, কি প্রচণ্ড দুঃখার্ত হয়ে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসতে হবে। কিছুই করার থাকে না, তুমি দেখবে তুমি নিজে থেকে খসে পড়ে যাচ্ছ, অন্যেরা থেকে যাচ্ছে।

এইচ জি ওয়েলস, খুব নামকরা লেখক। তিনি বিজ্ঞানকে কল্পকাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপনা করেছেন। তার মধ্যে একটি বিখ্যাত বই টাইম মেশিন। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন একটা চেয়ার আছে যাতে বসলে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের দিকে এগিয়ে পিছিয়ে চলে যাওয়া যায়। বেশীর ভাগ সময় তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। হঠাৎ এমন একটা দেশে চলে গেছেন দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ। ওখানে সব মেয়েরা একেবার পরীর মত। তার মধ্যে একটা পরী একদিন জলে পড়ে গেছে। জলে পড়ে গেছে এবার তো সে জলে ডুবে মরে যাবে। বাকি পরীদের এই নিয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ওদের কাছে এটা কোন ব্যাপারই নয়। ইনি এখন জলে ঝাঁপিয়ে

পরীটিকে উদ্ধার করতে গেছেন। সেখানকার লোকরা অবাক হয়ে ভাবছে, এই লোকটা এই অদ্ভূত কাণ্ড কেন করছে! মূল কথা এটাই, যখন স্বর্গ থেকে তোমার পতন হবে তখন বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে কোন রকম হেলদোল হবে না। যার পতন হয়ে গেলে তাকে আবার জন্ম নিতে হবে। এই দুঃখজনক ব্যাপারটাকে পাশ কাটাবার জন্য খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম বলছে স্বর্গে অনন্ত সুখ। সেখানে তুমি কাদের সাথে থাকবে? যাদের তুমি খুব ভালোবাস তাদের সবার সাথেই তুমি থাকবে। আমেরিকাতে এক ফাদার স্বামীজীর পেছনে পড়ে গিয়েছিল, তুমি যদি খ্রীশ্চান না হও তাহলে তুমি একটা ড্যাম্ হয়ে যাবে। একবার বলেছে দুবার বলেছে, অনেক বার বলার পর স্বামীজী ফাদারকে বলছেন 'আপনি মারা যাওয়ার পর কোথায় যাবেন'? ফাদার বলল স্বর্গে। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন 'আমি অবশ্যই নরকে যেতে চাই শুধু আপনার থেকে বাঁচার জন্য'।

এই যে বর্ণনা চলছে, স্বর্গে সুখভোগ, সুখভোগ শেষ হলে আবার পতন, এগুলো কি সত্যিই এই রকম? আমরা কিছুই জানিনা, কারণ বেদের নাসদীয় সুক্তেই বলে দিচ্ছে – কে জানে কি আছে। মৃত্যুর পর কি আছে কেউ জানে না। নচিকেতা যমরাজকে ঠিক এই প্রশ্নই করছেন কেউ বলে মৃত্যুর পর কিছু আছে আবার কেউ বলে কিছু নেই। অথচ নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করছেন, যমরাজকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে তার মানে মৃত্যুর পরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে তাই বলছেন, এটা আখ্যায়িকা মাত্র। গল্প বা কাহিনীর মাধ্যমে একটা তত্ত্বকে বোঝান হচ্ছে। একটা লোক মারা গেছে, মারা যাওয়ার পর স্বর্গলোকে যমরাজের বাড়ির দরজায় তিন দিন ধরে যমরাজের জন্য অপেক্ষা করেছে। যমরাজ ফিরে আসার পর যমরাজকে প্রশ্ন করছে কেউ বলে মৃত্যুর পরে কিছু আছে আর কেউ বলে মৃত্যুর পর কিছু নেই। স্বয়ং মৃত্যুর দেবতার দোরগোড়ায় এই প্রশ্নটা দাঁড়ায় কি করে! তুমি তো নিজেই মৃত্যুর পর দাঁড়িয়ে আছ। সেইজন্য আচার্য বলছেন গল্পচ্ছলে একটা জিনিষকে আলোচনা করা হচ্ছে। এই সব কাহিনীগুলোকে যদি আক্ষরিক ভাবে নিলে অনেক সমস্যা হবে, যুক্তিতে তা দাঁড়াতে পারবে না। আবার নচিকেতা ধরেই নিয়েছেন যমলোকে আমাকে রাখা হবে না, আমি আবার ফেরত যাব। সেইজন্য বর চাইছেন আমি যখন ফেরত যাব তখন আমাকে দেখে আমার বাবা যেন ভয় না পেয়ে যান। অথবা বাবা আমার উপর যেন রেগে না থাকেন। নচিকেতা তো বলেই দিল, মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যুর পর আবার ফেরত যাবে। তাহলে তোমার প্রশ্নটা কি? এগুলো কিছুই নয়, যখনই দর্শন লেখা হয় তখন অনেক সময় কিছু কিছু কাহিনী বা কল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়। সেই কাহিনী ও কল্পনাগুলোকে খুব বেশী আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই।

এখানে মূল কথা হল শাস্ত্র প্রমাণ। শাস্ত্র বলছে পুনর্জন্ম আছে। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞাসা করছে মশাই পুনর্জন্ম কি আছে? ঠাকুর বলছেন অনেকে বলে গেছেন তাই মানতে হয়। অনেক বলে গেছেন, এটাই মূল কথা। পুনর্জন্মের কথা যে একজন দুজন বলেছেন তা নয়, অনেকে বলেছেন। যুক্তিবাদী ও অন্যান্য ধর্মে গায়ের জোরে পুনর্জন্মকে না করে দিলে তো হবে না, আর হিন্দুরা জানে এটা এই রকমই। একজন হিন্দু বাড়ির বাচ্চা যদি বলে জানো আমি গত জন্মে অমুক ছিলাম, এটা তার বাবা মার কাছে আশ্চর্যের কিছু মনে হবে না। হিন্দুদের কাছে পুনর্জন্ম স্বাভাবিক, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে শ্বশুড় বাড়ি চলে যাওয়ার মত। এখন মেয়ে যদি শ্বশুড় বাড়ি গিয়ে বলে আমার বাপের বাড়িতে এই এই ছিল। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বলবে তোমার বাপের বাড়িতে ছিল তো ছিল এখন আর বলে কি হবে, এখন এখানকার মতই তোমাকে চলতে হবে। ঠিক তেমনি তুমি আগের জন্মে কি ছিলে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, এখন এই জন্মে যা আছ এই জন্মের মতই তোমাকে চলতে হবে। আগের জন্মের কথা ভুলে যাও। আগের জন্মের স্মৃতিকে আমাদের কখনই আমল দেওয়া হয় না। তুমি আগের জন্মে রাজার ছেলে ছিলে কি ধোপার ছেলে ছিলে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। এখন যা আছ এটাই সত্য। মূল বক্তব্য হল, এনারা দেখছেন পুনর্জন্ম হচ্ছে। ঋষিরা পুনর্জন্মের ব্যাপারে সব জানতেন, দিব্য দৃষ্টিতে সব দেখেছেন। মৃত্যু আর পুনর্জন্ম এই দুইয়ের মাঝখানের সময়টা সে কোথায় থাকছে? কোন লোকে তো তাকে নিশ্চয় থাকতে হবে। যে ভালো কাজ করেছে আর যে খারাপ কাজ করেছে এই দুজন তো সমান মর্যাদায় সমান লোকে থাকবে না। তখন তাঁরা ভাবনা চিন্তা করে স্বর্গলোক, উচ্চলোক, নিম্নলোক

নরকাদির ধারণা গুলো নিয়ে এসেছেন। এখন হয়তো এগুলো কোন কোন ঋষি দেখেও থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা এর বেশী কিছু জানিনা, সেইজন্য এসবে বেশী মন দিতে নেই। উপনিষদ তাই সব সময় তত্ত্ব কথা নিয়েই চলে।

কিন্তু এনারা বলছেন তুমি যদি, ইষ্ট ও পূর্ত, এই দুটো কাজ হল সব থেকে শুভ কর্ম, এই কর্মগুলো যদি কামনা-বাসনা লাগিয়ে কর তাহলে তোমার আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। নিঃস্বার্থ ভাবে যদি কর তাহলে কষ্টটা কম পাবে। ঋষি বলে দিলেন তুমি ভালো করে বিচার করে দেখ, এইভাবে বেদ ও স্মৃতির কর্ম করে তুমি কত দূর যেতে পারবে! তোমাকে আবার দুঃখার্ত হয়ে ফেরত আসতে হবে। তাহলে আমরা কি করব? এইবার উপনিষদ শুরু করছে সাধনার মন্ত্র। অপরা বিদ্যা থেকে পরা বিদ্যার সাধনা কি রকম হবে পরের মন্ত্রে ঋষি বলছেন। এখান থেকেই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারটা শুরু হচ্ছে। এর আগে বলা হয়েছে যেখানে ব্রহ্মলোক বলা হয়েছিল এটা আসলে ব্রহ্মলোক নয়। কারণ ব্রহ্মলোকের জন্য অন্য ধরণের সাধনার দরকার। কিন্তু পরের মন্ত্রে যে ব্রহ্মলোকের কথা বলা হচ্ছে এটা প্রকৃত ব্রহ্মলোক –

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।।১/২/১১।।

(সংযতেন্দ্রিয় (সগুণব্রহ্ম-বিষয়ক) জ্ঞানবান্ গৃহিগণ এবং বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে অরণ্যেই অবস্থানপূর্বক স্বাশ্রমবিহিত কর্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা ক্ষীণপাপপূণ্য হয়ে উত্তরায়ণ মার্গে সেই লোকে গমন করেন, যে লোকে অমর ও অব্যয়স্বভাব হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন।)

কঠোপনিষদে একটা খুব সুন্দর কথা আসে, যেখানে বলছেন *যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে*। এর বক্তব্য হল, মানুষ যে স্বর্গলোকে যাচ্ছে বা অন্য কোন লোকে যাচ্ছে সেখানে সে আত্ম চিন্তন করতে পারেনা। একমাত্র এই পৃথিবীলোকে সব থেকে স্পষ্ট রূপে আত্মাকে জানা যায়। সেইজন্য স্বামীজী খুব সুন্দর কথা বলছেন This life is a great chance, use it to attain the highest। Highestটা কি, সেটা তুমি নিজেই ঠিক করে নাও। এখন কেউ যদি মনে করে আমার স্ত্রী-পুত্র আমার কাছে উচ্চতম। তাতেই তুমি থাক, কেউ আপত্তি করবে না। যে চাকরি করছে, কর্মস্থলে তার যে সুপারভাইজার আছে তাকেই সে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারে। কিন্তু আগামীকাল যখন সেই সুপারভাইজার অপমান করে তাকে দুটো কটূ কথা বলবে তখন তার মন ভেঙে যাবে। কিন্তু সে যদি মনে করে থাকে আমার উচ্চতম তো অন্য কেউ, আমার গুরু, কিংবা আমার ইষ্ট। যখন সে বড়কে ধরে রেখেছে তখন ছোট কি বলল আর কি করল তাতে তার কি আসে যায়। সমগ্র মানবজাতির সমস্যা এটাই। যখন বলছেন *যোগৈ ভূমাঃ তৎ সুখম্*, বড় যেটা তাতে অবস্থিত থাকাটাই সুখ। স্বামীজী যখন বলছেন তোমার এই জীবন মানে তুমি এক বিরাট সুযোগ পেয়েছ। এই সুযোগকে কাজে লাগাও। কি কাজে লাগাতে বলছেন? To attain the highest। কিন্তু সবাই কি করছে? কামিনী আর কাঞ্চনকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে এই দুটোর পেছনেই ছুটে চলেছে। তাই আমাদের দুর্গতিরও কোন শেষ নেই।

এতক্ষণ প্রথম ধাপের কথা বলা হয়েছে। তোমার উচ্চতম লক্ষ্য হল স্বর্গ, কিন্তু তুমি তো ভালো করে বিচার করে দেখলে এই স্বর্গও পৃথিবী থেকে কোন অংশে ভাল কিছু নয়, বরঞ্চ এই পৃথিবীলোকে তুমি আত্মার সাক্ষাৎ করতে পারবে, যেটা অন্য কোন লোকে সম্ভব নয়। এবার দ্বিতীয় ধাপে যে সাধকের কথা বলা হচ্ছে, সে এখনও উচ্চতম সাধক হয়নি, উচ্চতম সাধকের কথা এর পরের মন্ত্রে বলা হবে। এখন যেমন সাধকের সাধনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি খুব সুন্দর ভাবে পর্যায়ক্রমে সাজান হয়ে গেছে, উপনিষদের সময় এতটা সাজান ছিল না। সেই সময় গুরু নিজে যেভাবে সাধনা করে উপলব্ধি করেছেন, সেই সাধনাটাই শিষ্যের সামনে রেখে দিতেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, সেইজন্য আগের আগের শিষ্যদের সাধনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে

তুল্যমূল্য বিচার করা হচ্ছে না, সাধনার বিভিন্ন ধারা ও পদ্ধতিগুলোকে সাজান হচ্ছে না, যেখানে ফাঁক থেকে যাচ্ছে সেগুলো পূরণ করা হচ্ছে না। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যদি এই মন্ত্রের সাধনা প্রক্রিয়াকে বিচার করা হয় তাহলে দেখতে পাব এখানে কিছুটা সগুণ ব্রহ্মের সাধনার কথা বলা হচ্ছে। যিনি সগুণ ব্রহ্মের সাধনা করছেন, মানে সাকার ঈশ্বরের সাধনা করছেন, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করছেন কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা করছেন বা যিশুর সাধনা করছেন তাঁদের চরম গতিটা কি হবে, এই মন্ত্রে তারই বর্ণনা করা হচ্ছে।

সাকার সাধক হলেও এনারা কিন্তু খুবই উচ্চমানের সাধক। *তপঃশ্রদ্ধে*, তপস্যা আর শ্রদ্ধাতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাধনা করছেন। কোথায় ধ্যান করছেন? অরণ্যে। ঠাকুর বলছেন ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে। সাকার সাধক সাধনা করার জন্য অরণ্যে চলে গেছেন। মানে, এই সংসারজঞ্জাল থেকে বেরিয়ে অরণ্যে চলে গেছেন। অরণ্যে মানে গভীর জঙ্গলে চলে গেছেন তা নয়, জনসংযোগ বিবর্জিত নির্জন প্রদেশ। এর আগের আগের মন্ত্রে বলা হয়েছিল অজ্ঞানযুক্ত মানুষ কি কি করে, ভগবতী দাসীর মত পাথর বসাচ্ছে আর তাতে নিজের নাম খোদাই করে দিচ্ছে। এরাও স্বর্গে যাবে, কিন্তু আবার কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসবে। এখানে আচার্য তাঁর ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন *যে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানযুক্তা*, এই এতক্ষণ যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছিল এবার ঠিক তার বিপরীত বলা হচ্ছে। আগে অজ্ঞানযুক্তদের কথা বলা হয়েছে, এবার জ্ঞানযুক্তদের কথা বলা হচ্ছে। এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান নয়। সে বুঝে গেছে সংসারের সব কিছুই অনিত্য, সবই দুদিনের জন্য। এর থেকে আমাকে আরও অনেক উচ্চতর অবস্থায় যেতে হবে। তখন তাঁরা কি করছেন – *বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ*, এনারা বাণপ্রস্থি হয়ে গেছেন বা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। সংসার থেকে নিজেকে আলাদা করে নির্জন বাস করতে শুরু করেছেন। নির্জনে থেকে কি করছেন? *তপঃশ্রদ্ধে*, তপস্যা আর শ্রদ্ধাতে নিরত, মানে লেগে আছেন।

তপঃ সম্বন্ধে আচার্য বলছেন *স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম*, নিজের আশ্রম সম্বন্ধিত যে কর্ম সেটাকে বলা হয় তপস্যা। বর্ণাশ্রম জনিত যে কর্ম আমি পেয়েছি, সেই কর্মকে সাধন করাই আমার তপস্যা। যেমন একজন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হওয়ার পর তিনি এখন আশ্রমবাসী হয়ে গেলেন, এই আশ্রম শুধু রামকৃষ্ণ আশ্রমের কথা বলা হচ্ছে না, এটা হল সন্ন্যাস আশ্রম। সন্ন্যাস আশ্রমের কাজ হল, তিনি ব্রাহ্ম মুহুর্তে উঠবেন, ঠাকুরের মঙ্গলারতি করবেন, দু-তিন ঘন্টা জপ-ধ্যান করবেন, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করবেন, কোন জিজ্ঞাসু এলে ধর্ম সম্বন্ধিত উপদেশের দ্বারা তার সংশয় বিদূরিত করবেন। এরপর যেখানে আছেন সেখানে কোন কাজ থাকলে করে দেবেন, সবাইকে করুণা করবেন। কিন্তু জপ-ধ্যান-পাঠ এই তিনটে বাদে সে কিছু করবে না। জপ-ধ্যান-পাঠের বাইরে কেউ যদি কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে তাকে উত্তর দিয়ে দেবেন, এটাও তাঁর পাঠের মধ্যে পড়বে। আর যখন স্নান করতে যাচ্ছেন, ঘুমোতে যাচ্ছেন, খাওয়া-দাওয়া করছেন তখনও মন তাঁর পরমাত্মাতে লাগিয়ে রাখতে হবে। এটাই একজন সন্ন্যাসীর আশ্রমোচিত ধর্ম। এটাই যদি ঠিক ঠিক ভাবে করতে থাকে তখন এটাই তাঁর তপস্যা হয়ে যাবে। ছাত্রের তপস্যা হল *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*, ছাত্র অধ্যয়ণ করবে, এটাই তার তপস্যা। পরিবারের মায়েরা সন্তান, স্বামী, শ্বশুড়, শাশুড়ি সবার দেখাশোনা করে যাচ্ছে এবং নির্বিকার ভাবেই করে যাচ্ছে তখন এটাই তার তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেও যখন ঈশ্বর চিন্তন করছে, অবসর সময়ে শাস্ত্র পাঠ করছে তখন সেটাও তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। বর্ণাশ্রমে যে যেখানে যে অবস্থায় তার কর্ম করে যাচ্ছে সব অবস্থাতে কিন্তু ঈশ্বর চিন্তনটা সব সময় চালিয়ে যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই ঈশ্বর চিন্তন বন্ধ হবে না। এই সব কিছুকে মিলিয়ে বলছেন তপস্যা।

নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রে এসে দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টে যায়। আমি যজ্ঞাদি কর্ম কেন করছি? যজ্ঞাদি করাটা আমার আশ্রমোচিত ধর্ম বলে করছি, আমি স্বর্গ যাব এই আশায় করছি না। ইষ্টাপুর্ত কেন করছি? আমার ধর্ম তাই করছি। একটু রজোগুণ বেড়ে গেছে, রজোগুণটা বার করতে হবে তাই এই কাজগুলো করছি। বেলুড় মঠের একজন প্রাজ্ঞ মহারাজ ছিলেন। উনি সারা জীবন ঘোর তপস্যা করে গেছেন। একবার তাঁর সেন্টারের অধ্যক্ষকে গিয়ে বলছেন 'দেখো ভাই! আমার ভেতরে একটু রজোগুণ বেড়েছে, আমার এখন কাজ করতে ইচ্ছে করছে। আমাকে একটা কোদাল আর খুরপি দাও'। সব দেওয়া হল। ওসব নিয়ে এখন তিনি কিছু গাছ

লাগাতে শুরু করে দিলেন। নিজেই সব কিছু করছেন। সকালে গাছে জল দিচ্ছেন। গাছের চারা বেরোবার পর তিনি আবার অধ্যক্ষকে গিয়ে বলছেন 'দেখো ভাই! আশ্রমের কাজের জন্য যদি এই গাছ গুলো উপড়ে ফেলতে হয় তখন একবারো ভেবো না আমি লাগিয়েছি বলে কাটবে না, সঙ্গে সঙ্গে এগুলো উপড়ে ফেলবে। আমি আমার রজোগুণটা ক্ষয় করছি'। তারপর আরেকবার এই রকম খেয়াল হল কিছুটা ফাঁকা জমিতে ভুট্টা লাগালেন। আর সবটাই নিজে করছেন। কোদাল নিজেই চালাচ্ছেন, বীজ রোপণ নিজেই করছেন, জল নিজেই দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁর তপস্যার ঝোঁক এসে যাওয়াতে সেন্টার ছেড়ে তপস্যায় চলে গেছেন। কিছু দিন পর সেই ভুট্টা গাছ থেকে ভুট্টা ফলতে শুরু করেছে। আশ্রমের মহারাজরা এখনও বলেন সেই গাছে যখন ভুট্টা হয়েছে তখন অত বড় সাইজের ভুট্টা বাজারে দেখাই যায় না। সন্ন্যাসীর নিজের হাতে চাষ করার ফসল কিনা। এই কর্মগুলোই হল ধর্ম। এটা আমার কাজের মধ্যে পড়ছে না, কিন্তু করতে হচ্ছে, ঠিক আছে আমি নিষ্কাম ভাবে করে দিলাম। এরপর আমি কোন কিছুতেই নিজেকে জড়াচ্ছি না। এই মনোভাব নিয়ে যখন কোন কিছু করা হয়, বলছেন এটাই *তপঃ*।

শ্রদ্ধাকে আচার্য বিশ্লেষণ করছেন – *শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা*। বেদান্তে, উপনিষদে এই হিরণ্যগর্ভ শব্দটা অনেবার আসে, যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, এই জগতে তাঁর যে প্রথম অভিব্যক্তি হচ্ছে তাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। হিরণ্যগর্ভকে অনেক সময় শাস্ত্রে ব্রহ্মাও বলা হয়েছে। ইদানিং কালে যারা শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরা অনেক সময় হিরণ্যগর্ভকে সগুণ ঈশ্বরও বলছেন। সগুণ ঈশ্বর বিষয়ক বিদ্যা, অর্থাৎ মন্ত্র জপাদি করা। উত্তরাঞ্চলের সাধু বাবারা বলেন কাম করো ঔর নাম করো, অর্থাৎ ঠিক ভাবে কাজকর্ম কর আর ঈশ্বরের নাম কর। এখানে উপনিষদে সেটাকেই বলছেন *তপঃশ্রদ্ধা*, কাজ কর আর ঈশ্বরের নাম কর। এখানে কর্ম মানে ভোগের কর্ম করতে বলা হচ্ছে না। ভোরবেলায় উঠে ট্রেনে ঝুলতে ঝুলতে টাকা রোজগারের জন্য চললাম, এই কর্মের কথা বলছেন না। আমি যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমি ছাত্রাবস্থায় আছি, কিংবা আমি গৃহস্থ অবস্থায় আছি অথবা বাণপ্রস্থি অবস্থায় থাকি না কেন আমার উদ্দেশ্য একটাই, ঈশ্বরের দিকে এগোন। পেট চালাতে হবে, বিয়েথা না করে থাকতে পারছি না, বিয়ে করার পর দু-একটি সন্তানাদি হয়েছে, এদের খাওয়াতে পড়াতে হবে, এর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই করে দিচ্ছে। কিন্তু এখানে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এখানে আর ব্রহ্মচর্য আর গৃহস্থের কথা বলছেন না, বাণপ্রস্থি আর সন্ন্যাসীদের কথা বলছেন। এদেরকে বলছেন তোমাদের জন্য দুটো জিনিষ, এক তোমার আশ্রমধর্ম, যেমন সন্ন্যাসীর আশ্রমধর্ম একটাই জপ-ধ্যান-পাঠ। এই তিনটের বাইরে আর কোন কর্তব্য নেই। এই আশ্রমধর্মটাই তোমার তপস্যা। আর শ্রদ্ধা, হিরণ্যগর্ভ বিষয়ক বিদ্যার প্রতি অনুরাগ। এখানে কিন্তু চরম সাধনার পর্যায় চলছে না। একেবারে চরম সাধনা যাঁরা করছেন এরা তাঁদের থেকে একটু নিচে। আচার্য শঙ্কর এই ব্যাপারে খুব কড়া। একটু পরেই আসবে, যেখানে তিনি বলছেন যাঁরা শুদ্ধ জ্ঞানমার্গে তাঁদের কোন তুলনাই হয় না, তাঁরা হলেন শ্রেষ্ঠতম। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর রাজপথ। এই মন্ত্রে সন্ন্যাসীর রাজপথের কথা বলা হচ্ছে না, তার থেকে এক ধাপ নিচে হলেন এরা, যারা সগুণ ঈশ্বরের সাধনা করছেন। সগুণ ঈশ্বরের সাধনাকে এখানে বলছেন বিদ্যা সাধন, বিদ্যা হল হিরণ্যগর্ভ বিষয়ক।

এই বিদ্যা সাধন কোথায় গিয়ে করবে? *হি উপবসন্তি অরণ্যে*, বাড়িতে বসে সগুণ ঈশ্বরের সাধনা করতে বলছেন না। ঠাকুরকে অনেকবার প্রশ্ন করা হয়েছে – বাড়িতে বসে, সংসারে থেকে কি ঈশ্বর লাভ হবে না? উপনিষদ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে হবে না। আর স্বভাব তাঁর কেমন হবে? *শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ*, তাঁর একাদশ ইন্দ্রিয় একেবারে শান্ত হয়ে গেছে, একাদশ ইন্দ্রিয় যদি নাও নিই, একাদশ ইন্দ্রিয় হল মন – বাকি দশটি ইন্দ্রিয়, হাত, পা, কান ইত্যাদি যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে সব শান্ত হয়ে গেছে। এখন আর তার সুন্দর চেহারা দেখার ইচ্ছে নেই, সুন্দর গান শুনতে চাইছে না, স্বাদিষ্ট খাওয়া-দাওয়া করার ইচ্ছে নেই। ঠাকুর বলছেন, যে ঠিক শুদ্ধ ভক্ত তার একটু ভাত ঝোল হলেই চলে যায়। খাওয়া-দাওয়ার জন্য বিরাট আয়োজন করবে না। এগুলোর আয়োজন বা ভোগের সময় কোথায় তার! শুধু সময়ের অভাব বলেই নয়, যিনি জপ-ধ্যানে নিয়ে পড়ে আছেন তাঁর মন চলে যায় উপরে। মনটা উপরে চলে গেলে পেটে রক্ত চলাচলটা কমে যায়।

পেটে রক্ত চলাচল কম হলে হজম করার ক্ষমতা কমবেই, কমতে বাধ্য। ঠাকুর, মা, স্বামীজী সবারই পেটের গোলমাল ছিল। লাটু মহারাজ ঠাকুরের কাছে তাই প্রার্থনাই করেছিলেন, যা খাই সব যেন হজম করতে পারি। কিন্তু হজম শক্তি দুর্বল হবেই, তাই তাকে ঝোল ভাত খেয়েই থাকতে হবে, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। কারণ ধ্যান যত হবে রক্ত তত মাথার দিকে উঠতে শুরু করবে, ফলে শরীরের নিচের যন্ত্রগুলোর ক্ষমতা কমে যায়। সেইজন্য বলছেন তাঁর ইন্দ্রিয় সংযম হয়ে যাবে।

আর বলছেন *বিদ্বাংসো*। স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন রাজস্থানের দিকে ছিলেন তখন তাঁকে রাজপুতরা জিজ্ঞেস করছে লঙ্কা মে কৌন রাজ করতা হ্যায়। মহারাজ বলছেন ইংরেজ। শুনে তারা মহারাজকে তেড়ে এসেছে। তারা বলছে লঙ্কা মে বিভীষণ রাজ করতা হ্যায়। সাধুদের মধ্যে একটা হিউমার আছে, উনি কি রকম সাধু? তখন বলবে লঙ্কা মে বিভীষণ রাজ করতা হ্যায়ের মত সাধু। এই রকম সাধু দিয়ে চলবে না, তাকে বিদ্বান হতে হবে, শাস্ত্র জানতে হবে। আমাদের পরম্পরাতে শাস্ত্র অধ্যয়ণ আর শাস্ত্রজ্ঞানকে প্রচণ্ড সম্মান দেওয়া হয়। কি করে ভক্তদের মাথায় ঢুকে গেছে – ঠাকুর কি বই পড়েছিলেন! ঠাকুর কিন্তু বলছেন আমি শুনেছি কত। ঠাকুর অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভাগবত, মহানির্বাণ তন্ত্র, সাধুদের মুখ থেকে বিভিন্ন দর্শনের কথা সব শুনেছেন। শোনা বা পড়া একই জিনিষ। শান্ত আর বিদ্বান, এই দুটি যদি না হও সাধনা তোমার দ্বারা হবে না।

আর *ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ*, নিজের জন্য তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। আগামীকাল কি খাব এই নিয়েও তিনি কোন চিন্তা করবেন না। উপনিষদে এই জিনিষটা বারবার বলা হয়, ভিক্ষা, ভিক্ষাতে যে যা দিল তাতেই সন্তুষ্ট। তাও কটি বাড়িতে ভিক্ষা করবে? সাত বাড়ি যাবে, এক মুঠো করে নেবে, এই সাত মুঠোই তুমি গ্রহণ করবে। সাত বাড়িতে গিয়ে যদি না পাও তাহলে অষ্টম বাড়িতে কোন ভাবেই যাবে না। বুঝে নেবে আজ ঈশ্বর আমার খাওয়ার জন্য কোন বিধান করেননি। আমাদের মত লোকের কাছে এগুলোর সোজা অর্থ হল মুর্খামি। ঠিকই, কোন সন্দেহই নেই যে এগুলো মুর্খামি। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনাকে মুর্খামির এই চরম পর্যায়ে না নিয়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ সাধনা কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এক কদমও এগোতে পারবে না। গান্ধীজী যখন বললেন আমি অহিংস ভাবে সত্যাগ্রহ করব। পুলিশ লাঠি নিয়ে তেড়ে গান্ধীজী সহ হাজারে হাজারে সত্যাগ্রহীকে মারতে এসেছে। উইল ডুরাণ্ড প্রত্যক্ষদর্শিদের থেকে বর্ণনা শুনে ১৯৩০ সালে লিখছেন – সত্যাগ্রহীরা এগোচ্ছে, তাদের সামনে পুলিশ মোটা মোটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের সংস্পর্শে আসতেই সেই লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে শুরু করে দিল পুলিশ। মাথা ফেটে চৌচির। কংগ্রেসের কার্য কর্তারা আসছে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আরেকটা দল এগিয়ে এল, আবার পুলিশ তাদেরকেও প্রহার করল। একজন মহিলা সাংবাদিক লিখছেন 'আমি আর ওই দৃশ্য দেখতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এসেছি। শেষ মুহুর্তেও আসার সময় দেখে এলাম কিভাবে পুলিশ মেরেই যাচ্ছে'। কিভাবে মারছে – একটা লাইন টানা আছে, সত্যাগ্রহীরা ওই লাইনটাকে শান্ত ভাবে ভাঙবেন। এক দল এগোচ্ছে আর তাদের এমন অমানুষিক ভাবে মারছে যে ওই দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। গান্ধীজীকে যখন মারতে এসেছে একটা লাঠির আঘাতে ওই টেকো মাথা ভেঙে দিতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে শুরু করল। উনি যে হাতটা উপরে তুলবেন রক্তটা চাপা দেওয়ার জন্য, সেটাও তুলছেন না। এটাকে মুর্খামি বলব নাতো আর কোনটাকে মুর্খামি বলব! কিন্তু এই মুর্খামির জন্যই সত্যাগ্রহ আন্দোলন হিংস্র বর্বর ইংরেজ শাসকের মসনদে চিড় ধরাতে সফল হয়েছিল। ঠাকুর সত্যের সাধনা করছেন, সত্য ছাড়া হবে না। ঠাকুর বলছেন আমি বাহ্যে যাব। কিন্তু পরেই দেখছেন তাঁর বাহ্যে পায়নি। কিন্তু বলে ফেলেছেন বাহ্যে যাবেন, সত্য রক্ষা করতে হবে তখন একবার ওই ঝাউতলায় ঘুরে এলেন। এই পর্যায়ে মুর্খামিকে না নিয়ে গেলে সাধনা হয় না। সাধনা মানেই এই মুর্খামির স্তরে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে। ভগবান বুদ্ধ যখন রাজাকে বলছেন এই ছাগকে বলি দিলে যদি আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় তাহলে এই নিন, আমি আমার মাথাটা এগিয়ে দিলাম। আমি বুদ্ধ, আমাকে বলি দিলে আপনার আরও পূণ্য হবে, আপনি আরও উচ্চ স্বর্গে যাবেন। যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাচ্ছে, শুধু তিনি যদি বলে দিতেন

না আমি আর স্বর্গের পিতা এক নই, তাহলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু কই যিশু তো নিজের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না। যতক্ষণ সাধনা এই মুর্খামির পর্যায়ে না যায় ততক্ষণ কিন্তু তিনি মহৎ হবেন না।

এখানেও প্রথমেই বলছেন বাড়ি ছাড়। বাড়ি তো ছেড়ে দিলাম, এরপর কি করবে? ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা রাখব? কিছু রাখতে পারবে না, ভিক্ষা করতে হবে। কিভাবে ভিক্ষা করব? সাতটি বাড়িতে ভিক্ষা করবে। যদি ভিক্ষা না পাই? এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তুমি উপোস করে থাকবে। এবার তুমি সাধক হয়েছ। সোজা মুর্খামি ছাড়া আর কি! এই যে এতক্ষণ মুর্খামি মুর্খামি বলে যাচ্ছি, এই মুর্খামিটা কাদের চোখে? বিষয়ীদের চোখে। যারা নিজের শরীর আর ইন্দ্রিয়ের বাইরে কোন কিছুই ভাবতে পারেনা। সঙ্গীত বলতে হিন্দী সিনেমার গান, সুন্দর দৃশ্য বলতে হিরো হিরোইনদের চেহারা – এ ছাড়া আর তো কিছু জানেনা তারা। যারা ভোগ ছাড়া কিছুই জানে না তারা আবার অধ্যাত্ম বিষয়ে জ্ঞান দিতে আসেন। ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে বলছেন – তোমার কথা কি শুনব! তুমি কামী, লোভী, অহঙ্কারী! বলছেন *ভৈক্ষচর্যাং*, এই সাত ঘরে ভিক্ষা ছাড়া আর কোন ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন করতে যাবে না। বাবা-মার কাছে দু টাকা দামের কুলফি খেতে চেয়েছে মেয়ে। বাবা-মা দেয়নি সেইজন্য দশ বছরের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে দিল। এটাও তো মুর্খামি। নিশ্চয়ই মুর্খামি, কিন্তু ভোগের জন্য। যখন ভোগের জন্য এই ধরণের মুর্খামি আসে তখন বুঝে নিতে হবে এই সমাজ আর বেশী দিন টিকবে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যখন মানুষের মুর্খামি চরম পর্যায়ে চলে যায় তখন বুঝতে হবে এই সমাজের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে যখন কয়েকজন বলবেন *ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ*, রাজমহল ছেড়ে আমি পথে নেমে পড়েছি, আমি ভিক্ষা করে গ্রাসাচ্ছদন করব। সাত বাড়িতে যদি কোন দিন ভিক্ষা না পাই, তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি সেদিন উপোস করব। বুঝে নিন এই দেশকে কেউ আর আটকাতে পারবে না। স্বামীজী বারবার বলছে I want only twenty youngman, who can come out in the streets and say I have nothing but God। কুড়ি জন মাত্র যুবক চাই, যারা শুধু রাস্থায় নেমে বলবে ঈশ্বর বৈ আমার কিছু নেই। দেশ তোলপাড় হয়ে যাবে এই কুড়িটি যুবকের দাপটে।

একনাথ রানাডে, এক মারাঠি যুবকের মাথায় কি ভাবে ঢুকে গেল কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর মন্দির তৈরী করতে হবে। পুরো দেশকে, দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের সংযুক্ত করে মন্দির তৈরীর কাজে নেমে পড়লেন। যেখানে খ্রীশ্চানরা কত ভাবে বাধা দিয়েছে, কত রাজনৈতিক দলের নেতারা বিরোধিতা করেছে সব রকম বাধা-বিপত্তির মধ্যে কি বিশাল স্বামীজীর রক মেমোরিয়াল মন্দির দাঁড় করিয়ে দিলেন। কি শক্তি এসে গিয়েছিল তাঁর মধ্যে যে, বিবেকানন্দ কেন্দ্রের মত একটা সংগঠনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন? সাধনা এই মুর্খামির পর্যায়ে চলে যাবে, যাকে দেখলে অন্যান্য সবাই হাসবে, লোকটি কি পাগল! তখন বুঝবেন এবার সে মহৎ হবার পথে উঠে পড়েছে। ঠিক তেমনি যখন দেখবেন ভোগের পথে মানুষ এই মুর্খামির পর্যায়ে চলে গেছে তখন বুঝতে হবে সমাজ বিনাশের দিকে চলে গেছে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।

প্রথম শর্ত *শান্তা*, ইন্দ্রিয় সংযম। দ্বিতীয় শর্ত *বিদ্বান্* শাস্ত্র জানা থাকা চাই। তৃতীয় শর্ত *ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ*, তার নিজের বলে আর কিছু নেই। সে ধরেই নিয়েছে ভগবান তাকে যেভাবে দেবেন তাতেই সে পরিতৃপ্ত। কিভাবে ভগবান দেবেন? সাত ঘর ভিক্ষা করে। এক মুঠো করে যদি সাত বাড়ি থেকে ভিক্ষা পেয়ে যায় ওই সাত মুঠো দিয়েই সে গ্রাসাচ্ছাদন করবে। দুবার করে ভিক্ষায় যাবে না। আর যদি সাত বাড়ির মধ্যে চার বাড়ি না বলে দেয় তাহলে ঐ তিন মুঠোই খাবে। এক বাড়িতেই যদি পেয়ে থাকে, তাহলে এক মুঠোই খেয়ে থাকবে। আর যদি কোন বাড়িতেই না পেয়ে থাকে তাহলে উপোস করে থাকবে। এই ধরণের সাধক, যাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে নিবৃত্তি হয়ে গেছে, যারা গৃহস্থ থেকে বাণপ্রস্থি হয়ে গেছে তাদের তো এখনও জ্ঞান উপলব্ধি হয়নি, তাদের শরীর ধারণ করতে হবে, তাই কিছুই যে নেবে না তা নয়, কিন্তু ভিক্ষা করে যা পাবে সেটা দিয়েই তোমার শরীর ধারণ করতে হবে। তখন এনারা হয়ে যান বিরজা। এই 'বিরজা' শব্দটি শাস্ত্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা। বিরজা মানে, বি+রজ, রজ মানে ধূলো। যারা সংসারে থাকেন তাঁরা রজ, তাঁদের গায়ে ধূলো মাখা। সন্ন্যাস নেওয়ার সময় একটা হোম করতে হয়, এর নাম বিরজা হোম। সন্ন্যাসী এত কাল যে

ধূলো জমিয়েছে, এই ধূলোকে এবার বিঃ করতে হবে, মানে সব ধূলোকে পরিষ্কার করতে হবে, বিরজা হোমের এটাই মূল তাৎপর্য। আচার্য এখানে বিরজার ব্যাখ্যা করছেন অন্য ভাবে। পাপ আর পূণ্য দুটোই রজ। বেদান্ত পূণ্য আর পাপে কোন পার্থক্য করে না, পাপটাও রজ, পূণ্যটাও রজ, ভালো-মন্দ দুটোই রজ। এই রজকে পরিষ্কার করতে হবে। কিভাবে? সাধনার দ্বারা। সাধনার কি কি শর্ত? শান্ত, বিদ্বান আর ভিক্ষাব্রত। এইভাবে সাধনা করে নিজের পাপ-পূণ্য দুটোকেই ক্ষয় করে দিয়েছেন। যজ্ঞ-যাগ করে যে পূণ্য অর্জন করব সেটাও নয় আর পাপের তো প্রশ্নই উঠছে না।

সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি, সাধনার দ্বারা সমস্ত পাপ-পূণ্যকে ক্ষয় করে বিরজঃ হয়ে মৃত্যুর পর এবার এনারা সূর্যদ্বার দিয়ে হিরণ্যগর্ভের দিকে গমন করেন। যারা সাধারণ সাধক তারা যে পথ দিয়ে গমন করেন সে পথকে বলা হয় ধূম্রমার্গ। আর যাঁরা এই ধরণের সাধনা করেন তাঁরা এই সূর্যমার্গ দিয়ে আরও উপরের দিকে চলে যান। এই *সূর্যদ্বারেন*, সূর্যদ্বার দিয়ে তাঁরা কোথায় চলে যান? *যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা*, সত্যলোক, অর্থাৎ উচ্চ লোকে বা ব্রহ্মলোকে পৌঁছে যান। এই ব্রহ্মলোকে কে থাকেন? *অমৃতঃ হি অব্যয়াত্মা*, যিনি প্রথম পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ রূপে বা ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর যে সাকার রূপ বা শ্রীরামকৃষ্ণের যে সাকার রূপ তিনিই সেখানে বিরাজমান। একেই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলে বৈকুন্ঠধাম।

এই সত্যলোককেই ইদানিং ভক্তরা বলেন রামকৃষ্ণলোক। শুদ্ধ ব্রহ্মের উপর প্রথম যখন মায়ার আবরণ আসে, সেখান থেকে যে সৃষ্টিটা শুরু হচ্ছে তখন যে জিনিষটার প্রথম অভিব্যক্তি হয় তাঁকেই বলছেন হিরণ্যগর্ভ। তাঁর যে লোক সেটা উচ্চতম লোক, এই উচ্চতম লোকে এনারা চলে যান। বলছেন অপরা বিদ্যাতে এর থেকে আর উপরে যাওয়া যায় না। পরের দিকে শাস্ত্রে যেসব মত এসেছে তাতে বলা হয়, যাঁরা ব্রহ্মলোকে চলে যান, সেখানে গিয়ে দুই রকমের গতি হয়। সাধনার সময় যাঁদের মনে একটু বাসনা ছিল আমি সাকার রূপের আস্বাদ করব, তাঁরা কিছু দিন সেখানে থাকেন। তারপর কল্প যখন শেষ হয় তখন তিনি আবার যে সাকার ঈশ্বরের সাধনা করেছিলেন তাঁর সাথে এক হয়ে যান। আর যাঁদের সাধনায় কোথাও একটু অল্প কিছু বাকি থেকে গিয়েছিল, তাঁরা আবার দেহ ধারণ করেন। কিন্তু এই দেহ ধারণটা অত্যন্ত উচ্চ বংশেই হবে।

অপরা বিদ্যার সাধনার দ্বারা অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের সাধনার করে যাঁরা সত্যলোকে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কিছু আর ফেরত আসবেন না, কিছু আবার ফেরত আসবেন। কিন্তু সত্যলোকে থাকবে দুজনে একই সঙ্গে। কিন্তু সাধনার ফলে তাঁর মন এমন হয়ে গেছে, সেই মনে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য আর সাযুজ্য এগুলো হল বোঝাবার জন্য, কিন্তু তাঁরা এমন উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন যে তিনি ঈশ্বরের সমান হয়ে গেছেন। ঠাকুর এটাকেই বর্ণনা করছেন – একদিন তাঁর মন সমাধিতে ছুটে চলেছে, মন এমন জায়গায় চলে গেছে যেখানে দেবতারাও যেতে পারেনা। ঠাকুর এটাকেই বলছেন সপ্তর্ষি মণ্ডল, এগুলো আক্ষরিক অর্থেই আছে। হয়ত সত্যলোকটাই সপ্তর্ষিলোক। সপ্তর্ষি মণ্ডলের উপরে আমাদের কোন ঋষি নেই। ওইখান থেকে ঠাকুর স্বামীজীকে নিয়ে এসেছেন। স্বামীজী কে? এই বর্তমান কল্পে হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে যিনি এক হয়ে আছেন, তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে এসে আরও মায়ার আবরণ দিয়ে দিলেন। তা নাহলে আবার দুম্ করে তাঁর নিজের জায়গায় চলে যাবেন।

বলা হচ্ছে, অপরা বিদ্যা বা সগুণ ব্রহ্মের সাধনা করে এর উপরে কেউ যেতে পারবে না। কেউ আবার একেই মোক্ষ বলেন। বৈকুন্ঠলোকে যাওয়াটাই তো মোক্ষ, রামকৃষ্ণলোকে যাওয়াটাই তো মোক্ষ। আচার্য শঙ্কর ছিলে কট্টর বেদান্তী, তিনি এটাকে মোক্ষ বলে কখনই মানবেন না। আচার্য বলছেন – দেখো ভাই! তুমি একে মোক্ষ বলতে পার। কিন্তু তুমি যদি এটা মেনে নাও, তাহলে কিন্তু অনেক ধরণের সমস্যা দাঁড়িয়ে যাবে। সেইজন্য আচার্য শঙ্করের বক্তব্যকে কখনই আচার্যের দর্শন বলে বলা যায় না। তিনি শুধু অর্থ দিয়ে গেছেন, গীতার এই অর্থ, উপনিষদের মন্ত্রের এই অর্থ। যদি উপনিষদের এই মন্ত্রের অর্থ আক্ষরিক ভাবে মোক্ষ বলে মেনে নেওয়া হয়, তখন কিন্তু অন্য মন্ত্রে গিয়ে এর বিরোধ হয়ে যাবে। আচার্য উপনিষদ, গীতার দর্শনের

সামগ্রিক চিত্রটাকে মাথার মধ্যে একেবারে পাকাপোক্ত ভাবে বসিয়ে রেখেছিলেন। সমগ্রকে জানার জন্য তিনি ধরিয়ে দিচ্ছেন যদি তুমি বল এই রকম যাঁরা তপস্যা করেছেন *শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ* আর এই সাধনা করে তিনি বিরজা হয়ে গেছেন, পূণ্য-পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন। মুক্ত হয়ে তিনি কোথায় যাচ্ছেন? *যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা*, অব্যয় আত্মা যেখানে বিরাজ করছেন। আপনিই তো বলছেন অব্যয় আত্মা যেখানে আছেন সেখানে চলে যাচ্ছেন। সেটাই তো অব্যয় আত্মার বাস। আচার্য শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, না, না, সব গোলমাল হয়ে যাবে। কেন গোলমাল হয়ে যাবে? কারণ এই মন্ত্রেই বলছেন যারা এই ধরণের সাধনা করছেন – *তপঃশ্রদ্ধে*, তপস্যা করেছে, জপ-ধ্যান করেছে, সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, ইন্দ্রিয় সংযম করেছে, শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছে। এইবার সে মৃত্যুর পর সূর্যদ্বার দিয়ে অমৃত পুরুষ সেই অব্যয় আত্মার কাছে চলে যাচ্ছে। আচার্য নিজে তরফ থেকেই আপত্তি তুলে বলছেন এটাই তো মুক্তি। নিজেই আপত্তি তুলে আবার নিজেই সেটাকে খণ্ডন করছেন। তুমি যদি এটাকে মুক্তি বলে মনে কর তাহলে অন্য অন্য মন্ত্রের সাথে বিরোধ হয়ে যাবে। আরে ভাই! এই মুণ্ডকোপনিষদে পরে বলবে *ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তে কামাঃ*, জগতে যত রকমের কামনা-বাসনা আছে এইখানেই সব শেষ হয়ে যায়। তাহলে যার সব কিছু এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সে যাবেটা কোথায়! ঈশ্বরকে যে আমি পাবো, সেই কামনাটাও তো চলে গেছে, তাহলে কি করে সত্যলোক শ্রেষ্ঠ হতে পারে। এটাকে মুক্তি বলে দিলে পরের মন্ত্রে গিয়ে বিরোধ হয়ে যাবে। যেমন মুণ্ডকোপনিষদেই আরেকটি মন্ত্রে বলবেন *তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি*, সব দিক থেকে ব্রহ্মেই প্রবেশ করে যায়। কিন্তু এই মন্ত্রে তো প্রবেশ করার কথা বলা হচ্ছে না, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় সে যাচ্ছে। যিনি এখানে এ পৃথিবীতেই জীবিত অবস্থাতেই ব্রহ্মে প্রবেশ করে যাচ্ছেন, যেমন আমরা গীতাতেও পাই *ইহৈব তৈর্জীতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, এইখানেই তিনি ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে সাম্য অবস্থায় চলে যান। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর গীতার এই শ্লোকটি খুব প্রিয় ছিল। এগারো নম্বর মন্ত্রের অর্থকে যদি মোক্ষ বলে ধরা হয় তাহলে তো গীতা উপনিষদের অন্যান্য মন্ত্রের সাথে বিরোধ হয়ে যাবে। একদিকে বিরোধ হলে এর অর্থ মোক্ষ বলা যাবে না। আবার একই সাথে দুটো মন্ত্রের বক্তব্যের কোন একটাকে বাদ দেওয়াও যাবে না। সেইজন্য আচার্য বলছেন যাঁরা হিরণ্যগর্ভের সাধনা করছেন, সগুণ ঈশ্বরের সাধনা করছেন তাঁরা এই ব্রহ্মলোকে যাবেন। যদি তাঁর কোন কামনা বাসনা না থাকে তাহলে কল্পান্তে তাঁর মুক্তি হয়ে যাবে। একটু যদি বাসনা থাকে তাহলে হয় কল্পান্তে বা এই কল্পেই আবার তাঁকে জন্ম নিতে হবে। কিন্তু তাঁরা যে জন্ম নেবেন এটা যারা স্বর্গে গিয়ে ফেরত আসছে তাদের মত *আতুরাঃ* হয়ে আসবেন না। তাঁরা আবার কোন উচ্চ ঋষি হয়েই জন্মাবেন।

এখানেই বোঝা যায় আচার্যের কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! এই কথা বলেই তিনি বলছেন 'ভাই মনে রেখো, এখনও মোক্ষের কথা আসেনি, অপরা বিদ্যা নিয়েই আলোচনা চলছে'। এখনও গুরু শিষ্যকে বললেন না মুক্তি কিভাবে হয়, মোক্ষ কিভাবে হয় আর তার আগেই মোক্ষের কথা বলে দেবেন, সেটা তো কখন হয় না। এখানে প্রসঙ্গটাই আলাদা। একটা প্রসঙ্গ চলছে সেখানে একটা অন্য প্রসঙ্গ কি করে এসে যাবে! তাই এখানে মোক্ষকে আনা যাবে না। মোক্ষের প্রসঙ্গ এর পরে আসবে। আচার্য দেখিয়ে দিচ্ছেন উপনিষদ অযৌক্তিক কোন কিছু বলে না, এখানে অপরা বিদ্যার ব্যাখ্যা চলছে আর তার মধ্যে পরা বিদ্যার পরিণামের কথা বলে দেওয়াটা কখনই যুক্তি সঙ্গত হবে না। প্রসঙ্গ চলছে অপরা বিদ্যার আর মোক্ষ বলছেন পরা বিদ্যাতে হয়, তাহলে এটা কি করে মোক্ষ হবে। যাই লেখা থাকুক এটা কখনই মোক্ষ হতে পারেনা। এক বধিরকে আরেক বধির যা প্রশ্ন করছে সে তার উত্তর দিচ্ছে অন্য প্রসঙ্গে। একজন বধির বেগুন চাষ করেছে। আরেকজন বধির সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করছে। কি তোমার ছেলেপুলে হয়েছে? এই বধির উত্তর দিচ্ছে – খুব ভালোই হয়েছে, অনেকগুলো হয়েছে। তারা সব কেমন আছে? এ উত্তর দিচ্ছে – একটা করে তুলছি, পোড়াচ্ছি আর খাচ্ছি। প্রসঙ্গ চলছে অন্য উত্তর আসছে অন্য। এগুলো কারা করবে? যারা বধির আর তা নাহলে যাদের বুদ্ধি নেই। উপনিষদ কি সেই রকমই নাকি? প্রসঙ্গ চলছে অপরা বিদ্যা, সেখানে পরা বিদ্যার ফল কি করে নিয়ে আসবে! বৈষ্ণবদের সমস্যা হল, বৈষ্ণবরা এত সুসংবদ্ধ নিয়ম ও যুক্তির মধ্যে দিয়ে যাবে না। যখনই নিয়ম ও যুক্তির মধ্যে দিয়ে যাবে তখনই সব ধরা পড়ে যাবে। রামানুজাদি আচার্যরা এই মন্ত্রকে ধরে নিয়ে বলবেন এটাই হল মুক্তি, এটাই শেষ কথা।

আচার্য আবার এদের এই মতকে তুলোধুনো করে ছাড়বেন। তবে ওনাদের বুদ্ধি অনেক উচ্চস্তরের আমরা আমাদের সামান্য জ্ঞান দিয়ে এনাদের বিচার ধারাকে বুঝতে পারিনা। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যা বলছেন আমরা সেটাই মেনে নিয়ে চলছি।

কিন্তু এখানে মূল বক্তব্য হল, হঠাৎ করে এখানে মোক্ষের কথা আসতে পারেনা। কারণ এখনও অপরা বিদ্যার আলোচনা চলছে। অপরা বিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল দ্বৈতবাদ, যেখানে ক্রিয়া, কর্ম, কারক, ফল সব আলাদা আলাদা। এখানে যে পরিণতির কথা বলা হচ্ছে সেটা একটা জায়গায় যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। যাওয়ার ব্যাপার এলেই সেখানে দ্বৈত এসে যাবে, সেইজন্য এটি অপরা বিদ্যা। সগুণ সাকার ঈশ্বরের সাধনা করে কখনই মোক্ষ লাভ হতে পারেনা। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়েও আচার্য এই বিষয়টাকে উত্থাপন করেছেন। মুক্তি হবে, পরের দিকে এটাকেই আবার সামঞ্জস্য করা হয়েছে। ধরুন কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা করেছেন। কিন্তু মুক্তি হবে না, সাধনা করে ঠাকুরের লোকে যাবে, থাকবে। কল্পান্তে তোমার মুক্তি হবে। কিন্তু তুমি মনে করবে না যে, ঠাকুর এসে তোমাকে মোক্ষ দিয়ে দেবেন, তা হবে না। আচার্য শঙ্কর আবার মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন '*ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ*', যাঁরা সাত্ত্বিক, মনীষি, প্রজাপতিলোক, যমলোক, মহৎ বা এই ধরনের বিভিন্ন লোকে তাঁদের গতি হয়। আচার্যের এটাই বিশেষত্ব, তিনি বলবেন বেদ, মহাভারত, স্মৃতি, পুরান, ইতিহাস সবাই একই কথা বলছে। তিনি তাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি এনে দেখাবেন কিভাবে সবাই একই কথা বলছে। এখানেও বলছেন মনুস্মৃতিও বলছে যাঁরা সাত্ত্বিক পুরুষ, উত্তম সাধনা করেছেন তাঁরা উত্তম লোকে যান। উত্তম লোকের সাথে পরা বিদ্যা বা মুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ভালো মানুষ, ধর্মীয় পুরুষ, মহৎ ব্যক্তিত্বের সাথে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই। একজন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন কিন্তু তাঁকে কখনই আধ্যাত্মিক পুরুষ বলে গণ্য করা হবে না। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মের লক্ষ্য হল মানুষকে সাত্ত্বিক বানানো। বৈষ্ণব ধর্মও তাই, তারাও সাত্ত্বিক বানায়। আধ্যাত্মিকতা পুরো আলাদা, যেখানে তিনি পাপ-পূণ্যকে পার করে যাচ্ছেন, ধর্ম-অধর্মকে পার করে যাচ্ছেন, সব লোককে পার করে যাচ্ছেন, তার মধ্যে কোন ধরণের দ্বৈত ভাব থাকবে না।

এই এগারো নম্বর মন্ত্রে এসে অপরা বিদ্যার আলোচনা শেষ করা হচ্ছে। এখানে যদি মুক্তি হয় তবে সেটা ক্রমমুক্তি হবে। ঈশ্বর ছাড়া তিনি আর কিছু চান না, ঈশ্বরের প্রতি তিনি নিবিষ্ট হয়ে আছেন, সেখান থেকে তাঁর ক্রমমুক্তি হয়ে যাবে। অপরা বিদ্যা এখানেই শেষ হয়ে যায়। আচার্য কিন্তু এই ক্রমমুক্তির কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু পরের দিকের ভাষ্যকাররা, যাঁরা এগুলোকে আবার সমন্বয় করার প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁরা এই ক্রমমুক্তির ধারণা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আচার্যের কাছে ক্রমমুক্তি এগুলো কিছু নয়, ব্রহ্মালোকে যাবে এই পর্যন্তই বলছেন। কিন্তু তারপরে তাঁর কি হবে সেটা আর আচার্য কিছু ব্যাখ্যা করছেন না। অন্যান্য জায়গায় কোথাও কোথাও তিনি বলেছেন সেখান থেকে তাঁর মুক্তি হবে। কিন্তু কল্প পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। কল্প মানে যখন ওই হিরণ্যগর্ভের শরীরটা নাশ হয়ে যাবে তখন সাধকের ওই সূক্ষ্ম শরীরটাও নাশ হয়ে যাবে, তাঁকে আর ফেরত আসতে হবে না।

এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে ঠাকুর বলছেন সাকার সাধনা করে যেখানে যাবে নিরাকার সাধনা করেও সেখানে যাবে। কিন্তু আচার্যের কথাতে আমরা তা পাইনা। এখানে একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে, ঠাকুর একটা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এই কথা বলছেন। আবার আচার্যও আরেকটা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বলছে। বুঝতে গেলে বা তর্ক করতে গেলে এই পদ্ধতিকে ওই পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে নেই, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। সব থেকে সহজ কথা হল যদি সাকার নিরাকার একই হয় তাহলে দুটো শব্দ কেন ব্যবহার করা হল। H^2O আমাদের কাছে পরিষ্কার কিন্তু জল আর বরফ কেন বলছি? জলও H^2O আবার বরফও H^2O, তাহলে দুটো আলাদা শব্দ কেন ব্যবহার করছি। কোথাও একটা পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। নিরাকার সাকার এক, কিন্তু দুটো আলাদা শব্দ কেন ব্যবহার করা হচ্ছে? তাই দুটোর সাধনা যখন করা হচ্ছে তখন কোথাও সেই সাধনার সিদ্ধিতেও পার্থক্য আসবে। দুটো সাধনার মধ্যে যেমন তফাৎ হবে সাধনার সিদ্ধিতেও তফাৎ হবে।

কিন্তু কোথাও আবার দুটো গিয়ে এক হয়ে মিলে যাবে। সেটাকেই এখানে ক্রমমুক্তির কথা বলছেন। পরের পরের ভাষ্যকাররাও বলছেন সাকার সাধনাতেও মুক্তি হবে, কিন্তু ক্রমমুক্তি হবে। কিন্তু আচার্য বলছেন, ওই ক্রমমুক্তি-ফ্রমমুক্তি নয় আমার এক্ষুণি চাই।

এরপর থেকে ঠিক ঠিক পরা বিদ্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে। যাঁরা *ইহমুত্রফলভোগ বিরাগঃ* হয়ে গেছেন, যাঁর কাছে এই জগতসুখ আর স্বর্গসুখ অসার হয়ে গেছে, যিনি বলছেন আমার স্বর্গসুখ আর এই জগতের সুখ কোনটাই চাইনা। এই মনোভাবে যাদের চিত্ত দৃঢ় হয়ে গেছে, এনারাই হলেন স্বাভাবিক সন্ন্যাসী। এঁদের জন্য হল *সাধ্যসাধনরূপাৎসর্বস্মাৎসংসারাদ্বিরক্তস্য*। এতক্ষণ বলা হয়েছিল কার্য আর কারণ সম্পর্ককে নিয়ে, একটা সাধ্য আরেকটা সাধন, আমার টাকা চাই তাই চাকরি করতে হবে, স্বর্গ চাই যজ্ঞ করতে হবে, সন্তান চাই বিয়ে করতে হবে। সংসার মানেই যেখানে সাধ্য সাধন। এই সাধ্য সাধন থেকে যাঁরা বিরক্ত হয়ে গেছেন, আমার আর কিছুই লাগবে না। তখন বলছেন একমাত্র এঁদেরই পরা বিদ্যাতে অধিকার। আচার্যের এই মন্তব্যের জন্য তাঁকে অনেকে সমালোচনা করেন। আচার্য বার বার একটা কথাতে জোর দিয়ে বলে গেছেন সন্ন্যাসী ছাড়া মুক্তি হয় না। এর পেছনে আচার্যের জোরাল যুক্তি আছে। আচার্যের বক্তব্য হল পরা বিদ্যার সাধন ছাড়া কখনই মুক্তি হতে পারেনা। আর সংসারে থেকে কখনই পরা বিদ্যার সাধন হতে পারে না। এখানে প্রথমে তিনি তাই ঠিক এই শব্দই ব্যবহার করছেন *অথেদানীমস্মাৎসাধ্যসাধনরূপাৎসর্বস্মাৎসংসারাদ্বিরক্তস্য*, সংসার থেকে তাকে বিরক্ত হতে হবে।

এই সংসারের কি রূপ? বলছেন, এই সংসার হল সাধ্য সাধন রূপ। এই সংসার কার্য কারণ সম্পর্কযুক্ত। একটা কাজ করলে তার একটা ফল হবে। একটা ফলের ইচ্ছা হয়েছে তার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে। এর থেকে যতক্ষণ পূর্ণ বিরক্তি না হচ্ছে, একটু বাকি থাকলেও হবে না, তখন পরা বিদ্যার অধিকারী হবে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন সুতোয় যদি একটু আঁশ থাকে ছুঁচে সুতো ঢুকবে না। ঠাকুরও এই কথা বলছেন। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন সংসারে থাকলে কেন ঈশ্বর লাভ হবে না, সেখানে যে শর্তগুলো আরোপ করছেন সেগুলো সবই সন্ন্যাসীদের জন্য প্রযোজ্য। আচার্য শঙ্কর আবার এই ব্যাপারে প্রচণ্ড কড়া। তিনি তিনটে শ্রেনীতে ফেলে দিচ্ছেন – সাধারণ সাধক, যারা যজ্ঞাদি করছে তার স্বর্গে যাবে, সেখানে সুখভোগ করবে, তারপর সেখান থেকে নেমে আসবে। আরেকটু উচ্চস্তরের সাধকের কথা বলছেন এরা স্বধর্ম পালন করছে, নিষ্কাম ভাবে সাধনা আর কিছু কর্মাদি করছে, এরা সত্যলোক পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকে যারা গভীর সাধনা করেছেন, ঈশ্বর বৈ কিছু জানেনা, এরা সেই সত্যলোকে থেকে সেখান থেকে ক্রমমুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। তৃতীয় হল প্রকৃত সন্ন্যাসী, এঁরাই হল আসল পদার্থ, যাদের উপর পুরো জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ অপরা বিদ্যার কথা বলার পর পরা বিদ্যার কথা বলছেন। অপরা বিদ্যাতে সব সময় সাধ্য সাধন সম্পর্ক থাকবে, কার্য কারণ সম্পর্ক থাকবে, কর্তা ও ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকবে আর দ্বৈত সব সময় লেগে থাকবে। এরপর আস্তে আস্তে পরা বিদ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যা কিনা শুদ্ধ অদ্বৈত। প্রথমেই বলে দিচ্ছেন পরা বিদ্যার শিষ্য কেমন হবে আর গুরুর কি কি গুণ থাকতে হবে –

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।১/২/১২।।

('নিত্যবস্তু কর্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না' – এই ভাবে কর্মলভ্য ফলসমূহকে ভালো করে পরীক্ষা করে ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করবেন। সেই নিত্যপদকে জানবার জন্য তিনি যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে নিয়ে বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সকাশে গমন করবেন।)

মুণ্ডকোপনিষদের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। যাঁরা ঈশ্বর পথে যাবেন তাঁদের কি করতে হবে সেটাই এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে। *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো*, বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিন, বিজ্ঞানের বিষয় তো অনেক নীচের, এর থেকে যেটা উচ্চতম এই ঋগ্বেদ এটাও দোষযুক্ত, ঋগ্বেদও অপরা বিদ্যা। দোষযুক্ত এই বিদ্যা আপনাকে বেশী দূর নিয়ে যেতে পারবে না, এই ঋগ্বেদও আপনাকে ঘুরপাক করাবে। নারদ ভগবান বিষ্ণুকে বলছেন সবাইকে বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে আসতে হবে। ভগবানও নারদকে বলে দিলেন তোমার যাকে ইচ্ছে হয় নিয়ে এস। প্রথমে তিনি এসে গুবরে পোকাকে বলছেন 'কি এই গোবরের মধ্যে পড়ে আছিস, চল আমি তোকে বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে যাব, কিরে যাবি তো'। গুবরে পোকা শুনে বলছে 'হ্যাঁ হ্যাঁ যাব। কিন্তু ঠাকুর ওখানে কি ভালো গোবর পাওয়া যাবে'? গুবরে পোকার চরম লক্ষ্য ভালো গোবর। আমরা যা কিছু করছি এতে আমি সব থেকে বেশী কি পাব? ভোগ পাব। ভোগ আর কতটুকু পাব, ভোগের গুণগত মানটাই তো পাল্টাবে। ঝোল ভাতের জায়গায় বড় জোর মাছের ঝোল পাব, মাছের জায়গায় মাংসের ঝোল পাব। এক রকমের মাংস না খেয়ে পাঁচ রকমের মাংস খাব। কিন্তু এর মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে, এর বাইরে যাবে না। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছি তখন বিজ্ঞান শুধু এই জগতের সব রকমের সুখ সুবিধা দেবে। কিন্তু যখন বেদের সাহায্য নিচ্ছি তখন আমাকে মৃত্যুর পরেও সুখ দেবে। স্বর্গে সুখের মাত্রাটাই পাল্টাচ্ছে, কিন্তু একই জিনিষ থেকে যাচ্ছে। আবার যখন নামতে হবে তখন তার কষ্টটাও সেই রকম হবে। আমি যদি পকেটে পাঁচ টাকা নিয়ে বাসে যাই, পকেটমার হয়ে গেলে কষ্ট হবে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি পকেটমার হয়ে যায় তখন 'ওগো! আমার সব গেল, আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম'। এই জগৎ থেকে যদি কিছু চলে যায় তার কষ্ট যেটা হবে তার অনেক গুণ বেশী কষ্ট হবে যখন স্বর্গ সুখটা হাত থেকে বেরিয়ে যাবে।

এখানে বলছেন আমাদের সবার মধ্যে অবিদ্যা জনিত অজ্ঞান রয়েছে। অজ্ঞানের জন্য মনে কামনার উদয় হয়। কামনা পুর্তির জন্য আমাকে কর্ম করতে হবে। কর্ম করতে থাকলে অবিদ্যা বাড়বে, অবিদ্যা বাড়লে আবার অজ্ঞানও বাড়বে, অজ্ঞান বাড়ার জন্য কামের বৃদ্ধি হবে, বর্ধিত কামের জন্য আরও কর্ম করতে হবে। অবিদ্যা – কাম – কর্ম এই জঞ্জাল চলতেই থাকবে। একে সাহায্য করার জন্য ওর সাহায্য নিতে হবে, ওর থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য বিনিময়ে তার জন্য কিছু করতে হবে। এই জিনিষ চলতেই থাকবে, এ এক মহাজাল। কোন দিন এই জিনিষ শেষ হওয়ার নয়। গীতায় ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই মহাজালকে বলছেন *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্*, অব্যয় সংসাররূপী বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেই চলেছে। যখন এই অবিদ্যা কাম সম্পর্কিত যে দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আমাকে এখন পালন করতে হবে। যে মুহুর্তে আমি কর্ম করলাম তখন মৃত্যুর পর হয় আমাকে দক্ষিণমার্গ আর নাহয় উত্তরমার্গ অবলম্বন করতে হবে। দক্ষিণমার্গে গেলে একটু তাড়াতাড়ি নেমে আসতে হবে আর উত্তরমার্গে গেলে নামাটা দেরী হবে। দুটোতেই কিন্তু আমাকে নামতে হবে। আর তৃতীয় একটা পথ আছে যেটা কঠোপনিষদে বলছেন, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, ধান-গমের মত মরবে আর জন্মাবে। এদের বেশী সময় লাগবে না, আজকে মরেছে কালই জন্মাবে। হিন্দু শাস্ত্রে সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে মানুষ যখন মারা যায় সে যদি মোটামুটি ভালো লোক হয়, অত্যন্ত দুষ্ট লোক যদি না হয়, বছর খানেক সে সূক্ষ্ম শরীরে থাকবে। তারপর আবার সে নতুন শরীর ধারণ করবে। নামতে এদের সবাইকেই হবে, আগেও নামতে পারে আবার পরেও নামতে পারে।

হিন্দু ধর্মে প্রত্যেককে জীবদ্দশায় কয়েক রকম কর্ম করতে হয়। প্রথম হল নিত্যকর্ম, নিত্যকর্ম মানে যে কর্ম রোজ করতে হয়। যেমন জপ, ধ্যান, পুজো, পাঠ ইত্যাদি এগুলো সব নিত্য কর্ম, রোজ করতে হয়। দ্বিতীয় নৈমিত্তিক কর্ম, বিশেষ বিশেষ সময়ে যে কর্মগুলো করতে হয়। যেমন সূর্যগ্রহণের সময় একটা পূজো করতে হচ্ছে, চন্দ্রগ্রহণের সময় একটা বিশেষ পূজো করতে হচ্ছে, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী এইসব তিথিতে কিছু পূজো, কেউ মারা গেছে তার জন্য একটা পূজো, এগুলো সব নৈমিত্তিক কর্ম। তৃতীয় হল প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, আমরা জান্তা অজান্তায় অনেক কিছু দোষযুক্ত কর্ম করে থাকি, সেই দোষযুক্ত কর্মের জন্য কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করতে হয়। যেমন তীর্থাদিতে যাওয়া। আর চতুর্থ কর্ম হল কাম্য কর্ম। কোন কামনা বাসনার পুর্তির জন্য

সঙ্কল্প করে যে কর্ম করা হয়, আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, আমার প্রমোশন চাই, ছেলের চাকরি চাই, এই সব কামনার পুর্তির জন্য কোন বিশেষ পূজা বা যজ্ঞ করা হচ্ছে, এগুলোকে বলা হচ্ছে কাম্য কর্ম। সব শেষ পঞ্চম একটি কর্ম আছে যাকে বলা হয় নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্মগুলো তুমি কোন মতেই করবে না, যেমন কারুকে খুন করা, জীবহিংসা, এগুলো কোন মতেই করা যাবে না। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম মানুষকে অবশ্যই করতে হয়। কেউ যদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম না করে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করে তাহলে তাকে তির্যকাদি যোনিতে জন্ম নিয়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। ঠিক ঠিক কর্ম করা থাকলে স্বর্গে যাবে। শেষে গিয়ে কর্ম দুই প্রকারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বিহিত কর্ম আর নিষিদ্ধ কর্ম। যারা বিহিত কর্ম করে গেছে তারা স্বর্গে যাবে, কিন্তু সেখান থেকে তাকে আবার নামতে হবে। অন্য দিকে কেউ বিহিত কর্ম করেনি বা নিষিদ্ধ কর্ম করেছে তাহলে তাকে নীচের দিকে ঠেলে দেবে। নিত্যকর্মের ব্যাপারে বলা হয় অকরণে প্রত্যবায়, নিত্যকর্ম না করলে পাপ হবে, করলে পূণ্য হবে না। নৈমিত্তিক কর্ম করলে পূণ্য হবে। আর প্রায়শ্চিত্ত কর্মে দোষযুক্ত কর্মের দোষটা কেটে যায়, তার জন্য তীর্থাদি করা, দান করা বা উপবাস করা ইত্যাদি বিধি আছে। এখন বর্তমান যুগের যে সাধনার পদ্ধতি তাতে জপ ধ্যান করলে সব দোষই কেটে যায়।

এখানে বলছেন এগুলোকে ভালো করে বিচার কর। তুমি কি চাইছ? আমি পরা বিদ্যা চাইছি, আমি মুক্তিমার্গের পথিক। তাহলে প্রথমে আগে এগুলোকে বিচার কর – কর্ম কয় প্রকার, কর্মে কি হয়, বিহিত কর্ম করলে কি হবে, বিহিত কর্ম না করলে কি হবে। আচার্য এখানে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন, পুরো যুক্তি দিয়ে জিনিষটাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমে কর্মকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। *স্বাভাবিকাবিদ্যাকামকর্মদোষবৎ*, স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো অবিদ্যা-কাম-কর্ম। অবিদ্যা-কাম-কর্মে এতগুলো প্রকার। এখানে তিনি চারটে প্রমাণের কথা বলছেন – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান আর আগম, এই চারটে প্রমাণের কথা বলে বলছেন তুমি এই চার দিক থেকে কর্মকে বিচার কর। প্রত্যক্ষ তুমি কি দেখছ? ঠাকুরের জীবন দেখছি, ঠাকুর এই রকম করেছিলেন। চোখের সামনে দেখছি ভালো কাজ করলে তার সব কিছু শুভ হয়। অনুমান প্রমাণ, যখন যুক্তি দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তখন দেখ কি হয়। আর আগম, শাস্ত্রে এই ব্যাপারে কি বলছে মিলিয়ে নাও। শাস্ত্র কি বলছে, তুমি নিজে কি দেখছ, তুমি নিজে চিন্তা-ভাবনা করে কি বুঝছ। আগে যেমন বলা হয়েছিল শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি, এখানেও এই তিনটে আসছে। শ্রুতি আগম প্রমাণ, যুক্তি হল অনুমান প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল অনুভূতি। এই কর্মের খেলাকে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি, তিনটে দিয়ে তুমি বিচার কর। যা কিছু কর্ম তুমি করছ, এই কর্ম হয় তোমাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যাব নয়তো নরকের দিকে নিয়ে যাবে। আর তা নাহলে মিশ্র কর্ম হয়ে মানুষ জন্মই হবে। এর মধ্যেই তুমি ঘুরপাক খেতে থাকবে। *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো*, আমি যে এই নানা রকমের কর্ম করছি এই কর্মের দ্বারা আমি লোক পাব। কি লোক পাব? হয় স্বর্গলোক পাব, নয়তো নরক লোক পাব আর তা নাহলে তির্যকলোক পাব আর না হলে মনুষ্য জন্ম পাব। যা কিছু কর্ম করছি তার ফল অবশ্যম্ভাবি। এই অবশ্যম্ভাবি ফল তোমাকে কোন না কোন লোকে নিয়ে যাবে। বলছেন কর্ম আর লোক এই দুটো হল বীজ আর অঙ্কুরের মত সমান ভাবে জড়িত। এক অপরকে জন্ম দিতে থাকে। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রকম ভোগ হবে। এর থেকে বাঁচার তোমার কোন পথ নেই। এটাকে ভালো করে বিচার কর।

আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন *অনেকানর্থশতসহস্র*, এই কর্মগুলো শত সহস্র অনর্থে পূর্ণ। *কদলীগর্ভাবদসারান্*, কলা গাছের ভেতরে যেমন কোন সার থাকে না, ঠাকুর বলছেন মলয়ের বাতাসে সব গাছ চন্দন হয় কিন্তু কলা আর বাঁশ চন্দন হয় না। এগুলো সারহীন। যে কোন লোক, পৃথিবীলোক বাদে সব লোকই সারহীন। প্রথমে বলছেন বীজ আর অঙ্কুর সমান, দ্বিতীয় বলছেন শতসহস্র অনর্থ দিয়ে পরিপূর্ণ। আর কি বলছেন? *কদলীগর্ভবৎ অসারান্*। জগতে সুখের গন্ধ পর্যন্ত নেই। কিন্তু সুখের পেছনে ছুটেই চলেছে। ভোগ থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না। স্বামীজী বলছেন I want only twenty youngman, who can come out in the streets and say I have nothing but God। এর বাইরে যারা আছে তারা কোন না কোন ভাবে ভোগের মধ্যে পড়বে। এই ভোগ আবার কি রকম বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, এই সংসার হল

আমড়া, শুধু আটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। এটাকেই আচার্য অন্য ভাবে বলছেন, আচার্যের মধ্যে কবিত্ব ছিল, যখনই কিছু লিখতেন কবিতার ছন্দে লিখতেন। এই সংসার হল কলাগাছের মত অসার।

শুধু তাই নয়, *মায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব-নগরাকার-স্বপ্নজলবুদ্বুদফেনসমান্-প্রতিক্ষণ-প্রধ্বংসাহপৃষ্ঠতঃ*, কি সুন্দর ভাষার বুনোট। বলছেন, শুধু পৃথিবীই নয়, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যত লোক আছে সবটাই মায়ানগরীর মত ভ্রম। মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা হয় এটাও ঠিক তেমনি মায়া মরীচিকা মাত্র। কিছু নেই, প্রতীতি হচ্ছে মাত্র। সেইজন্য বলে সুখ পেতেও কষ্ট, যখন সুখ আসছে তখনও কষ্ট, চলে যাওয়ার সময় তো কষ্ট দেবেই। সবই মায়ানগরীর মত ভ্রমপূর্ণ, মনে হচ্ছে আছে, কাছে গেলে কিছু নেই। আর তাই না, স্বপ্ন, জলের বুদ্বুদ আর ফেনার মত ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণে ক্ষণে আসছে আর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই জগৎ সংসারও জলের বুদ্বুদ আর ফেনার মত, এই আছে এই নেই। সব কিছুই স্বপ্নের মত, ঘুম ভেঙে গেলে কিছুই নেই। এই হল আচার্য শঙ্করের বর্ণনা। এগুলোকে বিচার করতে বলা হচ্ছে। তারমধ্যে *কৃত্বাবিদ্যাকামদোষপ্রবর্তিতকর্মচিতান্*, অবিদ্যা কাম রূপ দ্বারা প্রবর্তিত যে কর্ম হচ্ছে তার থেকে প্রাপ্ত হয় *ধর্মাধর্মনির্বর্তিওতানিত্যেতৎ*, ধর্ম ও অধর্ম জনিত এই লোকসমূহ। অধর্ম করলে নরকে আর ধর্ম করলে স্বর্গে যাব। এই কর্মসমূহের হেতু কাম-বাসনা।

এগুলোকে চিন্তা করে করে দৃঢ় ভাবে বুঝে নাও, বুঝে নিয়ে তৃণ থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত, স্থাবর থেকে শুরু করে অব্যক্ত পর্যন্ত যা কিছু আছে সব ছুড়ে ফেলে দাও। গীতায় যে সংসার বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে সেখানেও ভগবান বলছেন মূল থেকে নিয়ে একেবারে অব্যক্ত পর্যন্ত, মানে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত যা কিছু আছে সবটাকে কেটে ফেলে দাও, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা*। এই ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে তাহলে এই পথ তোমার জন্য নয়। কঠোপনিষদে যমরাজ বলছেন *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্*, যিনি ধীর পুরুষ তাঁর ইচ্ছা হয়েছে আমি আত্মার দর্শন করব। এই ধীর কে? আচার্য শঙ্কর বলছেন – যার মধ্যে এই রকম উৎসাহ উদ্যম ও শক্তি আছে আমি গঙ্গাকে গঙ্গাসাগর থেকে ঠেলে গোমুখে ঢুকিয়ে দেব। যার মনে এই ভাব আছে এই যে স্থাবর, যেটা অত্যন্ত নিম্ন, এর নীচে আর কিছু হয় না, নরকের থেকেও জঘন্য। কারণ এই স্থাবর আমাকে বেঁধে দিয়েছে। তাই নয়, ব্রহ্মাও যদি হয়ে যাও সেখানেও তুমি বন্দী, এগুলো বিচার করে দেখ, সবটাই বরবাদ্।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো, এই সব কিছুকে আগে ভালো করে বিচার করে ভেবে দেখ। সব দেখে শুনে বুঝে নেওয়ার পর সব কিছু ছুড়ে ফেলে এগিয়ে এস। এই ব্রাহ্মণ বলতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতিকে বোঝাচ্ছে না, যার মধ্যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এসেছে। আচার্য এখানে কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার না করে খুব সুন্দর ভাবে বলছেন *ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোহধিকারঃ সর্বত্যাগেন*, এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ দ্বারা ভাবটাকে বোঝা খুব কঠিন। বলছেন যে ব্রাহ্মণ তার পক্ষে সর্বত্যাগটা সহজ। কারণ যারা ভোগের মধ্যে আছে তাদের দ্বারা সর্বত্যাগ হয় না। যাই হোক, এখন দু হাজার বছরের মধ্যে সমাজের অনেক কিছু পাল্টে গেছে। আচার্য বলতে চাইছেন, যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করেছে, এই লোকাদির কথা বুঝে নিয়েছে এবং ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। এখন সে সর্বত্যাগের জন্য রাজী – আমি বিয়ে করব না, আমি ধন-সম্পদ রাখব না, আমার কিছুই চাইনা।

আমরা ছোটবেলা থেকে গান করে আসছি হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর, কিন্তু জীবনে কিছুই করতে পারছি না। আমরাও এসব কথা শুনে আসছি, মুখে বলছি, কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে যাচ্ছে মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। তবে কখন কারুর মনের মধ্যে লেগে যায়। সেইজন্য বলছেন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম এই চারটে প্রমাণ দিয়ে দিবারাত্র বিচার কর, প্রত্যক্ষ দেখ সংসারটা কি রকম, চিন্তা-ভাবনা কর, শাস্ত্রে কি বলছে দেখ। তারপর সব কিছু ভালো করে বিচার করার পর তুমি যখন বুঝে গেলে এর সবই অসার, অনিত্য তখন তুমি নির্বেদ হও। এই নির্বেদ শব্দটি আবার খুব জটিল। বিদ্ মানে হয় জানা কিন্তু আচার্য এখানে ব্যাকরণের নিয়ম লাগিয়ে বলছেন, এখানে বিদ্ বৈরাগ্যের অর্থে হবে, তাই নির্বেদ মানে তুমি বৈরাগ্য অর্জন কর। অনেক সময় নির্বেদের অর্থ করা হয় বেদের পারে যাওয়া। বেদের পারে যাওয়া মানে তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজঃ আর তমোকে পার করে ত্রিগুণাতীত হওয়া। কিন্তু এটাও বৈরাগ্যের অর্থেই হয়। নির্বেদ

হওয়া মানে সম্পূর্ণ রূপে বৈরাগ্যবান হয়ে যাওয়া। কিসের থেকে বৈরাগ্য? পুরো নিজের এই বর্তমান অস্তিত্ব থেকে। স্বামীজী বলছেন ধর্ম কোথা থেকে শুরু হয়? Present state of affairs। বর্তমানে আমার চারিদিকে যা দেখছি, উপর-নীচ যা দেখছি এর কোন কিছুতে কোথাও যদি একটু মাত্র প্রীতি থাকে তাহলে ধর্ম আপনার জন্য নয়। এখন কিছু বাবাজীরা টিভির দৌলতে যোগের নামে, প্রাণায়াম শিক্ষার নামে মানুষের মধ্যে ভোগবৃত্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষকে আগে ত্যাগের শিক্ষা দাও, আগে নিজে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হও তারপর অপরকে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত কর। তা না করে নিজেও ভোগে প্রতিষ্ঠিত অপরকেও ভোগের মধ্যে টেনে আনছে।

এই বৈরাগ্যের পথ যদি কেউ অবলম্বন করে নেয় তখন তার কি হয়? এই জগতে কোন কিছু নেই যেটা *অকৃত*, আচার্য যেমন বলছেন এই যে জগতের অস্তিত্বকে সামনে দেখছি, এর মধ্যে এমন কিছু নেই যেটা অকৃত, অকৃত মানে যেটা করা হয়নি। কৃত মানে করা আর যেটা করা হয়নি সেটা অকৃত। জগতে যা কিছু দেখছি সবই কোন না কোন কার্যের ফল। যে কোন কার্য যখন হয় তখন তার চার রকমের কাজ হয় – প্রথম উৎপাদ্য, দ্বিতীয় আপ্য, তৃতীয় বিকার্য এবং চতুর্থ সংস্কার্য। উৎপাদ্য, আমি ধানের বীজ লাগালাম সেখান থেকে কিছু দিন পর ফসল হল। বিকার্য, দুধ থেকে দই হল, দুধের বিকার হল দই। আপ্য, একটা জিনিষকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল, যেমন আমি একটা বাড়ি তৈরী করলাম, কিংবা কোন জায়গায় পৌঁছাতে হবে সেখানে আমি চলে গেলাম, আমি পিওন হয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলাম এখন প্রমোশন পেয়ে উঁচু পদে পৌঁছে গেলাম। সংস্কার্য, একটা জিনিষকে সংস্কার করে ঠিকঠাক করা, একটা বাড়ি ছিল, সেটা পোড়ো বাড়ি হয়ে গেছে, বাড়িটা সংস্কার করে নতুনের মত করে নিলাম। যে কোন কাজ যখন হয় তখন এই চার রকমের কাজই হয়। জগতের এমন কোন কিছু নেই যেটা এই চারটের মধ্যে কোন একটাতেও ফেলা যাবে না। যেদিকেই তাকাব সব দিকেই এই চারটের মধ্যেই সব কিছু দেখব। যেমন আমি স্বর্গে যাব, এটা আপ্য হয়ে গেল। স্নানের পর আমাকে সতেজ দেখাবে, এটা হয়ে গেল সংস্কার্য। যেটাই করি না কেন এই চারটের বাইরে কখনই যাবে না। বিচার করার সময় এই চারটে জিনিষকেও নিয়ে এসে ভালো করে বিচার করে দেখতে হবে যত রকমের কর্ম আছে সবই অনিত্য ফলের সাধনা। আমি উৎপাদ্যই করি, সংস্কার্যই করি, আপ্যই কর বা বিকার্যই করি চারটের ফলই অনিত্য। কারণ যেটা উৎপাদ্য তার নাশ হবে, যেটা আপ্য সেটা ছাড়তে হবে, যেটা বিকার্য সেটা আবার অন্য দিকে বিকার হয়ে যাবে আর যেটা সংস্কৃত হয়েছে সেটা আবার অসংস্কৃত হবে।

এই চারটেই যদি অনিত্য হয় তাহলে নিত্য কোনটা? যেটা এই চারটে নয়। যেটা উৎপাদ্য নয়, বিকার নয়, আপ্য নয়, সংস্কার্য নয়। এটাই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান উৎপাদ্যও নয়, বিকার্যও নয়, আপ্যও নয় আর সংস্কার্যও নয় তাই আত্মাই একমাত্র নিত্য। তখন সে চিন্তা করে আত্মাই একমাত্র *নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কুটস্থেনাচলেন ধ্রুবেণার্থেনার্থী* – আত্মা নিত্য, অমৃত, অভয় কুটস্থ, অচল ও ধ্রুব। যেটা সর্বব্যাপী সে আর যাবে কোথায়, তারমধ্যে কোন চঞ্চলতা আসবে না, তার মধ্যে কোন বিকার আসবে না। তখন সে বলছে আমি আত্মাকেই চাই, স্বামীজী বলছেন I have nothing but God আত্মা ছাড়া আমি কিছুই চাই না।

জগতে এই চারটের বাইরে কোন কিছু নেই, এমন কি ব্রহ্মলোক সেটাও আপ্যর মধ্যে পড়ছে। টাকা-পয়সা সবই আপ্য, খাওয়া-দাওয়া বিকার্য, সন্তান উৎপাদ্য। এই ভাবে বিচার করার পর দেখ তুমি বলতে পার কিনা? এই আত্মার বিপরীত স্বভাব যা কিছু আছে সেদিকে আমার কোন আগ্রহ নেই। এই বিরক্তি যখন এসে যায় তখন সে সেই অবস্থাতে পৌঁছানর চেষ্টা করে। যদিও পৌঁছান ঠিক ঠিক হয় না, কারণ তখন দেখে ওইটাই তার স্বভাব। আত্মার কি স্বভাব – *অভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং, অভয়* – সেখানে কোন ভয় নেই, শিব – সবটাই তাঁর শুভ, নিত্য – চিরন্তন, আত্মার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই আর অকৃত – আত্মা উৎপাদ্য নয়, বিকার্য নয়, আপ্য নয় আর সংস্কার্যও নয় আত্মা অকৃত। এই আত্মাকে জানার জন্য তখন সে যাবে গুরুর কাছে। গুরু বলতে আচার্য, এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন *গুরুম্ এব আচার্যং*, আচার্যই গুরু। গুরু কি রকম হবেন? তিনি *শ্রোত্রিয়ম্* হবেন, বেদে কি আছে, শাস্ত্রে কি আছে সব তিনি জানবেন। আর *ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, ব্রহ্মে তাঁর নিষ্ঠা থাকবে। শুধু শাস্ত্র জ্ঞান থাকলেই গুরু হওয়া যাবে না, শাস্ত্র জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর উপলব্ধি থাকা চাই। আবার শুধু

উপলব্ধি থাকলেও হবে না, শাস্ত্র জানা চাই। কারণ শাস্ত্র যদি না জানা থাকে তখন মনের ভুলে যেটাই দেখবে সেটাকেই তিনি মনে করবেন এটাই আমার উপলব্ধি। তাই দুটোই এক সাথে চাই। আচার্যও বলছেন জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুটোই চাই। এমন গুরুর কাছে যাবে যাঁর practical realisation ও theoretical knowledge দুটোই আছে।

এই আত্মাকে জানার জন্য প্রথম হল তুমি বিচার করে নাও এই লোকে বা পরের লোকে আমার কিছু চাইনা। আমার চাই যেটা অকৃত, অর্থাৎ আত্মাকে। সেই পথকে পাওয়ার জন্য আমি গুরুর কাছে যাব। কিভাবে যাব? *সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্*। তিনি *শ্রোত্রিয়ম্* হবেন, উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণ হবেন আর পুরো বেদ তাঁর জানা থাকতে হবে তার সাথে *ব্রহ্মনিষ্ঠ*ম্, তিনি ঈশ্বরপরায়ণ।

এই মন্ত্রে দুটো অংশ। প্রথম অংশে বলছেন যিনি ছাত্র বা জিজ্ঞাসু বা শিষ্য তার কি কি গুণ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রিতে ভর্তি হতে গেলে ছাত্রের যেমন বিশেষ কিছু ডিগ্রি থাকতে হবে, ঠিক তেমনি গুরুর কাছে পরা বিদ্যার জ্ঞান পেতে গেলে শিষ্যেরও কিছু প্রারম্ভিক গুণাবলী আবশ্যক । প্রথমেই তাই বলছেন *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্*, কর্ম দিয়ে যে যে লোক পাওয়া যায় তার সব কটি লোককে পরীক্ষা করে বিচার করা হয়ে গেছে কিনা। এখানে লোক বলতে পৃথিবীলোকে যত রকমের সুখ ভোগ হতে পারে, আর যত রকমের স্বর্গলোক বা অন্যান্য লোক হতে পারে সব লোকের কথাই বলা হচ্ছে। বেদান্তসার গ্রন্থ বলছে এই বিদ্যাতে কার অধিকার আছে। ওর মধ্যে প্রথমেই বলবে *ইহমুত্রফলভোগ বিরাগঃ*। এই সংসারে যা কিছু ভালো হতে পারে তার কোন কিছুই সে আকাঙ্খা করছে না আর *অমুত্র*, মৃত্যুর পরে যা কিছু ভালো পাওয়া যেতে পারে এর সব কিছুতে তার বৈরাগ্য হয়ে গেছে। এই বৈরাগ্য যদি না হয়ে থাকে তাহলে পরা বিদ্যার অধিকারী সে কখনই হতে পারবে না। আর এই জগতে যা কিছু পদার্থ আছে সবটাই কৃত, কর্মের দ্বারা তৈরী, এগুলোও আমার লাগবে না। তখন সে হাতে সমিধা কাষ্ঠ নিয়ে গুরুর কাছে যাবে। এটা গেল মন্ত্রের প্রথম অংশ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে গুরুর কি কি গুণ থাকতে হবে বলছেন – *শ্রোত্রিয়ম্ আর ব্রহ্মনিষ্ঠম্*। এই দুটো হল গুরুর প্রধান গুণ। তাঁকে শ্রোত্রিয় হতে হবে, বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্তে খুব পারদর্শি হবেন অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্ম তাঁর জানা থাকতে হবে আর *ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠ। ঠাকুর গল্প বলছেন – একজন পণ্ডিত নৌকা করে যাচ্ছে। মাঝিকে জিজ্ঞেস করছে 'তোর ষড়দর্শন জানা আছে'?। মাঝি বলছে 'না, তাতো জানিনা'। 'ব্যাকরণ পড়া আছে'। 'না'। 'তোর তো ইহকাল পরকাল সব গেল'! এবার ঝড় উঠেছে, নৌকা দুলতে শুরু হয়েছে। মাঝি পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করছে 'পণ্ডিতমশাই! আপনার সাঁতার জানা আছে'? 'তাতো জানা নেই'। 'তাহলে তো আপনার জীবনটাই গেল'। এই গল্পের মাধ্যমে যে বক্তব্য রাখা হচ্ছে তার সাথে উপনিষদের কথায় অমিল হয়ে যাচ্ছে। কোথাও অমিল হচ্ছে না, ষড়দর্শন তাঁকে জানতে হবে আর সেইভাবে সাধনাও করতে হবে, শুধু জেনে নিয়ে বসে পাণ্ডিত্য দেখালে হবে না। শাস্ত্র অধ্যয়ণের কথা উঠলেই যে ভক্তরা বলে ঠাকুর কি পড়েছিলেন? ঠাকুর কি বই পড়তে বলেছেন? এই যে হাজারে হাজারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুদের কাছ থেকে লোকেরা দীক্ষা নিয়ে যাচ্ছে তাতে কি হবে তাদের? কিছুই হবে না। *শ্রোত্রিয়ম্* যদি না হয় তাহলে তার পক্ষে এই পথে চলা সম্ভব নয়। ঠাকুর পড়েছিলেন মানে! ঠাকুর তাঁর প্রত্যেকটি শিষ্যকে বই পড়িয়ে পড়িয়ে তৈরী করেছিলেন। ঠাকুরকে যখন বলা হচ্ছে – আপনি মশাই কি জানেন, আপনি তো কিছুই পড়েননি। ঠাকুর বলছেন 'ও বাবা! শুনেছি কত'। সেইজন্য কথামৃতে কোথাও কোন ধরণের শাস্ত্র বিরোধী কথা পাওয়া যাবে না। কথামৃতের সব কথা শাস্ত্র সম্মত।

দ্বিতীয় কথা হল, শ্রোত্রিয় যদি না হয় তাহলে কি হবে? আমরা যে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির কথা বার বার আলোচনা করে আসছি, তাতে এটাই বলা হয় যতক্ষণ এই তিনটে এক লাইনে না আসবে ততক্ষণ বোঝা যাবে না তিনি জিনিষটা ঠিক অনুভব করেছেন কি করেননি। আমার মনে একটা খেয়াল এসে গেল তখন মনে হবে এই খেয়ালটাই ঠিক। এটা আমার মনের খেয়াল, নাকি এটাই সত্য, এটাকে বোঝার জন্য আমাকে

শ্রোত্রিয় হতে হবে, শাস্ত্রের কথা জানতে হবে। এখন অবশ্য গীতা, উপনিষদ ও কথামৃত এই দুটো তিনটে বই ঠিক ভাবে পড়ে নিলেই তাকে শ্রোত্রিয় বলা যেতে পারে। কথামৃতে সব শাস্ত্রের সার দেওয়া আছে।

হয়ত তিনি সাধনা করে সত্যিই কিছু উপলব্ধি হয়েছে, কিন্তু শ্রোত্রিয় না হলে তাতেও কিছু সমস্যা থেকে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। কি সমস্যা? সাধনা করে হয়ত আমি একটা জিনিষ পেয়েছি, কিন্তু শাস্ত্রের অন্যান্য যে বক্তব্যগুলো আছে সেগুলো আমি জানতে পারছি না। কেউ যদি ওখান থেকে কিছু বলেন তখন আমার ধারণা হতে পারে যে, এটা ভুল বলছে। স্বামীজীর রচনাবলীর একটা জায়গায় স্বামীজী মহম্মদের নামে একটা কঠোর মন্তব্য করেছেন – Mohammad stumbled upon realisation। Stumble মানে হোঁচট খাওয়া, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, একটা হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই তুলে দেখেন এক বিরাট সম্পদ। আচমকা একটা বিরাট সম্পদ পেয়ে গেছেন। অনেক হয়ত বলতে পারেন, উপলব্ধি হওয়া নিয়ে কথা, সেখানে stumbling এ কি এসে যায়, সোনা পাওয়া নিয়ে কথা। কিন্তু একটা তফাৎ থেকে যায়। একজন লোক একটা কোম্পানিতে একেবারে পিওনের অবস্থায় ঢুকেছে। সেখান থেকে খেটে খেটে পরিশ্রম করে করে মালিকের অবস্থায় চলে গেছে। এখন তার কোম্পানির সব কিছুই জানা থাকবে। আরেকজন আচমকা মালিক হয়ে গেল, সেও জানবে কিন্তু পিওনের মত অত বিস্তৃত ও নিখুঁত ভাবে জানবে না। পরম্পরা যদি না থাকে তখন এই সমস্যা হবে, যেটা ইসলাম ধর্মে হয়েছে। ইসলাম কথাগুলো সবই ঠিক বলছে, আল্লাই সব কিছু, এতো উপনিষদেরই কথা। কিন্তু অন্য ব্যাপারগুলো তারা মানবে না। না মানার একটা কারণ, পরম্পরা নেই। অন্যরাও যে ঠিক হতে পারে সেটা তাদের জানা নেই বলে সমস্যা হয়। সেইজন্য বলছেন গুরুকে *শ্রোত্রিয়ম্* হতে হবে।

ব্রহ্মনিষ্ঠম্ হলে কি হবে? ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হল স্বসংবেদ্য, যিনি জানেন তিনিই জানেন যে আমি জানি। আমি দোকান থেকে দই খেয়ে বাড়িতে এসেছি, দইটা টক না মিষ্টি সেটা আমিই জানি, বাড়ির কেউ বুঝতে পারবে না দইটা টক কি মিষ্টি ছিল, জিভটা আমার। ঠিক তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা যিনি জানেন তিনিই জানেন ব্রহ্মবিদ্যা কি। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা অন্য কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু একেবারেই যে বোঝা বা জানা যাবে না তা নয়, টুক্‌টাক্ কিছু ব্যাপার দিয়ে বোঝা যায় তিনি সত্যিই ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা। প্রথম লক্ষণ হল তাঁর কামিনী-কাঞ্চনে কোন আসক্তি থাকবে না। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। শুধু কামিনী-কাঞ্চনেই যে তিনি অনাসক্ত থাকবেন তা নয়, সাধারণ লোকের সামনেও কামিনী-কাঞ্চনের প্রসঙ্গকে নিয়ে আসবেন না। ঠাকুর তো পুরোপুরি ঈশ্বর প্রেমে বুঁদ হয়ে থাকতেন, তিনিও দেখতেন যাতে এমন কোন কিছু না হয়ে যায় যাতে অন্য কারুর মনে কোন ছাপ পড়ে। ঠাকুরের ঘরে দুজন মহিলা এসেছেন। কিছুক্ষণ পরে সেখানে মোটা বামুন আসছে দেখে ঠাকুর দুজন মহিলাকে খাটের তলায় ঢুকে যেতে বললেন। তা নাহলে মোটা বামুনের মনে একটা ছাপ পড়ে যাবে, দুজন মহিলাকে নিয়ে ঠাকুর একা ঘরে বসে গল্প করছেন। মোটা বামুন এসে এমন গেঁড়ে বসে গেল যে ঠাকুর তাকে আর চলে যেতেও বলতে পারছেন না। শেষে ঘন্টা খানেক বাদে মোটা বামুন বিদায় নিল। হাসতে হাসতে মহিলা দুজন খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে, মশার কামড়ে তাদের সমস্ত শরীর ফুলে গেছে। খাটের তলায় মশাগুলোকে মারতেও পারছিল না, শব্দে না ধরা পড়ে যায়। ভেতর থেকে যেমন কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি চলে গেছে, অপরের সামনেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়ে মহিলাদের কাছে রাখবেন না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে পরেই গৃহস্থ এক আনা ত্যাগের সাহস করবে। কারণ গৃহস্থের ত্যাগের সাহস নেই। কিন্তু যাদের মধ্যে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত হয়, যারা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে এগোতে চায়, তারাও বোঝেন ত্যাগ ছাড়া এটা সম্ভব নয়। কিন্তু সে বেচারী ত্যাগ করতে পারেনা। কিন্তু যখন সে তার গুরুকে দেখে পূর্ণত্যাগী তখন তার মনে সাহস আসে, না আমিও একটু ত্যাগ করি। স্বামীজী আমেরিকাতে অনেকবার বলেছেন যে, টাকার বিনিময়ে যে ধর্ম উপদেশ দেয় এই রকম গুরুকে কখন বিশ্বাস করা যায় না। গুরুকে আমি দক্ষিণা দিচ্ছি কি প্রণামী দিচ্ছি সেটা আলাদা। ঠাকুর মজা করে ভক্তদের বলতেন 'এখানে প্যালা দিতে হয় না'।

আচার্য শ্রোত্রিয়মের ব্যাখ্যা করছেন *শ্রোত্রিয়ম্ অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং*, অধ্যয়ণ করে বেদ বা শ্রুতির অর্থ তাঁর বোধগম্য হয়ে গেছে। অধ্যয়ণ করা মানে শুধু প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পড়ে যাওয়া নয়। কথামৃত তো অনেকেই অধ্যয়ণ করেন। কিন্তু যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয় দ্বৈত ও অদ্বৈতের ব্যাপারে ঠাকুরের ভাব কি? কথামৃতের দুই এক পাতা পড়লে অদ্বৈতের ব্যাপারে ঠাকুরের এক রকম ভাব পাই আবার অন্য জায়গায় আরেক রকম ভাব পাবো। এবার কথামৃতে ঠাকুর দ্বৈত ভাবের উপর কি বলেছেন সেটা একটা জায়গায় লিখলাম, বিশিষ্টাদ্বৈতের ব্যাপারে ঠাকুরের কি ভাব, এবার অদ্বৈত নিয়ে কি কি বলেছেন সেগুলো সব লিখলাম, সব কটাকে এক জায়গায় জড়ো করা হল। এবার একটার সঙ্গে একটা মেলাতে শুরু করলাম। তখন পরিষ্কার হবে তাঁর আসল ভাবটা কি। গবেষণার মনোভাব নিয়ে অধ্যয়ণ করতে হয়। যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন তাঁরা ঠিক এইভাবেই পড়েন। গুরুর কাছে গেছে, গুরু অনেক খাটাখাটনি করে সব মাথায় বসিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে কোন প্রশ্ন করলে তিনি একটি কথা দিয়ে জিনিষটা বলে দিলেন। এরপর গুরু যদি পরিষ্কার করে না দেন তাহলে শিষ্যকে পরিশ্রম করে জিনিষটাকে বার করতে হবে।

ব্রহ্মনিষ্ঠমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন *হিত্বা সর্বকর্মাণি*, যত রকমের কর্ম হতে পারে সবটাকে তিনি ফেলে দিয়েছেন। এরপর আর তাঁর কোন কর্তব্য অকর্তব্যের বোধ নেই, তিনি যদি বিবাহিত হন, ঠাকুরেরই স্ত্রী ছিল, কিন্তু কোন দৃষ্টি নেই। বিয়ে করার জন্য যে তাঁর কিছু কর্তব্যবোধ আছে, সন্তান যদি থাকে তখনও কোন কর্তব্যবোধ বলে কিছু থাকবে না। সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্যের পারে চলে যান, সব কিছুতে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। কর্মের সঙ্গে জড়িত কোন কিছুতেই তিনি নিজেকে আর জড়াবেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠমের আর কি লক্ষণ? আচার্য বলছেন *কেবলেহদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা*, চুম্বকের কাঁটা যেমন সব সময় উত্তরমুখী, তাঁর মনও সব সময় একটা দিকে, অদ্বয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন দিকে তার মন নেই। আর কি? *জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ*, প্রচুর জপ করেন – যিনি সব সময় জপ করেন তাঁকে বলা হয় জপনিষ্ঠ আর ঘোর তপস্যা করেন তাঁকে বলা হয় তপোনিষ্ঠ। ঠিক তেমনি যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠ তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ। বলছেন *ন হি কর্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি*, আমি কাজও করছি আবার ব্রহ্মনিষ্ঠও আছি, এই দুটো এক সঙ্গে কখনই চলে না। আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামীজীর ঠিক এই একই সমস্যা হয়েছিল। স্বামীজীর মন স্বাভাবিক ভাবেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতে ছিল, কিন্তু ঠাকুরের আদেশে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে। ট্রামে করে যাচ্ছেন, ট্রামের মধ্যেই তাঁর মন সমাধিতে চলে যাচ্ছে। বেলুড়ে নামার কথা কিন্তু হাওড়ায় পৌঁছে যাচ্ছেন। স্বামীজীর হুঁশই নেই। সেখানে পৌঁছে গিয়ে খুব লজ্জায় পড়ে গেছেন। এবার আবার ফেরত আসছেন তখন আবার বেলুড়ে নামার জায়গায় দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে যাচ্ছেন। দুবার তাঁর আপ-ডাউন হয়ে যাচ্ছে। জোর করে কোন রকমে মনটাকে টেনে নামিয়ে রাখতেন। কিন্তু কর্মে তাঁর ক্ষমতারও ক্ষয় হচ্ছে। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজীর এক বন্ধু জিজ্ঞেস করছেন 'আপনি আগে বলতেন আমি চাইলেই কাউকে স্পর্শ মাত্রে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিতে পারি, সমাধি করিয়ে দিতে পারি'। স্বামীজী বলছেন 'বিদেশে কাজ করে করে সেই ক্ষমতা চলে গেছে। এখন ছ মাস যদি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করি তাহলে আবার ক্ষমতাটা এসে যাবে'। স্বামীজীর মত আধারের এই অবস্থা আর সেখানে আমাদের মত সাধারণ লোকেরা কাজ কর্মের মধ্যে জড়িয়ে থাকব আর বলব আমার মন ঠিক আছে। এ ভাবে হয় না। কর্ম আর আত্মজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। আচার্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকবার জোর দিয়ে বলছেন কর্ম আর জ্ঞান দুটোর মধ্যে আত্যন্তিক বিরোধ। এখানে জ্ঞান মানে জ্ঞানযোগ নয়। সবটাই কর্ম, জপ সেটাও কর্ম, ধ্যানটাও কর্ম, পূজাও কর্ম, যখন জ্ঞান বিচার করা হচ্ছে সেটাও কর্মের মধ্যে। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কর্মের যেটাই উৎপাদ্য হবে সেটাই কৃত, যেটাই কৃত তার চারটে বিকার থাকবে, যেটা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি।

বলছেন, এই রকম গুরুর কাছে বিধিবৎ যাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে আর বলবে আমি অক্ষর পুরুষের ব্যাপারে জানতে চাই। যখন এই রকম শিষ্য উপস্থিত হবে তখন গুরু কি করবেন –

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।।১/২/১৩।।
ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

(বিধিবদ্ সমীপাগত, প্রশান্তচিত্ত ও সংযেতেন্দ্রিয় সেই শিষ্যকে উক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সেই ব্রহ্মবিদ্যাটি যথাযথ ভাবে উপদেশ করবেন, যে বিদ্যাসহায়ে পরমার্থস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।)

এই মন্ত্রেও প্রকৃত গুরু ও শিষ্যের গুণ ও লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। *তস্মৈ স বিদ্বান*, গুরুকে পণ্ডিত বলছেন না, তিনি বিদ্বান। এখানে বিদ্বান মানে ব্রহ্মবিদ্, যিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। *উপসন্নায়*, এই রকম গুরুর কাছে সমীপাগত হয়েছেন সেই শিষ্য যে *সম্যক্*, সম্যক্ মানে পূর্ণ ভাবে, শাস্ত্রে যা যা গুণের কথা বলা হয়েছে সেই গুণগুলি তার মধ্যে থাকবে। কি কি গুণের কথা বলা হচ্ছে? *প্রশান্তচিত্তায়*, তার মন পুরো শান্ত থাকবে। আচার্য বলছেন *উপরতদর্পাদিদোষায়*, অহঙ্কারদি যে দোষ মানুষের মধ্যে থাকে সেই দোষ তার মধ্যে থাকবে না। প্রথমে তো *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান ব্রাহ্মণো*, সে তো সব কিছু বিচার করে দেখে নিয়েছে। এরপর শিষ্যের অহঙ্কার হয়ে গেছে। কিসের অহঙ্কার? আমি সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছি, এই ত্যাগের অহঙ্কার হয়েছে। আর তার সাথে বিনয়ের অহঙ্কার। আমি এসে গেছি, আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন। না, এই অহঙ্কার থাকলে হবে না। *সম্যক্*, সমস্ত রকমের অহঙ্কারাদি দোষ বর্জন করে খুব বিনয়ের ভাব নিয়ে আসতে হবে। আর *প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়*, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষার কথাই বলছেন অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযম করে নিয়েছে। কথামৃতে সব বর্ণনা আছে, ঠাকুরের কাছে এসে বসেছে আর কিছুক্ষণ পরেই ছটফট করতে শুরু করেছে। নিজের সঙ্গীকে ফিস্ ফিস্ করে বলছে আর কতক্ষণ! শেষে আর থাকতে না পেরে বলছে – আচ্ছা তুই বোস্ আমি না হয় নৌকাতে গিয়ে বসছি। এই ধরণের অস্থির চিত্ত নিয়ে গুরুর কাছে গেলে কিছুই হবে না। পুরো মনটা শান্ত থাকবে। পুরো জগৎ থেকে সে বিরক্ত হয়ে গেছে, কোন কিছুতেই তার আর মন নেই আর ইন্দ্রিয়গুলকে সংযম করে নিয়েছে। তখন সে বলবে, যে বিদ্যা দিয়ে সেই অক্ষরকে জানা যায় সেই বিদ্যার ব্যাপারে আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

যেনক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, যিনি ঠিক ঠিক সত্য অক্ষর পুরুষ যাঁকে উপলব্ধি করা যায়। আচার্য এখানে অক্ষরের বর্ণনা করে তিনটি অর্থ বলছেন। প্রথম অর্থ ক্ষরণ রহিত, অক্ষর মানে যাঁর ক্ষরণ হয় না। কখন চ্যুত হন না। চ্যুত না হওয়া হল, যে অবস্থায় আছেন সেখান থেকে অবস্থাচ্যুতি হয় না। মানুষ একটা অবস্থায় পৌঁছে যায় কিন্তু সেখান থেকে তার অবস্থাচ্যুতি হয়, এটাকে বলে ক্ষরণ। দ্বিতীয় ক্ষত রহিত, ব্রণ রহিত, ক্ষত বা ব্রণ মানে ঘা, তাঁকে ঘা দেওয়া যাবে না। ঘা দিতে না পারার অর্থ হল, তাঁর কোন অঙ্গকে ভঙ্গ করা যায় না। যেমন এই বোতল রয়েছে, আমি যদি চাই এর মাথাটা ভেঙে দিতে পারি। একটা বাড়িকে আমি ক্ষত করতে পারি, মানে ভেঙে দিতে পারি বা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারি। পুরো পৃথিবীটাকেও ক্ষত করে দেওয়া যায়। যখন ব্ল্যাকহোল হয়ে যাচ্ছে তখন পুরো একটা ব্রহ্মাণ্ড ক্ষত হয়ে যাচ্ছে। যে কোন জিনিষকে ক্ষত করে দেওয়া যায়, যেখান থেকে ক্ষতি শব্দটা এসেছে। কিন্তু অক্ষর হলেন ক্ষত রহিত, কারণ তিনি সর্বব্যাপী তাঁকে আমি কখনই ক্ষতি করতে পারবো না, কিন্তু শব্দটা হল ক্ষত। যার জন্য গীতায় বলছেন আগুন তাঁকে দাহ্য করতে পারে না, বায়ু তাঁকে শুষ্ক করতে পারে না, জল তাঁকে আর্দ্র করতে পারে না ইত্যাদি। তৃতীয় অর্থ হল ক্ষয় রহিত, ক্ষয় মানে নাশ। অক্ষরের এই তিনটে ক্ষরণ, ক্ষত আর ক্ষয় রহিত, 'অ' মানে নয়, ক্ষরণ নয়, ক্ষত নয় আর ক্ষয় নয়, এই তিনটে তাঁর হয় না। পূর্ণ রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত।

তাঁকে কি বলবে? *প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো*, যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি বলবে। এখানে পুরুষের একটা অর্থ করা হচ্ছে, পুরে যিনি শয়ন করেন। পুরে বলতে হৃদয়, এই শরীরের ভেতরে যিনি আছেন সেই অক্ষর

আত্মা, তাঁর ব্যাপারে শিষ্যকে উপদেশ দেবেন। বলছেন *নিস্তারণমবিদ্যামহোদধেঃ*, তুমি শিষ্যকে পার করে দেবে। কোথা থেকে? এই যে অবিদ্যার মহাসাগর, যে সাগরে সে হাবুডুবু খাচ্ছে, এটা থেকে তাকে পার করে দেবে। আমরা এখানে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে এসেছি, উপনিষদের কথা শুনছি, কিছু না কিছু সমস্যা আমাদের সবারই আছে। কিন্তু এক ঘন্টা ধরে যতক্ষণ শাস্ত্র কথা শুনছি ততক্ষণ দুশ্চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে আসছে না। জগৎট এখন অন্য রকম হয়ে আছে। জগৎ আর জগতের সমস্যা মানেই অবিদ্যা। তিন ঘন্টা ধরে যখন ক্লাস চলতে থাকে তখন আমরা একটা অন্য জগতে চলে যাই। জগৎ আর জগতের যে সমস্যা সেটা থেকে আমরা তিন ঘন্টার জন্য বেরিয়ে এসেছি। এটাই সেই অবিদ্যার সাগর যেখান থেকে আমরা এখন বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু মাত্র তিন ঘন্টার জন্যই বেরিয়েছি। যেমনি এখান থেকে বেরিয়ে বাসে উঠব, ট্রেন ধরব আবার সেই বাড়ি, আবার সেই সমস্যার মুখোমুখি, আবার সব দুশ্চিন্তা এসে আমাদের ঘিরে ফেলবে। কিন্তু অক্ষর জ্ঞানে তা হবে না, এই জ্ঞান চিরতরে আমাদের এই অবিদ্যার মহাসাগর থেকে বার করে দেবে। এরপরে জগৎ চলে যাবে না, জগৎ জগতের জায়গায় থাকবে কিন্তু আমার আপনার তাতে কিছু হবে না।

এটাই মূল কথা, *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো*, পরীক্ষা করে বুঝে গেছে কর্ম দিয়ে যা কিছু পাওয়া যায় সবটাই বেকার, যত লোক আছে এগুলোর কোন মূল্যই নেই, আমার আর এসব কিছুই লাগবে না, এই ভাব যার মনে এসে গেছে, এইবার সে যখন এই রকম শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে গেছে, তখন সেই বিদ্বান গুরু এই রকম শিষ্যকে, কি রকম শিষ্য? *প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়*, মন, চিত্ত তার শান্ত হয়ে গেছে আর তার ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে তখন তিনি এই শিষ্যকে উপদেশ দেবেন। উপদেশ দেওয়ার পর শিষ্যের কি হয়? জন্ম জন্ম ধরে যে অবিদ্যা সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, সেই অবিদ্যা সাগর থেকে এবার সে বেরিয়ে আসবে। এইখানে এসে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হচ্ছে। অপরা বিদ্যাকে নিয়ে যা যা আলোচনা করার ছিল মোটামুটি ভাবে সেটা শেষ হয়ে গেল। এরপর পরা বিদ্যার কথা বলা হবে। প্রথমে অপরা বিদ্যার কথা বলে দেওয়া হল, তারপর অপরা বিদ্যার সাম্রাজ্য থেকে বিরক্ত হয়ে যিনি বেরিয়ে আসছেন তাঁকে কি উপদেশ দেওয়া হবে এটা নিয়েই দ্বিতীয় মুণ্ডকে আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের আলোচনার শুরুতেই আচার্য বলছেন *অপরবিদ্যায়াঃ সর্বং কার্যমুক্তম্* - অপরা বিদ্যা দিয়ে যা যা হয় সব বলা হয়ে গেল। অপরা বিদ্যা দিয়ে কি কি হয়? অপরা বিদ্যা দিয়ে বেদ ও অন্যান্যা যত বিদ্যা আছে জানা যায়, অপরা বিদ্যা দিয়ে জগতের সুখ পাওয়া যায়, অপরা বিদ্যা দিয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গ পাওয়া যায়, সেই স্বর্গ থেকে আবার স্বর্গচ্যুতি হয়। অপরা বিদ্যাতে যা যা আলোচনা করার থাকতে পারে সবটাই বলা হয়েছে। *স চ সংসারো যৎসারো যস্মান্মূলাদক্ষরাৎ সম্ভবতি*, সংসারে যেটা মূল, যেটা কেন্দ্র, যেটা সার সেই মূলেরও মূলে রয়েছেন সেই অক্ষর, যাঁর কথা এর আগে আমরা আলোচনা করলাম। সংসারটা হল অপরা বিদ্যার কার্য, কিন্তু এই সংসার যাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে আর যেখানে লয় হয়, তাঁরই নাম অক্ষর। অক্ষর আর ক্ষর এই দুটো আলাদা। ক্ষরই অপরা বিদ্যার কার্য। এই ক্ষরের জন্ম অক্ষর থেকে, দাঁড়িয়ে থাকে অক্ষরে আর শেষে তার লয় হয় অক্ষরে। যেমন সমুদ্র আর তার ঢেউ, সমুদ্র হল অক্ষর আর তার ঢেউ হল ক্ষর। এই সমুদ্র থেকেই ঢেউএর জন্ম, সমুদ্রেই সে দাঁড়িয়ে থাকে আর সমুদ্রেই সে বিলীন হয়ে যায়। এই অক্ষর ব্রহ্মের আরেকটি নাম পুরুষ। আমাদের ভেতরে যিনি অন্তর্যামী তিনিই সেই পুরুষ বা অক্ষর ব্রহ্ম।

এর আগে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডেও বলছেন *তদেতৎ সত্যম্*, এখানেও বলছেন *তদেতৎ সত্যম্*। পরে এটাকে নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা করা হবে। বলছেন, যেটা জানলে সব কিছু জানা যায় সেটাই পরা বিদ্যার বিষয়, সেই পরা বিদ্যার বিষয়ের কথা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। অপরা বিদ্যা হল সংসার কার্য। অপরা বিদ্যা যা যা জিনিষ দিতে পারে, এই জগতের সুখ, স্বর্গাদি, কিন্তু এর সব কিছুই নশ্বর। অনেক দীর্ঘকাল ব্যাপী সময় নিয়ে হয়তো চলতে পারে কিন্তু সবাইকে শেষে ফিরে আসতে হবে। এগুলো নিয়ে সবই আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম মন্ত্রে অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গের উপমা দিয়ে এই অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে –

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

তদেতৎ সত্যম্ - যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।।২/১/১।।

(পরাবিদ্যার বিষয় এই অক্ষরই পারমার্থিক সত্য, যেরূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অনল থেকে অগ্নির স্বজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, সেরূপ হে সোম্য! অক্ষর থেকে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাঁতেই বিলীন হয়।)

যথা *সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ*, সুদীপ্ত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সেই আগুনের শিখা থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে। *সহস্রশঃ*, হাজারে হাজারে স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে, স্ফুলিঙ্গ নিজেও অগ্নির স্বরূপ। অনেক সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে অনেক অগ্নিকাণ্ড হতেও দেখা যায়। *তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ*, এখন গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন। শিষ্যকে বেশীর ভাগ সময় সোম্য বলে সম্বোধন করা হয়, আর যদি শিষ্যা হয় তখন সোম্যা বলেই সম্বোধন করা হয়। যেমন আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ঠিক তেমনি এই অক্ষর পুরুষ থেকে, যে অক্ষর পুরুষের ব্যাপারে জানতে চাইছ, অনেক ভাবের প্রকট হয়। ভাব বলতে বোঝাচ্ছে নানান রকমের জীব। আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়ে আবার আগুনেই লীন হয়ে যাচ্ছে, যখন কণা রূপে দেখছি তখন মনে হচ্ছে স্ফুলিঙ্গ, আবার আগুনে লয় হয়ে যাচ্ছে তখন অগ্নিই হয়ে যাচ্ছে, অগ্নি আর স্ফুলিঙ্গের মধ্যে কোন পার্থক্যই তখন আর থাকছে না। ঠিক তেমনি সেই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে হাজার হাজার ভাব উৎপন্ন হয়, তাতেই আবার লয় হয়ে যায়। আমাদের বোঝানর জন্য এই উপমা গুলো নেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর খুব প্রিয় উপমা ছিল সমুদ্র আর তার ঢেউ। বিদেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার সময় তিনি সমুদ্র আর ঢেউয়ের উপমা দিতেন। বিশাল জলধিরাশি নিয়ে সমুদ্র, তার মধ্যে হাজার হাজার ঢেউ উঠছে আবার সমুদ্রেই লয় হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার সমুদ্রেই লয় হয়।

এর আগে বলেছিলেন *তদেতৎ সত্যম্ - মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি*। ওখানেও *তদেতৎ সত্যম্* বলছেন, এখানেও *তদেতৎ সত্যম্* বলছেন। আচার্য প্রথমেই বলছেন *যদপরা বিদ্যাবিষয়ং কর্মফললক্ষণং সত্যং তদাপেক্ষিকম্*। এটাই হল মূল কথা। উপনিষদের অর্থ সমুদয়কে উদ্ধার করে ভাষ্য রচনার সময় হয়ত আচার্যের কাছেও সমস্যা হয়েছিল। একদিকে কর্মের ব্যাপারে *তদেতৎ সত্যম্* বলছেন আবার অক্ষর ব্রহ্মের ব্যাপারে *তদেতৎ সত্যম্* বলছেন। কিন্তু উপনিষদ কখন ভুল কথা বলবে না। তাহলে আমরা কি করে দুটোকে মেলাব? এইজন্যই আচার্যের দরকার হয়। যাঁরা বড় বড় পণ্ডিত তাঁদেরও এইসব মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার করতে ঘাম ছুটে যায়। একটি একটি করে মন্ত্র নিয়ে অর্থ করতে কোন সমস্যা হবে না। যখনই দুটি করে মন্ত্র নেওয়া হবে, যেমন এই দুটো মন্ত্র, এই মন্ত্রে বলছেন এটাই সত্য। কিন্তু তার আগেও তো বলেছেন এটাই সত্য। সেখানে কোনটাকে সত্য বলছেন? কর্মটাই সত্য। আবার এখানে এসে বলছেন অক্ষর ব্রহ্মই সত্য। দুটো সত্য তো হবে না। এভাবে শব্দের অর্থ করলে তো দুটো মন্ত্রকে মেলান যাবে না। হিন্দু ধর্মে এত মত, এত দর্শন, এত শাস্ত্র কেন জন্ম নিয়েছে? ঠিক এই কারণে, একজন একটা মন্ত্রেকে ধরে নিয়ে তার অর্থের উপর নিজের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে বিস্তার করেছেন আবার অন্য আরেকজন আরেকটা মন্ত্রে জোর দিয়েছেন। তাহলে কে ঠিক বলছেন? উপনিষদের একটাই রূপ, সামগ্রিক ভাব ও অর্থ এক, কোথাও কোন বিপরীতাত্মক ভাব নেই। আচার্যের ভাষ্য, কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী পড়া থাকলে উপনিষদের এই সামগ্রিক ভাব ও অর্থটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আচার্য সেইজন্য নতুন একটা শব্দ নিয়ে আসছেন, যে শব্দটি স্বামীজী বারংবার ব্যবহার করেছেন সেটা হল – আপেক্ষিক সত্য (Relative Truth)। স্বামীজী অনেকবার তাঁর ভাষণে বলছে We are not travelling from error to truth but from lower truth to higher truth।

বেশীর ভাগ ধর্মই স্পষ্ট করে good and bad, এটা ঠিক এটা ভুল, এটা ভালো এটা মন্দ, এই দুটো লাইন টেনে দেয়। বিশেষ করে খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম মূল্যবোধের দৃষ্টিতে দুটো পরিষ্কার লাইন টেনে দিচ্ছে – এটা ঠিক আর এটা ভুল। খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মে আমি যখন ধার্মিক হতে চাইছি তখন আমি ভুল থেকে ঠিকের দিকে যাচ্ছি। সংসার থেকে যখন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছি তখন আমি ভুল থেকে ঠিকের দিকে যাচ্ছি। আচার্য শঙ্কর এখানে এসে আটকে দিচ্ছেন। না, *তদেতৎ সত্যম্* জগৎ ঠিক ততটাই সত্য যতটা ঈশ্বর সত্য। সংসার তো ঈশ্বরের বাইরে নয়। কিন্তু সংসার হল আপেক্ষিক সত্য, স্বামীজী বলছেন lower truth/ relative truth। ঈশ্বরের তুলনায় তাঁর সৃষ্টিটা আপেক্ষিক। স্বামীজী বোঝানর জন্য উপমা দিচ্ছেন – এখান থেকে কেউ চাঁদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর প্রত্যেক স্তরে একটা দূরত্ব থেকে চাঁদের ছবি নেওয়া হচ্ছে, দেখা যাবে চাঁদের ছবি গুলো ক্রমাগত পাল্টাতে থাকবে। চাঁদে পৌঁছে যাওয়ার পর শেষ যে ছবিটা নেওয়া হবে, সেই ছবি দেখে আগের ছবি গুলোকে চাঁদের ছবি বলে না মানতে চায় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাহলে কোন ছবিগুলো ঠিক? সব ছবিই ঠিক, সব কটা ছবিই চাঁদের ছবি, তবে আপেক্ষিক সত্য আর ওটা পারমার্থিক সত্য। আপেক্ষিক সত্যকে অনেক সময় বলা হয় ব্যবহারিক সত্তা। যে কর্মগুলোর কথা বলা হয়েছিল সেই কর্মও ঠিক, কর্মকে যে বাদ দেওয়া হচ্ছে তা নয়। কথামৃতে ঠাকুরের উপদেশগুলো সাধারণ লোকের জন্য নয়, কথামৃত তাঁদেরই জন্য যাঁরা মনে প্রাণে একমাত্র ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাইছেন। স্বামীজী বলছেন বিরাটের পূজা, এটাই ঠিক ঠিক সাধারণ লোকেদের জন্য। স্বামীজী যে কর্মযোগের বিধান দিয়েছেন তা হল সাধারণ লোকেদের জন্য। সাধারণ মানুষ ঠাকুরের কথা পালন করতে পারবে না। যখন কাতর হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন তখন ঠাকুর বলছেন – আচ্ছা না হয় তিন দিন একান্ত বাস কর। কিন্তু কাকে বলছেন এই কথা? সাধারণ লোককে বলছেন না। কয়েকজন মহিলা উপোস করে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ঠাকুর তাদের নিষেধ করছেন, তোমরা উপোস করে এলে আমার কষ্ট হয়। কথামৃতের উপদেশ সাধারণ লোক পালন করতে পারবে না। সাধারণ লোকদের জন্য স্বামীজী বিধান দিয়ে গেছেন, শ্রীশ্রীমা যে কথা গুলো বলেছেন সেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য। কারণ তাদের দু কুলই রাখতে হবে। এগুলো পালন করতে করতে সে একটু একটু করে এগোবে। আমরা অনেক সময় ভাবি বর্তমান যুগের জন্য স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা বলে গেছেন, না তা নয়, এগুলো উপনিষদেই বলে দেওয়া হয়েছে।

কর্ম হল বিধান। তার সঙ্গে বলছেন এটাই সত্য, তুমি যা ভোগ করতে চাও এই কর্মের শক্তি দিয়েই তোমার ভোগ হবে। বলেই আবার বলছেন *তদেতৎ সত্যম্* এটাই সত্য, অক্ষর উপাসনাই সত্য। কিন্তু দুটোই সত্য কি করে হয়? আচার্য বলছেন আগেরটা আপেক্ষিক সত্য। যিনি কর্মযোগী তিনি বলবেন তোমার ব্রহ্মকেই আপেক্ষিক সত্য বলে গ্রহণ কর। দুবার যখন *তদেতৎ সত্যম্* বলা হয়েছে আর একটাই যদি ঠিক হয় তাহলে আমি আগেরটাই নেব। মণ্ডন মিশ্রের মত কর্মকাণ্ডীরা তাই বলবে, *তদেতৎ সত্যম্* ঠিকই বলছে, কিন্তু তোমাদের এই অক্ষর ব্রহ্মের উপসনা এটা আপেক্ষিক সত্য। এদের কাছে কর্মকাণ্ডই সত্য। শুধু তাই না, *মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি*, কবিরা, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাঁরা দেখেছিলেন কর্মকাণ্ডই সত্য। এখানে যুক্তিতে কোথাও ভুল কিছু নেই। যখন তর্ক হয় দ্বৈতবাদীরা তখন রীতিমত এই যুক্তিগুলোকে নিয়েই আক্রমণ শাণায়। তখন অদ্বৈতবাদীর বলবেন, তুমি যা বলছ অবশ্যই সেটা ঠিক বলছ, এটাই সত্য। তোমাকে এগুলো করতে কেউ নিষেধ করছে না। কিন্তু মনে রেখ কর্ম দিয়ে তুমি যেটাই পাবে সেটা অশাশ্বত। তুমি কি অশাশ্বতকে নিয়ে সুখ পেতে চাও? হ্যাঁ আমি অচিরন্তনকে নিয়েই সুখ ভোগ করতে চাই। এই সুখে আমার মন ভরেনি, আমি আরও সুখ ভোগ করতে চাই, আমি আরও টাকা চাই, বাড়ি চাই, গাড়ি চাই। আমার কাছে স্বর্গই শেষ কথা, আমার কাছে বউ বাচ্চা, গয়না, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় এরাই সত্য। তখন এরা বলবেন তাহলে *তদেতৎ সত্যম্*, তুমি যদি সুখ ভোগ করতে চাও তুমি যাও এখনও কর্ম করতে থাক, তোমার কাছে এখন কর্মই সত্য। বেদ মন্ত্র পাঠ কর, যজ্ঞ কর আরও তোমার শক্তি বাড়বে। কাজকর্ম করলে শক্তি বাড়বে, ঈশ্বরের পূজন পাঠন করলে আরও শক্তি বাড়বে, আর বেদ মন্ত্রাদি উচ্চারণ কর, অগ্নিহোত্রাদি কর আরও তোমার ভোগপ্রাপ্তি হবে। কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু যখন স্বর্গ থেকে তোমার পতন হবে, যখন টাকা উড়ে যাবে, তোমার বউ বাচ্চা

বন্ধু-বান্ধব মারা যাবে তখন তুমি হাউহাউ করে কাঁদবে। তুমি কি কাঁদতে রাজী আছ? হ্যাঁ আমি রাজী আছি। তাহলে যাও কর্মই তোমার বিধান। সেইজন্য আচার্য এটাকে বলছেন আপেক্ষিক সত্য। কারণ এতে তুমি যা চাইছ পাবে ঠিকই কিন্তু পরে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে। সেইজন্য এগুলোকে বলছেন নিম্ন সত্য।

উচ্চ সত্য হল যেটা আমাকে স্থায়ী ভাবে একটা জায়গায় নিয়ে যাবে। এখন আপনি বলবেন, এই জীবনটাই পরিবর্তনশীল, স্বর্গে যাব আবার স্বর্গ থেকে নামব। নেমে কোথায় যাব? পৃথিবীতেই তো আসব। খুব ভালো কথা। কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার জোর কদমে ভোগের জন্য লেগে যাব। তখন বলবেন, তাহলে তোমার জন্য ওটাই *তদেতৎ সত্যম্*। যখন তোমার ভোগ থেকে অরুচি হয়ে যাবে, যখন তোমার একটা তৃপ্তির ভাব এসে যাবে, যখন বার বার এই উপর নিচে আসা-যাওয়া করে হাজার হাজার জন্ম ভোগ করার পরে তোমার যদি চেতনা আসে তখন তুমি এই দিকে আসবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে – হ্যাঁ, ওটা আপেক্ষিক সত্য। যাদের ভোগ থেকে বিরক্তি এসে গেছে তাদের কাছে কোন দিনই আপেক্ষিক সত্য উচ্চ সত্য বলে মনে হবে না। আমেরিকাতে স্বামীজীকে একজন মহিলা বলছেন 'আমি আমার আত্মাকে দেখি আমার গয়নাতে, আমি আমার সুখ দেখি আমার নাম-যশে'। স্বামীজী বলছেন অবশ্যই আপনি আপনার গয়নাতে, সোনাতেই নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে থাকুন, হাজার হাজার জন্ম ধরে দেখতেই থাকুন। তারপর অনেক আঘাত, যন্ত্রণা পেতে পেতে যখন বুঝবেন তখন আপনার মধ্যে চেতনা ফিরে আসবে। সেইজন্য বলছেন যিনি এই কর্মগুলোকে বিচার করছেন, কর্মের দ্বারা যে সুখ তাকে বিচার করছেন, *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান ব্রাহ্মণো*, এগুলোকে বিচার করে যখন বলবে এগুলো আমার লাগবে না, তবেই আপনার জন্য আত্মা, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাই সবার জন্য নয়। এই উপনিষাদি সেইজন্য সবাইকে বলা হত না, সাধারণ মানুষ উপনিষদের তত্ত্ব গ্রহণের জন্য তৈরী নয়। যার এখন পরীক্ষা করা হয়নি, কি পরীক্ষা? এই জগৎটা একটা বেকার, জগৎটা একটা আমড়া শুধু আটি আর চামড়া, খেলে আবার অম্লশূল। এই বোধ যাদের হয়নি তাদের জন্য উপনিষদ নয়। আচার্য বলছেন, যারা এই বোধ নিয়ে পড়ে আছে তাদের জন্য *তদেতৎ সত্যম্*, আপেক্ষিক সত্য।

আচার্য স্পষ্ট বলছেন কর্মের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে সেটা আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু এখন যে *তদেতৎ সত্যম্* বলা হচ্ছে, তা পরমা বিদ্যাকে নিয়েই বলা হচ্ছে। পরমা বিদ্যাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তাই এটাই *পরমার্থ-সল্লক্ষণত্বাৎ*, এটাই পরমার্থ সত্য, এটাই শেষ কথা। সেইজন্য এই পরমা বিদ্যা নিরপেক্ষ সত্য, আপেক্ষিক সত্য নয়। নিরপেক্ষ সত্য মানে Highest Truth। এই সত্যের সাথে আর কারুর তুলনা চলে না। আচার্য দুটো সত্তাকে স্বীকার করেন – পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা। পারমার্থিক সত্তা মানে যেখানে ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। আর সেই পরমার্থ থেকে যখন সৃষ্টি আদি বেরিয়ে আসছে সেটাকে বলছেন ব্যবহারিক সত্তা। এখানে তিনি শব্দ ব্যবহার করছেন পরমার্থ সৎস্বরূপ আর আপেক্ষিক সত্য। কর্মফলের সত্য যেটা সেটাও সত্য, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য। অপরা বিদ্যা দিয়েও সত্যতে পৌঁছান যায় কিন্তু সেটা আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্য কেন? কারণ এই সত্য কর্মফলজনিত, কর্মফলজনিত যে সত্যকে পাওয়া যাচ্ছে সেটা আপেক্ষিক সত্য। সেটা যেহেতু বিদ্যার বিষয়, সেইহেতু এই বিদ্যা অপরা বিদ্যা।

পরা বিদ্যার বিষয় হল ব্রহ্মজ্ঞান। এটাই ঠিক ঠিক সত্য। পারমার্থিক সত্যের তুলনায় অপরা বিদ্যা আপেক্ষিক তাই এটা মিথ্যা। মিথ্যা বলতে আচার্য *অনৃতম্* শব্দ ব্যবহার করছেন। শুধু যে আপেক্ষিক তা নয়, *অনৃতম্*। *অনৃতম্* আবার খুব কঠিন শব্দ। মুণ্ডকোপনিষদেই পরে বলবেন *সত্যমেব জয়তে নানৃতম্*, সত্যেরই জয় হয় অনৃতর জয় হয় না। ঋতের বিপরীত হল অনৃত। অনৃত বলতে বোঝায় যা চিরন্তন নয়। জগতের যেটা সার্বভৌমিক নিয়ম বা সত্য, এটা তা নয়, সেইজন্য এটা মিথ্যা। যেটাই আপেক্ষিক সত্য সেটাকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। মিথ্যা এই বোধে, যেটা পারমার্থিক সত্য সেই তুলনায় আপেক্ষিক সত্য কিছুই নয়। সত্য বটে, কিন্তু নিম্ন সত্য। আর নিম্ন সত্য এমনই নিম্ন সত্য যে একেবারেই চলে না। পৃথিবী থেকে নেওয়া চাঁদের ছবি যেটা সেটাও চাঁদের ছবি আর চাঁদে গিয়ে চাঁদের যে ছবি নেওয়া হয়েছে সেটাও চাঁদের ছবি, কিন্তু চাঁদ থেকে নেওয়া চাঁদের ছবির তুলনায় একেবারেই মিথ্যা। সেইজন্য আপেক্ষিক সত্যকে অনৃত বলে দিচ্ছেন।

যে পরমার্থকে নিয়ে আলোচনা চলছে, সেই পরমার্থের অক্ষর তিনি *অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ*, অত্যন্ত পরোক্ষ। পরোক্ষের বিপরীত হল প্রত্যক্ষ। এই বোতল, টেবিল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, চোখের সামনেই দেখছি, এর আর অন্য কোন প্রমাণ লাগবে না। কিন্তু যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, শাস্ত্রাদিত যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন অত্যন্ত পরোক্ষ, শুধু পরোক্ষ নন, অত্যন্ত পরোক্ষ। এক্ষুণি যদি আমাকে বলা হয় দিল্লী, আমি এখান থেকে দিল্লী দেখতে পাচ্ছি না, দিল্লী আমার কাছে পরোক্ষ। দিল্লীর ব্যাপারে জানতে গেলে আমাকে অনেক রকম বিধি বার করতে হবে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান, অক্ষর ব্রহ্ম অত্যন্ত পরোক্ষ, কোন ভাবে তাঁকে জানা যাবে না। কেন জানা যাবে না? দুটো সমস্যা হয়। যে কোন জিনিষকে যখন প্রত্যক্ষীকরণ করা হয়, তখন তার দুটি শর্ত থাকবে। প্রথম শর্ত হল এই অত্যন্ত পরোক্ষ অক্ষর ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় করা, এটাকে বলে বস্তুকরণ। যেমন এই বোতল, এটা বিষয়। দ্বিতীয় প্রত্যক্ষীকরণ আরেকটা হয়, যখন মনের মধ্যে আকার তৈরী হয়। মনের মধ্যে একটা ভাব তৈরী হয়েছে কিন্তু এখনও বস্তু হয়নি। যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ার মনে মনে একটা বোতল তৈরীর পরিকল্পনা করলেন, বোতলের এই এই বৈশিষ্ট্য হবে। প্রথমে বোতলের একটা আইডিয়া তার মাথায় এসে গেল। তারপর তিনি সেটার একটা স্কেচ তৈরী করাবেন। স্কেচ করার পর এবার একজন ড্রাফটসম্যানকে দিলেন। ড্রাফটসম্যান একটা মডেল তৈরী করার পর সেটা চলে গেলে কারখানাতে। এই যে বিভিন স্তরে একটা বস্তুর বস্তুকরণের রূপান্তর হচ্ছে তার আগে একেবারে প্রথমে মনে একটা বিচার এসেছিল। মনের এই বিচারটাই একটার পর একটা স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে হয়ে গেল একটা বস্তু।

ব্রহ্মের ব্যাপারে সমস্যা হল ব্রহ্ম কখনই বস্তু নন। শুধু বস্তুই নন, মনে বিচার করে যে ব্রহ্মকে নিয়ে আসব তাও হবে না। কিন্তু বোতলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? এটা একটা শুধু বোতলই নয়, আমি যদি চিন্তা ভাবনা করি তখন মনেও আমি এর একটা বিচার নিয়ে আসতে পারব। আমি যাকে ভালোবাসি, আমি যদি চাই, মনে যদি বিচার করি তাহলে একটা ভাব রূপ পরিগ্রহ করে নেব – আহা! ও আমাকে কত ভালোবাসে। আহা! তার সঙ্গ আমাকে কত আনন্দ দিয়েছিল। আবার যাকে ভালো লাগছে না তারও একটা ভাব রূপ নিয়ে নেবে – ওঃ! ওই লোকটি আমাকে কি জ্বালাতনই না করেছিল। বিষয়ও মনের মধ্যে অনেক রূপ তৈরী করে। কিন্তু চোখের মাধ্যমে যা কিছু দৃশ্য দেখছি সেটাকে বেশী বাস্তব মনে হয়, মনের আইডিয়া গুলো একটু কম বাস্তব মনে হয়। কিন্তু যারা মনের জগতে বাস করেন তাদের কাছে সামনের বিষয় থেকে মনের আইডিয়া গুলো বেশী শক্তিশালী। উইলিয়ম জেমস্ তিনি একদিকে দার্শনিক আবার মনস্তাত্ত্বিকও ছিলেন। এগুলোর উপর তিনি অনেক গবেষণা করেছিলেন। শুধু যারা চিন্তক তাদের ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ লোকেদের কাছেও মনে যে চিন্তা গুলো হয়, যে ভাব গুলো তৈরী হয় সেগুলো বাস্তব জগত থেকে বেশী শক্তিশালী হয়। যে বাচ্চা ইঞ্জেকশানকে ভয় পায়, তাকে যদি বলা হয় কাল তোমাকে ইঞ্জেকশান দেওয়া হবে, তখন থেকেই সে ব্যাথার ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দেবে। কিন্তু ইঞ্জেকশান দেওয়াতে যে আসল ব্যাথাটা হয় সেটা তার তুলনায় অনেক কম। আমরাও যখন কোন কিছুকে নিয়ে ভয় করি তখন দেখা যায় চিন্তার জগতের ভয় বাস্তব জগতের ভয় থেকে অনেক বেশী হয়। বাস্তবে যখন ঘটে যায় তখন অতটা ভয় আর হয় না। সুখের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। মন একটা জিনিষকে ভেবে ভেবে সাঙ্ঘাতিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, মনের এতই ক্ষমতা। যেমন এক অপরকে যখন ভালোবাসে, বাস্তবে দেখতে সে হয়তো অত সুন্দরী নয়, কিন্তু মনে মনে এমন রূপ তৈরী করে নেয় যে তার শারীরিক সৌন্দর্যের ত্রুটিগুলো সরে যায়। তাই বলা হয় মনের জগৎ অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। কোন চিত্রকরকে যদি আমার একটি ছবি আঁকতে বলা হয়, আর তাকে যদি নিজের মনের মত আঁকবার স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি যে ছবিটা আঁকবেন তাতে আমার একটা মিল থাকবে কিন্তু তার সাথে অনেক বৈষম্যও চোখে পড়বে। কারণ সে নিজের দৃষ্টিতে যেটা দেখছে, তার মনের মধ্যে যে ইমেজটা তৈরী হয়েছে সেটাকেই সে আঁকবে। ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে, মন্দিরের গায়ে যেসব দেবীর মুর্তি দেখা যায় বাস্তবে কি সেই রকম কোন নারী ভারতের কোথাও দেখা যায়! বিশেষ করে দেবীদের চোখ, ওই রকম কোমর বা চোখ কোন বিউটি কুইনেও পাওয়া যাবে না। ভাস্কররা কোথায় পেলেন এই মডেল? কোথাও পায়নি, নিজের মাথা থেকে বেরিয়েছে। শিল্পী যখন কোন দেবীর কল্পনা করছে তখন সে তার সৌন্দর্য বোধকে নিয়ে আসছে। তখন

কোমরটাকে পাতলা করতে করতে এতটাই পাতলা করে দিল যার থেকে আর সরু করা যায় না। এবার তিনি সেটাকে পাথরের প্রতিমাতে বিষয়ীকরণ করে দিচ্ছেন, অথচ ওই প্রতিমার বাস্তব রূপ আমরা কোথাও পাচ্ছি না। এটা আলাদা জিনিষ।

কিন্তু ব্রহ্মের ব্যাপারে বলা হয় ব্রহ্মকে নিয়ে মন কোন আইডিয়া তৈরী করতে পারে না, তাই বস্তুতে রূপ দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই হয় না। সামনে একটা গাছ রয়েছে, বস্তু রূপে সামনে আছে। যার জন্য এর উপর দেখার কাজটা করা যায়। কিন্তু যখন মনের মধ্যে কোন আইডিয়া তৈরী করছি তখন এই দেখার কাজটাও হয় না, মনে মনেই সব কিছু হয়। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে তাও হবে না। সেইজন্য আচার্য বলছেন অত্যন্ত পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ তো দূরের কথা, অনেক জিনিষ পরোক্ষ থাকতে পারে। আমার বাড়ির প্রিয়জন আমার কাছে নেই সেখানে দেখার কোন কাজ হবে না, কিন্তু মনে মনে আমি একটা কল্পনা করতে পারি। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই কল্পনাটাও হবে না। যারা মঠ থেকে দীক্ষা নিয়ে ধ্যান করছে তখন তারা একটা মেন্টাল ইমেজ তৈরী করে, কিন্তু ঠাকুর তো তা নন। তিনি মনের কোন রূপ নন, তিনি আলাদা। মনের এই ইমেজ থেকে সরে যখন চিন্তা-ভাবনা করছে, সাক্ষাৎ তাঁর রূপ যখন আসতে শুরু হয় তখন ঠিক ঠিক ধ্যান ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করে।

যে জিনিষটা অত্যন্ত পরোক্ষ তাকে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে জানব কি করে! বেদান্তের কাছে এটি একটি সব থেকে বড় সমস্যা। প্রথম মুণ্ডকে এর আগে যেটা বলা হয়েছিল *যত্তদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্*, মানে কোন ভাবেই তাঁকে জানার পথ নেই। কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না, মনে তাঁর কোন ইমেজ তৈরী করা যাবে না, অত্যন্ত পরোক্ষ। কিন্তু তাঁকে প্রত্যক্ষ রূপেই জানতে হবে। সেইজন্য তাঁরা উপমা দেন, হাতে ফল রাখলে যেমন প্রত্যক্ষ রূপে প্রাপ্তি হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। ঠাকুর বলছেন তিনি কথা কন। ঠাকুর বলছেন, একদিন এসে আমার সাথে কত ফচকিমি, আমার আঙুল মটকে দিল। অথচ শাস্ত্র বলছে তিনি অত্যন্ত পরোক্ষ। তাঁকে তাহলে কিভাবে জানব?

আচার্য বলছেন, সেটা পরে হবে আগে তুমি উপমার সাহায্য নাও। উপমার সাহায্যে আগে বোঝ জিনিষটা কি রকম। উপমাটা কি? *যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ*, সুদীপ্ত, শুধু দীপ্ত নয় একেবারে সুদীপ্ত, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এই রকম প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। এই যে অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে সেই স্ফুলিঙ্গকে এখানে বলছেন *অবয়বাঃ*, অগ্নিরই অঙ্গ, অগ্নিরই স্বরূপ। এই সুদীপ্ত অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গের মধ্যে কি সত্যিই কি কোন ভেদ আছে? কোন ভেদ নেই। অগ্নি যা যা উপাদানে নির্মিত স্ফুলিঙ্গও সেই একই উপাদান দিয়ে তৈরী, কোন ভেদ নেই শুধু আকারে তফাৎ। এই আকারের তফাৎ আছে বলেই এনারা বলেন ব্যষ্টির স্তরে যখন মায়া কাজ করে তখন তাকে বলা হয় জীব আর সমষ্টির স্তরে যখন মায়া কাজ করে তখন তাঁকে বলছেন শিব। যখন ব্যষ্টির স্তরে কাজ করছে তখন দেখছি স্ফুলিঙ্গ আর যখন সমষ্টি রূপে থাকে তখন দেখছি সুদীপ্ত অগ্নি। দুটোর মধ্যে তফাৎ কিছু নেই, একই জিনিষ, দুজনে একই প্রপার্টি দিয়ে নির্মিত, তেমনই তার দাহিকা শক্তি, তেমনই সে বিপজ্জনক, সব কিছু একই। শুধু ব্যষ্টি আর সমষ্টিতেই পার্থক্য।

শিষ্যকে আদর করে বলছেন হে সোম্য! এই যে অক্ষর ব্রহ্মের আলোচনা করছি, যেভাবে সুদীপ্ত অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ঠিক সেই রকম *নানাদেহোপাধিভেদমনুবিধীয়মানত্বাদ্বিবিধাঃ*, নানান রকমের উপাধিযুক্ত দেহ, নানান রকমের ভাব মানে জীব এই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে জন্ম নেয়। এই যে নানান ধরণের জীব জন্ম নিচ্ছে হাতি, ঘোড়া, বাঘ, মানুষ, পোকা, কীট সব জন্ম নিচ্ছে, এরা সব উপাধি। উপাধি হল একটা কিছু রয়েছে সেটাকে আরেকটা জিনিষ দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। সেই যে শুদ্ধ ব্রহ্ম, তাঁকে আমি ঢেকে দিলাম। কি দিয়ে? একটা হাতির শরীর দিয়ে বা একটা মানুষের শরীর দিয়ে, হাতির শরীর বা মানুষের শরীরটা উপাধি। ঠাকুরও বলছেন – দেখছি সেই শুদ্ধ চৈতন্য কিন্তু তাঁর উপর একটা খোলস দেওয়া আছে। এক একটা জীব যেন এক একটা খোলস। এক একটি দেহ এক একটি উপাধি, তার ফলে অনেক রকম ভাব উৎপন্ন

হচ্ছে। ভাব বলতে এখানে বোঝাচ্ছে জীব। আসলে প্রত্যেকটি জীব এক একটি ভাব, যেমন ভাইরাস একটা ভাব, ব্যাকটেরিয়া একটি ভাব, কুকুর একটি ভাব। মানুষও ঠিক তেমনি একটি ভাব। আমরা দেখছি এক একটি মানুষ আবার এক এক রকমের।

মনে করুন অন্য কোন গ্রহ থেকে যদি কোন উন্নত জীব পৃথিবীতে আসে তারা যখন আমাদের সমষ্টি রূপে দেখবে তখন একটা ভাব নিয়েই দেখবে – এরা সবাই একই রকম। কিসে একই রকম? সবাই কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে ছুটছে। যদি শুধু মানুষকে একটি প্রজাতি রূপে দেখা যায়, তখন দেখা যাবে এই প্রজাতির মধ্যে অনেক রকম মিল আছে, যেমন মানুষ প্রজাতির মধ্যে একটা গড় উচ্চতা আছে, একটা গড় ওজন আছে, তাদের গায়ের রঙ, গঠন মোটামুটি গড় হিসাবে চলছে, হয় কালো, না হয় একটু কম কালো আর তা নাহলে একটু বেশী ফর্সা। কিন্তু জেব্রাদের মত মানুষের রঙ ডোরাকাটা নয়। ঠিক তেমনি মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি ও তার ধর্মকেও সরলীকরণ করা যাবে। একটু এদিক সেদিক হবে, তা গরুর মধ্যেও কিছু ভালো কিছু খারাপ গরুও থাকে, ওই অর্থে বলা হচ্ছে না। সেইজন্য বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি জীব যেন এক একটি ভাব।

অক্ষর ব্রহ্ম থেকে এই বিবিধ ভাব ঠিক সেই ভাবেই জন্ম নেয় যেভাবে আকাশে ঘটাকাশাদি জন্ম নেয়। এই আকাশ বলতে উপরে যে আকাশ দেখছি সেই আকাশকে বলছেন না। আকাশ বলতে বোঝাচ্ছে সূক্ষ্মতম যে তন্মাত্রা। এই গ্লাশ আছে, এই গ্লাশের ভেতরে আবার একটা আকাশ আছে। এই আকাশ আর গ্লাশের মধ্যের আকাশ দুটো আলাদা। এই গ্লাশটা ভেঙে দিলে গ্লাশের ভেতরের আকাশ যেটা বাইরের আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল সেটা বাইরের আকাশের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। গ্লাশটা যখন যেমন যেমন স্থান বদল করছে তখন গ্লাশের ভেতরের যে আকাশ আছে সেটাকে নিয়েই চলছে। কোথায় চলছে? বাইরের আকাশে চলছে। আমি যখন চলছি আমার ভেতরে সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম রয়েছেন তিনিও চলছেন। কোথায় চলছেন? সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের মধ্যেই চলছেন, তাঁর বাইরে তো আর কিছু নেই। আকাশটাই সুক্ষ্মতম, শুদ্ধ ব্রহ্ম তার থেকেও সূক্ষ্মতম। তাই সব কিছু ব্রহ্মের মধ্যেই থাকছে। এক একটি ঘট তৈরী হওয়া মানে এক একটি আকাশ তৈরী হয়ে গেল। ওই ঘটের যখন নাশ হয়ে যায় তখন সেই আকাশেরও নাশ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি এই শরীরের যখন জন্ম হয়, তখন এই শরীরের জন্মের সঙ্গেই সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের উপর যেন একটা উপাধি পড়ে গেল, তিনি যেন সীমিত হয়ে গেলেন। শরীরটা যখন নাশ হয়ে যাবে তখন সেই উপাধিটাও চলে যাবে। তাহলে মানুষ মরে গেলেই কি মুক্তি পেয়ে যাবে? না, মুক্তি হবে না, কারণ মানুষের এই বাহ্যিক স্থূল শরীরটার কোন দামই নেই। এই বাহ্যিক শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে সেই শরীরেরই গুরুত্ব। ওই সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে যে কারণ শরীর আছে তার গুরুত্ব আরও বেশী। এই কারণ শরীরটা যখন নাশ হয়ে যখন তখন সে শুদ্ধ ব্রহ্মে মিশে যায়। সেইজন্য সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হয়ে গেলেও হাল্কা একটা অজ্ঞানের পর্দা থেকে যায়, ওটারও যখন নাশ হয়ে গেল সব একাকার হয়ে গেল। আসল মুক্তি এটাই।

মূল কথা বলছেন, সব কিছুর জন্ম হচ্ছে সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম থেকে। কিন্তু কিভাবে জন্ম নিচ্ছে? উপাধি রূপে। উপাধি হল, জিনিষটা নেই কিন্তু তাকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্রে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুদীপ্ত অগ্নি আর স্ফুলিঙ্গকে ব্যাখ্যা করে আচার্য বলছেন স্ফুলিঙ্গ হল উপাধি – আসলে আচার্য ব্যাখ্যা করে বিবর্তবাদ আর পরিণামবাদের প্রভেদটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। সৃষ্টির ব্যাপারে দুটো মতবাদ আছে, একটা বিবর্তবাদ, আরেকটা পরিণামবাদ। পরিণামবাদে যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেটা সত্যিকারের পরিবর্তন হয়, যেমন দুধ থেকে দই। আর বিবর্তবাদে জিনিষটা দেখাচ্ছে অথচ নেই। যেমন দুধ থেকে আইসক্রীম বানান হয়েছে তখন এটা হয়ে গেল পরিণাম। কিন্তু এই আইসক্রীমকে যখন দশ রকমের আকৃতিতে দিচ্ছি তখন এটা হয়ে যাচ্ছে বিবর্ত। মাটির খেলনা আমাদের শাস্ত্রের খুব প্রচলিত উপমা, মাটি থেকে যখন খেলনা তৈরী হচ্ছে তখন তা হয়ে যাচ্ছে বিবর্ত। মাটির উপর নাম আর রূপ এসে যাচ্ছে, মাটির হাতি, ঘোড়া, পুতুল এগুলো মাটির নাম রূপ, সেইজন্য একে বলা হয় বিবর্ত। এখানে কোন বিকার হচ্ছে না, সেইজন্য এটাকে পরিণামবাদ বলা যাবে না। এখানে ঠিক এই কথাই বলছেন, সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই আছেন কিন্তু

তাঁর উপর যেন কতকগুলো উপাধি এসে গেছে। কি রকম? সেই আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। এই মাটিকে কুমোর যন্ত্রাদির সাহায্যে একটা ঘটে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। ওই ঘট তৈরী হওয়ার পর ঘটের মধ্যে একটি আকাশ তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আকাশটা ঘট তৈরী হওয়ার আগে কোথায় ছিল? ওখানেই ছিল। ঘট এখন বাইরে থেকে এসে গেছে, এসে আকাশে জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ঘটটা নাশ হয়ে গেলে আকাশ যেখানে ছিল ওখানেই থাকবে। কিন্তু ঘট যখন ছিল তখন আমার মনে হচ্ছিল ঘটের ভেতরে একটা আকাশ আছে। এটাই হল বিবর্তবাদ।

স্বামী নিখিলানন্দ একটা খুব সুন্দর উপমা দিতেন। ধরুন একটা সমুদ্র বা একটা বড় পুকুর রয়েছে। কোন কারণে পুরো পুকুরটা বরফ হয়ে গেছে। কিন্তু বরফ হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে বরফের জায়গায় জায়গায় কিছু ছিদ্র হয়ে গেছে। সেই ছিদ্র দিয়ে তলার জলটা দেখা যাচ্ছে। কোনটা বড় ছিদ্র, কোনটা ছোট ছিদ্র। সেই জল হল শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আর বরফটা হল মায়া। জল থেকেই বরফ হয়েছে, বরফটা যেন মায়া আর ছোট বড় ছিদ্র গুলো যেন জীব। আমি যদি এখন ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করে দিই তাহলে কি থাকবে? যা জল ছিল তাই থাকবে। পুরো বরফ যদি গলে যায় সব ছিদ্রই শেষ হয়ে যাবে। তখন সেই জলই থাকবে, শুদ্ধ ব্রহ্মই থাকবেন। আর মায়া যদি বেড়েও যায় তাতে কি হবে? কিছুই হবে না, যিনি ছিলেন তিনিই থাকবেন। এখন একটা ছিদ্র যদি কোন ভাবে নাশ হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি হবে? কিছুই হচ্ছে না, ওই জীবটা চলে গেল, মানে ওই জীবের খেলা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বাকি গুলো থেকেই যাবে। স্বামীজীও এই জিনিষটাকে বিভিন্ন উপমা দিয়ে বোঝানর চেষ্টা করেছেন। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু শুদ্ধ সচ্চিদানন্দে একটা যেন আবরণ পড়ে। যারা খুব ভক্তিমান তারা আবার এগুলো মানতে চায় না, আবরণ-টাবরণ কিছু নয় এগুলো সব শক্তির খেলা, এটা তাঁরই শক্তি। তাঁরই লীলা, ঈশ্বরের আবার অজ্ঞান কিসের! কিন্তু বেদান্ত তো অজ্ঞান বলছে না, এটাকে বলা হয় মায়া। মায়া কেন হয় কি কারণে হচ্ছে এগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইজন্যই এটাকে মায়া বলা হচ্ছে। এই মায়ার দরুণ জলটা বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। ওই বরফেই আবার হয়ে গেল হাজার হাজার ছিদ্র। ওই ছিদ্র দিয়ে বরফের ভেতরে জল দেখা যাচ্ছে। এই প্রত্যেকটি প্রাণী ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে সমস্ত জীবই হল যেন এক একটি ছিদ্র। ঠাকুরও উপমা দিচ্ছেন, একটা বিরাট বাগান, বাগানের চারিদিকে প্রাচীর। সেই প্রাচীরে অনেক ধরণের ফুটো আছে। ওই ফুটোতে চোখ রাখলে দূরের দিগন্ত বিশাল অনন্ত কে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি জীব যেন এক একটা ফুটো। কিন্তু আমি যখন আপনার দিকে তাকাচ্ছি, তখন কি আমার মনে হয় আপনার মধ্যে আমি ঈশ্বরের ভাব দেখছি? মনে হয় না। কারণ এটা অত্যন্ত ছোট ফুটো তাতে আবার মাকড়সার জাল। যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দিকে তাকাচ্ছি তখন সেটা যেন একটা বড় ফুটো। সেই বড় ফুটো দিয়ে ব্রহ্মকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেটাও সীমিত, পুরোটা আমি কোন দিনই দেখতে পাব না। ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ককে বোঝানর জন্য এগুলো হল নানা রকমের উপমা। সুদীপ্ত অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গ দুটো একই। জীব আর ব্রহ্মের মধ্যে সাধারণ মিল হল চৈতন্যে। আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যে কোন জায়গাটায় এক? চৈতন্যে। মূলে অর্থাৎ একেবারে কেন্দ্রে কোন তফাৎ নেই। যেমন অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গে কোন তফাৎ নেই।

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি, সেই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে নানান ভাবের উৎপত্তি হচ্ছে। ভাব বলতে বোঝাচ্ছে জীব। হাতি বলতে আমরা একটা জিনিষ ভাবছি, ভেড়া বলতে আরেকটা জিনিষ ভাবছি। এই যে নানান ভাব, তার যে স্থূল রূপ সেটার জন্ম হচ্ছে সেই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে। শুধু জন্মই হচ্ছে না, *চৈবাপিযন্তি,* যখন প্রলয় আসে তখন লয়টাও সেখানেই সেই অক্ষর ব্রহ্মেই হয়। জলের বুদ্বুদের উপমা দিয়ে এটাকে বোঝান হয়, জলের বুদ্বুদ জল থেকে জলের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে আবার জলেই মিলিয়ে যাচ্ছে। জলের ঢেউ, জল থেকেই উঠছে আবার জলেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্ম আর জীবের ঠিক এই সম্পর্ক।

সৃষ্টিকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই জায়গায় এসে অন্যান্য দর্শন তার নিজের নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আচার্যের মত একেবারে দৃঢ় – সৃষ্টি আছে এই নিয়ে কোন আপত্তি নেই। বেদান্তকে

বুঝতে গিয়ে অনেকে ভুল বুঝে বসেন, তারা বলেন বেদান্ত নাকি বলে সৃষ্টি বলে কিছু নেই। বেদান্তের ব্যাপারে এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা, বেদান্ত পুরোপুরি সৃষ্টিকে মানছে। কিন্তু মেনে নিয়ে বলছে এটা আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্য বলে এটা অনৃত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে জিনিষগুলো সত্য রূপে বিদ্যমান, আর যে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চলছে, এই সত্যকে বলা হয় ঋতম্। স্বামীজী ঠাকুরের মন্ত্রে ঠাকুরকে বলছেন – *ওঁ হ্রীং ঋতম্*, ঠাকুর ওঁ, মানে তিনি সেই ব্রহ্ম, হ্রীং ঠাকুরই শক্তি আর ঠাকুরই ঋতম্, ঋতম্ মানে যে সূক্ষ্ম শক্তি যেটা সত্য, যেটা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু চলছে। ওই সত্যের শক্তি যখন পদার্থ বিজ্ঞানে নিয়ে আসা হয় তখন আমরা বলি ফিজিক্সের নিয়ম। গরুর দুধ দেওয়া, বৃক্ষে ঠিক সময় ফল হওয়া, ঠিক সময় বৃষ্টি, রোদ, শীত হওয়া এই সব কিছুই হয় ঋতমের জন্য। কিন্তু কোন কিছু যদি ঋতমের মধ্যে না আসে তাহলে সেটাকে বলা হবে অনৃতম্। অনৃতম্ শব্দকে অনেক সময় মিথ্যার অর্থেও নেওয়া হয়। জিনিষটা থাকতে পারে কিন্তু কোন কাজ দিচ্ছে না, একটা গরু আছে কিন্তু এখন দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, এটা এখন অনৃতম্, ঋতমকে আর সে পালন করছে না। এগুলো হল যা আমাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সব সময় আসছে। কিন্তু উচ্চতম অবস্থায় ঋতম্ মানে, যেখানে ধর্ম আর কর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে এক।

স্ফুলিঙ্গের বাস্তবিক ধর্ম আগুনেরই ধর্ম, ঠিক তেমনি যত জীবের উৎপত্তি হচ্ছে সব জীবের যে বাস্তবিক স্বরূপ তা হল সে ব্রহ্মের সঙ্গে এক। কিন্তু শক্তির তফাৎ, আচার্য অবশ্য শক্তির তফাৎ বলছেন না, তিনি বলছেন উপাধির তফাৎ, ঠাকুর বলছেন শক্তির তফাৎ। বেদান্ত মতে শক্তি না বলে উপাধি বলা হয়। যখন মাটিকে এদিক ওদিক করে হাতির রূপ ও নাম দিয়ে দেওয়া হল তখন সেটা একটা উপাধি হয়ে গেল, যখন ইঁদুরের রূপ ও নাম দিয়ে দেওয়া হল তখন এটা একটা উপাধি হয়ে গেল। নাম ও রূপের উপাধি এটাই হাতি আর ইঁদুরকে আলাদা করে দিচ্ছে। কিন্তু বস্তুত দুটোই এক। এটাই দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য। এই মন্ত্রে সৃষ্টির ব্যাপারে বিবর্তবাদ আর পরিণামবাদের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিণাম রূপে নেওয়া হয়। সৃষ্টিতে কার্য কারণের সম্পর্ক থাকে। একমাত্র বেদান্ত সৃষ্টিকে বিবর্ত বলে। বিবর্তে জিনিষটা আছে অথচ নেই। বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যবাদ মানে যা কিছু আছে সবটাই মিথ্যা, আসলে কিছুই নেই সব শূন্য। কিন্তু বেদান্ত বলছে জিনিষটা আছে, সমুদ্র সত্য কিন্তু তার ঢেউটা মিথ্যা।

আমরা এখন উপনিষদের এক গূঢ় তত্ত্বের ভিতর দিয়ে চলেছি। এই জিনিষগুলোকে বোঝা ও ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। তবে বারবার অধ্যয়ণ করতে করতে, চিন্তন মনন করতে করতে আস্তে আস্তে ধারণা হতে শুরু হয়। উপনিষদ যারা অধ্যয়ণ করবেন তাঁদের জন্য কতকগুলো শর্ত আগে থাকতেই কঠোর ভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, মন যেন কোন ভাবেই চঞ্চল না থাকে আর ইহকাল আর পরকালের কোন কিছুর প্রতি যেন কোন এষণা না থাকে। এই গুণগুলো যদি না থাকে, কিছুতেই এই মন্ত্রগুলোর অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ ধারণা করা যাবে না। তবে শুনতে শুনতে একটা সংস্কার অবশ্য তৈরী হবে।

এবার এই অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলে একই নামে দুটো আলাদা জিনিষকে নিয়ে আসা হয়েছে, অর্থাৎ দুটো অক্ষরের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে বলছেন অব্যাকৃত অক্ষর। অব্যাকৃত অক্ষর হল, নাম রূপের যত উপাধি হয়েছে, যা কিছু আমি দেখছি, যা কিছু আমি কল্পনা করছি এগুলো সবই উপাধি। এই অব্যাকৃত অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ অক্ষর। গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়েও ঠিক এটাই বলছেন *দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব* চ, একটা হল ক্ষর, আরেকটি হল অক্ষর। যা কিছু বিনাশশীল সেটাই ক্ষর। এই বিনাশশীল থেকে শ্রেষ্ঠ হল অক্ষর। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোল নম্বর শ্লোকে যে অক্ষরের কথা বলা হচ্ছে সেটা প্রকৃতিকে বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে এই অক্ষরকে সগুণ ঈশ্বর বলা হচ্ছে। সগুণ ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, তিনি মালিক, আমি আর শ্রীকৃষ্ণ এক নয়। যারাই বেদান্তের কথা এদিক ওদিক থেকে একটু শুনে নিয়েছে তারাই এখানে এসে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। যখনই আমি বোধ আসছে তখনই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান। আমি আর ঈশ্বর এক নয়। এই সগুণ ঈশ্বর হলেন *অব্যাকৃতসংজ্ঞক অক্ষর*, যাঁর কোন বিকৃত হয় না। কিন্তু তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন উৎকৃষ্ট অক্ষর, গীতায় যেখানে ভগবান বলছেন *উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ*। সগুণ ঈশ্বর থেকেও উৎকৃষ্ট

নির্গুণ ঈশ্বর। কেন উৎকৃষ্ট এটা পরের আলোচনায় আসবে। যেসব ব্রহ্মচারীরা উপনিষদ অধ্যয়ণ করতে যেতেন তাঁদের আগে থেকে এত প্রস্তুতি থাকত যে তাঁরা এই তত্ত্বগুলো চটপট বুঝে নিতেন। এখানে এসে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীদের বিতর্ক লেগে যায়। দ্বৈতবাদীরা বলবেন শ্রীকৃষ্ণই সত্য, শ্রীকৃষ্ণেরই একটা রূপ নির্গুণ। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলবে শ্রীকৃষ্ণের আসল রূপ নির্গুণ, তাঁরই একটা রূপ সগুণ। আচার্য বলছেন সগুণ ঈশ্বর থেকে শ্রেষ্ঠ নির্গুণ ঈশ্বর।

এই নির্গুণ ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য কি? আকাশের মত আকারহীন। আকাশের কোন আকার থাকে না, আকাশে যে বস্তুই রাখা হোক না কেন আকাশ তারই রূপ ধারণ করে নেবে। এই নির্গুণ ঈশ্বরকে একমাত্র জানা যায় নেতি নেতি করে। নির্গুণ ঈশ্বরকে আচার্য বলছেন *অক্ষর পরমাত্মা – পরাদক্ষরাৎপরং*। আচার্য যদিও এখানে বলছেন এই নির্গুণ নিরাকার অক্ষর পরমাত্মাকে পাওয়ার একমাত্র পথ নেতি নেতি, কিন্তু গীতায় এই মতটাকে পাল্টান হয়েছে। উপনিষদ যখন রচনা হয়েছে, তখন ঋষিরা যখন নির্গুণ নিরাকারের কথা বলছেন, তখন একেবারে পরিষ্কার বলছেন নেতি নেতি পথ ছাড়া নির্গুণ নিরাকারে পৌঁছান যায় না। নেতি নেতি মানে, সব কিছুকে বিচারের মধ্যে নিয়ে আসতে বলা হচ্ছে, সাথে সাথে উপনিষদে যে ভাবগুলো বলে দেওয়া হয়েছে, এবারে দেখতে হবে সেই ভাবগুলোর সাথে যেগুলোকে বিচারের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে সেগুলোর সাথে মেলে কিনা। যদি না মেলে তাকে তৎক্ষণাৎ ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ফেলতে ফেলতে শেষে দেখা যাবে সগুণ ঈশ্বর যিনি বিচারের মধ্যে আসছেন তাঁকেও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন রূপ টুপ সব উড়ে যায়। তাহলে রূপ কি মিথ্যা? না, কখনই তা বলা হচ্ছে না। কিন্তু নেতি নেতি করে যখন শেষ ধাপে পৌঁছে যায় তখন রূপ টুপ সব উড়ে যায়। তোতাপুরী যখন ঠাকুরকে বেদান্ত মতে নেতি নেতি করে ধ্যান করে নির্বিকল্প সমাধিতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন ঠাকুরের সামনে মা কালীর রূপ এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর জ্ঞান খড়্গ দিয়ে, জ্ঞান খড়্গ মানে এই নেতি নেতি, মা কালীর রূপকে দ্বিখণ্ডিত করে নির্গুণ নিরাকারের অখণ্ডে লীন হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেলেন। তাই বলে মা কালী কি মিথ্যা? কোন মতেই নয়। তিনিই সত্য, কিন্তু নেতি নেতি দিয়ে যখন সাধনা করা হবে তখন এই রূপটাও থাকবে না।

আমাদের এখন যে মত বা ঠাকুর স্বামীজীর যে ভাব বা পরে ভক্তিতে যে মতটা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে এটাই বলা হচ্ছে যখন আমরা যে সগুণ ঈশ্বরের সাধনা করছি, যখন আমরা যে ইষ্টের মন্ত্র জপ করছি তখন তিনিই দর্শন দেবেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করেন নেতি নেতি করে যেখানে পৌঁছায়, নিজের সেই স্বরূপটাও আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন, যেটা মুক্তির কারক। আচার্যের মতে যতক্ষণ নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভূতি না হয়ে যায় ততক্ষণ কারুরই মুক্তি হবে না। আচার্যের মত হল বেদান্তের নেতি নেতি মত, নেতি নেতি করে সব কিছুকে উড়িয়ে দিতে হবে। জগৎ, কামিনী-কাঞ্চনের কথা ছেড়ে দিন, ওখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে এগুলো আমি একেবারে উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। এটাও ধরে নেবে *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্* করে এসেছে, যা কিছু কর্ম দিয়ে পাওয়া যায় সব পরীক্ষা করে উড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এগুলো সে আগেই উড়িয়ে দিয়ে এসেছে, গুরুর কাছে তারপরে এসেছে। এই অবস্থায় পৌঁছানর পর সে গুরুর কাছে এসেছে, গুরু এবার তাকে যেখানে নিয়ে যেতে শুরু করেছেন, সেখানে যাওয়ার পথে তার যা কিছু প্রিয় জিনিষ, কি কি প্রিয় জিনিষ? তার শরীর প্রিয়, তার মন প্রিয়, তার গুরু প্রিয়, তার ইষ্ট প্রিয়, এগুলোকেও নেতি নেতি করে উড়িয়ে দেবেন।

এই জায়গাটা অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা, এগুলো আমাদের ধারণাতীত। আমরা ভাবি আধ্যাত্মিক সাধনা মানে কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকা, নাম-যশ থেকে দূরে থাকা, ভোগ-বাসনা থেকে দূরে থাকা। না না, ওনারা বলবেন গুরুর কাছে যখন যাবে তার আগেই যেন এগুলো তোমার হয়ে থাকে। শুধু তাই না, মৃত্যুর পরে যে সুখ ভোগ হতে পারে, সেগুলোও তোমার ত্যাগ হয়ে গেছে। এখান থেকে নেতি নেতি শুরু হবে। নেতি নেতি শুরু হওয়া মানে আসল অন্তর্মুখী যাত্রা শুরু হল – আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই। দেহ তো আগেই ফেলে দিয়েছে। এই ভাবে ফেলতে ফেলতে শেষ একটা অবস্থায় গিয়ে নিজেকে দেখছে আমি মায়ের সন্তান, ঠাকুরের সন্তান, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত – এবার সেটাকেও উড়িয়ে দিচ্ছে। আচার্য বলছেন জ্ঞান লাভ ও মুক্তি এ ছাড়া গতি

নেই। ঠাকুর কিন্তু বলছেন আর গীতাতেও শ্রীধরস্বামী তাঁর টীকাতে বলছেন ঈশ্বর চাইলে তিনি মুক্তিও দিতে পারেন। মধুসুধন সরস্বতি দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটাই বলছেন ভক্তিমার্গ সহজ মার্গ। কেন সহজ মার্গ? একটা হল মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবণতা সেটা এই ভক্তিমার্গ দিয়ে সহজে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ভক্তিমার্গের গোঁড়া সমর্থকরা আবার বলে যারা ভক্তি দিয়ে যায় তাদের দুটি লাভ, একটি সাধনা করে দুটি জিনিষ পেয়ে যায়। প্রথমে ভক্তিটা আস্বাদ করে পরে মুক্তিটাও আস্বাদ করে, কিন্তু যারা মুক্তি সাধনা করে তারা শুধু মুক্তি পায়।

কিন্তু যারা মুক্তির স্তরে চলে গেছেন তাদের কাছে এগুলো সবই তাৎপর্যশূন্য হয়ে যায়। ঠাকুর নিজেও বলছেন উগুনো আমার এখন আলুনি লাগে। তিনি মা কালীর মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তাহলে ভক্তিমার্গ দিয়ে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কি লাভটা হল! এগুলো খুব উচ্চস্তরের কথা। কিন্তু এখানে বলার তাৎপর্য হল সাধনা করে কেউ সগুণ ঈশ্বর পর্যন্ত পোঁছাতে পারবে, যার বিকার এই জগৎ। কিন্তু তাঁরও পেছনে যিনি আছেন, তাঁর থেকে যিনি উৎকৃষ্ট সেই নির্গুণ নিরাকার, সেখানে পৌঁছানর একমাত্র পথ নেতি নেতি। কারণ তাঁর কোন স্বরূপ নেই। কিন্তু যিনি সগুণ ঈশ্বর তাঁর স্বরূপ রয়েছে। সগুণ ঈশ্বরের সাধনা নানান ভাবে করা যায়। তবে এখন ভক্তিমার্গের এখন প্রচলিত ধারণা যাঁরা ভক্তি করেন তাঁরা মুক্তিও পান, এই মুক্তি এখানেই হয়ে যাবে, মৃত্যুর পরে যে হবে তা নয়। আবার ভক্তরা তারও উপর দিয়ে যায়, তারা বলে আমাদের মুক্তি দরকার নেই, আমরা মুক্তি চাইনা আমরা ঈশ্বরের লীলা আস্বাদন করতে চাই। যাই হোক এগুলো অন্য কথা, উপনিষদের আলোচনাতেই আমরা ফিরে আসছি। এই যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, যা পরা বিদ্যার বিষয় আর তার যে সাধনা হয় এবং তার যে সিদ্ধি হয় এইবার তার বর্ণনা দ্বিতীয় মন্ত্রে করা হচ্ছে।

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।।২/১/২।।

(যেহেতু সর্বাবয়বরবিবর্জিত জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর ও বাহিরে বিদ্যমান, সেইহেতু তিনি জন্মরহিত, প্রাণশূন্য ও মনোহীন হওয়াতে তিনি শুদ্ধ এবং সেই জন্যই তিনি অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ।)

ব্রহ্মের পারমার্থিক স্বরূপ যেটা সেটা সব সময় দিব্য। দিব্য মানে স্বয়ং প্রকাশ। যখন দিব্য বলা হয় তখন স্বাভাবিক ভাবে বুঝে নিতে হবে স্বয়ং প্রকাশের কথাই বলা হচ্ছে। কোন বস্তুকে দেখার জন্য আলোর দরকার হয়, কিন্তু যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম তিনি স্বয়ং প্রকাশ, তাঁকে অন্য কোন আলো দিয়ে আলোকিত করতে হয় না। বরঞ্চ তাঁর আলোকেই বাকি সব কিছু আলোকিত হচ্ছে। কঠোপনিষদে বলছেন *ন তত্র সূর্য ভাতি ন চন্দ্রতারকং*, ব্রহ্মকে কেউ আলোকিত করে না। আচার্য আবার আরেকটা অর্থ করছেন, যদি *দিব্যো* শব্দকে দিবি থেকে নেওয়া হয় তখন দিবি শব্দের অর্থ হবে যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন বা অলৌকিক। এখানে অলৌকিক শব্দের অর্থ হল এই লোকের নয়। আচার্য যখন নিজের ভাষ্য লিখছেন তখন একটা শব্দের যত রকম অর্থ হতে পারে তার সব রকম অর্থই স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। এই লোকের নন, মানে সৃষ্টির কোন বস্তু তিনি নন, সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই, তিনি নিজেই নিজের স্বরূপে অবস্থিত। স্বরূপে অবস্থিত মানে, সেখান থেকে কোন সৃষ্টিও হয় না, আর তিনি এই জগতেরও কোন বস্তু নন। আমরা যেমন বলি ঈশ্বর এই জগতের বা এই জগতে আছেন, এই ধরণের কিছু বলা যাবে না। আর স্বরূপ থেকে তাঁর কখন চ্যুতি হয় না, যেমন অক্ষর বলছেন তখন তাঁর যেমন অর্থ হয় তাঁর কোন ক্ষরণ হয় না, সেই রকম ব্রহ্মেরও কোন চ্যুতি বা ক্ষরণ হয় না।

এই স্বরূপে অবস্থিত কি করে হয়? দিব্য কেন তিনি? *হি অমূর্তঃ*, কারণ তিনি অমূর্ত। মূর্ত মানে যার মূর্তি আছে, মূর্তি মানে যার কোন রূপ আছে আর অমূর্ত মানে, যত ধরণের রূপের যত কল্পনা করতে পারা যেতে পারে তার কোনটা দিয়েই তাঁকে কল্পনা করা যাবে না। ব্রহ্মকে কোন রকমের আকার বা রূপ যে দিয়ে দেব, এটা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এমন কি স্বামীজী বলছেন – আমরা যখন অনন্তের উপাসনা করি তখন ভাবি একটা আকাশ বা একটা বিরাট সমুদ্র, কিন্তু সেটাও অমূর্ত নয়। অনন্ত আর বিরাটের মধ্যে একটা তফাৎ

আছে। আমি যতই সুন্দর ভালো মূর্তির কল্পনা করি না কেন, যত বিরাটেরই কল্পনা করি না কেন, কিন্তু সেটা সব সময় মূর্ত হবে, অমূর্ত হল যাঁর কোন স্বরূপের কল্পনা করা যায় না। সেইজন্য বেশীর ভাগ সময় যখন আমাদের ঐতিহ্যে ভগবানের কোন নাম দেওয়া হয়, তখন সেই নামের যে অর্থই দেওয়া হোক না কেন, এমন ভাবে নাম দেওয়া হয় যে কোন অবস্থাতেই যেন তাঁর কোন রূপ না দাঁড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরের দিকে অন্য ভাবে ঘুরিয়ে বলা হয় শিব মানে যা, বিষ্ণু মানেও তাই, কৃষ্ণ মানেও তাই। কখন বলবেন তিনি অন্তর্যামী সবারই অন্তরে বাস করেন, কখন দেখাবেন যিনি সব জীবকে নিজের ভেতরে টানছেন, কখন দেখাবেন তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছেন – এগুলোর কোনটাতেই রূপ দেখান হয় না। হিন্দুরা ঈশ্বরের আরাধনা এভাবেই করে আসছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এত উঁচু ভাব, ভগবানের রূপ নেই, তিনি অমূর্ত, এগুলো কল্পনা করতে পারেনা। তাই শিব, বিষ্ণু সবারই একটা রূপ দেওয়া হয়।

পুরুষঃ, এখানে পুরুষ মানে তিনি সব দিক থেকে পূর্ণ। কোথাও কোন ধরণের কোন ফাঁক নেই। পুরুষের দ্বিতীয় অর্থ হল, এই শরীরটা একটা পুর মানে নগরী। ভাগবতে এবং পরে অন্যান্য শাস্ত্রে এই নগররূপী পুরুষের খুব কাব্যিক বর্ণনা করা হয়েছে। এই শরীর একটা যেন নগর, এর নয়টি দ্বার আছে, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি, এই নগরীর একজন রাজা আছেন। শহর যেমন ছোট বড় হয়, ঠিক তেমনি এই শরীর যেন একটা ছোট্ট শহর, আর এই ছোট্ট শহরে যিনি বাস করেন তিনি চৈতন্য। কিন্তু শরীরকে কাটা ছেঁড়া করলে এর মধ্যে সেই চৈতন্যকে কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, চৈতন্য রূপে তিনি এই শরীরে বিরাজমান। যেমন এই বইয়ে ছাপা অক্ষরে জ্ঞান রূপে বিদ্যা বিরাজমান। একবার উঁই পোকারা বলছে মানুষের এত বুদ্ধি কেন? বলা হল মানুষ বই পড়ে বলে এত বুদ্ধি তাদের। উঁই পোকারা ভাবছে বই পড়ে কি করে এত বুদ্ধি হয়, ঠিক আছে চল আমরাও বই পড়ব। এবার হাজারে হাজারে উই পোকা পৌঁছে গেলে একটা ছাপাখানায়। ছাপাখানায় যত বই ছিল সব বই খেয়ে নিয়েছে। খাওয়ার পর দেখছে মানুষ যা করে তার থেকে বেশী করেও আমাদের কোন বিদ্যা বুদ্ধি হল না। বুদ্ধি কি কাগজের ছাপা অক্ষরে আছে না তার কালিতে আছে? ঠিক তেমনি আমাদের এই শরীরকে যতই কাঁটা ছেড়া করা হোক না কেন কোন দিন চৈতন্যকে খুঁজে পাবে না। এই পুরুষের অর্থ হল এই পুররূপী দেহে যিনি বাস করেন তিনিই পুরুষ।

বিজ্ঞান আর ধর্মের মধ্যে খুব পুরনো ঝামেলা চলে আসছে। বিজ্ঞান বলে একটা জিনিষকে টুকরো টুকরো করে সব কটাকে মিলিয়ে সেই জিনিষটাকে আবার দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। যেমন এই মাইক্রোফোন, এর সব কিছুকে আলাদা করে দেওয়া যায়, যখন আবার সব অংশ গুলোকে এক সঙ্গে করে দেওয়া হবে তখন আবার মাইক্রোফোনে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক তেমনি মানুষ, এর যত টুকরো হতে পারে, হাত, পা, মাথা, চোখ, কান, পেট সব এক সঙ্গে করে দিলে এটাই মানুষ হয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে আছে wholeism, এর মানে অংশ মিলিয়ে যে সামগ্রিক পাচ্ছি, মূল সামগ্রিক তার থেকে বেশী হবে। আমাদের শরীরের যত অংশ আছে তার সব কিছু আলাদা তৈরী করে যদি জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় তাতে একটা জিনিষ বাদ থাকবে। বিজ্ঞান এটাকে মানবে না, অথচ মরা মানুষকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান দাঁড় করাতে পারেনি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যদি মরা মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় তাহলে কি আমাদের বেদান্তের কোন সমস্যা হবে? কিছুই হবে না। বলবে চৈতন্য ঢুকে গেছে। ইদানিং যে ক্লোনিং হচ্ছে এতেও বেদান্তের কোন সমস্যা নেই। টেস্ট টিউব বেবী হওয়ার পর ইসলাম খ্রীশ্চান ধর্ম সমস্যায় পড়ে গেছে। আমাদের যদি বলে আমরা বলে দেব, আরে ভাই আমাদের দ্রোণাচার্য তো কলসী থেকেই জন্ম নিয়েছে। আর শুকদেবের তো কোন গর্ভধারিণীই ছিলেন না। তাঁর পিতা ব্যাসদেব তাঁর কাম-বাসনাকে অগ্নিতে স্থাপন করলেন আর সেই অগ্নি থেকে শুকদেবের জন্ম হয়ে গেল। বিজ্ঞানের ইদানিং কালের সব আইডিয়া গুলো আমাদের কাছে অনেক পুরনো।

আমাদের কাছে এই শরীরটা অত্যন্ত নিম্ন শ্রেনীর, এগুলো আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। বিজ্ঞান যদি একটা মরা মানুষকে বাঁচিয়েও দেয় বেদান্তের কাছে কোন সমস্যাই হবে না। হবে না কেন? একটা আত্মা প্রবেশ করে গেছে। শঙ্করাচার্য তো হাজার বছর আগে ঠিক এই ব্যাপারটা নিজেই ঘটিয়েছিলেন। তিনি এক মৃত

রাজার শরীরের প্রবেশ করে রাজা হয়ে গিয়েছিলেন। এতে নতুনত্ব কি আছে! কিন্তু সাধারণ অবস্থায় করতে পারছ না। কারণ চৈতন্য যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ মানুষ মানুষ নয়। একটা মানুষ মরে গেলে আমরা হৃদ্দ বলতে পারি তার হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, তার মস্তিষ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে হলটা কি! চৈতন্য, আত্মা সে তো চলে গেছে, চলে যাওয়াতে এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বা এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বলে তিনি এই শরীরটা ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। এক অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। একটা মানুষের গলা কেটে দিলে তার শরীরের ক্রিয়াকলাপটাই বন্ধ হয়ে যাবে। পাখাটাকে ভেঙে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকলেও পাখা আর ঘুরবে না। পাখা ঘুরতে হলে তার দুটো জিনিষই দরকার পড়বে। এখানে বেদান্ত বলছে বিদ্যুৎ আছে বলে পাখাটা আছে। পাখার ব্লেডগুলো যদি ভেঙে বেঁকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বিদ্যুৎ থাকা সত্ত্বেও পাখা আর ঘুরবে না। তাহলে কোনটার গুরুত্ব, দুটোরই গুরুত্ব আছে, শরীরটাও লাগবে আর চৈতন্যকেও লাগবে। কিন্তু শরীরটা কম গুরুত্বপূর্ণ। আমি পাখা পাল্টে দিয়ে আরেকটা পাখা লাগাতে পারি কিন্তু বিদ্যুৎএর বিকল্প হবে না। ঠিক তেমনি শরীরের পেছনে চৈতন্য বা আত্মাকে থাকতেই হবে। এখানে তাঁকেই বলছেন পুরুষ বা অন্তর্যামী। যিনি সেই অক্ষর, নির্গুণ নিরাকার তিনিই আবার অন্তর্যামী রূপে সব জীবের দেহে বা পুরে বাস করছেন। এটাই এখানে বলা হচ্ছে।

সবাহ্যাভ্যন্তরো, বাইরে ভেতরে সব জায়গায় তিনিই বিদ্যমান। যে কোন জিনিষই নেওয়া হোক না কেন, তার বাইরেও তিনি আর তার ভেতরেও তিনি। যেমন আকাশের উপমা দিয়ে বলা যায় এই গ্লাশের ভেতরেও আকাশ আবার গ্লাশের বাইরেও আকাশ। এই গ্লাশকে যদি গঙ্গায় ফেলে দিই তখন গ্লাশের ভেতরেও গঙ্গাজল গ্লাশের বাইরেও গঙ্গাজল। ঠিক তেমনি এই অক্ষর ব্রহ্ম, যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই সব কিছুর ভেতরে আবার সব কিছুর বাইরেও। আমাদের দেহের ভেতরে যে ক্রিমি আছে, সেই ক্রিমির ভেতরেও তিনিই আছেন। আবার এই ক্রিমির পেটে যদি ডিম থাকে তখন তারও ভেতরে তিনিই আছেন। ডিমকে ভাঙতে ভাঙতে যখন এ্যটমে চলে যাওয়া যাবে, সেখানেও তিনিই আছেন, তার বাইরেও আছেন। এক এক জায়গায় তাঁর প্রকাশ এক এক ভাবে হয়। বেড়ালের মধ্যে যখন তিনি বিরাজ করছেন তখন বেড়ালের রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন, আবার এ্যটমের মধ্যে যখন আছেন তখন এ্যটমের যে প্রপার্টি তার মত প্রকাশ করেন। মানুষের মধ্যে যখন বিরাজ করছেন তখন মানুষের যা যা বৈশিষ্ট্য সেই রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। আমার ভেতরেও তিনি আমার বাইরেও তিনি। এই কথাই প্রহ্লাদ তাঁর পিতা হিরণ্যকশ্যপুকে বলেছিলেন – তিনি সর্বত্র বিরাজমান। হিরণ্যকশ্যপু বলছেন তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, আচ্ছা তোমার বিষ্ণু কি এই স্তম্ভের মধ্যেও আছেন? প্রহ্লাদ বললেন হ্যাঁ! এই স্তম্ভের মধ্যেও তিনিই আছেন। এই স্তম্ভের বাইরেও তিনি আছেন। সবটাতেই তিনি আছেন – *সবাহ্যাভ্যন্তরো*, বাইরে ও ভেতরে।

আর তিনি হলেন *অজঃ*, মানে যাঁর জন্ম হয় না। তিনি স্বয়ম্ভু, তিনিই হয়েছেন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ব্রহ্মার বাবা কে? বিষ্ণু। বিষ্ণুর বাবা কে? নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের বাবা কে? এবার তোমার মাথাটা গেছে। এখানে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন *হি অজঃ*, তাঁর জন্ম হয় না। তিনি কারুর অপেক্ষা রাখেন না। কালী কে? যিনি কালকেও খেয়ে নেন। কালীর জন্মের পরেই কালের জন্ম হয়। কিন্তু তিনি হলেন মহাকাল, কালীরও পেছনে। সময়ের তো কোন প্রশ্নই উঠছে না। অবান্তর প্রসঙ্গ এনে যদি বলা হয় তাঁর জন্মও হয়ে থাকে, কিন্তু এই কথাটাই তো বলা যাবে না। কারণ জন্ম হতে গেলে একটা ক্ষণ বা মুহূর্ত লাগবে, এই ক্ষণে জন্ম হল এই কথাতো বলাই যাবে না, কেননা সময়ের তো তখন জন্মই হয়নি। যদিও এগুলো অবান্তর কথা, বোঝানর জন্য বলা হল। তিনি হলেন *অজঃ*, তিনিই আছেন, স্বয়ম্ভু, তিনি নিজে ছাড়া আর কিছু নেই, সচ্চিদানন্দের ভাব এখান থেকেই এসেছে – তিনি আছেন, তিনি চিৎস্বরূপ আর তিনি আনন্দস্বরূপ। নিজে থেকে ভিন্ন আর কিছু নেই, তাই তাঁর জন্মের কোন প্রশ্নই উঠছে না। আচার্য এখানে খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – *যথা জলবুদ্‌বুদাদের্বায়াদিঃ*, জলে যে বুদ্‌বুদ্ হয়, এর নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ কি? বাতাস। বাতাস যদি না থাকে জলে বুদ্‌বুদ্ হবে না। জন্মের পেছনে একটা কারণ চাই, একটা শক্তির দরকার। কিন্তু তিনিই যখন আছেন তখন সেখানে কারণ কোথা থেকে আসবে আর শক্তিটাও তিনিই।

যেমনি বলে দেওয়া হল তাঁর জন্ম নেই, কোন জিনিষের জন্মের সাথে তার যে বিকারগুলো হয়, সেগুলোকেও সঙ্গে সঙ্গে না করে দেওয়া হল। যারই জন্ম হবে তারই এই ছয়টি বিকার হবেই – জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষিয়তে এবং বিনশ্যতে। জন্ম হল, তারপর পরিষ্কার বোঝা যাবে যে সে আছে, অস্তি। তার বৃদ্ধি হবে। একটা থেকে আরেকটাতে পরিবর্তন হবে। ধীরে ধীরে তার ক্ষয় হতে থাকবে। আর শেষে একদিন তার বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন বলা হল অক্ষর পুরুষের জন্ম হয় না, তিনি *অজঃ* তখন এই বাকি ছটি বিকারকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল। মানে কোন বিকার তার মধ্যে নেই, তিনি তাই অবিকারী। বীজটাই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে গাছ, ডালপাল, ফল, ফুল কোথা থেকে আসবে! সবটাই যদি বাদ চলে গেল তাহলে এই যে সৃষ্টি আমরা চোখের সামনে দেখছি, বাকি যেগুলো আসছে এগুলো কি? তখন আবার ঘুরে সেই জায়গাতে চলে যায় সেটা হল বিবর্ত। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই আছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই। আর তাঁর না আছে জন্ম, না আছে কোন বিকার, না আছে পরিণাম। কিন্তু যা কিছু দেখছি সবই তো বিকার আর পরিণাম। তাহলে এত কিছু কোথা থেকে আসছে? এটাই রহস্য, এটাই তাঁর খেলা বা লীলা। তাই এর আক্ষরিক পরিভাষা হল বিবর্ত। বিবর্ত মানে জিনিষটা দেখাচ্ছে, নাম রূপ নিয়েই দেখাচ্ছে, আর নাম রূপটা সত্য, এটাকে কেউ না বলতে পারবে না, কিন্তু এটা বাস্তবিক নয়। বাস্তবিক যদি হয় তাহলে ঈশ্বরে বিকার দোষ এসে যাবে। ঈশ্বরে যদি বিকার দোষ আসে তাহলে তা কিন্তু শাস্ত্র সম্মত হবে না। শাস্ত্র সম্মত হল তিনি অবিকারী। যার জন্য কঠোপনিষদে একটা মন্ত্রে বলা হচ্ছে *নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* – তিনি সকল অনিত্য বস্তুর শাশ্বত কারণশক্তি, তিনি চেতনারও চেতনা, আমাদের যে বুদ্ধির চেতনা, সেই চেতনারও তিনি চেতনা। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হল তিনি হলেন *নিত্যোহনিত্যানাং*, সব কিছু অনিত্য, সব কিছুরই পরিণতি হচ্ছে, কিন্তু তিনি নিত্য।

আমরা যে এত বিকার দেখছি, বীজ থেকে গাছ হচ্ছে, গাছ থেকে ফল হচ্ছে, মানুষ জন্মাচ্ছে। এগুলো কি তাহলে? বলছেন *তদেতৎ সত্যম্*, এটাও সত্য। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য, নিম্ন সত্য। যেহেতু এটা আপেক্ষিক সত্য সেই হেতু এটা *অনৃতং*। যখন পারমার্থিক দৃষ্টিতে বস্তু রূপে বিচার কর হচ্ছে তখন এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু যারা এই ভাবে বিচার করছে না, তাদের জন্য এর সব কিছু একেবারে সত্য। এই যে এক এক করে স্ক্যাম ধরা পড়ছে, কমনওয়েলথ গেমসে সত্তর হাজার কোটি টাকার স্ক্যাম, টুজি স্ক্যামে সাত লক্ষ কোটি টাকার স্ক্যাম, সম্প্রতি কোল স্ক্যামে নাকি দশ লক্ষ কোটি টাকার স্ক্যাম ধরা পড়েছে। এরা সবাই কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে দৌড়াচ্ছে। তাদের কাছে এগুলো সত্যি না মিথ্যা? পুরো সত্যি, উপনিষদ বলছে *তদেতৎ সত্যম্*। কিন্তু যখন ব্রহ্মকে সত্য বলে গ্রহণ করছ তখন এগুলো আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্য হওয়ার জন্য এটা অনৃতং, এটা মিথ্যা, ত্রিকালে কোথাও দাঁড়ায় না। যেটা ত্রিকালে দাঁড়ায় না সেটা নিয়ে আমি কি করব! তুমি এখন ঠিক কর তুমি কোনটা চাও। সত্য তো দুটোই, এটাও সত্য ওটাও সত্য। কোন কিছুই তো ঈশ্বরের বাইরে হতে পারেনা। জগৎ হল আপেক্ষিক সত্য। যাঁরা কম বয়সে ব্রহ্মচারী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসছে তারা বলছে আমার আপেক্ষিক সত্য লাগবে না, আমার পারমার্থিক সত্য দরকার। এগুলো সব বিবর্ত, সবই মায়া, সব জলের ঢেউ। কিন্তু জলের ঢেউ কি মিথ্যা? না, তবে আপেক্ষিক সত্য। জল হল পারমার্থিক সত্য। তুমি কি চাও? যারা সংসারে ভোগ বাসনার মধ্যে ডুবে আছে, কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া কিছুই জানে না তাদেরকে যদি গিয়ে বলা হয় বুঝলে ভায়া! এই সংসারটা হল আপেক্ষিক সত্য, এগুলো সব মিথ্যা। সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে আমার আজকে অনেক কাজ আছে আপনি আজকে আসুন, অন্য একদিন আপনার কথা শুনব।

সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে কোন দিন ধর্মান্তরিত করার কোন প্রশ্নই ছিল না। যতক্ষণ না কারুর মধ্যে জিজ্ঞাসা উঠছে, সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, আমি আর পারছি আমাকে বলুন এর থেকে বাঁচার কি কোন পথ আছে? তার আগে কাউকে ধর্মের এই সব তত্ত্ব কথা কেউ বলতে যেতেন না। মানুষ যখন যেমন যেমন সমস্যা নিয়ে ধর্মজ্ঞ পুরুষদের কাছে হাজির হতেন তখন তাকে তেমন তেমন উপদেশ দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হত। এখন একজন এসে বলছে আপনি আমাকে বলুন কোনটাকে জানলে সব জানা যাবে। বা কেউ

এসে বলছে আমি ঈশ্বরকে জানতে চাই, আমাকে একটা পথ বলে দিন। তখন তাঁরা জানতে চাইবেন তুমি কি শম, দম ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত? তোমার ইন্দ্রিয় সংযম হয়েছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে। কর্মের দ্বারা যে লোক পাওয়া যায় এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেছ? আর এই লোকগুলো তোমার চাই কি চাইনা? বলল, হ্যাঁ, দেখে নিয়েছি, আমার কোন লোকই লাগবে না। এবার বলবেন, তবে তুমি শোন, তুমি যে ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করছ তাঁর এই স্বরূপ, এটা আসলে বিবর্ত। হিন্দুরা কখন আগ বাড়িয়ে ধর্মপোদেশ দিতেন না, উপদেশ দেওয়া মানেই লোকে শুনবে না।

শ্রীমার জীবনে একটা ঘটনা আছে। শ্রীমা বাগবাজারে আছেন, বয়স হয়ে গেছে, শরীর ভালো যাচ্ছে না। পূর্ববঙ্গ থেকে একজন ভক্ত চিঠি লিখছেন শ্রীমাকে – মা, আমি আপনার দীক্ষাপ্রার্থি। আপনি এর আগে আমাকে দীক্ষার একটা তারিখ দিয়েছিলেন। আমি এসেও ছিলাম। কিন্তু আপনার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেদিন আমার দীক্ষা হতে পারেনি। আমি অতি সাধারণ লোক, আমার পক্ষে এত টাকা-পয়সা খরচা করে যাতায়াত করা খুবই কষ্টের। আপনি যদি একটা তারিখ ঠিক করে দিন তাহলে আমাকে যেন আর খালি হাতে ফিরে না আসতে হয়, ইত্যাদি। চিঠি পড়ে শোনানর পর শ্রীমা প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন – ওকে বলে দাও দীক্ষা হল জন্ম জন্মান্তর থেকে মুক্তি, তার টাকা খরচের দায়ীত্ব আমি নিতে পারব না, এখানে নোটিশ দিয়ে দীক্ষা হবে না। শ্রীমা বলতে চাইছেন, তুমি দীক্ষা নেবে কি নেবে না তার দায় কি আমার নাকি! তোমার যদি টাকা-পয়সা না থাকে তার দায় কি আমার! তোমার যদি ঝামেলা হয়ে থাকে সেটা আমার দায় নাকি! দীক্ষা তো তুমি চাইছ, সংসার থেকে মুক্তি তুমি চাইছ, ঝামেলা তোমাকে পোয়াতে হবে। ঠিক এই রকমই একটা ঘটনা দেওঘরে হয়েছিল। স্বামী ভূতেশানন্দজী একবার দেওঘরে গিয়েছিলেন। সেখানকার কয়েকজন সাধারণ কর্মচারী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চাইল। এক জুনিয়র মহারাজ দেওঘরের তদানীন্তন সচিব মহারাজকে গিয়ে বললেন – মহারাজ! এরা তো দীক্ষা নিচ্ছে। তা নিয়ম অনুযায়ী গুরুদক্ষিণা দিতে হয়, সেটা না হয় দু চার টাকা দিয়ে দিতে পারবে কিন্তু গুরু প্রণামীর ধুতি যেটা দেবে সেটা যদি আমরা আশ্রমের তরফ থেকে তাদের দিয়ে দিই তো ভাল হয়, মাত্র তো দু-চারজন। শুনে সচিব মহারাজ প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন – এরা নিজের বউয়ের জন্য শাড়ী কেনে না! আর গুরুর জন্য জীবনে একবার একটা ধুতি দিতে পারবে না! কিচ্ছু করতে হবে না।

এই দুটি ঘটনা আমাদের অনেকের চোখ খুলে দেয়। আগে তুমি নিজে ঠিক কর আধ্যাত্মিক জীবন তোমার লাগবে কি লাগবে না। উপনিষদে এই নিয়ে অনেক কাহিনী আছে, যেখানে মনে হবে গুরু শিষ্যের উপর যেন কি প্রচণ্ড অত্যাচার করছেন। গুরু শিষ্যকে এমন এমন আদেশ করছেন, যা শুনলে অনেকে আশ্রম থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইবে। যারা পালন করতে এগিয়ে যাবে তারাই ব্রহ্মজ্ঞান পাবে। তোমার চাই কি চাই না বল। খ্রীশ্চান মিশনারীতে এখন লোকই পাওয়া যাচ্ছে না, তারা এখন বড় বড় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে – আপনারা আমাদের সাথে আসুন, আমরা এই জগতের সুখ হয়তো দিতে পারব না কিন্তু স্বর্গের সুখ দিতে পারব। এরা সাধারণ মানুষকে স্বর্গসুখের লোভ দেখিয়ে ডাকছে। এইভাবে কক্ষণ হয় না। মনুস্মৃতিতে ব্রাহ্মণকে বলছেন – তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েছ, তুমি এখন তোমার বিদ্যা কাউকে না দিয়ে মরে যাও কিন্তু অপাত্রে কক্ষণ এই বিদ্যা দান করবে না। যেদিন বেলুড় মঠ নোটিশ দেবে আপনার আসুন আমাদের মঠের সন্ন্যাসী হন। তখন বুঝে নিতে হবে বেলুড় মঠের আর বাঁচার আশা নেই। পাড়াতে সব্জীওয়ালারা ফেরী করে যে আনাজ বিক্রী করতে আসে, তারা যখন কোন সব্জীর দাম দশ টাকা হাঁকে তখন আমরা দরদাম করে ফাটাফাটি করে হয়তো এক টাকা কমাতে পারি। কিন্তু যখন কোন শপিং মলে গিয়ে সেই আনাজই কিনছে তখন দরদাম করতে গেলেই বলবে প্যাকেটের গায়ে যে দাম লেখা আছে ওই দামেই নিতে হবে। ধর্মের ফেরিওয়ালাদের এই দুরবস্থাই হয়।

হিন্দুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষা এই পরম্পরাতেই হয়। তুমি তোমার প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছ, সে তুমি কত ঝামেলা করে এসেছ, কত টাকা খরচ করে এসেছে সেটা তোমার ব্যাপার। এবার আমি তোমাকে যা যা বলব সেটা তোমাকে শুনতে হবে। এবার তুমি বিচার করে দেখ তুমি আসবে কি আসবে না।

এই কারণেই হিন্দু ধর্মের সেই রকম প্রচার প্রসার হয়নি যেটা অন্যান্য ধর্মে হয়েছে। তার কারণ হিন্দুদের আদর্শ এত উঁচু যে সাধারণ মানুষ নিতেই পারবে না।

সেইজন্য গুরু এখানে শিষ্যকে বুঝে নিয়েছেন তার কি প্রয়োজন, আর তাই বলছেন এগুলো সব মিথ্যা। কেন মিথ্যা? তিনি অজঃ, তাঁর জন্মই হয়নি, জন্ম যখন হয়নি তাই তাঁর কোন বিকারও নেই। কিন্তু আমরা সর্বক্ষণ সর্বত্র সব বিকারই দেখছি, এটাই মায়া। মায়া মানে মিথ্যা, তাই এগুলো হয়ে গেল বিবর্তবাদ। এই যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, তিনি হলেন *সবাহ্যাভ্যন্তরঃ*, তিনিই বাইরে তিনিই আবার ভেতরে। আচার্য এখানে কয়েকটি শব্দ সংযোজন করেছেন, যে শব্দগুলো মন্ত্রে নেই। কি সেই শব্দগুলো – *সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, অতোহজরোহমৃতোহক্ষরো ধ্রুবোহভয় ইত্যর্থঃ*। তিনি সব কিছুর বাইরে আর ভেতরে এবং *অজঃ* হওয়ার জন্য তাঁর কয়েকটি গুণ এসে যাচ্ছে – অজর, অমর, অক্ষর, ধ্রুব আর সবচেয়ে গুরুত্ব হল অভয়। উপনিষদে খুব সুন্দর একটা কথা আছে যেখানেই দুই সেখানেই ভয়, যেখানে এক সেখানে কিসের ভয়! তিনিই শুধু আছেন, *অজঃ*, সেইজন্য তিনি অভয়। এগুলো হল বিশেষত্ব, যখনই কোন একটা তত্ত্ব বলে দেওয়া হল তখন সেই তত্ত্বের সাথে তাঁর কিছু বিশেষত্ব স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসবে। যেমন বলে দেওয়া হল তিনি হলেন *বাহ্যাভ্যন্তরো* আর *অজঃ* তখন এই বিশেষত্বগুলো স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেল।

আচার্য বলছেন *তলমলাদিমদিবাকাশাং*, বেদান্তে প্রায়ই এই উপমাটা নেওয়া হয়, যখন দৃষ্টিদোষ এসে যায় তখন আকাশের মধ্যে দুটো দোষ এসে যায় – তল আর মল। তল হল কড়াইয়ের মত গোলাকার। ভাবলে অবাক লাগে, সেই কবেকার কথা, আকাশকে কার্ভ দেখায়, কিন্তু ঋষিরা জানতেন আসলে আকাশ কিন্তু কার্ভ নয়। অথচ কত পরে ইসলাম ধর্ম জন্ম নিয়েছে তারা কিন্তু এখনও বলে যাচ্ছে আকশ হল গোলাকার। এর যুক্তি ও প্রমাণ পাচ্ছেন – যখনই এগিয়ে যাচ্ছেন আকাশও পিছিয়ে যাচ্ছে, তার মানে আকাশ গোলাকার নয়। আর মল, আকাশে যে নীল রঙ দেখা যাচ্ছে, আসলে এটা আকাশের রঙ নয়, আবার ঝড়ের সময় আকাশের রঙ পাল্টে যায়। আবার অনেক সময় দৃষ্টি দোষে একটাকে দুটো দেখায়, আকাশে দুটো চাঁদ দেখে। দৃষ্টি দোষ হয়ে গেলে জিনিষটা যে রকম আছে সেই রকম না দেখিয়ে অন্য রকম দেখায়। তখন রেলগাড়ি ছিল না, তাই এনারা নৌকার উপমা নিতেন। নদীর মাঝখান দিয়ে নৌকা করে যাওয়ার সময় মনে হয় নদীর কুল বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। এখন ট্রেনে করে যাওয়ার সময় মনে হয় প্ল্যাটফর্মটা অন্য দিকে যাচ্ছে। একটা ট্রেনে বসে আছি, পাশেই আরেকটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আমার ট্রেনটা ছাড়লে বাইরে তাকালে সব সময় মনে হবে পাশের ট্রেনটা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এগুলো দৃষ্টি দোষ।

এই দৃষ্টি দোষের জন্য অক্ষর ব্রহ্মকে মনে হয় *দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনামবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেষু সপ্রাণঃ সমনাঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয়ে ইব প্রতিভাসতে* – এই দৃষ্টি দোষে আকাশ *তলমলবৎ* মনে হয়। ঠিক তেমনি এই যে অক্ষর ব্রহ্ম তিনি এই নানান রকমের উপাধি ভেদে মনে হয় তিনি যেন বিভিন্ন দেহ হয়েছেন। শুধু বিভিন্ন দেহই নয়, এই দেহের ভেতরে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় আর নানান রকম বিষয় যা কিছু আছে এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি যেন ভাসমান। আমার ভেতরে যিনি আত্মা তিনি যেন ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়ে গেছেন, তিনি যেন প্রাণযুক্ত হয়ে গেছেন। ঠিক তেমনি আমি যখন ঈশ্বরের কল্পনা করছি, যখন ঈশ্বরের চিন্তন করছি তখন আমি মনে করছি ঈশ্বরের যেন সহস্র শির, সহস্র পা, সহস্র হাত, হাজারটা চোখ হয়ে গেছে। একদিকে আমি নিজেকে আমার সাথে যুক্ত করে রেখেছি। আসলে আমি কে? আমি শুদ্ধ আত্মা। এই শুদ্ধ আত্মার কি আছে? দুটি হাত আছে, দুটি পা আছে, একটি মাথা আছে আর প্রাণ আছে। কাল আমি যখন মরে যাব তখন আমার নাম নিয়ে বলবে অমুক মারা গেল। তার মানে এবার শুদ্ধ আত্মার মৃত্যুটাও এসে গেল। এই জিনিষগুলো সবই ভাসমান। ভাসমান মানে, এগুলো বাস্তবে নেই কিন্তু মনে হয় যেন উপাধি ভেদে যেন তিনি আছেন। এখানে যে আত্মা আছেন তাঁরই জন্য সব কিছু আছে, আত্মা আছেন বলেই এগুলোকে সবাই তাই দেখছে। কারা দেখছে? সাধারণ লোকেরা। কিন্তু *তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থদৃষ্টীনাম্*, এই রকম দেখায় ঠিকই কিন্তু যাঁরা পরমার্থ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে গেছেন তাঁরা পরিষ্কার দেখেন। যাঁরা কথামৃত নিয়মিত পড়েন, বিশেষ করে ঠাকুরের শেষের দিকের কথা,

তাঁরা দেখে থাকবেন সেখানে এই ধরণের বাক্য যেন অনেক বেশী করে ঠাকুর বলছেন – সব জায়গায় দেখছি তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই।

তাঁরা পরিষ্কার কি দেখেন? মন্ত্রের দ্বিতীয় পঙক্তিতে এটাই বলছেন –তিনি *অপ্রাণো*, আত্মার সঙ্গে প্রাণের কি সম্পর্ক! এই প্রাণের সাথে আত্মার কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু *ক্রিয়াশক্তিভেদবান্*, একজন পালোয়ান তার অনেক শক্তি আছে, একজন রোগাপ্যাটকা তার শক্তি কম, এদের ক্রিয়াশক্তির তারতম্য, তার মানে বায়ু তার কম। আমরা যে নিঃশ্বাস ছাড়ি আর নিঃশ্বাস নিই এই নিঃশ্বাস কিন্তু প্রাণ নয়, এই নিঃশ্বাসটা বায়ু। এই বায়ু মাধ্যমে প্রাণশক্তি ভেতরে যায়, এটা হল ক্রিয়াত্মক শক্তি, মানুষের যে কার্য ক্ষমতা এটা নিঃশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেইজন্য যোগীরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে দৃষ্টি দিতেন। এখানে বলছেন আত্মার সাথে এই প্রাণের কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি *হ্যমনাঃ*, আত্মার মনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই মানে জ্ঞানশক্তি, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই যে মনের নানান রকমের রূপ এর সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। যে কোন জীবন্ত মানুষের মধ্যে সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই বিরাজমান। ঠাকুর বলছেন লেটো গালে হাত দিয়ে বসে আছে দেখছি সেই সচ্চিদানন্দ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। ঠাকুর লাটুকেও দেখছেন আবার তাঁর ভেতরে সেই সচ্চিদানন্দকেও দেখছেন যেন একটা খোলস। লাটু হাত নাড়ছে কিন্তু তিনি দেখছেন সচ্চিদানন্দই হাত নাড়ছেন। আসলে খোলসটা হাত নাড়ছে। যিনি পরমার্থ দৃষ্টি সম্পন্ন তিনি পরিষ্কার দেখেন সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছুই নেই। আর ওই প্রাণ, মন এগুলোর সাথে সচ্চিদানন্দের বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্কটা কি রকম? যেন মনে হয়। যখন মনে হবে যে তাঁর মন নেই, মনের সঙ্গে কোন যোগ নেই আর প্রাণের সঙ্গেও কোন যোগ নেই তখন এই দুটোর যত আনুষাঙ্গিক আছে তার সবটাই বাদ চলে যাবে। তার মানে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় রূপে যা কিছু আছে তাদের সাথে অক্ষর ব্রহ্মের কোন সম্পর্ক নেই। তার মানে হাত, পা, চোখ এগুলোর সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এগুলো সব হল প্রাণের ক্রিয়া। প্রাণশক্তিতে হাত চলছে, পা চলছে, চোখের কাজ চলছে। যে বক্সার তার হাতে প্রাণশক্তি বেশী আছে, যে দৌড়বীর, যে কুস্তি করছে এদের মধ্যে প্রাণ শক্তি বেশী আছে। ঠিক তেমনি কর্মেন্দ্রিয়ের মত জ্ঞানেন্দ্রিয়ও আত্মার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কর্মেন্দ্রিয় আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মূলে হল প্রাণ আর মন। এই দুটোকেই কেটে উড়িয়ে দেওয়া হল। প্রাণ আর মনকেই কেটে দিল তাহলে আর কার সাথে তার কি সম্পর্ক থাকবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেই বলছে *ধ্যায়তীব লেলায়তীব*, ধ্যান করছে মনে হয় যেন তিনি ধ্যান করছেন, কোন কাজ করছে মনে হয় যেন তিনি চেষ্টা করছেন। প্রায়ই লোকে বলে আচার্য শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের নামে বলছেন দেহভামিনী শ্রীকৃষ্ণ যেন করছেন। যেন করছেন না তো কি বলবেন, আত্মা কি কখন এগুলো করেন! আত্মার এগুলোর কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কই নেই, তাঁর প্রাণ আর মনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাহলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক আসবে! সেইজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলছে *ধ্যায়তীব লেলায়তীব*, যেন তিনি ধ্যান করছেন, যেন তিনি চেষ্টা করছেন। যেন বলা হচ্ছে এগুলো বোঝাবার জন্য। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা যিনি, যিনি অক্ষর ব্রহ্ম তাঁর সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এগুলোকে মাথায় রাখতে হবে, এখানে কোন তর্কের ব্যাপার নেই, গুরু শিষ্যকে বলছেন। গুরু হলেন শ্রোত্রিয় আর ব্রহ্মনিষ্ঠঃ আর শিষ্য যে এসেছে সেও অত্যন্ত উচ্চমানের, তাই কঠোপনিষদের মন্ত্রে বলছেন *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ*, যিনি আচার্য তিনি আশ্চর্য আর তাঁর শিষ্যও অত্যন্ত কুশল, যা গুরু বলবেন সেটা চটপট বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা তার মধ্যে আছে। এই যুগলবন্দী না হলে অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ণ করা যায় না। এই যে তত্ত্বগুলো বলা হচ্ছে মানুষ ধ্যান করছে কিন্তু মনে হবে যেন তিনি ধ্যান করছেন। এটা কারা দেখেন? যাঁরা পরামার্থ দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষ। পরামার্থ স্বরূপকে যিনি জেনে গেছেন, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনিই এই রকম পরিষ্কার দেখবেন, এই দৃষ্টিতে কোন সংশয় বা সন্দেহ থাকবে না। স্বামীজী এটাকে বোঝানর জন্য আলেকজাণ্ডারের কাহিনী বলছেন, আলেকজাণ্ডার যখন এক ব্রাহ্মণকে বলছে চল তোমাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব। ব্রাহ্মণ বলল 'আমি যাব না'।

আলেকজাণ্ডার ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে বলছে 'তাহলে তোমাকে আমি দু টুকরো করে দেব'। আলেকজাণ্ডারকে ব্রাহ্মণ বলছেন 'এর থেকে বড় মিথ্যা কথা তুমি কখন বলোনি, তুমি আমাকে কি করে মারবে! আমি তো সেই শুদ্ধ আত্মা, তুমি বড় জোর আমার গলাটা না হয় কেটে দেবে, তাতে শরীরের দুটো টুকরো হয়ে যাবে কিন্তু আমাকে তুমি কিভাবে মারবে, যে শুদ্ধ আত্মা তাঁকে তুমি কি করে মারবে'! এগুলো যে কোন যুক্তি, চিন্তা, ভাবনা করে বলছেন তা নয়। বাস্তবিক তাঁরা এটাই দেখেন।

অপ্রাণো মানে তিনি প্রাণহীন নন, *অমনাঃ* মানে তিনি বুদ্ধিহীন নন। প্রাণ আর মনের সাথে সম্পর্ক আছে কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু মনে হয় যেন সম্পর্ক আছে। প্রাণ ও মনের উপাধিকে যখনই বাদ দিয়ে দেওয়া হল তখন আর তার মধ্যে কোন ধরণের মলিনতা আসবে না, সেইজন্য অক্ষর ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে শুভ্র। প্রথমে বলেছিলেন দিব্য, দিব্য মানে স্বয়ংপ্রকাশ, শুভ্রের অর্থও প্রায় একই হয়। কিন্তু দুটোকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য শুভ্রের ব্যাখ্যায় আচার্য বলছেন – মন আর প্রাণের সাথে সম্পর্ক নেই বলে তাঁকে বলা হচ্ছে *শুভ্রো*, মন আর প্রাণের জন্য যে মলিনতা আসবে সেটা আসছে না, সেইজন্য তিনি সব সময়ই *শুভ্রো*। স্বামীজী যে বলছেন তোমার ভেতরে অনন্ত শক্তি, তুমি শুদ্ধ পবিত্র, এই কথাগুলো স্বামীজী কাকে বলছেন? আমি তো জানি আমি পাঁচ রকমের ভুল কাজ করি, পাঁচ ধরণের অন্যায় করছি। কিন্তু স্বামীজী বারবার আমাদের বোঝাতে চাইছেন তুমি হলে সেই শুদ্ধ আত্মা, যে শুদ্ধ আত্মার সাথে মন ও প্রাণের কোন সম্পর্ক নেই। প্রাণের সাথে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই তখন স্বাভাবিক ভাবেই হাত, পা এগুলোর সাথেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। পাপকর্মই হোক বা শুভকর্মই হোক, কর্ম করতে গেলে এই হাত, পা, চোখ, কান দিয়েই করতে হয়, মন দিয়েই শুভ ও অশুভ কর্ম হয়, কিন্তু তোমার তো প্রাণ আর মনের সাথে কোন সম্পর্কই নেই তাহলে তুমি আর কি করে এই সব কর্মের কর্তা হলে। পুলিশ যদি একটা দাগী আসামীকে কাঠগড়াতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাকেও টেনে নিয়ে গিয়ে বলা হল আপনি প্রমাণ করুন। আমি প্রমাণিত করে দিলাম আমি আসামীকে জানিও না, চিনিও না। এরপর পুলিশ আমাকে আর কি করে ধরবে! যিনি শুদ্ধ আত্মা তাঁর মন আর প্রাণের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। প্রাণ সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে করছে সঞ্চালন আর মন সঞ্চালন করছে সব জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে। শুদ্ধ আত্মার ক্ষেত্রে সব কটাই বাদ হয়ে গেছে, সেইজন্য শুদ্ধ আত্মা সব সময়ই পবিত্র। *শুভ্রো* বলতে এখানে পবিত্র অর্থে বলা হচ্ছে।

এই পবিত্রতার জন্য আরেকটা জিনিষ স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাচ্ছে। এই শুভ্র হওয়ার জন্য যত রকমের উপাধি আছে, একেবারে স্থাবর থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত যত রকমের উপাধি হতে পারে এর সব কটির তুলনায় এই অক্ষর ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। এখানে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সগুণ ঈশ্বর যিনি তিনি সৃষ্টির যত রকমের বীজ হতে পারে, সব বীজকে ধারণ করে আছেন, সেইজন্য তিনি সব কিছুর উপরে। ঈশ্বরের ভেতরে পুরো সৃষ্টির বীজ রয়েছে, সেইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ। এর আগের মন্ত্রে বলা হয়েছিল সৃষ্টি মানেই মায়ার কার্য। তাই সগুণ ঈশ্বর আর মায়া এঁরা কোথায় যেন একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছেন। মায়া যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ সগুণ ঈশ্বর আসবেন না। তাহলে সগুণ ঈশ্বর কেন শ্রেষ্ঠ? কারণ তিনি হলেন সব কিছুর বীজ, সেখান থেকেই পুরো সৃষ্টি বেরিয়ে আসছে, কিন্তু মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। নির্গুণ ঈশ্বর কেন সগুণ ঈশ্বর থেকে শ্রেষ্ঠ? কারণ তাঁর মধ্যে মায়া বলে কোন পদার্থ নেই। তাই সব সময় এটাই বলা হয় – সগুণ ঈশ্বর জগতের সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ সৃষ্টির বীজকে তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছেন। যেমন মা, মা সব সময় সন্তান থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ মা সন্তানের বীজ ধারণ করেছিল। কিন্তু সন্তানের দোষ মাকে স্পর্শ করে না। সগুণ ঈশ্বর সৃষ্টির বীজকে নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন বলে যত রকমের উপাধিবান জগতে আছে তার থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। সব কটার তিনিই মালিক। কিন্তু সৃষ্টিটা বিবর্ত বলে মায়া ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারেনা। মায়ার সাহাযে তিনি সৃষ্টি করেন কিন্তু মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই তাঁকে বলা হয় মায়াধীশ। নির্গুণ ব্রহ্মে মায়ার লেশ মাত্র নেই। তাই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম থেকে শ্রেষ্ঠ।

এই যুক্তির মধ্যে এসেই ভাব ভাবের তফাৎ এসে যায়। আমি বলতে পারি মায়া আছে কি নেই তাতে আমার কি আসে যায়, যে ঈশ্বরকে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারছি, যে ঈশ্বরকে আমি আস্বাদন করতে পারছি, যে ঈশ্বরের সাথে আমি রমণ করতে পারছি সেই ঈশ্বরই তো শ্রেষ্ঠ। সগুণ ঈশ্বর তাই এদের কাছে শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর বলছেন যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই সেই বাবু কিসের বাবু। যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নেই সেই ঈশ্বর কিসের ঈশ্বর! তাই নির্গুণ ব্রহ্মকে নিয়ে লোকে কি করবে! দ্বৈতবাদীরা সেইজন্য সগুণ ঈশ্বরকেই প্রাধান্য দেয়। আচার্য শঙ্করও কখনই এখানে না করবেন না, সব সময়ই বলবেন হ্যাঁ ঠিকই বলছে। গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন ঈশ্বরের সঙ্গে সব সময় ছয়টি ঐশ্বর্য আছে, তাই তিনি ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন। কিন্তু মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। সেইজন্য তিনি রাজা, সেইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁরই যে অন্য রূপ নির্গুণ নিরাকার তাতে মায়ার লেশ মাত্র নেই। এগুলো হল যারা যুক্তি তর্ক নিয়ে আছেন তাঁদের জন্য। আমাদের জন্য হল, ঠাকুর বলছেন যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই সেই বাবু কিসের বাবু। সেইজন্য অনেকে সগুণ সাকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। উপনিষদ পড়ে অনেকে বুঝতে পারেনা, কারণ এখানে ভক্তির কিছু নেই। গীতা ভাগবতে অনেক ভক্তির কথা আছে, আর সগুণ ঈশ্বর যদি নাইই হন তাহলে ভক্তি কাকে করবে। ভক্তি যদি না হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কি নিয়ে থাকবে, সেই কারণে এরা উপনিষদের তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেনা। তাই আগে থেকেই এই দুটো আলাদা পথ চলে আসছে, জ্ঞানপথ আর ভক্তিপথ। এই দুটো পথ যে আলাদা হয়ে যায়, ঠিক এই কারণেই আলাদা হয়ে যায়। যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ, কিন্তু মূল তফাৎটা এইখানেই এসে যায় – সগুণ ঈশ্বর হলেন মায়াধীশ কিন্তু নির্গুণ যিনি তাঁর মায়ার সাথে কোন সম্পর্কই নেই। আর বেদান্তের মত হল মায়ার সাথে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই তিনিই শ্রেষ্ঠ। মায়ার আবরণকে যখন তিনি গ্রহণ করে নিচ্ছেন তখন তাঁকে বলা হচ্ছে সগুণ ঈশ্বর কিন্তু মায়ার আবরণকে গ্রহণ করেছেন বলে সগুণ ঈশ্বরকে নির্গুণ ঈশ্বরের তুলনায় একটু যেন ছোট করে দেখা হয়। ছোট মানে, আমরা ছোট বড় যেই অর্থে বিচার করি সেই অর্থে ছোট নয়। এগুলো হল ভাবের ব্যাপার। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত, যাঁর মধ্যে ভক্তির উপাদানের প্রাচুর্য আছে তাঁরা কখন নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে তাকাবেনও না। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকেই বলা হয় উৎকৃষ্ট, কারণ মানুষের এটাই স্বভাব।

মন্ত্রের শেষ অংশে তাই বলছেন *হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ*, শুদ্ধ ব্রহ্ম অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ। অক্ষর বলতে এখানে সগুণ ঈশ্বরকে বোঝাচ্ছেন। অক্ষর এই শব্দটি আমাদের শাস্ত্রে একটি খুব জটিল শব্দ। গীতাতে অক্ষরকে বলা হয়েছে প্রকৃতির অর্থে, সব কিছুর ক্ষয় হয়, পরিবর্তন হয় কিন্তু প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। আবার এখানে অক্ষরকে ব্যবহার করা হচ্ছে সগুণ ঈশ্বরের অর্থে। আবার অক্ষরকে নির্গুণ ব্রহ্মের অর্থেও কখন কখন ব্যবহার করা হয়। এই কারণে উপনিষদাদি শাস্ত্র আচার্যের ভাষ্য নিয়ে পাঠ করতে বলা হয়। আচার্যের ভাষ্য না নিয়ে পড়লে কোন জায়গায় কোন শব্দকে কি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বোঝা খুব কঠিন হয়ে যায়। এখানে এই একই অক্ষর শব্দকে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও সগুণ ঈশ্বর আবার কোথাও নির্গুণ ব্রহ্ম তিনটে আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যাই হোক, এখানে বলছেন যিনি সগুণ ঈশ্বর তিনি নিজের সৃষ্টি থেকেও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মায়ার কারণে নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ।

আচার্য বলছেন *যস্মিংস্তদাকাশাখ্যমক্ষরং*, নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে বলছেন যাঁকে আকাশের মত বলা হচ্ছে, সব কিছুতে যিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন, তিনি কি করে প্রমাণরহিত হন? আমার আপনার ভেতরে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই বিরাজমান, সব কিছুর বাহিরে ভেতরে তিনিই আছেন। তাহলে তিনি *অপ্রাণো অমনঃ* কি করে হন? এই জগৎটা তো মিথ্যা নয়, উপনিষদই বলছে *তদেতৎ সত্যম্*। আর এই জগৎ পুরোটাই ক্রিয়াশক্তির খেলা, ক্রিয়াশক্তির খেলা মানেই প্রাণের খেলা। তাহলে কি করে তাঁকে *অপ্রাণো অমনঃ* বলা হচ্ছে? তখন বলা হচ্ছে এই যে প্রাণ ও মন এদের উৎপত্তি হয়েছে, এদের উৎপত্তির আগেও তিনিই ছিলেন। তাই যখন প্রাণ ছিল না, মন ছিল না তখনও তিনি ছিলেন। সেইজন্য তাঁকে বলা হয় *অপ্রাণো অমনঃ*। তখনও যদি প্রাণ ও মন থাকত তাহলে এইভাবে বলা হত না। একবার যখন প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হয়ে গেছে তখন আর তাকে মিথ্যা বলা যাবে না। এই ইলেক্ট্রিসিটির খেলা, শক্তির খেলা এগুলোকে আমরা অস্বীকার করছি না, কিন্তু স্বরূপতঃ

এগুলো নেই। কেন স্বরূপতঃ নেই বলা হচ্ছে? কারণ ব্রহ্ম যেভাবে প্রথম থেকেই আছেন প্রাণ কিন্তু ঐ ভাবে প্রথম থেকে থাকে না, প্রাণের সৃষ্টি পরে হয়। পরে সৃষ্টি হয় বলে এর স্বরূপতা নেই। স্বরূপতা নেই বলে ঘোর বেদান্তীরা শক্তিকে কখনই মানবে না, কালীকেও তাঁরা মানবে না। বেদান্তের ভাষায় শক্তি মানে প্রাণ, এই প্রাণের তো পরে জন্ম হয়েছে। পরে জন্ম হওয়ার জন্য প্রাণের স্বরূপতা নেই। এর পরের মন্ত্রে আসবে প্রাণ ও মনের সৃষ্টি পরে পরে হয়েছে। কিন্তু পরের দিকে তন্ত্র দর্শনে বিশেষ করে মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্ম আর শক্তিকে অভেদ দেখান হয়েছে। ঠাকুরও ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ মানে, সৃষ্টির যখন লয় হয়ে যায় তখন শক্তি ব্রহ্মের মধ্যে লীন হয়ে যায়। কিন্তু এখানে প্রাণ বলতে ক্রিয়াত্মক শক্তিকে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের শরীরের ভেতরে যে প্রাণবায়ুর খেলা চলছে, সেটাকে বোঝাচ্ছে।

অপ্রাণ বলতে গিয়ে বোঝাচ্ছেন, একটা এমন অবস্থা ছিল যখন সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম আছেন তখন তাঁর মধ্যে প্রাণ ছিল না, তাই প্রাণের স্বরূপতা অর্থাৎ প্রাণের বাস্তবিক সত্তা নেই। প্রাণের বাস্তবিক সত্তা অনেক পরে আসছে। যেমন আমার চোখে চশমা আছে। আমি এমন এক দেশে গেলাম যেখানকার লোকেরা চশমা বলে কিছু জানেই না, তারা আমাকে দেখে বলবে চশমাযুক্ত লোক। কিন্তু চশমা তো আমার স্বরূপ নয়, আমি যখন জন্ম নিয়েছিলাম তখন আমার চোখে চশমা ছিল না। ফলে চোখ যেমন আমার জন্ম থেকেই আছে, চোখ যেভাবে আমার স্বরূপে অবস্থিত সেইভাবে চশমা আমার স্বরূপে নেই। ঠিক তেমনি প্রাণ আছে কিন্তু তাঁর স্বরূপে নেই, সেইজন্য বলা হচ্ছে তিনি *অপ্রাণো*। আচার্য বলছেন, দেবদত্ত নামে কোন লোকের যত দিন কোন সন্তান না হচ্ছে তত দিন তাকে সন্তানহীন বলা হবে। ঠিক তেমনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, পরমপুরুষ যিনি তিনি *অপ্রাণাদিমান্*। এখানে কিন্তু তাঁকে প্রাণহীন বলা হচ্ছে না। প্রাণহীন মানে যার প্রাণ ছিল, কিন্তু এখন প্রাণ চলে গেছে। এখানে বলছেন তিনি প্রাণের বাইরে। তিনি প্রাণের বাইরে, তাই তিনি জীবনমৃত্যুর পারে। যার প্রাণ আছে সে জীবিত, যার প্রাণ নেই সে মৃত। ঈশ্বর হলেন এই জীবনমৃত্যুর পারে। তাই ঈশ্বরের কখন জন্ম হয় না, মৃত্যুও হয় না। অবতার যখন হন, তখন তিনি একটা দেহ ধারণ করেন। সেইজন্য বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে লীলা করছেন। কারণ আমরা যে ভাবে জন্মমৃত্যুকে জানি সেইভাবে ভগবানের জন্ম মৃত্যু হতে পারে না। জন্ম মৃত্যু তারই হবে যার প্রাণ আছে। কিন্তু ভগবান জন্ম ও মৃত্যু এই দুটোরই পারে, সেইজন্য *তিনি অপ্রাণো*। আচার্য শব্দটা ব্যবহার করছেন *অপ্রাণাদিমান্*।

আবার তিনি *অমনবান্*, মনেরও পারে। যার মন আছে তার মন খারাপ হতে পারে ভালোও হতে পারে। কিন্তু তিনি মনেরও পারে। কিন্তু এগুলোর উৎপত্তি সেখান থেকে। তিনিই আবার সব কিছুতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন, যেখানে প্রাণ সেখানেও তিনি। আসলে আমরা সগুণ ঈশ্বরকে সব সময় পুরুষ বলে চিন্তা করি, আর পুরুষ রূপে চিন্তা করে যখন বলা হচ্ছে *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্* তখন কি করে ঈশ্বরের প্রাণ থাকবে না। আর ঈশ্বরের প্রাণ যদি না থাকে তাহলে সৃষ্টিই বা কি করে হবে। এই ভুলটা ভাঙার জন্য বলছেন তিনি প্রাণশক্তি দিয়ে কাজ করেন কিন্তু একটা অবস্থা আছে যেখানে প্রাণের জন্ম হয়নি। সেইজন্য তাঁকে বলা হয় *অপ্রাণো*, কিন্তু এই *অপ্রাণো* বলা হয় নির্গুণ ব্রহ্মের ক্ষেত্রে। সত্যিই কি তাঁর প্রাণ নেই? হ্যাঁ, সত্যিই তাঁর প্রাণ নেই। কিভাবে নেই, আর কেন নেই? তখন তৃতীয় মন্ত্রে বলছেন

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।।২/১/৩।।

(*এই পুরুষ থেকে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা পৃথিবী জাত হয়।*)

আমরা জগতে যা কিছু দেখছি সবেতেই প্রাণের খেলা চলছে, পাখা ঘুরছে এও সেই প্রাণশক্তিতেই চলছে। কিন্তু এই প্রাণ বিদ্যুৎ রূপে আসছে। শরীরে যে নিঃশ্বাস বায়ু চলছে এটাও প্রাণ, ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে এটাও সেই প্রাণশক্তির খেলা। তাহলে কেন এই নির্গুণ ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে *অপ্রাণবান্?* কারণটা এই মন্ত্রে প্রথমেই

বলছেন *এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো*। এই যে অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম, সেখান থেকে এই সব কিছুর জন্ম হয়। কিসের জন্ম হয়? নাম-রূপের যে বীজভূত, যা উপাধির দ্বারা উপলক্ষিত সেই পুরুষের জন্ম হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যখনই সৃষ্টির কথা হবে তখনই তা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কথাই বলা হবে। যদিও কখন কখন অক্ষর শব্দ নিয়ে আসা হয় কিন্তু অক্ষর শব্দটি নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম এই দুটো ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সৃষ্টি মানেই সগুণ ঈশ্বর।

নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে এই সগুণ ঈশ্বরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সগুণ ঈশ্বরের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই হল নাম-রূপের বীজভূত উপাধি লক্ষিত। এখানে কিন্তু সগুণ ঈশ্বরের কোন নাম-রূপ নেই। নির্গুণ ব্রহ্মের একটা নাম আর রূপ দিয়ে দিলাম আর তিনি সগুণ ঈশ্বর হয়ে যাবেন, কখনই তা হবে না। এই অর্থ করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ ঈশ্বর তাহলে সংসারী হয়ে যাবেন। তাহলে তিনি কি? *পুরুষান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ*, নাম-রূপ বীজের উপাধি লক্ষিত। যা কিছু আমরা দেখছি, আমরা সবাই পৃথক নামধারী, এই টেবিল, বোতল, পাখা, লাইট সব নাম আর রূপের উপাধি, এই নাম-রূপের উপাধির বীজ যাঁর মধ্যে রয়েছে এবং ওই বীজ দিয়ে যাঁকে উপলক্ষিত করা হয় তিনিই সগুণ ঈশ্বর। নাম-রূপ উপাধি থাকবে সৃষ্ট পদার্থে বা জীবে, কিন্তু সগুণ ঈশ্বর নাম-রূপ উপাধিযুক্ত নন। তিনি নাম-রূপ বীজ উপাধি লক্ষিত, অর্থাৎ নাম-রূপ ও উপাধির বীজ তাঁর মধ্যে আছে। নাম-রূপ উপাধির সাথে সগুণ ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর যখন বলছেন আমার রূপ-টুপ সব উড়ে যায়, তখন তিনি অন্য অর্থে বলছেন, তাঁর যে কোন বাস্তবিক রূপ আছে তা নয়। নির্গুণ ব্রহ্ম একটা মায়ার আবরণ গ্রহণ করে নেন এবং এই মায়ার আবরণ গ্রহণ করার জন্য এবার যে নাম-রূপের খেলা শুরু হবে, সেটা এই সগুণ ঈশ্বর থেকে শুরু হয়। সগুণ ঈশ্বরের এটাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। এবার যত নাম-রূপ ও উপাধির সৃষ্টি হবে তার বীজ এই সগুণ ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত।

এই পুরুষ অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর থেকে কি হয়? *উৎপদ্যতেঽবিদ্যাবিষয়ো বিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ*, অবিদ্যার বিষয়ের বিকারভূত নাম মাত্র মিথ্যা প্রাণ উৎপন্ন হয়। আচার্যের এটাই একটা মজার বৈশিষ্ট্য, তিনি ব্যাখ্যা করতে করতে হঠাৎ করে এমন একটা ব্যাখ্যা নিয়ে আসবেন যেটা শুনলে আমাদের মাথা ঘুরে যাবে। এখানে আচার্য বলতে চাইছেন, এই যেন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, এনার মায়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেখান থেকে এসে গেলেন সগুণ ঈশ্বরে যিনি মায়াকে আবরণ করে নিয়েছেন। এই আবরণ থেকে প্রথমে সৃষ্টি হয় প্রাণের। প্রাণ সগুণ ঈশ্বর থেকে প্রথম সৃষ্ট পদার্থ বলে অনেক সময় প্রাণকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ। এই প্রাণের বৈশিষ্ট্য হল শুধু নাম মাত্র, আর এই প্রাণটা মিথ্যা। মিথ্যা মানে প্রাণের বাস্তবিক সত্তা বলে কিছু নেই। এটা একটা খুব সহজ ভাবে বোঝা যেতে পারে। সগুণ ঈশ্বর রয়েছেন, এবার তাঁর উপর মায়ার আবরণ এসে গেল। এরপর যা কিছু সৃষ্টি হবে সবটা মিথ্যাই তো হবে। এখানে পরিণাম বলে কিছু নেই, সবটাই বিবর্ত, সবটাই মায়া। সেইজন্য সবটাই মিথ্যা। এই মিথ্যাটা কারা দেখছেন? যাঁরা পরমার্থদর্শি তাঁরাই দেখছেন। মায়ার আবরণ এসে যাওয়ার পর প্রথম প্রাণের জন্ম হয় এবং এই প্রাণের বৈশিষ্ট্য হল অনৃত।

সব কিছুর মা হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ প্রাণ সেটাই মিথ্যা। এরপর বাকি যত কার্য সেগুলো আর কতটা সত্য হবে বুঝে নিন! কারণ হিরণ্যগর্ভই যদি সত্য হত তাহলে সবটাই সত্য হয়ে যেত। সব কিছুই যদি সত্য হয়ে যায় তাহলে সবটাই পারমার্থিক সত্য হয়ে যাবে, তাহলে ঈশ্বরও সত্য হয়ে যাবে আর জগৎও সত্য হয়ে যাবে। তখন পুরো দর্শনটাই দ্বৈতবাদ হয়ে যাবে। বেদান্ত প্রথম সৃষ্টিটাকেই ঘা মেরে দিয়ে বলে দিচ্ছে, না এটা মিথ্যা। আচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন *'বাচারম্ভাণং বিকারো নামধেয়ম্'*(৬/১/৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদের এটি একটি খুব বিখ্যাত মন্ত্র, যত রকমের বিকার দেখছ সব *বাচারম্ভাণং*, শুধু নামধেয় আর শব্দ মাত্র। তাহলে প্রাণটা কি? প্রাণটাও বিকার, একটা শব্দ মাত্র, এর বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। বাস্তবিক অস্তিত্ব যদি থাকত তাহলে কোন অবস্থায় তার নাশ হবে না। একটা অবস্থায় প্রাণের নাশ হয়ে যায়। সমাধির অবস্থায় বা মুক্তির অবস্থায় এই প্রাণকেও জ্ঞানী অতিক্রম করে যায়।

আচার্য বলছেন *অবিদ্যাবিষয়েণানৃতেন প্রাণেন*, অবিদ্যা বিষয় হেতু প্রাণ মিথ্যা হওয়ার জন্য পরব্রহ্মকে *সপ্রাণত্বং* বলে কখন সিদ্ধ করা যায় না। প্রাণই যদি মিথ্যা হয় তাহলে যিনি বাস্তবিক আছেন তাঁর মধ্যে প্রাণ কোথা থেকে আসবে। ঋষিরা নিজেদের মধ্যে নানা রকমের প্রশ্ন তুলতেন। সেই সময় হয়ত কেউ প্রশ্ন তুলেছিল ঈশ্বরের মধ্যে কি প্রাণ বিদ্যমান? তখন এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে ঈশ্বরের মধ্যে প্রাণ থাকে না। এই কারণে একেবারে কট্টর বেদান্তী বা ঘোর অদ্বৈতীরা শক্তিকেও মানেন না। প্রাণ মিথ্যা তাই ঈশ্বরের সাথে প্রাণের কোন সম্পর্কই নেই। আচার্য উপমা দিয়ে বলছেন সন্তানহীন এক পুরুষ স্বপ্নে দেখল তার একটি সন্তান হয়েছে, তার ঘুম যখন ভাঙবে তখন তাকে তাই বলে সন্তানবান বলা হবে না, সে সন্তানহীন হয়েই থাকবে। এই যে প্রাণ, এটা হল মিথ্যা, কারণ যত রকমের বিকার আছে সবই শব্দের খেলা মাত্র। তাই ঈশ্বরের মধ্যে প্রাণ থাকতে পারেনা। আগের মন্ত্রে যে অপ্রাণো বলা হয়েছিল, সেটাকেই এখানে সিদ্ধ করা হল।

এরপর মন, ইন্দ্রিয়সমূহ আর ইন্দ্রিয়সমূহের যত বিষয় সব জন্ম নেয় এই প্রাণ থেকে। এবার এখানে বুঝতে হবে, সৃষ্টির আগে এরা সব অসৎ ছিল, অর্থাৎ এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, ঠিক তেমনি লীন হয়ে গেলে এরা আবার অসৎ হয়ে যায়। তার মানে, সব কিছুই আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে, ইন্দ্রিয় আছে আর সব এই ঈশ্বর থেকেই জন্ম নিচ্ছে কিন্তু এদের বাস্তবিক সত্তা বলে কিছু নেই। কিন্তু যখন আমাদের এই অবস্থা থেকে দেখছি তখন সবই আছে, সবই সত্য। সেইজন্য বলছেন *তদেতৎ সত্যম্*, এগুলো সবই সত্য, কর্ম করলে কর্মের ফল পাবে, ভালো কর্ম করলে স্বর্গে যাবে এটাও সত্য, স্বর্গ থেকে তোমার বিচ্যুতি হবে সেটাও সত্য, তখন তুমি কাঁদবে তাও সত্য। কিন্তু আসল সত্য হল সেই সত্তা যেখানে কোন প্রাণ নেই, কোন মন নেই, কোন কিছু নেই। অথচ সেখান থেকেই এই জিনিষগুলোর উৎপত্তি হচ্ছে।

এতসম্মাজ্জায়তে প্রাণো, এই যে ঈশ্বরের কথা বলা হল এখান থেকেই প্রথম জন্ম নেয় প্রাণ। প্রাণ যখন জন্ম নিয়ে নিল তারপর এক এক করে পর পর মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, পঞ্চতন্মাত্রা গুলোর জন্ম হতে শুরু করে। বেদান্তের মতে সৃষ্টিতে পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম থেকে প্রথমে আসছে প্রকৃতি। তবে উপনিষদে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার করা হয় না, এখানে বেশীর ভাগ সময় প্রাণ আর তা নাহলে বলবেন হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ মানে সোনার ডিম। তাই বলে যে সত্যিকারের সোনার ডিম আছে তা নয়। যেমন ডিম থেকে সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয়, ঠিক তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এই ডিম থেকে হয়। কি ডিম? সোনার ডিম। বোঝানর জন্য বলা হয়। কিন্তু পৌরানিক কাহিনীতে এটাকে সোনার ডিম রূপেই দেখান হয়। এই হিরণ্যগর্ভ থেকে সব থেকে প্রথমে সৃষ্টি হয় মহৎ মনের। মহৎ মনের অর্থ হল Cosmic Mind। এই মন আমার আপনার মনের কথা বলছেন না। প্রাণ থেকে মনের জন্ম হল, মন থেকে *সর্বেন্দ্রিয়াণি চ*, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। সেখান থেকে অহঙ্কারের জন্ম হয়, যেখানে তার বোধ হয় আমি আছি, এটাকে বলা হয় Cosmic Ego। এর পরের ধাপে পঞ্চতন্মাত্রার জন্ম হয় – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই তন্মাত্রা গুলো আবার পরে একটা আকার নিয়ে নেয় – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী – এটাকেই বলা হয় পঞ্চ মহাভূত। সেখান থেকে আবার স্থূল ইন্দ্রিয়াদির জন্ম নিচ্ছে। সবকটিকে মিলিয়ে চব্বিশটা তত্ত্ব হয়ে যায়। এই সব কিছুর জন্ম হয় সেই ব্রহ্ম থেকে, কিন্তু সৃষ্টির এই পুরো পদ্ধতি আর সৃষ্ট পদার্থের সাথে ব্রহ্মের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আচার্য প্রথমেই বলে দিচ্ছেন এগুলো সব মিথ্যা। মিথ্যা যদি না হয় তাহলে এগুলো সব হয়ে যাবে পরিণাম। পরিণাম যদি হয়ে যায় তাহলে পুরো বেদান্ত দর্শন অন্য দিকে ঘুরে যাবে।

মুণ্ডকোপনিষদের মূল প্রশ্ন ছিল কোনটা জানলে সব কিছু জানা যায়। প্রথমে দুটো বিদ্যা আছে বলার পর এবার বলছেন সেই পুরুষকে জানলে সবটাই জানা যায়। পরা বিদ্যার বিষয় হল এই নির্বিশেষ সত্য পুরুষ, মানে নির্গুণ ব্রহ্ম। এই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ সংক্ষেপে দ্বিতীয় মন্ত্রে বলে দেওয়া হয়েছে, তিনি দিব্য মানে স্বয়ং প্রকাশ, অমূর্ত্য, তাঁর কোন আকার নেই আর তিনি পরিপূর্ণ হয়ে সর্বত্র বিরাজমান। সংক্ষেপে বলে দেওয়ার পর শ্রুতি এইবার এই তত্ত্বটাকেই বিস্তারপূর্বক বলতে যাচ্ছে। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *সংক্ষেপেবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি*। কোন জিনিষকে যখন সূত্রাকারে বলে

দেওয়া পর সেই জিনিষটাকেই যখন বিস্তারিত ভাবে বলা হয় তখন সেই বিষয়টিকে বুঝতে সুবিধা হয়। মহাভারতে ঠিক এই জিনিষটাই পাওয়া যায়। ব্যাসদেব প্রথমে মহাভারত খুব সংক্ষেপে লিখলেন, সেটার তিনি নাম দিলেন জয়। এরপর আরেকটু বড় করে লেখার পর তার নাম দিলেন ভারত। পরে আরও বিস্তারিত করে লেখার পর গিয়ে দাঁড়াল মহাভারত। সেখানে বলা হচ্ছে, যাঁরা উচ্চমানের লেখক তাঁরা একই বিষয়কে প্রথমে সংক্ষেপে এবং পরে বিস্তারিত ভাবে রচনা করেন। গীতা যখন শুরু হয় সেখানেও ঠিক একই জিনিষ হয়েছে। দশ দিন যুদ্ধ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে খুব সংক্ষেপে বলছে 'পিতামহ ভীষ্মের পতন হয়ে গেছে, তিনি এখন শরশয্যায় শায়িত'। ভীষ্মের পতনের সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রচণ্ড শোকাহত হয়ে সঞ্জয়কে বলছেন 'তুমি আমাকে আরও বিস্তারিত ভাবে বল'। তারপরে সঞ্জয় গীতার বর্ণনা শুরু করছে। গীতার কথা দশম দিন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আসছে। প্রথমে সংক্ষেপে খবর দিয়ে দেওয়া হল। ধৃতরাষ্ট্র শুনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তিনি যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে যা যা হয়েছে তার সবটাই ক্রমানুযায়ী বলতে বললেন। অভিমন্যু বধের ঘটনাও ধৃতরাষ্ট্র বিস্তার করে বলতে বলেছিলেন। এখনও দেখা যায় কেউ মারা গেলে তার মৃত্যু সংবাদটা প্রথমে সূত্রে বলা হয়। বলার পর এবার জিজ্ঞেস করবে – কি হয়েছিল ঠিক করে বলতো। একটা জিনিষকে যখন বুঝতে হয় বা ওই ব্যাপারে যদি তার আগ্রহ থাকে তাহলে সেটা প্রথমে তাকে সংক্ষেপে বলা হয়। সংক্ষেপে বলে দেওয়ার আবার সেটাকেই বিস্তার করে বলা হয়, তখন বক্তব্যর বিষয়বস্তুটা পরিষ্কার হয়। সংক্ষেপে বলে দিলে আবার জিনিষটা পরিষ্কার হয় না, আর প্রথমেই বেশী লম্বা করে বললে শ্রোতার মন সব কিছু ধারণা করতে পারেনা বলে সংশয় তৈরী হয়।

সেই জিনিষটাকেই বিস্তার করে বলছেন এই পুরুষ থেকে বিরাটের জন্ম হল। বিরাটকে বলছেন যিনি প্রথম পুরুষ। এই জায়গাটা অত্যন্ত কঠিন আর ধারণা করাও খুব জটিল। এই কারণেই বলা হয় উপনিষদাদি বার বার পড়তে হয় আর সাথে সাথে তপস্যাও করতে হয়। পুরুষসূক্তমেও এই একই জিনিষ বর্ণনা করে বলছেন সেই পুরুষ থেকে অধিপুরুষের জন্ম হল। আসলে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। সৃষ্টিকে আমরা মায়াই বলি, শক্তিই বলি যাই বলি না কেন, সৃষ্টি যখন হয় তখন একটা কিছু হয়। একটা কিছু যেটা হচ্ছে সেখানে প্রথম যার উৎপত্তি হয় তাকে বলছেন প্রাণ। শাক্ত মতে এই প্রাণকেই বলছে কালী, সাংখ্য মতে বলছে প্রকৃতি ইত্যাদি। মূল কথা শক্তির খেলা শুরু হল। ছিলেন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, সেখানে এখন এসে গেল প্রাণ। নাসদীয়সূক্তমে এই একই ভাবনা প্রতিফলিত করে প্রাণ আর আকাশকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রকৃতিই শুধু যদি থাকে তাহলে তো পুরো সৃষ্টি জড় হয়ে যাবে। তাই সেই যে পুরুষ তিনি এখন হিরণ্যগর্ভে প্রবেশ করে তিনিই আবার প্রথম জন্ম নিচ্ছেন। একেই বলছেন বিরাটের জন্ম হল। তার মানে, যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যিনি অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনি নিজের শক্তিকে অবলম্বন করে নেন, শক্তিকে অবলম্বন করার পর বা আবরণ আসার পর যাঁকে প্রথম দেখা যাচ্ছে বা যিনি প্রথম বেরিয়ে আসছেন তাঁকেই বলছেন বিরাট পুরুষ বা শুধু বিরাট, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্মকেই কোথাও বলছেন প্রথম পুরুষ, বেদে তাঁকেই কখন বলছে অধিপুরুষ, কখন বিরাট আবার কখন বিষ্ণু বলছেন। বিভিন্ন নামে তাঁকে পরিভাষিত করা হয়। সৃষ্টির শুরুতে প্রথম কম্পন শুরু হওয়া মানেই প্রাণের জন্ম হল, শক্তির খেলা শুরু হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। জল হেলতে দুলতে শুরু করল মানে প্রাণের সঞ্চার হল, এই অবস্থায় সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ যেন সেই প্রাণের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। এবার যে আসল সৃষ্টি হবে, তিনিও এই পুরুষ থেকেই হবেন। যে পুরুষ বেরিয়ে এলেন আর ওই দিকে যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আছেন এই দুটোতে কোন তফাৎ নেই। আর যে পয়েন্টে প্রাণের জন্ম হয়েছে এটাকেই স্বামীজী বলছেন মায়া। এখান থেকেই কার্য কারণের সম্পর্ক, সময় আর আকাশের জন্ম হয়। এই জিনিষগুলোই অদ্বৈতকে দ্বৈত থেকে আলাদা করে দেয়। এই বিভাজন রেখার এই পারে যখন চলে আসেন তখন তাঁকে বলছেন বিরাট পুরুষ।

বলছেন তাঁরই নিজের প্রাণ, প্রাণ মানে এখানে শক্তি। এই প্রাণকে লক্ষিত করেছেন হিরণ্যগর্ভ দিয়ে। এই শব্দগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু খুব সহজ ভাবে বলা হয় – শুদ্ধ

সচ্চিদানন্দ আছেন, তিনি তাঁর মায়ার আবরণের মাঝখান দিয়ে যখন এদিকে চলে আসেন তখন তাঁকে বলা হচ্ছে বিরাট। এই বিরাটের আরেকটা নাম আছে। যত রকমের স্থূল শরীর হতে পারে তার যে সমষ্টি তাঁরও নাম বিরাট। ঈশ্বর মানেই বিরাট। বলছেন *এতসম্মাজ্জায়তে*, একটা থেকে আরেকটার উৎপত্তির কথা বলা হচ্ছে, এর সব কিছুর সমষ্টিকে যদি নেওয়া হয় সেটাকেই তখন বলা হয় বিরাট। কিন্তু এই বিরাটের জন্ম কোথা থেকে হচ্ছে? হিরণ্যগর্ভ থেকে। কিন্তু তিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছুই নন। এই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই যখন প্রকৃতির এই দিকে চলে আসছেন, তাঁর যে সমষ্টি রূপ এই সবটাকে মিলিয়ে বলা হয় বিরাট পুরুষ। শুধু তাই নয়, সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ যিনি হিরণ্যগর্ভের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনিই সৃষ্টি করে আবার তার মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে যিনি চৈতন্য রূপে বিরাজমান, তিনিই সেই বিরাট। বিরাটের তাই দুটো রূপ এসে যাচ্ছে, বিরাটের একটা সমষ্টি রূপ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, তারা, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, সৌরজগৎ সব মিলিয়ে যে সামগ্রিক রূপ দাঁড়াচ্ছে সেটাই যেন ঈশ্বরের শরীর। সেই বিরাটই চৈতন্য রূপে সমস্ত প্রাণীর ভেতরে বিরাজমান। এই বিরাটকেই আবার বলা হয় বিষ্ণু। কিন্তু বিষ্ণু আর হিরণ্যগর্ভে একটা তফাৎ এসে যায়। হিরণ্যগর্ভ বলতে এখান বলছেন প্রাণকে, প্রাণ মানে ঈশ্বরের যে শক্তি সেই শক্তিকে এখানে বলছেন হিরণ্যগর্ভ। ঐ হিরণ্যগর্ভ দিয়ে বা প্রকৃতি বা মায়ার আবরণের ভেতর দিয়ে যখন সেই সচ্চিদানন্দ দেখা যাচ্ছে তখন তাঁকে বলছেন বিরাট পুরুষ। আমাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু আছে তার সমষ্টিকে বলছে বিরাট। আবার আমাদের ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা রয়েছেন তাঁকেও বলা হচ্ছে বিরাট। এই বিরাটকেই যখন দেখছেন সব কিছুর দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা রূপে, তখন তাঁকে বলছেন বিষ্ণু।

তাহলে শেষ পর্যন্ত বিরাটের এই তত্ত্বটা কি সিদ্ধান্তে দাঁড়াচ্ছে? যাবতীয় যা কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে তাতে ভগবান বিষ্ণু ওতপ্রোত ভাবে আছেন। ভগবান বাইরে কোথাও বসে বসে আমাদের পুতুলের মত নাচিয়ে যাচ্ছেন, ব্যাপারটা তা নয়। সব কিছুর ভেতরে তিনিই আছেন। আবার সমষ্টি শরীর রূপে তিনি ব্যপ্ত হয়ে আছেন। আমার আপনার এই যে শরীর এটা যে ঈশ্বরের শরীর তা নয়, কিন্তু এর ভেতরে যিনি চৈতন্য আছেন সেটা তিনিই। তার মানে তিনিই আছেন, ঠিক তার বাইরে যদি বলা হয় সেটা তিনি নন, কিন্তু আবার পুরোটা মিলিয়ে তিনি। এই একটা বিচিত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তবে যদি বলি এই গ্লাশের ভেতরে কে আছেন? তখনও বলা হবে, হ্যাঁ এই গ্লাশের ভেতরেও ওতপ্রোত ভাবে তিনিই আছেন। গ্লাশের যে আত্মা সেটাও তিনি। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান একটার পর একটা বলে যাচ্ছেন নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ। এই যে বিভিন্ন জিনিষকে নিয়ে বলছেন প্রত্যেকটি জিনিষের সারটুকু আমি, সার মানে আত্মা। সেই তিনিই সব কিছুতে ওতপ্রোত ভাবে রয়েছেন আর তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যা কিছু আছে সেটাও তিনিই হয়েছেন। বিরাটের মূল কথা হল তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। এই একটি জিনিষকেই বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝান হচ্ছে। এগুলো কোন কল্পনা করে বা কবিত্ব ভাবকে প্রস্ফুটিত করার জন্য বলা হচ্ছে না, এখানে একটা বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে হচ্ছে। সেই সত্যটা কি? ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সব তাঁরই রূপ। তাঁকে তিনটে রূপে দেখা হচ্ছে – সমস্ত স্থূল শরীরের যে সমষ্টি রূপ সেটা হল বিরাট। এই বিরাটের জন্ম প্রাণ থেকে, প্রাণ মানে ঈশ্বরের শক্তি। দ্বিতীয় প্রত্যেক জীবের মধ্যে চৈতন্য রূপে যিনি রয়েছেন তাঁকেও বিরাট বলছেন। আর তৃতীয় রূপ, সেই বিরাটই ভগবান বিষ্ণু, তিনিই আদি পুরুষ।

এই আদি পুরুষ হলেন, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ থেকে যে প্রাণের জন্ম হয়েছে, সেই প্রাণকে আশ্রয় করার পর দ্বৈত জগতে যাঁকে প্রথম দেখাচ্ছে, তিনিই হলেন সেই আদি পুরুষ। তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠতম। তার মানে, আমি আর শ্রীকৃষ্ণ কখন এক হবো না। যখনই আমি বোধ এসে যাবে তখন আমি আর শ্রীকৃষ্ণ সব সময় আলাদা থাকব। শ্রীকৃষ্ণ সব সময় নিয়ন্তা, তিনি সব সময় ভগবান। আমি আর ভগবান সব সময় আলাদা। তিনিই অধিপুরুষ বা আদি পুরুষ বা তিনি হলে বিরাট। তিনিই আবার ভগবান বিষ্ণু। আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই এক নই। কিন্তু যখন ব্রহ্ম রূপে দেখব তখন তো এই আমি বোধটা থাকবে না। এই যে নানান তত্ত্ব দিয়ে তাঁকে জানা যাচ্ছে, সেটাও সেই পুরুষ থেকেই জন্ম নিয়েছে। কোন পুরুষ থেকে? যেখানে দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা

হয়েছিল, *দিব্যো হ্যমূর্তঃ*। আর তাই নয়, এটা হল পুরুষ রূপ। সগুণ ঈশ্বর আর নির্গুণ ঈশ্বরে কোন তফাৎ নেই। আচার্য শঙ্কর বার বার এই কথা বলছেন। কোথা থেকে কিভাবে আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে আচার্য সগুণ ঈশ্বরকে মানেন না। কিন্তু তা নয়, তিনি পুরোটা মানছেন। আচার্য বলছেন যিনি সগুণ ঈশ্বর তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। যখন প্রাণের ব্যবধান এসে যায়, যখন প্রাণের এই দিকটা দেখছি তখন সগুণ ঈশ্বর আবার অখণ্ড রূপে দেখছি তখন সেটাই নির্গুণ ব্রহ্ম।

সেই সর্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব ভূতের মধ্যে যিনি বিরাজিত সেই ব্রহ্মের যে বিশ্বরূপটি কি রকম বলছেন। এই যে আমরা এতক্ষণ বিরাটের আলোচনা করলাম, যত দেহ আছে সবার সমষ্টি রূপ হলেন সেই বিরাট। সেই বিরাটের রূপটা কি রকম? সেই যে ভগবান তাঁর দেহের স্বরূপটা কি রকম? আমরা তো বলতে পারি সব মন্দিরে গেলেই তো ভগবানের রূপ দেখা যায়। মা কালীর মন্দিরে গিয়ে দেখছি তাঁর এই রূপ, দুর্গামন্দিরে গিয়ে মা দুর্গাকে এই রকম দেখছি, শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীরামচন্দ্রকে দেখছি। কিন্তু উপনিষদে ঈশ্বরের রূপের যে বর্ণনা অন্য রকম যেটা আমরা পুরুষসূক্তমেও পাই। শব্দের কিছু এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু ভাবের কোন তফাৎ নেই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, ভৌতিক রূপে যা দেখা যাচ্ছে তা তিনি। তিনি কি রকম –

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা।।২/১/৪।।

(মস্তক যাঁর দ্যুলোক, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর চক্ষু, কর্ণ দিক্সমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং যাঁর পদদ্বয় থেকে পৃথিবী জাত হয়, তিনিই সমুদয় স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা)

একদিকে তিনি বিরাট। একদিকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যা কিছু হয়েছে, তার যে সমষ্টি রূপ সেটা তিনি। যেমন আমার এই শরীরটা পুরো মিলিয়ে আমি অমুক ব্যক্তি। আবার আমার ভেতরে একজন আছেন। তিনি শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে বলবে অমুক ব্যক্তি মারা গেলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সমষ্টি রূপ সেটাও সেই বিরাট পুরুষ। আবার প্রত্যেক জীবের মধ্যে যিনি আছেন তিনিও সেই বিরাট পুরুষ। *অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ* দিয়ে সেই বিরাটের শরীরের বর্ণনা শুরু করছেন আর শেষ করছেন তিনিই *সর্বভূতান্তরাত্মা*, প্রত্যেক জীবের ভিতরে তিনিই রয়েছেন। মূল কথা ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই, অনুর মধ্যেও তিনিই বিদ্যমান। এই গ্লাশের ভেতরে তিনিই বিদ্যমান, আর এই গ্লাশের যে অনু আছে তাতেও তিনিই আছেন। আবার এই গ্লাশ, বোতল, টেবিল, আমাদের সবাইকে মিলিয়ে যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেটাও তিনি। বাইরে ভেতরে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখছেন, আমরা জগতের সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখছি, এটা কেন হচ্ছে? এটাই মায়া, এটাই ব্যবধান। ভৌতিক রূপে কখনই বলা যাবে না আমিই সেই ঈশ্বর, আমি হলাম সেই ঈশ্বরের অংশ।

এবার পর পর এক এক করে এই ঈশ্বরের শরীরের বর্ণনা চলতে থাকবে। প্রথমে বলছেন *অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ*। প্রথমে অগ্নি, এই অগ্নি বলতে আমরা যে অর্থে অগ্নি মনে করি সেই অগ্নিকে বলা হচ্ছে না। এই কারণে উপনিষদ কেউ সরাসরি পড়তে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। তাই বলা হয় আচার্যের ভাষ্য নিয়ে উপনিষদ না পাঠ করলে এর অর্থ কেউ বুঝতেই পারবে না। এখানে অগ্নি বলতে বোঝাচ্ছে দ্যুলোক, অগ্নির অর্থ যদি দ্যুলোক না করা হয় তাহলে পরের শব্দগুলোর অর্থ বার করতে গোলমাল হয়ে যাবে। মূর্ধা যদি অগ্নি হয় অর্থাৎ মাথা যদি অগ্নি হয় তাহলে এর কোন অর্থই দাঁড়াবে না। সেইজন্য বলছেন *অগ্নির্মূর্ধা*র অর্থ হবে দ্যুলোক। আমাদের শাস্ত্রে অনেকগুলো লোকের বর্ণনা করা হয়েছে। আর বিভিন্ন জায়গায় এই লোকগুলোকে বিভিন্ন অর্থে নেওয়া হয়। সব থেকে প্রচলিত যে তিনটি লোকের কথা বলা হয়ে তা হল ভূলোক, দ্যুলোক আর স্বর্গলোক। ভূলোক বলতে এই পৃথিবীলোককে বোঝায়, স্বর্গলোক হল যেখানে দেবতারা বাস করেন। এই দুটো

লোকের মাঝখানের স্থানকে বলা হয় দ্যুলোক। আবার অন্য অন্য জায়গায় ভূঃ, ভুবঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ, সত্য ইত্যাদি যে লোকের কথা বলা হয়েছে সেখানে আরেক রকম বর্ণনা আছে। কিন্তু খুব প্রচলিত যে ধারণা আমরা পাই তাতে দেখা যায় এই ভূঃ লোক রয়েছে সূর্যলোকের মধ্যে, অথবা সূর্যলোককে আবার আলাদা করেও দেখান হয়। এই সূর্যলোকের উপরে রয়েছে দ্যুলোক আর দ্যুলোকের উপরে আছে চন্দ্রলোক। এগুলো আকাশের সূর্য আর চন্দ্র নয়, এগুলো লোকের নাম।

স্বামীজী ই টি স্টার্ডিকে একটা চিঠিতে এই সব লোকের ব্যাপারে নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলছেন এই সূর্যলোক হল এই জগৎ, যে জগৎকে আমরা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যেখানে পদার্থ আর পদার্থের উপর যে শক্তি কাজ করে এই দুটো আলাদা। এই মন্ত্রে দ্যুলোককে বলা হচ্ছে বিরাট পুরুষের মস্তক। তবে ঋষিরা দ্যুলোক বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন এখন বলা খুব মুশকিল। স্বামীজীর ব্যাখ্যাকে যদি মানা হয় তাহলে জিনিষটা সত্যিকারের স্পষ্ট হয়ে যায়। আমি যদি একটা গোলাকার বস্তুর কথা কল্পনা করি, এখন এই গোলাকার বস্তুর বাইরে আরেকটা গোলাকার বস্তু এই গোলাকার বস্তুটিকে ওতপ্রোত ভাবে ঘিরে রেখেছে। তারও বাইরে আরেকটা গোলাকার বস্তু সেই গোলাকারটাকে ঘিরে রেখেছে। যেমন একটা বলের মধ্যে একটা বল, সেই বলের মধ্যে আরেকটা বল, এই ভাবে রয়েছে। জিনিষটা একটা থেকে আরেকটা সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে যাচ্ছে। এখন একটা গোলাকার জালির কথা কল্পনা করুন। সেই জালির ভেতরে কিছু পাথর ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই গোল জালির বাইরে আবার আরেকটা গোল জালি আছে আর তাতে বালি রাখা আছে। এই বালিগুলো ভেতরে যেখানে পাথর রাখা আছে সেখানে আসতে পারবে কিন্তু পাথরগুলো বালির জালিতে যেতে পারবে না। আবার বালির পরে আরেকটা জালিতে জল আছে। এই জল নিজের জায়গা থেকে বালিতে, বালি থেকে পাথর এই তিনটে জায়গাতেই যেতে পারবে। আমাদের এই লোকগুলো কিছুটা এই ধরণের। যেটা সূক্ষ্ম সেটা স্থূলকে ঘিরে রেখেছে। স্থূলের ভেতরে সূক্ষ্ম যেতে পারছে কিন্তু স্থূলটা যেতে পারছে না। ঠিক তেমনি দেবতারা আমাদের আশে পাশেই আছেন আবার আমাদের থেকে অনেক দূরেও চলে যেতে পারেন। আমরা কিন্তু দেবতাদের কাছে যেতে পারবো না। আমরা হলাম এই পৃথিবীলোকের বাসিন্দা, যেখানে সব কিছু স্থূল রূপে রয়েছে। আমাদের দেবতারা ঘিরে রেখেছে। আমাদের ও দেবতাদের মাঝখানে আছে পিতৃলোক, যেখানে পিতৃরা বাস করেন। পিতৃলোকের উপরে আছে দেবলোক, দেবলোকের উপরে আছে ঋষিলোক ইত্যাদি। এই ভাবে একটার পর একটা লোক বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু যেটা সব থেকে পেছনে আছে, যেটা সূক্ষ্মতম সেটা বিরাটের মস্তক।

ছান্দোগ্য উপনিষদে একটা মন্ত্র আছে যেখানে এর কথাই বলা হয়েছে '*অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ*'। আচার্য শঙ্কর যা কিছু ব্যাখ্যা করেন সেটা উপনিষদ থেকে নিয়েই ব্যাখ্যা করেন, নিজের থেকে বানিয়ে কিছু বলেন না। শুধু তিনি দেখিয়ে দেন তিনি যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন এটা তাঁর মাথা থেকে বেরোচ্ছে না, এর পেছনে শ্রুতির অনুমোদন আছে। *অগ্নির্মূর্ধা*কে দ্যুলোক কেন বলা হচ্ছে? আচার্য শঙ্কর দেখিয়ে দিচ্ছেন ছান্দোগ্য উপনিষদেই বলা আছে *অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ*, হে গৌতম! এই দ্যুলোকই অগ্নি। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে আধার করে আচার্য বলছেন এই অগ্নি মানে দ্যুলোক, এটা যেন তাঁর মস্তক। *চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ*, সূর্য আর চন্দ্রমা যেন তাঁর চোখ। *দিশঃ শ্রোত্রে*, যে দশটি দিশা অর্থাৎ দিক আছে সেটা তাঁর কর্ণ। *বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ*, বেদ হল তাঁর বাণী। এই যে পুরুষ, যে বিরাটের কথা বলা হচ্ছে তাঁর রূপ কি রকম? উচ্চতম স্বর্গ যেটা সেটা তাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য তাঁর চক্ষু। আকাশে চন্দ্র আর সূর্যকেই আমরা সব থেকে বৃহদাকারে জ্যোতিষ্মান দেখি বলে এই রকম বলছেন। কারণ তাঁরা জানতেন চন্দ্রমা পরিক্রমা করে। এগুলো বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে, এই দুটো যেন তাঁর চোখ। তাহলে কর্ণ কোনটা? যতগুলো দিশা আছে সব তাঁর কর্ণ। বিরাটের মুখ আছে, সেই মুখ দিয়ে তিনি কি কথা বলেন? *বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ*, বেদে যা কিছু আছে সেটাই তাঁর বাণী। এটিও আমাদের খুব প্রচলিত ধারণা বেদ হল ঈশ্বরের বাণী, তাঁর শ্রীমুখ থেকেই বেদ নির্গত হয়েছে। নিঃশ্বাস যেমন অনায়াস ভাবে নিঃসৃত হয়, বেদের সব কথা ভগবানের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত বেরিয়ে

এসেছে। এক একটি মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার করে বুঝতে আমাদের কত সময় লেগে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবানের মুখ থেকে এগুলো অনায়াস ভাবে বেরিয়ে এসেছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত বেরিয়ে আসছে। বলা হয়, ভগবানের মুখ থেকে যেটাই বাণী হয়ে বেরিয়ে আসে সেটাই বেদ। ঠাকুর যা কিছু বলে গেছেন সেটাকে কথামৃতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাই কথামৃত হয়ে গেল বেদ। ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা মানেই ঈশ্বরীয় কথা, আর ঈশ্বরীয় কথা মানেই বেদ। হিন্দুদের কাছে কোন কথা যদি ঈশ্বরীয় কথা না হয় তাহলে সেই কথার কোন মূল্য নেই। বেদ হল ভগবানের কথা, ভগবানের কথা বলেই বেদের এত প্রাধান্য। সব হিন্দুরাই তাই বেদকে মানে। মুসলমানদের কাছে কোরান যেমন আল্লার কথা, সেইজন্য কোরানের উপর আর কিছু নেই। আল্লার কথা বলেই সব মুসলমান কোরানকে মান্যতা দেয়।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য, বায়ু যেটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটাই বিরাটের প্রাণ। আমরা যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছি সেটা বাতাস রূপেই আমাদের ভেতরে যাচ্ছে। তেমনি এই পুরো বিশ্বে যে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এটাই যেন তাঁর প্রাণ। এটা কি সত্যিকারের বিরাটের প্রাণ? না, সব কিছুর সমষ্টি যে তিনি এটাকেই উপমা দিয়ে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। *হৃদয়ং বিশ্বমস্য*, সমস্ত বিশ্ব যেন তাঁর অন্তঃকরণ। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই পুরো বিশ্বকে হঠাৎ করে কেন তাঁর হৃদয় বলা হচ্ছে? হৃদয় বলতে বোঝাচ্ছে অন্তঃকরণ। এই জায়গাটা আবার খুব জটিল। এই মন্ত্রগুলো যদিও অত্যন্ত কঠিন কিন্তু এটাই হিন্দুদের ঠিক ঠিক দর্শন। আমরা এখানে সবাই জাগ্রত, আমি আপনাদের দেখছি, আপনারা আমাকে ও আর সবাইকে দেখছেন। আমরাই আবার যখন ঘুমোই তখন ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্নের মধ্যেও তো অনেক কিছু দেখছি। যখন গভীর নিদ্রায় সুষুপ্তিতে চলে যাই তখন আমাদের কোন হুঁশ থাকে না। তখন এই জগৎটা কোথায় চলে যায়? বিশ্ব জগৎটা চলে গেল, স্বপ্নের জগৎও চলে গেল। এবার এই জগৎটা কোথায় আছে?

বেদান্তের এটাই সব থেকে কঠিন ও মৌলিক প্রশ্ন। কট্টর বেদান্ত শুধু এই একটি প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন ঘুমোচ্ছি তখন আমার কাছে বহির্জগৎ নেই কিন্তু স্বপ্নের জগৎ আছে। গভীর নিদ্রায় এই স্বপ্ন জগৎটাও হারিয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে জগৎটা তাহলে কোথায় গেল? আবার সুষুপ্তি থেকে যখন ফেরত আসা শুরু হয় তখন প্রথমে আসে মনের জগৎ, তারপরে সৃষ্টি হয় বহির্জগৎ। তাহলে জগৎটা কোথায়? বেদান্তের কাছে এটি একটি অত্যন্ত কঠিন ও গূঢ় প্রশ্ন। মাণ্ডুক্যকারিকা উপনিষদ শুধু এই প্রশ্নের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। যাঁরা জ্ঞানী সাধু, যাঁদের আমরা বলি ঘোর বেদান্তী সাধু, ঠাকুর যাঁদের বলছেন শুষ্ক সাধু এনারা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের বিচারের মধ্যেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেন। জাগ্রত অবস্থায় জগৎ আছে, স্বপ্ন অবস্থায় জগৎ অন্য রকম আর সুষুপ্তিতে কিছুই নেই। কার কাছে নেই? আমার ক্ষেত্রে। তাহলে ভগবানের ক্ষেত্রে কি হবে? বিরাট পুরুষ যিনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি রূপ, তাঁরও তো এই একই অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। তিনি যখন জাগ্রত অবস্থায় আছেন তখন এই সমষ্টি জগৎ আছে, তিনি যখন স্বপ্ন অবস্থায় তখন তাঁর মনের লয় হয়ে যাচ্ছে আর যখন সুষুপ্তিতে চলে যাচ্ছেন তখন কোন কিছুই নেই। কিন্তু সত্যিই কি জগৎটা লয় হয়ে যাচ্ছে? কারণ যখন সুষুপ্তি অবস্থা থেকে জাগ্রত অবস্থায় আসছে তখন জগৎ সেই আগের অবস্থা থেকে আবার ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকছে। লয় হয়ে গিয়ে আবার তার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। তাহলে কি হচ্ছে? আসলে জগৎট লয় হয়ে যাচ্ছে আমার অন্তঃকরণে। সেখান থেকেই আবার সৃষ্টি বেরিয়ে আসছে। কার জন্য বেরিয়ে আসছে? আমার জন্য। তার মানে আমার নিত্য সৃষ্টি, নিত্য প্রলয় হচ্ছে।

ভগবানেরও ঠিক তাই হচ্ছে। এই অবস্থাত্রয়ের বিচার না করা পর্যন্ত বেদান্তে প্রবেশ করা যাবে না। কিন্তু অবস্থাত্রয় বিচার করতে গেলেই আমাদের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দেবে। মাণ্ডুক্যকারিকা পড়লেই মাথাটা বিগড়ে যায়, অথচ বেদান্তকে জানতে হলে এটাই করতে হবে, অবস্থাত্রয় বিচার ছাড়া বেদান্তের কোন পথ নেই। এই কারণে সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো বেশী আলোচনা করা হয় না। সুষুপ্তিতে আমার জগৎটা মনের ভেতরে লয় হয়ে যায়। সেই মন থেকেই আবার সেই জগৎটাই বেরিয়ে আসছে, মন মানে অন্তঃকরণ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ভগবানের সুষুপ্তি অবস্থায় তাঁর ভেতরে লয় হয়ে যাচ্ছে। তাঁর জাগ্রত অবস্থায় আবার এই

পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে আসে। ভগবানের অন্তঃকরণ মানে এখানে মহৎ এর কথা বলা হচ্ছে। আমাদের যেমন অন্তঃকরণ আছে, যেটাকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার বলছে, ঠিক তেমনি ঈশ্বরেরও অন্তঃকরণ আছে, সেটাকে বলা হয় মহৎ বা Cosmic Mind। অন্তঃকরণ আবার হৃদয়কেও বলা হয়। প্রথমে আসছেন সেই পুরুষ, পুরুষ থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকেই আসছে অহঙ্কার, মানে আমি ভাব। সেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে তন্মাত্রাগুলো। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে মহৎ থেকে, আর মহৎ হল ঈশ্বরের অন্তঃকরণ বা অন্তরাত্মা। তার মানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের অন্তঃকরণ থেকে বেরোচ্ছে আবার এই অন্তঃকরণেই লয় হচ্ছে। সৃষ্টি যখন লয় হয় তখন মহতে গিয়ে লয় হয়। সেইজন্য বলা হচ্ছে *হৃদয়ং বিশ্বমস্য*। এটা কোন কবিতার ছন্দে বলছেন না, একেবারে বাস্তবিক অর্থে বলা হচ্ছে। অবস্থাত্রয় বিচার যখন হয় তখন জিনিষটা এইভাবেই হতে থাকে।

সুষুপ্তিরও পরে আরেকটা অবস্থা আছে, তাকে বলছেন তুরীয়। তুরীয় অবস্থায় চলে গেলে সৃষ্টি আদি কোন কিছুই থাকে না। সুষুপ্তি, স্বপ্ন আর জাগ্রত এই তিনটের মধ্যে সৃষ্টির বাচ খেলা চলতে থাকে। তারপরে আসছে তুরীয়, তুরীয় অবস্থায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এগুলো কিছুই থাকে না। বেদান্তীরা বলেন এই অবস্থাত্রয়কে পার করে ওই তুরীয় অবস্থায় যেতে হবে যেখানে সৃষ্টির সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এই তুরীয় অবস্থাটি হল নির্গুণ ব্রহ্ম। আমার যে নিত্য প্রলয়, নিত্য সৃষ্টি হচ্ছে সেটা চিরদিনের মত তুরীয় অবস্থায় শেষ হয়ে যায়। আমি যদি মারা যাই, তাহলেও কিছুই হবে না। মৃত্যুর পর আমার এই স্থূল শরীরটাই শুধু নাশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুক্ষ্ম শরীরটা থেকে যাচ্ছে যার সঙ্গে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারও জড়িত। সেই সূক্ষ্ম শরীর আবার একটা নতুন শরীর ধারণ করে আবার ওই একই জিনিষ চলতে থাকবে, সৃষ্টি প্রলয় চলতেই থাকবে, কখন বন্ধ হবে না। যে কোন প্রাণীই স্বপ্ন দেখে, যে প্রাণী যত উন্নত সে স্বপ্ন দেখবেই। যে মানুষ বলে আমি স্বপ্ন দেখি না, তাহলে বুঝতে হবে তার স্মৃতিটা দুর্বল আর তা নাহলে মাথাটা খারাপ আছে, স্বপ্ন দেখতেই হবে তাকে। আর সুষুপ্তিও তার হতেই হবে। সুষুপ্তি যদি না হয় তাহলে শরীরটা ভেঙে পড়বে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সুষুপ্তি হবেই, ঐটুকুতেই তার মস্তিষ্কের বিশ্রাম হয়ে যায়। আর আমাদের প্রত্যেকের যে নিজস্ব জগৎ, আমার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব পরিবার, ধন, সম্পত্তি যা কিছু আছে, এই জগৎ নিত্য লয় হয়ে যাচ্ছে আমার অন্তঃকরণে, জাগ্রত অবস্থায় ওটাই আবার অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে আসছে। স্বপ্নে আমি দেখলাম ব্যাঙ্কে আমার দশ লাখ টাকা আছে। সকালে উঠে পাসবুকে দেখছি সেখান থেকে কয়েকটা শূন্য কমে গেছে কি বেড়ে গেছে। জাগ্রত অবস্থার জগতের ধারাবাহিকতাটা নষ্ট হয় না।

ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করেন তখনও এই একই কথা বলা হচ্ছে। *কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্* - ব্রহ্মা যখন ঘুমোন তখন সব কিছু লয় হয়ে যায়। যখন তিনি জাগ্রত হন যেমন কর্মফল নিয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল ঠিক সেইখান থেকেই আবার জীবের সব কিছু শুরু হয়। বাড়ির মায়েরা রাত্রিবেলা এঁঠো বাসন না মেজে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বপ্নে দেখছে কে যেন এসে বাসনগুলো মেজে রেখেছে। যখন সকালে ঘুম ভাঙলো তখন কি দেখে বাসনগুলো মাজা হয়ে গেছে? কখনই তা হবে না। কর্মফল কখন ছাড়বে না। ব্রহ্মাও যখন ঘুমোন, মনে করুন আমি জীব, তখন আমারও লয় হয়ে গেল। সকালে ব্রহ্মা যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন আমারও আবার জন্ম হবে। আমি কোথা থেকে জন্মাব? আমি ঠিক ওই কর্মগুলো নিয়েই জন্মাব। এঁটো বাসনগুলো যেমন টাঁই হয়ে জমান ছিল, কর্মগুলো ঠিক তেমনি জমে থাকবে। ওই কর্মগুলো কোথাও যাবে না। সেইজন্য বলছেন এই জগৎ অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা হল সেই বিরাটের হৃদয়।

আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খুব সুন্দর বলছেন – সমস্ত জগৎ হল এই অন্তঃকরণের বিকার। স্বপ্নটা যেমন আমার মনের বিকার ঠিক সেই রকম জাগ্রত অবস্থায় আমি যা কিছু দেখছি সব আমার মনের বিকার। এটাকে নিয়ে আচার্য আর বেশী কিছু আলোচনা করলেন না। কারণ এরপর আমাদের কাছে জগৎ-টগৎ সব উড়ে যাবে, সেইজন্য বেদান্ত বিচার বেশী করতে নেই। সত্যিকারের উড়ে যায়। যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে যান, সব কিছুর থেকে যে আসক্তি চলে যায়, কোন দিকে যে তাঁদের মন থাকে না, কারণ একটাই। ওঁর কাছে যেমন

স্বপ্নটা মিথ্যা তেমনি জাগ্রতটাও মিথ্যা হয়ে গেছে। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেভাবে অগ্নি থেকে বেরিয়ে অগ্নির মধ্যেই আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের থেকে জগৎ বেরিয়ে ঈশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত থাকে আবার ঈশ্বরের মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়।

পদ্ভ্যাং পৃথিবী, সেই বিরাটের পা হল এই পৃথিবী। যদি আমি ধরে নিই আমি সব থেকে নীচে দাঁড়িয়ে আছি, আর বাকি সবটাই উপরের দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। তখন আমি বিরাট পুরুষ বা ঈশ্বরকে কিভাবে দেখব? এই পৃথিবীটা যেন তাঁর পা, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে সেটা তাঁর প্রাণ, চন্দ্র আর সূর্য তাঁর চক্ষু, দূরে যে তারাদের দেখা যাচ্ছে সেটা তাঁর মস্তক আর মাঝখানে যে আকাশ সেটা তাঁর শরীরের অঙ্গ। আমরা বলতে পারি সূর্য চন্দ্র তো দূরের তারাদের থেকেও ছোট। হোক ছোট, এটা আমাদের বোঝাবার জন্য বলা হল। আর বিশ্ব হল তাঁর হৃদয়, মানে অন্তঃকরণ। কারণ সত্যিকারের বিশ্ব নিত্য তাঁর অন্তরাত্মা থেকে বেরোচ্ছে আবার তাঁর অন্তরাত্মাতে লয় হচ্ছে। যেমন আমার নিজের জগৎ নিত্য সৃষ্টি হচ্ছে আর লয় হচ্ছে।

হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা, এইখানে এসে আচার্য নিজের তরফ থেকে এক লাইন যোগ করে ব্যাখ্যা করছেন। *এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ*, এই যে দেবতা, এতক্ষণ যাঁর কথা বলা হল ইনিই বিষ্ণু। লোকেরা প্রায়ই বলে আচার্য ভগবান মানেন না, অথচ উপনিষদের কোথাও বিষ্ণু শব্দ নেই কিন্তু আচার্য নিজের তরফ থেকে বিষ্ণুকে নিয়ে এসেছেন। ইনিই হলেন সগুণ ঈশ্বর, সগুণ ঈশ্বর মানে বিষ্ণু। এই সগুণ ঈশ্বরকে আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণ বলি তাতে কোন ভুল হবে না, যদি শ্রীরামচন্দ্র বলি তাহলেও কোন দোষ হবে না, ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। তবে মূলতঃ বিষ্ণু নামেই বলা হয়। এই যে বিরাট শরীরের বর্ণনা করা হল, তিনি হলেন বিষ্ণু। অন্য দিকে তিনিই *সর্বভূতান্তরাত্মা*, সব কিছুর মধ্যে তিনি অন্তর্যামী রূপে বিদ্যমান। *এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী*, তিনি প্রথম শরীর ধারণ করছেন। প্রথম জাত এই কারণে বলা হচ্ছে, মায়াকে আশ্রয় করার পর প্রথম যিনি দেহ ধারণ করছেন, যখন দেখাচ্ছে ভগবান ক্ষীরসাগরে শায়িত। ব্রহ্মার উৎপত্তি তাঁরও পরে এবং সৃষ্টির কাজও তারপর থেকে শুরু হয়।

আসলে সৃষ্টিতত্ত্বকে পরিষ্কার করে বলা যায় না, তাই উপনিষদে বিভিন্ন ভাবে এই সৃষ্টিতত্ত্বকে সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, পুরানেও বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে যেটা বেশী প্রচলিত তা হল, তিনি অনন্ত সাগরে অনন্ত শয়নে বিরাজমান। এরপর তিনি যেন মায়ার আশ্রয় করলেন, মায়ার আশ্রয় করার পর দেখা যাচ্ছে এই অনন্ত সাগরে বিষ্ণু অনন্তনাগের উপর অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়ে আছেন। তাঁর নাভি থেকে বেরিয়ে এল এক প্রস্ফুটিত পদ্ম, সেই পদ্মের উপর ব্রহ্মা বসে আছেন। এই উপমাগুলো নিলে সাধারণ মানুষ খুব সহজে ধারণা করতে পারে। এটাও ঈশ্বরেরই অঙ্গ, আর পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই তাঁর শরীর, তিনিই আবার অন্তরাত্মা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান। তাঁরই অন্য রূপ নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। *তত্ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ*, আর এই তিনটে লোকের যদি কল্পনা করা হয়, সুদূরে স্বর্গ, মাঝে অন্তরীক্ষ আর এই পৃথিবীলোক, এই তিনটে লোককে মিলিয়ে যদি একটা শরীর রূপে দেখা হয় সেটাই হয়ে যাবে এই বিরাটের শরীর। আমরা তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখছি, এই রকম কত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে যা আমাদের কল্পনাতেও আসবে না। কালীর উদরে কত ব্রহ্মাণ্ড জন্মাচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে। এই সব কটিকে যদি মিলিয়ে দেওয়া হয় সেটাই হবে বিরাটের শরীর। তিনিই আবার সবার হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে বিরাজমান, তিনিই আবার বিষ্ণু। সেই বিষ্ণু কোথা থেকে এসেছেন? *তস্মাজ্জায়তে*, সেই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে, যাঁকে জানলে সব কিছুকে জানা যায়, সেখান থেকে এই সগুণ ঈশ্বরেরও জন্ম। *এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ*, প্রথমে আমাদের স্থূল জগতের বর্ণনা দিয়ে দেওয়া হল। এরপর বলছেন এই যে স্থূল জগতের শরীর এটা যেন সগুণ ঈশ্বরের শরীর। এই সগুণ ঈশ্বর অন্তরাত্মা হয়ে সব কিছুকে চালাচ্ছেন আবার তিনি নিজেই চলছেন। গাড়ি তিনি, গাড়ির যে ইন্ধন সেটাও তিনি, আর গাড়ির যে চালক সেও তিনি। এই জগৎটা তিনি, আবার প্রত্যকে জীবের মধ্যে তিনিই রয়েছেন, তিনিই চৈতন্য রূপে সবাইকে চালাচ্ছেন। তিনি হয়েছেন, তিনি চলছেন, তিনিই চালাচ্ছেন, এই ভাবটাকে আনার জন্য এত ভাবে

বলা হল। কোনটাকে জানলে সব কিছুকে জানা যাবে? এই জিনিষটাকে জানলে – তিনিই সব কিছু হয়েছেন আর তিনিই সব কিছুকে চৈতন্য রূপে চালাচ্ছেন। এর পরের মন্ত্রগুলিতে এই জিনিষটাকেই ব্যাখ্যা করে যাবেন।

এখানে যে বিরাট রূপী পরমাত্মা বিষ্ণুর বর্ণনা করা হয়, এই পরমাত্মাও এসেছেন সেই নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে। এর আগে বলছেন নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম এক, এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাঁর বৈশিষ্ট্য কি? এই যে কারণরূপ পরমাত্মা, পরমাত্মা থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। ঠাকুর এই ভাবটাকেই বলছেন – তিনি জগৎলীলা করেন, তিনি মানবলীলা করেন, তিনি দেবলীলা করেন আবার তিনিই ঈশ্বরলীলা করেন, তিনি আরও কত কি লীলা করেন। তাই আমরা যা কিছু দেখছি সব তাঁরই রূপ, এই জগৎটা তাঁরই রূপ, মানুষও তাঁরই রূপ। তিনি *দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা*। পরমাত্মা সব কিছুতে ওতপ্রোত ভাবে আছেন, তাই তিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, অনুমন্তা এবং বিজ্ঞাতা। জগতের বাইরে কোন ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। এই দুটি বাক্য বেদান্তের সার। এই দুটি সার বাক্য মাথায় বসিয়ে নিলে বেদান্ত বুঝতে আর কোন অসুবিধা হবে না।

দুধ থেকে ছানা, ছানা থেকে তৈরী হল রসগোল্লা, সেই রসগোল্লাকে এবার ক্ষীরের মধ্যে ফেলা হল। তৈরী হল রসমালাই। রসমালাইয়ে দুধ ছাড়া কিছু নেই। দুধটা দুধের মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে, কিন্তু সেটা হয়ে গেল রসমালাই। জগৎটা ঠিক তাই। সেই যে ঈশ্বর, তাঁরই একটা রূপ দুধ, দুধ থেকে রসগোল্লা, আর ওতপ্রোত ভাবে রয়েছেন তিনিই, তাঁর বাইরে কিছু নেই। রসমালাইয়ে দুধের বাইরে কিছু নেই। ওতপ্রোত ভাবে তিনিই রয়েছেন, তিনি হলেন সৎ চিৎ ও আনন্দ, সেইজন্য তিনি সব কিছুর দ্রষ্টা। তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাই তিনি সব কিছুই জানতে পারেন। সব কিছু শুনতে পান, তাই তিনি শ্রোতা। আর অনুমন্তা, অনুমন্তা মানে তিনি অনুমোদন করেন। ঠাকুর বলছেন তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। ওতপ্রোত থাকার জন্য তিনি সব শুনছেন, সব দেখছেন আর সব কিছু জানছেন। আর তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুটি কেউ করতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে।

সারা জগৎ স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা বলে চিৎকার করে যাচ্ছে। তুমি যতই স্বাধীন ইচ্ছা বলে চেঁচিয়ে যাও, স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। স্বাধীন ইচ্ছা মানেই ঈশ্বরের বাইরে কিছু আছে। এই সমস্যাগুলো সেই ধর্মের কাছেই হাজির হয়, যে ধর্মে ঈশ্বর আর ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আলাদা করে দেখায়। ঈশ্বরের বাইরে যদি কিছু থেকে থাকে তবেই স্বাধীন ইচ্ছার কথা উঠতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের বাইরে তো কিছু নেই। আবার এমন কিছু নেই যা তাঁর জানা নেই, তাই তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা। সাধারণ লোকদের তাই বলা হয় ঈশ্বর সব জানতে পারেন। আমরা মনে করি ঈশ্বর উপরে কোথাও সিংহাসনে বসে আছেন আর তাঁর চরেরা ঘুরে ঘুরে সব খবর তাঁকে সরবরাহ করে যাচ্ছেন। না, তা নয়, তিনি তো সব কিছুতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। এটাই বেদান্তের প্রথম ও শেষ কথা। পুরানাদিতে এই জিনিষটাকেই একটা খুব স্থূল কাহিনীর মাধ্যমে বলে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম ভাবে আমাদের মনের গভীরে ঢুকিয়ে দেয়। বেদান্তে ওসব কিছু নেই – শুরু করবে সূক্ষ্ম দিয়ে শেষও করবে সূক্ষ্ম দিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু বলবে না, যা বলবার একেবারে সরাসরি বলে দেবে। আচার্যও সরাসরি বলে দিচ্ছেন ঈশ্বরের এই চারটে জিনিষ – দ্রষ্টা, শ্রোতা, অনুমন্তা ও বিজ্ঞাতা। আমরা যেমন সচরাচর অসহায় হয়ে তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিই, সেটাও কিন্তু তাঁর ইচ্ছাতেই ছাড়ছি, অসহায় হয়ে নয়।

ঈশ্বর পঞ্চাগ্নির দ্বারা প্রজাকুলের বৃদ্ধি করেন। তার মানে প্রজাকুল, মানে যত জীব আছে, সেটাও এই পুরুষ থেকেই উৎপন্ন হয়। তা হলে দাঁড়াল, যিনি ঈশ্বর তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাট রূপে আছেন, তিনি আবার অন্তর্যামী হয়ে আছেন। অন্তর্যামী হয়ে তিনি কি হলেন? দ্রষ্টা, শ্রোতা, অনুমন্তা ও বিজ্ঞাতা। এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? তিনি কি বাইরে কোথাও বসে আছেন? না, তিনি ওতপ্রোত ভাবে রয়েছেন, রসমালাইয়ের দুধের মত। আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে উপনিষদ যে কথাগুলো বলছে সেটা কারুর সাথে কোন আপোষ রফা করে বলছে না, অহেতুক কোন উপমা বা কোন কাহিনী নিয়ে আসা হবে না, অহেতুক নিজের কোন মতকেও নিয়ে আসা হবে না। যেগুলো একেবারে খাঁটি সত্য সেটাকে আমাদের সামনে রেখে দিচ্ছে। যে হজম করতে পারবে

করুক, না করতে পারলে ছেড়ে দিক। সেইজন্য উপনিষদ সবাইকে জানতে দেওয়া হত না। মুষ্টিমেয় কজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সন্তান, যারা ব্রহ্মচর্য পালন করেছে, তপস্যা করেছে, জাগতিক সব কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করেছে, এত কিছু করে শারীরিক ও মানসিক একটা প্রস্তুতি নিয়েছে, শুধু তাদেরকেই উপনিষদ পড়ান হত। যারা এইভাবে মানসিক প্রস্তুতি না নিয়ে ঋষিদের কাছে যেতেন তাদেরকে তাঁরা ধারে কাছেই আসতে দিতেন না। পরিষ্কার বলে দিতেন উপনিষদ তোমার জন্য নয়।

বর্তমান যুগে মানুষের পক্ষে এই ধরণের তপস্যা সম্ভবই নয়। কিন্তু মানুষ উপনিষদের কথা শুনতে চায়। কিন্তু তার আগে অন্তত নিজের বাড়ির লোকদের দেখাভাল করুক, গরীব-দুঃখী, অতিথিদের সেবা করুক, ঠিক ঠিক ভাবে নিজের জপ-ধ্যান পূজা-পাঠটা করুক। কিছুই না করে এসে বলবে আমাকে একটু উপনিষদের বাণী শোনান। একজন ভক্ত মহিলা দুটো হাতে পাঁচ পাঁচটি মোটা মোটা সোনার বালা। বেলুড় মঠ দর্শন করে ফিরছে। কোন পরিচিত সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করছেন কোথায় গিয়েছিলেন। মহিলা বলছেন ‘মন্দিরে ঠাকুরকে দর্শন করে এলাম’। ‘ঠাকুরের কাছে কি প্রার্থনা করলেন’? মহারাজ জিজ্ঞেস করতেই মহিলাটি বলছেন ‘ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম, হে ঠাকুর! তুমি আমাকে পূর্ণ শরণাগতি দাও’। সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবছেন হাতে দশখানা সোনার বালা পড়ে এখন শরণাগতি চাইছে! একজন লোক দুহাতে দুটো রিভলবার নিয়ে আমাকে বলল ‘আমি আপনার শরণাগত হতে চাই’। তখন আমাকেই তার শরণাগত হতে হবে। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর কাছে দশখানা মোটা মোটা সোনার চুড়ি পরে এসে শরণাগত চাওয়া আর দু হাতে দুটো রিভলবার নিয়ে কেউ এসে আমার কাছে শরণাগত হওয়া একই ব্যাপার। আমাদের হাতে সব কিছুই রয়েছে, আমাদের হাতে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রয়েছে, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন রয়েছে, আমার নাম-যশের প্রতি প্রীতি রয়েছে, আমার অহঙ্কার রয়েছে, এগুলো এক একটা রিভলবার। এতগুলো রিভলবার নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছি ‘হে ঠাকুর! আমাকে শরণাগতি দাও’। ঠাকুর বলবে ‘না বাবা! আমিই তোমার শরণাগত’। শরণাগতি কিভাবে হয়? যে কাঙালী দীনহীন, যার আর কোন পথ নেই, এই অসহায় অবস্থায় এসে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে বলবে ‘হে ঠাকুর! তুমি ছাড়া আর আমার কিছু নেই। তোমার চরণে আমায় ঠাঁই দাও’। এটাই শরণাগতি।

কিন্তু এই ধরণের ভক্ত মহিলা আর সাধারণ লোককে কে বলতে যাবে এই জগৎ মিথ্যা। তখন তারা আবার বলবে – সত্য যেটা সেটা তো আছেই আর থাকবেও কিন্তু মিথ্যা যেটা সেটা তো থাকবে না। তাই যতটা পারি এই মিথ্যাটাকে এখন ধরে নিই। ঈশ্বর তো আছেনই, তিনি তো আর কোথাও চলে যাবেন না। কিন্তু হীরা, মোতি, টাকা-পয়সা, গয়না এগুলো সব মিথ্যা, এগুলোকে যতটা পারি ধরে নিই, ঈশ্বর তো আছেনই। শ্রীমা যখন পান সাজতেন তখন দু রকমের পান সাজতেন। কিছু পানে অনেক রকম ভালো ভালো মশলা দিয়ে বানাতেন, কিছু পানে শুধু চুন আর সুপুরি দিয়ে সাজতেন। একজন জিজ্ঞেস করেছেন ‘মা! দু রকমের পান কেন’? শ্রীমা তখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন ‘এগুলো হল ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের জন্য যাতে মশলা নেই। এরা তো আপনার লোক, এদের তো আর কোথাও যাওয়ার নেই। আর মশলা দেওয়া পানগুলো অতিথিদের জন্য। এদেরকে ভালোবেসে নিজের করে নিতে হবে’। ঠিক তেমনি এদের কাছে ভগবান সত্য, ভগবান আর যাবেনটা কোথায়। মায়াটা মিথ্যা, তাই মায়াটাকে আগে হাতে করতে হবে। টাকা পয়সা, গয়না, বাড়ি, গাড়ি এগুলোকে আগে ধরতে হবে, ধরে এগুলোকে আপন করে নিতে হবে। এইভাবে যুক্তিতর্ক চলে না। এদের জন্য উপনিষদ একেবারেই নয়। যারা ধন-সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবদের একদিকে মুখে মিথ্যা বলে যাচ্ছে আর অন্য দিকে এগুলোকেই আঁকড়ে রয়েছে, এরা হল প্রচণ্ড জ্ঞানপাপী। এদের এখনও অনেক অনেক জন্ম লাগবে। যারা বলছে এগুলো মিথ্যা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি দুর্বল, আমি এগুলোর আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না, এরা তাও অনেক ভালো। পরের মন্ত্রে বলছেন, এই পুরুষ থেকে প্রজার উৎপন্ন হচ্ছে। প্রজা মানে সব রকমের জীবদের বলা হচ্ছে। এই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে কিভাবে চর আর অচর জগৎ উৎপত্তি হচ্ছে আর এই উৎপত্তির ক্রমটা কি রকম? তখন বলছেন –

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎপর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ।।২/১/৫।।

(সেই পরম পুরুষ থেকে দ্যুলোক জাত হয় যার ইন্ধন সূর্য, চন্দ্র থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পৃথিবীতে ওষধিসমূহ জাত হয়। পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃ সিঞ্চন করে, এইভাবে পুরুষ থেকে প্রাণী সমুৎপন্ন হয়।)

এই মন্ত্রটিও খুব কঠিন একটি মন্ত্র। বলছেন *তস্মাদাগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ*, সেই অক্ষর পুরুষ থেকে অগ্নির উৎপন্ন হল, এই অগ্নির সমিধা হল সূর্য্য, সমিধা মানে যে কাঠ দিয়ে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। কোন অগ্নি? দ্যুলোকের অগ্নি, এর আগের মন্ত্রে যেখানে বলা হয়েছিল *অগ্নির্মূর্ধা*, পুরুষের মস্তক হল দ্যুলোক। *সোমাৎপর্জন্য*, সোমরস থেকে মেঘের জন্ম, আর *ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্*, এই মেঘ থেকে পৃথিবীতে নানা রকমের বৃক্ষাদির জন্ম হল। মানুষ এই বৃক্ষলতাদি আর শস্য খাওয়া-দাওয়া করার পর তার ভেতরে অগ্নির জন্ম হয়। পুরুষ যখন নারীর সঙ্গ করে তখন সেই অগ্নি নারীর শরীরের অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে। সেখান থেকে *বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ*, একটার পর একটা প্রাণীর জন্ম হতে থাকে।

এর আগের মন্ত্রে দেখালেন ঈশ্বর আর নির্গুণ ব্রহ্ম বা অক্ষর ব্রহ্ম বা সেই পুরুষ এক। সেই অক্ষর পুরুষ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে। আর ওই অক্ষর পুরুষই অন্তর্যামী, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, অনুমন্তা ও বিজ্ঞাতা। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তাঁর হৃদয়, তাঁর অন্তঃকরণ থেকে সব কিছু জন্মাচ্ছে আবার তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাচ্ছে। এই মন্ত্রে এসে বলছেন সৃষ্টি কিভাবে হয়, আমি আপনি কিভাবে জন্মেছি। আমাদের জন্ম সেই পুরুষ থেকেই। পঞ্চাগ্নির মাধ্যমে সেই পুরুষ জীবের সৃষ্টি করতে থাকেন, আর এই সৃষ্টি কখন থেমে থাকে না। তিনি কি ম্যাজিকের মত শূন্য থেকে সব সৃষ্টি করেন? না, পুরো একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি এই সৃষ্টির কার্য করে চলেছেন। জীব বিজ্ঞানীরা বলবেন, সৃষ্টির পুরোটা হয় বায়োলজিকাল পদ্ধতিতে, নয়তো ক্লোনিং এর মাধ্যমে নতুবা কলম করে। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানীরা বলবেন, এগুলো তো কিছুই নয়, এগুলো হল তোমাদের বাহ্যিক পদ্ধতি, কিন্তু আভ্যন্তরীন পদ্ধতিতে পাঁচটি অগ্নির ব্যাপার থাকে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে একটি খুব উল্লেখনীয় আলোচনা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতু ঋষিকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। শ্বেতকেতু এখন বড় ঋষি হয়ে গেছেন, তাঁর পিতা গৌতমও ছিলেন খুব বড় ঋষি। বাবার কাছ থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করার পর শ্বেতকেতু একবার কোশল রাজ্যের এক বিচার সভায় গিয়ে হাজির হয়েছে। কোশল দেশ অযোধ্যার কাছে। রামায়ণেও আমরা একজন গৌতম মুনির কাহিনী পাই, যাঁর স্ত্রী ছিলেন অহল্যা। তবে এই গৌতম মুনি আর রামায়ণের গৌতম মুনি একই ব্যক্তি নন। যাই হোক শ্বেতকেতুকে দেখে কোশলরাজ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করছেন 'তোমার বাবার কাছ থেকে তুমি উপদেশ পেয়েছ তো'? 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে সব উপদেশ দিয়েছে'। রাজা তখন শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞেস করছেন 'আচ্ছা তুমি বলতো পঞ্চাগ্নি কোনটি যেটা দিয়ে প্রাণীকুলের জন্ম হয়'? শ্বেতকেতু তো পঞ্চম অগ্নির কথা কোন দিন শোনেইনি। শ্বেতকেতু উত্তর দিতে পারেনি। তাঁর বিদ্যার অহঙ্কার ছিল। খুব লজ্জা পেয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে। বাড়িতে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে পঞ্চম অগ্নি কোনটা। গৌতম মুনি বলছেন 'আমি তো এর আগে পঞ্চম অগ্নির কথা শুনেনি, এই ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না'। এবার বাবা ও ছেলে দুজনে মিলে কোশল দেশের রাজার কাছে গেলেন। কোশল দেশের রাজাকে গিয়ে বললেন, আপনি আমাদের বলুন পঞ্চম অগ্নি কোনটা। কোশল দেশের রাজা পিতা-পুত্র দুজনেক তখন বলছেন, এই বিদ্যাটা ব্রাহ্মণের কাছে কোন দিন ছিল না। এই উক্তিকে নিয়ে তথাকথিত অনেক পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে উপনিষদ হল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে জেহাদ। এগুলো অত্যন্ত বালসুলভ চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। কিছু কিছু বিদ্যা কেউ হয়ত গুরু পরম্পরায় নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল, পরে সেটা হয়তো কোন কারণে অন্যেরা জানত না।

গৌতম মুনি খুব বিনয় করে রাজাকে পঞ্চাগ্নির ব্যাপারে বলার জন্য অনুরোধ করাতে কোশলরাজ খুব সঙ্কোচে পড়ে গেছেন – আপনারা এত উচ্চকুলের ঋষি, ইত্যাদি। তারাপর রাজা ব্যাখ্যা করছেন পঞ্চম অগ্নিটা কি। সৃষ্টি যে পঞ্চাগ্নি দিয়ে হয় এই ধারণাটা খুব প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। অস্তিত্ব বলতে যা কিছু আছে, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত অদ্বৈত ছাড়া কিছু নেই। এখানে ঠিক অদ্বৈত না বলে এক বলাটা ঠিক হবে, কারণ অদ্বৈত এক দুইয়ের পারে। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সেটা একটারই অস্তিত্ব, এখানে বহু বলে কিছু নেই, যা কিছু আছে একটাই আছে। দ্বিতীয় মুণ্ডকে পুরো এই জিনিষটাকেই বর্ণনা করে দেখান হচ্ছে। মূল প্রশ্ন ছিল কোনটাকে জানলে সবটাই জানা হয়। বলছেন, অক্ষর পুরুষকে জেনে নিলে সব কিছুকেই জানা হয়ে যায়। এই অক্ষর পুরুষকে এখন দেখাচ্ছেন, যাবতীয় যা কিছু আছে এই অক্ষর পুরুষই হয়েছেন, তাঁর বাইরে কিছু নেই। কিন্তু সব কিছুকে সব কিছুর থেকে আলাদা দেখছি, আমি আলাদা আপনি আলাদা। এই আলাদা যা কিছু দেখছি সব কিছু তাঁর থেকেই উৎপত্তি হচ্ছে। এবার উপনিষদ দেখাচ্ছে কি পদ্ধতিতে সব কিছু তাঁর থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। শুধু যে তাঁর থেকেই জন্ম নিচ্ছে তা নয়, যে পদ্ধতিতে সব কিছু তাঁর থেকে জন্ম নিচ্ছে সেই পদ্ধতির মধ্যেও একটা ঐক্য আছে। যেমন মনে করুন এখানে অনেকগুলো স্টীলের গ্লাশ রাখা আছে, আর প্রত্যেকটা গ্লাশের আকার বিভিন্ন রকমের। বলছেন এই যে এতগুলো বিভিন্ন আকারের স্টীলের গ্লাশ দেখছ শুধু তা নয়, এগুলো একই কোম্পানী থেকে বেরিয়েছে, একই মেশিন থেকে বেরিয়েছে আর একই পদ্ধতিতে বেরিয়েছে। এই যে তুমি নানান দেখছ এটা তোমার মনের ভুল, এগুলো নাম আর রূপ মাত্র, নাম ও রূপের কোন মূল্য নেই। এই বাস্তবিক একত্বকে বিশ্লেষণ করছেন পঞ্চাগ্নি দিয়ে। পঞ্চাগ্নি বলতে সবার প্রথমে দেখাচ্ছে দ্যুলোক, দ্যুলোকের পরে মেঘ, মেঘের পরে পৃথিবী, পৃথিবীর পরে পুরুষ, পুরুষের পরে নারী।

যজ্ঞের সময় যজ্ঞাগ্নিতে যে সোমরস আহুতি দেওয়া হয়, এই সোমরস জীবকে চন্দ্রলোকে নিয়ে চলে যায়। স্বামীজী এইসব লোককে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন – স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জগতে। পুরানাদিতেও অনেক লোকের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যদিও সেখানে লোকগুলোর নামে একটু আগে পরে হয়ে যায় কিন্তু পদ্ধতিটা একই। এখানে চন্দ্রলোক বলতে বলা হয়েছে পিতৃদের স্বর্গ। যখন জীবকে এই স্বর্গের দিকে নিয়ে যায় সেখানে এই যে আহুতিগুলো দেওয়া হয়েছিল তারা দাঁড়িয়ে থাকে। এর আগে যেমন মন্ত্রে বলা হয়েছিল *এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ*, এই আহুতিগুলো স্বাগত অভ্যর্থনা করে যজমানকে চন্দ্রলোকে নিয়ে যাচ্ছে। কত দিন এই চন্দ্রলোকে থাকবে? যত দিন তার সুকর্ম থাকবে। সুকর্মের ফল শেষে হয়ে যেতেই সেই চন্দ্রলোক থেকে তাকে নেমে আসতে হবে। তা আত্মা কি ভাবে নেমে আস? খুব গতিতে নেমে আসে? না, ধাপে ধাপে। প্রথমে সেখান থেকে নামবে দ্যুলোকে। এই দ্যুলোককে বিদ্যুৎলোকও বলা হয়, স্বামীজী এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সূক্ষ্ম থেকে যেন আরও একটু স্থূল হয়ে গেছে। এই দ্যুলোক হল প্রথম অগ্নি, চন্দ্রলোক কিন্তু অগ্নি নয়। আগুন জ্বালাবার জন্য একটা কাঠ চাই, এই দ্যুলোকের সমিধাটা কি? বলছেন, *তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ*, দ্যুলোকে সূর্য হল তার সমিধা কাষ্ঠ। এই সূর্য হল সেই সূর্য যা নিত্য আমরা আকাশে দেখতে পাই। এখন দ্যুলোক বলতে কি বোঝাচ্ছেন, অন্তরীক্ষকে বোঝাচ্ছেন কিনা আমরা জানিনা, কিন্তু মূল হল সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের প্রথম প্রকাশ যেখানে হবে সেই এলাকায় চলে এসেছে। এই এলাকাটাকেই দ্যুলোক বলছেন।

সেখান থেকে চলে আসে *সোমাৎপর্জন্য*, পর্জন্য মানে মেঘ, এই মেঘ হল দ্বিতীয় অগ্নি। এই দ্বিতীয় অগ্নি মেঘ থেকে বর্ষণ হয়। এই যে যত জীবাত্মারা চন্দ্রলোক থেকে পতন হয়ে দ্যুলোকে নেমে এসেছিল তারা এই মেঘের মধ্যে থেকে বৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীতে নেমে আসে। পৃথিবীতে নেমে এসে জীবাত্মা কোথায় যাবে? *ওষধয়ঃ*, পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে, ধান, গম, শস্যাদি জাতীয় সব কিছুকে ওষধি বলা হয়, এই ওষধির মধ্যে জীবাত্মা বাস করতে থাকে। আমি যখন কোন গাছ কাটছি তখন কত জীবাত্মাকে কাটছি তা ধারণা করতে পারব না। নাও হতে পারে আবার থাকতেও পারে। এই জীবাত্মাদের আমি হয়ত চাল, ডাল, গমের মাধ্যমে সরাসরি খাচ্ছি। অথবা সেগুলোকে মাছে খেয়েছে, মুরগীতে খেয়েছে। জীবাত্মাগুলো সব এগুলোর মধ্যে বাস করছে। এই যে পৃথিবীতে যত ওষধি জন্ম নিচ্ছে, এই পৃথিবীটা হল তৃতীয় অগ্নি। এবার এই জীবাত্মাগুলো

খাদ্যের মাধ্যমে পুরুষের ভেতরে যে অগ্নি আছে সেখানে চলে যাচ্ছে। এই পুরুষ হল চতুর্থ অগ্নি। পুরুষের বৈশিষ্ট্যানুসারে তার মধ্যে যে বীর্য রয়েছে, সেখানে এই জীবাত্মারা জমায়েত হয়ে থাকে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্ক হয় আর নারীর যে দেহ তাকে বলা হয় পঞ্চম অগ্নি। শ্বেতকেতু এই পঞ্চাগ্নির ব্যাপারটা জানত না, আর এই পুরো পদ্ধতিটাও জানত না। এই পঞ্চাগ্নির কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে। সেইজন্য পুরুষ ও নারীর দেহের সম্পর্ককে হিন্দুরা কখনই ভোগের দৃষ্টিতে দেখতেন না। সব সময় একে যজ্ঞ রূপেই দেখা হয়।

দ্যুলোক যেন একটা অগ্নি, শুধু অগ্নি নয় খুব পবিত্র অগ্নি। সেই পবিত্র অগ্নি মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসছে, সেটাও পবিত্র অগ্নি। সেখান থেকে যখন পুরুষের শরীরের ভেতরে আসে সেটা আরেকটা অগ্নি। একটা অগ্নিকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় স্থাপনা করা হচ্ছে। শেষ স্থাপনা যেখানে হচ্ছে সেই নারীর দেহ সেটাও একটা অগ্নি। আর পুরুষ যখন নারীর সাথে সম্পর্ক করছে তখন সেই কার্যটাও একটা যজ্ঞ। এরপর মায়ের গর্ভ থেকে যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তখন আর যজ্ঞ থাকছে না। ওইখানেই যজ্ঞ শেষ হয়ে যাচ্ছে যখন পঞ্চম অগ্নিতে পুরুষ নিজের অগ্নিকে স্থাপনা করছে। বলছেন, যে এই পঞ্চাগ্নিকে জেনে যায় সে মহৎ হয়ে যায়। কারণ তিনি বুঝতে পারছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সেই এক রয়েছেন। আমার যাঁরা পূর্বপুরুষরা ছিলেন, তাঁরা যজ্ঞাদি শুভ কর্মের দ্বারা স্বর্গে গেছেন। এবার তাঁর শুভ কর্মের ফলভোগ শেষ হয়ে গেছে। এখন তিনি নেমে আসছেন। প্রথমে তিনি চন্দ্রলোক থেকে দ্যুলোকে নেমে এলেন, দ্যুলোক থেকে সূর্যলোকে নামলেন। সূর্যলোক হল এই স্থূল জগৎ। সূর্যলোক থেকে প্রথমে তিনি মেঘে নামলেন।

এগুলো বলা হচ্ছে যাঁরা যজ্ঞাদি করেছেন তাঁদেরকে নিয়ে। কিন্তু বাকিদের বলছেন *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, এরা ধান-গমের মত জন্মায় আর মরে। এদের নিয়ে কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে না। যারা শুধু ভোগের মধ্যে ডুবে আছে, কোন শুভ কর্ম নেই, এরা এখানেই কুকুর, বেড়াল, ধান-গমের মত জন্মাচ্ছে মরছে, আবার জন্ম নিচ্ছে আবার মরছে। যেমনি কোন যোনি পেয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সে সেই গর্ভে প্রবেশ করে যাচ্ছে। এরা জন্ম-মৃত্যু সাগরে হাবুডুবু খেয়েই যাচ্ছে। এখানে তাদের কথা একেবারেই বলা হচ্ছে না। একমাত্র তাঁদের কথাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যাঁরা যজ্ঞাদি করেছেন, শুভকর্ম করেছেন, ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা করেছেন, ঈশ্বরের ভক্তি সাধন করেছেন। এনারা প্রথমে স্বর্গলোকে বাস করেন। সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা দ্যুলোকে চলে আসেন, মানে আরেকটু স্থূল ভূমিতে। এই ভাবে স্থূল থেকে আরও স্থূলতর ভূমিতে নেমে আসেন। শেষে আমরা যে জায়গাটাকে অনুভব করতে পারি, সেই মেঘে নেমে আসেন। সেখান থেকে জলকে আশ্রয় করে পৃথিবীতে নেমে আসেন। তারপর ধান-গম, গাছপালাতে আশ্রয় করেন। সেখান থেকে পুরুষের শরীরে আশ্রয় করেন। পুরুষের শরীর থেকে সেই জীবাত্মা এবার নারীর শরীরে যাচ্ছে। এই পুরো পদ্ধতিটাই হল পঞ্চ যজ্ঞ। দ্যুলোকের সমিধা হল সূর্য, মেঘের সমিধা হল বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে তো আগুনের ছড়াছড়ি। পুরুষের এটা একটা অগ্নি আর নারীর দেহ আরেকটা অগ্নি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণনা আছে পুরুষ আর নারীর সম্পর্কটাও একটা যজ্ঞ। সেইজন্য স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যারা এটাকে যজ্ঞ রূপে গ্রহণ করে না তাদের সন্তানরা সব পাপীই হয়, সমাজের জন্য এরা অভিশাপ। আগেকার ঋষিরা যাঁরা ছিলেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা তাঁরা এটাকে পুরো যজ্ঞ রূপেই নিতেন। তাঁরা তিথি, বার, নক্ষত্র সব দেখে নিতেন। কারণ তিনি অগ্নিকে স্থাপনা করতে যাচ্ছেন। একটা উনুন থেকে আরেকটা উনুনে অগ্নিকে স্থাপনা করা হচ্ছে। প্রথম উনুন হল দ্যুলোক, দ্বিতীয় উনুন মেঘ, মেঘ থেকে পৃথিবীতে নেমে এল, সেটা আরেকটা উনুন। সেখান থেকে পুরুষে এসে গেল, আরেকটা উনুন। এবার পুরুষ থেকে সেই অগ্নিকে স্থাপনা করা হচ্ছে নারীর দেহে। নারীর দেহটা আরেকটা উনুন। সৃষ্টি এই পঞ্চাগ্নির দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। সেইজন্য বলা হয় মানবজীবনও একটা আধ্যাত্মিক অভিযান।

ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, এই একটি কথা সবাইকে বলে দিলেই তো হয়ে যায়। কিন্তু বলে দিলেও কিছুই হয় না, সেইজন্য আবার নানান ভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে হয়। এই নানান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের

আলোচনা করা হল। বলছেন এমনকি যে শিশু জন্ম নিচ্ছে সেও যজ্ঞের মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছে। গীতায় ভগবান বলছেন যারা আসুরকি ভাবাপন্ন তারা বলে বাবা-মায়ের মধ্যে কাম ভাব জেগেছিল, সেখান থেকে সন্তানের উৎপত্তি হল, এখানে ঈশ্বরের ভূমিকা কিভাবে আসছে! এই ধরণের চিন্তাকে এখানে নিন্দা করা হচ্ছে। সব কিছু তাঁর থেকেই উৎপত্তি হচ্ছে। এই যে পঞ্চাগ্নির বর্ণনা করা হল, গভীর ভাবে দেখলে দেখা যায় এই সব কিছু পরস্পর পরস্পরের সাথে একটা যোগসূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে, যদিও ঠিক এর সাথে মিলবে না, কিন্তু ভাবটা প্রায় কাছাকাছি – *অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।* জগতে যা কিছু আছে, যা কিছু হচ্ছে সবই এক অপরের সাথে একসূত্রে গ্রথিত। *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি*, বেদ থেকে যজ্ঞ হয়। বেদ কোথায় অবস্থিত? পরমাত্মাতে। যজ্ঞ থেকে মেঘের উদ্ভব হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসছে, বৃষ্টি থেকে অন্নের জন্ম হচ্ছে। সেই অন্ন আবার সমস্ত প্রাণীকুল ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করছে। তাই সব কিছু যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

এখন দেখা যাচ্ছে এই যে যত রকম কর্ম হচ্ছে, এখানে কর্ম মানে যজ্ঞাদি কর্মকে বোঝাচ্ছে, যত রকমের যজ্ঞ হচ্ছে তার যে সাধন আর তার যে ফল, এই সব কিছুই আসছে সেই অক্ষর পুরুষ থেকে। উপনিষদের এই মন্ত্রগুলির একটা ধ্যানোপোযোগী মূল্য আছে। এই মন্ত্রগুলির অর্থ বুঝে নিয়ে যদি মুখস্ত করে নেওয়া হয় তখন মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এই মন্ত্রগুলো ভেসে উঠবে। তখন দেখা যাবে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে গিয়ে একটা নতুন জীবনদর্শন জন্ম নেবে। আমি আলাদা, তুমি আলাদা, এই জগৎ আমার থেকে আলাদা, এই আলাদা বোধটাই হারিয়ে যায়। এর পরের মন্ত্রে বলছেন –

তস্মাদৃচঃ সাম যজুংসি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ।।২/১/৬।।

(সেই পরম পুরুষ থেকে ঋক্, সাম, যজুর্মন্ত্রসমূহ উৎপন্ন হয়েছে। দীক্ষা, যজ্ঞসমূহ, ক্রতুসমূহ এবং সকল প্রকার দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান সৃষ্টি হয়েছে। যে সোমরস বা চন্দ্র সকল কিছু পবিত্র করে, যে সূর্য কিরণ বিতরণ করে তারাও সেই পরম পুরুষ থেকে জাত হয়।)

মুণ্ডকোপনিষদ খুব প্রাচীন উপনিষদ, তখনকার দিনে মানুষ যে জিনিষগুলো ব্যবহার করত, দৈনন্দিন যে কাজগুলো করত সেগুলোকে আধার করেই আলোচনা করা হচ্ছে। সেই পুরুষ অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু থেকেই *তস্মাদৃচঃ*, ঋকবেদের ঋচাগুলো জন্ম নিয়েছে। ব্যাসদেবের কত আগে একটি একটি করে উপনিষদ ছন্দোবদ্ধ হয়ে রচিত হয়ে গেছে আমাদের পক্ষে বলা খুব মুশকিল। কয়েকটি জিনিষ আমাদের ধারণা করে নিলে উপনিষদের মন্ত্রগুলোর অর্থ বুঝতে সুবিধা হবে। বেদের দুটি অর্থ, তার একটা অর্থ বেদ হল শব্দরাশি। উপনিষদের যে মন্ত্রগুলো আমরা পাঠ করছি এগুলো সব শব্দরাশি। কিন্তু এই শব্দরাশির পেছনে একটা জ্ঞান থাকে। যেমন যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ, কিন্তু কবিতার মাধ্যমে একটা ভাবকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। যখন গীতাঞ্জলীর কবিতা পাঠ করছি তখন আমাদের মন সাধারণত কবিতার শব্দরাশিতে থাকে, এই শব্দরাশিকে অতিক্রম করে কবিতার জ্ঞানরাশিতে প্রবেশ করার চেষ্টা খুব কম পাঠকই করেন, আবার অনেকের পক্ষে সম্ভবও হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা খুব বিখ্যাত গান, যেটা গান্ধীজী খুব পছন্দ করতেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'। এখানে একটা শব্দের খেলা আছে, যা ছন্দের সাহায্যে কবিতাকে ব্যঞ্জনাময় করে দিচ্ছে। কিন্তু এই শব্দের সাথে জীবনদর্শনের একটা উপদেশও দেওয়া হচ্ছে, যদি দেখ তোমার পাশে কেউ নেই, তাও তুমি নিজের মত একলা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চল। শব্দরাশি আর জীবনদর্শনের উপদেশ এই দুটোকে নিয়েই এই কবিতাটা এগিয়ে চলে। কিন্তু যখন গীতাঞ্জলী বলা হচ্ছে তখন শব্দরাশিকেই ইঙ্গিত করা হয়। যারাই গীতাঞ্জলী পাঠ করে তাদের বেশীর ভাগই জীবনদর্শনকে গ্রহণ করার জন্য গীতাঞ্জলী পাঠ করে না।

বেদের ক্ষেত্রেও দুটো জিনিষ, একটা শব্দরাশি আর দ্বিতীয় সেই শব্দরাশির পেছনে রয়েছে জ্ঞানরাশি। বেদে কিন্তু কোন উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না – বেদ হল শুধু জ্ঞানরাশি। জ্ঞানরাশিটা কি? জগতের কিছু কিছু সত্য আছে, যেমন বলছেন *তদেতৎ সত্যম্*, এই সত্যগুলোকেই বেদ বলা হচ্ছে। এই জিনিষটাকে আমাদের মাথার মধ্যে বসিয়ে রাখতে হবে, তা না করলে এই মন্ত্রগুলোকে বোধগম্য করতে আমাদের সমস্যা হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিন্তার জগতে ডুবে আছেন। সেই চিন্তার জগতে হঠাৎ তাঁর মনে হল যাঁরা একটা আদর্শকে নিয়ে এগোচ্ছে একটা সময় আসে যখন তাঁদের পাশ থেকে সবাই সরে যায়। এই ভাবটা কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেই প্রথম ভেসে উঠেছে? কখনই না, এটা সবাই জানে আর অন্যান্য শাস্ত্রেও এই একই ভাব পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর চিন্তা জগতে এই ভাবটা যখন ভেসে উঠল তখন তিনি শব্দ দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। বেদের যে জ্ঞান এটা কিন্তু কোন ঋষি চিন্তা করে বার করছেন না। এই জ্ঞান সাক্ষাৎ ভগবান থেকে আসছে। কারণ জগতের যত মূল সিদ্ধান্তগুলো আছে, জীবনের যে সত্যগুলো আছে, ঈশ্বরই যে সত্য, ধ্যানের প্রত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে আমাদের ঋষিরা এই ধরণের কিছু কিছু সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করার পর এবার সেই উপলব্ধ সত্যকে নিজের তপোনিষ্ঠ শিষ্যকে শুনিয়ে ধারণ করে রাখতে বলে দিচ্ছেন। আর ঋষির মধ্যে যদি কবিত্ব প্রতিভা থাকে তখন তিনি নিজেই সেটাকে ছন্দোবদ্ধ করে দিচ্ছেন। আমরা যখনই বলি ভগবানের শ্রীমুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়েছে তখন এই *তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা*, ভগবান বিষ্ণু কিন্তু এইভাবে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিচ্ছেন না। ব্রহ্মাও পরবর্তিকালে তাঁর শিষ্যকে এভাবে শেখাচ্ছেন না। তাঁরা এই জ্ঞানরাশিটা দিয়ে দিচ্ছেন? জ্ঞানরাশিটা কিভাবে হস্তান্তরিত হয়? ইচ্ছামাত্র। গুরু যেমন শিষ্যকে সামনে বসিয়ে দিনের পর দিন শিক্ষা দেন, সেইভাবে ব্রহ্মা শিক্ষা দেননা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই জ্ঞানরাশি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

সৃষ্টি যখন হচ্ছে, তখন এই জ্ঞানরাশিকে আধার করেই সৃষ্টি এগিয়ে চলে। ব্যাসদেবের সময় থেকে পাঁচশ বছর কি হাজার বছর বা তারো আগে থেকে যে এই বেদ রচিত হয়ে আসছিল, এবার বেদ হয়ে গেল শব্দরাশি, জ্ঞানটা শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ব্যাসদেব বেদের যে কাজটা করছেন সেটা তিনি বেদের জ্ঞানকে নিয়ে করছেন না, শব্দরাশিকে নিয়ে করছেন। জ্ঞান আসছে ভগবান থেকে, সেটাকে ধরছেন ঋষিরা। ঋষিদের থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই জ্ঞানরাশি চলতে থাকল। এবার ব্যাসদেব সব বেদকে এক জায়গায় জড়ো করে সাজিয়ে দিলেন। কিভাবে সাজালেন? যেমন ঋক্, ঋক্ হল দেবতাদের স্তবনের জন্য, ঋগ্বেদের পুরোহিত হলেন প্রধান। ব্যাসদেব যত ঋক্ গুলো ছড়িয়ে ছিল সেগুলোকে এক জায়গাতে সাজিয়ে দিলেন। তার নাম হয়ে গেল ঋগ্বেদ। এখানে বলছেন *তস্মাদৃচঃ*, ঋচা গুলো আগে এসেছে কিন্তু ঋগ্বেদ অনেক পরে এসেছে। ভগবান থেকে জ্ঞানরাশি বেরিয়েছে, যেটাকে বলা হচ্ছে বেদ। এই জ্ঞানরাশিকে ঋষিরা বিভিন্ন ভাবে ছন্দোবদ্ধ করছেন। একটা বিশেষ ছন্দ যেটা বিশেষ কাজে লাগে সেটাকে বলছেন ঋচা বা ঋক্। তাই ঋক্ আগে এসে গেছে। ঋগ্বেদের সঙ্কলন করেছেন ব্যাসদেব কিন্তু ঋগ্বেদে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার কোন অবদান নেই। ঋগ্বেদে মূল অবদান কাদের আছে? যাঁরা ওই ঋক্ গুলো রচনা করেছেন। তারও আগে এই ঋকের যে জ্ঞান সেটা এসেছে ভগবান থেকে।

এই যে এখানে বলা হচ্ছে *তস্মাদৃচঃ*, ঋচার মধ্যে যে জ্ঞানরাশি আছে সেই জ্ঞানরাশি সাক্ষাৎ ভগবান থেকে এসেছে। যেমন ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র *ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্*।। এর যে জ্ঞানরাশি সেটা ভগবান থেকে এসেছে। অগ্নি হলেন দেবতাদের পুরোহিত, পূজোর সময় যেমন পুরোহিত যজমানকে দেবতার সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দিচ্ছেন ঠিক তেমনি অগ্নি পুরোহিতকে দেবতাদের সঙ্গে সংযোগ সাধিত করে দিচ্ছেন। এর যে জ্ঞান সেটা ভগবান থেকে আসছে, আর এই ঋচাকে ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছে বিশ্বামিত্রের পরম্পরাতে। আর এটাকে সংগ্রহ করে ঋগ্বেদের মধ্যে সঙ্কলন করলেন ব্যাসদেব। আমাদের কাছে যখন এই মন্ত্রটি আসছে তখন তিনটে পর্যায়ে আসছে। প্রথম ধাপ সাক্ষাৎ ভগবান থেকে আসছে, দ্বিতীয় ধাপ যে ঋষি এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এই মন্ত্রকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন, এই ছন্দোবদ্ধ তিনি নিজে

করেছেন নাকি তাঁর শিষ্যরা কেউ করেছে সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তৃতীয় ধাপে ব্যাসদেব থেকে আসছে, যিনি এটাকে ঋগ্বেদে সঙ্কলন করেছেন।

যখন বলছেন *তস্মাদৃচঃ* তার মানে যজ্ঞে ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করা হয় স্তবনের জন্য, সেই মন্ত্রের পেছনে যে জ্ঞানরাশি আছে সেটা সাক্ষাৎ ভগবান থেকে এসেছে। কিন্তু সব কিছু তো ভগবানের কাছ থেকেই আসছে, যে কবি কবিতার মাধ্যমে একটা ভাবকে ফুটিয়ে তুলছেন সেই ভাবটাও ভগবান থেকেই আসছে, কিন্তু বেদের তুলনায় সেগুলো অনেক নিম্ন স্তরের। যার জন্য কবিতার ভাব অনেকেই বুঝে নিতে পারে। খিদে পেলে মাকে বলতে হয় 'মা খেতে দাও'। এই বক্তব্যটা অত্যন্ত সাধারণ। একটা বাছুরও খিদে পেলে হাম্বা হাম্বা করতে থাকে। একটা নবজাতক শিশুও কাঁদতে শুরু করে। খিদে পেলে খাওয়া চাইতে হয়, এই জ্ঞানটাও ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। কিন্তু এই জ্ঞানটা অনেক নিম্ন স্তরের জ্ঞান, এই জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে আছে। এটাকেই বলছেন *তস্মাদৃচঃ*। এরপর বলছেন সাম, বেদের যে ঋচাগুলোকে গান করা যায়। এটা যে শুধু ঋগ্বেদেরই অংশ তা নয়, এর একটা বৈশিষ্ট্য হল এই ঋচা গুলো গেয়, অর্থাৎ গান করা যায়। যখন বড় যজ্ঞ হয় তখন যজ্ঞের একজন হোতা থাকেন, যিনি ঋগ্বেদ পাঠ করে যান। হোতা না থাকলে যজ্ঞ হবেই না। আমি একজনকে কিছু জিনিষ অর্পণ করব, কিন্তু তিনিই যদি উপস্থিত না থাকেন তাহলে তো অর্পণ করা যাবে না। হোতা দেবতাদের আহ্বাণ করে নিয়ে আসছেন। আর সামগান যখন হয় তখন দেবতারা ঠিক ঠিক প্রসন্ন হন। যাঁরা সামগান করছেন তাঁদের বলা হয় উদ্গাতা। আর যজুর্বেদের মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। যজ্ঞের এই তিনটি মূল – ঋক্, সাম ও যজু। যজ্ঞে এই যে তিনটে ক্রিয়া, স্তবন করা হবে, গান করা হবে আর আহুতি দেওয়া হবে, এই তিনটিই সেই অক্ষর পুরুষের কাছ থেকেই এসেছে। ভগবান বলে দিলেন, এই দেবতারা আছেন আর তোমরা মানুষ আছ, তোমরা দেবতাদের অর্চনা করে যাও তার বদলে তোমার যা যা দরকার দেবতারা তা দিয়ে যাবেন। তুমি যদি দেবতাদের খুশী করতে চাও তাহলে *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ*, তুমি এই ভাবে যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট কর। কিভাবে তুমি দেবতাদের সন্তুষ্ট করবে? ঋক্ দ্বারা তুমি দেবতাদের স্তবন কর, সাম দিয়ে তাঁদের গান করবে আর যজু দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে আহুতি দেবে। এই তিনটে ক্রিয়া করা হলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে।

এই তিনটে কোথা থেকে এসেছে? সাক্ষাৎ ভগবান থেকে। কিন্তু শব্দগুলো তাঁর থেকে আসেনি। পরে যখন তুলসীদাসাদি কবিরা গ্রন্থাদি রচনা করার সময় বলে দিলেন যে ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে বেদ বেরিয়েছে। সাধারণ মানুষ ধরে নিল ঋগ্বেদাদি যত বেদ আছে ভগবান নিঃশ্বাস ফেললেন আর এগুলো এভাবেই সেই নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়ে এল। না, এভাবে বেদ ভগবানের কাছ থেকে আসেনি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন আমাদের অনায়াসে চলে, ঠিক তেমনি বেদের ওই জ্ঞানরাশি ভগবানের কাছে অনায়াস। তাই বলে কি বেদ সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে এসেছে? সম্পূর্ণ রূপে কোন দিন বেরোতে পারেনা। কারণ ভগবান অনন্ত, তাঁর জ্ঞানরাশিও অনন্ত। যে কেউ ধ্যানের গভীরে গিয়ে এখনও নতুন নতুন বেদমন্ত্র প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু হিন্দুরা সেটা বেদ রূপে গ্রহণ করবেন না। কারণ ব্যাসদেব ওখানে একটা লাইন টেনে দিয়েছেন। জ্ঞানরাশি অনন্ত, এখনও থাকতে পারে আমরা মানছি। কিন্তু আমরা আর বেদের কলেবর বাড়াব না। কারণ লোকেদের এত কিছু মাথায় রাখা সম্ভব নয়। তাহলে কি করবে? তোমার যা যা নতুন জ্ঞানরাশি প্রাপ্ত হচ্ছে সেগুলো অন্য বইয়ের আকারে রাখতে পার। তাই এখনও অন্যান্য আকারে বিভিন্ন শাস্ত্র রচিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেদের সেই সম্মানটা পাবে না। যাই হোক, এখানে বলতে চাইছেন বেদের যে তিনটে অঙ্গ ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটে ভগবানের কাছ থেকে বেরিয়েছে। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয়, অথর্ববেদ যেখান থেকে এই মুণ্ডকোপনিষদ নিজে এসেছে, সেই অথর্ববেদের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না। অথচ তার আগে বলছেন অথর্ববেদটাও অপরা বিদ্যার মধ্যে। অথর্বা তিনিও একজন নামকরা ঋষি ছিলেন। যজ্ঞার প্রথা ব্যাসদেবের অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। তখন তাঁরা কিছু এই মন্ত্র, কিছু এই গান, কিছু এই মন্ত্র দিয়ে আহুতি দিতেন। এই জিনিষগুলো অনেক আগে থাকতেই হয়ে আসছি। ব্যাসদেব শুধু আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে দিলেন।

এখানে যজ্ঞের বর্ণনা চলছে। দীক্ষা যজ্ঞের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইদানিং যখন যজ্ঞাদি করা হয়, বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশনে বা পূজোতে যখন যজ্ঞ করা হয় তখন আলাদা ধরণের একটা পোশাক পরিধান করান হয়। তখনকার দিনে যজ্ঞের আগে তাকে মুঞ্জমালা পরিধান করতে হত। আচার্য বলছেন *দীক্ষাঃ মৌঞ্জা-দিলক্ষণাঃ*। মুঞ্জ এক ধরণের কুশ ঘাসের মত, ঘাসকে দড়ি পাকিয়ে কোমরে পড়তে হত। এখনও অনেক জায়গায় এই প্রথা চলে আসছে। কিন্তু পরের দিকে এই মুঞ্জ ঘাস আস্তে আস্তে পাল্টে গিয়ে যজ্ঞ উপবীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আগেকার দিনে মুঞ্জ ঘাসের মেখলা পড়ত, মেয়েরাও পড়ত। স্বামীজীও উল্লেখ করছেন যে মেয়েরাও যজ্ঞ করত আর তারাও মুঞ্জ পরিধান করত।

যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ, যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গ আছে, যজ্ঞ করতে গেলে বিভিন্ন অঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়। যেমন প্রথমে বললেন ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তারপর যজ্ঞ যে করবে তাকে যে মুঞ্জ ঘাসের মেখলা পরিধান করতে হবে সেটাও ভগবান থেকে এসেছে। *যজ্ঞাশ্চ সর্বে*, যত রকমের যজ্ঞ আছে, গীতায় ভগবান বলছেন *তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্*। সব কিছু ভগবান থেকেই এসেছে, বেদও সেখান থেকেই এসেছে, বেদে যে যজ্ঞের বর্ণনা সেটাও ভগবান থেকে এসেছে। এখানে আচার্য বলছেন *অগ্নিহোত্রাদি সম্পূর্ণ যজ্ঞঃ*, যেখানে অগ্নি জাতীয় যত রকমের যজ্ঞ হয়, সবই তাঁর কাছ থেকে আসে।

তারপর বলছেন *ক্রতবঃ*, ক্রতু হল যেখানে যূপ থাকত। যজ্ঞ দুই রকমের, একটাকে বলা হয় যজ্ঞ আর একটি ক্রতু। যেখানে শুধু অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় যজ্ঞ, আর যে যজ্ঞে বলি দেওয়া হত সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রতু। বেদের এই বলি প্রথার বিরুদ্ধে পরের দিকে ভগবান বুদ্ধ প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন আর বেদের ঋষিরাও আপত্তি করেছিলেন। যার জন্য পরবর্তি কালে বলিপ্রথাটা বন্ধই হয়ে গেল। পরের দিকে তন্ত্র মতের অনুগামীরা বিশেষ করে যাঁরা শক্তি মতকে বেশী প্রাধান্য দিলেন তাঁরা এই বলিপ্রথাকে ধরে রাখলেন। এখানে বলছেন যজ্ঞ আর ক্রতু দুটোই ভগবান থেকে এসেছে। দক্ষিণা ব্যতিরেকে কোন যজ্ঞেরই পুর্তি হবে না, যজ্ঞ সমাপ্তিতে দক্ষিণা প্রদান যজ্ঞের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখনও বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে যে যজ্ঞ হয় সেখানেও দক্ষিণা ছাড়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। এই দক্ষিণাও ভগবান থেকেই এসেছে। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন – দক্ষিণা কাকে বলে? *দক্ষিণাশ্চ একগ-বাদ্যা অপরিমিতসর্বস্বান্তাঃ*, একটি গরু দান করা থেকে শুরু করে নিজের সর্বস্ব দান করে দেওয়া এর সবটাই দক্ষিণার মধ্যে গণ্য হবে। দক্ষিণা নানা রকমের হয়ে থাকে, বিভিন্ন যজ্ঞে বিভিন্ন দক্ষিণার কথা বলা আছে। যজ্ঞ যত বড় হতে থাকবে তার দক্ষিণাও সেই ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে প্রচুর উপহার ও দক্ষিণা দিতে হয়, কারণ সেখানে নিয়ম আছে এত ব্রাহ্মণকে রাখতে হবে, এত রাজাদের আমন্ত্রণ করতে হবে, এত অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতে হবে আর সবাইকে উপহার দিতে হবে। যুধিষ্ঠিরের কাছে অত টাকা নেই। এখন এত অর্থ জোগাড় করবে কিভাবে? যুধিষ্ঠির বাড়িতে বসে রইলেন আর চার ভাই চার দিশায় রাজ্যে রাজ্যে ঘুরতে চলে গেলেন। সব রাজ্যে গিয়ে হাতজোড় করে বলছেন আমার দাদা এই রকম রাজসূয় যজ্ঞ করতে চলেছেন তার জন্য যদি আপনারা কিছু অর্থ দিয়ে দেন। ভালোভাবে যদি দিয়ে দেনতো ল্যাটা চুকে যাবে, আর না যদি দেন তাহলে সামনা সামনি এসে লড়াই করুন।

এই যে বলছেন *অপরিমিতসর্বস্বান্তাঃ*, সব কিছু দান করে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া, এই শক্তি ভগবান থেকেই এসেছে। যদি কেউ এর ব্যাখ্যা করে যে, ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, নিজেদের লোভ চরিতার্থ করার জন্য এই দক্ষিণার ব্যাপারটাকে নিয়মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাদের এখানে দেখিয়ে বলে দিতে হবে – তা নয়, এই দক্ষিণাও ভগবান থেকেই এসেছে। পরে পরে এই দক্ষিণার ব্যাপারটা অনেক জায়গায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিকই। যেমন তীর্থাদিতে অনেক জায়গায় পাণ্ডাদের এই দক্ষিণার ব্যাপারটা তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কিন্তু যজ্ঞের যে দক্ষিণার প্রথা এটা পরিষ্কার বেদের মধ্যেই আছে। ভগবান থেকেই এই দক্ষিণার প্রথা এসেছে সেইজন্যই বেদে এটা বিধিবদ্ধ হয়ে আছে।

সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ, সংবৎসরশ্চ মানে বছর, কিন্তু এখানে এর অর্থ হল কাল। যজ্ঞের প্রারম্ভিক সূচনা থেকে সমাপ্তি ঘোষণার মধ্যে যা কিছু করা হত তার সব কিছু করার একটা নির্দিষ্ট কাল থাকত। এছাড়া কোন্ পূজা কোন্ দিন হবে এগুলোও আগে থাকতেই দিনক্ষণ দেখে নির্ধারিত করা থাকত। ঠিক তেমনি কোন্ যজ্ঞ কখন করতে হবে এটা বেদেই আগে থেকে নির্দিষ্ট করা আছে। বেদের সময়ে এই দিনক্ষণ গুলো এবং যজ্ঞের কাল নির্ধারণ খুব কঠোর ভাবে মানা হত। প্রায়ই ভারতীয়দের নামে বলা হয় সময়ের মূল্যবোধকে ভারত কোন দিনই নাকি গুরুত্ব দেয় না। পরে যখন ইংরেজরা ভারতে ঢুকল, ট্রেন চলতে শুরু হল, ফ্যাক্টরি খুলল তখনও দেখা গেল ভারতীয়দের টাইমের কোন বোধ ছিল না। সত্যিই কি ছিল না? পুরো ছিল। এখন বিজ্ঞানীরা যে ন্যানো সেকেণ্ড করছে, ঋষিদের কাছে ন্যানো সেকেণ্ডেরও হিসাব আছে। চণ্ডীতে বর্ণনা আছে *কলাকাষ্টাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়নি*। চোখের পাতা পড়তে যে সময়টুকু লাগছে তাকে বলা হয় নিমেষ, নিমেষ সেকেণ্ড থেকেও ক্ষুদ্র। কিন্তু নিমেষেরও অনেক ক্ষুদ্রাংশ করে যখন নীচে চলে যাচ্ছে তাকে বলছেন কলা। কলা সময়ের এতই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ যে এটাকে ধরাও খুব মুশকিল। বেদের ঋষিরা যে যজ্ঞের সময় নির্ধারণ করতেন সেটা সূর্যোদয় থেকে হিসাব করে ঠিক করতেন। সূর্যোদয় হওয়া থেকে ঘটি, পল ইত্যাদি নামে সময়ের হিসাব তাঁদের করা থাকত। আমরা এখন যেমন বলি এত ঘটিকায় অমুক বক্তার ভাষণ হবে, এই ঘটিকা আমরা অমুক সময়কে বলি। কিন্তু ওনাদের ঘটি, পল সূর্যোদয় থেকে শুরু হত। সূর্যোদয়ের সময়ের হিসাব করাটাও একটা আলাদা নিয়ম ছিল, আর রীতিমত জলের ফোঁটা দিয়ে গুণে রাখা হত।

আমাদের পরম্পরাতে লীলাবতী প্রথম ভারতে বীজগণিত শুরু করলেন, ওনার বাবাও ছিলেন বিরাট বড় গণিতজ্ঞ। লীলাবতীর বাবা গণনা করে বললেন, আমার মেয়ের বিয়ের কোন যোগ নেই কিন্তু যদি এই বিশেষ ক্ষণের মধ্যে হয় তাহলেই বিয়ে হবে, এই ক্ষণ যদি পেরিয়ে যায় তাহলে আর কোন দিনই বিয়েটা হবে না বা বিয়ে হলে বিধবাও হয়ে যেতে পারে। ভদ্রলোক অনেক হিসাব-টিসাব করে ক্ষণটাকে দেখে নিলেন। তিনি একটা পাত্রে জল রেখে তলায় নির্দিষ্ট ডাইমেনশানে একটা ছিদ্র করে তার তলায় আরেকটা পাত্র রেখে দিলেন। ঠিক যখন উপরে পাত্রের জল শেষ হয়ে নীচের পাত্রটা ভরে যাবে, ওইটাই হল ক্ষণ। সূর্যের গতির সাথে পুরো গণনা করে ক্ষণকে নির্ধারিত করা আছে। তারপর সবাই লক্ষ্য রাখছে, টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। পরে কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হতেই দেখছে নীচের পাত্রে জল পড়ছে না। তারপর দেখছে পুরো মধ্যাহ্ন হয়ে গেছে তাও নীচের পাত্রটি ভর্তি হয়নি, এটা কি করে হল! তারপর নজরে এল লীলাবতীর কানে দুল ছিল, কখন একটা দুল খুলে জলের মধ্যে পড়ে ওই ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়েছে। উপরের পাত্রে জল যেমন ছিল তেমনই রইল। লীলাবতী শেষ পর্যন্ত বিয়েই করলেন না। বাবাকে বললেন 'বাবা তুমি মন খারাপ করো না, আমি অমর হয়েই থাকব'। গণিতজ্ঞের মেয়ে কিনা, বাবার কাছ থেকে গণিতটা খুব ভালো করে রপ্ত করে পরে তিনি ভারতে প্রথম বীজগণিত বার করলেন। তাও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতরা বলে ভারতে নাকি মেয়েদের কোন শিক্ষা ছিল না। লীলাবতী ভারতীয় গণিত জগতে খুব নামকরা এক ব্যক্তিত্ব।

এখানে *সংবৎসরশ্চ* মানে কাল, অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদনের যে নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময় যেটাকে যজ্ঞকাল বলছে সেটাও ভগবান থেকে এসেছে। *যজমানশ্চ*, যজ্ঞকর্তাও ভগবান থেকে এসেছে। *লোকাঃ*, কর্মের ফলস্বরূপ যে লোকগুলো প্রাপ্ত হবে সেই লোকগুলোও ভগবানের থেকে উৎপন্ন হয়েছে। একটা যজ্ঞের কত অঙ্গ আমরা পাচ্ছি, যজ্ঞের স্তুতি, যজ্ঞের গান, আহুতির মন্ত্র, দীক্ষা, দক্ষিণা, যজ্ঞকাল, যজ্ঞের প্রস্তুতি, যে যজ্ঞকর্তা অর্থাৎ যজমান সবই তাঁর থেকে এসেছে। আর শেষ যেটা যজ্ঞের যে ফল সেটাও ভগবান থেকেই আসছে।

এবারে লোকের বর্ণনা করছেন। যজ্ঞের ফল দুই রকমের হয়, যজ্ঞের কিছু ফল এই জীবনেই সে পেয়ে যাবে। আর কিছু কিছু ফল মৃত্যুর পর সে পাবে। যে ফলটা এখানে পেয়ে গেলাম সেটা তো এখানেই ভোগ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু *লোকাঃ*, মৃত্যুর পরে বিভিন্ন লোকপ্রাপ্তির মাধ্যমে যে ফলগুলো পাবো সেই লোকগুলোর বর্ণনা করছেন। *সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ*, সোম শব্দের দুটো অর্থ একটা সোমরস আর চন্দ্রমা। সোমবারকে চন্দ্রবার আর রবিবারকে সূর্যের বার বলা হয়। আমাদের এখানে বার গুলোকে নক্ষত্রের নামে নামকরণ করা

হয়েছে। এখানে দুটি লোকের কথা বলছেন। যেটা পরে গীতাতে অন্য একটা আকার নিয়েছে। এখানে চন্দ্রলোক আর সূর্যলোকের কথা বলছেন। আমরা আকাশে যে চন্দ্রমা দেখছি তাকে চন্দ্রলোক বলা হচ্ছে না, ঠিক তেমনি যে সূর্যকে রোজ দেখছি এটাও কিন্তু এই সূর্যলোক নয়। জড় যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে এই লোকসমূহকে ওই সূক্ষ্মতা আর স্থূলতার হিসাবে নির্ধারিত করা হয়।

আচার্য এখানে বিদ্বান ও অবিদ্বান এই দুটো শব্দ ব্যবহার করছেন। ঈশাবাস্যোপনিষদে এই ভাবটা কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা শুধু কর্ম করে যাচ্ছে তারা এক ধরণের লোক পাবে, আবার যারা শুধু বিদ্যাকে নিয়ে আছে তারা আরেক রকম আর যারা কর্ম ও বিদ্যা দুটোও করছে আর উপাসনাও করছে তাদের ফল অন্য রকম হবে। বলছেন, যারা বিদ্বান কর্তা, যারা আরও উন্নত অর্থাৎ যারা আরও ভালো কর্ম করেছেন তারা উত্তরায়ণ মার্গ দিয়ে সূর্যলোকে গমন করেন, যেখানে বেশী দিন সুখ ভোগ হয়। আর যারা অবিদ্বান তারা দক্ষিণায়ন মার্গ দিয়ে চন্দ্রলোকে গমন করেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য একটু অন্য ধরণের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। এখানে চন্দ্রলোককে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে তাতে মনে হবে বিদ্বৎদের জন্য দক্ষিণায়ন আর অবিদ্বৎদের জন্য উত্তরায়ণ বলছেন। সাধারণত চন্দ্রলোককে সূর্যলোক থেকে উচ্চলোক বলা হয়। এই নিয়ে অনেক সংশয় আছে। তবে মূল কথা হল মৃত্যুর পর উত্তরায়ণ দিয়ে যাঁরা গমন করেন তাঁদের এই পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ মার্গ। এটি দেবতাদের মার্গ হওয়ার জন্য এখানে বেশী দিন থাকতে পারেন। আর চন্দ্রলোক হল পিতৃদের মার্গ। এই পথ দিয়ে মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন আর সেখানে পিতৃদের সাথে বাস করেন। কিন্তু আচার্য এখানে বিদ্বান ও অবিদ্বান শব্দ নিয়ে এসেছেন। বিদ্বান হল, যাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মেষ হয়েছে, তাঁরা যে কর্মই করছেন সেটা বুঝে নিয়ে করছেন আর তার সাথে তপস্যাও করেছেন। যেমন ঠাকুরের মন্দিরে অনেকেই যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ঠিক ঠিক ভক্তিভাব নিয়ে যাচ্ছেন, আর অনেকে ঠাকুরের মন্দিরে যেতে হয় এই উপাচারের ভাব নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুররের কাছে প্রণাম দুজনেই নিবেদন করছে কিন্তু ফল দুজনের ক্ষেত্রে আলাদা হবে। এই ব্যাপারটাকে এখানে বিদ্বান আর অবিদ্বান দিয়ে বলা হচ্ছে। এখানে এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, এনারা একবারও কোন ব্যাখ্যা করছেন না যে, মৃত্যুর পর কিভাবে যাচ্ছে। এগুলো অন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করবে কিন্তু উপনিষদের কাছে গুরুত্ব হল মৃত্যুর পর তুমি যেখানেই যাও, তুমি পৃথিবীতেই জন্মাও বা চন্দ্রলোক কিংবা সূর্যলোকেই যাও, এগুলো সবটাই সেই অক্ষর পুরুষের থেকে উৎপন্ন হয়েছে। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। যজ্ঞ ঈশ্বর থেকে এসেছে, যজ্ঞের অঙ্গ রূপে যা কিছু আছে সব ঈশ্বর থেকেই এসেছে। আর যজ্ঞের যে ফল তাও ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসছে। যাঁরা উত্তরায়ণ দিয়ে গমন করেন সেটাও ভগবান করেছেন আর যাঁরা দক্ষিণায়ন দিয়ে গমন করেন সেটাও ভগবানের করা। স্বর্গটাও ভগবানের নরকও ভগবানের। সুখ যেটা আসছে সেটাও ভগবানের কাছ থেকেই আসছে।

তাহলে দুঃখটা কে দেন? সেটাও তিনিই দেন। আমি কি চাইছি? ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন। একজনের কাছে একটা রঙের গামলা ছিল, সেই গামলাতে কাপড় যে রঙে ছোপাতে চাইবে সেই রঙেই সে ছুপিয়ে দেবেন। একজন সেই রঙওয়ালা গামলার লোকটির কাছে গেছে। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি রঙ চাইছ? তুমি যে রঙে রাঙিয়েছ আমাকে সেই রঙ দাও। জগতের কোন কিছুই ঈশ্বরের বাইরে নয়। ঠাকুরের যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন, এই কামিনী-কাঞ্চনও কি ঠাকুরের বাইরে? কখনই না, কামিনী-কাঞ্চনও ঠাকুরেরই। নরক যেটা সেটাও ঠাকুরের। আমি কি চাইছি? কামিনী-কাঞ্চন যদি চাও তার একটা ফল আছে সেটাও নিতে হবে, যজ্ঞাদি যদি চাও তারও একটা ফল আছে। ঈশ্বরের সাধনা যদি কর তারও একটি ফল আছে। আপনি কোনটা চাইছেন? আপনি বলছেন, 'সুখ-দুঃখ এত ভোগ করা হয়েছে যে আমার সব দেখা হয়ে গেছে, এগুলো আমার আর লাগবে না, আমার এখন চাই ঈশ্বরের সাথে সম্ভোগ'। ঠিক আছে, তাহলে বাপু আপনাকে কামিনী-কাঞ্চন ছাড়তে হবে। আরেকজন বলছে কামিনী-কাঞ্চনে আমার এখনও মন ভরেনি, আমি এখন সুখভোগ করতে চাই। খুব ভালো কথা, যত খুশী সুখভোগ কর কেউ বারণ করছে না, এটাও ঈশ্বরেরই। ভোগ করতে গিয়ে যখন চড়-চাপড় খাবে, খেয়ে যখন খুব কেঁদে আমার কাছে আসবে তখন অন্য কথা হবে।

এরপর বলছেন নানান ধরণের যত জীব আছে, যক্ষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, নানান রকমের যে শক্তিগুলো আছে আর নানান রকমের যে জিনিষ আছে সব ভগবান থেকেই এসেছে। মুণ্ডকোপনিষদের এই পুরো অধ্যায় জুড়ে এটাই দেখান হচ্ছে যে, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। যজ্ঞের বর্ণনা করে এবার বিভিন্ন জীবের কথা বলছেন –

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ।।২/১/৭।।

(সেই অক্ষর পুরুষ থেকে বসু প্রভৃতি বিশেষ গণ ভেদে দেবতাগণ উৎপন্ন হন, সাধ্যসমূহ, মনুষ্যসকল, পশুগণ, পক্ষিকুল, প্রাণ এবং অপান, ব্রীহিযব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য এবং কর্তব্যবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়।)

প্রথমে বলছেন সেই অক্ষর পুরুষ থেকে যত দেবতা আছেন, বসুগণ, মরুৎগণ আছেন, যত রকমের দিব্য প্রাণী আছেন সবাই ভগবান থেকেই এসেছেন। কুবেরাদি যক্ষরা সেখান থেকেই এসেছেন, চিত্ররথাদি যত গন্ধর্ব আছেন সেই পুরুষের কাছ থেকেই এসেছেন। কপিল মুনির মত সিদ্ধরাও সবাই সেখান থেকেই এসেছেন। সেটাই এখানে বলছেন *তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ*, নানান রকমের যত দেবতা আছেন, দেবতাদের অনেক ধরণের শ্রেনী আছে, আমরা বেদে প্রায় পঞ্চাশ রকমের দেবতাদের শ্রেনী পাই – যেমন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্রাদি দেবতারা একটা শ্রেনী, আবার যমজ দেবতা আছেন যেমন অশ্বিনী কুমারদ্বয়, অষ্টবসু আদি, রুদ্রাদি দেবতারা আছেন, ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ আছেন এরা সবাই দেবতাদের এক একটা শ্রেনী। এদের সব কিছু আলাদা, শক্তি আলাদা, কার্য আলাদা কিন্তু সবাই সেই অক্ষর পুরুষ থেকে এসেছেন। আর *সাধ্যা*, সাধ্যাও দেবতাদের একটা জাতি বিশেষ। এরা কিন্তু সিদ্ধ নয়, সিদ্ধ হলেন ঋষি। *মনুষ্যাঃ*, যত রকমের মানব আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, হিন্দুস্থান, পাকিস্থানের যত রকমের মানব আছে সব ভগবানেরই সৃষ্টি। *পশবো বয়াংসি*, পশু বলতে এখানে দুই ধরণের পশুকেই বোঝাচ্ছে, যারা জঙ্গলে থাকে আর যারা গ্রামে থাকে। সব পশুই ভগবানের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য পুরানে দেখান হয়েছে প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি মেয়ে ছিল। প্রজাপতি তার সব কটি মেয়েকে বিয়ে দিলেন কাশ্যপ মুনির সাথে। এবার এক একটি মেয়ে থেকে এক এক ধরণের প্রজাতির জন্ম হতে শুরু করল। অদিতি থেকে দেবতারা, দিতি থেকে দৈত্যরা, সরমা থেকে কুকুর শেয়াল, বিনতা থেকে গরুড় অর্থাৎ পাখি প্রজাতি যারা আকাশে উড়ে বেড়ায়, কদ্রু থেকে সরিসৃপ প্রজাতিরা বেরোল। আসলে দেখানো হচ্ছে সব সেই ভগবান থেকেই বেরিয়েছে।

তাই নয়, আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, নিঃশ্বাস ছাড়ছি, *প্রাণাপানৌ* – এটিও ভগবান থেকেই এসেছে। *ব্রীহিযবৌ*, নানান রকমের শস্য, এমনকি যজ্ঞে যে হবি তৈরী হবে ব্রীহি ও যব, ধান-গম জাতীয় এই ব্রীহি যব সব ভগবান থেকেই এসেছে। আর *তপশ্চ*, তপঃ শব্দকে আচার্য এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন – যজ্ঞাদি যাঁরা করেন তাঁদেরকে তপস্যা করতে হয়, ভোরবেলা স্নান করা, উপবাস করা। তপস্যা মানুষকে শুদ্ধ পবিত্র করে। তপস্যা যজ্ঞাদি কর্ম করার জন্য মানুষকে সংস্কার করে। দ্বিতীয়তঃ, *স্বতন্ত্র চ ফলসাধনম্*, আমি যে যজ্ঞ করতে যাচ্ছি তপস্যা আমাকে যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। যেমন জপ করার আগে স্নানাদি করে ঠাকুরের পূজো করে জপে বসছি। এই যে আমি স্নান করে পূজো করলাম, মানে আমি নিজেকে সংস্কার করে নিলাম অর্থাৎ জপ করার জন্য আমাকে শুদ্ধ করে দিল। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হল, শুধু যে স্নান করলাম আর ভগবানের পূজা করলাম, এই কাজগুলো নিজস্ব একটা স্বাধীন ফল প্রদান করে। পরের দিকে যখন বেদের যজ্ঞাদি কর্ম উঠে গেল কিন্তু এই তপস্যাটা থেকে গেল। এই তপস্যাও ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। মহাভারতে তপস্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। পুরানেও যজ্ঞের ভাবটা কমিয়ে দিয়ে তপস্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ যদি দিনে দুই তিন ঘন্টা জপ করে এই জপটাও একটা তপস্যা হয়ে গেল আর এই তপস্যা নিজস্ব একটা স্বাধীন ফল দেবে। তার জন্য তাকে যে আলাদা কোন কর্ম করতে হবে,

তা নয়। যেমন কোন পূজাদি করার সময় আসনে বসে পূজা করছে, তার একটা অঙ্গ হল জপ। এটাও তপস্যা, এটাও একটা স্বাধীন ফল দেবে। একটা বড় কিছু শুভ কর্ম করার জন্য যখন তপস্যা করছে সেই তপস্যা তাকে তখন সংস্কার করে শুদ্ধ করে দিচ্ছে। তপস্যার এটা একটা কাজ, আর দ্বিতীয় কাজ তাকে স্বাধীন স্বতন্ত্র একটা ফল দিচ্ছে। এই স্বাধীন ফলটাও ভগবান থেকে আসছে।

আর শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাকে বলছেন আস্তিক্য বুদ্ধি। আস্তিক্য বুদ্ধি হল একটা জিনিষে বিশ্বাস। আমাকে গুরু দীক্ষা দিয়ে বলে দিলেন, এই মন্ত্রের জপ করলে তুমি ফল পাবে। আমি গভীর বিশ্বাসের সাথে এখন জপ করতে থাকলাম, এটাকেই বলছেন আস্তিক্য বুদ্ধি, মন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। ঠাকুরের প্রতি আস্তিক্য বুদ্ধি মানে, তাঁর যে অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বে বিশ্বাস। দ্বিতীয় বলছেন, চিত্তপ্রসাদ। চিত্তপ্রসাদ হল মনের আনন্দ। যাদের মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব অশান্তি তাদেরই হয়। মনে যদি অশান্তি থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার শ্রদ্ধার অভাব আছে। গোমড়া মুখ, চোখে জল বুঝবে শ্রদ্ধার অভাব আছে। শ্রদ্ধার তৃতীয় দিক বলছেন, পুরুষার্থ সাধনের প্রয়োগ। পুরুষার্থ সাধন মানে, আমি টাকা-পয়সা অর্জনের জন্য সৎ ভাবে কাজ করব, এটা হল পুরুষার্থ সাধন। আমি কামভোগের জন্য ঠিক ভাবে চলব, এটা হল পুরুষার্থ সাধন। আমি ধর্মকর্ম করব, আমি মোক্ষের জন্য সাধনা করব, সব পুরুষার্থ সাধন। কিন্তু মানুষের মধ্যে যতক্ষণ শ্রদ্ধা না আসে ততক্ষণ সে পুরুষার্থের সাধন করতে যাবে না। ধর্ম আর অধর্ম দুটি পথ। মানুষ যখন ধর্মের পথকে আশ্রয় করে তখন তার কখন সুখ আসবে কখন দুঃখ আসবে, কখন ফল আসবে কখন ফল আসবে না। কিন্তু তাকে কখন দুমড়ে মুচড়ে দেবে না, তার চিত্তপ্রসাদ কখন নষ্ট হবে না। অধর্মের পথ যারা অবলম্বন করে তাদের সুখটাও বেশী হয় আবার দুঃখটাও অনেক বেশী হয়। অধর্মীদের সব থেকে খারাপ দিক হল চিত্তপ্রসাদ তাদের কখনই হবে না। অধর্ম পথে থেকে প্রচুর ঘুষ নিলে প্রচুর টাকা হবে, তাতে ভোগের প্রাচুর্য অনেক আসবে কিন্তু মনে শান্তি কখনই থাকবে না। যখন ধরা পড়বে তখন তার কষ্টটা আরও বেশী হবে। পুরুষার্থ সাধন, মানে আমি আমার ধর্মে অবস্থিত থাকব, এই দৃঢ়তা আসে একমাত্র শ্রদ্ধা থেকে। শ্রদ্ধা হলে মানুষের এই তিনটে জিনিষ হয়। শ্রদ্ধাও সেই অক্ষর পুরুষ থেকেই আসে।

সত্যং, যেমনটি হয়েছে তেমনটি বলা, এটিও ভগবান থেকেই আসে। *ব্রহ্মচর্যং*, মৈথুন না করা। একমাত্র সন্তান উৎপত্তি ছাড়া মৈথুনে লিপ্ত না হওয়াই ব্রহ্মচর্য। *বিধিশ্চ*, নানা রকমের বিধির যে কথা বলা হল, শ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য এগুলো বিধি, বিধি মানুষকে ঠিক পথে পরিচালিত করে এগিয়ে দেয়। এই বিধিও ভগবানের কাছ থেকেই আসছে। যত রকমের যজ্ঞ, যত রকমের কর্ম, যত রকমের সৃষ্টি, যাবতীয় যা কিছু আছে সব সেই অক্ষর পুরুষ থেকে আসছে। যে বিধিগুলো আমরা পালন করছি, যে শক্তি আমাদের শরীরে, প্রকৃতিতে কাজ করছে, প্রাণাপান কাজ করছে সব ভগবান থেকেই আসছে।

এরপরে আট নম্বর মন্ত্রে বলছেন আমাদের শরীরে যত ইন্দ্রিয় আছে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের স্থান এগুলো সবই ভগবানের থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উৎপত্তি কিভাবে হয় এখানে তার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না, বেদান্তের দৃষ্টিতে এগুলোর উৎপত্তিকে কিভাবে দেখা হয় তারই বর্ণনা চলছে। সৃষ্টির ব্যাপারে মূল কথা হল, পুরুষ থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার থেকে পাঁচটি তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। তন্মাত্রা বলতে বোঝায়, যে জিনিষটা আছে সেটা ভৌতিক জগতের জিনিষ কিনা বোঝা যায় না। তাদের মধ্যে শুধু গুণটুকু থাকে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই কটি গুণ একেবারে শুদ্ধ আকারে থাকে, এখনও ঠিক স্থূল রূপ গ্রহণ করেনি। প্রকৃতি নিজেই তিনটে গুণের সমাহার, সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো। এই তিনটে গুণ প্রকৃতির মধ্যে সাম্য অবস্থায় থাকে। সাম্য অবস্থাটা যখন ভেঙে যায় তখনই সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। প্রকৃতি থেকে প্রথম সৃষ্টি হয় মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার। অহঙ্কার থেকে এই পঞ্চ তন্মাত্রা। এই পাঁচটি তন্মাত্রার সত্ত্বগুণের সমষ্টি দিয়ে তৈরী হয় আমাদের মন ও বুদ্ধি। আর প্রত্যেকটি তন্মাত্রার এক একটা সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরী হয় ইন্দ্রিয়। মন আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এক একটি তন্মাত্রার সত্ত্বগুণ দিয়ে আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয়গুলি তৈরী হয় আর মন পাঁচটা তন্মাত্রার সত্ত্ব অংশের সমষ্টি দিয়ে তৈরী। তার ফলে

আমাদের মন ও বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। সে যদি চায় অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না নিয়েও কাজ করে দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলে যে কোন মন্ত্রীর ক্ষমতাকে নিজের হাতে নিয়ে নিজেই সেই মন্ত্রীর কাজ করে দিতে পারেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ইচ্ছে করলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাজ করতে পারবে না। আমাদের মনস, যেটাকে মন বলছে সে হল প্রধানমন্ত্রী। মন পাঁচটি তন্মাত্রার তত্ত্বকে নিয়ে বসে আছে। পাঁচটি তন্মাত্রার যে রজোগুণের অংশ আছে, সেই রজোগুণ দিয়ে তৈরী হয় প্রাণ ও কর্মেন্দ্রিয় গুলি। আমরা প্রায়ই যেমন বলি আমার মন প্রাণ ভরে গেছে। মন হল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির রাজা অন্য দিকে প্রাণ কর্মেন্দ্রিয়গুলির রাজা। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলি যদি শিথিল হয়ে যায় তাতে মন ও প্রাণ কিন্তু শিথিল হবে না, চাপ বেড়ে যাবে কিন্তু সবটাই তার অধীনে থাকবে, মন ও প্রাণ শেষ রাজা।

ইন্দ্রিয়ের কাজ হল মনকে সব খবর পৌঁছে দেওয়া। যেমন, আমার এই হাত এটি আমার শরীরের একটা অঙ্গ। হাতটা কিন্তু ইন্দ্রিয় নয়। হাত দিয়ে আমি কিছু একটা ধরলাম, হাতে যে স্নায়ুগুলো আছে এরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দিচ্ছে ইন্দ্রিয়কে। কোন্ ইন্দ্রিয়কে? হস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে। আমি একটা বস্তুকে ধরেছি তার এই রকম স্পর্শ হয়েছে, এই খবরটা হস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে দিচ্ছে। এবার কর্মেন্দ্রিয় এই খবরটা পৌঁছে দিচ্ছে মনকে। মনের কাছে আছে পুরো দশটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দশটি একই জিনিষ দিয়ে তৈরী। আবার মন নিজেও একটি ইন্দ্রিয়, তাই একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়। মন এবার চোখকে আদেশ করল দেখ তো ব্যাপারটা কি। চোখ সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফেলে দেখে নিল জিনিষটা কি। যদি অনিয়ন্ত্রিত মন হয়, যেমন বাচ্চাদের মন, বাচ্চারা যখনই কিছু দেখে তখন সেটা হাতে করে ধরবে, চোখে ভালো করে দেখল, নাক দিয়ে শুঁকে দেখল তারপর জিভ দিয়ে দেখে জিনিষটা কি। মন প্রাথমিক স্তরে এইভাবে সব জিনিষকে পরীক্ষা করে দেখে। একটা অবস্থায় এসে মন পুরো অভিজ্ঞ হয়ে বুঝে যাবে যে, একটা ইন্দ্রিয়ের কাজকে আরেকটা ইন্দ্রিয়ের ঘাড়ে চাপাতে নেই। যেটা স্পর্শ করলেই হয়ে যায় সেটাকে আর চোখ দিয়ে দেখার দরকার নেই। যেটা দেখেই বুঝে যাবে সেটাকে আর স্পর্শ করার দরকার হবে না। এই কাজগুলো মনের কাজ। সেইজন্য মনকে প্রথম থেকে খুব নিবিড় প্রশিক্ষণ দিতে হয়।

মজার ব্যাপার হল, যাবতীয় যত বস্তু আছে সবই স্থূল ভূত। এই পঞ্চ তন্মাত্রাগুলো যখন এক অপরের সঙ্গে মিশ্রণ হতে থাকে সেখান থেকে এই ক্ষিতি, অপঃ, মরুৎ, ব্যোম ও তেজ জন্ম নেয়। ইন্দ্রিয়গুলোও আবার সেই পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী। ফলে এক অপরের সঙ্গে মিশে যায়। যেমন চক্ষু, চক্ষু তৈরী হয়েছে অগ্নি তত্ত্ব দিয়ে। আর বস্তু যে রূপ ও রঙের আকার নিয়েছে সেটাও অগ্নি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। তাই চোখের যে অগ্নি তত্ত্ব আর বাইরের বস্তুর যে অগ্নি তত্ত্ব এই দুটো সব সময় চাইছে এক হয়ে যেতে। কারণ দুজনের স্বভাব এক। সেইজন্য চোখ, আমাদের যে দৃক্ ইন্দ্রিয় সেটা সুন্দর দৃশ্যের সাথে, সুন্দর মুখের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। এই ভাবে আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলো যার যার নিজের তত্ত্বের সাথে এক হয়ে যেতে চায়। কারণ এরা একই জিনিষ, শুধু একজন একটা জায়গায় আরেকজন আরেকটা জায়গায় আছে। এখানে বলছেন এই যে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত বস্তু সব সেই অক্ষর পুরুষ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। সেটাই এই মন্ত্র বলছেন –

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত।।২/১/৮।।

(সেই পুরুষ থেকে সাতটি প্রাণ উৎপন্ন হয়। সাতটি অর্চি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ সামর্থ্য, সাতটি সমিধ(বিষয়), সাতটি হোম (বিষয় সম্পর্কিত বিজ্ঞান), সাতটি লোক (যে সাতটি বিষয়ে বা স্থানে ইন্দ্রিয় বিচরণ করে) বিধাতা কর্তৃক প্রতি জীবে স্থাপিত হয়।)

উপনিষদের এইসব মন্ত্র সংস্কৃত জানা কেউ যদি নিজে থেকে পড়েন কিছুই বুঝতে পারবেন না। আচার্য যেভাবে এই শব্দগুলোর অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন, সেইভাবে না বুঝলে এই মন্ত্রের কোন অর্থই দাঁড়াবে না। এখানে বলছেন *সপ্ত প্রাণাঃ*, শব্দটা হল প্রাণ কিন্তু এই প্রাণের অর্থ আচার্য করছেন ইন্দ্রিয়। পরে আবার ব্যাখ্যা করে দেখাবেন কেন এখানে প্রাণের অর্থ ইন্দ্রিয় হবে। এখানে প্রাণা, অপানা, ব্যয়ানা, উদানা ও সমানা এই পাঁচটি প্রাণকে বলা হচ্ছে না। যখন এই মন্ত্রের প্রথম লাইনের সাথে পরের পঙক্তির সাথে মেলান হবে তখন এই প্রাণের অর্থ পঞ্চ প্রাণ করলে কোন অর্থই দাঁড়াবে না। কিন্তু আচার্যের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করলে তখন অর্থটা বোঝা যায়। তাহলে এই সাতটি প্রাণ কি কি? আসলে বেদান্ত মতেও সাতটা প্রাণের কথা নেই, এমন কি সাতটা ইন্দ্রিয়ের কথাও নেই। আচার্য সেইজন্য ব্যাখ্যা করছেন – আমাদের দুটো চোখ, দুটো নাক, দুটো কান আর মুখ। প্রথম তিনটির দুটো করে ছিদ্র আর মুখের একটি ছিদ্র এই সাতটি ছিদ্রকে বলা হচ্ছে *সপ্ত প্রাণাঃ*, ইন্দ্রিয়গুলো এই সাতটি ছিদ্র দিয়ে কাজ করছে।

এই সাতটি প্রাণ, *প্রভবন্তি তস্মাৎ*, সেই ভগবান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। *সপ্তার্চিষঃ*, এই যে সাতটি ছিদ্রে অর্থাৎ চোখ, কর্ণাদিতে যে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, যজ্ঞের অগ্নিতে যেমন সমিধা কাঠ দেওয়া হয় ঠিক তেমনি এই সাতটি প্রাণে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। অগ্নি আর প্রাণ দুটোকে সমান ভাবে নেওয়া হয়। *সপ্ত অর্চিষঃ*, অর্চিষঃ মানে দীপ্তি, ইন্দ্রিয় নিজের নিজের বিষয়কে দীপ্ত করছে। যদি ইন্দ্রিয় না থাকে তাহলে ইন্দ্রিয়ের নিজের যে বস্তু তাকে কোন দিন জানা যাবে না। রূপ আছে কিন্তু সেই রূপকে দেখার জন্য যদি চোখ না থাকে তাহলে সেই রূপকে কোন দিন জানা যাবে না। *সমিধঃ*, সমিধ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে বিষয়কে, জগতের বস্তুসমুদয়কে। প্রিয়জনকে দেখে বলছি তোমাকে দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল, এখানে ঠিক এই ব্যাপারটা হচ্ছে। চোখে আহুতি দেওয়া হল। কিসের আহুতি? তোমার রূপের। তোমার মিষ্টি কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। প্রাণ কি করে জুড়াবে! এখানে কান জুড়াল। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া, প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া একই জিনিষ হচ্ছে। যেমন আগুনে ইন্ধন দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি তোমার রূপটা একটা ইন্ধন, তোমার কথা একটা ইন্ধন, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, মিষ্টি গন্ধ সবই নাসিকার ইন্ধন। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, মায়ের হাতের রান্নাটা ইন্ধন আর এখানে প্রাণ হল মুখ। ইন্দ্রিয়গুলো যখন নিজের নিজের ইন্ধন পেয়ে যাওয়া আর অগ্নিতে ইন্ধন দেওয়া দুটো কিন্তু মূলতঃ এক। *সপ্ত হোমাঃ*, অর্থাৎ এই সাতটি প্রাণে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। নিজের নিজের বিষয়কে যখন পেয়ে যায় তখন আগুন যেমন ইন্ধন পেলে জ্বলে ওঠে ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়গুলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

যার গান শুনতে ভালো লাগে, সে যত গান শুনতে থাকে ততই তার আরও গান শুনতে ইচ্ছে করে। যার কোন সুন্দর দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে, দেখে দেখে তার মন এমন হয়ে যায় আরও দেখতে ইচ্ছে করে। তাই হোমকে এখানে আচার্য বলছেন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের ধ্যান। প্রথম হল চোখ, চোখের সঙ্গে মিলন হচ্ছে রূপের বা সুন্দর দৃশ্যের, এটা হল দ্বিতীয় ধাপ আর তৃতীয় হল জ্ঞান। কি জ্ঞান? জিনিষটা সুন্দর বা জিনিষটা খারাপ। এই সব কিছু, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় আর বিষয়ের যে জ্ঞান সব ভগবান থেকেই আসছে। মহানায়ক উপনিষদে একটা মন্ত্র আছে '*যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি*', এই মন্ত্রকে আধার করে আচার্য ব্যাখ্যা করছেন *জুহোতি* মানে আহুতি দেওয়া। আহুতি দেওয়া অর্থাৎ হোম এটাকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞান, মানে জিনিষটাকে জানা। এই ইন্ধন বা সমিধা ও আহুতি দুটোই তাঁর কাছ থেকে এসেছে। কারণ সেই তন্মাত্রা থেকে ইন্দ্রিয় তৈরী হয় আর সেই তন্মাত্রা থেকেই এই জগৎএর সব স্থূল ভূত তৈরী হয়। এই তন্মাত্রাগুলো এসেছে অহঙ্কার থেকে, অহঙ্কার এসেছে মহৎ থেকে আর মহৎ এসেছে প্রকৃতি থেকে, প্রকৃতি এসেছে সেই পুরুষ থেকে। সেইজন্য কোন কিছুই তাঁর বাইরে হতে পারেনা।

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা, যদি এর শব্দার্থ নিয়ে অর্থ করি তাহলে মনে হবে বলতে চাইছে এর আগে যে লোকের কথা বলা হয়েছে সেই সপ্ত লোকে সাতটি প্রাণের খেলা চলছে। না, এখানে তা হবে না। সাতটি যে ইন্দ্রিয়, আর তাদের যে সাতটি বিষয়, আর সেই বিষয়ের যে জ্ঞান সব তাঁর কাছ থেকে আসছে। প্রাণের অর্থ যে ইন্দ্রিয়সমুদয়ই হবে এর সপক্ষে আচার্য যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন, সেটা যে কত সঠিক এখানে

এসে বোঝা যায়। প্রথমে বলছেন *সপ্ত প্রাণাঃ* সাতটি প্রাণ *প্রভবন্তি তস্মাৎ*, তাঁর কাছ থেকেই জন্ম নিচ্ছে। পরের পঙক্তিতে এসে বলছেন *সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা*, যেখানে প্রাণবায়ু সঞ্চার হচ্ছে। প্রথম লাইনের প্রাণের অর্থ ইন্দ্রিয় আর দ্বিতীয় পঙক্তির প্রাণের অর্থ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার কর্মেন্দ্রিয় গুলো কোথায় যায়? এর আগে চার নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছিল হৃদয়ে প্রবেশ করে যায়। তাহলে এই ইন্দ্রিয়গুলো হৃদয়ে ঢুকে যাচ্ছে। এখন এই প্রাণকে যদি প্রাণ, অপানের অর্থে নেওয়া হয় তাহলে আমরা ঘুমিয়ে পড়লে প্রাণ, আপান তো বন্ধ হয় না। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তো তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় না। তাহলে শেষ লাইনে কি বলছেন? *গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত*। গুহা বলতে এখানে হৃদয়কে বলছেন, এই হৃদয়ে সাতটি প্রাণ প্রবেশ করে যায়। যদি এই প্রাণকে আমরা প্রাণ, আপানাদি অর্থ করি তাহলে তো এই প্রাণ তো কখন হৃদয়ে ঢুকবে না। কারণ মানুষ সুষুপ্তিতে থাকুক, ঘুমিয়ে থাকুক তখনও কিন্তু তার প্রাণবায়ু চলতে থাকে। তাহলে সপ্ত প্রাণ বলতে কি বোঝাবে? যেখানে ক্রিয়া হচ্ছে। শরীর ছাড়া আর কোথায় প্রাণক্রিয়া চলে? ইন্দ্রিয়গুলিতে চলে। ঘুমিয়ে পড়লে ইন্দ্রিয়গুলো আর কাজ করে না। *সপ্ত প্রাণাঃ* বলতে তাই ইন্দ্রিয়কেই বুঝতে হবে। আর ঘুমিয়ে পড়লে এই সাতটি ইন্দ্রিয় হৃদয়গুহাতে প্রবেশ করে যায়। সেইজন্য উপনিষদ যতক্ষণ আচার্যের কাছে না অধ্যয়ণ করা হয় কিছুতেই এই সব মন্ত্রের অর্থ পরিষ্কার হবে না। এখানে কি বলছেন? যে জিনিষগুলো এক সময় সক্রিয় থাকে, অন্য সময় হৃদয়ে ঢুকে যায়, অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়ে ঢুকে যায়। এবার তাহলে অর্থটা পরিষ্কার হচ্ছে এই *সপ্ত প্রাণাঃ* বলতে ইন্দ্রিয়কে বোঝান হচ্ছে, যার মধ্যে মনকেও ধরা হয়েছে। আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করছে এই আমাদের শরীরে যত কার্যকলাপ চলছে, দুটো চোখ, কান নাক ইত্যাদি, এরা যে বিষয়গুলো নিয়ে সক্রিয় হচ্ছে, সেখান থেকে তাদের যে বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে এই সব কিছু সেই অক্ষর পুরুষ থেকে আসছে। একজন মানুষ নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু করছে সেই ইন্দ্রিয়গুলো ভগবান দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়গুলো সেগুলোও ভগবান দিয়েছেন আর ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে সেটাও তিনিই দিচ্ছেন। কোন কিছুই তাঁর বাইরে নেই।

সেইজন্য হিন্দুধর্মে পাপ বলে কিছু হয় না। সবটাই তো ঈশ্বরের, ঈশ্বরের আবার পাপ কি করে হবে। যদি আমাদের অবচেতন মনে কোথাও কখন এই বোধটা কাজ করে যে, শাস্ত্রে বলছে তুমি যদি এই কর্মগুলো কর, যেমন যে কাজে অপরের কষ্ট হয় সেই কাজ না করা, তখন অবশ্যই আমাদের শাস্ত্রের কথানুসারে চলতে হবে। কিন্তু আমি নিজের ভালোর জন্য মাছ মেরে খাচ্ছি, এখানে তো অপরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, একটা প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। এটাকে কি পাপ বলা যাবে? এখানে এসে আমাদের ধর্ম দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল বলবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই পাপ, প্রাণী হিংসা যখন হবে তখন এটা অবশ্যই পাপ। আরেক দল বলবে আমরা জন্মাবধি মাছ খেয়ে আসছি, মাছ ছাড়া আমরা বাঁচব কি করে! তখন বলবে, ঠিক আছে যদিও এটা নিষেধ তাও তুমি খেতে চাইছ খাও কিন্তু এর জন্য তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে নাও। কিন্তু মানুষ মানুষকে যখন খুন করছে তখন সে হয় কোন প্রতিহিংসা বশতঃ বা কোন লোভ চরিতার্থ করার ভাবনা থেকে খুন করছে। এগুলোকে পাপ বলছে কেন? তুমি নিজের স্বার্থের জন্য অপরকে কষ্ট দিচ্ছ। যে কোন ধরণের হিংসাকে নিষিদ্ধ কর্ম বলা হচ্ছে। ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়া হল মানব জীবনের উদ্দেশ্য। যে কর্ম আমাকে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছে সেই কর্মকে পাপ বলছে। কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মে যে অর্থে পাপকে নেওয়া হয় সেই অর্থে এখানে কোন পাপ হয় না। যেটাই করছি সেটাই তো ঈশ্বরের তাহলে পাপ আবার কোথা থেকে হবে। সমস্যা হল, আমাকে ঈশ্বর থেকে এই কার্যটা দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই সাধারণ জিনিষগুলো যা আমরা সব সময় করছি, যেমন খেতে কেউ ভালোবাসে এটা পাপ নয়। কিন্তু সবটাই যখন আহুতি রূপে নেবে তখন তা কোনটাই আর দোষের মধ্যে গ্রাহ্য হবে না।

আচার্য বলছেন *আত্মযাজী*, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর যে কর্ম, আর কর্মফল এবং অজ্ঞানীর কাছে তার কর্ম, কর্মফল, তার সাধন সব কিছু বেরিয়েছে সেই পরম পুরুষ থেকে। আত্মজয়ীরা নতুন কোন কর্ম

করেন না, নিজে থেকে যে কর্মটা এসে যাচ্ছে সেটা করে দিচ্ছেন কিন্তু তাতে তাঁর কোন কর্মফল উৎপন্ন হচ্ছে না। কোন কিছুতেই তাঁরা জড়াবেন না, *তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, পা এগিয়ে কিছু করতে যাবেন না। কিন্তু অজ্ঞানী পা এগিয়ে গিয়ে করে, তাই তাদের সাধনটাও দরকার। আত্মজ্ঞানীর কর্ম আছে, কর্মের ফলও আছে কিন্তু এই কর্মফল তাঁকে বাঁধতে পারবে না। অন্য দিকে যে অজ্ঞানী তার কর্ম আছে, কর্মফলও আছে আর তার সঙ্গে সাধন আছে। এই হল পার্থক্য। আত্মজ্ঞানীর কর্ম, অজ্ঞানীর কর্ম, অজ্ঞানীর সেই কর্মফল আর তার সাধন সবটাই ভগবান থেকে আসছে। এই ভাবটাই আমরা পাই গীতাতে ব্রহ্মার্পণং মন্ত্রে। যাবতীয় যা কিছু করছি সবটাই ব্রহ্ম, যজ্ঞে অর্পণ যেটা করছি সেটা ব্রহ্ম, যে কর্ম হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, তার যে সাধনভূত অঙ্গ সেটাও ব্রহ্ম। বক্তব্য হল তুমি যেদিকেই দৃষ্টি দাও, যা কিছু করছ, সবটাই ব্রহ্ম। আর যদি এই বোধ না থাকে তবে গীতায় যেটা ভগবান আরও সহজ করে দিয়েছেন, যদি না করতে পার তাহলে এটাকেই ঘুরিয়ে কর – *যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।*

এরা আগে যেটা বললেন সেটা হল জ্ঞান বিশেষ, তুমি সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করতে পারছো না ঠিক আছে তাহলে তুমি আমার নামে সব কিছু অর্পণ করে দাও। এইখানেই জ্ঞানী আর ভক্তের তফাৎ। জ্ঞানী দেখছে সব কিছু এক, সেই আত্মাই আছেন, যা কিছু দেখছি সবই ব্রহ্মের স্বরূপ। আর ভক্ত দেখে তাঁর ইষ্টই সব হয়েছেন, কিন্তু তার একটু বোধ আছে আমি আর তুমি আলাদা। তাই তখন বলে দেওয়া হল যা কিছু করছ সব আমাকে অর্পণ কর। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখবেন স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক সেই পঞ্চাগ্নি, সেটাও সেখান থেকেই এসেছে। আর যিনি ভক্ত তিনি বলবেন আমি সন্তানোৎপত্তির জন্য এই কর্ম করছি, প্রভু এই সন্তান তোমাকেই অর্পণ করলাম। এইভাবে প্রত্যেকটি কার্য যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এর পরের মন্ত্রে বলছেন যা কিছু আছে পাহাড়, নদী, বনস্পতি সবই সেই ঈশ্বরের থেকে আসছে –

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা।।২/১/৯।।

(এই পুরুষ থেকেই সমস্ত সমুদ্র ও সকল পর্বত উৎপন্ন হয়; নদীসমূহ তাঁর থেকেই প্রবাহিত হয়, তাঁর থেকে সমস্ত ওষধি সম্ভূত হয়, তাঁর থেকেই মধুরসাদি উদ্ভূত হয়, যার বলে সূক্ষ্ম শরীর স্থূল পঞ্চভূতাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে।)

এই পুরুষ থেকেই সপ্ত সমুদ্র বেরিয়েছে। আগেকার দিনে একটা ধারণা ছিল যে আমাদের ভারতের চারিদিকে সাত রকম সমুদ্র ঘিরে রেখেছে। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, ক্ষীর এবং জল এই সাতটি সমুদ্র। এই সপ্ত সমুদ্র, আর যত ধরণের পাহাড় সব এই পুরুষ থেকেই বেরিয়েছে। যত নদী আছে গঙ্গা থেকে শুরু করে সব নদী ঈশ্বর থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে। আসলে উপনিষদ বলতে চাইছে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। এখন এনাদের যে ধরণের জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল, মহাকাশের জ্ঞান ছিল, পদার্থের জ্ঞান ছিল, ভূগোলের জ্ঞান ছিল, ইতিহাসের জ্ঞান ছিল, সব জ্ঞানকে গুছিয়ে এনে বলছেন সবটাই ব্রহ্ম। এখন যদি কেউ প্রমাণ করে দিয়ে থাকেন যে তাঁদের মহাকাশের এই তথ্যটা ভুল বা ভূগোলের এই বর্ণনাটা ভুল, সেই তথ্য ভুল থাকতে পারে কিন্তু মূল তত্ত্ব, সব কিছু পুরুষ থেকেই বেরিয়েছে, এটা কখনই পাল্টাবে না।

অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো, যত রকমের গাছপালা হতে পারে, ছোট গাছ, বড় গাছ, লতা গাছ সব ঈশ্বর থেকেই বেরিয়েছে। *রসশ্চ*, যত রকমের রস হতে পারে সব তাঁর থেকে আসছে। রস ছয় রকমের হয়, বলা হয় ষট্‌রস – তিক্ত, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, মানে ঝাল, মধু আর কষায়। এই ষট্‌রসের মাধ্যমে পঞ্চ স্থূলভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে। আমাদের সবার এই স্থূল শরীর টিকে থাকে এই ষট্‌রস দিয়ে। আমরা যে রকম খাবারই খাই না কেন সমস্ত খাবার এই ছটি রসের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে। স্থূল শরীরের ভেতরে

রয়েছে সূক্ষ্ম শরীর, অন্তরাত্মা। এই সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর আর আত্মার মাঝখানে আত্মার মত বিদ্যমান, সেইজন্য সূক্ষ্ম শরীরকে বলছেন অন্তরাত্মা। শরীরকেই বলছেন লিঙ্গ শরীর। স্থূল শরীরের ভেতরে রয়েছেন সূক্ষ্ম শরীর আর ঐ সূক্ষ্ম শরীরের ভেতরে রয়েছেন আত্মা। স্থূল শরীরের পেছনে থাকে বলে এই সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থান আত্মার মতই। আত্মা যেমন সব কিছুকে চালিত করছেন ঠিক তেমনি এই স্থূল শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর চালাচ্ছে, সেইজন্য সূক্ষ্ম শরীরকেও আত্মা বলে। এখানে মজার ব্যাপার হল, খ্রীশ্চান, ইসলাম ও জুহুদিরা আমারা যেটাকে সূক্ষ্ম শরীর বলছি এটাকেই তারা আত্মা বলে গ্রহণ করে। আচার্যও এখানে বলছেন স্থূল শরীর আর আত্মার মাঝখানে আছে বলে একে আত্মা বলেই গ্রহণ করা হয়, সেইজন্য একে বলা হচ্ছে অন্তরাত্মা। ইংরাজীতে আমরা সোল শব্দটা শুনে থাকব, স্বামীজী বলছেন Each soul is potentially divine। ইংরাজীতে যখন সোল বলা হয় আর পার্সিতে যাকে রুক্ বলা হচ্ছে এই দুটোই কিন্তু হিন্দুদের সূক্ষ্ম শরীরকে বলা হয়। স্বামীজীর কাছে সমস্যা হল, বিদেশীরা আত্মা শব্দ ও তার ভাবটাকে বুঝতে পারবে না, সেইজন্য তিনি প্রায়ই soul শব্দটা ব্যবহার করছেন। কিন্তু খ্রীশ্চানরা যাকে soul বলছে আর আমাদের সাধারণ মানুষ যখন প্রায়ই আত্মা শব্দটা ব্যবহার করে তখন তারা এই সূক্ষ্ম শরীরকে মনে করেই বলছে। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে যিনি রয়েছেন তিনিই হলেন প্রকৃত আত্মা। সূক্ষ্ম শরীরের উপরেও শুদ্ধ আত্মা বলে যে কিছু আছে খ্রীশ্চান, ইসলাম, পার্সিদের ধারণার মধ্যেই নেই। এদের ধর্মে সূক্ষ্ম শরীরকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। আত্মা বলতে সব সময় বোঝাবে ব্রহ্ম। আত্মা মানে ব্রহ্ম এই কথা বেদান্ত ছাড়া আর কোথাও কেউ বলবে না। এমনকি বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতেও নেই। বেদান্তের বাইরে যত ধর্ম আছে, যত মত আছে তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম শরীরকেই আত্মা বলে গ্রহণ করে। তাই এর নামই হল অন্তরাত্মা।

এই মন্ত্রের ভাষ্যের শেষে আচার্য বলছেন, এর থেকেই বোঝা গেল জগতে যা কিছু আছে শুধু বিকার মাত্র, কতক গুলি শব্দ মাত্র। এই দেখো উপনিষদে তোমাকে দেখান হল ভগবান ছাড়া কিছু নেই। তুমি যা কিছু দেখছ এগুলো সব বিকার, আর বিকার হল শব্দ মাত্র, নাম ও রূপের খেলা। ভগবান নিজেই শুধু আছেন তাঁর বাইরে কিছু নেই। এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা হল তার সব কিছুকে দশ নম্বর মন্ত্রে এসে এক করে দিচ্ছেন –

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতেদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্
সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।।২/১/১০।।
।।ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।।

(হে সোম্য! উক্ত পুরুষই কর্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক এই জগৎ। এই পরম অমৃত, সর্বস্বরূপ ব্রহ্মে যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়গুহাতে অবস্থিতরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যাগ্রন্থি নাশ করেন।)

মুণ্ডকোপনিষদের মূল প্রশ্ন ছিল, শৌনক অঙ্গিরা ঋষির কাছে প্রশ্ন করেছিল কোনটা জানলে সবটাই জানা যায়। এতক্ষণ ব্যাখ্যা করার পর এবার তার সারাংশ দিচ্ছেন। তোমাকে আমি পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যার কথা বলেছিলাম। পরার বিদ্যার উদ্দেশ্য বলেছিলাম *যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে*। সেই অক্ষর পুরুষ কি রকম? *দিব্যো হ্যমূর্ত্যঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ*। তারপর এটাকেই ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন তুমি যাবতীয় যা কিছু দেখছ, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মানুষ, দেবতা, পশু, পাখি সব সেই অক্ষর পুরুষ থেকে বেরোচ্ছে। দশ নম্বর মন্ত্রে বলছেন, এই সমস্ত জগৎ আর এই জগতে যত রকমের কর্ম হতে পারে, তা তুমি যজ্ঞাদি কর্ম বল, চুরি-ডাকাতির কর্ম বল, গৃহস্থের কর্ম বল, নারী-পুরুষের ভালোবাসাই বল আর মায়ের সন্তানের প্রতি ভালোবাসাই বল যত রকমের কর্ম সব এই পুরুষ থেকে বেরিয়েছে। *তপঃ*, যত রকমের তপস্যা হতে পারে সবই তাঁর কাছ থেকেই বেরিয়েছে। তাহলে কোনটা জানলে সব কিছুকে জানা যাবে? পরমাত্মাকে জানলে সবটাই জানা হয়ে যাবে। কেন? তিনিই তো সব কিছু হয়েছেন। সোনাকে জানলে যেমন সোনার সব গয়নাকে

জানা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভগবানকে জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায়। কারণ তিনিই সব কিছু হয়েছেন। এটাকেই এতক্ষণ ধরে বোঝান হয়েছে।

তাহলে এই সংসারটা কি? আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং তপঃ জ্ঞানং তৎকৃতং ফলমুনা*, অর্থাৎ এই সংসার হল অগ্নিহোত্রাদিরূপ কর্ম, *তপঃ*, এখানে তপ বলতে বোঝাচ্ছে জ্ঞান আর তার ফল, এই সব কিছুকে বলছেন বিশ্ব। এখানে তিনটে জিনিষ হচ্ছে, সংসার, কর্ম আর তপস্যা। সাধারণ অর্থ দিয়ে বলা হল – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু আছে, যত রকমের কর্ম আছে আর তপস্যা আছে। কিন্তু এটাকেই আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলছেন যত রকমের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম আছে অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যা ও জ্ঞান। আগেও বলা হয়েছিল *তপঃ* মানে জ্ঞান, যেখানে বলা হয়েছিল *যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ*। *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, জ্ঞান থেকেই তাঁর বৃদ্ধি হচ্ছে, চেষ্টা করে নিজেকে বিস্তার করতে হচ্ছে না। আর জ্ঞানের যে ফল বা কর্মের যে ফল সেটাই হল এই জগৎ। যত লোকাদি আছে এগুলো সবই জ্ঞান ও কর্মের ফল, এই সব কিছু মিলিয়ে এই বিশ্ব আর তার সবটাই ঈশ্বর। সব কিছুই অমৃত ব্রহ্ম, *পরমামৃতম্*। নির্বিশেষ ব্রহ্মই আছেন, তাছাড়া আর কিছু নেই।

ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই এই জ্ঞান যখন হয়ে যায়, *এতদ্যো বেদ*, এটাকে যে বুঝে নিয়েছে তার অবিদ্যা গ্রন্থি খুলে যায়। কিভাবে খুলে যায়? সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সেই ব্রহ্মই অবস্থিত, *নিহিতং গুহায়াম্*। যেমন জল, জলের হৃদয়ে কে আছেন? তিনিই আছেন। এই গ্লাশের হৃদয়ে কে আছেন? সেই ব্রহ্মই আছেন। গ্লাশের হৃদয়টা কি? Steelness। Steelness এর হৃদয় কি? পদার্থ। পদার্থের হৃদয় কি? শক্তি। শক্তির হৃদয় কি? ভগবান। ঠিক তেমনি আমার আপনার হৃদয় কি? ভগবান। এইটাকে, অর্থাৎ সব কিছুর হৃদয়ে ভগবানই আছেন যে জেনে যায় তখন সে কি করে? *সোহবিদ্যাগ্রন্থিং*, অবিদ্যা গ্রন্থি, অজ্ঞান রাশিকে *বিকিরতীহ*, এইখানেই কেটে ফেলে দেয়। বিকিরতীহ = বিকিরতি + ইহ, এই 'ইহ' শব্দটা হল বেদান্তের প্রাণ। বেদান্ত আর যে কোন ধর্মের তফাৎ হয়ে যায় এই 'ইহ' শব্দে। 'ইহ', মানে যা কিছু হবার এইখানেই হতে হবে, মৃত্যুর পরে মুক্তি হবে কি হবে না কে দেখতে যাবে, মৃত্যুর পর কোন ঈশ্বর দর্শন হয় কি হয় না কে জানতে যাবে! যা হবার, অবিদ্যাগ্রন্তি, অজ্ঞানগ্রন্থির নাশ, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন, যাই বলা হোক না কেন সেটা 'ইহ' মানে এখানেই আমার জীবদ্দশাতেই হতে হবে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলছেন *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*। কাশীতে মরলে মুক্তি হয়, খুবই ভালো কথা, কিন্তু উপনিষদের মতে কখনই হবে না। যা হবার এইখানেই হবে। বলে মৃত্যুর সময় ঠাকুর আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন। কোথায় নিয়ে যাবেন? স্বর্গে নিয়ে যাবেন। স্বর্গে যাওয়াটাই যদি তোমার কাছে মুক্তি বলে মনে হয় তাহলে তাই হবে। কিন্তু বেদান্ত মতে তোমাকে আবার স্বর্গ থেকে নামতে হবে। উপনিষদের এই মন্ত্রগুলোই, বেদান্তের প্রাণ, বেদান্তের মূল শক্তি। বেদান্তের মুক্তি এই লোকেই হবে, যদি না হয় তাহলে আবার তোমাকে ঘুরে আসতে হবে। মুক্তির জন্য তোমাকে এই পৃথিবীলোকেই আসতে হবে। এই লোকে যদি মুক্তি না হয় তোমাকে বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসতে হবে। 'ইহ' ছাড়া মুক্তি হবে না। মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে আমাকে রামকৃষ্ণলোকে নিয়ে যাবেন, শ্রীকৃষ্ণ এসে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবেন, উপনিষদ এই ধরণের কথা সব কথা মানবে, বলবে কোন ভুল নেই তোমার কথায় কিন্তু আমার কাছে এর কোন গুরুত্ব নেই, কোন দাম নেই। উপনিষদ হল ভগবানের কথা, আর এর সবই জ্ঞানরাশি, শব্দরাশি নয়। এই জ্ঞানরাশি পরিষ্কার স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে মুক্তি এইখানেই হতে হবে। এই শরীরে যদি না হয় তবে তুমি গেছ। অনেক দিন ঘুরপাক খেয়ে আবার এসে আবার চেষ্টা করতে থাক।

সেইজন্য বলছেন মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, মানব জীবন এক বিরাট সম্ভাবনাময়, মস্ত বড় সুযোগ। একে বৃথা নষ্ট হয়ে যেতে দিওন না। মুক্তি একমাত্র এই মানবদেহেই সম্ভব, এখান ছাড়া আর কোথাও মুক্তি সম্ভব হবে না। এতক্ষণ ধরে যেটা বলে গেলেন, সেই ব্রহ্ম তিনিই সব কিছু হয়েছেন, এত কিছু বলার পরেই বলছেন তাঁর যে জ্ঞান সেটা এইখানেই লাভ করতে হবে। আর তোমার যে অবিদ্যাগ্রন্থির জন্য নানান ভেদ দেখছ সেই অবিদ্যাগ্রন্থির নাশ এইখানেই হবে, *বিকিরতীহ*, এই 'ইহ' শব্দটা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

এই অবিদ্যাগ্রন্থিটা আসলে কি? অবিদ্যাগ্রন্থি তো অনেক উচ্চ কথা। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যাটা কি। মানুষের কাছে সব থেকে বড় সমস্যা হল আমার যে আমি বোধ, এই বোধটা একদিন হারিয়ে যাবে। স্থূল ভাবে দেখলে এটাই মৃত্যু ভয়। যারা একেবারে পশুস্তরে জীবন-যাপন করছে তারা মৃত্যু ভয়ে সব সময় আতঙ্কিত। পশুস্তরকে অতিক্রম করে যারা বুদ্ধির স্তরে পৌঁছে যায় তাদের কাছে আমি বোধটা পাল্টাতে থাকে। গীতাতে ভগবান বলছেন *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদাতিরিচ্যতে*, যাঁরা সমাজে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠাবান তাঁদের কাছে কোন কলঙ্ক হয়ে যাওয়া বা সম্মান হানি হওয়ার থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াটা বেশী শ্রেয়। তাই বলে কি তিনি জীবনকে ভালোবাসছেন না? নিশ্চয়ই ভালোবাসছেন, জীবনকে ভালোবাসছেন বলেই মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছেন। কারণ কলঙ্ক নিয়ে তিনি বাঁচতে চাইছেন না। মানুষের কাছে মৃত্যু ভয়টাই মারাত্মক। কারণ তার কাছে কলঙ্ক, অসম্মানটাই মৃত্যুর সমান। এক সময় হিন্দু স্ত্রীরা বিধবা হয়ে গেলে বলত স্বামী যদি না থাকে মরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত।

সম্প্রতি একটা খবরে জানা গেল কাশ্মীরে কিছু দিন আগে একটা মেয়ে তিন বার বিয়ে করেছে। আর প্রত্যেক বারেই মেয়েটি কিভাবে কিভাবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে স্বামীটাকে মারিয়ে দেয় আর তার জন্য সরকার থেকে ক্ষতিপূরণও পায়। মেয়েটি দুদিকেই তাল দিয়ে যাচ্ছিল। সব সময় আবার বিয়ে করত পুলিশের লোককে। পুলিশের লোক বলে সন্ত্রাসবাদীদের তাঁতিয়ে দিয়ে নিজের স্বামীকে মারিয়ে দিত। আবার সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পুলিশ মারা গেছে বলে সরকার থেকে দশ থেকে পনের লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ পেত, যেটা সে নিজেই রেখে দিত। তৃতীয় স্বামীটা মারা যেতে পুলিশের একটু সন্দেহ হল। খোঁজখবর করতে করতে যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই। এই ধরণের মেয়েও জগতে আছে। আবার তখনকার দিনে স্বামী না থাকলে বিধবারা মনে করত আমার মরে যাওয়াই ভাল। মানুষ নিজের আমিত্বটাকে এমন জায়গায় দিয়ে রেখেছে খুব যদি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখি তাহলে দেখা যাবে মৃত্যু ভয়টা হল সব থেকে ভয়ঙ্কর।

কিন্তু উপনিষদ বলছে পিঁপড়ে থেকে শুরু করে কুকুর, বেড়াল, মানুষ যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। তাহলে অবিদ্যার প্রথম রূপ যেটা দেখছি সেটা হল জীবন ও জীবনের মৃত্যু হবে, অর্থাৎ মৃত্যু ভয়। ভয়ের দ্বিতীয় ধাপ আবার আমাকে জন্ম নিতে হবে। প্রথম ভয়টা স্বাভাবিক ভাবে সবার মধ্যেই থাকবে। কিন্তু আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে এই ভয় সবার মধ্যে আসেনা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে একজন বলছে – আমার আবার জন্ম নিতে ভয় নেই। ঠাকুর বলছেন – তুমি বলো না যে তোমার এখনো ভোগ করার বাসনা আছে। যারা আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে, এই ভেবে বাবাগো মাগো বলে আতঙ্কে আঁতকে উঠছে না, তাদের জন্য শাস্ত্র নয়।

অবিদ্যাগ্রন্থি এই দুটো রূপে আসে – প্রথমে এই জীবনের প্রতি মোহ বা আমি মরতে চাইনা রূপে। আর দ্বিতীয়টা পরজন্মের প্রতি মোহ রূপে। আমি বলতে পারি খাওয়া-পড়ার লোভ, টাকা-পয়সার লোভ, নারীসুখের লোভ এগুলোই তো অবিদ্যা। হ্যাঁ এগুলোও অবিদ্যা, কিন্তু সমস্ত লোভ, কামনা-বাসনাকে ছাঁকনিতে ছাঁকতে ছাঁকতে একেবারে শেষে যেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটাই হল অবিদ্যা – নিজের জীবনের প্রতি মোহ। যোগশাস্ত্রে বলছে *অবিদ্যাহস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ*। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ এই পাঁচটি হচ্ছে ক্লেশজনক বিঘ্ন। অবিদ্যা দিয়ে শুরু হয় আর অভিনিবেশে গিয়ে শেষ হয়। নিজের স্বরূপকে না জানাটাই অবিদ্যা আর জীবনের প্রতি মোহই হল অভিনিবেশ। যাদেরই এই জীবনের প্রতি মোহ আছে তারা সবাই অবিদ্যার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। এই জীবনের পরে যে জীবন আসবে সেই জীবনের প্রতিও যদি মোহ থাকে তাহলে সে কিন্তু আরও বড় বিপদে পড়ে গেছে। প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনে মিলে যখন আত্মহত্যা করে তখন তারা এটাই ভাবে পরের জন্মে আমরা এক সঙ্গে থাকব। কিন্তু দুজনে যে মৃত্যুর পর কোথাও কোন আলাদা গাছে প্রেত আর প্রেতনী হয়ে থাকবে সেটা তো বুঝতে পারছে না। উপনিষদের মূল হল আমাদের সবার এই অবিদ্যাগ্রন্থিকে নাশ করা। তোমার চেতনাকে এই অবিদ্যা এমন ভাবে বেঁধে রেখেছে যে, জীবনের প্রতি আকর্ষণটাকে তুমি ছাড়তে পারছ না। যিনি নিত্য, শুদ্ধ, অনন্ত তাঁর উপর এই অবিদ্যা বা মায়ার একটা আবরণ পড়ে যায় আর তার ফলে সেই অনন্ত নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে আর এই জীবনের প্রতি তার পুরো

আসক্তি চলে আসে। উপনিষদ এই অবিদ্যার আবরণকে সরাবার চেষ্টা করছে। এরপরের অধ্যায়গুলোতে পুরোপুরি সাধনার দিকে নিয়ে যাবে আর সিদ্ধির ব্যাপারটা বলবেন।

এখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মে, তাঁর কি স্বরূপ আর তাঁকে কিভাবে পাওয়া যাবে। এর আগে বলা হয়েছিল যিনি ব্রহ্ম তিনি নির্বিশেষ। এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখনই ব্রহ্ম শব্দ বলা হয় তখন তাঁর সাথে নির্গুণ ও নিরাকার শব্দ দুটো ঠিক উপযুক্ত বিশেষণ নয়। ব্রহ্মের সাথে শাস্ত্রে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় সেটা হল নির্বিশেষ এবং এটিই ব্রহ্মের সঠিক সংজ্ঞাত্মক বিশেষণ। আমরা এখানে যে কজন বসে আছি সবারই নিজস্ব কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, যে বিশেষত্ব দিয়ে আমি নিজেকে অন্য সব কিছু থেকে আলাদা ভাবছি। প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জীবের কিছু না কিছু বিশেষ থাকে, কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে যেটা দিয়ে তাকে জানা যায়। চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সময় বাবা ছেলেকে বলে দিল নীল গাই দেখে আসিস। ছেলে জানেনা নীল গাই কি রকম দেখতে। বাবা বলে দিলেন অনেকটা গরুর মত দেখতে, লেজ আছে, শিঙও আছে কিন্তু যখন দৌড়াবে তখন হরিণের মত দৌড়াবে। কারুর সাথে কোন মিল নেই কিন্তু এর সাথে কিছু মিল আছে আবার অন্য কিছুর সাথে অন্য মিল আছে। ছেলে এবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখছে একটা জন্তু অনেকটা গরুর মত দেখতে। এইবার একটা বিশেষ এসে গেল, কিন্তু গরুর সাথে আবার অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মের কথা যখন বলা হয় তখন তাঁকে নির্বিশেষ বলা হয়। ব্রহ্মের এমন কোন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না যেটা দিয়ে জগতের কোন কিছুকে দিয়ে তাঁকে ইঙ্গিত করা যাবে।

কিন্তু যে জিনিষটা নির্বিশেষ তাঁকে জানব কি করে? যাঁর কোন বিশেষণ নেই, কোন কিছু সাধারণ চিহ্ন নেই তাঁকে জানব কি করে? তখন বলছেন, না, তাঁকে জানা যায়। কিভাবে জানা যায়?

দ্বিতীয় খণ্ড

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমৈত্রৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণনিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্।।২/২/১।।

(প্রকাশমান, সকল প্রাণীর হৃদয়গুহায় বিচরণশীল যে ব্রহ্ম তিনি সম্যকরূপে নিকটে রয়েছেন, তাঁতে সমস্ত জগৎ প্রবিষ্ট হয়ে আছে, তিনি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সকলের গন্তব্যস্থল। কারণ সচল পক্ষী, প্রাণাপানাদিযুক্ত পশু ও মনুষ্যাদি, নিমেষবান ও নিমেষরহিত – এই সমস্তই সেই পুরুষে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। তিনিই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান, তিনি সকলের প্রার্থনীয়, তিনি শ্রেষ্ঠতম, তিনি প্রাণীদের লৌকিক জ্ঞানের অগোচর। সেই ব্রহ্মকে জান।)

এই যে ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে, যদিও তিনি নির্বিশেষ, জগতের কোন কিছু দিয়ে তাঁকে ইঙ্গিত করা যাবে না, কিন্তু তিনিই *বরেণ্যং*, তিনিই একমাত্র বরণ যোগ্য। একমাত্র তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনীয়, উপাসনা যদি কারুর করতে হয় সর্বদা এঁরই উপাসনা করবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য কি? ভূমণ্ডলে মানুষ থেকে শুরু করে কীট পতঙ্গ পর্যন্ত যাবতীয় যত প্রাণী আছে সব প্রাণীর ভেতরে তিনি *আবিঃ*। আবিঃ মানে প্রকাশমান। প্রকাশমান মানে আলো, আলো যেমন সব কিছুকে প্রকাশিত করে। সামনে যত মানুষ দেখছি তাদের ভেতর থেকে কি কোন আলো বেরোতে দেখি? না, তা কখন দেখা যায় না। অস্তি, ভাতি ও প্রিয়, সব জীবের ভেতরে এই যে তিনটে রূপ আছে, এই তিনটেকে মিলিয়েই বলছেন *আবিঃ*। অস্তি মানে জিনিষটা আছে, ভাতি মানে জিনিষটা যে আছে আমার বোধ হচ্ছে আর প্রিয় সেই জিনিষটার প্রতি ভালোবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ, সেটাই যখন জীবের ক্ষেত্রে নেমে আসে তখন ঘুরিয়ে বলা হয় অস্তি, ভাতি ও প্রিয়।

আবিঃ সন্নিহিতং, *আবিঃ* মানে বলা হল সব জীবের ভেতরে তিনি অস্তি, ভাতি ও প্রিয় রূপে প্রকাশিত আর *সন্নিহিতং* মানে জীবের সব থেকে কাছে। যত ইন্দ্রিয় আছে আর ইন্দ্রিয়ের যত রকমের কর্ম সব যেন তাঁর

উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমি কথা বলছি, কথা আসলে বলছে আমার বাগেন্দ্রিয়, কিন্তু আমরা বলি অমুক ব্যক্তি কথা বলছেন। তাহলে সেই ব্যক্তিটি আসলে কে, তিনি কি সেই বাগেন্দ্রিয়? না, তাঁর শুদ্ধ রূপটি হল তিনি সেই আত্মা বা ব্রহ্ম। কিন্তু তাকে যখন উপলক্ষিত করা হয় তখন একটা উপাধি দিয়েই উপলক্ষিত করা হয়। কি উপাধি দিয়ে উপলক্ষিত করা হয়? *বাগাদ্যুপাধিভিঃ*, বাক্ আদি উপাধি দিয়ে, তিনি কথা বলছেন, তাঁকে এই রকম চেহারাতে দেখাচ্ছে ইত্যাদি দিয়ে। তাই বলছেন তিনি খুব কাছে, অর্থাৎ খুব সহজেই তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া যায়। কি ভাবে? ইন্দ্রিয়াদির উপাধি দিয়ে। আমি যে তাঁর আত্মতত্ত্ব জেনে গেছি তা নয়। তাঁর আত্মতত্ত্বের সাথে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো এমন ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে মনে হয় যেন এক হয় গেছে। ফলে তাঁকে জানা যেন খুব সহজ। একদিকে তিনি *আবিঃ*, প্রকাশস্বরূপ। অন্য দিকে তিনি *সন্নিহিতং*, যেন খুব কাছে। অন্য এক জায়গায় একটা স্তুতিতে বলা হচ্ছে তিনি যেন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জগৎকে ভোগ করেন। যখন আমরা বলছি, আমি কথা বলছি তুমি শুনছ তখন এগুলো কোন ভুল কিছু নয়, শ্রুতিতে অন্যান্য জায়গাতেও এর উল্লেখ আছে। আচার্য বলছেন *দর্শনশ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানাদ্যুপাধি*, মানুষের দর্শন, শ্রবণ, মনন বিজ্ঞান এই নানা রকমের উপাধি দিয়ে তাঁর প্রতীতি হয়।

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় দুটো একই বস্তু দিয়ে নির্মিত। তার মানে এই বোতল যেটা চোখ দিয়ে দেখছি, এই বোতল যা দিয়ে তৈরী আমার চোখও সেই একই জিনিষ দিয়ে তৈরী। বোতলটা যদি জড় হয় তাহলে আমার চোখটাও জড়। কিন্তু এই বোতলটাকে প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে না কিন্তু আমার চোখ দুটোকে প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে, কারণ এই চোখ ইন্দ্রিয়ের পেছনে আত্মতত্ত্ব আছে। আত্মতত্ত্ব আছে বলে সব কটি ইন্দ্রিয় সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে। ঠাকুর সেইজন্য খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, উনুনে হাঁড়ি চাপান আছে। হাঁড়িতে জলের মধ্যে আলু, পটলগুলো লাফাচ্ছে। বাচ্চা ছেলে বলছে আলু পটল গুলো লাফাচ্চে। মা বলছে নীচে আগুন আছে বলে ওগুলো লাফাচ্ছে। আগুন সরিয়ে দিলে সব লাফালাফি বন্ধ হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের পেছনে আত্মতত্ত্ব আছে বলেই ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল। চঞ্চল মানে প্রকাশমান। মানুষ যখন মরে যায় তখন শরীরের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারে না। তাই বলছেন যত ইন্দ্রিয় আছে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় আত্মতত্ত্ব এত সন্নিকটে।

আত্মতত্ত্ব থাকার জন্য ইন্দ্রিয়গুলো যেমন প্রকাশধর্ম পেয়ে গেল, ঠিক তেমনি মনে হয় ইন্দ্রিয়ের ধর্ম গুলোকে আত্মতত্ত্ব যেন নিজের উপর চাপিয়ে নিয়েছে। উভয় উভয়ের সঙ্গে যেন একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরী করে নেয়। এনারা প্রায়ই একটা উপমা দেন – একটা পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখা আছে আর তাতে যদি একটা গরম লোহার বল ফেলে দেওয়া হয় জলটা গরম হয়ে যাবে আর লোহার বলটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যখনই আত্মা ইন্দ্রিয়ের কাছাকাছি আসে ইন্দ্রিয়গুলো চন্‌মন্ করে ওঠে আর তখন মনে হয় ইন্দ্রিয়গুলোই আত্মা। আর আত্মা অন্য দিকে ইন্দ্রিয়ের কিছু ধর্মকে নিজের করে নেয়, বিশেষ করে ইন্দ্রিয়ের জড়ত্বকে গ্রহণ করে নেয়। জড়ত্ব গ্রহণ করার ফলে আত্মা মনে করতে শুরু করে আমি সুখী, আমি দুখী, আমি মোটা, আমি রোগা, আমি অমুক, আমি তমুক। সৎ, চিৎ ও আনন্দের চিতিকে এখন আত্মা কোথায় গিয়ে প্রয়োগ করছে? ইন্দ্রিয়ের অতি সাধারণ সাধারণ আবেগে গিয়ে লাগাচ্ছে। নিজের চেতনার সাথে ইন্দ্রিয়ের ধর্মকে এক করে নেয়। এটাই *আবিঃ সন্নিহিতং* এর ব্যাখ্যা। সব জীবের মধ্যে তিনি অস্তি, ভাতি ও প্রিয় রূপে প্রকাশস্বরূপ আর *সন্নিহিতং* তিনি ইন্দ্রিয়াদির সব থেকে কাছে।

আত্মা যখন দেহের ধর্মকে নিজের করে নেয় তখন তাকে বলা হয় জীব। আত্মা যে দেহের ধর্মগুলো নিচ্ছে এতে যে তাঁর বাস্তবিক কোন ধর্ম পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়, এটা হল ওপর থেকে যেন চাপিয়ে দেওয়া হল। যখন খুশী সে এটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। হাঁস জলের উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে, কখন ডুব দিচ্ছে কখন ভাসছে, কিন্তু যখন জল থেকে ডাঙায় উঠে এল তখন একবার পাখার ঝাপ্টা দিতেই সব জল বেরিয়ে গেল। আত্মা যখনই মনে করবে তখনই সব ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবে। এই কারণেই বলা হয় জীব বলে কোন কিছু হয় না। সত্যিই যদি জীব হত তাহলে তাকে সংগ্রাম করে করে পেরোতে হত। খ্রীশ্চান, ইসলাম বা যে কোন দ্বৈতবাদী ধর্মে আমরা সত্যিকারের জীব। আর ধর্ম ও অধর্ম আমাদের ভেতরে আছে। অধর্মকে কাটিয়

কাটিয়ে জঙ্গল পরিষ্কারের মত খাটতে খাটতে ধর্মকে বড় করতে হবে। বেদান্ত মতে এইভাবে হবে না। বেদান্ত বলছে তোমার মধ্যে যে শুদ্ধ স্বরূপ আছে সেটাই শ্রেষ্ঠ আর খারাপ জিনিষটাকে বলছে, তুমি এগুলো গায়ের জোরে হাত বাড়িয়ে শুধু ধরে রেখেছ। তোমাকে বলা হচ্ছে তুমি ওটা ছেড়ে দাও, ওটা তোমার স্বরূপ নয় ছেড়ে দিলেই চলে যাবে। সেইজন্য জীব যেটা বলা হচ্ছে এটা আত্মার বাস্তবিক ধর্ম নয়, এটা সে নিজের উপর চাপিয়ে নিয়েছে।

আচার্যের ভাষ্য নিয়ে উপনিষদ পড়লে বোঝা যায় ধর্ম জিনিষটা ঠিক ঠিক কি। আর উপনিষদই হিন্দুদের ঠিক ঠিক শাস্ত্র। তবে সমস্যা হল, যেমন ঠাকুর বলছেন রূপ-টুপ সব উড়ে যাচ্ছে, উপনিষদ পড়ার পর এটাই হয়। স্বামীজীও বার বার বলছেন আমাদের উপনিষদে ফিরে যেতে হবে। উপনিষদ পড়ার পর বুঝতে পারছে খারাপ যেটাই বলা হচ্ছে, দুর্বলতা যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা আমাদের স্বভাব নয়। বাচ্চা বয়স থেকে আমাদের শেখান হয় খারাপ কাজ করবে না, পাপ করতে যাবে না তাহলে পাপের দিকে আরও মন যাবে। তার মানে আমাদের মধ্যে পাপ ও পূণ্য বোধ দুটোই আছে। বেদান্ত এসব কথা মানবেই না, বেদান্ত বলবে তোমার স্বভাব হল নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। তুমি তো শুদ্ধ, একেবারে পবিত্র। তোমার মধ্যে কোন নোংরা, অপবিত্রতা বলে কিছু নেই, যেটা আছে বলছ সেটাতো তুমি ধরে রেখেছ। রাজার ছেলেকে চারজন দাসী দেখাশোনা করছে। কোন একটা সময় দাসীদের চোখের আড়ালে রাজার ছেলে নোংরার মধ্যে হাত দিয়েছে। রাজার ছেলের এটা স্বভাব নয়, এখন হাতটা ধুয়ে ফেললেই হল। তোমার ভেতরে নোংরা যেটা আছে সেটা বাইরে থেকে এসেছে, আর এই নোংরা গুলো চিরন্তন নয়, ঝেড়ে ফেলে দিলেই চলে যাবে।

যিনি *আবিঃ সন্নিহিতং* তিনি আবার *গুহাচরং*। তাঁর আরেকটা নাম হয় *গুহাচরং*, তিনি হৃদয়ে অবস্থিত বলে তাঁকে *গুহাচরং* বলছেন। উপনিষদে যখনই হৃদয় শব্দটা ব্যবহার করেন তখন তাঁরা বুদ্ধিকে বোঝান। বুদ্ধির আরেকটা নাম হৃদয়। যে অর্থে আমরা হৃদয় মনে করি, বেদান্তে সেই অর্থে হৃদয়ের কোন স্থান নেই। যা আছে বুদ্ধিই আছে। শাস্ত্রে যখনই বলবে হৃদয়স্থিত তখনই বুঝতে হবে বুদ্ধিতে স্থিত। গ্রীক দর্শনে যেমন হৃদয় ও বুদ্ধিকে নিয়ে অনেক আলোচনা উঠেছিল, কিন্তু উপনিষদের ঋষিদের কাছে পরিষ্কার, হৃদয় মানে বুদ্ধি। এখানে বলছেন বুদ্ধির ভেতরে তিনি সঞ্চার করেন। যে কোন মানুষ বা জীবের জন্য বুদ্ধিই হল উচ্চতম স্তর। পাঁচটি যে তন্মাত্রা আছে তার সত্ত্ব অংশ দিয়ে বুদ্ধি তৈরী হয়। ফলে ব্রহ্মের সব থেকে ভালো প্রতিবিম্ব হয় বুদ্ধিতে। সেইজন্য বলা হয় বুদ্ধির মধ্যে তিনি বিচরণ করছেন। আমাদের যে কটি ইন্দ্রিয় আছে তার সব কটিই তাদের বিভিন্ন তত্ত্বের সত্ত্ব অংশ দিয়ে তৈরী। কিন্তু বুদ্ধি সব কটি তন্মাত্রার সত্ত্ব অংশ দিয়ে তৈরী। ফলে আত্মতত্ত্বের প্রকাশ সব থেকে ভালো বুদ্ধিতেই দেখা যায়।

উপনিষদ আমাদের ধীরে ধীরে দেখাচ্ছে যিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁকে সরাসরি জানা যাবে না, কিন্তু তাঁর কার্য দিয়ে তাঁকে জানা যেতে পারে। বাতাস দেখা যায় না, কিন্তু কিছু কিছু কার্য দ্বারা আমরা বুঝতে পারি বাতাস বইছে। যিনি ব্রহ্ম তিনি যখন আত্মা রূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন জীবের মধ্যে অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই ভাবগুলো আসে। জীবের ভেতরে আত্মা অবস্থান না করলে তার ইন্দ্রিয়গুলো দীপ্তিমান হয়ে সক্রিয় হবে না। সব কটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবার বুদ্ধিতে তাঁর প্রকাশ বেশী। যাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি বেশী সেখানে ঠিক ঠিক আত্মার প্রকাশ হচ্ছে না, কিন্তু যার যত বেশী বুদ্ধি সেখানে যেন আত্মতত্ত্বের প্রকাশ বেশী। ইন্দ্রিয়ের যে প্রকাশ সেটাও আত্মারই প্রকাশ কিন্তু বুদ্ধিতে তিনি বেশী প্রকাশিত হন।

তিনি সবার থেকে বড়, ব্রহ্মের উপরে আর কিছু নেই তাই তাঁকে বলছেন *মহৎ*। যেদিক থেকেই মাপা হোক না কেন, শরীর, শরীরের থেকে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের থেকে মন বুদ্ধি। মন বুদ্ধির পরে দেবাতাদির দিকে চলে যান, দেবাতাদির থেকে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা পর্যন্ত চলে যান কিন্তু সব কিছুর থেকে ব্রহ্ম হলেন শ্রেষ্ঠ। *মহৎ পদমৈত্রতৎ*, পদ বলতে আমরা দুটো অর্থ করতে পারি। যে কেউই ব্রহ্মকে পেতে পারেন বলে তাঁকে পদ বলা হচ্ছে বা তিনি সব কিছুর আশ্রয়, সেইজন্য তাঁকে পদ বলা হচ্ছে। মহৎ আর পদ শব্দের তাৎপর্য কি দেখলাম,

এরপর এরই ব্যাখ্যা করছেন। রথের চাকায় যেমন শলাকা চাকার মূল কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে বাইরে গোলাকার কাঠের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, ঠিক তেমনি যত প্রাণী আছে, যা কিছু আছে সবার কেন্দ্র ব্রহ্মের সাথে যুক্ত হয়ে আছে, আর এই জগৎটা বাইরে ব্রহ্মের সাথে জুড়ে রয়েছে। কি রকম ভাবে জুড়ে রয়েছে? সব কিছু যেন ব্রহ্মে সমর্পিত হয়ে আছে। সাইকেলের চাকার রীম থেকে স্পোক গুলি বেরিয়ে চাকার কেন্দ্রে জুড়ে আছে, সব স্পোক যেন মূল কেন্দ্রে সমর্পিত হয়ে আছে। এটাকেই বলছেন *সমর্পিতম্*। চাকার কেন্দ্রে আবার লাগান আছে চেন, সেই চেনটা লাগান আছে প্যাডেলে। প্যাডেলকে যখন ঘোরান হচ্ছে তখন ওই প্যাডেলের শক্তি যাচ্ছে চাকার কেন্দ্রে, তখন ওই কেন্দ্র থেকে চাকাটা ঘুরছে। চাকার কেন্দ্রটা ঘুরছে বলে গোটা চাকাটা ঘুরছে। এই উপমাটা নিয়ে দেখান হচ্ছে কেন্দ্রটা ঘুরছে বলে বাকি সব কিছু ঘুরছে। যে কোন মেশিনে মেইন ফ্লাই হুইলট ঘুরছে বলে মেশিনের বাকি যত অংশ আছে সব ঘুরতে থাকে, মেইন ফ্লাই হুইলের সাথে সব জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারা কার জুড়ে আছে? *এজৎ*, মানে যত পশু পাখি যারা চলতে পারে, *প্রাণ*, যারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, *নিমিষৎ*, চোখ বন্ধ করে, তারপরেই বলছেন *চ*, *নিমিষচ্চ*, তার মানে হল নিমিষাদি ক্রিয়া করে না। যত রকমের প্রাণী আছে, চলছে আবার চলছে না, পড়ে আছে, শুয়ে আছে যাই হোক না কেন, প্রাণী মাত্র সবাই জুড়ে রয়েছে ব্রহ্মের সঙ্গে। সেইজন্য বলছেন সব কিছু, যা কিছু আছে সব ব্রহ্মে সমর্পিত। যেমন রথের চাকার স্পোকগুলো সমর্পিত রয়েছে চাকার কেন্দ্রের সাথে।

এবার গুরু শিষ্যকে বলছেন *যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং*, হে শিষ্যগণ! তোমার এটা জেনে নাও, এই যে ব্রহ্ম যিনি সব কিছুর আশ্রয়স্বরূপ তিনি হলেন সৎ অসৎ স্বরূপ তোমারই আত্মা। এটাই আমাদের উপনিষদের মূল কথা, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছু জুড়ে রয়েছে সেই ব্রহ্মের সাথে। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি যেটা ব্রহ্মের সাথে জুড়ে রয়েছে সেটা হলে তুমি নিজে, এটাই উপনিষদের মহান মন্ত্র ***তত্ত্বমসি***। যাবতীয় যা কিছু আছে, বাঘ, সিংহ, হাতি, সাপ, বিছে, মানুষ সব জুড়ে রয়েছে ব্রহ্মের সঙ্গে আর তুমিই হলে সেই ব্রহ্ম। এই কারণে হিন্দুরা কোন প্রাণীকে হিংসা করে না। বিশ্বে যত সভ্য জাতি আছে তাদের মধ্যে একমাত্র হিন্দুরাই অহিংস জাতি। যখন একটা ছাগলকে কাটা হচ্ছে তখন আমাকে ভাবতে হবে এই ছাগলও সাইকেলের চাকার স্পোকের মত কেন্দ্রের সঙ্গে জুড়ে আছে, কেন্দ্রটা হল ব্রহ্ম, আর সেই ব্রহ্ম আমি নিজেই। এই তত্ত্বমসি ভাবটা একবার মাথার মধ্যে এসে গেলে ওই ছাগলকে কি আর কখন কাটা যাবে? ওই ছাগল তো আমারই সম্প্রসারিত প্রাণ। হিন্দুরা অকারণে কখন কোন জীব হত্যা করত না, সাপটাপ দেখলেও মারত না, তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে, সহজে মারতে যাবে না। এখন দিনকাল অনেক পাল্টে গেছে। তখনকার দিনে সবাই একই সাথে শান্তিতে থাকত। একই বাড়িতে সাপও আছে, বিছেও আছে, ছারপোকাও আছে তার মধ্যে বাড়ি লোকেরাও আছে। জন্তুর সঙ্গে আছে তাই বলে সেই জন্তুদের মত থাকত না, তার মধ্যে সে পূজাপাঠও করছে, উচ্চ চিন্তনও করে যাচ্ছে। সাপ দেখল একটা দুটো হাততালি দিত সাপ পালিয়ে যেত। আগেকার দিনে তাই খড়ম পড়ে হাঁটাচলা করত, খড়মের ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজে সাপ পথ থেকে সরে যেত। তার কারণটা হল এটা। সে জানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে সব তার সাথে জুড়ে রয়েছে।

এই যে পাখা ঘুরছে, পাখার ব্লেডগুলো জুড়ে আছে মোটরের সাথে। এই মোটরটা হল ব্রহ্ম। গুরু শিষ্যকে বলছেন তুমিই সেই ব্রহ্ম, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই জুড়ে রয়েছে, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে। বলছেন, তোমার আত্মা ভিন্ন সব কিছু অসৎ, তোমার আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থ নেই। এখানে *সৎ অসৎ* বলতে বোঝাচ্ছেন মূর্ত ও অমূর্ত, যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা সৎ আর অসৎ মানে যেটা দেখা যাচ্ছে না, যেমন আগামীকাল যেগুলো জন্ম নেবে। স্থূল ও সূক্ষ্ম এই অর্থেও হতে পারে, অনেক কিছু আছে যেগুলো দেখা যায় না, যেমন ভূত, প্রেত দেখা যায় না এগুলো সূক্ষ্ম, অমূর্ত, তাই অসৎ কিন্তু আছে। একমাত্র ব্রহ্মাই হলেন সব কিছু, মুর্ত অমুর্ত, সৎ বলুন অসৎ বলুন, স্থূল হোক কি সূক্ষ্ম হোক সব কিছু ব্রহ্ম। সেইজন্য একমাত্র তিনিই হলেন *বরেণ্যং*, প্রার্থনীয়। একবার যে শ্রেষ্ঠকে জেনে গেছে সে কেন নীচুর

কাছে প্রার্থনা করতে যাবে! মালিকের সঙ্গেই যখন একবার পরিচয় হয়ে গেছে তখন কর্মচারীদের কাছে আমি কেন যাব!

লৌকিক পদার্থের তিনি আবার অবিষয়। অর্থাৎ লৌকিক পদার্থ দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না, কারণ তিনি নির্বিশেষ। আর সব কিছুর থেকে তিনি বরিষ্ঠ। এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে কিছু না কিছু দোষ রয়েছে। দোষরহিত একমাত্র ব্রহ্ম। বলা হয় ক্লিওপেট্রার নাক যদি হাফ ইঞ্চি ছোট হত তাহলে বিশ্ব ইতিহাস অন্য রকম হত। ক্লিওপেট্রার নাক নাকি এত সুন্দর ছিল যে, সব পুরুষরা ওই রূপ দেখে মাটিতে গড়াগড়ি দিত। এই নাকটাই যদি হাফ ইঞ্চি ছোট হত তাহলে বিশ্ব ইতিহাস অন্য রকম হত। খুঁত বিহীন বলে জগতে কোন কিছু হয় না। যেখানেই creation সেখানেই imperfection। আমার মধ্যে একটা দুর্গুণ আছে আপনার মধ্যে আরেকটা দুর্গুণ আছে, আমার মধ্যে একটা দোষ আছে আপনার মধ্যে অন্য একটা দোষ পাওয়া যাবে। যিনি নির্বিশেষ তিনি একমাত্র দোষ রহিত। তিনি দোষ রহিত বলেই তাঁকে বলা হয় *বরিষ্ঠং*। এখানে তাই বলছেন *সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্*, *পরং* মানে লৌকিক জ্ঞানের বাইরে, যে জিনিষটাই লৌকিক জ্ঞানের পারে সেই জিনিষটাকেই বলা হয় *পরং*। *বরিষ্ঠং প্রজানাম্*, জগতে যত রকমের প্রাণী আছে তাদের মধ্যে তিনিই বরিষ্ঠ, কারণ তিনি দোষ রহিত। এই যে ব্রহ্ম ইনিই একমাত্র প্রার্থনীয়।

এখানে বক্তব্য হল, যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম তিনি সব জীবের মধ্যেই আছেন। এটা কি করে বোঝা যাবে? ইন্দ্রিয়াদির চাঞ্চল্য দিয়ে বোঝা যায়, জীবের উপাধি দিয়ে তাঁকে জানা হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবটাই তাঁর মধ্যে জুড়ে আছে। আর প্রত্যেক জীব আসলে সেই ব্রহ্মই। কিন্তু তিনি লৌকিক জ্ঞানের পারে। যাবতীয় যা কিছু জগতে আছে সব কিছুর মধ্যে তিনিই বরিষ্ঠ, কারণ তিনি নির্বিশেষ তাঁর মধ্যে কোন দোষ নেই। যদি জীবনে কিছু পেতে হয় তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হয়, কারণ তিনিই একমাত্র *বরেণ্যং*।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যিনি নির্বিশেষ, তাঁর কোন গুণ নেই, তাহলে তিনি বরিষ্ঠ কি করে হলেন? এই প্রশ্নের উত্তর একটু অন্য ভাবে দেওয়া যেতে পারে। আমরা স্টাইল সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি। কিন্তু স্টাইল মানে কি? বৈশিষ্ট্যকেই স্টাইল বলা যেতে পারে। আমরা সবাই যদি একই পোষাক পরিধান করি তাহলে পোষাকের দিক থেকে আমাদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু তার মধ্যে একজন একটা অন্য ধরণের পোষাক পড়ে এসেছে। এটাই স্টাইল, পোষাকের বৈশিষ্ট্য তাকে আমাদের সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্টাইল মানেই হল imperfection, Style means imperfection। একজন মহিলা নিজের ব্লাউজ বানাচ্ছিল। বানাতে গিয়ে দেখছে কাপড়ে কুলোচ্ছে না। কাপড় কম পড়াতে একদিকে লাল আরেকদিকে সবুজ কাপড় দিয়ে ব্লাউজ বানাল। মূলতঃ এটা imperfection কিন্তু এটাই স্টাইল হয়ে গেল।

এক ভদ্রলোক তার নিজের জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন। তিনি যে ছোট্ট শহরে থাকতেন তার কাকা ছিল সেই শহরের আবার খুব বিখ্যাত দর্জি। তার দোকানে অনেক দর্জি কাজ করত। সেই শহরে এক নামকরা দুর্ধর্ষ ক্রিমিনাল ছিল। সেই ক্রিমিনাল একদিন একটা ঘোড়ার পিঠে বসে, দুদিকে দুটো রিভলবার আর আগে পিছে তার মতই বড় বড় সাকরেদদের সঙ্গে করে সেই দর্জির দোকানে এসে বলছে 'এই কাপড় দিলাম, খুব দামী কাপড়, বড় শহর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্যান্টের মাপটাপ ঠিকমত নিয়ে নাও'। দর্জির দোকানের সবাই তো ভয়ে কাঁপছে। মাপটাপ নেওয়া হয়ে গেছে। পাঁচ দিনের সময় দিয়েছে। পঞ্চম দিনে সেলাই হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ মুহুর্তে দেখে হাঁটুর জায়গাটা কাঁচি দিয়ে কাটা। যিনি এই কাহিনীটা লিখছেন তিনি তখন বাচ্চা ছিলেন। কাপড়টা সেই বাচ্চাটির এত ভালো লেগেছে যে কিছু না বুঝে ওই জায়গাটা কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছে। ওই দেখে মালিকের তো হার্টফেল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা, আজকে আমার সব গেল, দোকানে এসে সব কটাকে গুলি মেরে উড়িয়ে দেবে। পাঁচ বছরের বাচ্চাকে মালিক কি আর বলবে, নিজের ভাইপো আবার। পনেরো মিনিট কি আধ ঘন্টার মধ্যে ওরা এসে পড়বে। এর মধ্যে আট দশটা লাল রঙের ফুলের ডিজাইন তৈরী করল। যে জায়গাটা কাটা ছিল সেখানে লালফুল দিয়ে সেলাই করে দিয়েছে। তার সাথে দর্জির দোকানে যত কারিগর ছিল সবার প্যান্টে হাঁটুর জায়গাতে ওই লালফুল সেলাই করে লাগিয়ে

দিয়েছে। ইতিমধ্যে সেই ক্রিমিনাল দলবল নিয়ে দোকানে এসে হাজির হয়েছে। প্যান্ট দেওয়া হয়েছে। যেমনি ওই লালফুল দেখেছে সঙ্গে সঙ্গে এমন জোর হাঁক দিয়েছে আর মুহুর্তের মধ্যে রিভলবার বেরিয়ে এসেছে। এরা তো সবাই ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। ক্রিমিনাল দর্জির মালিককে দেখাচ্ছে 'এটা কি করেছ তুমি'! 'স্যার! এটা লেটেস্ট স্টাইল দিলাম আপনাকে'। 'কি বলছ! লেটেস্ট স্টাইল দিলাম, রেখে দাও তোমার লেটেস্ট স্টাইল'। ক্রিমিনাল যে শহর থেকে কাপড় এনেছিল তার থেকেও একটা বড় শহরে নাম করে দর্জির মালিক দেখাচ্ছে 'এই দেখুন স্যার, এরাও অত বড় শহর থেকে কাপড় নিয়ে সবাই এই স্টাইলে বানিয়েছে'। যতগুলো কারিগর ছিল সবারই পা এগিয়ে নিয়ে দেখাচ্ছেন সবার পায়েই লালফুল। তারপর এমন কায়দা করল যে বেচারা শান্ত হয়ে ফেরত চলে গেল।

তাহলে বৈশিষ্ট্যটা কি? এরাতো বোকার মত ভাবছে আমি বিরাট এক স্টাইল মারছি। কিন্তু আসলে জিনিষটা imperfection। Imperfection টাই বৈশিষ্ট্য। আমরা যেটাকে বিশেষ ভাবে জানি সেটা মূলতঃ একটা দোষ। ব্রহ্ম হলেন নির্বিশেষ, তাঁর কোন বৈশিষ্ট্য নেই সেইজন্য তিনি দোষহীন, তাই তিনি বরিষ্ঠ। বরিষ্ঠ হল negative এর দিক থেকে।

যে ব্রহ্মের কথা বলা হল এই ব্রহ্মে কিভাবে মনোনিবেশ করা যাবে সেই সম্বন্ধে এখন বলতে যাচ্ছেন। বলছেন *বেদ্ধব্যম্*, বেধন করতে হবে। মনকে তাড়ন করে করে ব্রহ্মের দিকে নিয়ে যাওয়া, এটাই *বেদ্ধব্যম্* -

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।।২/২/২।।

(যিনি দীপ্তিমান, যিনি সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ থেকেও সূক্ষ্মতর এবং যিনি স্থূল থেকেও স্থূলতর, যাঁতে লোকসমূহ অবস্থিত, তিনিই সর্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ, বাক্য ও মন। সেই ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই অবিনাশী। হে সোম্য! তাঁকেই ভেদ করতে হবে, তাঁকেই ভেদ কর, অর্থাৎ তিনিই জানার যোগ্য, তাঁকে জান।)

নিজের শিষ্যকে স্নেহপূর্বক সোম্য বলে সম্বোধন করা হচ্ছে – হে সোম্য! *যদর্চিমদ্*, অর্চিমৎ মানে দীপ্তিমৎ। *অর্চিমৎ*এর যদিও অনুবাদ আমরা দীপ্তিমান অর্থে করছি কিন্তু অর্চিমৎ বোঝায় তার থেকে অনেক বেশী। যেমন এই টিউব লাইটের আলোকে আমরা দীপ্তিমান বলছি কিন্তু দীপ্তিমৎ এখানে ঠিক তা নয়, আলোর পেছনেও যে আলো তাঁকে বোঝাচ্ছে। এই জগতে দেদীপ্যমান বলতে আমরা সূর্য, চন্দ্রকেই জানি। অথচ আজকে আমরা জেনে গেছি চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলো চন্দ্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। এটা আমাদের ঋষিরাও জানতেন। এখানে কিন্তু তা বলতে চাইছেন না, এখানে বলছেন সূর্যের যে আলো সেটা আসলে ব্রহ্মের আলো। ব্রহ্মের শক্তি সূর্যের পেছনে আছে বলেই সূর্য আলো দিচ্ছে। অগ্নির যে আলো, ব্রহ্ম অগ্নির পেছনে আছে বলেই সে আলো দিচ্ছে। প্রকৃত যে আলো সেটা হল ব্রহ্মের। সেইজন্য ব্রহ্ম দীপ্তমান। ব্রহ্ম যদি না থাকতেন তাহলে কোন আলোরই অস্তিত্ব থাকত না। যেমন মানুষের দেহে যদি ব্রহ্ম না থাকেন তাহলে সেটা মৃত শরীর হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি ব্রহ্ম না থাকলে সূর্যের আলোটা চলে গিয়ে দীপ্তিহীন হয়ে যাবে।

যদণুভ্যোঽণু চ, আমরা সব থেকে যত ছোট ভাবতে পারি, আচার্য এখানে বলছেন *শ্যামাকাদিভ্যোঽপি অণু চ সূক্ষ্মম্*, চাল, গম, তিল যত ছোট ছোট দানা শস্য আছে তার মধ্যে শ্যমা শস্য চাল গম থেকেও অতি ক্ষুদ্র, তিনি তার থেকেও সূক্ষ্ম। এ্যটমের থেকেও সূক্ষ্ম, এ্যটম থেকে ইলেক্ট্রন সূক্ষ্ম, ইলেক্ট্রন থেকেও তিনি সূক্ষ্ম। আমাদের বুদ্ধিতে সবচেয়ে সূক্ষ্ম জিনিষ যেটাকেই কল্পনা করি না কেন, তার থেকেও ব্রহ্ম সূক্ষ্ম। একদিকে তিনি দেদীপ্যমান, সূর্যের পেছনে তিনি আছেন বলেই সূর্য আলো বিকিরণ করছে, তার সাথে তিনি অণু থেকেও অণু। এখানে *অণু চ* বলছে, 'চ' বলতে আচার্য বোঝাচ্ছে অন্যান্য যে উপমাগুলো আছে সেগুলোকেও ধরে

নিতে হবে। আমাদের দৃষ্টিতে পৃথিবী হল সব থেকে স্থূল, যেটাকে আমরা সব থেকে ভারী জিনিষ ভাবতে পারি, তিনি তার থেকেও বেশী ভারী। আমাদের ভাবনায় যেটা সব থেকে হাল্কা তিনি তার থেকেও হাল্কা। কারণ তিনি নির্বিশেষ। নির্বিশেষের অর্থ হল যেখানেই কোন বিশেষণ এসে যাবে সেখান থেকে তিনি সরে আসবেন। যেটাই বলব সেটাকে তিনি ছাড়িয়ে যাবেন, স্থূল যেটা ভাবছি তিনি তার থেকেও স্থূল হয়ে যাবেন, বুদ্ধিতে যেটা সব থেকে সূক্ষ্ম বলে ভাবছি তিনি তার থেকেও সূক্ষ্ম হয়ে যাবেন, যাকে সব থেকে পবিত্র ভাবছি তার থেকেও তিনি পবিত্র হয়ে যাবেন। কোথাও গিয়ে তাঁকে বাঁধা যাবে না।

যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যত লোক আছে, পৃথিবীলোক, ভূর্লোক, স্বঃলোক ইত্যাদি সব তাঁর মধ্যেই *নিহিতা*, অবস্থিত। আর *লোকিনশ্চ*, যত রকমের পদার্থ হতে পারে এবং বিভিন্ন লোকে যত বাসিন্দারা আছে সবাই তাঁর মধ্যেই অবস্থিত। আচার্য এখানে আবার যোগ করছেন – চৈতন্যই সব কিছুর আধার, সেইজন্য যত লোক আর লোকের বাসিন্দারা সব তাঁর মধ্যেই *নিহিতা*।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রানস্তদু বাঙমনঃ, এই যে অক্ষর ব্রহ্ম তিনি প্রাণ, বাক্, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ। সব কিছু সেই চৈতন্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। যাঁরা সাধনা করতে চান, যাঁরা সেই ব্রহ্মে মনকে নিবেশ করতে চাইছেন তাঁদের কাছে মন্ত্রের এই লাইনটা খুবই উপযোগী। আমার প্রাণে, আমার বাণীতে, আমার মনে আর আমার সব কটি ইন্দ্রিয়ে ব্রহ্মই ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, এদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। কেনোপনিষদেও এই প্রশ্ন এসেছে *কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতে যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।।* এই মনকে কে প্রেরণা দেয়, এই প্রাণকে কে প্রেরণা দিচ্ছে, বাণীকে কে প্রেরণা দিচ্ছেন, কোন জ্যোতিষ্মানই বা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন? উত্তরে ঋষি বলছেন যিনি প্রাণের প্রাণ, মনেরও মন, বাণীরও বাণী, চক্ষুরও চক্ষু। এখানে একটি জিনিষকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে, প্রত্যেক জিনিষের যেটা সার পদার্থ, যার জন্য জিনিষটা দাঁড়িয়ে আছে। যেমন জল, জল আমার তৃষ্ণা নিবারণ করছে, জল আগুনকে নির্বাপিত করছে, জল শীতলতা প্রদান করছে। তাই বলে ব্রহ্ম কি জল? না, জলের যে জলত্ব সেটা ব্রহ্ম নিজে। যে কোন জিনিষের যেটা বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্যের যেটা সূক্ষ্ম জিনিষ সেটা তিনি। ইস্পাতের যে ইস্পাতত্ব সেটা ব্রহ্ম নিজেই। বাক্ মানে বাণী, বাণীর যে বাণীত্ব সেটা তিনিই। প্রাণের যে প্রাণ, প্রাণ সব কিছুকে চালাচ্ছে, কিন্তু প্রাণকে কে চালাচ্ছে? সেই ব্রহ্মই চালাচ্ছেন। সূর্য তো সবাইকে আলো দিচ্ছে, সূর্যকে কে আলো দিচ্ছেন? বলছেন সেই ব্রহ্ম। তাহলে ব্রহ্মকে কে আলো দিচ্ছে? এখানে আর এই প্রশ্নটা হয় না। এই প্রশ্নটা হয় না বলেই এত কিছু আলোচনা চলছে। কারণ তিনি নির্বিশেষ। যেমনি বলছি সূর্য আলো দেয়, তেমনি সূর্যকে আমি বানিয়ে দিলাম বিশেষ। কিন্তু ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এই প্রশ্নই হতে পারে না। শাস্ত্রের এই জিনিষগুলো বোঝার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। অনেক দিন ধরে তপস্যা করার পর, অনেক দিন যাবৎ শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে করতে এগুলো ধারণা হতে শুরু হয়। তা নাহলে এগুলো আমাদের কাছে শব্দ মাত্র থেকে যাবে। এই কারণেই উপনিষদ সবাইকে বলা হত না, অপাত্রে যাতে না চলে যায় তাই ব্রাহ্মণরা নিজেদের কাছে উপনিষদকে ধরে রেখেছিলেন। এই মুণ্ডকোপনিষদ যদি কেউ ঠিক ঠিক বুঝে নেয় সব উপনিষদ তার কাছে জলভাত মনে হবে। অবশ্য ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের কিছু উপাসনাকাণ্ড আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে উপনিষদের অংশটুকুর কথা বলা হচ্ছে।

মূলতঃ উপনিষদ কি বলতে চাইছে? নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই সত্য, সেই নির্গুণ নিরাকার থেকে আসছে সগুণ সাকার, সগুণ সাকার থেকে সৃষ্টি। বলতে গেলে এর বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু যত আমরা ভেতরে ঢুকছি তত আমাদের কঠিন মনে হচ্ছে। এখানে আচার্য আমাদের উপনিষদের বক্তব্যকে বোধে বোধ করানর চেষ্টা করছেন। এই বোধ করাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেইজন্য উপনিষদ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদের কথা ছেড়ে দিন, তাদের মধ্যে মাত্র বাছাই করা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে পড়ান হত। প্রশ্নোপনিষদেও শৌনকের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা হচ্ছে। প্রথমে আচার্যকে গিয়ে বলছেন কিছু প্রশ্ন আছে। আচার্য বলছেন 'খুব ভালো, তবে এক বছর আমার আশ্রমে থেকে সাধনা কর, তপস্যা কর। এক বছর পর আমাকে প্রশ্ন করবে, আমি যদি উত্তর

জানি তাহলেই উত্তর দেব’। আচার্য প্রশ্নই শোনেননি। আর এটাও বললেন না যে এক বছর পর তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দেব, আমি যদি জানি তবেই দেব। মানে, তোমার আগে প্রশ্ন করার পাত্রতা হোক। প্রশ্নোপনিষদ শুরুই হচ্ছে এই ভাবে। ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে তত্ত্বমসি বলে প্রজাপতি দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন, যাও এবার চিন্তা করতে থাক। দুটোর মধ্যে একটা করতে বলবেন, প্রথমতঃ একটা সাধারণ কথা বলে বলবেন, যাও চিন্তা করতে থাক, সমস্যা হলে আসবে। চিন্তা ভাবনা করে কিছুই বুঝতে পারল না, আবার ফিরে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ হয়ত বলে দিলেন এখানে থেকে তপস্যা করতে থাক। তপস্যা করার পর প্রশ্ন করবে, যদি আমি জানি তাহলেই উত্তর দেব। আমার যদি জানা না থাকে তোমার তপস্যাটা বৃথাও যেতে পারে। এক বছর তপস্যা করার পর যখন প্রশ্ন করবে, আচার্য তখন হয়ত এও বলতে পারেন ‘হ্যাঁ, এর উত্তর আমার জানা আছে, তুমি আরও এক বছর তপস্যা কর তারপর আমি উত্তরটা দেব’। সেটা অবশ্য করেননি। এত বড় বড় ঋষি তাঁদের প্রতি আচার্য এই ধরণের কঠোর অনুশাসন চাপিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই উপনিষদের তত্ত্বকে আমরা একদিন বেলুড় মঠে ঘুরতে এসে কোন সন্ন্যাসীর কাছে শুনেই ধারণা করে নেব, সে কি কখন সম্ভব! ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিজের দিব্য দর্শনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, দেখলাম মাকে দিগম্বরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর চোখের চাহনিতে জগৎ নড়ছে। এই চাহনি জিনিষটা কি? দৃষ্টি কি? কই ঠাকুর তো বললেন না তাঁর দৃষ্টিতে জগৎ নড়ছে। কিছু কিছু জিনিষ বোঝার জন্য প্রচণ্ড সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। এগুলো সহজে বোঝা যায় না।

এই যে বলা হল *তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙমনঃ*, এটা হল উপনিষদের প্রাণ, এটাই উপনিষদের ঠিক ঠিক ভাব। বাকি যা কিছু আছে সব শব্দমাত্র, শব্দের খেলাই আছে। সবটাই মায়া, মায়া কিন্তু নেগেটিভ অর্থে নয়, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। এই যে পাখা ঘুরছে, পাখার পেছনে ইলেক্ট্রিসিটি, ইলেক্ট্রিসিটির পেছনে সেই ব্রহ্মই আছেন। জ্ঞানীর কাছে এগুলো আলাদা করে দেখার কোন পথই নেই। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একজন খুব উচ্চমানের শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ছিলেন। তিনি সবারই কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একজন ব্রহ্মচারীর প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর তাঁকে নরেন্দ্রপুরে পাঠানো হয়েছিল। তিনিও সেই আচার্যের কাছে গিয়ে বলছেন ‘মহারাজ! এতদিন আপনার কাছে পরা বিদ্যার চর্চা করার পর এবার অপরা বিদ্যার চর্চা করতে যাচ্ছি’। মানে নরেন্দ্রপুর স্কুলে এখন তাঁকে পঠন-পাঠন করাতে হবে। মহারাজ ব্রহ্মচারীর কথা শুনে অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছেন ‘অপরা বিদ্যা! রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধুদের কাছে অপরা বিদ্যা বলে কিছু আছে নাকি’! এই হল একজন প্রকৃত সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গী। যে কোন কাজ সাধারণ দৃষ্টিতে একটা ঝামেলা, কাজ মানেই অপরা বিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষদেও তাই বলা হচ্ছে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ সব অপরা বিদ্যা। বেদ, বেদাঙ্গ সবই অপরা বিদ্যা আর আমি যখন বায়োলজি, কেমেস্ট্রি পড়াচ্ছি সেটাতো আরও অপরা বিদ্যা। কিন্তু মহারাজ বলছেন রামকৃষ্ণ মিশনে কোন অপরা বিদ্যা আছে নাকি! সবটাই তো পরা বিদ্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উপনিষদের সাথে মহারাজের বক্তব্যের সরাসরি বিরোধ এসে যাচ্ছে। কিন্তু না, কোন বিরোধ নেই। অপরা বিদ্যার মৌলিক নিয়ম হল, যখন কোন কাজ করা হয় তখন সেই কর্মের একটা ফলের আশা থাকে। যখন যজ্ঞাদি করছে তখন স্বর্গ পাব এই আশা থাকে। তখন সেই কাজ অপরা বিদ্যা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু যখন একটা ছাত্রকে চড়ও মারবে তখনও সে ভাববে এটা আমার নারায়ণের সেবা। একে না মারলে আর শোধরান যাচ্ছে না। আমি যে রাগ বার করছি সেটা নয়, এর ভালোর জন্য আমাকে এই সেবা করতে হল। আমি কাউকে স্নেহ করছি সেখানেও এই একই ভাব। এখানে আমার কর্মফলের কোন আশা নেই। যখনই আমি নারায়ণ জ্ঞানে কোন কাজ করছি তখন সেই কাজটাই পরা বিদ্যা হয়ে যায়।

ঠিক এই জিনিষটাই এখানে বলছেন, *তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙমনঃ*, প্রাণ, বাণী, মন যা কিছু আছে সব তিনিই, সেই অক্ষর ব্রহ্ম। এরপর কোথা থেকে অপরা বিদ্যা আসবে! ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছানর দুটি পথ বলা হয়। একটা হল নেতি নেতি আরেকটা ইতি ইতি। প্রথমে আমাদের নেতি নেতি পথটা দেখান হল, অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা। নেতি নেতিতে দেখাচ্ছেন যেখানেই কর্ম, কর্মফল, ক্রিয়া এগুলো আলাদা, বিশেষ করে ক্রিয়া আর কর্মফল সব সময়ই আলাদা হয়, আমি অফিসে চাকরি করছি, মাসের শেষে পনেরো হাজার টাকা

মাইনে পাচ্ছি। ক্রিয়া আর তার ফল আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু যখন ক্রিয়া আর তার ফল এক হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় পরা বিদ্যা। ক্রিয়াটা কি? নারায়ণ সেবা। ফলটা কি? নারায়ণ সেবা। আমি ঠাকুরকে ভালোবাসি। কেন ভালোবাসি? যাতে আমি ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারি। ক্রিয়া আর ফল এক হয়ে গেল। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়া আর ফল এক থাকে না, কারণ আমরা বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি, যাতে তুমিও আমাকে ভালোবাসতে পার। ঠাকুরকে কেন ভালোবাসছি, যাতে আমার সংসারের অশান্তি মিটে যায়। ক্রিয়া আর তার ফল আলাদা হয়ে গেল। যেখানেই ক্রিয়া আর ফল আলাদা, সেই বিদ্যার যে চর্চা হচ্ছে সেটাই অপরা বিদ্যা। যেখানেই ক্রিয়া আর ফল এক সেখানেই পরা বিদ্যা এসে যায়। তখন আমি অঙ্ক করাচ্ছি না বায়োলজি বা ইতিহাস পড়াচ্ছি, আমি বই লিখছি না ঠাকুর মন্দির পূজা করছি তখন সবটাই পরা বিদ্যায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কথা কি ব্রহ্মচারীকে মহারাজ নতুন কিছু বললেন? আদপেই না। এখানেই এই কথা বলা হচ্ছে – *স প্রাণস্তদু বাঙমনঃ*, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাণী, তিনিই মন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এইভাবে দেখতে পারেনা আর দেখেও না। আমি যখন খেতে বসি তখন মন মত খাবার দেখে উৎফুল্ল হচ্ছি, অপছন্দের খাবার দেখলে বিরক্তি প্রকাশ করছি। তাই প্রথমে শিক্ষা দিতে হয় ভালো খাবারে লোভ করতে নেই, মন্দ খাবারকে অবহেলা করতে নেই। তারপর দেখাবে সবটাই তিনি। তখন সে ভালো-মন্দের উর্দ্ধে চলে যাবে।

এরপর বলছেন *তদেতৎ সত্যম্*, এই রকম যিনি অক্ষর ব্রহ্ম যিনি প্রাণের ভেতরও প্রাণস্বরূপ তিনি সত্য। সত্য মানে, *অবিতথম্* অর্থাৎ যেখানে কোন ধরণের মায়ার ভাব নেই। মায়া মানে মিথ্যা, জিনিষটা যে রকম ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে, তিনিই সত্য তিনি ছাড়া কিছু নেই। তাই ব্রহ্মের বাইরে যা কিছু আছে সবটাই মিথ্যা। মাণ্ডুক্য উপনিষদে একটা নামই আছে *বৈতথ্যপ্রকরণ*। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, *তদেতৎ সত্যম্*। এর আগেও কতবার সত্য সত্য বলে এসেছেন, আবার এখানে নিয়ে এসে বলছেন *তদেতৎ সত্যম্*, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্ম *অবিতথ্*, *বিতথ্* মানে মিথ্যা। *অবিতথ্* তাই তিনি অমৃত, অবিনাশী। সেইজন্য বলছেন *তদমৃতং*। যেটাই বিনাশী সেটাই *বিতথ্*। আর বলছেন *তদ্বেদ্ধব্যং*, *বেদ্ধব্যং* মানে বেধন করা বা তাড়না করা বা মারা। মন থেকে তাড়ন করা, মন থেকে তাড়ন করা বলতে বলছেন মনের মধ্যে তাঁকে সমাহিত করা। উপনিষদের ভাষা অনেক প্রাচীন, তাই অন্য ভাবে বলছেন। মনটাকে সমাহিত করা সেই ব্রহ্মে যে ব্রহ্মের এতক্ষণ বর্ণনা করা হল। হে সোম্য! তুমি সেই অক্ষর ব্রহ্মে তোমার মনকে বেধন কর। তোমার মনকে শাসন করে, পিটুনি দিয়ে, তাড়না করে ব্রহ্মে লাগাও। সেই ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য কি? *যদর্চিমদ্*, আলো থেকেই আলো, অণু থেকে অণু, স্থূল থেকেও স্থূল, সুন্দর থেকে সুন্দর, ভারী থেকেও ভারী, হীরা যে শক্ত তার থেকেও শক্ত। এখানে কোন কিছুকে যুক্তিতর্ক দিয়ে দাঁড় করান হচ্ছে না, নিজেদের মনের কোন চিন্তা ভাবনা থেকে যে বলছেন তাও নয়, যেটা মৌলিক সত্য সেটাকেই তুলে ধরা হচ্ছে। যার জন্য উপনিষদগুলো বিভিন্ন বেদের, বিভিন্ন ঋষিরা তাঁদের আলাদা আলাদা শিষ্যদের শিখিয়েছেন কিন্তু কথা সবাই একই বলে গেছেন, কোথাও কোন অমিল নেই।

ঠাকুর কথামৃতে এক জায়গায় বলছেন – শুধু শুনলে জানলে কি হবে, ধারণা করা চাই। আসলে আমাদের যে ধরণের কাজে সব সময় জড়িয়ে থাকতে হয় সেখানে আমাদের পক্ষে জপ-ধ্যান খুব বেশী করা যায় না, একটা সময় পর্যন্ত করা যায় তার বেশী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কি, নিত্য-অনিত্যের বিচারটা সব সময় চালিয়ে যাওয়া যায়। আর এই জগৎটা যে ঈশ্বরের মহিমা এই চিন্তাটাও সব সময় করা যায়। এই বিচার চিন্তনকে ধরে রাখলে মানুষ মৃদু হয়ে যায়, জগতের সবার প্রতি করুণার ভাব জাগ্রত হয়। শুধু মাত্র তত্ত্বটা জেনে গেলাম এতে কিছু হয় না। তত্ত্ব বলতে তো দুটি কথা, ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা অথবা ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। যত শাস্ত্র, মহাভারত, পুরান, উপনিষদ, গীতা সবাইর শেষ কথা তো এই দুটি, হয় ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা নয়তো ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। তাহলে শাস্ত্র এত এত কথা কেন বলছে? আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন উপনিষদের তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য সেইজন্য শাস্ত্র বার বার পড়ে যেতে হয়। ঠাকুর তাই বলছেন – শুধু শুনলে, শাস্ত্র পড়ে জানলে কি হয়, ধারণা করতে হয়। যদিও বলা হয় ঈশ্বর দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান এগুলো স্বসংবেদ্য। কিন্তু তাঁর আচার আচরণে বোঝা যায়। ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন সিদ্ধ হয়ে যায়। সংস্কৃতের যে সিদ্ধ

শব্দ সেটা তিনি বাংলায় ব্যবহার করছেন। আলু-পটল যেমন সিদ্ধ হয়ে যায় সেই রকম সিদ্ধ হয়ে যায়। তখন একজন মজা করে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন – মশাই কলাই বাটা সেদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়। সিদ্ধ মানে যিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছেন, ঠাকুর এটাকে বাংলায় ব্যবহার করছেন। মানুষ নরম হয়ে যায়, নরম হয়ে যাওয়া মানে তাঁর যে আচরণ, তাঁর আচার-ব্যবহারটা মৃদু হয়ে যায়। নরম হয়ে যাওয়া মানে, জগতের সবারই প্রতি মন করুণার ভাবে আর্দ্র হয়ে যাওয়া। তাঁর অন্তরে মাতৃভাবের জাগরণ হয়, মাতৃভাব যে শুধু নারীর মধ্যেই থাকবে তা নয়, যাঁরা উচ্চ সাধু সন্ন্যাসী তাঁদের মধ্যেও মাতৃভাব এসে যায়। পুরো জগৎকে দেখেন তাঁর ভেতর থেকেই বেরিয়েছে। কিন্তু যখন তিনি জ্ঞানী হয়ে গেলেন তখন তিনি তত্ত্বটাকে সাক্ষাৎ দেখছেন, তখন তো আর কোন কথাই হয় না। এই জ্ঞানী হওয়া তো অনেক দূরের, কিন্তু তার আগে হল ধারণা।

ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য শাস্ত্র একবার এদিক দিয়ে আরেকবার ওদিক দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিষটাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যায়। অনেক দিন ধরে শুনতে শুনতে ধারণা হতে শুরু হয়। পাথরের গ্লাশবাটি যখন তৈরী হয় তখন একটা পাথরকে ছেনি, হাতুড়ি বা গ্রাইণ্ডিং মেশিন দিয়ে কাটতে থাকে। ধারণা করার অর্থ মানে, আমাদের মন বুদ্ধি সব পাথর হয়ে আছে, সেটাকে গ্রাইণ্ডিং মেশিন দিয়ে ড্রিলিং করে পাথরটাকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে তাই হয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদের মস্তিষ্ক পাথরের মত হয়ে আছে। উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ করা মানে ড্রিলিং মেশিন চালান। প্রথমের দিকে উপনিষদ শুনলে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। একবার যখন কাটা শুরু হয় তখন আর কাটতে বেশী কষ্ট হয় না। যেমন যেমন কাটা হতে থাকে তেমন তেমন তার পাত্রতা বাড়তে থাকে। সেটাই এখানে বলা হচ্ছে, শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে কোন একটা অবস্থায় এসে ধারণা হতে শুরু হয়। ধারণা করা শুরু হলে পাত্রতা আসে। পাত্রতা মানে, পাথরের উপর এখন গর্ত হতে শুরু হয়েছে। যত গর্তটা বড় হতে থাকে তার মানে এবার ধারণা করার ক্ষমতাটা বেড়ে গেছে। আমাদের মন সত্যিই এইভাবেই ধারণা করার ক্ষমতা অর্জন করে। এই পাত্রতাকে বাড়ানর জন্য নানান রকমের উপমা, বিভিন্ন রকমের কথা দিয়ে শাস্ত্রকে সাজান হয়েছে। আমি শাস্ত্র পড়েছি কিনা, জপ-ধ্যান করেছি কিনা এগুলো কোন গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল আধ্যাত্মিক ভাব আমার ভেতরে প্রবেশ করেছে কি করেনি। আগে আমাদের যে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা ছিল সেখানে আধ্যাত্মিক ভাবটাই ছিল মূল। প্রথম থেকেই তখন শিক্ষা দেওয়া হত অভাবে পড়ে কেউ যদি আসে তাকে সাহায্য করবে, অতিথিকে সেবা করবে, কারুর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ভাব রাখবে না। এগুলো হল জগতে সব কিছুর মধ্যে যে একটা একত্ব রয়েছে, এই মৌলিক একত্ব বোধটাকে ভেতরে জাগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

এরপর কোনটাকে অবলম্বন করে এবং কিভাবে সাধনা করতে হবে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে। এর আগে বললেন *তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি*, একটাকে নিয়ে আরেকটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, এটাকেই বলছেন বিদ্ধ করা। কিভাবে বিদ্ধ করবে? তখন এই উপমার সাহায্যে বলছেন। উপমাকে কখন আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হয়।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি।।২/২/৩।।

(হে সোম্য! উপনিষদে প্রসিদ্ধ মহাস্ত্র ধনুকে গ্রহণ করে তাতে সতত চিন্তাদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত বাণ সন্ধান করবে, ধনু আকর্ষণপূর্বক লক্ষ্যে চিত্ত নিবিষ্ট করে লক্ষ্য সে অক্ষরকেই ভেদ কর।)

মনকে সেই অক্ষর পুরুষে বিদ্ধ করতে বলা হচ্ছে। কিভাবে বিদ্ধ করব? উপনিষদেই ধনুর বর্ণনা করা হয়েছে। পরের মন্ত্র যখন আলোচনা হবে তখন দেখব সেখানে প্রণবকে ধনু রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে বলছেন *ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং*, ধনু ওঁ। প্রণবকে বলা হচ্ছে *মহাস্ত্রং*, এই অস্ত্রের সামনে অন্য কোন অস্ত্র

দাঁড়াতে পারবে না। শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক যেমন মহাশক্তিশালী, শিবের ধনুষকে যেমন প্রচণ্ড শক্তিশালী বলা হয়, এই প্রণবরূপ ধনু ঠিক সেই রকম *মহাস্ত্রং*, প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রণবরূপ ধনু থেকে যে বাণ ছাড়া হবে, সেই বাণের যে শক্তি উৎপন্ন হবে সেই শক্তি দিয়ে সব কিছু প্রলয় করে দেওয়া যেতে পারে। এই প্রণবের বর্ণনা কোথায় বলা আছে? উপনিষদেই ওঁ এর কথা বলা হয়েছে, সেইজন্য বলছেন *ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং*। যার জন্য পরে তন্ত্র মতে যত মন্ত্রাদি আছে সেখানে ওঁ কে নেওয়া হয়েছে। স্বামীজীও যখন হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করছেন সেখানে তিনি ওঁ কে অত্যন্ত উচ্চস্থান দিয়েছেন। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে অনেক কিছুই পৃথক পৃথক, দুজন হিন্দুর মত কখনই মেলে না, কিন্তু প্রণব সবাই মানে। যে প্রণবকে মানে না সে হিন্দু নয়।

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত, বাণটাকে নিয়ে এবার কি করবে বলছেন। বাণের বর্ণনা পরের মন্ত্রে গিয়ে বলছেন। বলছেন এই বাণের ফলাটাকে অত্যন্ত ধারালো করবে। তীরের ফলা যদি তীক্ষ্ণ ও ধারালো না হয় তাহলে কাজ হবে না। তবে মহাভারতে তীরের যে বর্ণনা আছে তাতে অনেক তীর ভোঁতাও থাকত, সেই তীরের ব্যবহার অন্য কাজে, যেমন কিছু জিনিষকে ভাঙার জন্য ব্যবহার করা হত। কিন্তু যখন কাউকে বিদ্ধ করতে হবে তখন তীরের ফলাটাকে সুতীক্ষ্ণ হতে হবে। এই বাণকে কিভাবে তীক্ষ্ণ করতে হবে? উপাসনা দিয়ে এই তীরকে ধারালো করতে হবে। কি কি উপাসনা করবে সেটা একটার পর একটা বর্ণনা আসতে থাকবে। ওঁ সেই ধনু আর তীরকে উপাসনার দ্বারা ধারলো করবে। *সন্ধয়ীত*, ধারালো করার পর ওঁ রূপ ধনুতে রেখে সন্ধান করবে। বাণ হল আমাদের মন বা জীবাত্মা।

মুণ্ডকোপনিষদের এই দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটি জিনিষ ঘুরে ঘুরে আসবে। উপনিষদ মতে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা সবাই সবাইকে আলাদা আলাদা দেখছি। এই আলাদা দেখাটা কোথা থেকে আসছে? বলছেন এটাই মায়া। কিন্তু মায়াতো না হয় বুঝলাম কিন্তু আমি আপনি কি? এনারা বলবেন প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। আমি, তুমি সবাই সেই শুদ্ধ চৈতন্যই কিন্তু প্রতিবিম্বিত। সূর্য এক, কিন্তু নীচে যদি দশটা জলপূর্ণ পাত্র রেখে দেওয়া হয় তাহলে কটা সূর্য দেখাবে? দশটা জলের পাত্রে দশটি প্রতিবিম্বিত সূর্য আর একটা আকাশে আসল সূর্য, মোট এগারোটি সূর্য দেখাবে। ঠাকুর বলছেন যদি একটা একটা করে পাত্রগুলো ভেঙে দেওয়া হয়, কমতে কমতে শেষে একটি পাত্র অবশিষ্ট রইল। তখন দুটি সূর্য রইল, একটা নীচে আরেকটি উপরে। শেষ পাত্রটাও এবার ভেঙে দেওয়া হল, তাহলে কটা সূর্য থেকে গেল? ভক্ত বলছে একটি সূর্য। ঠাকুর বলছেন – না, কি থাকে সেটা মুখে বলা যায় না। প্রথম প্রথম কথামৃত পড়ার সময় এই জিনিষটা অনেকেরই মাথায় ঢুকবে না। এগুলোই হল ধারণার ব্যাপার। চিন্তা করতে করতে একটা অবস্থায় বক্তব্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পাত্রগুলো হল মন বুদ্ধি। মন বুদ্ধি আছে বলেই গ্রহণ করছে, গ্রহণ করছে বলেই সে এক দুই বলছে। প্রতিবিম্বিত যেটা হচ্ছে সেটা একটা পাত্র, পাত্র মানে মন বুদ্ধি। কিন্তু যখন শেষ পাত্রটা ভাঙা হয়ে গেল তখন শেষ মন বুদ্ধি তো ভাঙা হয়ে গেল, তাহলে গ্রহণ করবেটা কে! কেউই নেই গ্রহণ করার। তাহলে কি থাকল? যা থাকার তাই থাকল, এখন একও বলা যাবে না দুইও বলা যাবে না। যারা বিজ্ঞানের ছাত্র, খুব মনযোগ দিয়ে যারা বিজ্ঞান পড়েছে তারা সূক্ষ্ম চিন্তন দিয়ে এটাকে ধরতে পারবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরা খুব মুশকিল। কথামৃতের এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো পড়লে ঠাকুরের কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, কোন্ অজ গ্রামের একজন অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়াতে ব্রাহ্মণের কিছু সংস্কার হয়ত ছিল। কিন্তু তারপর কোন লেখাপড়া নেই, কোন শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেননি। কিন্তু এখানে তিনি যে যুক্তি দিচ্ছেন, দুটি সূর্য, শেষ পাত্র ভেঙে গেল। কটি সূর্য? ঠাকুর বলছেন কি আছে আর মুখে বলা যায় না। এই প্রতিবিম্বিতের উপমা শুধু বেদান্তেই দেওয়া হয়। ঠাকুর নিশ্চয়ই তোতাপুরীর কাছে এই উপমাটা শুনেছিলেন বা অধ্যাত্ম রামায়ণে শুনেছিলেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন করতে ভক্ত বলছে একটি সূর্য, ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলছেন – কি আছে সেটা কে বলবে। তিনি এক দুইয়ের পার, কথামৃতে ঠাকুরও এই কথা অনেকবার বলছেন।

সাধনার মাধ্যমে যাঁর এই অনুভূতি হচ্ছে যে, শেষে যেটা থেকে যায় সেটা এক দুইয়ের পার, এটাই অদ্বৈত। বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতে রামানুজ, মাধ্বাচার্যরা যাই বলে থাকুন না কেন ঠাকুরের কথাই আমাদের কাছে

শেষ কথা। ঠাকুরও দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতের কথা বলছেন, কিন্তু যখন সূর্য আর তার প্রতিবিম্বের উপমা দিচ্ছেন তখন এটাই অদ্বৈত। সূর্য আছে, অনেক পাত্রও আছে, সবই আছে। কিন্তু একটা একটা করে শেষ পাত্রটাও ভেঙে দেওয়া হল তখন কি আছে বলার জন্য তো আর কেউ নেই। কারণ মন আর বুদ্ধি যে বলবে তারাই তো নেই। কিন্তু যখন কটি সূর্য আছে গোনা শুরু হয় তখন দুই থেকেই শুরু হয়। এটাই মজার ব্যাপার। এক থেকে কখন শুরু হয় না। শূন্য থেকেও শুরু হয় না, শুরুই হয় দুই থেকে। হয় আমার কোন বোধ থাকবে না, আর তা নাহলে শুরু হবে দুই থেকে। আমি এক আছি বহু হব, এগুলো বলা হয় ধারণা করার জন্য। সূর্য ছিল দুটি সেখান থেকে চলে গেল এক দুইয়ের পার। তার মানে একটি সূর্য কখন থাকে না, শূন্যও কখন থাকবে না। গণনা শুরুই হয় দুই থেকে, আজব জিনিষ। দুইই হল শেষ, দুইয়ের পরে কি হয় বলা যায় না। তাহলে বলতে পারে, মুখে যদি নাই বলা যায় তাহলে এত আলোচনার কি দরকার। কিন্তু একেশ্বরবাদ কখন আসবে না। এই যে বলা হয় ঈশ্বরই আছেন, এটা বলা হয় ধারণা করানর জন্য। কিন্তু কি আছে মুখে বলা যাবে না। তিনিই আছেন বলতে আমাদের মাথায় আসে একমাত্র তিনি, এই অর্থে এক বলা হচ্ছে না। যখন বলছে তিনিই আছেন, তখন এক দুইয়ের পারের কথাই বলছে। এগুলো ধারণা করা খুব কঠিন। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে নিজেকে যে এক করে নিয়েছেন সেই জীবাত্মা রূপে তিনিই আছেন এটা আসল চৈতন্য নয়, প্রতিবিম্বিত চৈতন্য।

এই যে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, অংশ রূপে দেখাচ্ছে, একেই বলছেন বাণ। উপনিষদে যে মহাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে, মহাস্ত্র হল ওঁ, এই ওঁ এর উপর তোমার বাণকে সন্ধান কর। বাণ মানে তোমার ভেতরে যিনি জীবাত্মা হয়ে আছেন। কিন্তু জীবাত্মা বলে কিছু আছে নাকি? জীবাত্মা বলে কিছু নেই। কিন্তু তোমার বোধ আছে। তোমার এই বোধটাকে ওঁ এর উপর নিয়ে যাও। মূলতঃ বলা হচ্ছে তুমি ওঁ এর সাধনা কর। এই বাণকে শুদ্ধ সংস্কার করতে হবে, *উপাসানিশিতং*। কিভাবে সংস্কার করবে? জপ-ধ্যান করে, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতির অভ্যাস করে। এগুলোর অভ্যাসের দ্বারা মনকে শুদ্ধ কর, মন শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত জপ-ধ্যান হয় না। বর্তমান কালে আমাদের যেভাবে বলে দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয় জপ-ধ্যান কর তাতেই মন শুদ্ধ হবে। শুদ্ধ মনে জপ, ধ্যান করলে জপ, ধ্যান ভালো হবে এবং তাতে মন আরও শুদ্ধ হবে। কিন্তু বেদান্ত মতে তা হয় না। বেদান্ত মতে চব্বিশ ঘন্টা অনুশীলন কর, নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম কর, মনকে কখন চঞ্চল হতে দেবে না। শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতির দ্বারা অনুশীলন করে করে মন শুদ্ধির অবস্থায় চলে গেল এইবার তুমি জীবাত্মা রূপী বাণকে ওঁ এর উপর সন্ধান কর।

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা, ধনুকে বাণ সন্ধান করার পর ধনুর দড়িকে যেমন টানা হয় সেই রকম টানতে হবে। কিন্তু এতো আসল ধনু নয়। উপমা সব সময় একদেশীয়, বোঝাবার জন্য বলা হল। আসল ধনু তো নেই তাহলে কি টানতে বলছেন? *আয়ম্য* বলতে আচার্য বলছেন *আকৃষ্য সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং*, ইন্দ্রিয় সহিত অন্তঃকরণকে বিষয় থেকে টেনে সরিয়ে আনতে হবে। অন্তঃকরণ হল মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটির সত্ত্ব অংশ দিয়ে নির্মিত। ফলে যে ইন্দ্রিয় তার যে তন্মাত্রার সত্ত্ব অংশ দিয়ে নির্মিত স্বাভাবিক ভাবেই সেই তন্মাত্রার বিষয়ের দিকে ছুটে যাবে। যেমন চোখ তেজ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী, তাই চোখ সব সময় রূপের দিকে ছুটে যাবে, কারণ রূপও তেজ তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত। কর্ণ সব সময় শব্দকে ধরতে যাবে। আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলো রজোগুণ দিয়ে তৈরী। অন্য দিকে যত গুলো তত্ত্ব আছে তার সব কটির সত্ত্বগুণ মিলিয়ে মন ও বুদ্ধি নির্মিত। সেইজন্য মন আর ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য সব সময় নিজের নিজের বিষয়ের দিকে ধাবিত হবে। এটাই স্বাভাবিক। ভালো গানের দিকে আকর্ষণ থাকাটা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভালো গান না শুনতে চাওয়া, ভালো দৃশ্য না দেখতে চাওয়া, ভালো-মন্দ কিছু খেতে না ইচ্ছে করা মানে কিছু গোলমাল আছে। এটাই স্বাভাবিক।

অস্বাভাবিক কোনটা? বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে টেনে নিয়ে আসা। সমাজে কারুর যদি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ না থাকে তাহলে তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। সন্ন্যাসীর ভোগ-বাসনায় একটুও মন নেই, বুঝতে হবে

তার মানসিক কিছু সমস্যা আছে। যাদের বয়স হয়ে গেছে তাদেরও ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ থাকে। তাকেও চেষ্টা করতে হয়। সন্ন্যাসীর বয়স হয়ে গেছে কিন্তু তিনিও চাইছেন একটু হরিদ্বার ঘুরে আসি। গোয়া-বম্বে নয়, তীর্থস্থানেই যেতে চাইছেন, খারাপ কিছু নয়। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে কোথায় একটা জায়গায় শান্তিতে থেকে সাধন ভজন করবেন, অথচ চললেন হরিদ্বার। কিংবা কোন উৎসবে ঠাকুরকে কেমন সাজিয়েছে একবার দেখি আসি। হাঁটতে পারছেন না, হুইল চেয়ারে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে, না নিয়ে গেলে অশান্তি করবেন। এগুলো যে সব সময় আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই থাকবে তা নয়, চোখ চাইছে দেখি কেমন আলো দিয়ে সাজিয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয় প্রবল হয়ে আছে। এগুলো স্বাভাবিক। বয়স হয়ে গেলে সব ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে জিহ্বাতে এসে জমা হয়। সেইজন্য বেশীর ভাব বয়স্ক লোকেদের খাওয়ার প্রতি লোভটা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন ঠিক ঠিক সাধনা শুরু করে দিয়েছে, *ইহামুত্রফলভোগ বিরাগঃ*, এই জগতের আর পরের যে জগতের তার সব সুখ থেকে আমি বৈরাগ্য নিলাম। তখন ইন্দ্রিয়ের সব বিষয় থেকে সে মনকে টেনে নিয়েছে। ঋষি শিষ্যকে তাই বলছেন *আয়ম্য*, এটাকে টান, মনকে ওখান থেকে সরাও। অন্তঃকরণকেও বিষয় থেকে টেনে নেবে। বিষয়ের থেকে ইন্দ্রিয় ও মনকে সরানটা চেষ্টা সাপেক্ষ। শম, দম ও উপরতি, শুধু টেনে নিলেই হয়ে যাবে না, ওখানে আর ফেরতও যাতে না যেতে পারে। এমন টানা হয়ে গেছে এখন চাইলেও আর যেতে পারবে না।

স্বামী ভূতেশানন্দজীর জীবনে একটা ঘটনা আছে। মহারাজ তখন গুজরাতে ছিলেন। মহারাজ কখন পান খেতেন না। গুজরাতের এক শেঠজী মহারাজকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। শেঠিজী অনেকদিন ধরে মহারাজকে বলছেন 'এখানে খুব বিখ্যাত পান পাওয়া যায় আমার খুব ইচ্ছা আপনাকে এখানকার একটা পান খাওয়ান'। মহারাজের আবার পান খাওয়াতে কোন মন নেই। শেষে একদিন ওই ষাটের দশকে পঞ্চাশ টাকা দামের একটা বিশেষ পান এনে মহারাজকে দিয়ে বলছেন 'মহারাজ আপনি একবার শুধু এই পানটা খেয়ে দেখুন, তারপর বলবেন কি খেলাম। গুজরাতের এটা শ্রেষ্ঠতম পান, এখানে শুধু রাজারাই এই পান খায়'। মহারাজ আর কি করবেন, ভক্তের পীড়াপীড়িতে মুখে দিয়েছেন। পানটাকে চর্বণ করছেন। শেঠজী কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করছে 'মহারাজ কেমন লাগছে বলুন'। মহারাজও বলছেন 'ছাগলের মত লাগছে। ছাগল যেমন ঘাস চিবোয় ঠিক তেমনই আমার লাগছে'। শেঠজী তখন বললেন 'আমি আর কোন দিন আপনাকে পান খাওয়া না'। তখনকার দিনে পঞ্চাশ টাকার পান মানে আজকালকার দিনের হিসাবে প্রায় পাঁচশ টাকা দামের পান খাইয়ে জিজ্ঞেস করছে কেমন লাগছে, মহারাজ বলছেন ছাগলের মত। সত্যিকারের এই রকম অবস্থা হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়কে টেনে নিয়েছে, শুধু টেনেই নিয়েছেন তা নয়, ওখান থেকে আর কোন দিকে সে যাবে না।

ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, একজনের স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে 'অমুককে দেখ কেমন ভালো, এক এক করে নিজের সব স্ত্রীকে ত্যাগ করছে'। তার মানে একটা একটা করে মনকে তুলে নিচ্ছে। তখন স্বামী বলছে 'দূর খেপী! এক এক করে কি ত্যাগ হয়! এই দ্যাখ্ ত্যাগ কাকে বলে'। বলেই সে কাঁধের উপর গামছাটা ফেলে বেরিয়ে গেল। উপনিষদ ঠিক এটাকেই বলছে, *আয়ম্য*, টেনে নাও। একটা একটা করে ত্যাগ মানে প্রথমে বাজে, অপছন্দ জিনিষগুলোকে ত্যাগ করল, নিজের পছন্দের ভালো জিনিষগুলো শেষের জন্য রেখে দিল। ওইভাবে হবে না। প্রথমে নিজেকে টান, কাঁধে গামছা দিয়ে বেরিয়ে যাও। যেভাবে ধনুকে তীর রেখে হাত দিয়ে টানা হয়, এটা তো তা নয়। এখানে বলতে চাইছেন মন আর ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে টেনে নিতে হবে। উপনিষদে এই জিনিষটাকে অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। কঠোপনিষদেও ঠিক এই কথা বলা হচ্ছে, যতক্ষণ বিষয় থেকে মন আর ইন্দ্রিয়কে টেনে না নেওয়া হয় ততক্ষন কিন্তু সাধনা শুরু হবে না। যখন সে ঠিক করে নিল আমার জগতের যা ভোগ করার হয়ে গেছে আমার আর কিছু চাইনা, এইবার তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হবে ভোগ থেকে নিজেকে টানতে হবে। সংসারীরা সব কিছুর ভোগ থেকে টেনে নিতে পারবে না, একেবারেই সম্ভব নয়। এই কারণেই উপনিষদ সংসারী, গৃহস্থদের বলা হত না। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণ যাঁরা ছিলেন তাঁরা পারতেন, তাঁরা থাকতেনও সেইভাবে। বড়লোকদের তোয়াজ করা, তাদের মোসায়েবি করা এগুলোর কোনটাই তাঁদের স্বভাবে ছিল না।

গঙ্গানাথ ঝা নামে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলার হয়েছিলেন। নিজের গ্রাজুয়েশান পরীক্ষার সময় তিনি নিজস্ব কিছু নোটস্ বানিয়েছিলেন। আমরা সেই নোটস্ এখন টেক্সট বুক হিসাবে পড়ছি। তাঁর ভাই ছিলেন আবার তখনকার দিনের খুব নামকরা আইসিএস অফিসার। পরিবারটাই খুব নামকরা, এনাদের গ্রামটাই পাণ্ডিত্যের জন্যই বিখ্যাত। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা নিজের মেয়েকে এই দুই ভাইয়ের কোন একজনের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গঙ্গানাথ ঝার মা আটকে দিলেন, তিনি বলে দিলেন লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুজনের কখন মেল হয় না। আপনার টাকা-পয়সা প্রচুর আছে কিন্তু আপনার মেয়ের মধ্যে বিদ্যার সংস্কৃতি নেই। রাজীই হলেন না বিয়েতে। বিদ্যাচর্চা যে করে তাকে প্রথমেই সব কিছু ভুলে যেতে হবে। সন্ন্যাসীর গুণগুলো তখনকার দিনের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল। ব্রাহ্মণ, তুমি না খেয়ে মরবে, তোমার স্ত্রীও না খেয়ে মরবে আর তোমার বাচ্চাও না খেতে পেয়ে মরবে। এতে তুমি কি রাজী আছ? আমরা তোমাকে সম্মান দেব। বর্তমান কালে শিক্ষার নামে এত সংস্থা গজিয়ে গেছে, এত এত বই ছাপা হচ্ছে। কিন্তু একবার বলে দেওয়া হোক, যে শিক্ষকতা করবে সে নিজের জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু দরকার সেটুকুর বাইরে সে কিছু পাবে না। তুমি বই লিখবে? কিন্তু কোন রয়্যালটি পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে সব সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবে, সব বই লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি নিজের কাজকে খুব উচ্চমানে নিয়ে যেতে চাইছেন সেখানে প্রথমেই থাকতে হবে নিঃস্বার্থপরতা, পূর্ণ ত্যাগের ভাব। ইদানিং চারিদিকে শুধু সেমিনার আর সেমিনার, দেশে বিদেশে আইআইটি, আইআইএমের প্রফেসাররা সব চারিদিকে সেমিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু একবার প্রফেসরদের বলে দেওয়া হোক তুমি কোন স্পনশরশিপ পাবে না, নিজের পয়সায় যেতে হবে। সব সেমিনার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে, সাধারণ যাত্রীদের প্লেনের টিকিট না পাওয়ার সব ঝামেলা মিটে যাবে।

আমেরিকাতে বুকার টি ওয়াশিংটন নামে একজন নিগ্রো ছিলেন, আমেরিকার শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি একটা বিরাট বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন। তার ওখানে জর্জ কারভার বলে একজন এসেছিলেন, সেও নিগ্রো, তিনি কৃষি গবেষণায় ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর কৃষিতেই আগ্রহ ছিল। ছোটবেলা পড়াশোনা করে ডিগ্রী নিয়ে যখন দাঁড়িয়ে গেছেন, তখন বুকার টি ওয়াশিংটন বললেন তুমি আমার এখানে চলে এস, আমি নিগ্রোদের মধ্যে কাজ করছি। কারভার এসেছেন। বুকার টি ওয়াশিংটন বলে দিলেন আমি তোমাকে অন্য বিশ্বাবিদ্যালয়ের মত টাকা দিতে পারবো না। কারভার রাজী হয়ে গেলেন। তিনি জীবনে আর বিয়েই করলেন না। বিয়ের কথা বললেই বলতেন আমি কোথা থেকে সময় দেব, আমার সমস্ত সময়টা তো গাছপালারাই নিয়ে নিয়েছে। তখনকার দিনে ওঁকে দশ ডলারের মত কিছু মাইনে দেওয়া হত। আর প্রত্যেক কয়েক মাস পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে তাঁকে ধমক দিতে হত, আপনার চেকটা ভাঙান, আমরা হিসাব মেলাতে পারছি না। ওনাকে যে মাসে মাসে দশ ডলারের চেক দেওয়া হচ্ছে সব তার টেবিলের উপরই জমে থাকছে। ব্যাঙ্কে গিয়ে যে চেক ভাঙাবে সেই সময়ও তাঁর নেই। ছয় মাস পর ব্যাঙ্কে যখন ষান্মাসিক হিসাব করছে তখন তাদের হিসাব মিলছে না। তিনি যখন বৃদ্ধ বয়সে মারা গেলেন, দেখা গেল বেশীর ভাগ চেকই পড়ে আছে আর যা টাকা আয় করেছিলেন সব পড়ে আছে। কিছুই খরচ করেননি। পিনাট বাটারের পুরো বিপ্লব একা এই ভদ্রলোক এনেছেন। বুট পালিশের যে কালি যেটা বাদামের খোসা থেকে তৈরী হয়, কারভারের মাথা থেকেই এই বুট পালিশের কালির ফরমুলা বেরিয়েছে। পিনাট থেকে প্রায় একশ খানা প্রোডাক্ট তৈরী করেছেন। শুধু এনার পেটেন্টের জোরে আমেরিকা পিনাটের বিশ্ব বাজারে ছেয়ে গেল। পিনাট তো তাঁর একটা দিক গেল, এই রকম কত দিকে তাঁর যে কত অবদান ভাবা যায় না। অথচ যেখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা হাজার ডলার মাইনে পেতেন সেখানে তিনি দশ ডলার করে পেতেন, সেটাও তিনি ভাঙাচ্ছেন না। যেদিন দেখা যাবে বিদ্যার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে বুঝবেন সে দাঁড়িয়ে গেছে। *আয়ম্য*, এইটাই, ইন্দ্রিয় ও মনকে তাদের বিষয় থেকে টেনে নাও।

তদ্ভাবগতেন চেতসা, একবার মন আর ইন্দ্রিয়কে যখন টেনে নেওয়া হয়ে গেল এবার সেই ব্রহ্মভাব, *লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি*, যেটা লক্ষ্য তারই ভাবে মনের চেতনাকে ডুবিয়ে দাও। গীতার প্রণাম মন্ত্রেও

আমরা এই ভাবটা পাই *ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো*। *তদ্ভাবগতেন*, তাঁরই ভাবে মনটা চলে গেছে, মন লক্ষ্য বস্তুর ভাবে এক হয়ে গেছে। এই ভাবটাকেই আবার মহাভারতে দেখান হয়েছে যেখানে অর্জুন পাখির চোখকে বিদ্ধ করতে যাচ্ছে। অর্জুন এখন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? শুধু পাখির চোখ আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। পাখির চোখের সাথে অর্জুনের মন এক হয়ে গেছে। এটাই সাধনা। এখনও কিন্তু আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়নি। মনটা পুরোপুরি তদ্ভাবগত হয়ে গেছে। তখন কি করতে হবে? *লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি*, ওই অক্ষর ব্রহ্মকে তুমি লক্ষ্য করে বেধন কর, মানে তাঁকে তুমি জান, জেনে তাঁর সাথে এক হয়ে যাও।

তাহলে কি দাঁড়াল। ওঁ হল ধনু, জীবাত্মা বাণ। কিন্তু এটা সেই জীবাত্মা নয়, তোমার যে অহং বোধ, যেটা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেটাকে শম, দম, উপরতি ইত্যাদি উপাসনার দ্বারা সংস্কার করার পর যে শুদ্ধ জীবাত্মা হবে সেই জীবাত্মা হল বাণ। ধনু হয়ে গেল, আর বাণও এসে গেছে। এবার ধনুর দড়িতে বাণটাকে রেখে টানা হবে, *আয়ম্য*। কি টানবে, তোমার ইন্দ্রিয় আর অন্তঃকরণকে তাদের নিজস্ব বিষয় থেকে টেনে সরিয়ে আনবে। আর যেমন লক্ষ্যের প্রতি মনটা স্থির হয়ে যায় ঠিক তেমনি *তদ্ভাবগতেন*, অর্থাৎ ব্রহ্মভাব ছাড়া অন্য কোন ভাব সেখানে থাকবে না। ব্রহ্মের ভাবই কেন শুধু থাকবে? কারণ ওইটাই লক্ষ্য, লক্ষ্য আর তুমি এক, এই ভাবের মধ্যে তদ্‌গত হয়ে যাও। এটা করার পর এবার তুমি টার্গেটে হিট কর। দুই নং মন্ত্রে যেমন বলা হয়েছে *সোম্য তদ্বিদ্ধি*, বেধন কর। কিভাবে বেধন করতে হবে তিন নং মন্ত্রে বলে দিলেন। যেটাকে ধনু বলা হয়েছে আর তার যে ফল তার বর্ণনা পরের মন্ত্রে করছেন –

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।।২/২/৪।।

(ওঁঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই শর, ব্রহ্ম ঐ শরের লক্ষ্য। প্রমাদহীন হয়ে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে। তারপর শরের মত লক্ষ্যের সাথে অভিন্ন হয়ে যাবে।)

এটাই ব্রহ্মের সাধনা। *প্রণবো ধনুঃ*, প্রণব হল ধনু, *শরো হ্যাত্মা*, ভেতরে যে আত্মা তা হল বাণ। *ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে*, লক্ষ্য হল ব্রহ্ম। *অপ্রমত্তেন*, একটুও মনকে বিচলিত না করে *বেদ্ধব্যং*, বেধন কর যাতে *শরবত্তন্ময়ো* ভবেৎ। একটা বাণ যখন ধনু থেকে ছাড়া পেয়ে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়ে আসছে, ধাবিত হয়ে শেষে যখন লক্ষ্যকে বেধন করে দিচ্ছে তখন লক্ষ্য আর বাণ দুটো এক হয়ে যায়। এটা একটা উপমার দ্বারা বোঝান হচ্ছে। কঠোপনিষদে আবার একেই অন্য উপমা দিয়ে বলছেন – *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল প্রক্ষিপ্ত করলে যেমন দুটো জল মিলে এক হয়ে যায়। ঠিক তেমনি টার্গেটে একটা বুলেট ছোঁড়া হল, এবার টার্গেট আর বুলেট মিলে এক হয়ে গেল। এর অর্থ তো খুবই সহজ কিন্তু ধারণা করাটাই অত্যন্ত কঠিন। ধারণা করার জন্য পাথরে ড্রিলিং করার মত তিল তিল করে খাটতে হয়।

এখানে যে আত্মাকে বাণ বলা হচ্ছে এই আত্মাকে বলা হয় সোপাধিক, অর্থাৎ উপাধি সহিত। আসলে আত্মা আর ব্রহ্মের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, এঁরা অভিন্ন। তফাৎ হল নিরুপাধিক আর সোপাধিকে। উপাধি সহিত যখন থাকে তখন তাঁকে বলছেন জীবাত্মা। উপাধি সরিয়ে দিলে সেটাই পরমাত্মা। শুদ্ধ চৈতন্য যখন কোন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন যে কোন কারণেই হোক সেই শুদ্ধ চৈতন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় আর দেহের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আর শরীর এদের নিজস্ব কোন চেতনা নেই। কিন্তু এরা যে চেতনা সম্পন্ন মনে হচ্ছে সেই চেতনাটা আসছে শুদ্ধ আত্মা থেকে। এখন আত্মা যে কোন কারণেই হোক, তাকে আমরা শুদ্ধ আত্মার বোকামি বলতে পারি, মায়া বলতে পারি বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলতে পারি, কিন্তু নিজেকে মনে করছে আমি আর ও এক। স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনের থেকে আলাদা কিন্তু মনে করে আমরা এক, স্বামীর দুঃখ-কষ্ট স্ত্রীর দুঃখ-কষ্ট আবার উল্টোটাও হয়। আত্মার ঠিক এই একই দুরবস্থা হয়, যখন সে গায়ের জোরে নিজের উপর একটার একটা উপাধি চাপিয়ে দিতে থাকে। উপাধি মানে যে জিনিষটাকে উপর থেকে আরোপিত করা হয়েছে। আমি অমুক ব্যক্তি, আমি সন্ন্যাসী, আমি আচার্য এগুলো এক একটি উপাধি। কিন্তু

আমি তো শুদ্ধ আত্মা ছাড়া কিছু নই, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী এই উপাধিটা বাইরে থেকে আমার উপরে চেপে যাচ্ছে। আর যার যত উপাধি তার তত সমস্যা।

উপনিষদে ওঁঙ্কার অনেকবার ঘুরে ঘুরে আলোচনার মধ্যে এসে যায়। ওঁএর ব্যাখ্যা এর আগেও করা হয়েছে। ওঁই হল ব্রহ্ম, তাঁর বাচক। ব্রহ্ম বাচ্য আর তাঁর বাচক ওঁ। যেমন CO^2 বলতে কার্বোনডাই অক্সাইড বোঝায় তেমনি ওঁ বলতে ব্রহ্মকেই বোঝান হচ্ছে। আর CO^2 বলতে কার্বোনডাই অক্সাইডের যত প্রপার্টিস আছে সবটাকেই বোঝা, ঠিক তেমনি ওঁ হল ব্রহ্মের প্রতীক। 'অ' 'উ' আর 'ম' এই তিনটে মিলিয়ে ওঁ। 'অ' শুরু হয় কণ্ঠে আর 'উ' শব্দ মুখের ভেতর ঘোরে, আর 'ম' ঠোঁটে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের বর্ণমালাও এই 'অ' দিয়ে শুরু হয়ে 'ম' তে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। য, র, ল, ব, এগুলো শব্দের মধ্যে গণ্য করা হয় না। আর 'উ' মুখের মধ্যে ঘুরছে। তাই 'উ' দিয়ে ক, খ, গ, ঘ যত শব্দ আছে সবটাকেই বোঝায়। 'অ' আর 'ম'য়ের মাঝখানে 'উ' শব্দটা ঘুরছে, এই তিনটে মিলে হয়ে যায় ওঁ।

জগতে যত রকমের বস্তু আছে সব বস্তুরই একটা নাম আছে। নাম মানে শব্দ, আর জগতের সমস্ত শব্দ ওঁ এর মধ্যে বাঁধা। যেমন আমি বললাম বোতল – ব, ও, ত আর ল সব কটি শব্দ 'অ' আর 'ম' এর মধ্যে আবদ্ধ, আর 'উ' টা এই এতটুকুর মধ্যেই ঘুরছে। যেমন আমরা ইংরাজীতে অনেক সময় বলি He knows A to Z। এই যে A to Z যেটা ঘুরছে, তেমনি এখানেও 'অ', 'উ' আর 'ম'তে ব্রহ্মাণ্ডের সব শব্দ ঘুরছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের শব্দ হতে পারে সবটাই ওঁ এর মধ্যে বাঁধা।

অন্য দিকে যত রকমের বস্তু সবই ব্রহ্মের মধ্যে বাঁধা, ওঁ তাই ব্রহ্মের ঠিক ঠিক বাচক। নাম আর নামী যেমন অভেদ তেমনি ব্রহ্ম আর ওঁ এক। এই ওঁ কেই ধনু রূপে ধারণ করতে বলছেন। আচার্য বলছেন *প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণস্তদালম্বনো*। মানুষ নিজেকে যখন সংস্কার করে, কিভাবে করে? ওঁ এর অভ্যাস করে। ওঁ এর অভ্যাস মানে ওঁ এর জপ করা। বলছেন ওঁ এর জপ ও ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হয়, মনের যত ময়লা আবর্জনা আছে সব ধুয়ে মুছে সাফ্ করে দেওয়া হয়। কোন জিনিষকে সংস্কার করা মানে সেই জিনিষটাকে শুদ্ধ করা। মনকে শুদ্ধ করার উপায় ওঁ এর জপ ও চিন্তন করা। বলছেন, এই ওঁ কে দিয়ে যখন মনকে সংস্কার করা হয় আর লক্ষ্য যেখানে ব্রহ্ম তখন কি হয় – *অপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেহবতিষ্ঠতে*, তখন তার লক্ষ্য অপ্রতিবন্ধকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তাকে আর কোন কিছু দিয়ে আটকে রাখা যায় না। মন্ত্র জপ ও ধ্যান সাধনা করে করে মন যখন শুদ্ধ হয়ে যাবে তখন তাকে সোজা একেবারে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে, এই যাওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

ধনু থেকে বাণ ছেড়ে দেওয়ার পর বাণ যেমন লক্ষ্যের দিকে চলে যায় ঠিক তেমনি এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য লক্ষ্যে চলে যায়। এই জীবাত্মা কি? এখানে আচার্য বলছেন *সূর্যাদিবদিহ প্রবিষ্টো দেহে সর্ববৌদ্ধপ্রত্যয়সাক্ষিতয়া*। জলের মধ্যে যে প্রতিফলিত সূর্য দেখছি সেটা আসল সূর্য নয়, প্রতিবিম্বিত সূর্য। ঠিক তেমনি যত দেহ আছে সেই দেহকে জীবন্ত বলে দেখছি, তার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, আর তার জীবন যে চালিত হচ্ছে এবং তার পেছনে যিনি সাক্ষী তিনিই হলেন আসল সূর্য। আত্মা তো কোন কিছুতে নিজেকে জড়ায় না, তিনি সাক্ষী, আচার্য তাই বলছেন তিন হলেন *বৌদ্ধপ্রত্যয়সাক্ষিতয়া*। এই যে দেহটাকে জীবন্ত দেখাচ্ছে, বৌদ্ধ প্রতীতি হচ্ছে, তার মধ্যে যে চেতনার প্রতীতি হচ্ছে, তার পেছন যিনি আছেন তিনি হলেন সাক্ষী চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্য যদি সাক্ষীস্বরূপ না হত তাহলে তো সব সময় জড়িয়েই থাকত, কোন দিন আর এই শরীরকে ছাড়তে পারতো না। আসলে তিনি সাক্ষীস্বরূপ, কোন কিছুর সঙ্গেই নিজেকে জড়াবেন না, অথচ তাঁর জন্যই এই দেহ, জীবন সব কিছু চলছে। এই সাক্ষী চৈতন্যকেই বলা হয় আত্মা। মূল কথা হল ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু সেই ব্রহ্মের যে চৈতন্য প্রত্যেকটি দেহের মধ্যে প্রবেশ করে থাকেন, সাক্ষী রূপে তাঁরই প্রতীতি হয় জীবন রূপে। আমরা যে প্রত্যেকটি দেহকে একজন নামধারী বলে দেখছি, তার ভেতরে সেই শুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্য আছেন বলেই তাকে আমরা ঐ নামধারী রূপে জানছি। ভেতরে এই শুদ্ধ চৈতন্য না থাকলে শরীরটা একটা মৃত শরীর হয়ে যাবে, পঞ্চভূতের শরীর বলে দেহটাকে তখন আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। এই বৌদ্ধ প্রতীতি,

জীবন যেটা আমরা দেখছি, এই জীবনের পেছনে যিনি আছেন তিনি কিন্তু সাক্ষী চৈতন্য। যিনি সাক্ষী তিনি কোন কিছুতেই জড়ান না। কিন্তু সে মনে করে নেয় আমি জড়িয়ে আছি, কিন্তু আসলে কখনই জড়ায় না।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে, এই মন্ত্র গুলো খুবই জটিল। যখন আমরা বলছি আত্মা বাণ আর ব্রহ্ম লক্ষ্য, দ্বৈতবাদীরা একে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে সঙ্গে সঙ্গে বলবে, এই তো উপনিষদেই দেখাচ্ছে আত্মা আর ব্রহ্ম আলাদা, বাণ আলাদা বাণের লক্ষ্য আলাদা। যাঁরা ভাষ্যকার তাঁদের একটা মত থাকে, তাঁরা বলেন উপনিষদের বক্তব্য এই। আচার্যের মতে উপনিষদের বক্তব্য হল ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু এখানে এসে বিপরীত কথা এসে যাচ্ছে। জীবাত্মাকে আলাদা বলা হচ্ছে, ব্রহ্মকে আলাদা করে বলছেন, আর বলছেন জীবাত্মা গুলির মত টার্গেটে গিয়ে হিট করবে, তারপর তোমার যাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়ে ঈশ্বর পর্যন্ত যাবে। আচার্য তখন বলবেন, না, জিনিষটাকে ওইভাবে দেখলে হবে না। কিভাবে দেখতে বলছেন? এই যে জীবাত্মা এটা ব্রহ্মের নিজেরই আত্মা, নিজেরই স্বরূপভূত অক্ষর ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট করে। যিনি তাঁর মনকে সমাহিত করতে চাইছেন, এই যে মনকে সমাহিত করতে চাইছেন এখানে তাঁর এই বোধটা আছে যে আমি আলাদা। আর লক্ষ্য রূপে কি দেখাচ্ছে? লক্ষ্য রূপে ঈশ্বরকে দেখাচ্ছে বা লক্ষ্য রূপে ব্রহ্মকে বা সেই স্বরূপকে দেখাচ্ছে। এখন যিনি সমাহিত করতে চাইছেন তিনি চাইছেন আমি ওখানে পৌঁছাব, আমি তাঁর সঙ্গে একাত্ম বোধ করব, এই কারণে এইভাবে বলা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে যে দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে তা নয়। আচার্য শঙ্কর সেইজন্য সব সময় দুটো সত্তার কথা বলছে, একটা পারমার্থিক সত্তা, আরেকটি ব্যবহারিক সত্তা। পারমার্থিক সত্তাতে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। দুটো মন্ত্রের পরে আচার্য দেখিয়ে দেবেন পারমার্থিক সত্তাতে কিভাবে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা, যেখানে আমি আপনি আলাদা সেটাকে তিনি কখনই অস্বীকার করছেন না। সাধনা যখন শুরু হয় তখন সাধক ভালোভাবেই জানছে যে আমি আর আমার ইষ্ট আলাদা। কিন্তু সাধনা করতে করতে একটা অবস্থার পর দেখে দুটো এক। এখানে সাধনার প্রাথমিক অবস্থার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বলা হচ্ছে। পতঞ্জলী যোগসূত্রের প্রথম সূত্রেই বলছেন *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, এই চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে যিনি মনকে সমাহিত করতে চাইছেন তাঁর কাছে লক্ষ্য ব্রহ্ম আর তিনি পুরো আলাদা মনে হবে। আসলে দুটো আলাদা নয়। কারণ কয়েকটা মন্ত্রের পরেই দেখান হবে দুটো এক।

অপ্রমত্তেন এই শব্দটা সাধনার জন্য খুব মূল্যবান। কঠোপনিষদে বলছেন – *নাবিরতো দুশ্চরিতান্নশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।*১/২/২৪।। যিনি সাধক হবেন তাঁকে কি কি জিনিষ প্রথমে করতে হবে কঠোপনিষদে বলা হচ্ছে – *নাবিরতো দুশ্চরিতান্*, দুষ্ট কর্ম, বাজে কর্ম করা থেকে সে এখন বিরত হয়নি, তার দ্বারা সাধনা হবে না। *নশান্তো*, এখনো ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল, *নাসমাহিতঃ*, তার মন এখন ছটফট করছে। *নাশান্তমানসো*, সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে, সে পাপাচার থেকে সরে এসেছে, ইন্দ্রিয়গুলো শান্ত, মন স্থির হয়ে গেছে কিন্তু এখনও আমার সমাধি হল না, এখনও আমার সিদ্ধি হল না ভেবে ছটফট করছে এর দ্বারাও সিদ্ধি হবে না। এগুলোকে এক কথায় বলা হয় প্রমত্ত। প্রমত্ত মানে যার মধ্যে ইন্দ্রিয় ও মনের চঞ্চলতা রয়েছে। আচার্য অপ্রমত্তের অর্থ এইভাবে করছেন – *বাহ্যবিষয়োপলব্ধিতৃষ্ণাপ্রমাদবর্জিত*, বাহ্য জগতের বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় ও মনের যে তৃষ্ণা এটাই প্রমাদ। বাহ্য জগতের ভোগ্য বিষয় ঠাকুরের ভাষায় খুব সহজ – কামিনী আর কাঞ্চন। কিন্তু এখানেই ভোগের তালিকা শেষ হয়ে যায় না। এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন সুতোর একটু আঁশ যদি বেরিয়ে থাকে তাহলে ছুঁচের মধ্যে সুতোকে প্রবেশ করান যায় না। ঠাকুর আবার এও বলছেন – মা যাকে বাঁধতে চান বেড়াল পুষিয়ে তাকে মায়াতে আবদ্ধ করেন। কত নিঃসন্তান বিধবা আছে, কত অবিবাহিত আছে, এদের কোথাও কোন বন্ধন নেই কিন্তু তাও ঈশ্বরের দিকে মন যায় না। কিছু না হলে, দুটো পাখি পুষে নিয়েছে, নয়তো দুটো বেড়াল বা কুকুর পুষে নিয়ে এদেরকে অবলম্বন করেই ঘর-সংসার ফেঁদে বসেছে। এই যে আচার্য বলছেন *বাহ্যবিষয়োপলব্ধিতৃষ্ণা*, কিন্তু এগুলো কি তৃষ্ণা? হ্যাঁ, তৃষ্ণাই। মানুষ চায় ভালোবাসা। ভালোবাসা থেকে বেরোতে পারে না। যখন টাকা-পয়সা থাকে তখন ভাবে টাকা-পয়সা দিয়ে ভালোবাসা কিনে নেব। তখন নাতি-পোতা, ভাইপো-ভাইঝিদের নানান রকমের উপহার দিয়ে ভরিয়ে দেয় যাতে তারা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু ভালোবাসা কি কখন কেনা যায়! এক মহিলা তিন চারটে বিয়ে করার পর বিরক্ত

হয়ে ক্ষোভের সাথে বলল এই পুরুষ মানুষদের বিশ্বাস করা যায় না। এরপর চার্চে গিয়ে মহিলা একটা কুকুরকে বিয়ে করে নিল। কুকুরকে বিয়ে করে এখন কুকুরের সাথেই থাকছে, আর বলছে এ আর যাই হোক বিশ্বস্ত। মানুষ ভালোবাসা চায় বলে যেখানেই ভালোবাসা পাবে সেখানেই ছুটে যাবে। অপরূপা সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে একটা ট্রাকের ক্লিনারকে ভালোবেসে বিয়ে করে বসছে, আবার বিদ্বান সুপুরুষ কোথা থেকে একটা প্রেতনীকে ধরে বউ করে এনে বাড়িতে ঢোকাচ্ছে। কি করে সম্ভব হচ্ছে সেটা অন্য ব্যপার কিন্তু মানুষ মাত্রই ভালোবাসা চায়। এটাই হল *বাহ্যবিষয়োপলব্ধিতৃষ্ণা*। সব কিছুতে ভালোবাসা চাইছে। যখন মানুষের থেকে পায়না তখন সেটাই বেড়াল কুকুরে নেমে আসে। যখন সেটাও পায়না তখন গাছপালাতে নেমে যায়। তখন বলে আমার গাছ, আমার ফুল আমার সাথে কথা বলে, ভালোবাসাটা সেখানে নেমে যাচ্ছে। এটাই মূল। কিন্তু যখনই চাই চাই করে বেড়াচ্ছে, টাকা চাই, গাড়ি চাই, বাড়ি চাই তখন মনে হয় এগুলো থেকে সে আনন্দ পাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনন্দ পায় না। এই যে আনন্দ পাওয়ার ইচ্ছা, এই আনন্দটাই বিষয় সুখে চলে যায়।

যে কোন ধরণের তৃষ্ণা, আমি জগৎ থেকে ভালোবাসা পেতে চাইছি, এই তৃষ্ণাও থাকবে না। পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হতে হবে। দশটি ইন্দ্রিয় আর মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের সবটাই প্রমাদরহিত হবে। কোথাও তার কোন ধরণের চাঞ্চল্যতা থাকবে না। তার এই মনোভাব থাকবে – বাইরের জগৎ থেকে আমার কিছু পাবার নেই। কিছুই যখন পাবার ইচ্ছা নেই, সেতো সব কিছু থেকে মনকে টেনে নিয়ে এসেছে। এবার তার কি হবে? স্বাভাবিক ভাবেই সে একাগ্রচিত্ত হয়ে যাবে। রাজযোগে বলছে, বাইরের সব কিছু থেকে মনকে টেনে নিয়ে এসেছে তাই বলে যে তার এখন ঈশ্বরে মন যাবে তা নয়। একজন অচেতন হয়ে আছে, তার ইন্দ্রিয় বন্ধ, মন কোন কাজ করছে না। তাই বলে কি তার মধ্যে ঈশ্বরের চেতনা বোধ হচ্ছে? কখনই হবে না। সেইজন্য নিদ্রা, ব্যাধি, স্ত্যান, আলস্য ইত্যাদিকে রাজযোগে যোগের বিঘ্ন বলা হচ্ছে। এখানে কিন্তু তাদের কথাই বলা হচ্ছে যারা সচেতন ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সাধনা করছেন, যারা জোর করে ইন্দ্রিয় ও মনকে বাহ্যবিষয় থেকে টেনে নিয়ে একাগ্রচিত্ত হয়েছেন।

একাগ্রচিত্তের পরের ধাপ হল *বেদ্ধব্য*, নিজের আত্মার সাথে নিজেকে এক করে থাক। বেলুড় মঠ থেকে যিনি দীক্ষা নিচ্ছেন তাঁকে বলে দেওয়া হয় ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম বোধ নিয়ে জপ ধ্যান করতে। *বেদ্ধব্য* মানে, প্রথম বাণ ছিল তুণিরে, সেখান থেকে এল ধনুর ছিলায়, সেখান থেকে চলে গেল লক্ষ্যে, লক্ষ্যের সঙ্গে এক হয়ে গেল। ঠিক তেমনি, এখানে আচার্য বলছেন *দেহাদ্যাত্মাতাপ্রত্যয়তিরস্করণেনাক্ষরৈকাত্মত্বং*, দেহাদিতে যে আত্মত্বের প্রতীতি হচ্ছে, যেমন যদি আমার নাম ধরে বলা হয় দেবদত্ত কে? আমিই দেবদত্ত। দেবদত্ত বলতে আমি কাকে বুঝবো? এই দেহ-মনের সঙ্ঘাতে যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকেই আমি দেবদত্ত বলে জানছি। এই দেহের মধ্যেই আত্মা প্রতীতি হচ্ছে। আমি যখনই বলছি আমি অমুক, তখন আমার সব সময়ই বোধ হবে এই আমার দেহ। আমি এসেছি যখনই বলছি তার মানে আমার এই দেহটা এসেছে। কিন্তু আমি যদি নিজেকে শুদ্ধ আত্মা মনে করি আর সেই শুদ্ধ আত্মা ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন, তাহলে আমি কোথায় যাব? আমি তো সর্বত্র, সব জায়গাতে সব সময়ই আছি। অনেকেই অবশ্য বলে যে, আমি তো সব সময় তোমার কাছেই আছি। এগুলো শুধু মুখের কথা, আর তা নাহলে কপটতা। ঠাকুর দেশে গেছেন। তাঁতিরা ঠাকুরকে দেখে নিজেরা পরস্পর বলছে ইনি কোন্ কৃষ্ণ মানেন। ঠাকুর বলছেন – এদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। আসলে ঠাকুর বলতে চাইছেন, তুমি তাঁতির কাজ করছ, তোমার মন এখন বিষয়ে পড়ে আছে। এরা এখানে সেখানে শুনেছে নানান রকমের কৃষ্ণ আছে, এখন তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে ইনি কোন্ কৃষ্ণকে মানেন। অনেককে কিছু খাবার দিলে বলবে – আমাকে দিতে হবে না, তুমি খাও তোমার মুখ দিয়ে আমিই খাবো। এগুলো কথার কথা। তার কি বোধ হয়েছে আমি আর সে এক? কোন বোধ নেই, তোতা পাখির মত বুলি শিখে নিয়েছে।

যখনই আমি বোধ হয় তখন প্রথম আসে দেহ, দেহ থেকে একটু যে ছাড়িয়েছে সে মনের সাথে এক হয়ে আছে। এটাই আচার্য বলছে *দেহাদ্যাত্মাতাপ্রত্যয়*, আমার যে প্রত্যয় আমি কে, আমি বোধ, এটা সব সময়

নিজের দেহবুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এটাকে তিরস্কার করে ছেড়ে দিচ্ছেন। কখন ছাড়ছেন? যখন ওই বাণটাকে ছাড়া হল। এই যে এত লম্বা আলোচনা করা হচ্ছে, এখানে একটাই মূল কথা সাধনা করতে হবে। বাহ্য জগতে যত ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় রয়েছে, আর তাদের প্রতি যে তীব্র তৃষ্ণা রয়েছে, সেখান থেকে তোমার মনকে সরিয়ে নিয়ে এস। তার আগে ওঁএর জপ কর, ওঁ ধ্যানের অভ্যাস কর আর সেই অক্ষর ব্রহ্মে নিজের মনকে একাগ্র কর। তখন দেহাদিতে যে আত্মপ্রত্যয় সেটা তিরস্কৃত হয়ে যাবে, মানে খসে পড়ে যায়। এই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি খসে পড়ে গেলে অবিনাশী অক্ষর ব্রহ্মের সাথে ঐক্যরূপ ফল লাভ করে। দেহের প্রতি আমি বোধটা চলে গিয়ে ব্রহ্মে সেই আমি বোধটা চলে আসে। এই আমি আর আগের সেই আমি না। তখন সে হয়ে যায় *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*, তার দেহ কেটে দিচ্ছে, গলা কেটে দিচ্ছে বা সে কারুর গলা কেটে দিচ্ছে তাতে তার কিছুই যায় আসে না।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে জিনিষগুলো আলোচনা করছি, আসলে এখানে পরা বিদ্যাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এই ব্রহ্মজ্ঞান হল পরা বিদ্যা। এই ব্রহ্মজ্ঞান কিভাবে হয় সেটাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, জগতের সব কিছুর প্রতি যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা থেকে তোমার মনকে সরিয়ে নিয়ে এস। সরিয়ে আনার পর ওঁ সাধনা কর। ওঁ সাধনা করার পরে তুমি চেষ্টা কর তোমার দেহাদিতে যে তোমার আত্মপ্রীতি আছে সেটাকে কেটে উড়িয়ে দিয়ে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যেতে। বাণ আর লক্ষ্য এই দুটো মিলে যেমন এক হয়ে যায়, ঠিক সেই রকম তোমার আমিত্বটাকে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাবে। এখন যেটা বলছ আমি দেহ তখন সেটাই পাল্টে গিয়ে হয়ে যাবে আমি ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি। দেখতে গেলে মূল যাত্রা পথটা বিরাট কিছু লম্বা নয়। এই দেহ আছে, দেহের মধ্যে আত্মা আছে আর বুদ্ধিও আছে। বুদ্ধি দেহটাকে আমি বলে ভাবছে, ওখান থেকে ঘুরে আত্মার দিকে তাকালে দেখবে আত্মাই আমি। এটুকু মোর ঘোরানর জন্য এত কিছু করতে হচ্ছে। ঠাকুর এটাকেই একটু ঘুরিয়ে বলছেন – সার্জেন্টের হাতে লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলোতে সার্জেন্ট সবাইকে দেখতে পায়, এক অপরকে দেখতে পায় কিন্তু সার্জেন্টকে কেউ দেখতে পায় না। কেউ হয়ত সার্জেন্ট সাহেবকে প্রার্থনা করল, সাহেব আলোটা একবার তোমার মুখের উপর ধর যাতে আমি তোমাকে দেখতে পাই। সার্জেন্ট আলোটা নিজের মুখের দিকে ধরলে জগৎটা অন্ধকারে চলে যাবে আর আলোতে সাহেবের মুখটা দেখতে পাবে। সাধনা মানে তাই। এই যে আত্মার আলো, এই আলোতে মানুষ নিজেকে দেখতে পারছে এবং এক অপরকে দেখতে পারছে। এই আলোটাকে ঘুরিয়ে দাও, ঘুরিয়ে দিলেই আত্মাকে দেখতে পাবে। দুটোই নিজের ভেতরে, দেহ যেখানে আত্মাও সেখানে। এইটাই পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যাতে জগৎ চলছে আর পরা বিদ্যাতে অন্তর্জগতের স্বামীকে দেখতে পারছে। এইটাই মূল বক্তব্য।

এই ঘুরিয়ে দেওয়ার সাধনাটা কিভাবে হবে বলতে গিয়ে বলছেন যতক্ষণ তোমার বিষয়তৃষ্ণা আছে ততক্ষণ তোমার কিছুই হবে না। বিষয়তৃষ্ণা থেকে কিভাবে বেরোবে? স্বামীজী বলছেন Either by fight or by flight। জয় কর আর তা নাহলে ওখান থেকে পালাও। যে কোন প্রলোভন যখন সামনে আসছে তখন হয় ওই প্রলোভনকে জয় কর আর নয়তো ওখান থেকে পালাও। এই দুটো ছাড়া কোন গতি নেই। প্রলোভন যখনই কোন সাধু, সন্ন্যাসী, যোগীর সামনে আসে তখন হয় তিনি ওটাকে জয় করে নিয়ে তার পারে চলে যান, তাকে প্রলোভন আর কিছু করতে পারেনা। জয় করতে না পারলে সেখান থেকে পালায়।

ঠাকুর আবার বলছেন – ছোটখাটো বাসনাগুলোকে মিটিয়ে নিতে হয়, মিটিয়ে নিতে দোষ নেই। একবার এ্যারোপ্লেনে চড়ার ইচ্ছে হল, একবার প্লেনে চড়ে নিলাম হয়ে গেল। এগুলো দোষের মধ্যে নয়। না মিটলে মন খুঁতখুঁত করতে থাকবে, তার চাইতে বরং একবার করে নিয়ে খুঁতখুঁতানিটা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, কামিনী-কাঞ্চনের বেঁধে নেওয়ার ক্ষমতাটা প্রবল। আমি কোন দিন প্লেনে চাপিনি একবার চেপে নিলাম, বিরিয়ানি কোন দিন খাইনি একবার খেয়ে দেখে নিলাম, এগুলো আমাকে বাঁধবে না। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ এগুলোর বেঁধে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে। যেমনি এগুলোতে নেমে পড়বে আবার তার সেটাই করতে ইচ্ছে হবে। সব শেষে ইচ্ছে হবে এটা আমারই হোক অপরের যেন না হয়।

একটা ছেলে একটা মেয়েকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে ভাবছে মেয়েটি যদি আমার দিকে একবারটি তাকায়, তারপর যখন তাকাল তখন মনে হবে মেয়েটি যেন আর কারুর দিকে না তাকায়। টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। একজন লোক শিবের পূজা করে শিবকে খুশী করেছে। শিব তার প্রার্থনা কি জানতে চাইলে বলল আমার যেন অনেক সম্পত্তি হয়। শিব বললেন, খুব ভালো কথা, তবে তুমি যা যা সম্পত্তি চাইবে তার দ্বিগুণ তোমার প্রতিবেশীর হবে। লোকটি এবার বলল আমার হাজার টাকা হোক, তার হাজার টাকা হয়ে গেল সাথে সাথে তার প্রতিবেশীর দু হাজার টাকা হয়ে গেছে। এর একটুও আনন্দ নেই যে আমি হাজার টাকা পেয়েছি, পাশের বাড়ির দু হাজার টাকা হয়ে গেছে। আমার দুটো গরু হোক, ওর চারটে গরু হয়ে গেছে। যেটাই চাইছে তার দ্বিগুণ পাশের বাড়ির হয়ে যাচ্ছে। তার তো এখন অশান্তির শেষ নেই। শেষে লোকটা এত দুষ্ট প্রকৃতির যে বলছে আমার একটা চোখ অন্ধ হয়ে যাক, তাহলে প্রতিবেশীর দুটো চোখই যাবে। তারপর দেখা গেল, এর একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেলে পাশের বাড়ি কিছুই হয়নি। মানুষ সব সময় নিজের কাছে কি আছে দেখে না, সব সময় দেখে অপরের কাছে কি আছে। সেটা দেখেই সব সময় কষ্ট পায়। নাম-যশের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ। আমার নাম-যশ না হোক অপরের যেন নাম-যশ না হয়। এই যে তিনটে কামিনী, কাঞ্চন আর নাম-যশ, এদের বাঁধার ক্ষমতা প্রচণ্ড। অন্য গুলো বাঁধতে পারে না। আবার কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশের পথ খুব পিচ্ছিল ও খানা-খন্দরে পূর্ণ। যারাই কামিনী-কাঞ্চনের পথে পা বাড়িয়েছে তারাই তাদের পথে গর্ত খুড়ে রেখেছে। যারাই এই তিনটের যে কোন একটির পেছনে, টাকার পেছনে, নারীর পেছনে বা নাম-যশের পেছনে ছুটছে তাদের দেখে করুণা হওয়া উচিৎ, এরা মরতে চলেছে। আচার্যও পরে বলবেন শেষে এদের কি দুর্গতি হয়।

সাধনার উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বরূপ ফল প্রাপ্তি। আচার্য পরের মন্ত্রের ভাষ্যে উপনিষদের ব্যাপারে বলছেন *অক্ষরস্যৈব দুর্লক্ষ্যত্বাৎ পুনঃপুনর্বচনং সুলক্ষণার্থম্*। এই যে অক্ষর ব্রহ্মের ব্যাপারে এত কথা বলা হচ্ছে, এই অক্ষর ব্রহ্মটা কি? বলছেন *দুর্লক্ষ্যত্বাৎ*, ব্রহ্মকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য *পুনঃপুনর্বচনং*, উপনিষদ তাই বার বার এই ব্রহ্মের বিষয়ে নানা ভাবে নানান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে, যাতে মানুষের মাথার মধ্যে জিনিষটা স্থায়ী ভাবে বসে যায়। হৃদয়রাম ঠাকুরকে বলছেন 'মামা! তুমি একই কথা বার বার বলো কেন'? ঠাকুর বলছেন 'শালা! আমি একই কথা একশ বার বলব তাতে তোর কি'। তা নাহলে ধারণা করা যায় না। এতক্ষণ ধনু, বাণ, লক্ষ্য দিয়ে অনেক উপমা দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে এবার আরেকটি উপমার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আত্মজ্ঞানের বিষয়টা একেবারে *দুর্লক্ষ্যত্বাৎ*, ধারণা করা যায় না। সেইজন্য বার বার বিভিন্ন ভাবে বলতে হচ্ছে। পরের মন্ত্রে আবার অন্য ভাবে ঘুরিয়ে বলছেন –

যস্মিন দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষা সেতুঃ।।২/২/৫।।

(যে অক্ষর পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ও সর্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়বর্গসহ অন্তঃকরণ সমর্পিত, সেই সমস্তের আধারস্বরূপ সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে জান আর অন্য সব বাক্য পরিত্যাগ কর। অমৃতত্ব লাভের এটাই উপায়।)

এই যে কথাগুলো বলা হল, *এষ অমৃতস্য সেতুঃ*, এই কথাগুলো অমৃতের সেতু। সেতু দুটো অর্থে হয়, একটা বাঁধের অর্থে হয় আর একটি পারাপার করার পুলের অর্থে হয়। আমাদের সামনে যে জন্ম-মৃত্যুরূপ সাগর রয়েছে, যে সাগরে সমস্ত জগৎ হাবুডুবু খাচ্ছে, এই সাগরকে পেরিয়ে যাবার জন্য এটি অমৃতের সেতু।

পুরো উপনিষদ মূলতঃ পারমার্থিক সত্যকে নিয়েই আলোচনা করছে। উপনিষদ ছাড়া অন্য যত দর্শন আছে, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস আছে সবাই সত্যকে জানতে চাইছে। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটল। এ্যারিস্টটল যে পদ্ধতি নিজের দর্শনকে যৌক্তিকতায় প্রতিষ্ঠিত করতে অবলম্বন করেছিলেন, বলছেন এই পদ্ধতিটাই হল যে কোন সত্যকে জানার একমাত্র উপায়। একটা খুন হল, সিবিআই জানতে চাইছে

খুনের পেছনে সত্যটা কি। খবরের কাগজের লোকরা জানতে চাইছে সত্যটা কি। একটা কবিতা পড়ে জানতে চাইছে এই কবিতার অর্থটা কি, মানে সত্যটা কি। উপনিষদও বলছেন চরমতম সত্যটা কি, যেটাকে বলা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্য। কিন্তু সমস্যা হল আজকে বিজ্ঞান বা অন্য যেই কেউই যেটাকে সত্য বলে সামনে নিয়ে আসছে, কদিন পর দেখা গেলে সেই সত্যটাকে মানা যাচ্ছে না, সত্যটা পাল্টে অন্য দিকে ঘুরে গেছে। উপনিষদ এই সব সত্যের উদ্‌ঘাটন করছে না। উপনিষদ যে সত্যকে নিয়ে আসছে এই সত্যকে ধারণা করা খুব কঠিন। ধারণার আগে বোঝাটাও অত্যন্ত কঠিন। আচার্য শব্দটা বলছেন *দুর্লক্ষ্যত্বাৎ*, বোঝাটাও অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য উপনিষদ একই কথা বার বার বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন।

পাঁচ নম্বর মন্ত্র শিষ্যের প্রতি গুরুর নির্দেশ। মুণ্ডকোপনিষদে প্রথমে দেখান হল অপরা বিদ্যাটা কি। পরে পরা বিদ্যার কথা বলে শেষে পরা বিদ্যার ফলটা কি বলে দিলেন। পরা বিদ্যার ফলের কথা বলতে গিয়ে অক্ষর ব্রহ্মের উপর আলোচনাকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু কথা বলার পর বুঝলেন শিষ্য এই কথাগুলো ধরতে পারবে না। তারপর অক্ষর ব্রহ্মের আলোচনা থেকে সরে এসে ব্রহ্মের কার্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। আর অন্তিমে বলছেন কিভাবে সেই অক্ষর ব্রহ্মে পৌঁছান যায়। পরা বিদ্যার ফল, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোচনা করেছেন। এর একটা মাত্র উদ্দেশ্য, উপনিষদ আমাদের সজাগ করিয়ে দিচ্ছেন, তুমি কে? তুমি সেই ব্রহ্মের সাথে এক, এই চেতনাকে তুমি জাগিয়ে রাখ। তোমার বোধে বোধ না হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এই চেতনাটা সব সময় মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা যে আমি আর সেই পরম ব্রহ্ম এক, এই চেতনাটুকুই জীবনের অনেক সমস্যা, বিশেষ করে হতাশা, দুঃখ-কষ্ট থেকে যে নিজেকে দুর্বল করে ফেলছে তাকে তার দুর্বলতাকে দূর করে মহত্ত্বে উত্তোরণ করিয়ে দেবে। উপনিষদ আমাদের এই চেতনাটাকে জাগিয়ে দেয়। আট নং মন্ত্রে বলবেন *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ*, আমাদের হৃদয় গ্রন্থি খুলে যায়, যত রকমের সংশয় নাশ হয়ে যায়। কখন? যখন এই জ্ঞান উপলব্ধি হয়। এই জ্ঞান আমাদের এই জীবনে নাও হতে পারে, আমরা মেনেই চলছি এই জীবনে জ্ঞান উপলব্ধি হবে না। কিন্তু আচার্য গীতার ভাষ্যে বলছেন, যাঁরা এই আত্মতত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন, যাঁদের একটু বোধ হয়েছে যে এই রকম কিছু আছে, তাঁরাও জ্ঞানী পদবাচ্য। আধ্যাত্মিক জগতে যিনি প্রথম পা রাখলেন আচার্য তাঁকেও জ্ঞানী বলছেন। এটুকুতেই জীবনের বিরাট সমস্যার বোঝা লাঘব হতে শুরু করবে। একেই আমাদের সবার পিঠে রয়েছে বিশাল কর্মের বোঝা, তার ওপর আবার সামনে পাথর বাধা হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু যেমনি চিন্তা করলাম আমি তো সেই ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তান, তক্ষুনি সব তুলোর মত হাল্কা হয়ে যাবে। আবার যখন ঈশ্বরের থেকে মন সরে ব্যক্তি আমির উপর চলে আসবে আবার সেটা পাথর হয়ে যাবে। এই পাথর তুলো, তুলো পাথর এই রকমই চলতে থাকবে। এইভাবে চলতে চলতে ওই তুলো বোধটাও চলে যাবে, তখন শুধুই বাতাস, মানে কিছুই নেই। এই বোধটাকে কিভাবে জাগাবে তারই বর্ণনা করা হচ্ছে। এগুলো যে শুধু আধ্যাত্মিক সত্য, আর দার্শনিক তত্ত্বের অনুশীলন চলছে, তা নয়। মানব জীবনে এগুলো পুরোপুরি বাস্তবিক কার্যকরী, এটাই ব্যবহারিক বেদান্ত। অতীতের বহু মহামানবের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই সত্য পরীক্ষিত হয়ে আছে।

গুরু শিষ্যকে বলছেন, এই পথ যদি তুমি অবলম্বন করে চল তাহলে তোমার সমুদয় মঙ্গল হবে। কি পথ? তাঁকে জানার চেষ্টা। অন্য সব কিছু ছেড়ে তাঁকে জানার চেষ্টাতে ঝাঁপ দাও। উপনিষদের সাধনাতে জগৎকেও রাখব আর এই পথকেও অবলম্বন করব, এভাবে দুটো একসাথে কখনই হয় না। ধরি মাছ না ছুঁই পানিতে হবে না, জলে তোমাকে নামতে হবে। কিন্তু নামতে গেলেই জগৎ উড়ে যাবে। জগৎ উড়ে যাওয়া সেটা তো শেষ কথা। অল্প একটু যে অনুশীলন করার কথা বলা হচ্ছে, স্বামীজী বার বার যে Practical Vedant এর কথা বলছেন, এটাই Practical Vedant অর্থাৎ যে সত্যগুলো আছে সেগুলোকে জীবনে প্রয়োগ করা। সেই সত্যের বর্ণনাই এখানে চলছে।

যস্মিন্, যাঁতে, *দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্*, স্বর্গলোক, পৃথিবী আর মাঝখানে অন্তরীক্ষ, *ওতং*, তাঁর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। ইংরাজীতে যাকে স্পেস্ বলছে সেটাকে আমি যেভাবেই চিন্তা করি না কেন, আমি

সাতটা স্বর্গ আনব, না বহির্আকাশে যেখানে তারামণ্ডল, ছায়াপথ আছে সেটাকে মানব তাতে কিছু আসে যায় না। সব কিছু যাঁর মধ্যে রয়েছে, স্পেসের ধারণাই হোক, দেশ, কাল ও পাত্রের এই যে দেশ, যেখানে সৃষ্টির সব কিছু অবস্থিত, পুরো জিনিষটা তাঁর মধ্যেই অবস্থিত। শুধু তাঁর মধ্যেই অবস্থিত নয়, তাঁর একটা খুব ছোট্ট অংশ। মাটিকে জল মিশিয়ে কাদা করা হয়েছে, মাটির মধ্যে এখন জল যেমন ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে, ঠিক তেমনি এই স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মন, প্রাণ সব কিছুর মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন।

তমেবৈকং জানথ আত্মানাম্, ওই আত্মাই একমাত্র আছেন, তাঁকে জানাই একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁকে জানার চেষ্টা কর। স্বামীজীর এই কথাটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে At whom is the Universe, who is in the Universe। রসগোল্লা তৈরী হচ্ছে। রসের কড়াইয়ে রসগোল্লা দেওয়া আছে। রসগোল্লা রসের ভেতরে আর রসগোল্লার ভেতরেও সেই রস, বাইরেও সেই রস ভেতরেও সেই রস। ওই আত্মাকে জান। আর *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, বাকি সব কথা ফেলে দাও। এটাই গীতাতে ভগবান বলছেন *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* আর এখানে বলছেন *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, একই কথা। সব কিছু ছাড়, ছেড়ে ওই এককে ধর। এই আত্মজ্ঞানকে কেন ধরবে? কারণ *অমৃতস্যৈষ সেতুঃ, এষ*, মানে এই জিনিষটা অর্থাৎ এই আত্মজ্ঞান হল অমৃতের সেতু, অমৃতের দিকে নিয়ে যায়। কোথা থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে যায়? *মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়*। এই সংসারে দুটি ভয় – প্রথম ভয় মৃত্যুর ভয়, আর দ্বিতীয় ভয় আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে, পুনর্জন্মের ভয়। পুনর্জন্মের ভয় অবশ্য সবারই হয় না। সবাই মনে মনে আশা করে আমি এর পরের জন্মে ভালো বংশে জন্মাব, পণ্ডিত বংশে জন্ম নেব, ফিল্মস্টার হয়ে জন্মাব। এত সহজে এই আশা যেতে চায় না। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা জন্মাব এটা ভাবলেই আতঙ্কতি হয়ে পড়েন। এই দুটি ভয়। যেখানে এই দুটো জিনিষ হয়ে চলেছে মানুষ মরছে আর মানুষ জন্মাচ্ছে, এটাকে বলে মৃত্যুর সংসার। আর যেখানে জন্ম নেই মৃত্যুও নেই সেটাকে বলছেন অমৃত। এই যে আত্মজ্ঞানের এত কথা বলা হচ্ছে, এই আত্মজ্ঞান সেই অমৃতে যাওয়ার সেতু।

আচার্য বলছেন, এখানে যে অক্ষর পুরুষের কথা বলা হচ্ছে, এই অক্ষর পুরুষ নির্গুণ নিরাকার নিরুপাধিক ব্রহ্মকে নিয়ে বলা হচ্ছে না, এখানে সোপাধিক ব্রহ্মের কথাই আলোচনা চলছে, সোপাধিক ব্রহ্মকেই বলা হয় ঈশ্বর। যিনি নির্গুণ নিরাকার তাঁর মধ্যে কোন উপাধি থাকবে না। এখানে বলা হচ্ছে সগুণ সাকারের ব্রহ্মের মধ্যে বা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বা ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে এই জিনিষগুলো *ওতং* হয়ে রয়েছে। কোন গুলো? দ্যুলোক, পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষ – গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হচ্ছে *ভূর্ভুবঃ স্বঃ*, ভূঃ মানে এই পৃথিবীলোক যেখানে আমরা আছি, ভূবঃ, মাঝের লোক আর স্বঃ স্বর্গলোক, সংক্ষেপে এই তিনটে লোক দিয়ে সমস্ত লোককে বলে দেওয়া হল, এই তিনটে লোকের উপরেও যদি কিছু থাকে, তার নীচে বা তার বাইরেও যদি কোন লোক থাকে তাতে কিছু আসে যায় না, সংক্ষেপে সব কিছুকে বলে দেওয়া হল। কোন যোগী যদি দেখেন আরও হাজার খানেক স্বর্গ আছে, তাতেও কোন অসুবিধা হবে না। নীচে পাতাললোকও ধরা আছে। ঠাকুরের আগমনের পর আবার রামকৃষ্ণলোক হয়েছে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। এই তিনটেকে যখনই বলে দেওয়া হল, তখন যেখানেই যত ব্রহ্মাণ্ড আছে সবটাকেই ধরে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত লোকের সাথে *মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ*, সব মন, প্রাণ – এখানেও মন ও প্রাণের সাথে ইন্দ্রিয়কেও জড়িয়ে বলা হচ্ছে।

গণিত বিজ্ঞানে যখন ইনফাইনাইট আসে তখন তার কিছু কিছু প্রপার্টিস থাকে। যাঁরা গণিত বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাঁরা জানেই ইনফাইনাইটের এই এই প্রপার্টিস। আধ্যাত্মিক জগতেরও একটা ইনফাইনাইট বা অনন্ত আছে। সেই অনন্তের বৈশিষ্ট্য হল, আমি যেটাকে সব থেকে বৃহৎ ভাবছি অনন্ত তার থেকেও বড়, আবার যেটাকে আমি সব থেকে ছোট ভাবছি অনন্ত তার থেকেও ছোট। যেদিকেই আমি যাই না কেন, এদিক থেকেও অনন্ত সেদিক থেকেও অনন্ত। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে সব থেকে সূক্ষ্ম হল আকাশ, আকাশের পর থেকে সমস্ত পার্টিকেলস্গুলো বড় হতে শুরু করে। তিনি আকাশ থেকেও সূক্ষ্ম। আবার যেটা বৃহত্তম, তার থেকে বৃহৎ, এটাই অনন্ত। ব্রহ্মের বর্ণনা করে বলছেন *অণোরণিয়াম্ মহতোমহীয়ান্*। অণু থেকেও অণু আবার মহৎ থেকেও মহৎ, এক সঙ্গে দুটোই চলবে। এটাই অনন্তের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কাল যদি কেউ এসে বলে

আমিতো গণিতে ইনফাইনাইট পড়েছি, তা তোমার ব্রহ্ম কি সেই রকম? আমি বলব, না বাপু আমার ব্রহ্ম সেই রকম নয়। আমার ব্রহ্ম মহৎএর থেকেও মহৎ, এটা তোমার অঙ্কেও হবে। গণিতে আমি যে সংখ্যাটা ভাবছি যে এটাই সব থেকে বড় সংখ্যা, কিন্তু গণিতে তার থেকেও বড় সংখ্যা হয়, সেটাই গণিতের ইনফাইনাইট। কিন্তু আধ্যাত্মিক যে সত্য তাতে যেটাকে সব থেকে ছোট ভাবছি তার থেকেও ছোট হবে। এক সঙ্গে দুটো, ছোট থেকেও ছোট আবার বড় থেকেও বড়। তার সাথে বলবে এই যে তুমি যত গ্রহ নক্ষত্র দেখছ, আকাশ, স্বর্গ সবটাই এর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। তার মানে সব কিছু ওঁর মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে আছে আর তিনি অর্থাৎ আত্মতত্ত্বও সব কিছুর মধ্যে ঢুকে রয়েছে। শুধু তাই নয়, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সব সেই আত্মাতেই অবস্থিত আর আত্মা এসবের মধ্যে ঢুকে আছে। অন্য দিকে শিষ্যকে বলা হচ্ছে, তুমি যাবতীয় যা কিছু অনুভব করছ, সব কিছুতে সেই আত্মাই ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। এই জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যাতে তিনি নেই। আর জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যেটা আত্মার বাইরে আছে।

প্রথমে শিষ্যকে জানিয়ে দেওয়া হল যা কিছু আছে সব আত্মাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে আর আত্মা সব কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। তারপর বলছেন *তমেবৈকং জানথ*, এই আত্মাকে প্রথমে জান, এরপর নেমে পর। প্রথমে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জানান হল, তারপর দ্বিতীয় ধাপে বলছেন এই আত্মাকে এবার তুমি জেনে নাও। তারপর তুমি এই আত্মার উপর কাজে নেমে পর। কি কাজ করবে? সৃষ্টিতে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু হতে পারে, প্রত্যেকটি প্রাণী, প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি কণা তার যে প্রত্যগ্ স্বরূপ সেটা হল আত্মা। আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আকাশ হল সব থেকে ছোট পার্টিকেল তারও প্রত্যগ্ স্বরূপ হল আত্মা, পরাগ্ মানে বাইরেরটা। সমস্ত বস্তু, এই যে বোতল এর অন্তর্নিহিত যে সার সেটা হল আত্মা, সমস্ত প্রাণীর একটা মশা, পিঁপড়েরও যে সার সেটা আত্মা, আমারও যে সার সেটাও আত্মা। সব কিছুর শেষ যেটা সেটা আত্মা। এই জিনিষটা যখন বুঝে নেবে তখন তুমি কি করবে? অপরা বিদ্যারূপী অন্য যত বাণী আছে সব ফেলে দাও, *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, এটাই কার্য। একটা জিনিষকে না জানা পর্যন্ত তার উপর কোন কাজ করা যায় না। একটা চোরও যদি জানে পাশের ঘরে কিছু নেই সে চুরি করতে নামবে না, আরেকটা চোর যদি জেনে যায় পাশের ঘরে কিছু আছে সে তখন চুরি করতে নেমে পড়বে। আপনি যখন জেনে গেলেন আত্মা এই, তখন তার উপর কাজ করতে নেমে পড়তে হবে। কিভাবে নামবেন? *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, সমস্ত রকমের বাণী থেকে সরে এস। অন্য রকম বাণী কি? প্রত্যগ্ স্বরূপ আত্মার বিষয় ছাড়া যা কিছু আছে সেখান থেকে সরে আসা। আত্মার বিষয় ছাড়া বাকি সব কিছু অপরা বিদ্যা। প্রথমে যেখানে শুরু হয়েছিল পরা আর অপরা বিদ্যা দিয়ে, এবার ঘুরে সেই অপরা বিদ্যাতে চলে এসেছেন। পরা বিদ্যা বাদে যাবাতীয় যা কিছু আছে সেখান থেকে সরে এস।

অপরা বিদ্যার ধর্ম হল কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। এই তিনটে অপরা বিদ্যাতে আলাদা হবে। পরা বিদ্যাতে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া এক হয়ে যায়। যিনি জ্ঞাতা তিনিই জ্ঞেয় তিনিই জ্ঞান। এই যে এখানে *অন্যা বাচো* বলা হচ্ছে, এই বাচোর মধ্যে সব রকম কর্মকেই ধরা হয়েছে। বলছেন সব কিছু থেকে বেরিয়ে এস। তাহলে যারা চাকরি করছে তারা কি চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে? উপনিষদের মতে হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। সেইজন্য উপনিষদ কক্ষণ গৃহস্থদের বলা হত না। একদিকে উপনিষদের কথা শুনছি, ধারণা করার চেষ্টা করছি, ধারণা করে পালন করার চেষ্টা চালাচ্ছি, তারপর চাকরিও করছি তখন এটা চৌর্য বিদ্যা হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের যখন সন্ন্যাস দেওয়া হয় তখন তাঁদের একটা বিশেষ সন্ন্যাস মন্ত্র দেওয়া হয়। এই মন্ত্র দেওয়ার সময় সমস্ত দরজা-জানলা এমন ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে ভুলেও অন্য কারুর কর্ণে এই মন্ত্রের শব্দগুলো প্রবেশ করতে না পারে। তার কারণ এই মন্ত্র শ্রবণ করার পর এই মন্ত্রকে পালন না করলে সেটা চুরির পর্যায়ে চলে যাবে। অর্থাৎ মন্ত্র জেনে নেওয়ার পর পালন না করাটা বিরাট বড় পাপ।

কলকাতা হাইকোর্টে একটা মামলা হয়েছিল। একজন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে এই মামলাটা হয়েছিল। সেখানে প্রমাণ করার ছিল এই সন্ন্যাসী প্রকৃত সন্ন্যাসী না নকল সন্ন্যাসী। তখন ঠিক হল সন্ন্যাসী ওই মন্ত্রটা জানে কিনা, কারণ সন্ন্যাসী ছাড়া ওই মন্ত্র অন্য কেউ জানবে না। কোথাও কোন বইতে এই মন্ত্র ছাপা অক্ষরে

পাওয়া যাবে না। হাইকোর্টের বিচারক বললেন সন্ন্যাসের মন্ত্রটা বলে তুমি প্রমাণ কর যে তুমি আসল সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বিচারককে বললেন, আমি তো আপনাকে এই মন্ত্র বলতে পারবো না। আপনি জজ সাহেব হতে পারেন, আপনি তো সন্ন্যাসী নন, আপনাকে আমি এই মন্ত্র বলতে পারছি না, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ছাড়া কাউকে বলবে না। তাহলে একজন সন্ন্যাসীকে আনা হোক। সন্ন্যাসী বলল, আমি কি করে জানব সে আসল সন্ন্যাসী কিনা। রামকৃষ্ণ মঠের তখন জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ, তিনি খুব নামকরা বিদগ্ধ সন্ন্যাসী। হাইকোর্ট থেকে একটা স্পেশাল অনুরোধ পাঠান হল বেলুড় মঠে। আমরা এই সমস্যায় পড়েছি, যদি কোর্টে এসে সাক্ষী দিয়ে যান। স্বামী মাধবানন্দজী কোর্টে এলেন। তখন আলাদা একটা ঘরে কানে কানে সেই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের মন্ত্রটা মহারাজকে বললেন। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে এসে জজ সাহেবকে বললেন এই সন্ন্যাসী প্রকৃত সন্ন্যাসী। তখন মামলাটা খারিজ হয়ে গেল।

এই বিদ্যা অপাত্রের শোনার অধিকার নেই। কোন কোন স্মৃতিতে আছে যদি কোন শূদ্র বেদের কথা শুনে ফেলে তাহলে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেবে যাতে আর কখন বেদের কথা শুনতে না পায়। এগুলো নিয়ে তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের খুব নিন্দা হয়েছিল। নিন্দা হওয়ারই কথা। যদিও এই ধরণের কোন ঘটনা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। আমাদের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা আজ পর্যন্ত কোথাও নেই। এমনিতে আমাদের বেদের দেবতাদের সম্বন্ধে পরবর্তি কালে কত রকমের আজগুবি কাহিনী বানিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে ভাবা যায় না। অথচ দেবতাদের নিয়ে এই ধরণের কোন ঘটান ইতিহাসে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যাঁরা লিখছেন তাঁরাও ইতিহাস থেকে একটি ঘটনা দেখাতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেবতার গ্রাস কবিতায় মাসি তার ভাইপোকে বলছে 'চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখালেন সাগর দেবতা, মানে বরুণ দেবতা রুষ্ট হয়ে গেছেন বলে সমুদ্রের ঢেউকে উত্তাল করে দিলেন। সবাই বলতে শুরু করল দেবতাকে দেওয়ার নাম করে না দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ বলে দেবতা রুষ্ট হয়ে গেছেন। শেষে ছেলেটিকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে দেওয়ার পর সমুদ্র শান্ত হল। একটা ছেলেকে খুন করে দেবতাকে তুষ্ট করা হল, এই ধরণের দেবতার আক্রোশের একটি ঘটনা ভারতের পাঁচ ছয় হাজারের ধর্ম শাস্ত্রের ইতিহাসে কোথাও কি পাওয়া যাবে? একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না। এগুলো হল বেদ বিশেষ করে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের সুপ্ত মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। আর এটি অত্যন্ত নেতিবাচক চিন্তা। ইতিবাচক চিন্তা থাকলে কি হত? কোন একজন চরিত্র দাঁড়িয়ে উঠে বলত 'তোমাদের এসব কুসংস্কার কার্য বন্ধ কর, দেবতাদের যদি ক্ষমতা থাকে দেখি সে এসে নিয়ে যাক'। এটাই হল স্বামীজী আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। মানুষের মধ্যে যদি কোন ভুল ধারণা থাকে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা থাকতে পারে, সেটাকে কেউ অস্বীকার করছে না, তাহলে সেই ভুলটা ভাঙানো তো মানবদরদী সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীর কর্তব্য। ভল্টায়ার ফরাসী বিপ্লব নিয়ে এলেন শুধু তার কলমের শক্তিতে। ভল্টায়ারের লেখাতে কোথাও কোন নেতিমূলক কথা পাওয়া যাবে না। দেবতারা কি কখন কোথাও এইভাবে রুষ্ট হয়ে সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে? এর উল্টোটাও আছে। দেবতাদের কাছে মানত করে সবাই কি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে? মাসি বলল আর দেবতা নিয়ে চলে গেল! হিন্দুরা যে দেবতাদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছে সেই দেবতাদের কালিমালিপ্ত করা ছাড়া এই কবিতার আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমাদের জানা নেই। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি কেউ অস্বীকার করছে না, কিন্তু তাই বলে তাঁর ধর্মীয় দর্শনকে মানতে হবে এই দিব্যিতো কেউ দিতে পারবে না। রোমা রোঁলার খুব ইচ্ছে ছিল কোন ভাবে যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রামকৃষ্ণ মঠের ভাবধারার একটা সেতুবন্ধ হয় তাহলে দেশ ও মানবজাতির প্রভূত মঙ্গল হবে। রোমা রোঁলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে বোঝাতে চাইছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করতে শুরু করে দিলেন – তিনি কালীর উপাসক, কালী রক্তপিপাসীনি ইত্যাদি, যে কালীর আরাধনা করে, সেই যেই হোন না কেন, আমার কাছে সে অত্যন্ত হেয়। এটা না হয় মেনে নেওয়া যায়, এক একজন মানুষের ধর্মীয় দেব-দেবী আর তাঁদের দর্শনের ব্যাপারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হতেই পারে। কিন্তু দেবতার নামে একটা বালসুলভ ছবি আঁকাটা কখনই কাম্য নয়। যাঁরা মহাপুরুষ, মহাজন তাঁদের প্রত্যেকটা কথার একটা গভীর মূল্য আছে যেটা সমাজের সর্বস্তরে একটা গভীর

রেখাপাত করে। একটি কবিতাতে গোটা হিন্দুধর্ম ও তার দেবদেবীদের কলঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে। শুধু কলঙ্কিত করাই নয়, সমাজের কুসংস্কারগুলোকে দূর করার বদলে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি যারা শূদ্রদের কানে সীসা ঢেলে দেওয়ার কথা বলছে হিন্দুদের নামে, তারা একটি এই ধরণের কোন ঘটনা দেখাতে পারবে না যে কারুর কানে সীসা ঢালা হয়েছে। স্মৃতির বক্তব্য হল তুমি এই বিদ্যা অপাত্রে দান করো না। মনুস্মৃতিতে এক জায়গায় যেমন বলছেন এই বিদ্যা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, আবার অন্য জায়গায় বলছেন – ব্রাহ্মণ! তুমি মরে যাও তো মরে যাবে কিন্তু অপাত্রে এই বিদ্যা দান করো না। তোমার এই বেদের জ্ঞান উপযুক্ত শিষ্য যদি না পাও তুমি দিও না। এই বিদ্যার এত উচ্চ ভাব যে, যদি পালন না করা হয় তখন সব মুখের কথা হয়ে যাবে। এই বিদ্যা শুধু মুখের কথা হতে দেওয়ার জন্য নয়।

এখানে বলছেন *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, অন্য সব কথা বাদ দাও। কিন্তু কাকে এই কথা বলছেন? যে শিষ্য আচার্যের সম্মুখে এসে হাতজোড় করে শ্রদ্ধা ও বিনম্রপূর্বক বলছে আমাকে সেই বিদ্যার জ্ঞান দিন যে বিদ্যাকে জানলে সব কিছু জানা যায়। হ্যাঁ, আমি তোমাকে সব বলব। অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যার সব কিছু বলার পর বলে দিলেন *অন্য বাচো বিমুঞ্চথা*, এবার তুমি সব কিছু বন্ধ কর। সন্ন্যাসীদের যেমন বলা হয় তোমার যা কিছু আছে সর্বস্ব ত্যাগ কর। সন্ন্যাসীর সময় শপথ নিতে হয়, *অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ*, সর্বভূতকে আমি অভয় দিচ্ছি। সন্ন্যাসীকে দেখে যদি কেউ ভয় পায় তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। সন্ন্যাসী মন্ত্র নিয়েছে *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, সৃষ্টি আমার থেকেই বেরিয়েছে, তাহলে তো সন্ন্যাসী সবারই মা। যদি সন্তান মাকে দেখে ভয় পায় তাহলে বুঝতে হবে মায়ের কিছু গোলমাল আছে। সন্ন্যাসীও ঠিক তেমনি *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা* এই মন্ত্র পড়ার পর, গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করার পরেও যদি সে ভোগে নামে, অপরা বিদ্যার এলাকায় ঘুরঘুর্ করে তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে অনেক গোলমাল আছে। এই গোলমাল যাতে না হয় সেইজন্য বলা হয় অপাত্রে দান করবে না।

অপরা বিদ্যার যা কিছু আছে, তার মানে যেখানেই কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আর ফলের ব্যাপার থাকবে সেখান থেকে সরে এস। সরে এসে শুধু মনকে লাগাও সেই জ্ঞানের উপলব্ধিতে যাতে তুমি সাক্ষাৎ আত্মাকে জানতে পারবে। ঠাকুর বলছেন – শুধু ঈশ্বরের ব্যাপারে চিন্তা করে কি হবে? তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন কর, তিনি কথা কন, এই অবস্থায় না যেতে পারলে কোন লাভ নেই! এখানে ঋষি তাই করছেন, এগুলো তুমি শুনে নিলে, অপরা বিদ্যার কথা শুনলে, পরা বিদ্যা অর্থাৎ আত্মার কথা শুনে নিলে এবার অপরা বিদ্যা থেকে বেরিয়ে এস আর পুরোপুরি পরা বিদ্যাতে মনকে কেন্দ্রীভূত কর, *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*। খুবই কঠিন, কিন্তু এটাই পথ, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। সন্ন্যাসী জেনে বুঝে নিজে থেকেই সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু প্রকৃতির এমনই কঠোর নিয়ম যে সে সবাইকে একটা অবস্থায় সন্ন্যাস বানিয়ে ছাড়ে। মৃত্যুর সময় সব পড়ে থাকবে, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ সব কিছু পড়ে থাকবে কিন্তু তাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে। সন্ন্যাসী কি করছে? আগে থাকতেই বলছে নিকুচি করেছে আমার এসবে, বলে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আত্মসাক্ষাৎকার করতে। সবাইকেই এই পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু সন্ন্যাসী স্বেচ্ছায় করছে। চোর যে সেও আইন ভঙ্গ করছে আর যে সত্যাগ্রহী সেও আইন ভঙ্গ করছে। সত্যাগ্রহী বলছে – আমি এই আইন ভঙ্গ করলাম, তুমি আমাকে জেলে নিয়ে যাবে তো যাও। চোর আইন ভঙ্গ করে পালিয়ে যায়। সংসারী আর সন্ন্যাসীর মধ্যে এটাই তফাৎ। সন্ন্যাসী বলছে, তুমি নিয়ে নিতে চাইছ, আগেই নিয়ে নাও। সংসারী বলে আমার দেওয়ার ইচ্ছে নেই আমি আঁকড়ে থাকব। কিন্তু যমরাজ যখন শেষ দিনে পায়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে তখন তাকেও সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করতে হয়, কোন রাস্তা থাকবে না।

কেন বলছেন *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, কেন তুমি সব কিছু ছাড়বে? কারণ সব কিছু ছেড়ে যাঁকে ধরছ তিনিই হলেন *অমৃতস্যৈষা সেতুঃ*, Bridge to eternity। অমৃত মানে এখানে অনিত্য বলে কিছু নেই, সবটাই নিত্য। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এখানে সব কিছুই অনিত্য, আমার ভোগ দুদিনের জন্য, জীবন কয়েকটা দিনের জন্য, জাগতিক সম্পর্কগুলো কিছু দিনের জন্য, সব কিছুই অস্থায়ী। কিন্তু এই সব কিছু অস্থায়ীর পেছনে

চিরন্তন শাশ্বত একটা সত্য আছে, যেখানে এই বিদ্যা আমাকে নিয়ে যাবে। এখন আমাকে বিচার করে দেখতে হবে আমি কি তাঁকে পেতে চাইছি, কি চাইছি না। ঠাকুর বলছেন – পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে আর গোফ চাপড়াচ্ছে, এদের দ্বারা হয় না। মানুষ প্রচুর কষ্ট পেতে পেতে বহু জন্ম অতিবাহিত করার পরেই এদিকে মন যায়। সংসাররূপ তেতো ফল খেয়ে খেয়ে যতক্ষণ বিরক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ এদিককার কথা মনেই আসবে না। যেমনি তেতো ফল খেয়ে মন একেবারে ভেঙে পড়বে তখনই প্রকৃতি একটু মিষ্টি কিছু এগিয়ে দিয়ে সংসারে বেঁধে রাখতে চায়, যাতে না সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প করে বসে। কিন্তু যখন বলে আর না, আমার আর মিষ্টি ফলও লাগবে না, তেতো ফলও চাইনা, ঠাকুর যেমন উপমা দিচ্ছেন – বাড়ির গিন্নী রান্নাবান্না করে সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে এবার স্নান করতে চলল, এবার তাকে ডাকলেও ফিরে তাকাবে না। খুবই সাধারণ উপমা। আমার আর কিছু লাগবে না, এবার তুমি সব কিছু আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, এই ভাব যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ হবে না। কিসের প্রতি এই ভাব? জগতের সব কিছুর প্রতি। এই যার ভাব এসে গেছে তিনি এখন তাহলে কি করবেন? আমি আছি বাবা আমার মত, আমি তো আর গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারবো না, বেঁচে আছি। যদি দরকার হয় তাহলে দুটো লোকের ভালো করে দেবে, ঈশ্বরে সর্বক্ষণ মন রেখে দিয়েছে, যখন শরীর খসে পড়ে যাবার যাবে। আর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে জোর ধ্যান চালিয়ে যাও। এগুলোই এখন পর পর আলোচনা চলতে থাকবে। এরপর আরও গভীর তত্ত্বকথা নিয়ে বলা হবে। মুণ্ডকোপনিষদ খুব উচ্চমানের উপনিষদ।

আচার্য এখানে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ থকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন '*তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়*', এই আত্মাকে যদি জানা যায় তাহলে মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাওয়া যায়। মৃত্যুর কথা বলা মানে, জন্ম-মৃত্যুর যে চক্র সেটাকে পার করে যাওয়া। *নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়*, অয়ন মানে পথ, এছাড়া পথ নেই। গভীর উচ্চ চিন্তার মধ্যে বিচরণ না করলে এই জিনিষগুলো ধারণা করা যায় না। যখন গভীর চিন্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গভীরে যেতে যেতে একটা জায়গায় গিয়ে দেখা যায় আমার যে অস্তিত্ব এটাই প্রধান সমস্যা। যার জন্য একজন গ্রীক ফিলজফার বলেছিলেন The best thing is not to be born and the second best thing is to die early। জীবনে সব থেকে ভালো হল জন্ম না নেওয়া, তার নীচে ভালো হল তাড়াতাড়ি মরে যাওয়া। কিন্তু সেটা আর বললেন না, তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার পর কি হবে। তাকে তো এখানেই আবার ফিরে আসতে হবে। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের চিন্তা ধারায় এইখানেই পার্থক্য।

প্রাচ্যের চিন্তাবিদরা বলছেন এগুলো কোন চিন্তা প্রসূত নয়, এটাই বাস্তব। পাশ্চাত্যের দার্শনিক, লেখকরা এখন প্রাচ্যের এই রিয়েলিটিকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা করতে শুরু করে দিয়েছে। করতে গিয়ে দেখছে সব মিলে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাস্তবকে যদি পাশ্চাত্য জগৎ স্বীকার করে নেয় তাহলে বিশ্বের দুটো বৃহৎ ধর্ম তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সাথে সাথে বিজ্ঞানীদের তাঁদের ছক বাঁধা তত্ত্বগুলোকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করতে হবে। তুমি কালকে মরে গেলে পরশু আবার তুমি জন্ম নেবে, এই কথা মেনে নিলে বিজ্ঞানের আর কোন সম্মান থাকবে! কিন্তু এটাই সত্য। আর এই সত্যকে জানলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যাবে। এই যে আপনি এত নোংরামি করছেন, চুরি, জোচ্চুরি, ফাঁকাবাজী, চিটিংবাজী করছেন সবটাই তো ঘুরে আপনার ঘাড়ে চলে আসবে। আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে এটা ভাবলেই যে কোন মানুষই এই সব কার্যকলাপ থেকে সংযত হবার চেষ্টা করবে। হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যে এই তত্ত্বকে তারা পরম্পরাগত ভাবে মেনে আসছে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মানুষের মধ্যে এত ভোগ বৃত্তি বেড়ে গেছে, ভোগে এমন উন্মত্ত হয়ে গেছে এই সত্যটাকেই ভুলে বসে গেছে। গ্রীক ফিলজফার জন্মানো আর মরে যাওয়াকে নিয়ে যেটা বলছেন, হিন্দুদের কাছে এটা কোন সমস্যা নয়। এখানে অস্তিত্বটাই বিরাট সমস্যা। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, আমি ম'লে ঘুচবে জঞ্জাল। আমি ম'লে বলতে এই আমি নয়, এখানে অহঙ্কারকে বলা হচ্ছে। কিন্তু জিনিষটা হয়ে যাচ্ছে অন্য। যে আত্মহত্যা করতে চাইছে সে ভাবছে আমি চোখ বন্ধ করলে সব শেষ, কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয় তাকে আবার ঘুরে আসতে হবে। উপনিষদ কি বলছে? মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তোমার কোন কিছুই শেষ নয়।

'তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যমেতি' সেই ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে যখন জানবে একমাত্র তখনই তুমি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবে। তাঁকে জানার আগে পর্যন্ত তোমাকে এখানেই ঘুরপাক খেয়ে যেতে হবে।

এই মৃত্যুকে অতিক্রমের জন্য দুটো কথা বলছেন। প্রথমে বললেন *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, অন্য ধরণের কর্ম, আলতু-ফালতু কথা বলছি, নিউজ পেপার পড়ছি, টিভি দেখছি এগুলো আগে বন্ধ কর। তাহলে কি করব? *তমেবৈকং জানথ*, ওই একটা জিনিষকেই জানার চেষ্টা কর। কোন্ জিনিষটাকে জানার চেষ্টা করব? যাঁর মধ্যে, *যস্মিন দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ওতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ*, এই দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মন, প্রাণ সহিত সব কিছু ওতপ্রোত হয়ে আছে। ওই জিনিষটাকে জানার চেষ্টা কর। এটা কোন কাল্পনিক কিছু নয়, তুমি ধ্যানের গভীরে যখন যাবে তখন দেখবে সত্যিই জিনিষটা তাই। যা কিছু আছে, সৎ পদার্থ যেটাই আছে সবটাই সেই আত্মতত্ত্বের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে, ওইটাকে জানার চেষ্টা কর। ওইটাই পরা বিদ্যা, ওই জিনিষটা ছাড়া বাকি যা কিছু আছে সব অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যাকে ভালো করে পরীক্ষা করা তোমার হয়ে গেছে, অনেক সুখ পেয়েছ, অনেক দুঃখ পেয়েছ। এবার এটাকে বন্ধ কর। যা কিছু কর্তব্য কর্ম তোমার বাকী আছে সেগুলো থেকে যত তাড়াতাড়ি পারো বেরোনর চেষ্টা কর। এগুলো থেকে যখন তুমি বেরিয়ে আসবে তখন তুমি প্রথম সেই সেতুর উপর পা রাখলে। হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে যেমন হাওড়া থেকে কলকাতায় আসা যায়, এবার তুমি সেই অমৃত সেতুতে পা দিলে মানে তুমি এবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করে, অনিত্য সংসার থেকে নিত্যধামের দিকে এগিয়ে যাবে।

গুরু শিষ্যকে বলে দিলেন বাপু! তুমি এত দিন যা কিছু করে এসেছ এবার সেখান থেকে সরে এস, *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, আর যেটা অমৃতের সেতু সেই সেতুর উপর পা দাও, এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এই কথা বলার পর গুরু আত্মতত্ত্বের একটু ব্যাখ্যা করে শিষ্যকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন – তোমার সার্বিক কল্যাণ হোক, এই সাধনার পথে তোমার যেন কোন বিঘ্ন না আসে –

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।।২/২/৬

(চক্রশলাকা যেভাবে রথচক্রের নাভিতে সংযুক্ত থাকে সেইভাবে নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্প্রবিষ্ট আছে, সেই হৃদয়মধ্যে উক্ত পুরুষ নানারূপে প্রতীত হয়ে বিহার করেন। ওঁঙ্কার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান কর। অন্ধকারের পারে যে পরম তত্ত্ব আছে তাঁর দিকে তোমাদের যাত্রা পথ শুভকর হোক।)

আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করে বলছেন – *স্বস্তি বঃ পারায়*, তোমার মঙ্গল হোক, তোমার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হোক আর এই আত্মতত্ত্বের সাধনার পথে তোমার যেন কোন বিঘ্ন না আসে। এর আগে আত্মতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন *যস্মিন দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্*, সেই আত্মতত্ত্বের মধ্যে *ভূর্ভূবঃ স্বঃ*, পৃথিবী লোক, স্বর্গলোক আর অন্তরীক্ষ ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। এতক্ষণ যেটা বহু ছিল সেটাকে এবার ভেতরের দিকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করে দিচ্ছেন। প্রথমে বড়টা বললেন তার সাথে মন, প্রাণের কথা বললেন। এবার অন্য দিক দিয়ে বলছেন।

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ, রথের চাকার যে মূল কেন্দ্র সেখান থেকে চক্রশলাকা গুলো বেরিয়ে বাইরের গোলাকার পরিধি বিশিষ্ট বস্তুটিকে ধরে রাখে। যেমন সাইকেলের মূল চাকার কেন্দ্র থেকে অনেকগুলো স্পোক মানে শিক বেরিয়ে আসে বাইরের লোহার রিমটাকে ধরে রাখে। সাইকেলের আসল গতিটা তৈরী হয় সাইকেলের প্যাডেলে যে চেন থাকে সেই চেনকে প্যাডেলের সাহায্যে ঘোরালে। কিন্তু শুধু চেনকে ঘোরালে তো সাইকেল চলবে না। সেই চেনের আবার বড় আর ছোট দুটো হুইল থাকে, ছোট হুইলের সাথে

সাইকেলের পেছনের চাকাটা লাগান থাকে। চাকার যাতে ওজন না বেড়ে যায় সেইজন্য আগেকার দিনে রথের চাকায় দণ্ড ব্যবহার করা হত, যেমন সাইকেলে চাকার মধ্যে অনেকগুলো লোহার স্পোক দেওয়া থাকে। কোন কারণে একটা স্পোক যদি ভেঙেও যায় তাতে অসুবিধা কিছু হয় না। এই যে মানুষের ভেতরে আত্মা যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি হলেন সেই কেন্দ্রবিন্দু, যিনি সবাইকে চালাচ্ছেন। ফ্লাই হুইল যেমন বড় বড় মেশিনগুলোকে চালাচ্ছে, যে ফ্লাই হুইলের সাথে বেল্ট দিয়ে সব মেশিনকে জুড়ে রাখা আছে। এখানে উপমাটা নিচ্ছেন *অরা ইব রথনাভৌ সংহতা*, রথের চাকার যে দণ্ডগুলো হয় তার মত। সব কিছু সেই আত্মার সাথে জুড়ে আছে।

কি বলছেন? *যত্র নাড্যঃ*, আমাদের শরীরের যত নাড়ী আছে, বিভিন্ন উপনিষদে নাড়ীর বিভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলোতো আর গুণে গুণে দেখা হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেও একটা বিরাট সংখ্যার কথা বলা আছে। সে যাই হোক, যত নাড়ী আছে সব নাড়ীর কেন্দ্রবিন্দু হল সেই আত্মা। এখন আমরা জানছি আমাদের শরীরের যা কিছু চলছে মস্তিষ্কের মাধ্যমেই চলছে। ঋষিরাও এটা জানতেন। কিন্তু ওনারা সব সময় নাড়ীর ধারণাটাকে সামনে নিয়ে আসতেন। ওনারা যা কিছু বলতেন আমাদের যতগুলো নার্ভস আছে এই নার্ভস গুলোকে কেন্দ্র করে বলতেন। কারণ বাস্তবিক যা কিছু আমাদের শরীরের কাজ হয় সেটা মস্তিষ্কতেও যে কাজ হচ্ছে সেটা নার্ভ দিয়ে হচ্ছে। মস্তিষ্কে যে নিওরোনগুলো আছে, বলে হাজার কোটি নিওরোন আমাদের মস্তিষ্কে আছে। সেগুলো সব আত্মার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। কিন্তু আত্মাকে তো এই চোখ দিয়ে দেখা যাবে না, কিন্তু আত্মা ভেতরে অবস্থান করে আছেন বলেই এগুলো সব কাজ করছে। আত্মা যখন বেরিয়ে যাবে তখন শরীরের সব সেল, নার্ভ সব কিছুই থাকবে কিন্তু কোনটাই আর কাজ করবে না। বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণে এই জিনিষগুলোকে এক রকম ভাবে দেখায় আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যখন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় তখন আবার এই জিনিষগুলোকেই অন্য ভাবে দেখাবে। বিজ্ঞানীরা বলে ব্রেন ডেড্। ব্রেন ডেড্ মানে, ওখানে আর রক্ত সরবরাহ হচ্ছে না, নার্ভের লিঙ্ক কেটে গেছে। এনারা বলবেন, না না, তা কেন হবে। জীবাত্মা যখন শরীর ছেড়ে দেয় তখন সব কিছুই চলে গেল, মানে আসল শক্তিটাই চলে গেল, শরীরের সব কিছু থাকলেও কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না। বিদ্যুৎ যদি চলে যায় তখন পাখা, বাল্ব, টিউব কোনটাই কাজ করবে না। ঠিক তেমনি শরীরের সব কাজ নাড়ী দিয়ে হচ্ছে, নাড়ীগুলো কাজ করছে কারণ তার পেছনে আত্মতত্ত্ব আছে।

স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ, আত্মা হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আর বহু প্রকার ভাবের উৎপন্ন হচ্ছে। এই আত্মা তোমার স্বরূপ, তোমার বাস্তবিক তুমি, সেই আত্মাকে তুমি ওঁম রূপে চিন্তা কর – *ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং। স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ*, এই আত্মতত্ত্বের পথে তোমার যাত্রা শুভ হোক, তোমার কল্যাণ হোক, এই পথে যেন তোমার কোন বিঘ্ন না আসে। আর এই আত্মতত্ত্ব যেন তোমাকে অন্ধকারের পারে নিয়ে যায়। অন্ধকার বলতে জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্র। আচার্য বলছেন আমাদের হৃদয় হল কেন্দ্র। হৃদয় কেন্দ্র ব্যাপারটা খুব বিতর্কিত বিষয়। আমরা যেমন বলি তোমার কথা আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। মানুষ কি সত্যিই হৃদয়ে আঘাত পায়? কোথায় আঘাত পায় সেটা আমাদের ভাবতে হবে। আসলে আঘাতটা মস্তিষ্কেই পায়, হৃদয়টা একটা শব্দ। ওনারা হৃদয় বলতে সব সময় শরীরের স্থূল হৃদয়কে বোঝাচ্ছেন তা নয়, হৃদয় বলতে এনারা সব সময় অন্তঃকরণকেই বোঝান। সেটা আজকে আমাদের এই স্থূল হৃদয় হতে পারে, বা মস্তিষ্ক হতে পারে তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। যে জায়গা থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যার জন্য ডাক্তাররা বলেন ব্রেন ডেড এণ্ড হার্ট ডেড। কিন্তু এখানে সব সময় হৃদয় বলতে অন্তঃকরণকেই বোঝাচ্ছে।

এনারা তিনটে স্তরের কাজকে দেখান, প্রথমে শরীর। শরীরের পেছনে আছে অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ মানে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। অন্তঃকরণের পেছনে রয়েছেন আত্মা। আত্মা, সেই শুদ্ধ চৈতন্য প্রতিবিম্বিত অন্তঃকরণে, যেটা হল মন। মন শরীরের সাথে নাড়ী দিয়ে যুক্ত হয়ে আছে। এই অন্তঃকরণকে অনেক সময় সংস্কৃতে হৃদয় বলা হয়। হৃদয় বলতে যদি এই অন্তঃকরণ বা মস্তিষ্ক হয় তাহলে এই হৃদয় শব্দকেই কেন গ্রহণ করা হচ্ছে? উপনিষদ বা অন্যান্য শাস্ত্রে প্রায়ই উপমা হৃদয়ের নেওয়া হয়। আমাদের ঋষিরা ভালোভাবেই জানতেন মুণ্ডু যদি কেটে দেওয়া হয় তাতেই শরীরের সব কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। মুণ্ডু দিয়ে সব হচ্ছে এটা

ঋষিরা তো খুব ভালো করেই জানতেন, হৃদয় তখন থাকলেও কোন কাজ করবে না। অথচ যখনই আত্মার ব্যাপার আসবে, যখন অন্তঃকরণ নিয়ে, মন নিয়ে কথা বলবেন, ওনারা তো জানেন হৃদয় দিয়ে মন চলবে না, মন সব সময় চলবে মস্তিষ্ক দিয়ে। অথচ যখনই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র বা অন্তঃকরণ বা জীবনীর কেন্দ্র, এগুলোর সব কিছুর জন্য হৃদয় শব্দটা ব্যবহার করছেন। একটা আমরা বলতে পারি যেহেতু মাথা থেকে পা পর্যন্ত হৃদয়টা শরীরের মাঝখানে, সেইদিক দিয়ে এটা বলা যেতে হৃদয়টা শরীরের কেন্দ্রের কাছাকাছি। সাধারণতঃ যোগীরা যখন ধ্যান করেন তাঁরা হৃদয়েই ধ্যান করেন। তাই যোগীর যত আধ্যাত্মিক অনুভূতি সব হৃদয়েই অনুভূত হয়। তাহলে যাঁরা আজ্ঞাচক্রে বা সহস্রারের ধ্যান করেন তাঁরও আধ্যাত্মিক অনুভূতি কি সেই সেই জায়গায় হবে? হ্যাঁ, তাই হবে, যিনি আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করছেন তাঁর আজ্ঞাচক্রেই হবে, যিনি সহস্রারের ধ্যান করছেন তাঁর সহস্রারেই হবে। কিন্তু বেশীর ভাব যোগীরা হৃদয়েই ধ্যান করেন বলে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হৃদয়েই হয়। ঠাকুর বলছেন হৃদয় কি কম গা! হৃদয় ডঙ্কা মারা জায়গা। ধ্যানের পক্ষে হৃদয় যে কোন সাধকের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। বলা হয় সহস্রারে ধ্যান করলে নাকি মাথা গরম হয়ে যায়, গরম হয় কি হয় না আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। হৃদয়ে ধ্যান করা হয় বলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি সব হৃদয়েই অনুভূত হয় সেইজন্য এনারা প্রায়ই হৃদয় শব্দটাই ব্যবহার করছেন, এর পেছনে অন্য কোন কারণ নেই।

বলছেন আমাদের যে চেতনার কেন্দ্রস্থল সেখানে আমাদের শরীরের সব নাড়ী, আমাদের ভেতরে যত চেতনা রয়েছে, চেতনার যে পথগুলো রয়েছে সবটাই ঐ কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রিত হয়ে আছে। সব কিছু যেন সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছে। ওখানে বসে যত বুদ্ধিজনিত প্রতীতি, যাবতীয় যা কিছু আমার সাথে ঘটছে – আমি শুনছি, আমি দেখছি, আমি হাসছি, আমি কাঁদছি, এই যে বোধ হচ্ছে আমি দেখছি, আমি শুনছি এখানে আসলে শুনছে জীবাত্মা। আমি চুপ করে বসে পাখা ঘুরছে তার আওয়াজ শুনছি। এই পাখার আওয়াজটা কে শুনছে? বিজ্ঞান বলবে কান শুনছে, কানের নার্ভ দিয়ে সেটা মস্তিষ্কের কেন্দ্রে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক পুরুষ কখন এই জিনিষটাকে মানবেন না, তুমি বলছ মন শুনছে? মন তো জড়, জড় আবার কি করে শুনবে। তাহলে কে শুনছে? আমার ভেতরে যে জীবাত্মা আছেন তিনি শুনছেন। এই জীবাত্মা কোথায় আছেন? হৃদয়ে। জীবাত্মা হৃদয়ে আছেন এর কি প্রমাণ? যোগীরা ধ্যানের গভীরে তাঁকে ওখানেই দেখতে পান। এটাই প্রমাণ।

আচার্য বলছেন *পশ্যন্ শৃণ্বন্ মন্বানো বিজানন্*, জগতের যাবতীয় যা কিছু আছে তাকে শুনতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে, মনন করতে পারছে। কে পারছে? জীবাত্মা, যাঁর নিবাস হৃদয়ে। এটাই আমাদের প্রাচীন ধারণা। যোগীদের এই ধারণাটাকে আমাদের পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। আমরা যদি আমাদের হৃদয়কে কাঁটাছেড়া করি সেখানে আমরা কিছুই পাবো না। কারণ তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। যোগীরা যখন ধ্যানের গভীরে আত্মার অনুভব করেন, যখন প্রথম তাঁর আত্মজ্ঞান হয়, অন্তর্যামীকে যে অনুভব করেন সেটা তাঁরা পরিষ্কার হৃদয়েই করেন। অবশ্য যাঁরা মাথায় ধ্যান করেন তাঁরা মাথাতেই দেখতে পান। আমরা এখানে বেশীর ভাগ যোগীর কথা বলছি। সেইজন্য বলা হয় অন্তর্যামী হৃদয়ে বসে সব কিছু চালাচ্ছেন। হৃদয়টা শরীরের মাঝখানে অবস্থিত বলে হচ্ছে না, নাভি থেকে দশ আঙুল উপরে হৃদয় অবস্থিত বলে হচ্ছে না। কারণ আমি যেটাই বলব তারও একটা বিপরীত যুক্তি আছে। যোগীরা সাধারণতঃ ধ্যান করেন হয় হৃদয়ে, নাহলে নাসিকাগ্রে, নয় ভ্রূমধ্যে আর নয়তো সহস্রারে। যেখানেই ধ্যান করুন না কেন সেখানেই তাঁর আত্মার দর্শন হবে কিন্তু সাধারণতঃ বেশীর ভাগ যোগী ঋষিরা হৃদয়েই ধ্যান করেন বলে হৃদয় শব্দটা ব্যবহার করা হয়।

হৃদয়ের এই অবস্থানকে নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে সেই গ্রীক ফিলজফি থেকে শুরু করে অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় পুরুষরা অনেক গবেষণাদি করে চলেছেন। আমরা আগে বললাম তোমার কথা আমার হৃদয়ে বেদনা দিয়েছে। আমরা তো জানি যত রকম বেদনা মস্তিষ্ক থেকে পাঠান হয়, তাহলে কেন হৃদয়ের কথা বলা হচ্ছে! আবার যখন খুব টেনশন হয় তখন বুকটা ধরমড় করে ওঠে। বৈজ্ঞানিকরাও এই নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেন। বৈজ্ঞানিকদের বৈশিষ্ট্য হল এনারা সব কিছুরই একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিতে সক্ষম, কারণ তাঁরা পেছনের দিকটায় দৃষ্টি দেন। পেছনের দিকে যে কোন জিনিষকে যখন দেখা হয় তখন তার ব্যাখ্যা দেওয়াটা অতীব

সহজ। কিন্তু এগিয়ে কিছু বলতে পারেন না। ইদানিং যাঁরা স্পিরিচুয়াল আর সাইন্সকে এক লাইনে দাঁড় করাবার জন্য অনেক রকম গবেষণা করছেন তাঁরা অনেক ধরণের হৃদয়ের কথা বলেন, যেমন ফিজিক্যাল হার্ট, ইমোশানাল হার্ট, স্পিরিচুয়াল হার্ট ইত্যাদি। সমস্যা হল, কোনটারই কোন প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক আগামীকাল যদি আরেকটা চতুর্থ হৃদয়ও এসে যায় তাতেও যোগীদের কিছু আসবে যাবে না। আচার্য এখানে যেটা বলতে চাইছেন বা আচার্যের ভাষ্যকে যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের বক্তব্য হল, উপনিষদে বা ঋষিরা যে বর্ণনা করছেন হৃদয়ে ব্রহ্ম অনুভূত হন, এই হৃদয়কে আমরা প্রথম অবস্থায় হাজার চেষ্টা করেও ধরতে পারবো না। প্রথমে এই জিনিষটাকে কিছুটা কল্পনার সাহায্য নিয়ে এগোতে হয়। যার জন্য দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যকে বলে দেন তুমি হৃদয়ে ইষ্টের ধ্যান করবে। গুরু কিন্তু ফিজিকাল হার্টে ধ্যান করতে বলছেন না। বরং বলে দেন তোমার বুকের মাঝখানে একটা পদ্মফুলের চিন্তা কর, সেটাকে তুমি হৃদপদ্ম রূপে কল্পনা কর, সচরাচর অষ্টদল পদ্মের কথা বলা হয়। এই কল্পনা করতে করতে কুণ্ডলীনি শক্তির যখন জাগরণ হয় তখন শিষ্য সত্যিকারের দেখে ওখানে একটা পদ্মফুল রয়েছে। প্রথমে সবাইকে কল্পনা করে করে সাধনা করতে হয়, পরে দেখে সত্যিই তাই। গুরু শিষ্যকে যে নির্দেশগুলো দিচ্ছেন, সেটা তিনি নিজে যেভাবে দেখেছেন বা তিনি তাঁর গুরুর কাছে যেভাবে নির্দেশ পেয়েছেন বা শুনেছেন তাঁর গুরু যেভাবে দেখেছিলেন সেটাই তিনি নিজের শিষ্যকে এখন দিচ্ছেন। সেইজন্য শিষ্যকে গুরু যে নির্দেশগুলো দিচ্ছেন সেই নির্দেশ পালন করে যখন শিষ্যের অনুভূতি হবে তার সাথে গুরুর অনুভূতি বিরাট বড় কোন পার্থক্য থাকবে না। পরম্পরাতে হৃদয়েই দেখে আসছেন বলে এইভাবেই চলে আসছে। কিন্তু যাঁরা সহস্রারে ধ্যান করেন তাঁরা যা কিছু দেখেন সহস্রারেই দেখবেন, তাঁরা কিন্তু হৃদয়ে দেখবেন না। আবার এগুলোকে কোথাও কোথাও হৃদয়াকাশ, চিদাকাশও বলা হয়। যোগী হৃদয়াকাশে দেখেন অন্তর্যামী এখানেই বিরাজমান। শুধু হিন্দুধর্মের পরম্পরাতেই নয়, খ্রীশ্চান, ইসলাম পরম্পরাতেও সবাই কিন্তু হৃদয়ে ধ্যান করে। হৃদয়স্থানকে সব ধর্মেই খুব পবিত্র স্থান রূপে দেখা হয়। আমার যে আমিত্ব বোধ এটা হৃদয়েই বোধ হয়।

হৃদয়ে জীবাত্মার দর্শনকে অনেকে জ্যোতিদর্শন বলেন। ইসলাম পরম্পরাতে আল গাজালী নামে একজন সুফী পণ্ডিত এগুলোকে নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তিনিও জ্যোতিদর্শনের ব্যাপারে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। এই হৃদয়েই যখন জীবাত্মাকে দর্শন করেন তখন দেখেন তিনি আছেন বলে সব কিছু চলছে। ঠাকুরও বর্ণনা দিচ্ছেন, হৃদয়ে তিনি যে জ্যোতি দর্শন করছেন সেই জ্যোতি যেন হৃদয় থেকে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এসে নৈবেদ্যর সব কিছু দ্রব্য স্পর্শ করে আবার ভেতরে প্রবেশ করে গেল। এগুলো কাল্পনিক কিছু নয়, জিনিষটা এই রকমই হয়। ঠাকুর তো সাক্ষাৎ দেখছেন। এনারা দেখেন আমাদের স্থূল শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সব কাজ করছে কারণ কেন্দ্রে রয়েছেন সেই বিশুদ্ধ আত্মা। বিশুদ্ধ আত্মার একটা সমস্যা, একে বলা হয় জীবাত্মা। আসলে জীবাত্মা বলে কিছু হয় না। জীবাত্মা অন্তঃকরণকে অর্থাৎ মন, বুদ্ধিকে আলো দেয়। ইন্দ্রিয়গুলো খেলা করতে চাইছে তাদের বিষয়ের সঙ্গে, চোখ ভালো দৃশ্য দেখতে চাইছে, কান ভালো কিছু শুনতে চাইছে। মন আবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে আছে। মন মনের মত জিনিষ পেয়ে আনন্দিত হচ্ছে, বিপরীত জিনিষ পেয়ে মন বিমর্ষ হচ্ছে। এখন জীবাত্মার সমস্যা হল জীবাত্মা এই অন্তঃকরণের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। গীতায় ভগবান জীবাত্মার এই জড়িয়ে নেওয়াকেই বলছেন *অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, অর্থাৎ নিজের শরীরের প্রতি আসক্তি আর তার সাথে আশেপাশে যারা আছে তাদের প্রতিও আসক্তি, স্ত্রী-পুত্রের সাথে আসক্তি, গাড়ি-বাড়ির সাথে আসক্তি, গয়না, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের সাথে আসক্তি। আমাদের যেমন বিভিন্ন জিনিষের প্রতি আসক্তি হচ্ছে ঠিক তেমনি অন্তঃকরণের সাথে জীবাত্মার আসক্তি হয়ে যায়। অন্তঃকরণ পুরোপুরি জড়। আমি তার সামনে যখন তার মনের মত কিছু রেখে দেব তখন সে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, তার বিপরীত জিনিষ দেখালে সে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আত্মার এগুলো হওয়ার কথা নয়। কারণ, এর আগেও আমরা বলেছি যে আত্মা অপরিবর্তনশীল। কিন্তু সেই জীবাত্মা মনের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ে যে মনের যখন কিছু হয় তখন মনে করতে থাকে আমারই যেন কিছু হয়েছে। জীবাত্মা আর পরমাত্মার এটাই পার্থক্য। এই জিনিষটাকেই একটু পরেই অন্য একটা মন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হবে। জীবাত্মা হলেন শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত। কিন্তু সে

মনে করে আমি আনন্দিত হলাম, আমি দুঃখিত হলাম। যার জন্য বিচার করতে বলা হয়, বিচার করে দেখ এই আমিটা কে? ভালোটা লাগছে তো ইন্দ্রিয়ের। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের সাথে মন জড়িয়ে আছে বলে মন আনন্দিত হয়ে গেল। কিন্তু আমার যে আমি বোধ হচ্ছে সেটা হচ্ছে শুদ্ধ আত্মা। সমস্যা হল মন যখন নিজেকে সুখী মনে করে তখন শুদ্ধ আত্মাও মনে করছে আমিই সুখী হলাম। এটাই আত্মার দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার কারণ। ইন্দ্রিয়ের সাথে কি হচ্ছে, মনের মধ্যে কি হচ্ছে এগুলোর আত্মার কোন ব্যাপারই নয় কিন্তু মিছিমিছি সে এদের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে মনের আনন্দে নিজের আনন্দ অনুভব হয়, মনের দুঃখে সেও ব্যাথিত হয়। ফলে কি হচ্ছে? *স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানাঃ*, জীবাত্মা রোজ নতুন নতুন জন্ম নিতেই থাকছে। এইক্ষণে সে সুখী, এইক্ষণে সে দুখী, এইক্ষণে সে রেগে গেল, এইক্ষণে সে মজা পেল। অনবরত তাঁর স্বভাবটা পাল্টাতে থাকে।

আচার্য বলছেন – *বহুধা অনেকধা ক্রোধহর্ষাদি-প্রত্যয়ৈর্জায়মান ইব জায়মানঃ*। যেন জন্ম নিচ্ছে। কেন? আমার ক্রোধ হয়েছে, আমি আনন্দিত – আমি আর ক্রোধ বৃত্তিটা এক হয়ে গেছে, আমি আর আনন্দের বৃত্তিটা এক হয়ে গেছে। একটা কথা প্রায়ই বলা হয় – পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করো না। এই ব্যাপারে স্বামীজী বলছেন I can walk twenty miles to see a man who can distinguish between the sin and sinner। যে পাপ আর পাপীর মধ্যে তফাৎ করতে পারবে এই রকম লোককে দেখার জন্য আমি কুড়ি মাইল হাঁটব। পাপ আর পাপীর মধ্যে কে তফাৎ দেখতে পারে? যিশু খ্রীষ্টের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবরাই দেখতে পারেন। পাপ আর পাপীর তফাৎ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ, ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ ছাড়া কেউ দেখতে পারে না। সাধারণ লোকের কাছে পাপ আর পাপী এক, এটাই বাস্তবিকতা। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে আমি আর আমার আনন্দ কি কখন এক হতে পারে? কখনই না।

মানুষ সব কিছু লুকাতে পারে কিন্তু নিজের আবেগকে কখন লুকাতে পারেনা। মজা করে বলা হয়, ট্যাক্সিতে একজন মহিলা আর পুরুষ উঠেছে। সেই মহিলাটা কি পুরুষটির স্ত্রী না প্রেমিকা কি করে বোঝা যাবে? প্রেমিকা হলে খুব মিষ্টি করে কথা বলতে বলতে যাবে আর স্ত্রী হলে সারা রাস্তা ঝগড়া করতে করতে যাবে। মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন মানুষ কখনই নিজের আবেগকে লুকাতে পারেনা। একটা ছেলে পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করে সারপ্রাইজ দেবে বলে গোমড়া মুখ করে বাড়িতে মায়ের কাছে হাজির হয়েছে। মা জিজ্ঞেস করছে কি রে কি খবর বল। ছেলে সেই গোমড়া গোমড়া মুখ করে বলছে, আমার দ্বারা কি আর ভালো রেজাল্ট সম্ভব! মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন যতই সে তার আনন্দকে লুকোবার চেষ্টা করুক সে ধরা পড়বেই, তার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, তার হাঁটাচলাতেই আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে। মুখের ভাবে সে চাপা দিয়ে রাখতে পারবে কিন্তু বডি ল্যাঙ্গোয়েজ কক্ষণ সে পাল্টাতে পারবে না। কারণ ব্রেনে যে নিউরো ট্রান্সমিটারস আছে ওরা এই চালাকিগুলো বোঝে না।

এই যে নানান রকমের প্রত্যয়, হর্ষ, ক্রোধাদির জন্ম হচ্ছে, এখন প্রচণ্ড ভাবে যে রেগে গেছে সে এখন যতই চেষ্টা করুক ক্রোধের ভাবকে লুকাতে পারবে না। তাহলে আমি আর আমার ক্রোধ কি আলাদা? কখনই আলাদা নয়, আমিই ক্রোধ, ক্রোধই আমি। আমি আর আমার ক্রোধ এক। তাহলে এই যে আমি, আমার জীবাত্মা এখন কি হয়ে গেল? ক্রোধে পরিবর্তিত হয়ে গেল। হর্ষ হল, তখন আনন্দে পরিবর্তিত হয়ে গেল, দুঃখ এলে দুঃখে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেইজন্য বলছেন *বহুধা জায়মানঃ*। এই জীবাত্মা আমার আপনার সবার ভেতরে বিদ্যমান, তাঁকে কেন্দ্র করেই এই শরীর, মন সব কিছু চলছে। অথচ এই আত্মা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যেন নতুন নতুন ভাবে জন্ম গ্রহণ করছে – *বহুধা জায়মানঃ*, এর মধ্যে কোন কবিত্ব নয়, এটি একেবারে সোজা বাস্তব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের পরিহাস এই যে এগুলো জীবাত্মার কোন ব্যাপারই নয়। এই জীবাত্মাই যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামীজী হয়ে যাবেন তখন সে আর নিজেকে অন্তঃকরণের সঙ্গে জুড়বে না, তখন সে শুদ্ধ ব্রহ্মের সঙ্গে জুড়ে নেয়। তখনও সব কিছুই হবে, আনন্দ হবে, দুঃখ আসবে, ভালো-মন্দ সব কিছুই চলতে থাকবে কিন্তু জীবাত্মা তখন আনন্দেও লাফাবে না আর দুঃখেও ভেঙে পড়বে না। এখন সব কিছুতে উদাসীন হয়ে গেছে, এটাই জীবনমুক্তি। এগুলো বলা হল মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে। কিন্তু লৌকিক পুরুষদের নামে আচার্য বলছেন

– *লৌকিকা হৃষ্টো জাতঃ ক্রুদ্ধো জাতঃ ইতি*, এই লোকটি রেগে গেছে, ইনি আনন্দিত হয়েছেন, ওর ছেলে হয়েছে, ওর মেয়ে হয়েছে, সে ক্রুদ্ধ হয়েছে, লৌকিক পুরুষদের এই ভাবে এক এক দিনে, এক এক ঘন্টার মধ্যে যেন কত জন্ম হয়ে চলেছে।

গুরু তাই শিষ্যকে বলছেন, এই জিনিষগুলোকে ভালো করে বুঝে নিয়ে ওঁঙ্কারকে আলম্বন করে ওঁএর চিন্তা করতে করতে ধ্যানের গভীরে ডুব দাও। শৌনক অঙ্গিরস মুনির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন কোনটাকে জানলে সব কিছুকে জানা যায়, *কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*। শৌনককে অঙ্গিরস বলছেন ওঁমকে জানলে সব জানা যায়। পরা বিদ্যার এটাই ফল। আচার্য যা বলবার সব কিছু বলে দিয়েছেন। কিন্তু বলে দিলেই তো সব কিছু হয়ে যাবে না। শিষ্য এখন সব রকম কর্ম, যত রকম অপরা বিদ্যা আছে ত্যাগ করে এবার সাধনার পথে নেমে গেল। সাধনার পথে নেমে গেলেই তো সব হাতের মুঠোতে চলে আসবে না। কত রকমের বিঘ্ন আসবে। জপ করতে বসলেই ঘুম পাবে, আর তখনই মনে পড়বে এই কাজ করা হয়নি, এই কাজটা এইভাবে করলে হত ইত্যাদি। কিন্তু এই বিঘ্ন গুলো কিছুই নয়, সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় এই বিঘ্নগুলো সবারই আসবে। ঘুম পাওয়া, গা চুলকানো, কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়া এগুলো সাধকের এলাকাতেই হয়। কিন্তু বড় বড় মারাত্মক ধরণের বিঘ্নগুলো আসতে শুরু হয় উচ্চ সাধনাতে যখন যায়। এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দেবে সাধকে আর একাগ্র হতেই দেবে না বা এমন কিছু করে দেবে যে তাকে ওই পথকে ছিটকে অন্য দিকে ঠেলে দেবে। গুরু জানেন, গুরুকৃপা ছাড়া সাধনা কখনই সম্ভব হয় না। সব বিঘ্নকে অতিক্রম করার পর এবার শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে, কিন্তু তারপর আর কিছুতেই শেষ পর্যায়টা অতিক্রম করা যায় না। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে শেষ ধাপটা পেরোন যায় না। সেইজন্য বলে তাঁর ইচ্ছা। এবার সে নিজের এলাকাকে অতিক্রম করে তাঁর এলাকায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর এলাকায় প্রবেশ করা অর্থাৎ কিনা তাঁর দর্শন কোন দিনই হবে না।

কিন্তু এতো গেলে ঈশ্বরের কৃপা। এখানে ঈশ্বরের কৃপার কথা আলোচনা করা হচ্ছে না, তার নীচের ধাপের কথা বলা হচ্ছে যেখানে নানান রকমের বিঘ্ন আছে। যাদের সঙ্গে সাধকের কোন পরিচিতি নেই তারা নিজেদের ঝামেলা গুলো এনে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। হয়তো একটা পুলিশ কেস হয়ে গেল, কিংবা মিথ্যা কোন একটা বদনাম হয়ে যাবে। ঘুম পাওয়া, গা চুলকানো এগুলো প্রাথমিক স্তরে হয়। সাধনা করতে করতে যত উপরের দিকে যেতে থাকবে তত বড় বড় বিঘ্ন আসতে শুরু করবে। তবে শেষের দিকে একটা মারাত্মক বিঘ্ন আসে যখন মনে হয়ে ধ্যুৎ, এগুলো সব মনের কল্পনা, ঈশ্বর-ফিশ্বর বলে কিছু নেই। এই সংশয় একটা বিরাট বড় বিঘ্ন। সংশয় বিঘ্ন এসে গেলে হয়তো আসন-টাসন তুলে ফেলে দেবে। গুরু তাই শিষ্যকে ভরসা দিয়ে বলছেন, দেখো বাপু এই পথ খুবই বিঘ্নসঙ্কুল ও কঠিন কিন্তু আমি তোমাকে আশীর্বাদ দিচ্ছি। কি আশীর্বাদ? *স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ* - তুমি যেন এই অন্ধকারের পারে যেতে পার। *তমসো মা জ্যোতির্গময়*। তমস্ এখানে অবিদ্যা, অজ্ঞানকে বোঝাচ্ছে। এই অবিদ্যার পারে যেন তুমি নির্বিঘ্নে যেতে পার এই আশীর্বাদই করছি, কামনা করছি না, আশীর্বাদ করছি – *স্বস্তি বঃ*। এতক্ষণ শিষ্য ছিল দেহাত্ম স্বরূপে, দেহের সাথে জীবাত্মাকে এক করে রেখেছিল, খুব হলে মনের সাথে এক করে রেখেছিল। এখান থেকে তুমি যেন অবিদ্যার পারে ব্রহ্মাত্ম স্বরূপে অবস্থিত হয়ে ব্রহ্মেই যেন তোমার আত্মবুদ্ধি হয়ে যায়।

এখনও পরা বিদ্যার আলোচনা চলছে। অপরা বিদ্যা হল কর্ম প্রবাহ, পরা বিদ্যা হল সরাসরি জ্ঞান। পরা বিদ্যাকে জ্ঞান দিয়েও জানা যায় না। পরা বিদ্যাতে সরাসরি জ্ঞান আসে, কোন মাধ্যমের দরকার হয় না। এই পরা বিদ্যা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, যেখানে নিয়ে যাবে সেই অবস্থাটি কেমন, সেই দেশটি কেমন? এই যে স্বামীজী গান করছেন মন চল নিজ নিকেতনে, এই যে নিজ নিকেতন এটাই হল পরা বিদ্যার প্রদেশ। ঠিক ঠিক বলতে পরা বিদ্যা কোথাও নিয়ে যায় না। তিনি তো সর্বব্যাপী তাই তিনি আমাদের আর কোথায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু শিষ্য এখনও অনভিজ্ঞ, তাই তাকে বোঝাবার জন্য এত কিছু বলছেন। পরের মন্ত্রে ব্রহ্মের

মহিমাকে অন্য ভাবে প্রকাশ করছেন। এই বিষয়টি বোঝা বা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, সেইজন্য নানান ভাবে নানান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে।

অদ্বৈত বলতে সব সময় লোকে মনে করে এক। কিন্তু অদ্বৈত এক দুয়ের পার। সাধারণতঃ গণনা শুরু হয় এক থেকে নাহলে শূন্য থেকে। হিন্দু শাস্ত্রে কিন্তু গণনা শুরু হয় দুই থেকে। এটা একটি আশ্চর্যের ব্যাপার। শূন্য বললে বৌদ্ধ হয়ে যাবে। এক বললে মুসলমান হয়ে যাবে। হিন্দুদের গণনা সব সময় দুই থেকে শুরু হয়। দুইয়ের আগে কি আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। স্বামীজী অদ্বৈতর জন্য absolute শব্দ ব্যবহার করতেন। যিনি আছেন তিনিই আছেন, এখানে এক দুই শূন্য এগুলো কিছুই বলা যাবে না। যিনি আছেন তিনিই আছেন, কি আছে মুখে বলা যাবে না, শুধু মাত্র অনুভব সাপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মের অনুভব যখন হচ্ছে তখন আমিটা চলে যায়। আমি চলে যাওয়া মানে আর কিছু নেই, এখন কে বলবে? যেমনি আমি এসে যাবে তখন প্রথমে দুই এসে যায়, আমি আর তিনি, একও থাকে না শূন্যও থাকে না। ঠাকুরের দশটি ঘটের উপমাটা সব সময় মনে রাখতে হবে। দশটি জলপূর্ণ ঘট তাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ছে। কটি সূর্য আছে? দশটি প্রতিবিম্ব সূর্য উপরে আসল সূর্য মোট এগারটি সূর্য। এবার একটি একটি করে নটি ঘট ভেঙে দেওয়া হল। এখন কটি সূর্য? একটি প্রতিবিম্ব সূর্য আর উপরে আসল সূর্য মোট দুটি সূর্য। এবার শেষ ঘটটিকেও ভেঙে দেওয়া হল। এখন কটি সূর্য থাকবে? ঠাকুর যাকে জিজ্ঞেস করছেন সেই ভক্ত বলছে একটি সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বলছেন, না, কি আছে সেটা মুখে বলা যায় না। তার মানে দুই পর্যন্ত আছে, দুইয়ের পরে আর কিছু বলা যাবে না। একও থাকে না শূন্যও থাকে না। এগুলো ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, ঠাকুর তাই বলছেন শুনে যেতে। সময় না হলে কিছু হবে না, তবে শুনে রাখা ভাল। অনেক দিন ধরে শুনতে শুনতে ধারণা হতে শুরু হয়। তারপর যখন সাধনা করতে শুরু করবে তখন কিছু উপলব্ধি হলে মনে হবে, তাইতো এটা কোথায় যেন শুনেছিলাম। ঠিক এই কারণেই গুরু শিষ্যকে বার বার নানান ভাবে ব্রহ্মের ব্যাপারে বলে যাচ্ছেন। ব্রহ্মপ্রদেশ বলতে কিছু হয় না, কারণ তিনি অণু থেকে অণু আবার মহৎ থেকেও মহৎ। সব জায়গাতে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া কিছু নেই। একটা মানুষকে জানতে হলে তার মাথা জানতে হবে, তার হাত কোনটা, পা কোনটা জানতে হবে, এই রকম কত কিছু জানতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য এত কিছু জানতে হয় না। একটু জানলে সবটাই জানা যায়, একটুকে ধরতে পারলে পুরোটাই ধরা হয়ে যায়। অথচ তিনি অনন্ত। তাঁরই বর্ণনা করা হচ্ছে পরের মন্ত্রে –

যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।।
মনোময় প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।।২/২/৭।।

(যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্ যাঁর মহিমা জগদ্ব্যাপী, সেই আত্মাই জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম-মধ্যস্থ আকাশে অবস্থিত থাকেন।

মন-অভিমানী হয়ে তিনি প্রাণ শরীরের পরিচালক (নেতা) এবং অন্নের দ্বারা পুষ্ট শরীরে তাঁর অবস্থিতি হৃদয় অনুভূত হচ্ছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে দেখেন – তিনি আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ রূপে বিভাসিত হন।)

উপনিষদের কোন মন্ত্রই বৃথা থাকে না। কখন সখন একটি কি দুটি মন্ত্র থাকে যার ব্যাখ্যা পরের মন্ত্রে থাকে। এছাড়া প্রত্যেকটি মন্ত্রই নিরেট খাঁটি সোনা। যখনই আধ্যাত্মিক ভাবকে মানুষের সামনে উপস্থাপনা করতে হয় তখন উচিৎ বিশুদ্ধ বেদান্তকেই সামনে তুলে ধরা। স্বামীজী এই ব্যাপারে কখনই কোন আপোষ করেননি। মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবতাদিতে যে নানা রকমের কাহিনী, নানা রকমের আবেগপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা আছে সেগুলোকেও মানুষের সামনে রাখা দরকার কিন্তু একটা জায়গায় তার সীমা টেনে দিতে হয়। এই ধরণের

ঘটনাগুলোকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে সেটাকে টেনে নিয়ে শেষে বিশুদ্ধ বেদান্তের সাথে মিলিয়ে দেওয়া যায়। সেদিক থেকে এই মন্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়ে নয় নং মন্ত্রে বলা হয়েছিল *যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ*। এখানে *সর্বজ্ঞ* আর *সর্ববিদ্* দুটি শব্দের অর্থ একই কিন্তু পৃথক শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। *সর্বজ্ঞ* মানে সাধারণ ভাবে জানা, তিনি পুরোটাই জানেন আর *সর্ববিদ্*এর অর্থ বিশেষ রূপে জানা। তিনি আলাদা আলাদা ভাবেও জানেন। অবতার আর সাধারণ জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সাধারণ জ্ঞানী যিনি তিনি যেন বইয়ের একটি একটি করে পাতা উল্টে দেখে নিচ্ছেন কিন্তু অবতার পুরুষ পুরো বইটাই এক সঙ্গে দেখে নিতে পারেন। আমরা একটা লাইন বা শব্দের পর শব্দ দেখে দেখে জানছি। যিনি ভগবান তিনি সর্বজ্ঞ তিনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই জানেন আর যে কোন ব্যক্তিকে আলাদা ভাবেও জানেন। কারণ ব্রহ্ম অনু রূপেও বিদ্যমান, বিভু রূপেও বিদ্যমান আবার প্রভু রূপেও বিদ্যমান। বিশেষ রূপেও জানবেন আর সামগ্রিক রূপেও জানবেন। সাধারণ ভাবে জানা মানে সম্পূর্ণ রূপে জানা, বিশেষ রূপে জানা মানে ছোট্ট রূপে জানা। তিনি সামগ্রিক ভাবেও জানেন আবার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা পিঁপড়ের ভবিষ্যতও তাঁর জানা। ঠাকুর বলছেন তিনি পিঁপড়ের পায়ের নুপুরের ধ্বণিও শুনতে পান।

এই ব্রহ্মের মহিমাটা কি? মহিমা বলতে আমরা সাধারণতঃ অর্থ করি মাহাত্ম্য। ঠাকুর বলছেন যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই, গাড়ি নেই সে বাবু কিসের বাবু! যে ভগবানের ঐশ্বর্য নেই সেই ভগবান কিসের ভগবান। এখানে কিন্তু ঐশ্বর্যের কথা না বলে মহিমার কথা বলা হচ্ছে। ব্রহ্মের যদি মহিমা না থাকে তাহলে তাঁর তো আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। আমরা প্রায়ই এই ভুলটা করি যে যিনি নির্গুণ নিরাকার তার যেন কিছুই নেই। কিন্তু এই নির্গুণ নিরাকারেরই আবার সগুণ সাকার রূপ। এখানে সগুণ ব্রহ্মের মহিমার কথা বলা হচ্ছে, কারণ নির্গুণ নিরাকার একেবারে শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁর মহিমা বলে কিছুই থাকার কথা নয়। যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তিনিই আবার সগুণ ব্রহ্ম, তাঁর মহিমা হল *ভুবি*। *ভুবি* মানে, এরা আগে বলা হয়েছে দ্যুলোক, পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি এই সৃষ্টি আদির যা কিছু দেখা যাচ্ছে এগুলো সব তাঁরই মহিমা। ভুবি মানে যা কিছু হয়েছে, ভু ধাতু থেকে ভুবি। পুরুষসূক্তমেও আছে *এতাবানস্য মহিমা*, এই সৃষ্টিটা পুরুষের মহিমা। তাঁর মহিমাকে প্রকাশ করাবার জন্যই এই সৃষ্টি। একজন চিত্রকরের মহিমা প্রকাশ পায় তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃজনশীলতায়। একজন গায়কের মহিমা জানা যায় তাঁর সুকণ্ঠের সঙ্গীতে। ঠিক তেমনি এই ব্রহ্মের, যাঁর কথা এতক্ষণ ধরে চলছে, যাঁকে উপলব্ধি করার জন্য সাধক সর্বস্য ত্যাগ করে সাধনা করছেন, তাঁর মহিমা হল এই ভুবি। শুধু তাই নয়, আচার্য আরও বলছেন – এই যে দ্যুলোক, পৃথিবীলোক এদের কেউ ধারণ করে আছে বলেই নিজের নিজের জায়গায় স্থির রয়েছে। *সূর্যাচন্দমসৌ যস্য শাসনেহলাতচক্রবদজস্রং ভ্রমতঃ*, এই সূর্য, চন্দ্র, অজস্র গ্রহ, নক্ষত্র যত আছে সব *অলাতচক্র*। *অলাতচক্র* মানে, একটা জ্বলন্ত মশালকে হাতে নিয়ে যদি ঘোরান হয় তখন মশালের আগুনকে মনে হবে একটা আগুনের বৃত্ত, এটাকেই বলা হয় অলাত। এই যে সূর্য চন্দ্রই ঘুরছে এরা কেউই নিজের সীমাকে অতিক্রম করছে না। সবাই নিজের নিজের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে চলেছে, কেউ নিজের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা বলবেন এটা মাধ্যাকর্ষণের জন্যই সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন, কিন্তু আমাদের কাছে মাধ্যাকর্ষণটাও তাঁরই মহিমার প্রকাশ।

একটা শাসনের কথা বলা হল, অন্য আরেকটি শাসনে কি করছেন বলছেন। *যস্য শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরং নাতিক্রামন্তি*, নদী একটা নির্দিষ্ট গতিতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, নদী যদি কোন দিন উল্টোদিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে তখন অনেক বিপর্যয় এসে যাবে, কিন্তু তিনি এটা হতে দেবেন না। সমুদ্রও কখন নিজের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করবে না। শ্রীরামচরিতমানস বা অন্যান্য রামকথাতে যদিও আমরা অন্য ধরণের বর্ণনা পাই যেখানে সমুদ্র আজ্ঞা পালন না করাতে শ্রীরামচন্দ্র বললেন সমুদ্রকে আমি দগ্ধ করে দেব। বাল্মীকি রামায়ণে এসব কিছু পাওয়া যাবে না। শ্রীরামচন্দ্র যখন বললেন আমি সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেব তখন সমুদ্র দেবতা এসে বলছেন – আমি ভয়ে বা প্রলোভনে বশীভূত হয়ে আমার মর্যাদাকে কখনই উল্লঙ্ঘন করব না। সমুদ্র দেবতা স্পষ্ট করে শ্রীরামচন্দ্রকে বলে দিলেন আমি আপনাকে পথ দিতে পারিনা এবং আমি

পথ দেব না। কিন্তু বাল্মীকির পরে যত রামকথা রচিত হয়েছে সেখানে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, ভগবানকে কি করে সমুদ্র এত বড় বড় কথা বলতে পারবে! কিন্তু যিনি ভগবান তিনিই সবার মর্যাদাকে বেঁধে দিয়েছেন, সেই ভগবানই আবার এসে তাঁরই ঠিক করে দেওয়া মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করাবেন না। ভাবরাজ্যে পার করাতে পারেন। ঠাকুর বলছেন – আমার যা কিছু দিব্য দর্শনাদি হচ্ছে এগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে ওই পাথরটা তিন বার লাফাবে। ঠাকুর দেখলেন পাথরটা তিন বার লাফাল। পাথরের এই তিনবার লাফান, এটা তো প্রকৃতির নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করা হল। কিন্তু এগুলো হল ভাবরাজ্যের বস্তু। ঠাকুর যেটা দেখছেন পাথর তিন বার লাফাল, তিনি ঠিকই দেখেছেন যে পাথর লাফাচ্ছে, কিন্তু ভাবরাজ্যে লাফাবে। সেখানে আরও কেউ যদি থাকতেন তাঁরা কিন্তু পাথরের এই লাফানিটা দেখতে পেতেন না। ঠাকুরই শুধু দেখবেন। তাহলে কি এটাকে আমরা কল্পনা বলব? না, কোন কল্পনাই নেই, একেবারে সত্য। কিন্তু ভাবরাজ্যে লাফাচ্ছে, ভাবরাজ্য পুরো আলাদা একটা রাজ্য। তুলসীদাস এনারা কবির কল্পনার মাধ্যমে এই ভাবরাজ্যকে দাঁড় করিয়েছেন। বাল্মীকি এসব কিছু করলেন না, তিনি পুরোপুরি কবি যেমনটি করেন সেই ভাবে নিয়ে গেছেন। সমুদ্র তাই বলছেন ভয়েই হোক আর লোভেই হোক মর্যাদাকে আমি লঙ্ঘন করবো না। যদিও বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান রূপে বর্ণনা করেননি, কিন্তু তিনি যদি ভগবানও হন তাহলে সমুদ্র বলত, আপনি ভগবান আপনি নিজে এই মর্যাদা তৈরী করেছেন আমি এই মর্যাদাকে ভাঙতে পারবো না। সমুদ্র দেবতা এসব বলার পর বললেন, তবে আমি আপনাকে একটা পথ বলে দিচ্ছি, আপনি আমার উপর একটা সেতুবন্ধন তৈরী করুন, পথ আমি আপনাকে দিতে পারবো না।

আচার্য ঠিক এটাই বলছেন, জগতে যা কিছু আছে সবাইকে একটা মর্যাদা দিয়ে তিনিই পরস্পরকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছেন। এই যে পাখা ঘুরছে, এর পেছনে ইলেট্রিসিটি আছে, ম্যাগনেটিক ধাতুতে সেই বিদ্যুৎএর সম্পর্ক হচ্ছে তারপর কতকগুলো নিয়মকে অনুসরণ করেই এই পাখাকে ঘুরতে হবে, সেই নিয়মে ঘোরা ছাড়া অন্য কিছু পাখা করতে পারবে না। কারণ তাঁর ইচ্ছা এর পেছনে কাজ করছে। ঠাকুর তাঁর খুব সহজ ভাষায় বলছেন – তিনি বিধান করে রেখেছেন লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে। এটাই লঙ্কার ধর্ম, এই ধর্মকে লঙ্কা কখনই অতিক্রম করবে না। এই যে কোন বস্তু তার ধর্মকে অতিক্রম করতে পারছে না এটাই ঈশ্বরের মহিমা। এর ধর্ম ওর ধর্ম আমার পছন্দ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আমার আপনার ব্যাপার। সাপ ছোবল দিলে মানুষ মরবে এও ঈশ্বরের মহিমা। আবার রোজা সাপের বিষ নামিয়ে বাঁচিয়ে দিচ্ছে সেটাও তাঁরই মহিমা। আমরা কোনটাকে ভালো মনে করছি কোনটাকে খারাপ মনে করছি সেটা আমাদের সমস্যা। কিন্তু এটাই সত্য যে, যা কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে কোন পদার্থই তার মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করবে না। কঠোপনিষদে একই কথাকে ঘুরিয়ে বলছেন *ভয়াদাস্যাগ্নিস্তপতিঃ ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যোর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।* সমস্ত দেবতারা নিজের নিজের কাজ করছেন তিনি আছেন বলে। তিনি না থাকলে সব কর্ম বন্ধ হয়ে যাবে।

দুই ধরণের সৃষ্ট পদার্থ নিয়ে এই জগৎ - স্থাবর আর জঙ্গম। যে সব পদার্থ নিজের জায়গাতে স্থির হয়ে আছে যেমন গাছপালা, পাথর, পর্বত এগুলো সব স্থাবর। আর জঙ্গম যে সব পদার্থ চলে, যার মধ্যে গতি আছে। স্থাবর জঙ্গম যা কিছু পদার্থ আছে সব কিছুই নিজের নিজের মত অবস্থান করবে। তাঁর শাসনে কেউ এক জায়গাতে স্থির আবার তাঁরই শাসনে কেউ চলছে। এটাই ঋতম্। ঋতমের জন্যই সব কিছু একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চলছে, তাই ভগবানেরই আরেকটি রূপ ঋতম্, মানে Divine Law। শুধু তাই নয়, আচার্য বলছেন *ঋতোবোহয়নে অব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি* – অর্থাৎ এই যে ঠিক সময়ে মাস, ঋতু, অয়ন (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ – ছয় মাসকে বলা হয় অয়ন), বর্ষ, এই সব কিছু হয় তিনি আছেন বলে। *তথা কর্তারঃ কর্মাণি ফলং চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্তন্তে* – এছাড়া তিনি আছেন বলে কর্তা, কর্ম আর তার ফল কেউ কারুর সীমাকে অতিক্রম করতে পারেনা। ভালো কর্মের ভালো ফল আর খারাপ কর্মের খারাপ ফল কর্মের কর্তার কাছেই আসবে। আমি বাজে কাজ করলে তার ফল অন্য কারুর কাছে কখনই যাবে না। অন্য কেউ ভালো কাজ করল আর আমি তার ভালো ফলকে কখনই নিজের অনুকূলে টেনে আনতে পারবো না।

কর্তা, কর্ম ও ফল এই তিনটের সাম্য কখনই নষ্ট হবে না। সেইজন্য তাঁর আরেকটি নাম উপদ্রষ্টা, গীতাতেও ভগবান বলছেন *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ*। উপদ্রষ্টা রূপে তিনি আছেন বলেই সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁর ঘরে বসে আছেন বলে কলেজের অধ্যাপকরা অধ্যাপনা করছেন, ছাত্ররা অধ্যয়ণ করছে। রেলমন্ত্রী আছেন বলে রেলের সব কিছু ঠিক মত চলছে। ঠিক তেমনি তিনি সুপারভাইজার রূপে আছেন বলে জগতে সব কিছু নিয়মে চলছে। ঠাকুর বলছেন – তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটিও নড়তে পারে না। আমরা বলতে পারি গাছের পাতা নড়ছে বাতাসের জন্য। ঠিকই, কোন সন্দেহ নেই। বাতাস কিসের জন্য চলছে? পৃথিবীর গতির জন্য এবং সূর্যের উত্তাপ আর বরফের ঠাণ্ডার জন্য বাতাস চলছে। কেউ আপত্তি করবে না, সবই ঠিক বলা হচ্ছে। এগুলো কেন এই রকমই হচ্ছে? এইভাবে ঘুরে ঘুরে শেষে সেই জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছাবে যেখানে দেখা যাবে ঈশ্বরই এই বিধানগুলো আগে থাকতেই করে রেখেছেন, এটা হলে ওটা হবে, ওটা হলে এটা হবে।

হিন্দুধর্মে সব কিছুর জন্য আলাদা শব্দ আছে কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার জন্য কোন শব্দ নেই। ওনারা জানতেন স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু হয় না। সবটাই তিনি করছেন। কর্ম আছে আবার কর্মফলও আছে, কিন্তু কর্ম আর ফল দুটো আলাদা জিনিষ, কিন্তু দুটোকে একসাথে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা বলে কোন শব্দই নেই। স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু হয় নাকি? স্বাধীন ইচ্ছা অন্য ধর্মের সমস্যা, অন্যান্য ধর্মে আমারও ইচ্ছা আছে আবার ঈশ্বরেরও ইচ্ছা আছে। এখানে যে পর পর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল, এর পরেও যত আলাদা আলাদা ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি ইত্যাদি নিয়ম আছে সবটাই তাঁর মহিমা। যত রকমের সৌন্দর্য আছে, গাছের ফুল, মায়ের ভালোবাসা সবটাই তাঁর মহিমা। আর ক্ষমতা, উর্জা, তেজ সম্পন্ন যা কিছু আছে সেটাও তাঁরই মহিমার প্রকাশ। এই মহিমাকে দেখে বোঝা যায় এগুলোর যিনি মালিক তিনি কি রকম।

সংসারে এই যাঁর মহিমা, কার মহিমা? সগুণ ব্রহ্মের, ঈশ্বরের। *স এষ সর্বজ্ঞ এবংমহিমা দেবঃ দিব্যে দ্যোতনবতি*, এই ধরণের মহিমার যিনি সর্বজ্ঞ দেব তিনি হলেন দিব্য দ্যুতিমান। কেন তিনি দ্যুতিমান? যেখানে যেখানে বুদ্ধির প্রকাশ ও কার্য দেখা যায় সেখানে সেখানে তিনিই আছেন। আর *দিব্যে ব্রহ্মপুরে*, পুর মানে নগরী কিন্তু এই ব্রহ্মনগরী বাইরে কোথাও নেই, হৃদয়ের ভেতরেই ব্রহ্মপুর। এখানে স্থূল জৈব হৃদয়ের কথা বলা হচ্ছে না, আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ সেই আকাশকে বলা হচ্ছে ব্রহ্মপুর, এখানেই ব্রহ্মের বাস। এই ব্রহ্মপুরে সেই চৈতন্য শক্তির প্রকাশ সর্বক্ষণ হয়ে চলেছে। চৈতন্য স্বরূপ তিনি সেখানে আছেন বলেই এই শরীর, মন, বুদ্ধি কাজ করছে। এর সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই, যোগীরা যখন ধ্যান করেন তখন ধ্যানের সময় তিনি এইখানেই চৈতন্য জ্যোতির দর্শন করেন। চৈতন্য জ্যোতি এই জাগতিক আলো নয়, একটা জ্যোতি যে জ্যোতি প্রাণবন্ত। *দিব্যে ব্রহ্মপুরে*, হৃদয়াকাশে এই দিব্য দ্যুতিমান প্রাণবন্ত জ্যোতিকে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে সক্ষম হন। ঠাকুর এইজন্য বলছেন, হৃদয় হল ডঙ্কামারা জায়গা। ধ্যানের গভীরে যোগী স্পষ্ট দেখতে পান হৃদয়কমলে যে আকাশ রয়েছে সেই আকাশে একটা জীবন্ত ও চৈতন্যময় আলো বিদ্যমান। বলা হয় যতক্ষণ এই দিব্য জ্যোতির দর্শন না হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হবে না। দিব্য জ্যোতি দর্শন হয়ে গেলেই যে সব কিছু হয়ে গেল তা নয়। এখান থেকেই আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু হয়।

এই যে হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যস্থিত আকাশ, অনেক বলেন অষ্টদল পদ্ম, সেই আকাশে দিব্য চৈতন্যময় জ্যোতির দর্শন হয়। এই কথা বলার পর আচার্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন – *ন হ্যাকাশবৎ সর্বগতস্য গতিরাগতঃ প্রতিষ্ঠা বান্যথা সম্ভবতি* – যিনি আকাশতুল্য সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তাঁর পক্ষে কোথাও আসা-যাওয়া, কোথাও স্থিত হওয়া অন্য কোন ভাবে সম্ভব নয়। তার মানে, ব্রহ্মের যে সরাসরি অভিব্যক্তি, তিনি যে চৈতন্য জ্যোতি স্বরূপ সেটা একটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে একমাত্র এই হৃদয়কমলের মধ্যেই। একটা সময় সে দেখতে পায় সেই জ্যোতির প্রকাশ হয়ে গেছে। এটাই ব্রহ্মের একমাত্র অভিব্যক্তি, এছাড়া আর কোন ভাবে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির প্রকাশকে বোঝা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যপ্ত এটা মানুষ কোন দিন জানতে পারবে না। কারণ আমাদের যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিতে যতটুকু ধরে ততটুকু দিয়েই তাঁকে ধরা যাবে এর

বাইরে তাঁকে ধরা সম্ভব নয়, তিনি তো বিরাট। একমাত্র এই হৃদয়কমলেই তাঁকে দেখা যায়। এটাই ব্রহ্মের স্বরূপ। *দিব্যে ব্রহ্মপুরে* তিনি প্রতিষ্ঠিত বলার পর বলছেন ওই হৃদয়াকাশে একমাত্র মনোবৃত্তি দিয়েই তাঁকে জানা যায়। ধ্যানের গভীরে যত প্রবেশ করতে থাকবে ততই সমস্ত বৃত্তিগুলো শান্ত হতে থাকে বা অনেকটা যখন শান্ত হয়ে যায় তখন পরিষ্কার সেই দিব্য চৈতন্যময় জ্যোতিকে দর্শন করা যায়।

এই মন্ত্রের প্রথম দুটি লাইনের অর্থকে সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে – যিনি ব্রহ্ম, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, যা কিছু চলছে, যা কিছু স্থির হয়ে আছে সব তাঁরই মহিমা। তাঁর শাসন আছে বলে সব কিছু চলছে। তাঁকে কোথায় দেখা যায়? তাঁকে একমাত্র দেখা যায় হৃদয়াকাশে, যাকে অনাহত চক্র বলা হয়, ঠাকুর যে জায়গাকে ডঙ্কামারা জায়গা বলছেন। কি রূপে দেখা যায়? দিব্য চৈতন্যজ্যোতি রূপে তাঁকে দেখা যায়। এটাই মূল বক্তব্য। ঠাকুর যখন মাকালীর হাতের খড়্গ তুলে এনে নিজের গলা কেটে দিতে চাইছেন, তখন হঠাৎ ঠাকুর দেখছেন মাকালী তাঁকে ধরে নিলেন আর তিনি আলোর সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন।

সেই সময় ঠাকুরের কাছে যদি কেউ থাকত তারা কি এই আলো দেখতে পেত? না, কারণ এই জ্যোতির সমুদ্রের খেলা ঠাকুরের হৃদয়াকাশে সংঘটিত হয়েছিল। হৃদয়াকাশের সেই অনুভূতিটা ঠাকুরের মনের বৃত্তিকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু যা কিছু হওয়ার এই হৃদয় মধ্যেই হচ্ছে। এই আত্মাকে মনোবৃত্তি দিয়ে জানা যায়, মন যেন তাঁর উপাধি, সেইজন্য বলছেন *মনোময়ো*। এই আত্মাকে জানা যাচ্ছে মনের বৃত্তি দিয়ে। আর বলছেন *প্রাণশরীরনেতা*, প্রাণ আর শরীর এই দুটোকে মিলিয়ে বলা হয় প্রাণশরীর, এই প্রাণশরীর হল নেতা। কেন নেতা বলা হচ্ছে? নেতা আগে আগে নেতৃত্ব দিয়ে আমাকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতে নেতা শব্দের অর্থ হল যিনি সবাইকে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় নিয়ে যান। তিনি হলেন *প্রাণশরীরনেতা*। শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম তিনি আমার যে বাস্তবিক আমিকে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে নিয়ে যাচ্ছেন, এই শরীরটা তো বাস্তবিক আমি নয়। আমার যে সূক্ষ্ম শরীর এক শরীর থেকে আরেকটি শরীরে যাচ্ছে তিনি আছেন বলেই যেতে পারছে। অনেক সময় সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরকে ছাড়তে চায় না। যেমন কেউ খুন হয়ে গেলে শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর ওই শরীরকে ব্যবহার করা যাবে না। কিছুদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর আরেকটা শরীরে চলে যায়। কে নিয়ে যাচ্ছেন? ইনিই নিয়ে যান। এনার একটা নাম *মনোময়*, কারণ মনের বৃত্তি দিয়েই তাঁকে জানা যায়। আরেকটি নাম *প্রাণশরীরনেতা*, প্রাণ আর শরীরকে তিনিই এক শরীর থেকে আরেক শরীরে নিয়ে যান।

প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়, এখানে হৃদয় মানে বুদ্ধি। এর আগেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রায়ই যখন হৃদয় শব্দ ব্যবহার করা হয় সেটা বুদ্ধি অর্থেই ব্যবহার করা হয়। হৃদয়াকাশে শুদ্ধ আত্মা রয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে আত্মা নিজেকে জড়িয়ে ফেলার জন্য বুদ্ধির অবস্থান যেন সেই হৃদয়াকাশেই অবস্থিত হয়ে যায়। আমরা যে অন্নাদি খাদ্য গ্রহণ করছি, যার জন্য আমাদের যে স্থূল শরীর, যে শরীরের কোন গুরুত্ব নেই, সেই স্থূল শরীরের কখন বৃদ্ধি কখন হ্রাস হয়। দেখে মনে হয় আমি যেন রোগা হয়ে গেছি, আমি যেন মোটা হয়ে গেছি। এই যে শরীরের সাথে আমি নিজেকে একাত্ম মনে করছি, অন্যেরাও যে একাত্ম বোধ করছে শরীরের সাথে কারণ যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি বুদ্ধির সাথে নিজেকে এক মনে করে হৃদয়াকাশে বুদ্ধিকে বসিয়ে দিয়েছেন, আর সেই বুদ্ধি আবার এই স্থূল শরীরের সাথে নিজেকে এক করে নিচ্ছে। জীবিত স্থূল শরীরের সাথে বুদ্ধি এক হয়ে আছে বলে আমাদের দেহবুদ্ধি হচ্ছে, এই দেহবুদ্ধি কিছুতেই যেতে চায় না। সেইজন্য বলছেন *প্রতিষ্ঠিতোহন্নে*, অন্নে প্রতিষ্ঠিত মানে এই অন্নময় দেহটা অন্নের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বস্তুত যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম তিনি অন্নে প্রতিষ্ঠিত হন না। এটাই ব্রহ্মের প্রথম আবরণ। ব্রহ্মের পাঁচটি আবরণ – অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ আর আনন্দময়কোষ। শুদ্ধ ব্রহ্মের এই যে পাঁচটি আবরণ, এর মধ্যে প্রথমে তিনি অন্নময়ের সাথে একাত্ম মনে করছেন। এখানে অন্ন মানে অন্নময়কোষ, এই অন্নময়কোষের সাথে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে একাত্ম বোধ করেন না, বুদ্ধি একাত্ম হয়ে আছে অন্নময় শরীরের সাথে, ওই বুদ্ধির সাথে আবার আত্মার একটা মিলন হয়ে আছে বলে আত্মা যেন অন্নময়কোষে বাস করেন।

এই ব্যাপারটা খুব মজার আর অনেক রকম প্রশ্নও সামনে নিয়ে আসে। যাঁরা বেদান্তের কথা কিছু কিছু শুনেছেন তাঁরা এই ধরণের মন্তব্য শুনে থাকবেন যে, দেহটা মিথ্যা, দেহের দিকে দৃষ্টি দিও না, দেহের এই সৌন্দর্য দুদিনের এই সৌন্দর্যের জন্য যত্নবান হয়ো না ইত্যাদি। কথাগুলো ঠিকই কিন্তু দেহের যে সৌন্দর্য, দেহের প্রতি যে ভালোবাসা ও আকর্ষণ, এই ভালোবাসা ও আকর্ষণটা তাঁরই ভালোবাসা, তিনি এই দেহে বিদ্যমান বলেই এই আকর্ষণ জন্ম নিচ্ছে। কারণ এটাই, এখানে যেটা বলছেন *প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়*, এই অন্নে তিনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, এখানে অন্ন মানে চাল, ডাল, গম নয়, অন্ন মানে এই স্থূল শরীর। কিন্তু অন্নময় শরীরে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে সরাসরি বাস করছেন না। তাহলে কিভাবে বাস করছেন? বুদ্ধির মাধ্যমে। বুদ্ধি কোথায় আছে? হৃদয়পদ্মে যেখানে আত্মা বাস করেন সেখানে শুদ্ধ আত্মা বুদ্ধিকেও টেনে নিয়েছেন, আর বুদ্ধি সব সময় শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই প্রক্রিয়াতেই শুদ্ধ আত্মা অন্নময় শরীরে বাস করছেন। কিন্তু ঠিক ঠিক বাস করেন না, মনে হয় যেন তিনি বাস করছেন।

শুদ্ধ ব্রহ্মের মহিমার কথা বলতে গিয়ে প্রথমে শুরু করেছেন একেবারে বহির্জগত থেকে, সেখান থেকে টেনে আস্তে আস্তে আমাদের শরীরে নামিয়ে আনছেন। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর মহিমা। তিনি আছেন বলেই এদের এই স্থিতি, তিনি আছেন বলেই এরা সব নিজের নিজের কার্য করছে, তিনি আছেন বলেই সব কিছু নিজের নিজের কক্ষপথে ঘুরছে, গাছ ফল দিচ্ছে, গরু দুধ দিচ্ছে, নদী বয়ে যাচ্ছে, দিন, মাস, অয়ন, বর্ষ, ঋতু সব ঠিক সময় আসছে আবার চলে যাচ্ছে। যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে তিনি আছেন বলে। এটাই তাঁর মহিমা। এর পরের ধাপে এসে বলছেন, সেই ব্রহ্মকে যোগীরা ধ্যানের গভীরে হৃদয়াকাশে দিব্য চৈতন্যময় জ্যোতি রূপে দর্শন করেন। মনের বৃত্তি দিয়ে তাঁকে জানা যায় বলে তাঁর নাম *মনোময়*। আস্তে আস্তে পেছনের দিকে নিয়ে আসছেন। আবার তিনি এক শরীর থেকে আরেক শরীরে জীবকে নিয়ে যান সেইজন্য তিনি *প্রাণশরীরনেতা*। শুদ্ধ আত্মা যদি জীবের ভেতরে না থাকেন তাহলে এই দেহ থেকে সেই দেহে কখনই যেতে পারবে না। শেষ ধাপে বলছেন সেই আত্মা অন্নে প্রতিষ্ঠিত, অন্ন মানে অন্নময় দেহে প্রতিষ্ঠিত। কিভাবে প্রতিষ্ঠিত? বুদ্ধির সাথে আত্মা নিজেকে জড়িয়ে যেন এই অন্নময় দেহে প্রতিষ্ঠিত।

ধ্যানের গভীরে এই আত্মাকে যদি কেউ জানেন, কি জানেন? এই দেহের যা কিছু আছে সব তাঁরই জন্য, মনের যা কিছু আছে তাঁরই জন্যে, এই যে ধ্যানের গভীরে জানা যাচ্ছে তিনিই আছেন আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সব তাঁরই মহিমা, এটাকেই বলছেন *তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা*। ধীর ব্যক্তি যখন এই শুদ্ধ আত্মাকে হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ করেন তখন কি হয়? *আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি* – যত দুঃখ-কষ্ট যা কিছু ছিল সব নাশ হয়ে গিয়ে আনন্দরূপে নিমজ্জমান হয়ে যান। ধীর পুরুষ মানে যাঁরা বিবেকী পুরুষ, বিবেকী মানে যাঁরা সাধন পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরা কিভাবে জানেন? শাস্ত্র আর আচার্যের উপদেশের মাধ্যমে। শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেছি, গুরু থেকে উপদেশ পেয়েছি, বলছেন এতে কিন্তু কিছু হবে না। প্রথম শর্ত হল, গুরু উপদিষ্ট বেদান্ত বাক্য। বেদান্ত বাক্য হতে হবে, কিন্তু গুরু যেটা বলে দিয়েছেন, নিজে থেকে অধ্যয়ণ করলে হবে না গুরুর কাছে শুনতে হবে। শুনে নিলেই কিন্তু হবে না। দ্বিতীয় শর্ত – *শমদমধ্যানসর্বত্যাগবৈরাগ্যোদ্ভূতেন*, এবার আমাকে অনুশীলন করতে হবে। কি অনুশীলন? শম, দম, ধ্যান, সর্বত্যাগ এবং বৈরাগ্য। শম ও দম মানে ইন্দ্রিয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ, প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয় তারপর কর্মেন্দ্রিয়ের সংযম। এগুলো হল শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা অথবা যোগশাস্ত্রে বলছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান ইত্যাদি। এরমধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ধ্যান। কিন্তু একজন ইন্দ্রিয় সংযম করেছেন, ধ্যানও করছেন, তপস্যা করছেন ঠিকই কিন্তু ত্যাগ নেই। হবে না, একটা জায়াগাতে গিয়ে আটকে যাবেন। সর্বত্যাগ আর বৈরাগ্য না হলে হবে না। ভক্তিশাস্ত্র বলে ভোগও কর যোগও কর, কিন্তু আসলে এভাবে হয় না। অনেক সময় উৎসাহিত করবার জন্য বলা হয় ঠিকই, কিন্তু হয় না। মন এমনই একটা জিনিষ একটু ভোগের মধ্যে থাকলেই আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামতে থাকবে।

শুধু তাই না, *পরিপশ্যন্তি সর্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভ্যন্তে*, বিশেষ জ্ঞান দ্বারা জিনিষটাকে আত্মসাৎ করা। গুরু বলে দিয়েছেন তুমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম। জ্ঞান তো দিয়ে দিলেন, কিন্তু তাতে কিছুই হবে না। এবারে শিষ্য ত্যাগ তপস্যা করতে শুরু করল। তাতেও কি কিছু হবে? কিছুই হবে না। কিন্তু ত্যাগ তপস্যার দ্বারা নিজেকে যখন শুদ্ধ করে ওই জ্ঞানকে যখন আত্মসাৎ করল, যখন জ্ঞানকে নিজের করে নিল তখন সে ফল দেয়। বীজ জোগাড় করা হয়েছে, মাটি খুব সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছে কিন্তু বীজ মাটিতে রোপণ করা হয়নি। কিছুই হবে না। বীজ জোগাড় করতে হবে, মাটিও তৈরী করতে হবে। এবার বীজকে মাটিতে রোপণ করে জল দিতে হবে। জ্ঞান হল তাঁর জল। আত্মাসাৎ করতে হবে, অর্থাৎ বিচার করে, চিন্তা করে মনন করে করে ভাবতে হবে জিনিষটা কি। তখন তিনি এই আত্মতত্ত্বকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই যে মন্ত্রের মধ্যে বর্ণনা করা হল, তিনি হৃদয়াকাশেও দেখছেন, দেহের খেলাতেও দেখছেন, আবার বহির্জগতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হচ্ছে সেখানেও তিনি তাঁকেই প্রত্যক্ষ করছেন। কি রকম প্রত্যক্ষ করেন? আনন্দস্বরূপময়, সেইজন্য তাঁর নাম সচ্চিদানন্দ। আমাদের শাস্ত্রে যে সচ্চিদানন্দ, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ শব্দগুলো আছে এগুলো কোন কল্পনা নয় আর কবিতাও নয়। যোগীরা সত্যিকারের এইভাবে দেখেন।

কি রকম আনন্দস্বরূপ দেখেন? আচার্য বলছেন – *সর্বানর্থদুঃখায়াসপ্রহীণং সুখরূপম্ অমৃতং*, সম্পূর্ণ ভাবে সমস্ত অনর্থদুঃখক্লেশ রহিত সুখস্বরূপ এবং অমৃতময়। আর কি বলছেন? দেখছেন সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম সদা সর্বদা নিজের অন্তঃকরণে বিশেষ রূপে ভাসমান। আবার দেখছেন এই শুদ্ধ ব্রহ্ম নিজের অন্তঃকরণে যেমন বিশেষ রূপে ভাসমান সেই তিনি আবার বহির্জগতে সর্বত্র সবার মধ্যে সমান ভাবে বিদ্যমান। তখন তিনি সমদর্শি হয়ে যান, গীতায় এটাই ভগবান বলছেন *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*। যিনি পণ্ডিত, ধীর পুরুষ, বিবেকী তিনি সত্যি সত্যি দেখেন সব কিছুতে সেই ব্রহ্মই আছেন। সেইজন্য কি হয়, তিনি কাউকে দেখে উদ্বিগ্ন হন না, তাঁকে দেখেও কেউ উদ্বিগ্ন হয় না। সব কিছুতে সর্ব ক্ষেত্রে তিনি নির্বিকার। গুরু যে বেদান্তবাক্য বলে দিয়েছেন সেই বাক্যকে গ্রহণ করে যে পদ্ধতিতে সাধনা করতে বলা হয়েছে, সেই পদ্ধতিতে সাধনা করার পর সেই বেদান্ত জ্ঞানকে আপন করে নিতে হয়। জ্ঞানকে আপন করে নিলে আত্মজ্যোতির দর্শন হয়। আত্মজ্যোতিকে হৃদয়াকাশে দর্শন করার পর পরিষ্কার দেখতে পান সেই জ্যোতি সমস্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভাসমান, সর্বত্র তিনিই আছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সব কিছুকে দেখেন সবই তাঁর মহিমার প্রকাশ, *যস্যৈষ মহিমা ভুবি*। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে বিগব্যাঙ কারণ নয়, এই গাছপালা, ফসল উৎপাদন হচ্ছে চাষী চাষ করছে বলে নয়, সব তাঁরই মহিমার প্রকাশ। আমি সাধনা করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমার অভিব্যক্তি, আবার হৃদয়াকাশে সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে দর্শন করছি, এতে আমার লাভ কি? মানুষ যে কাজই করে কোন লাভের আশাতেই করে। এই কার্যকারণরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হলে কি হয় সেটা পরের মন্ত্রে বলা হচ্ছে –

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।২/২/৮।।

(স্থূল এবং সূক্ষ্ম, কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ হলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।)

কার্যকারণরূপ ব্রহ্ম, এখানে সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ের কথাই বলছেন, এই ব্রহ্মজ্ঞান যদি হয় তখন যিনি সাধনা করছেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি খুলে যায়, যত রকমের সংশয় সব নাশ হয়ে যায় আর যত রকমের কর্ম আছে সব ক্ষীণ হয়ে যায়। বেদান্তে খুব সহজ একটা equation চলে – শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই আছেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তিনি অবিদ্যাকে আশ্রয় করে নেন। অজ্ঞান আর অবিদ্যা কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। যার জন্য অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতরা বেদান্তকে এটার উপরই বার বার আক্রমণ করে আসছে। কিন্তু বেদান্ত বলছে এভাবে বলা ছাড়া অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত পথও নেই যে ব্যাখ্যা করবে। এর বাইরে যেটা দিয়েই বলা হোক না কেন, সবেতেই কিছু না কিছু ফাঁক থেকে যাবে। যখনই

অবিদ্যা আসে তখন যিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁর মনে কামনার জন্ম হয়। এই কামনাটাই অবিদ্যা, বা অবিদ্যার ফল কামনা, দুটো পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। কামনার জন্ম হলেই কামনার পুর্তির জন্য কাজ করতে হয়, সেইজন্য বলা হয় অবিদ্যা, কাম ও কর্ম, এই তিনটে বৃত্তের মত ঘুরতে থাকে। আমরা সবাই নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছি। আমি কে, আমার ঠিক ঠিক কি পরিচয়, এই বোধটা পুরোপুরি চলে গেছে। যার ফলস্বরূপ আমাদের মধ্যে অপূর্ণতার বোধ হচ্ছে। অপূর্ণতার বোধ অনুভূত হলেই আমি পূর্ণ হতে চাইব। এই পূর্ণ হওয়ার জন্য কামনা আসছে আর এই কামনার পুর্তির জন্য কর্ম করতে হচ্ছে।

এই মন্ত্রে এটাই বলা হচ্ছে – কিন্তু যখন সেই ব্রহ্মকে জেনে যায় তখন এই অবিদ্যার গ্রন্থিটাই নাশ হয়ে যায়। যে অবিদ্যা তাকে বেঁধে রেখে নাচিয়ে যাচ্ছিল, সেই অবিদ্যার এখন নাশ হয়ে যাওয়ার জন্য কামনা-বাসনারও নাশ হয়ে যায়। কামনাই যদি নাশ হয়ে যায় তখন আর সে কিসের জন্য কর্ম করতে যাবে, কর্ম করার ইচ্ছেই থাকবে না। অবিদ্যা নাশ হলে কামনা আর কর্ম এই দুটো স্বাভাবিক ভাবেই নাশ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা উপনিষদে অনেক বার আসে, কঠোপনিষদেও বলছেন *যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কাম্য যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ*। মানবহৃদয়ে যে সব কামনা আশ্রিত আছে সেই কামনা সকল যখন বিদীর্ণ হয় তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয়। হৃদয় বলতে অনেক সময় মনকেও বোঝান হয়, মনের মধ্যে যে কামনা বাসনা রয়েছে এগুলো ক্ষয় হয়ে যায়।

আমরা মনে করি আমাদের মনের উপরের অংশে যে কামনা-বাসনাগুলো প্রতিনিয়ত ধাক্কা মারছে এই কামনাগুলোই শুধু আছে, কিন্তু মনের গভীরে যে কত কামনা-বাসনা সুপ্ত হয়ে জমে আছে তার খবর আমরা জানতেও পারিনা। সিঁড়ি দিয়ে একতলা পোঁছে যাওয়ার পর দেখছি এর উপরে আরেকটা তলা আছে, সিঁড়ি দিয়ে সেই তলাতে গিয়ে দেখছি আরেকটা তলা আছে, একটার পর একটা তলা আসতেই থাকে, শেষ আর হতে চায় না। কামনার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। একটা কামনার পুর্তি হতেই দেখে আরেকটা কামনা এসে গেছে, সেটার পুর্তি হতেই আরেকটা কামনা এসে যাচ্ছে, এই ভাবে কামনা আসতেই থাকে, কোন দিন যেন কামনার এই প্রবাহ শেষ হবে না। সেইজন্য এই কামনার জন্য শব্দ ব্যবহার করছেন হৃদয়গ্রন্থি, হৃদয়ের মধ্যে দড়ির গিট্ দেওয়া। ঠাকুর বলছেন জীব আষ্টেপৃষ্টে স্ক্রুপ দিয়ে বাঁধা। আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা কি দিয়ে? কামনা-বাসনা দিয়ে। আমাদের মনের গভীরে সূক্ষ্মস্তরে কত কামনা-বাসনা জমে আছে তার কোন আন্দাজই নেই।

ফ্রয়েডের মত দার্শনিকরা এটাকেই অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলেন। এনারা বলছেন মায়ের গর্ভ থেকে এখন পর্যন্ত যত রকমের অনুভব হয়েছে সেগুলো সব মনের মধ্যে বীজাকারে জমে থাকছে। ফ্রয়েড এর নাম দিলেন unconscious(অবচেতন), ফ্রয়েড sub-conscious কেই বলছেন unconscious। এই unconscious গুলো চাপা থাকে। এদের মতে এই unconscious এর উপর রয়েছে conscious, তার উপর রয়েছে super conscious ইত্যাদি। এনারা যে ডায়গ্রাম তৈরী করেছেন সেটা আইসবার্গের মত। আইসবার্গ যেমন তার দশ ভাগের এক ভাগ জলের উপর ভাসে আর তার নয় ভাগ জলের নীচে ডুবে থাকে। এনাদের থিওরি অনুযায়ী আমাদের মনের অবচেতন অংশটা বিশাল আর চেতন অংশটা সামান্য একটু ভেসে থাকে। বলছেন, আমাদের যা কিছু কর্ম হয় এই অবচেতন অংশ ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের এই মত নয়, হিন্দুদের মতে আমরা জন্মজন্মান্তরে যা কিছু কর্ম করেছি সব জমে থেকে সুযোগের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করতে থাকে, উপযুক্ত সুযোগ পেলে বেরিয়ে আসবে। তার সাথে এই জন্মে আমি যত কর্ম করছি, আর কর্ম করতে গিয়ে যে আমার নিত্য নতুন অনুভব ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে, সেই অনুসারে আমার ভেতরে নতুন নতুন কামনা-বাসনার জন্ম হচ্ছে। একদিকে পুরনো সংস্কার ঠেলছে আর তার সাথে নতুন নতুন সংস্কার ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে চলেছে। ঠাকুর যে বলছেন, জীব আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, এর বক্তব্য হল ভেতরে এত কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে, এগুলো থেকে বেরোবে কি করে! আমার একটা সমস্যা হয়েছে, এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু উপায় অবলম্বন করে বেরিয়ে এলাম। তাই বলে কি আমার সমস্যা মিটে যাবে? কখনই মিটবে না। কারণ আমার কর্মের পুটলিতে যেমনটি আছে তেমনটিই বেরোবে। এগুলোই কামনা-বাসনা,

এই কামনা-বাসনাকেই এখানে বলছেন হৃদয়গ্রন্থি। শেষে যেটা বলছেন, *তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে* – পরাবরে মানে পর আর অবর। যিনি কারণরূপ ব্রহ্ম তিনিই কার্যরূপ ব্রহ্ম, জগৎটাই তাঁর কার্য, *যস্যৈষ মহিমা*। এই কার্যও ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম ছাড়া তো কিছু নেই, যা কিছু দেখছি সবই তাঁর অভিব্যক্তি।

যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বললেন আমি এবার সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাচ্ছি। যাজ্ঞবল্ক্যের দুজন স্ত্রী ছিল, মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন আমার যা সম্পত্তি আছে সব তোমাদের মধ্যে সমান সমান ভাগ করে দিচ্ছি। মৈত্রেয়ী খুব উচ্চ আধারের ছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার এই সম্পদ যদি আমি পাই তাহলে কি আমার জ্ঞানপ্রাপ্তি হবে'? যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন 'সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পত্তি পেয়ে গেলেও তোমার জ্ঞান হবে না'। 'তাহলে এই সম্পত্তি নিয়ে আমি কি করব, আমার চাইনা। আপনি আমাকে সেই উপদেশটা দিন যাতে আমি জ্ঞান লাভ করতে পারি, অবিদ্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি'। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন 'হে মৈত্রেয়ী! তুমি আমার চিরদিন প্রিয় ছিলে, এই প্রশ্ন করে তুমি আমার আরও প্রিয় হয়ে গেলে'। যাজ্ঞবল্ক্য এরপর যে উপদেশ মৈত্রেয়ীকে দিয়েছিলেন সেটাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে জায়গা করে নিয়েছে। বলছেন, মানুষ যখন যে কোন জিনিষকে ভালোবাসে তখন ওই জিনিষটার জন্য কখন ভালোবাসে না, সেখানে নিজের আত্মার প্রতিবিম্বকে দেখে বলে ভালোবাসে। মানুষ টাকা-পয়সাকে এই জন্যই ভালোবাসে না যে এগুলো টাকা-পয়সা, কারণ যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ তিনি কখন জড় জিনিষকে পছন্দ করবেন না। তাহলে কেন পছন্দ করছে? সেখানে নিজের প্রতিবিম্বকে দেখতে পায় বলে।

গ্রীক কাহিনীতে নার্সিসাসের কাহিনী আছে। সেখান থেকে নার্সিসিস্ট শব্দ এসেছে। নার্সিসাস ছিল গ্রীক দেশের এক সুন্দর যুবক। নার্সিসাস একদিন এক জলাশয়ের কাছে গিয়েছে। সেখানে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছে। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকিত হয়ে ভাবছে আমি দেখতে এত সুন্দর! জলে নিজের প্রতিবিম্বকে দেখে মুগ্ধ হয়ে জলাশয়ের পারেই বসে পড়ল, আর সেখান থেকে নড়বার নাম নেই। সারাদিন ধরে খাওয়া নেই দাওয়া নেই শুধু নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েই রয়েছে। বাড়ির লোকেরা, পাড়ার লোকেরা, শহরের লোকেরা সবাই এসে তাকে বোঝাচ্ছে, সে সেখান থেকে সরবেই না। সেখানে বসে থেকে থেকে একটা সময়ের পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খাওয়া-দাওয়া কিছুই নেই। এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন সেখানেই সে মারা গেল। ওর নাম ছিল নার্সিসাস, সেখান থেকে শব্দ এল নার্সিসিস্টিক, যার অর্থ যারা শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে, নিজের রূপেই মোহিত হয়ে থাকে। কি দেখে মুগ্ধ হয়েছে? নিজের রূপের প্রতিবিম্বকে দেখে, নিজের রূপকে তো কেউ দেখতেও পারবে না, যেটা দেখবে সেটা প্রতিবিম্ব। আমরা যখন টাকা-পয়সাকে ভালোবাসছি কারণ সেখানে আমরা আমাদের আত্মার প্রতিবিম্বকে দেখছি। মানুষ নিজের স্ত্রীকে কেন ভালোবাসে? কারণ স্ত্রীর মধ্যে নিজেরই আত্মার প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে। সন্তানকে ভালোবাসছে এই কারণেই। শাস্ত্রকে কেন ভালোবাসছে, যে কোন জিনিষকেই ভালোবাসা মানে সেখানে সে তার আত্মার প্রতিবিম্বকে দেখতে পায় বলে। আমরা যে জিনিষটাকে ভালোবাসছি সেই জিনিষটাকে দেখে আমরা আমাদের মানসিক স্থিতিকে বুঝতে পারি। কারণ আমার আত্মার ছবি সেই জিনিষেই দেখব যে জিনিষটাকে আমি ভালোবাসছি। মানুষ তো চাকরিকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে টাকা-পয়সা আর পদমর্যাদাকে।

আজকাল ম্যানেজমেন্টে নতুন নতুন শব্দ আসছে, সম্প্রতি একটা শব্দ এসেছে Self Actualisation। এগুলো আর কিছুই না, শুধু কতকগুলো শব্দ মাত্র। মানুষ এই তিনটে জিনিষের পেছনেই ছুটছে – কামিনী, কাঞ্চন আর নাম-যশ – ইন্দ্রিয়ের পেছনে, টাকা-পয়সার পেছনে আর নাম-যশের পেছনে। ঠাকুর বলছেন সাধুর সব অহঙ্কার যায় কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না। এর বাইরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন যাঁরা বিদ্যাকে নিয়ে আছেন। এনারা অনেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তারপরে আছেন যাঁরা সাধনার পথে আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করেছেন। আত্মজ্ঞানের পথে যখন আত্মার ছবি দেখেন তখন সেই ছবির দিকে এগোতে থাকেন। এখন সাধারণ মানুষ আর সিদ্ধ পুরুষে তফাৎ কি? সাধারণ মানুষ ওই সীমিত গণ্ডিটুকুর মধ্যেই আত্মার ছবি দেখে। সাধারণ মানুষ নিজের সন্তানের মধ্যে আত্মার ছবি দেখে, অন্য সন্তান মরে যাক

তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই হবে না, ঠাকুর বলছেন নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ করছে আর পাশের বাড়ির লোক না খেয়ে মরছে। তার মানে আমার বাড়ির লোকের মধ্যে আমার আত্মার ছবি খুব সুন্দর দেখছি কিন্তু প্রতিবেশীর মধ্যে দেখছি না। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ সবার মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখেন।

মহাভারতে সুবর্ণ নেউলের কাহিনীতে আছে গরীব ব্রাহ্মণ দম্পতি তাঁর পুত্র ও পুত্রবধুকে নিয়ে দুর্ভিক্ষে খুব অভাবের মধ্যে বাস করছেন। কোথা থেকে ভিক্ষায় সামান্য একটু আটা পেয়েছে, তাই দিয়ে সামান্য কটি রুটি বানিয়েছে পরিবারের সদস্যদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। সেই সময় অতিথি এসে গেছে। একজন একজন করে নিজের নিজের অংশের রুটি অতিথিকে খাইয়ে তাকে তৃপ্ত করে দিল, আর নিজেরা অভুক্ত থেকে মারা গেল। এরা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করল নাকি বোকার মত কাজ করল? আজকের প্রজন্ম বলবে এর থেকে বোকার কাজ আর কিছু আছে নাকি! আগের প্রজন্ম বলবে না, ওটাই ঠিক কাজ। উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয় তাহলে, নিজের সন্তান পুত্রবধুর মধ্যেই শুধু যখন নিজের যে আত্মার ছবি দেখছেন তখন কিন্তু সে পতিত। সবারই মধ্যে যখন নিজের আত্মার ছবি দেখে তখন কিন্তু সে অনেক এগিয়ে গেছে। আর যিনি সিদ্ধ পুরুষ তিনি দুটোই দেখেন। প্রথম দেখেন সমগ্র কার্য ব্রহ্মে আত্মছবি দেখেন, *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমিই এই সব কিছু হয়েছি। শুধু তাই নয়, তাঁর পেছনে যে কারণ ব্রহ্ম সেই ভগবানকেও জানছেন। এই যে সৃষ্টি এটা ঈশ্বরের, ঠাকুরেরই সৃষ্টি, সৃষ্টির পুরোটাকেই তিনি ভালোবাসেন। কারণ সব কিছুর মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন। আমরা নিজের বাড়ির লোকের মধ্যেই ছবিটা দেখছি বাড়ির লোকের বাইরে কারুর মধ্যে দেখছি না। কিন্তু যিনি যোগী তিনি সবারইর মধ্যে নিজের আত্মার ছবি দেখেন। শুধু যে সবারই মধ্যে সেই ছবি দেখছেন তাই নয়, এই সব কিছুর পেছনে যিনি আছেন তাঁকেও তিনি জানেন। *তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে* এই কথার মধ্যে এটাই বলা হচ্ছে। *পর*, মানে যেটা শ্রেষ্ঠ, *অবর* মানে যেটা কম শ্রেষ্ঠ , অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম আর কার্য ব্রহ্ম দুটোকেই তিনি জানেন। তিনি জানেন এই যে কার্য ব্রহ্ম এটা ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি, আবার তাঁর পেছনে যে ঈশ্বর তাঁকেও জানেন। অন্যান্য ধর্মে এটাই সমস্যার কারণ। তারা বলছে তাদের ধর্মে যিনি ভগবান, সেই ভগবানের যারা সৃষ্ট তারা আমার লোক। খুব ভালো কথা। তার বাইরে সব বিধর্মী, গলা কেটে দাও। এটাই অজ্ঞান। কিন্তু যাঁরা ভগবানকে জেনেছেন, সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা কিন্তু যারা ভগবানকে মানে না তাদের গলা কখন কাটতে যাবে না। যিনি জ্ঞানী তিনি ঈশ্বরকে জানেন আর ঈশ্বরের সৃষ্টিকেও জানেন। সেইজন্য হিন্দুরা কখন ধর্মান্তরণ করতো না। কারণ তারা জানে সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি, কেউ সেই পথ কেউ এই পথ অবলম্বন করে তাঁর দিকেই এগোচ্ছে।

যখন কেউ এই দুটো জিনিষকেই দেখে – কার্যকেও দেখছেন আবার কারণকেও দেখছেন, পর আর অবর দুটোকেই জেনে গেছেন তখন কি হয়? *ভিদ্যত হৃদয়গ্রন্থিঃ*, হৃদয়ে যত কামনা-বাসনার জট পাকিয়ে রয়েছে সব নাশ হয়ে যায়। এই কামনা-বাসনা যখন জট পাকিয়ে থাকে সেখান থেকে একটু একটু করে সুতো বেরোতে থাকে, মানে একটু কামনা-বাসনা বেরোচ্ছে তাতেই দাবানল লেগে যাচ্ছে। পুরানে অসুরদের কাহিনীতে এই কামনা-বাসনা থেকে কি হতে পারে সেটাই দেখান হয়েছে। সমস্ত কামনা-বাসনার বাস হৃদয়ে। এখানে হৃদয় মানে মন। হৃদয়াকাশে যেখানে যোগীরা ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করেন সেই হৃদয়ের বাইরে যত হৃদয় আসবে সব মনকে বলা হয়ে থাকে। কামনা-বাসনা বাইরে কোথাও নেই, সব মনের মধ্যেই বাস করে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ বলতে বোঝাচ্ছেন এই দোষ আত্মার মধ্যে নেই। আসলে কিছু নৈয়াকিদের মতে গ্রন্থিগুলো আত্মার ধর্ম। আমরা যখন কাউকে বলছি তুমি ভালো হও, তার মানে তুমি খারাপ। এই তুমিটা কে? বেদান্তীরা সব সময় বলবে বুদ্ধির সাথে তোমার যে একাত্মবোধ সেই তুমিকে বলা হচ্ছে। কিন্তু এই কথা যদি কোন খ্রীশ্চান বা মুসলমানকে বলা হয় তারা এটা মানবেন না। এদের মতে তুমি এখন খারাপ আছ, এবার তুমি ভালো হও। বেদান্তীরা বলবে আত্মাতে কোন গ্রন্থি নেই, তোমার মধ্যেও কোন গ্রন্থি নেই, গ্রন্থি রয়েছে তোমার মনের ভেতরে। কিন্তু তোমার মনের সাথে যে যোগ এই যোগটা কৃত্রিম, আসল যোগ নয়। এই হৃদয়গ্রন্থিটাই, মনের মধ্যে যে গিট্ আছে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। আত্মতত্ত্ব যদি সাক্ষাৎকার হয়ে যায় তখন সব

পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গীতায় বলছেন *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন*, কাঠের যত বড় স্তুপাকার হোক না কেন একটু আগুন লাগলে পুড়ে সব ছাই হয়ে যাবে।

ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, আধ্যাত্মিক জীবনে যত রকমের সংশয় আছে সব সংশয়ের অবসান হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম সংশয় হল মৃত্যুর পর কিছু আছে কিনা, দ্বিতীয় সংশয় ভগবান বলে কিছু আছে কিনা, তৃতীয় সংশয় বাজে কাজ করলে সত্যিই কি খারাপ ফল পাব আর ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে, অর্থাৎ কর্মফলে সংশয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মূল সিদ্ধান্ত হল – ঈশ্বর, জীব, জগৎ আর মায়া, এই চারটের উপরে রয়েছেন ব্রহ্ম। জীব আর ব্রহ্মের যে খেলা এটা চলে কর্ম আর কর্মফল দিয়ে। এর ফলে পরলোকের ব্যাপার এসে যাচ্ছে, পুনর্জন্মের ব্যাপার এসে যায়। কিন্তু ঘুরছে ওই চারটের মধ্যে – ঈশ্বর, জীব, জগৎ আর মায়া। এই সব কিছুর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশয় থাকে। জীবের ধারণা এই দেহ, দেহটাই জীব। জগৎ কোত্থেকে আর কিভাবে আসছে? বিগব্যাঙ হল জগতের সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি মরে গেলাম, সব খেলা শেষ। মায়া বলে কিছু আছে নাকি! আর ঈশ্বর তো একটা কল্পনা মাত্র। কর্মফল? পুলিশে ধরা না পড়লেই হল। পরলোক? আজ পর্যন্ত কেউ দেখেছে কোন মরা লোক ফেরত এসেছে। এরপর কেউ যদিও বা একটু ধর্ম পথে যেতে শুরু করবে তখন তার বাড়ির লোকেরা তাকে টানতে শুরু করবে। প্রথমে বলবে তোমার কি সেই বয়স হয়েছে যে গীতা উপনিষদ শুনতে বেলুড় মঠে যাবে। দ্বিতীয় বলবে, ঠাকুর-ফাকুর বলে কিছু আছে নাকি! খুব সুন্দর বলছে স্বামী ধ্যান করছে স্ত্রী এসে বলছে 'কি সারাদিন ঠাকুর ঠাকুর করে যাচ্ছে'। এদের সংশয় বলে কিছু নেই, কারণ তারা দৃঢ় যে এসব কিছু নেই। এরা চার্বাকপন্থি, ভোগ ছাড়া কিছু জানে না। আর বাকি যারা এই পথে আসছে তাদের মধ্যে সংশয় থাকবে। সংশয় এসে যাওয়া মানে এই পথে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। আচার্য বলছেন, *জ্ঞেয়বিষয়াঃ সংশয়াঃ লৌকিকানাম্*, *জ্ঞেয়বিষয়াঃ* হল জানার মত জিনিষ কি আছে? একমাত্র আত্মা। জানার মত জিনিষ একমাত্র পরা বিদ্যা। লৌকিক পুরুষদের পরা বিদ্যাতে যা কিছু আছে সব ব্যাপারে এদের সন্দেহ। পরা বিদ্যাতে এই চারটে জিনিষই জানা যাবে, ঈশ্বর, জীব, জগৎ আর মায়া। আর তার যে সম্বন্ধিত জিনিষ, যেমন জগৎ বলতে শুধু এই পৃথিবী নয়, স্বর্গ, নরক, পাতাল সব কিছু এই জগতের মধ্যে অন্তর্গত। স্বর্গ নরকাদি লোকে কিভাবে যায়? তোমার কর্মানুসারেই যাবে। তখন স্বাভাবিক ভাবে কর্ম, কর্মফলও এসে যাবে। জীব কে? এই দেহ নয়, দেহের পেছনে যিনি আছেন। সেটা আবার কি? ওটা হল সেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। এই চারটে জ্ঞেয় পদার্থে এদের সব সময় সংশয় লেগে থাকে। ঠাকুর বলছেন, সংসারীদের কাছে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কতক্ষণ? তপ্ত তাওয়াতে একটু জল ছিটিয়ে দিলে জল যতক্ষণ থাকে। আর সাধারণ পুরুষের এই সব ব্যাপারে সন্দেহ মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গা প্রবাহের মত চলতেই থাকে, কক্ষণ থামে না। কিছুতে সন্দেহ মিটবে না। শুধু ভৌতিক পুরুষদেরই নয়, আমরা যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছি আমাদের মধ্যেও সংশয় আছে। সেইজন্য স্বামীজী ঠাকুরের স্তুতি বন্দনায় বলছেন *সংশয় রাক্ষস নাশ মহাস্ত্রং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্*। ঠাকুর হলেন এই সংসারের *ভববৈদ্যম্*, যে সংশয় রাক্ষসের করালগ্রাসে সংসার জীব জর্জরিত হয়ে আছে ঠাকুর সেই সংশয় রাক্ষসকে নাশ করার জন্য মহাস্ত্র দিচ্ছেন।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি, যাঁর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেছে, যাঁরা আত্মজ্ঞান পেয়ে গেছেন, যাঁদের হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলো কেটে গেছে, যাঁদের মধ্যে অজ্ঞান বলে কিছু নেই, সংশয় বলে কিছু নেই, কোন ধরণের কামনা-বাসনা নেই, এই ধরণের পুরুষের সব কর্ম ক্ষয় হয়ে যায়। ক্ষয় মানে যে কর্মগুলো হচ্ছে সেগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই কর্মের ফল আর কাজ করবে না। আর পুরনো কর্মগুলো নাশ হয়ে যায়। আচার্য এখানে কর্মের ব্যাপারে তিনটে শরীরের কথা বলছেন। এগুলোকে নিয়ে অনেক সময় অনেকে তর্ক যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করেন। কিন্তু এগুলো যুক্তি তর্ক দিয়ে মানা যায় না। এই নিয়ে বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন রকম যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যেভাবে বলেছেন সেটা আমাদের পুরোটাই মানতে হবে, কারণ আচার্যের ভাষ্যকে যখন অনুসরণ করছি তখন সবটাই মানতে হবে। প্রথমে বলছেন জন্মজন্মান্তরের যত কর্ম সব নষ্ট হয়ে যায়। এই কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বা প্রারব্ধ কর্ম বলা হয়। জ্ঞানোৎপত্তির পরে যে কর্মগুলো হবে সেই কর্মের ফলও

দেবে না। সেইজন্য এনাদের বলা হয় *দগ্ধবীজবৎ*। ঠাকুর বলছেন দড়ি পুড়ে গেছে, দড়ির আকারটুকু থাকে কিন্তু এই দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজ করা যাবে না, ফুঁ মারলেই উড়ে যাবে। তৃতীয় ক্রিয়মান, এগুলো বেদান্তের পরিভাষা, ক্রিয়মানকে কখন আগাম বলে। ক্রিয়মান বলতে বোঝায়, যিনি সাধক সাধনা করছেন তাঁর এমন কিছু প্রারব্ধ কর্ম ছিল, যার জন্য তাঁকে এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে। যে কর্মের জন্য শরীর ধারণ হয়েছে সেই কর্মগুলো কিন্তু নাশ হয় না।

ধরুন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি এখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করাচ্ছেন, কিন্তু আগেই তাঁর জ্ঞান উৎপত্তি হয়ে গেছে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ অবতার, অবতারের ক্ষেত্রে এই জিনিষগুলো প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু একজন বেদান্তী, যিনি ঈশ্বরের অবতার মানেন না, এই দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান উৎপত্তির পরে কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ করাচ্ছেন, এত লোক মারা যাচ্ছে, তাতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপরে এই কর্ম ফল আসবে না। কারণ জ্ঞান উৎপত্তির পরে এগুলো হচ্ছে। কিন্তু যে কারণে তাঁর এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে সেই কারণটা নাশ হবে না। যেমন একজন বড় যোগী, তিনি গত জন্মে এমন কোন কর্ম করেছিলেন যার জন্য তাঁকে একটা চোখ কানা নিয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। এবার যোগী সাধনা করে তাঁর জ্ঞান উৎপত্তি হয়ে গেল, তাই বলে কি তাঁর চোখের কানাটা মিটে যাবে? না, যাবে না, তাঁর চোখের কানাটুকু থেকে যাবে, এই কর্মটা তাঁর পাল্টাবে না। তবে তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, তিনি এইসব ব্যাপারে পুরো নিস্পৃহ। যখন বলা হয় জীবনমুক্ত পুরুষ নিষ্কাম হন, নিস্পৃহ হন, অনাসক্ত হয়ে যান তখন এটাই বোঝায়। তাঁর যত পুরনো কর্ম জমে আছে, যে কর্মগুলো ফলমান হওয়ার জন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জন্ম নিতে হত, সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জ্ঞানোৎপত্তির পর তিনি যত কর্ম করছেন সেগুলো তাঁকে আর বাঁধতে পারবে না। কারণ দড়ির বাঁধার ক্ষমতা চলে গেছে। কিন্তু জন্মের সময় তিনি যে কর্মগুলোকে নিয়ে এসেছিলেন, যে কর্মের জন্য এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে, যেটাকে নিয়ে তিনি সাধনা করেছেন, আচার্যের কাছে নিজেকে নিয়ে গেছেন, তারপর সিদ্ধি লাভ করেছেন, এই কর্মগুলো তাঁর চলে যাবে না, এগুলো ফল দেবে। কিন্তু জ্ঞানী স্পষ্ট দেখছেন, এগুলো কিছুই নয়, যত দিন শরীর আছে তত দিনই এগুলো আছে। জীবনমুক্ত পুরুষের একটাই কাজ থেকে যায়, জ্ঞান বিতরণ, তাছাড়া অন্য কোন কাজ থাকে না। জীবের উপর কৃপা করে করছেন। তিনি যদি নাও করেন কারুর কিছু বলার কিছু নেই, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, তিনি চুপ্ মেরে গিয়েছিলেন। তাতে কোন দোষ নেই। তিনি যদি পাহাড় থেকে ঝাঁপও দিয়ে দেন তাতেও কোন দোষ নেই।

কবীর দাস কি করলেন? কাশীতে মরলে মুক্তি হয় আর কাশীর গঙ্গার ওই পারে মরলে গাধা হয়। তিনি সারাটা জীবন কাশীতে কাটালেন আর মৃত্যুর সময় ওই পারে চলে গেলেন। যিনি জীবনমুক্ত পুরুষ তাঁর আবার জন্মই কি আর মৃত্যুই কি! কাশীতে মরলে মুক্তি কিন্তু তাঁর তো মুক্তি জীবন থাকতেই হয়ে গেছে। জ্ঞান উৎপত্তির পর জ্ঞানীর শরীর ধারণটা তাৎপর্য হীন হয়ে যায়। কিন্তু যতক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে তাঁর শরীর না চলে যাচ্ছে তত দিন তাঁকে এইভাবেই কাটাতে হবে। ধরুন একজন গরীব ঘরে জন্ম নিয়েছিল। পরে তিনি সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেলেন। তাই বলে কি তিনি রাজা হয়ে যাবেন? যেমন গরীব ছিলেন তেমন গরীবই থাকবেন। আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিই ঠাকুর একজন সিদ্ধ পুরুষ। তাই বলে কি ঠাকুর সিদ্ধির পর ইংরাজী আর সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলতে শিখে যাবেন? যেমন অশিক্ষিত ছিলেন তেমন অশিক্ষিতই থাকবেন, ওটা আর পাল্টাবে না। আচার্য এখানে এটাই বলতে চাইছেন। তাই বলে কি ঠাকুরের দুঃখ হয়েছিল যে আমি সংস্কৃত আর ইংরাজী জানিনা বলে? কিছুই দুঃখ হয়নি। যে কর্মের জন্য এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে সেই কর্মগুলো জ্ঞান লাভের পরেও শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ঠাকুর, শ্রীরামচন্দ্র, শঙ্করাচার্য এঁদের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়, কারণ এনারা অবতার পুরুষ। অবতার পুরুষের পরের ধাপেই যাঁরা আছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এগুলো চলতে থাকবে। অবতার আর অবতারের সঙ্গী যাঁরা যেমন স্বামীজী, তাঁর ক্ষেত্রেও এগুলো প্রযোজ্য হবে না, এনারা নিত্যমুক্ত। অবতার পুরুষ আর নিত্যমুক্তকে কর্মের কারণে জন্ম নিতে হয় না। জগতের কল্যাণের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য নিজের ইচ্ছায় দেহ ধারণ করে কিছু কর্ম করে আবার ফিরে যান। এনাদের বাদে আর

যাঁরা আছেন, কবীর দাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, কমলাকান্ত, চণ্ডীদাস যত সিদ্ধপুরুষ আছেন এনাদের আগের আগের জন্মে যত কর্ম জমে আছে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সিদ্ধির পরে যত কর্ম হয়েছে সেগুলো ফল দেবে না। কিন্তু জন্ম থেকে যে কর্মগুলো নিয়ে এসেছেন যেমন কেউ যদি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়ে থাকেন ব্রাহ্মণের যা যা কর্ম সেটাই করতে থাকবেন, ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম নিলে তাঁকে ক্ষত্রিয়ের মতই আচরণ করে যেতে হবে। কবীর দাস তিনি তাঁত বুনতেন, সারা জীবন তাঁতই বুনতে থেকে গেলেন। রুইদাস ছিলেন মুচি, জ্ঞানপ্রাপ্তির পর সেই জুতোই সেলাই করতে থাকলেন।

আচার্য শেষে বলছেন *তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে*, কারণ ব্রহ্ম আর কার্য ব্রহ্ম এই দুটোই সাক্ষাৎ আমিই, তখনই তিনি বলেন *অহং ব্রহ্মাস্মি, মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, আমার থেকেই এই জগৎ বেরিয়েছে। এই সাক্ষাৎ বোধ যখন হয় তখনই এই জিনিষগুলো ঘটে, তখনই বলতে পারেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। এই অবস্থায় পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেও যদি তিনি নাশ করে দেন তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না। যারা বলছে, আমি ঠাকুরের কাজ করছি, আল্লার কাজ করছি, এগুলো সব মুখের কথা। তোমার কি বোধ হয়েছে আমি আর ঈশ্বর এক?

যোগীরা হৃদয়াকাশে যে দিব্যজ্যোতির দর্শন করেন সেটাকে আরও তিনটে মন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। মূল কথা হল সেটাই যেটা স্বামীজী বলছেন Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within। আমাদের সবার মধ্যে এই দিব্য সত্তা সব সময় বিদ্যমান। কিন্তু আমরা এই মুহুর্তে নিজেদের সেই দিব্য সত্তাকে ভুলে আমার দেহ, আমার পরিবার, আমার সম্পদ এগুলোর সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছি। এই জিনিষগুলো যেমন যেমন ওঠানামা করে তেমন তেমন আমিও কখন উপরে উঠে যাই কখন নীচে নেমে আসছি। আমার সত্তা এই দেহ মনকে নিয়েই জড়িয়ে আছে। কিন্তু যখন জেনে যাই আমার আসল সত্তা হল সেই চৈতন্য জ্যোতির মধ্যে যিনি বিরাজমান, তিনিই আমার আসল সত্তা, তখন জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটা পুরোপুরি পাল্টে যায়। তাই বলে যিনি জ্ঞানী হয়ে গেলেন তাঁর কি বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র, স্বামী কেউ থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে, তারা সবাই থাকবে। কিন্তু এতদিন তাদের প্রতি যে বন্ধনের একটা ভাব ছিল সেই বন্ধনের ভাবটা নষ্ট হয়ে অন্য ভাবের উদয় হয়। তবে এই ভাবটাকে সাধনার মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। সাধনার মাধ্যমে না হলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। যেমন হৃদয়রাম ঠাকুরের খুব সেবা করত। সেবার অধিকারে ঠাকুরের কাছে অনেক কিছু আবদার করার সাহসও তার হয়েছিল। একবার ঠাকুরকে খুব পীড়াপীড়ি করছে একটু কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি যাতে তার হয়। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে ঠাকুর একদিন হৃদয়কে ছুঁয়ে দিয়েছেন। স্পর্শ করে দিতেই হৃদয় দেখছে তার শরীরটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে, ঠাকুরের শরীরকেও দেখছে জ্যোতির্ময়। এই দিব্য অলৌকিক অনুভূতির আতিশায্যে হৃদয় নিজেকে আর সামলাতে পারলো না, সে চেঁচাতে শুরু করেছে 'মামা! মামা! আমরা একি করছি! চল আমরা জগৎকে শিক্ষা দিই'। এই যে এখানে যে দিব্যজ্যোতির কথা বলা হচ্ছে, হৃদয়রামের সেই দিব্যজ্যোতির অনুভব হয়ে গেছে। কিন্তু হৃদয়রামের সেই প্রশিক্ষণ ছিল না, আর সেই সাধনা, তপস্যা কিছুই ছিল না। যে পথ দিয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে হবে, জপ, ধ্যান করে মনের শুদ্ধি করবে সেগুলো কিছুই করেনি। স্বামীজী এই ধরণের উপলব্ধির জন্য যে শব্দ ব্যবহার করছেন সেটা হল Stumbled upon realisation। এর অর্থ হল হোঁচট খেয়ে আকস্মিক ভাবে কিছু পেয়ে যাওয়া।

কিছু দিন আগে ইন্টারনেটে একটা খবর বেরিয়েছিল, আমেরিকাতে চুরি করতে এসে সেই বাড়ির চল্লিশ বছরের এক ভদ্রলোককে চোরেরা খুব পিটিয়ে দিয়েছে। তাতে ওই ভদ্রলোক মাথায় চোট পান। কিছু দিন চিকিৎসাদি করার পর সুস্থ হয়ে গেছেন। এরপরেই সেই ভদ্রলোক রাতারাতি একজন প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ হয়ে গেছেন। এখন সব কিছুতেই গণিতের ইক্যুয়েশন দেখছেন, সেই ইক্যুয়েশান থেকে ড্রইং করছেন। বিশ্বের নামকরা নিউরো বিজ্ঞানীরা তার মস্তিষ্ককে পরীক্ষা করার জন্য সেখান পৌঁছে গেছেন। এটা খুব পুরনো ধারণা, যারাই খুব বড় প্রতিভাবান হয় তাদের মাথায় কিছু না কিছু গোলমাল থাকবে। যে কজন বড় বড় বিজ্ঞানী

আছেন এদের ব্রেণের ম্যাপিং করলে সবারই কিছু না কিছু গোলমাল ধরা পড়বে। কোন একটা জায়গায় কোন ভাবে একটা ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে গেছে। এদের এখন নামই হয়েছে Mentally Autistic, তার মানে এদের স্নায়ুর মধ্যে কিছু অঙ্গ কম থাকে, এদের সব কিছুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়নি। দেখা যায় কেউ হয়ত অঙ্কে বিরাট, কম্প্যুটারে বিরাট, ফিজিক্সে বিরাট কিন্তু ভদ্র ভাবে কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না। এদের আচরণ তিন চার বছরের বাচ্চার মত। আসলে কিছু কিছু নার্ভ গ্রোথ হয়নি, একদিকে গ্রোথ হয়নি অন্য দিকে কিছু নার্ভের আবার প্রচণ্ড গ্রোথ হয়ে যায়। এই ভদ্রলোকের গণিতজ্ঞ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু এখন মাথায় লেগে গেছে চোট, আর হয়ে গেলেন গণিতজ্ঞ। একে দিয়ে কিন্তু বড় কোন কাজ হবে না। কারণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই। হৃদয়রামের ঠিক এটাই হয়েছিল। ঠাকুর স্পর্শ করে দিতেই হৃদয়রামের ভেতরে আলো জ্বলে গেছে। এবার ঠাকুরকেই সে বলছে আমরা এখানে এসব কি করছি চল আমরা জগতকে উপদেশ দিই। ঠাকুর দেখছেন মহা ফ্যাসাদ, সব জানাজানি হয়ে যাবে। তখন হৃদয়রামের বুকে আবার হাত রাখতেই তার ওই ভাবটা চলে গেল। হৃদয়রাম এবার কাঁদতে কাঁদতে বলছে ‘মামা! তুমি একি করে দিলে, আমি কত আনন্দে ছিলাম’। এভাবে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয় না।

ধ্যান করা বা ধ্যান হওয়ার জন্য কিছু কিছু জিনিষ আগে থেকে অনুশীলন করে প্রস্তুতি নিতে হয়। প্রথম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নিগ্রহ না হলে, কামনা-বাসনার বেগ প্রশমিত না হলে ধ্যান হয় না। যারাই ধ্যান শেখার আগ্রহ নিয়ে আসে তাদের যদি বলা হয় আগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করতে, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহটা কি জিনিষ সেটাই বোঝে না, এখন এরা নিগ্রহ করবে কি! সবারই মন কামনা-বাসনাত তাড়নায় ছটফট করে চলেছে, এদের দ্বারা কি করে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হবে, ধ্যান করা তো অনেক অনেক দূরে। মনে কোন কিছু চিন্তা করতে করতে যে গভীরে চলে যাচ্ছে সেটাও ধ্যান নয়। জাগতিক কোন বিষয়, তা যাই হোক না কেন, ফুল, পাহাড়, নদী, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস যাই হোক না কেন এর যে কোন একটাকে চিন্তা করে যে জগতে বিচরণ করছে আর উপনিষদের এই জিনিষগুলোকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে গভীরে গিয়ে যে জগতে বিচরণ করছে, এই দুটো পুরোপুরি আলাদা জগৎ। এগুলো কাউকে বোঝান যায় না। এই যে আমি আপনাদের দেখছি, আপনার আমাকে দেখছেন। আমরা পরস্পরের ছবিই দেখছি, এই চোখটা তো একটা লেন্স। ক্যামেরাতে যে রকম ছবি যায় সেই রকম ছবিই যাচ্ছে, মানুষটা তো তার মধ্যে ঢুকছে না। এখন ক্যামেরার লেন্সটা যদি চৈতন্য হত তাহলে পরিষ্কার মানুষকে অনুভব করবে। কিন্তু কি অনুভব করছে, কয়েকটা আলোর বিন্দু। আমাদের চোখের মধ্যে আলোর কিছু কিছু ডটস্ যাচ্ছে, তার জন্য মনে হচ্ছে আমি একে দেখছি, তাকে দেখছি। কিন্তু জিনিষটা তো আসলে তা নয়। আপনার মুখে আলো পড়ে যে আলোটা আমার চোখের লেন্স দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে সেটা একটা ছবি মাত্র। সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বহির্জগৎ। বরঞ্চ আমি যে আপনাকে সত্যিই দেখছি এটা মিথ্যা। সেইজন্য উপনিষদের ঋষিরা বলেন যখন জ্ঞান উন্মোচন হয় তখন এগুলোকে তাঁরা ছায়ার মতন দেখেন।

দর্শনেন্দ্রিয় আমাদের মস্তিষ্কের আশি শতাংশ সেলগুলোকে টেনে নেয়, নাক, কান এগুলো অনেক কম টানে। মস্তিষ্ক তার বেশীর ভাগ কার্য করে চোখের মাধ্যমে। আর যা কিছু সত্য বলে দেখছি এগুলো হল সিনেমায় যেমন দৃশ্যগুলো ছবির মত বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, সব ছবির মত বেরিয়ে যাচ্ছে। আর একেই সবাই সত্য বলে গ্রহণ করছে। কিন্তু ধ্যানের গভীরে হৃদয়াকাশে যে দিব্যজ্যোতিকে দর্শন করছেন ওইটাই আসল বস্তু, এই দেখাটা কোন কল্পনা নয়, চিন্তা নয়। ওটাই আসল ওটাই বাস্তবিক। এই দিব্যজ্যোতি দর্শনের পর বহির্জগৎটা অবাস্তব হয়ে যায়। এই দিব্যজ্যোতিকেই এখন বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করছেন।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।।২/২/৯।।

(জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কোশে রজোগুণশূন্য অংশরহিত নিরাবয়ব ব্রহ্ম অবস্থিত, তিনি শুদ্ধ এবং তেজোময় পদার্থেরও প্রকাশক, যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁরাই ব্রহ্মকে এই রূপে জানেন।)

এই ব্রহ্মজ্যোতিকে কারা জানতে পারেন? যাঁরা আত্মবিদ্‌, *যদাত্মবিদো বিদুঃ*। যাঁরা একটু জপ-ধ্যান করছেন, যোগাভ্যাস করছেন তাঁরাও অনেক সময় জ্যোতি দর্শন করেন। কিন্তু এই জ্যোতি দর্শনের বিশেষ কোন মূল্য নেই। স্বামীজীও বলছেন, কয়েক দিন যোগাভ্যাস বা জপ-ধ্যান করলে সুগন্ধ পাওয়া যায়, দূরের জিনিষ শ্রবণ করা যায় ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর কোন মূল্য নেই। ইদানিং অনেক বাবাজীরা একদিনেই বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে অনেকের জ্যোতি দর্শন করিয়ে দিচ্ছেন। এগুলো নেতিবাচক কিছু নয়, কিন্তু আবার বিরাট কিছুও নয়। আত্মবিদরাই ঠিক ঠিক জ্যোতি দর্শন করেন। তবে কি, যিনি আত্মবিদ্‌ একমাত্র তিনি জানতে পারবেন, বাইরের কারুর বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ আত্মজ্ঞান হল স্বসংবেদ্য। কেউ যদি এসে বলে আমাকে ঠাকুর এই এই বলেছেন। আমরা তার কথাকে অবিশ্বাস করতেও পারি নাও পারি। ঠাকুর যদি তাকে বলে থাকেন তাহলে ঠাকুর তাকেই বলে থাকবেন আমি আপনি কখন কোন দিন জানতে পারব না। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়েছে কি হয়নি এটা জানার অন্য অনেকগুলো লক্ষণ আছে। ওই লক্ষণগুলো একটা জায়গাতে মিলতে হবে। জ্ঞান হওয়া বা ঈশ্বরের দর্শন লাভ যদিও স্বসংবেদ্য, নিজেই জানবেন বুঝবেন অন্য কেউ বুঝতে পারবে না, কিন্তু তার চরিত্রের কিছু লক্ষণে বোঝা যাবে। ঘরের ভেতরে একটা আলো জ্বালালে ঘরের বাইরে সেই আলোর একটু কিরণ যাবেই।

প্রথমে দেখা যাবে তাঁর স্বভাবটা শান্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়, কোন ধরণের শোক মোহে সে বশীভূত হয়ে পড়ছেন না। তৃতীয়, সত্যের প্রতি আঁট এসে যায়। আরেকটা লক্ষণ, জগতের সবার প্রতি করুণা, ভালোবাসা জেগে যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি জগতের ভালো যা কিছু আছে সব আমার নিজের হলে ভালো হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এই ভাবটা থাকে না। কাউকে কিছু যদি বলতে হয় তখন তিনি এমন ভাবে বলবেন যাতে সে মনে কোন আঘাত না পায়, কাউকে কটূ কথা বলবেন না। অনেকে বলে উনি নাকি একজন বিরাট সাধু। কিন্তু তাঁর কাছে যেতেই আমাদের আতঙ্ক হয়, অন্যরা তাঁর কাছে যেতে ভয় পায়। তাহলে তিনি কিসের বিরাট সাধু হলেন! আমাদের যে এই বিশাল লম্বা ঋষিদের পরম্পরা সেখানে কোথাও পাওয়া যাবে না যে অমুক ঋষির কাছে যেতে সবাই ভয় পায়। ঠাকুরের কাছে সবারই অবারিত দ্বার। তবে এটা ঠিক যাদের ভেতরটা পুরো মাত্রায় ভোগের ইচ্ছাতে পরিপূর্ণ, এই ধরণের সাংসারিক লোকেদের তাঁরা পরিহার করে চলেন, কিন্তু তাই বলে তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেন না। সত্যিকারের যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁর কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকবে না, নাম-যশের পেছনে দৌড়াবেন না। আমাদের কেউ কিছু খারাপ কথা বলে দিলে কোন দিন ভুলতে পারিনা, মনের মধ্যে সেটা থেকেই যাবে। কিন্তু সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুরুষকে খারাপ কিছু বলে দিলে তাঁরও মনের মধ্যে একটু হলেও আলোড়ন হবে, কিন্তু তিনি সেটাকে ধরে রাখবেন না, কিছুক্ষণ পরেই ঝেড়ে ফেলে দেবেন। বাচ্চাদের মত তাঁদের স্বভাব হয়ে যায়। বাচ্চারা এই ঝগড়া করে কথা বন্ধ করে দিল, তার পরমুহূর্তেই আবার একজন আরেকজনের গলা জড়িয়ে খেলতে চলে গেল, বাচ্চাদের মধ্যে ত্রিগুণাতীতের ভাবটা খুব সুন্দর দেখা যায়। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনিও তিনটে গুণকে অতিক্রম করে যান, তাই কোন কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনা, তিনি বিনম্র হয়ে যান। সত্যিকারের সিদ্ধ হওয়া মানে বিনম্র হয়ে যাওয়া।

এই জিনিষগুলোকে বোঝা খুব কঠিন, তাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। পাকাপাকি এটা ঠিক ঠিক শুরু হয় যখন সেই চৈতন্যময় জ্যোতিকে নিজের হৃদয়াকাশে প্রত্যক্ষ করেন। *হিরণ্ময়ে পরে কোশে*, এখানে হিরণ্ময় বলতে বোঝাচ্ছেন জ্যোতির্ময়। *পরে কোশে*, মানে বুদ্ধি বৃত্তির যে প্রকাশ রূপ পরম কোশ। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয়ে শুদ্ধ আত্মা পাঁচটি কোশের আবরণ দিয়ে ঢাকা – অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কোশ। আনন্দময়কোশ হল আত্মার সব থেকে সন্নিকটে, আনন্দময়কোশের ভেতরে আত্মার অবস্থান। এই কোশগুলো পেঁয়াজের খোসার মত, একটা খোসা ছাড়ালে আবার আরেকটা খোসা। খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ভেতরে গেলে দেখে কিছুই নেই। যখন একটা জিনিষকে সরান হচ্ছে, তখন প্রকৃতির এলাকার

কিছু জিনিষকেই সরান হচ্ছে। কিন্তু তার ভেতরে যিনি আছেন তিনি সর্বব্যাপী, আর তাঁর স্বভাব পুরুষস্বভাব, চৈতন্যময় স্বভাব। এই জিনিষটা ক্ষীরকদমের মত নয়, ক্ষীরকদমের ভেতরে ছোট্ট একটু মিষ্টি পুর দেওয়া থাকে। ক্ষীরকদমের উপরে অংশটা সরাতে সরাতে ওই পুরটা বেরিয়ে আসে। এখানে জিনিষটা তা নয়। ওটারই সর্বব্যাপী প্রকাশ। এই সর্বব্যাপী প্রকাশের একটা পর একটা আবরণকে যখন সরান হয় তখন দেখা যায় তার সব থেকে বড় প্রকাশ, যেটা পঞ্চম কোশ, যার নাম হিরণ্ময় কোশ, জ্যোতির্ময়। সাধক যখন আনন্দময় কোশে পৌঁছে যায় তখন এই অন্ন, প্রাণ ও মন এই তিনটে কোশ খসে পড়ে যায়। এবার বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের মধ্যে তাঁর বাচ খেলা চলতে থাকে। জগতের সঙ্গে যখন সম্পর্ক করেন তখন বিজ্ঞানময় কোশে আর যখন শুদ্ধ আত্মাকে নিয়েই থাকেন তখন আনন্দময় কোশে বিচরণ করেন।

ঠাকুর বলছেন হৃদয়ে যখন কুণ্ডলীনি জাগ্রত হয় তখন সেখান থেকে তার পতন হতেও পারে। কিন্তু কণ্ঠে যখন পৌঁছে যাবে তখন সে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা বলবেন না। এটাই হল বিজ্ঞানময় কোশে অবস্থান। এরপর যখন ভ্রুর মধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে কুণ্ডলীনি শক্তি চলে এল আর কিন্তু সে কোন কথাই বলবে না, দিব্যজ্যোতির মধ্যেই সে বিচরণ করতে থাকে। এটাই আনন্দময় কোশ। এই আনন্দময় কোশকেও যদি সে অতিক্রম করে যায় তারপর আর কিছু নেই, সব শেষ। তার মানে, সে সহস্রারে চলে এসেছে, এখানে অনুভূতি বলে কিছু নেই, পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন আজ্ঞাচক্রে যখন চলে এল তখন ছুঁই ছুঁই অবস্থা, আলো একটা কাঁচের আবরণ দিয়ে যেন ঢাকা। কিন্তু ওই আবরণটা এত ক্ষীণ যে আবরণটা আদৌ আছে কিনা তাও বোঝা যায় না। এটাই আনন্দময় কোশের বৈশিষ্ট্য। তবে এখানে আনন্দ নিয়েই সে অবস্থান করে। এই অবস্থান যদি কোন ভাবে অতিক্রম করে বেরিয়ে সহস্রারে চলে আসে তাহলে কিন্তু তার শরীর আর থাকবে না। এই মন্ত্রে আনন্দময় কোশ আর বিজ্ঞানময় কোশের মধ্যে বাচ খেলার ব্যাপারটাকে বোঝাচ্ছেন। কখন সখন হয়ত মনোময় কোশে নামতে পারেন নাও পারেন, কিন্তু তার নীচে প্রাণময়, অন্নময় কোশে তো কোন ভাবেই নামবেন না। খাওয়া-পড়ার দিকে তার কোন দৃষ্টি থাকবে না। শরীরের ব্যাধি, কি পথ্য খেতে হবে, কি ওষুধ খেতে হবে, শরীরটাকে কিভাবে রাখতে হবে এসবের দিকে তার আর কোন নজর থাকে না।

এই পরম কোশে অর্থাৎ আনন্দময় কোশেই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয় সেই আত্মজ্যোতির। আমরা যে কথা বলছি, চিন্তা করছি এও সেই ব্রহ্মজ্যোতিরই প্রকাশ কিন্তু এগুলো বিচ্ছুরিত আলো, প্রকৃত আলো নয়। আনন্দময় কোশেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশকে বোঝা যায়। কিন্তু এই আনন্দময়কেও যখন সে অতিক্রম করে চলে যায় তখন বাস্তবিক সত্তাটা থাকবে কিন্তু আর বলাবলির কোন উপায় থাকবে না। ঠাকুর বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল। সে আর বাইরে এসে খবর দিতে পারল না। কারণ, সে সমুদ্রেই গলে গেছে। কিন্তু ঠাকুরের ব্যাপারে কি হয়েছিল? তখন তিনি বলছেন, কে জানে বাপু, যখন গলে যাচ্ছিল তখন কে যেন আটকে দিল আর সে যেন একটা পাথরের হয়ে গেল। মানে, ওই ব্যক্তি সত্তাটা অটুট রইল, তার মানে সহস্রারে গিয়েও কুণ্ডলীনিটা যেন ফেরত চলে এল আজ্ঞাচক্রে। আর আজ্ঞাচক্র থেকে নেমে কণ্ঠদেশে আবার কণ্ঠদেশ থেকে আজ্ঞাচক্রে এর মধ্যেই ওঠানামার খেলা চলতে থাকল। এবার অনাহতেও আর নামছে না। এ জিনিষ শুধুমাত্র অবতার পুরুষদেরই হয়। যারা সাধারণ সাধক তাদের আজ্ঞাচক্রেই সব খেলা শেষ। কোন ভাবে আজ্ঞাচক্রের উপরে যদি চলে যায় তাহলে তার আর অস্তিত্ব থাকবে না।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে, সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ? সব থেকে ভেতরে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত। এই কোশ ঠিক যেন তলোয়ারের খাপের মত, খাপের মধ্যে যেমন তলোয়র থাকে ঠিক তেমনি এই পঞ্চম কোশের মধ্যে সেই চৈতন্যময় দিব্য জ্যোতি অবস্থিত। সেইজন্য এই স্থানকে বলা হয় উপলব্ধির স্থান। আনন্দময় কোশ হল আত্মার উপলব্ধির স্থান। সেটাও কিন্তু শেষ কথা নয়, শেষ কথা তারপরে আছে, যদিও তার বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে না।

আনন্দময় কোশকে এই কারণে বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, এর পরে আর কেউ নেই। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কে? মন্ত্রী। কারণ মন্ত্রী হলেন রাজার সব থেকে কাছের লোক। রাজা পর্যন্ত আমি যেতে পারব না, মন্ত্রী পর্যন্ত আমি যেতে পারি। ভারতের শ্রেষ্ঠ কে? প্রধানমন্ত্রী। কারণ রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে তিনি আর কিছু করবেন না। কিন্তু সব কিছু রাষ্ট্রপতি সই করার পরেই হবে, তার আগে কিছু হবে না। যেমন আমাদের আত্মা হলেন সাক্ষী চৈতন্য, ভারতের রাষ্ট্রপতিও সাক্ষী চৈতন্য। সব কিছু হয় তাঁর সইতে, কিন্তু কোন কিছুতেই তিনি যুক্ত নন, করেন সব কিছু প্রধানমন্ত্রী। আনন্দময় কোশ অনেকটা তাই। যদি কোন রকমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে যেতে পারি তাহলে বুঝে নিতে হবে এবার আমি রাষ্ট্রপতির কাছেও পৌঁছে যেতে পারব।

এই পঞ্চম কোশের পেছনে কি আছে? এই যে পাঁচটি কোশ এর সব কটির মধ্যে রজ আছে, রজোগুণ দিয়েই এরা নির্মিত, এর মধ্যে অবিদ্যা আছে। পঞ্চম কোশটাও অবিদ্যা, কিন্তু তার পেছনে যেটা আছে সেটা হল বিরজ। *বিরজং* মানে এর মধ্যে কোন ধরণের ময়লা নেই। ময়লা নেই মানে, এর মধ্যে অবিদ্যার লেশ মাত্র নেই। যাবতীয় যে কোন মল রূপে যেটা কল্পনা করা হয় সেটাই অজ্ঞান অবিদ্যা। পঞ্চম কোশের পেছনে এই জিনিষটাই নেই। তাহলে ভেতরে কে আছেন? সেই ব্রহ্ম। কিভাবে আছেন? চৈতন্যজ্যোতি রূপে। যিনি নিজের ভেতরে সেই চৈতন্যজ্যোতির দর্শন করেন এবং চৈতন্যের অনুভব করেন, তখন তিনি দেখেন সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই জ্যোতিরই খেলা চলছে, সেই জ্যোতিতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসমান। তাঁর সাথে এই ব্রহ্মের কি সম্পর্ক? ব্রহ্ম সব থেকে বৃহৎ, এখানে বড় বলতে তুলনাত্মক বর্ণনা করা হচ্ছে। বড় বলতে তিনিই আছেন। ব্রহ্মকে যে অনন্ত বলা হয় সেখানে গণিতের অনন্ত আর আধ্যাত্মিক অনন্তের মধ্যে পার্থক্য হল গণিতের বা জাগতিক অনন্ত হল বিরাট বড় কিন্তু আধ্যাত্মিক অনন্ত বড় থেকেও বড় কিন্তু তার সাথে সব থেকে যে ছোট আধ্যাত্মিক অনন্ত আবার তার থেকেও ছোট – *অণোরণীয়াম মহতোমহীয়ান্*, এক দিকে তিনি মহৎ থেকেও বড়, অর্থাৎ সব থেকে যে বড় তার থেকেও বড় আবার তার সঙ্গে যে সব থেকে ক্ষুদ্র তার থেকেও তিনি ক্ষুদ্র। এই যে বৈপিরত্য এটা কখনই গাণিতিক বা পদার্থের অনন্তে হবে না। ব্রহ্ম অনু থেকেও অনু সেই এ্যটমের মধ্যেও বিদ্যমান, এ্যটমের মধ্যে যে ইলেক্ট্রন আছে তার মধ্যেও তিনি বিদ্যমান, ইলেক্ট্রনের পেছনে যে কোয়ার্কাদি আছে তারও মধ্যে তিনি বিদ্যমান। আগামী কাল যদি কোয়ার্কের থেকেও অন্য কোন সূক্ষ্ম উপাদান বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করেন ব্রহ্ম তার থেকেও সূক্ষ্ম হবেন, অর্থাৎ তার মধ্যেও ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকবেন। অন্য দিকে এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তার মধ্যেও তিনি বিদ্যমান, এই ব্রহ্মাণ্ড হল তাঁরই একটা ছোট্ট অংশ। সব থেকে বড়, সব থেকে মহৎ সেইজন্য তাঁর নাম ব্রহ্ম।

তিনি *নিষ্কলং*, *নিষ্কলং* মানে যার থেকে সব ধরণের কলা বেরিয়ে গেছে, কলা মানে অংশ। চন্দ্রের যেমন ষোলটি কলা বা অংশ হয়, ব্রহ্মের সেই রকম কোন কলা বা অংশ হয় না, তাই *নিষ্কলং*। আর তিনি নিরবয়ব, তাঁর কোন অঙ্গ নেই। আমি যখন বলছি আমার হাত আছে, তখন এটা আমার শরীরের একটি অঙ্গ, শরীরের অঙ্গ মানে শরীরের অংশ। ব্রহ্মের কোন অংশ হয় না, কোন অংশ হয় না বলে ব্রহ্মের কোন অঙ্গ হয় না। অংশ আর অঙ্গ দুটো এক অপরের সাথে যুক্ত। যে জিনিষের কোন অঙ্গ নেই সেই জিনিষের কোন অংশও হবে না। যখন বলা হয় *সহস্রশীরসাঃ সহস্রাক্ষ* তখন মানুষের মনে একটা বিচার ধারাকে জাগাবার জন্যই বলা হয়ে থাকে। সত্যিকারের যে তাঁর হাজারটা মাথা, হাজারটা চোখ, হাজারটা পা থাকবে তা নয়।

যিনি *নিষ্কলম্* আর বিরজ, যেখানে অজ্ঞানের লেশ মাত্র নেই, যাঁর অঙ্গ বা অংশ বলে কিছু নেই, সেইজন্য তিনি সব সময় শুভ্র, *তচ্ছুভ্রং*। এগুলো দিয়ে বোঝা যায় যুক্তি ও বিচার কত সুন্দর ছিল। শুভ্র মানে শুদ্ধ, তাঁর মধ্যে কোন ধরণের অশুদ্ধির লেশ নেই। শুভ্রের সাথে আর কি হবেন? *জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ*, শুভ্রের সাথে সাথে তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি। এই *জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ* এর ব্যাখ্যা দশ নম্বর মন্ত্রে আরও বিস্তারিত ভাবে করবেন। ঠাকুরের আরাত্রিক ভজনে স্বামীজী ঠাকুরের নামে বলছেন তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি। ব্রহ্ম বা আত্মা জ্যোতিরও জ্যোতি। যখন সাধক সাধনার মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখতে পান যেখানে যেখানে যত জ্যোতিষ্মান আছে, এই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, এই টিউব লাইটের আলো, এগুলো থেকে যে জ্যোতি দীপ্যমান

সবই হল সেই ব্রহ্ম আত্মচৈতন্য রূপ। আমাদের সবার ভেতরে যে চৈতন্যময় আত্মা আছেন সেই আত্মা আর ব্রহ্ম এক। সূর্যের যে জ্যোতি, সূর্যের যে আত্মা সেটা এই আত্মাই। অগ্নির যে সারতত্ত্ব, যে সার থাকাতে অগ্নি আলো দিচ্ছে, যে সারতত্ত্ব থাকার জন্য সূর্য আলো দিচ্ছে, সেই সারতত্ত্বটাই ব্রহ্মাত্মচৈতন্য রূপ, এটাই সেই ব্রহ্মজ্যোতি। এই ব্রহ্মজ্যোতিকে কোথায় দেখা যায়? হৃদয়াকাশে। ওই একই জ্যোতি যেখানে যেখানে যত জ্যোতি আছে সেখানেও প্রকাশিত হচ্ছে।

এরপর বলছেন, অন্য কোন জ্যোতির দ্বারা এই ব্রহ্মজ্যোতিকে প্রকাশিত করা যায় না। আমাদের ভেতরে যে আত্মাজ্যোতি বিদ্যমান সেই জ্যোতিকে অন্য কোন জ্যোতি দ্বারা দেখা যাবে না, এমন কি যদি জ্ঞানের আলোকে বা বুদ্ধির আলোকে যদি দেখতে চাই তাও দেখতে পাওয়া যাবে না, এরপর আগুনের আলো বা সূর্যের আলোর তো কোন প্রশ্নই নেই। সেইজন্য এই ব্রহ্মজ্যোতিকে বলা হয় পরমজ্যোতি। মজা করে বলা হয়, যদিও এর সাথে এই প্রসঙ্গের কোন মিল নেই, এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে আমি নিজের হাতে করে নিতে পারি, সেইজন্য বাংলায় বলে আপনা হাত জগন্নাথ, নিজের যে হাত এটাই শেষ কথা, নিজের হাতের সামনে আর কারুর হাত কাজ করে না। আমার যত বন্ধু থাকুক, যত পরিজন থাকুক নিজের হাতের কাছে কোন হাতই কিছু নয়। ঠিক তেমনি অন্য কোন জ্যোতি পরমজ্যোতিকে আলোকিত করতে পারেনা। এই পরমজ্যোতিকে কারা সাক্ষাৎ করেন? আত্মবেত্তা যাঁরা। আত্মাবেত্তা মানে, যাঁরা বিবেকী পুরুষ তাঁরা দেখেন এই সংসারে যা কিছু খেলা চলছে সব হচ্ছে আমার বুদ্ধি থেকে। আমি যে আপনাকে দেখছি, সেটা দেখছি বুদ্ধির মারফতে। আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ যা কিছু অনুভব হচ্ছে, সবই বুদ্ধির জন্য। বিবেকী পুরুষরা দেখেন, এই মনোময় কোশের পেছনে বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়ের পেছনে আনন্দময়। তিনি দেখেন এই যত বুদ্ধির বৃত্তি আছে এর পেছনে সেই আত্মার চৈতন্য আছে বলেই এগুলো হচ্ছে। আর এই আত্মার চৈতন্য হল সাক্ষী মাত্র, তিনি কখনই কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। কিন্তু তিনি আছেন বলাই এরা সবাই সব কিছু করছে। এগুলো কে জানতে পারেন? *তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ*, যাঁরাই আত্মবিদ তাঁরাই জানতে পারেন।

কারা জানতে পারেন বলা হল। কিন্তু কারা জানতে পারেনা? অজ্ঞানীরা। অজ্ঞানী কারা? যারা বাহ্য প্রকৃতির অনুসরণ করে। এই ধরণের আলোচনায় একই কথা অনেকবার ঘুরে ঘুরে চলে আসে। অধ্যাত্ম বিষয়ক আলোচনায় একই কথা বার বার ঘুরে আসে। অজ্ঞানী আর জ্ঞানীতে খুব বেশী পার্থক্য নেই। সংসারী আর সন্ন্যাসীর মধ্যেও খুব বেশী তফাৎ নেই। সবারই মধ্যে বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধিকে বাইরের দিকে লাগাচ্ছে, বাইরের জগৎকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যখন তার পেছনে পেছনে চলে তখন সে সংসারী বা গৃহস্থ, তখন সে অজ্ঞানী। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন চৈতন্য আছেন বলেই এই বুদ্ধির খেলা চলছে, কিন্তু সেই চৈতন্য সাক্ষী মাত্র, কোন কিছুতে জড়ায় না। এই ভাবে দেখা মানে তাঁর বুদ্ধিটা অন্তর্মুখী হয়ে গেছে। বুদ্ধি যখন বহির্মুখী তখন সংসারী বা অজ্ঞানী, বুদ্ধি যখন অন্তর্মুখী তখন সন্ন্যাসী বা জ্ঞানী। এই একটাই যন্ত্র, যখন এই যন্ত্রকে জগতের দিকে কাজে লাগায় তখন জগতের মধ্যে ছুটে বেড়ায়। এই বুদ্ধি যন্ত্রই যখন ভেতরের দিকে চলে যায় তখন দেখে আসল যিনি তিনি এই বুদ্ধির প্রত্যয়, বুদ্ধির মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তিনি সেগুলোর সাক্ষী। তখন সে শান্ত হয়ে যায়, সব ছুটোছুটি, দাপাদাপি বন্ধ হয়ে স্থিত হয়ে যায়। আমরা এখন কেন ছুটছি? আমাদের বুদ্ধি এখন বহির্জগতে লাগান আছে, বুদ্ধিতে যখন যেমন যেমন বৃত্তি উঠছে, যাদের সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক আছে, যাদের সাথে আমার ঝগড়া মনোমালিন্যের সম্পর্ক আছে তারা যেমন যেমন করছে আমাকেও সেই রকমই করতে হচ্ছে।

ঠাকুর কাশীপুরে আছেন। শ্রীমা ঠাকুরের পথ্য নিয়ে উপরে ওঠার সময় সিঁড়ি থেকে পরে গিয়ে তাঁর পায়ের খিল আলগা হয়ে গেছে। ঠাকুরের এখন কত চিন্তা। ঠাকুর তখন কথাও বলতে পারতেন না। মায়ের নাকে একটা নথ ছিল, নাকে নথের ইশারা করে লাটুকে বলছেন, ওঁকে ঝুড়িতে করে উপরে নিয়ে আসা যাবে কিনা। শ্রীমা নীচের তলায় থাকতেন, ঠাকুর থাকতেন দোতালায়। শ্রীমার পায়ে আঘাত, হাঁটতে পারছেন না, এখন ঠাকুরের সেবা কে করবে, খুব চিন্তা হয়ে গেছে। তাই লাটুকে ইশারা করে বলতে হচ্ছে, ঝুড়িতে বসিয়ে

উপরে নিয়ে আসা যাবে কিনা সেবার জন্য। লাটু বলছেন, কোন চিন্তা নেই আমি আছি। অবতার পুরুষকেও যখন কারুর সাথে জড়াতে হয় তখন তাঁকেও তার অবস্থানুযায়ী চলতে হয়। সাধারণ মানুষের আর কি কথা। অল্প একটু কারুর সাথে জড়িয়ে থাকলে তার পেছনে পেছনেই তাঁকে এখন দৌড়াতে হবে। বুদ্ধি বৃত্তির সঙ্গে যে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছে, আর না করলেও জগৎ চলবে না, সেই বুদ্ধি বৃত্তির বাহ্যিক যা কিছু আছে তাকে সেগুলো অনুসরণ করতেই হবে, এখানে কিছু করার থাকে না।

যিনি আত্মবেত্তা সেইজন্য তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া মানে জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁর আর কোন আসক্তি নেই। ভারতে ধর্মকে সন্ন্যাসীরাই ধরে রেখেছিল। এটাই আসল ধর্ম, আমরা বাকি যা ধর্ম করি সবই আপোষমূলক ধর্ম। অমুক বাবাজীর কাছে গিয়ে কিছু প্রণামী দিলে আমার এই এই সমস্যাগুলো মিটে যাবে। এটাই এখন সবার ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু বাবাজীরাও এই সুযোগর পুরো সদ্বব্যবহার করে নিচ্ছে। ইদানিং বাবাজীদের নামে অনেকে অনেক রকম কথা বলে, কিন্তু বাবাজীদের কি দোষ আছে! তোমরাই তো তাঁর কাছে দৌড়ে যাচ্ছ, টাকা তো তোমরাই দিচ্ছ। সহজ সমাধান তোমরাই খুঁজছ। একবার এক মহিলা এসে স্বামী গম্ভীরানন্দের কাছে খুব কান্নাকাটি করছে। তার অসুস্থ নাতনী কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলছেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। এখন সবারই চাই সহজ সমাধান। মহারাজ যদি বলে দেন তাহলে ভালো হয়ে যাবে। হয়তো ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু আমরাতো কখন দেখিনি ঠাকুর এই ভাবে কাউকে ভালো করে দিচ্ছেন। ঠাকুর নিজেকেও তো ভালো করতে পারলেন না। স্বামীজী তো এত রোগে ভুগেছেন, শ্রীমা এত রোগে ভুগলেন। এনারা কোথায় কার রোগ ভালো করে দিয়েছেন। পুরো উপনিষদ দেখুন কোথাও বলছেন না যে সাধুবাবা মাথায় হাত দিলে সব কিছু ভালো হয়ে যাবে।

গীতা আমাদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, তাতে কোথায় আছে তোমার রোগ, ব্যাধি, অভাব অনটন থেকে বাঁচবার জন্য সাধুবাবাদের কাছে দৌড়ে যাও তাঁর আশীর্বাদের জন্য। গীতা কি বলছে? *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। তোমার ছেলে মরে গেছে? *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। তোমার সব টাকা উড়ে গেছে? *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। মানে সহ্য কর সহ্য কর, সহ্য করে যাও। তোমার কি খুব গরম লাগছে? এটা কি পরিহার্য? না একটা পাখা লাগান যেতে পারে। তাহলে পাখা লাগিয়ে নাও। এবারও কি পরিহার্য? না, এসি লাগান যায়। এসি লাগান হল। তাও কষ্ট। কেন কষ্ট? খুব লোডশেডিং। এটা কি পরিহার্য? না, জেনারেটর লাগান যেতে পারে। জেনারেটর লাগাও। জেনারেটর লাগান হল। তাও কষ্ট। কেন? জেনারেটরের তেল পাওয়া যাচ্ছে না। এবার কি? এই কষ্টটা এখন অপরিহার্য। এসি আছে, পাখা আছে কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি নেই, জেনারেটারের তেল নেই। এরপর কি বলবেন? *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। এবার তুমি সহ্য কর। কিভাবে? মনকে চঞ্চল হতে দিও না। এটাই গীতার উপদেশ। গীতার উপদেশ মানে উপনিষদেরও উপদেশ। এই উপদেশ আমাদের পছন্দ হবে না। চমৎকারী দেখানোটা আমাদের ধর্মই নয়। যারা বাহ্য প্রকৃতির অনুসরণ করে, বাইরে যা কিছু হচ্ছে তার পেছনে যারা দৌড়াচ্ছে তারাই অজ্ঞানী। আর যাঁরা ভেতরে যে পরমজ্যোতি আছেন, শুধু তাঁকেই জানেন, তাঁরাই জ্ঞানী। সাধুকে দিনে রাতে দেখলে বোঝা যায় তাঁর মন কোন দিকে। যারা নাম-যশ কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে দৌড়াচ্ছে এরা মূলতঃ বাহ্য প্রকৃতির অনুসরণ করছে। টাকা-পয়সা রাখা মানেই বুঝতে হবে ইন্দ্রিয় সুখের অনুসরণ করছে। এগুলো বোঝা খুব সহজ কিন্তু ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, সেইজন্য উপনিষদ একই জিনিষ দুবার তিনবার করে বলছেন। আচার্য নিজেও বলছেন উপনিষদের তত্ত্ব বোধগম্য করা সহজ নয়, তাই ব্যাখ্যা করে করে একটা ধারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নয় নম্বর মন্ত্রে বলছেন আত্মজ্যোতি হল *জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ*, এই জ্যোতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরের মন্ত্রে বলছেন –

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।২/২/১১

(সেই ব্রহ্মকে সূর্য, চন্দ্র, তারকা বা বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ করে না – সুতরাং অতিসীমিত-প্রকাশ-শক্তি বিশিষ্ট অগ্নি কি করে তাঁকে প্রকাশ করবে? তিনি স্ব-প্রকাশ বলেই তাঁর দীপ্তিতে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত।)

বার বার বলা হয় *আত্মস্বরূপং ব্রহ্ম*। কারণ ব্রহ্মই আছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন বলি তখন এগুলো আমাদের তোতাপাখির বুলির মত, এগুলো আমাদের শুধু মুখের কথা। কিন্তু উপনিষদের কোথাও কি ভগবানের ইচ্ছার কথা বলছে? না, কোথাও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে একটি কথাও বলা নেই। কারণ, তিনিই তো আছেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই আর তিনি আছেন বলেই সব কিছু চলছে। যখনই আমরা ঠাকুরের ইচ্ছা বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলছি তখন আমরা ভেবে নিই ঈশ্বর আকাশে বা স্বর্গে কোথাও সিংহাসনে বসে আছেন আর সেখানে একটা সুপার কম্প্যুটারে টেপাটেপি করে সব নির্দেশ, আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। না তা নয়, এভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা কার্যকর হয় না। সেইজন্য বার বার একটা শব্দ ব্যবহার করা হয় – আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম। যিনি আমাদের হৃদয়ে চৈতন্য জ্যোতি স্বরূপ অবস্থিত, তিনিই আবার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। দুটো আলাদা কিছু নয়। কিন্তু ভক্তদের ক্ষেত্রে কি হয়, যখন তারা দুঃখ-কষ্টে পড়ে তখন এমন একজনকে আঁকড়ে ধরতে চায় যাঁর কাছ থেকে সে সান্ত্বনা পেতে পারে, যাঁর কাছে গেলে একটু বল, বুদ্ধি, ভরসা পেতে পারে। আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম এটাই বলছে, তোমার কষ্ট হচ্ছে তুমি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা কর। সাধারণ মানুষ মাথায় এক মন বোঝা নিয়ে হাঁটছে, বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বকে এরা গ্রহণ করতে পারেনা, তার পক্ষে *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত* সম্ভব নয়। যিশুর কাছে যারা আসছে তাদের কেউ কানা, কেউ খোঁড়া, তার এই কষ্ট সেই কষ্ট। যিশু তাকে দুটো কথা বলে দিচ্ছেন Be thou whole তুমি পূর্ণ হয়ে যাও বা স্পর্শ করে দিচ্ছেন। তাতেই সে সেরে উঠছে, সে আনন্দে লাফাচ্ছে। যিশু বলছেন Thy faith has yield thou, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সারিয়েছে। যিশু একবারও বলছেন না যে তিনি সারিয়ে দিয়েছেন, যিশু এও বলছেন না যে তাঁর ইচ্ছাতেই সেরেছে। বলছেন তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সারিয়ে দিয়েছে।

এর ব্যাখ্যাটা কি? যখন বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখব, তোমার বিশ্বাস – Thy faith, মানে ঈশ্বরের ইচ্ছা। যিনি তোমার অন্তর্যামী তিনিই তো ভগবান। তাঁর কাছে তুমি প্রার্থনা করলে, এই কথা যিশুও বললেন তোমারই বিশ্বাস তোমাকে সারিয়ে দিল। হেরী পটারের কাহিনীতে আছে, হেরী পটারকে ডেভিল কিছুতেই মারতে পারছে না। কেন মারতে পারছে না? কারণ হেরী পটারের মা তার সন্তানকে বাঁচানর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। মায়ের ভালোবাসা হেরী পটারকে রক্ষা করে চলেছে। পাশ্চাত্য জগতের মানুষ ভারতীয় মায়েদের কাহিনী কোন দিন শোনেওনি দেখেওনি, তাই মায়েদের মূল্যবোধ গুলোকে এখন বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের দেশের মায়ের সন্তানের মঙ্গলের জন্য কত রকমের উপোস নিয়মাদি পালন করে আসছে ভাবাই যায় না। তার স্বামীর মঙ্গল হোক, তার সন্তানের মঙ্গল হোক, সারাটা বছর ধরে শুধু উপোসই করে যাচ্ছে। দুই একটি ক্ষেত্রে মায়েদের প্রার্থনা হয়তো সফল হচ্ছে না, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রার্থনার ফলে সবারই সন্তানের মঙ্গল হচ্ছে এই বিশ্বাস সব মায়েদের মনেই দৃঢ় হয়ে আছে। এটাই হল ইচ্ছা শক্তি। এই ইচ্ছা শক্তিই ঈশ্বরকে প্রার্থনা করলে আসে। ভক্তিশাস্ত্রে যেটা ঈশ্বরের প্রার্থনা সেটাই বেদান্তে ইচ্ছা শক্তি। বিশ্বাটাই এখানে মূল। যিশু যেটা বলছেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কট্টর বেদান্তে এসবে একেবারেই যাবে না, তাদের কাছে ত্রিকালমে জগৎ মিথ্যা, এরা তো জগৎকেই উড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে অসুখ করলে কি করবে? বলবে, হরি হলেন আমার বৈদ্য আর গঙ্গাজল আমার ওষুধ। যদি নিরাময় হওয়ার থাকে তাহলে ভগবানই সারিয়ে দেবেন আর গঙ্গাজল পান করলেই নিরাময় হয়ে যাবে।

এই যে আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম, আমার হৃদয়ে যে ব্রহ্ম আছেন, সেই পরমজ্যোতিকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। *ন তত্র সূর্যো ভাতি*, তাঁকে সূর্যও প্রকাশিত করতে পারে না। লোকেরা অনেক সময় ভুল করে ভাবেন ব্রহ্মলোকে কোন সূর্য নেই, চন্দ্র নেই। এখানে তা বলছেন না, সেই ব্রহ্মকে কেউই আলোকিত করতে পারে না। এই জগতে যা কিছু আছে অগ্নি, সূর্য সব কিছুকে প্রকাশিত করতে পারে। প্রকাশিত করতে পারে মানে, আলো দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়ে দিতে পারে। এখানে আলো আছে বলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে

পারছি। সূর্যের আলো আছে বলে আমরা জগতের সব কিছু দেখতে পারছি। কিন্তু ব্রহ্মলোকে কেউ কোন কিছুকে আলোকিত করতে পারেনা। তাই বলে কি ব্রহ্ম ব্ল্যাকহোল? ব্ল্যাকহোলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত প্রচণ্ড যে সেখানে যেকোন আলোর স্ফোটনকে আটকে রেখে দেয়। ব্ল্যাকহোলের কাছে সূর্য, চন্দ্র যে কেউ যাবে তাকে গিলে ফেলবে। ব্রহ্ম সেই রকম নয়। এখানে বলছেন *ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ*, চন্দ্র, তারকরা, বিদ্যুৎ যেটা চমকায় বা বিদ্যুৎএর আলো এরাও ব্রহ্মকে প্রকাশিত করতে পারে না, সেখানে এই সাধারণ অগ্নির আর কি কথা। যেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ কেউই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করতে পারছে না সেখানে অগ্নির আর কি ক্ষমতা হবে।

আত্মতত্ত্ব আছে বলে অনাত্মতত্ত্বের প্রকাশ। এই ব্যাপারটাকে একটু বোঝার আছে। এই যে গ্লাশের ঢাকনা, এই ঢাকনাটা অনাত্মতত্ত্ব, জড়। কিন্তু এর পেছনেও সেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। বাইরের আলো আছে বলে এর প্রতীতি হচ্ছে না। ধ্যানের গভীরে গিয়ে যখন সেই পরমজ্যোতির দর্শন হচ্ছে তখন কিন্তু তিনি স্পষ্ট দেখছেন ব্রহ্মের আলোতেই জগতের সব কিছু আলোকিত। ঠাকুরের জীবনে ঠিক এই রকম একটা ঘটনা আছে। দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর মায়ের মন্দিরে পূজো করতে বসেছেন তখন তিনি দেখছেন পূজোর যত সামগ্রি, কোশাকুশি, চৌকাঠ সব চৈতন্যময়। ঠাকুর যখন দেখছেন কোশাকুশিটাও চৈতন্য তখন ঠাকুরে আসলে কি দেখছিলেন? ঠাকুর সাধনা করে যখন মাকালীর দর্শন পেলেন তারপর তিনি জগতকে ব্রহ্মময় দেখছেন, পূজোর যত সামগ্রি সবটাই চৈতন্যময় দেখছেন। আর যদি জীবন্ত জিনিষের ক্ষেত্রে যাই, বেড়াল যাচ্ছে ঠাকুর দেখছেন মাকালী সাক্ষাৎ যাচ্ছেন। ভোগের জন্য অন্ন রাখা আছে, বেড়ালের সামনে রেখে ঠাকুর বলছেন 'মা! তুই খাবি? খা তাহলে'। এটা কি সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ? এই জন্য যাঁরা খুব উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সাধক, উচ্চস্তরের জ্ঞানীরা সাধারণ লোকের সাথে কথা বলেন না। যাঁরাই ব্রহ্মজ্যোতি বা পরমজ্যোতির ধারণা করতে চান, এই পরমজ্যোতি জিনিষটা কি জানতে চান, তাঁরা একটিবার অন্তত চুপচাপ বসে এই দৃশ্যটাকে মনে মনে চিন্তা করেন – ঠাকুরের মাকালীর দর্শন হয়ে গেছে। এবার তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পূজো করতে বসে দেখছেন কোশাকুশি চিন্ময়, ঠাকুর ঠিক কি দেখেছিলেন? যদি চিন্ময় দেখে থাকেন তাহলে কি কোশাকুশি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে? না, তাতো তিনি দেখছেন না, কোশাকুশি ওখানেই রয়েছে। তাহলে চিন্ময় বলতে কি দেখছেন? চিন্ময় বলতে ঠাকুর যা দর্শন করছেন ঠিক সেটাই এখানে বলছেন, অনাত্ম বস্তু যেটা জড় কিন্তু এই যে তার প্রতীতি হচ্ছে, চোখের সামনে দেখতে পারছি তিনি সেই ব্রহ্ম আছেন বলেই অনাত্ম বস্তুর প্রতীতি হচ্ছে। সমস্ত অনাত্ম বস্তুকে প্রকাশিত করছেন সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা।

আমাদের বুদ্ধি হল জড়, সেই বুদ্ধি পরমজ্যোতির আলোকে আলোকিত হয়ে উঠছে। টিউব লাইটের উপমাকে যদি আমরা নিই তাহলে দেখছি এই টিউব লাইটের মধ্যে গ্যাস আছে, তারের মাধ্যমে সেই গ্যাসের মধ্যে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, গ্যাসে স্পার্ক হচ্ছে, সেই স্পার্কে টিউবের কাঁচটা আলোকিত হয়ে উঠছে। সেই আলোর সাহায্যে আমরা সব কিছু দেখছি, কাজ করছি। টিউবের কাঁচের কোন নিজস্ব আলো নেই, কিন্তু মনে করছি টিউবের কাঁচটাই আলো দিচ্ছে। আমাদের বুদ্ধিও ঠিক টিউবের কাঁচের মত, তার পেছনে আছে আত্মার আলো। আত্মার আলো জন্য বুদ্ধির কাঁচ জ্বলে উঠছে। সেই বুদ্ধির আলোতে আমরা সব কিছু দেখছি, জানছি, বুঝছি।

আচার্য বলছেন, যাবতীয় অনাত্ম পদার্থ, যেটা আত্মা নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তার যে প্রতীতি হচ্ছে কারণ তার পেছনে সেই আত্মার সত্তা আছেন বলে। সেইজন্য দুটো সত্তা দেখা যায়, একটা আত্মার সত্তা আরেকটা অনাত্মার সত্তা। বস্তুত কোন তফাৎ নেই, কিন্তু দেখা যায়। এই অনাত্ম বস্তুকে প্রকাশিত করছে সেই ব্রহ্মজ্যোতি। সুতরাং তার স্বয়ং প্রকাশ হবার কোন প্রশ্নই উঠছে না। যেমন এই টিউবের কাঁচকে আলোকিত করছে তার পেছনে যে স্পার্ক হচ্ছে সেটা, এই কাঁচ এখন স্বয়ং প্রকাশ কি করে বা কোথা থেকে হবে? তাই বলে কি ইলেক্ট্রিসিটি স্বয়ং প্রকাশ? না, ইলেক্ট্রিসিটির পেছনেও সেই আত্মতত্ত্ব আছেন বলেই ইলেক্ট্রিসিটিকে জানতে পারছি। ইলেক্ট্রিসিটিও পুরোপুরি অনাত্ম বস্তু। কিন্তু বন্ধ্যা পুত্রের পেছনে আত্মতত্ত্ব নেই তাই আজ পর্যন্ত কেউ বন্ধ্যা পুত্র দেখেনি। আকাশকুসুমের পেছনে আত্মচৈতন্য নেই বলে আকাশকুসুম দেখা যায় না। বাকি পদার্থের

পেছনে আত্মচৈতন্য আছে বলে তাদের প্রতীতি হচ্ছে। সেইজন্য সূর্য, চন্দ্রমা, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি এদের সবারই অস্তিত্ব আছে কারণ এদের পেছনে ব্রহ্ম আছেন বলে। ব্রহ্ম না থাকলে কোন কিছুরই কোন তাৎপর্য থাকবে না, সব কিছু অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এখানে যেমন বলছেন *ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং*, ঠিক তেমনি কঠোপনিষদে অন্য ভাবে বলছেন – ইন্দ্র যে নিজের কাজ করছে, মৃত্যু যে নিজের কাজ করছে, সব দেবতারা যে নিজের নিজের কাজ করছে কারণ তার পেছনে ব্রহ্মের ভয় আছে। অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব আছে বলে সবাই নিজের নিজের কাজ করছে।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, স্বয় প্রকাশিত ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্যমান বলেই সব কিছুকে আমরা দেখতে পারছি। অগ্নির কথা ছেড়ে দিন এই যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই যে জগতের প্রতীতি হচ্ছে কারণ তার পেছনে ঈশ্বর আছেন বলে। আমরা যে জগৎ দেখছি, যাঁরা পরলোকাদি দেখতে সক্ষম, এই যে সব কিছু দেখতে পারছেন কারণ তার পেছনে সেই ঈশ্বরীয় শক্তি আছে বলে। এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে বিগব্যাঙ আছে না ভগবান আছেন, এটা কি করে জানা যাবে? বিশ্বের তাবড় তাবড় পদার্থ বিজ্ঞানীরা কত কত গবেষণা করছেন, কত রকমের থিয়োরি দাঁড় করাচ্ছেন, কত রকমের ফরমুলা আবিষ্কার করছেন, কারণ তাঁদের বুদ্ধিতে কিছু একটা ধারণা হচ্ছে আর তার ভিত্তিতে মোটা মোটা বই লিখে দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের ঋষিরা একেবারে পরিষ্কার, সাধনা করেছেন, স্বাধ্যায় করেছেন, নিজেদের জীবনকে শুদ্ধ রেখেছেন, কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ থেকে সব সময় দূরে থেকেছেন আর শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা অনুশীলন করেছেন। এত কিছু করার পর তিনি গুরুর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। গুরুর মুখ থেকে শুনছেন বেদান্ত বাক্য। বেদান্ত বাক্য শুনে নেওয়ার পর তার উপর চিন্তন করতে শুরু করলেন। চিন্তন হয়ে গেল, এরপর তিনি বসছেন ধ্যানে। ধ্যানের গভীরে গিয়ে সাধনা করতে করতে হঠাৎ একদিন তাঁর প্রত্যক্ষ হয়ে গেল গুরু যে বেদান্ত বাক্য বলেছিলেন সেটাই একমাত্র সত্য, নিজের চোখের সামনে সরাসরি দেখতে পান। এখন আমরা এই ঋষিদের কথা শুনবো না কি সেই সব লোকেদের কথাকে বিশ্বাস করব যাদের কোন ইন্দ্রিয় সংযম নেই, সব সময় কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশের পেছনে ছুটছে?

এখানে এই কথাই বলা হচ্ছে, এত কিছু করার পর যোগীরা যখন সাধনা করেন, সাধনা করে মনকে যখন গভীরে নিয়ে যান তখন দেখেন হৃদয়াকাশ, এই হৃদয় শরীরের স্থূল হৃদয় নয়, এটা আধ্যাত্মিক হৃদয়। সেই হৃদয়ের মাঝখানে একটি পদ্ম আছে, এখানে তন্ত্র মতে বলা হচ্ছে না, বেদান্ত মতে বলছেন পদ্ম আছে। আচার্য শঙ্কর এই কথাগুলো বলছেন। আর সেই যোগী সেই পদ্মের মধ্যে দেখেন দিব্যজ্যোতি, যেটা চৈতন্য জ্যোতি। ঠাকুর বলছেন কুকুর-কুক্কুরীর মৈথুনের সময় যোনিতে সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে দর্শন করেছি। এগুলো যে কত উচ্চমানের কথা আমাদের মত সাধারণ মানুষে পক্ষে ধারণার অতীত। উপনিষদে ঋষি বলছেন, যাঁরা হৃদয়াকাশে সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন তাঁরা দেখেন সেই জ্যোতিই অখণ্ড, তিনি দেখেন সেই জ্যোতিতেই সব কিছু ভাসমান। সেই জ্যোতিকেই বলা হয় পরমেশ্বর। তখন দেখেন হৃদয়ের মধ্যে যে জ্যোতি ভাসমান, সেই জ্যোতিই এই জগতের পেছনে আছেন বলে জগতের প্রতীতি হচ্ছে। সেইজন্য এখানে যুক্তি তর্কের কিছু নেই। ঠাকুরের সঙ্গে একজন তর্ক করতে এসেছিলেন তাকে ঠাকুর বলছেন – তোমার কথা আমি কি শুনব, আমি তো এই রকমটি দেখেছি। যেখানে একজন জিনিষটাকে এই রকম দেখেছেন সেখানে তর্কের কিছু থাকে না। পদার্থ বিজ্ঞানীরা যাঁরা টেলিস্কোপ দিয়ে, ইক্যুয়েশন দিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে এসব কিছু নেই। তাঁরা বলছেন নেই তো কি আছে, তোমার জন্য নেই আমার জন্য আছে। আমি তো এই রকমটিই দেখেছি। তুমি বলবে আমার মনের ভুল। হ্যাঁ আমার মনের ভুল আর এত এত ঋষিরা যাঁরা শুদ্ধ, পবিত্র চরিত্রের তাঁদের সব দর্শন, উপলব্ধিগুলো মনের ভুল আর তুমি একটা কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছ তোমার মনের ভুল হচ্ছে না! ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে বলছেন 'তুমি আমার কথা শোন'। ঠাকুর বলছেন তোমার কথা আমি কি শুনব, তুমি হলে কামী, ক্রোধী, অহঙ্কারী, তোমার মন বাসনায় লিপ্ত তোমার কথাই সত্য হয়ে যাবে! আর যাঁরা শুদ্ধ পবিত্র, নিরহঙ্কারী, নিষ্কাম তাঁদের কথা মিথ্যা হয়ে যাবে!

কাঠে আগুন ধরিয়ে তার উপর জলের পাত্র রাখার কিছুক্ষণ পর জল ফুটতে শুরু করে। এই ধর্মগুলো, কাঠ জ্বলছে, জল ফুটছে এগুলো কেন হচ্ছে? ওই কাঠের আগুনের পেছনে ব্রহ্মজ্যোতি আছে বলে কাঠ জ্বলছে। আচার্য এত মুর্খ ছিলেন না যে তিনি বুঝবেন না কাঠের মধ্যে যে দাহিকা শক্তি আছে পাথরে তার থেকে কম দাহিকা শক্তি আবার কয়লাতে কাঠের থেকে দাহিকা শক্তি বেশী। এখানে জ্যোতির কথা বলা হচ্ছে, সেই ব্রহ্মজ্যোতি ওই রূপে আছে বলে জ্বলছে, সেই আগুনের উপর জল রাখলে জল গরম হয়ে উঠছে। অগ্নির পক্ষে সম্ভব নয় ওই ব্রহ্মকে আলোকিত করতে পারবে। একজন যুক্তিবাদী এসে বললেন আমি ব্রহ্ম কি জানতে চাইছি, এরজন্য আমি ব্রহ্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করব, তাঁর শরীরের কাটাছেঁড়া করব। না, এইভাবে তাঁকে কখনই জানা যাবে না। একজন ডাক্তার এসে বললেন আমি হৃদয়াকাশকে জানতে চাই, আমি অপারেশন করে দেখব। তোমার অপারেশন তো দূরের কথা তোমার যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান দিয়েও এগুলো জানা যাবে না। ওই স্থানটাকে দেখার জন্য, যেখানে ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন হয়, সেটাকে দেখার জন্য প্রথমে তো তোমার একটা আলো লাগবে। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে তো কোন আলো দিয়ে আলোকিত করা যায় না।

কেনোপনিষদেও এই প্রশ্ন আসে। দেবতা আর অসুরের লড়াইয়ে দেবতারা জয়ী হয়ে অহঙ্কার স্ফীত হয়েছে, আমরা আমাদের শক্তিতে অসুরদের জয় করেছি। ব্রহ্মের ইচ্ছা হল দেবতাদের শিক্ষা দিতে হবে। ব্রহ্ম একটু দূরে এক অদ্ভুত রূপে নিজেকে প্রকটিত করেছেন। দেবতারা ভাবছে এই জিনিষটা কি। প্রথমে বায়ুকে পাঠান হল খোঁজ নিতে। বায়ু এসেছে খোঁজ নিতে। ব্রহ্ম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? আমি বায়ু, বায়ু ছাড়াও আমার আরও অনেক নাম আছে। তোমার কি কাজ? আমি সব কিছু উড়িয়ে দিই। এই ঘাসের টুকরোটা উড়িয়ে দেখাও তো তুমি কেমন সব কিছু উড়িয়ে দিতে পার? বায়ু প্রাণপন চেষ্টা করেও ঘাসের টুকরোটাকে নড়াতে পারল না। বায়ু লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেরত চলে এসেছে। এরপর অগ্নি দেবতাকে পাঠানো হল। তুমি কে? আমি অগ্নি, আমার আরেকটা নাম জাতবেদ। যে ব্যক্তি খুব ক্ষমতাবান হন সেই ব্যক্তির অনেকগুলো নাম হয়। অগ্নিকে ব্রহ্ম জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি কাজ? আমি সব কিছু পুড়িয়ে ভস্ম করে দিই। এই ঘাসের টুকরোটাকে ভস্ম করে দাও তো। অগ্নি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পোড়াতে শুরু করল, কিন্তু পোড়াতে পারছে না। অগ্নিও মাথা নত করে ফিরে এসেছে। শেষে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র গেছেন। ইন্দ্র যেতেই ব্রহ্ম ইন্দ্রকে পাত্তাই দিলেন না, ওখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তখন উমা হৈমবতী দেবতাদের মাঝখানে আবির্ভূতা হয়ে বললেন, তোমার যে জিনিষটা দেখলে এটাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম তোমাদের পেছনে আছেন বলেই তাঁরই শক্তিতে তোমাদের জয় হয়েছে। এটা একটা আখ্যায়িকা, এই আখ্যায়িকা দিয়ে গুরু শিষ্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যতক্ষণ ব্রহ্ম যে কোন বস্তুর পেছনে থাকবে ততক্ষণই সেই বস্তু কাজ করে। ব্রহ্মের জ্যোতি যখন যেখান থেকে সরে যাবে তখন সেখান থেকে সব কিছুর কার্য ক্ষমতা চলে যাবে। ঠাকুর একজন ডেপুটিকে বলছেন ঈশ্বরই তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যদি তাঁর ক্ষমতা নিয়ে নেন তোমার কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। গীতাতেও ভগবান একই কথা বলছেন, যেখানে যেখানে বিশেষ শক্তি দেখবে বুঝবে সেখানে ঈশ্বরেরই বিশেষ শক্তির প্রকাশ। তাহলে কি ঈশ্বরের মধ্যে বৈষম্য দোষ আছে? ঠাকুরকেও এই প্রশ্ন করতেই ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে বলছেন – তোমার তো দেখছি বেনে বুদ্ধি। বেনে বুদ্ধি মানে ব্যবসায়ীদের বুদ্ধি। ঠাকুর বলছেন কেশব সেনের এত নাম-যশ হল কারণ ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে। ঈশ্বর কাউকে বেশী কাউকে কম কিছু দেন না। অর্থাৎ ঠাকুর বলতে চাইছেন যাঁরা ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তন করেন তাঁদের বুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী হয়। তাঁদের অনেক জাগতিক সমস্যা কমে যায়। কারণ ভেতরের সমস্যাই বাইরের সমস্যার রূপ নিয়ে আসে। যেমনি ধ্যান করতে শুরু করে দেবে ভেতরের সমস্যাগুলো কমতে থাকে, তারপর বাইরের সমস্যাগুলোও আস্তে আস্তে মিটে যায়।

এই যে ব্রহ্ম যিনি কার্যগত আর বিবিধ প্রকাশ রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন তাঁকে কিভাবে জানা যাবে? প্রথমে যখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে বাইরের জগৎ যেটা সেটা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। তারপর সেখান থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কারণ গুরু সব তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরপর ধ্যান করতে শুরু করল। ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে বৃত্তি গুলো শান্ত হতে শুরু করল। বৃত্তি শান্ত হতে হতে শেষে একটি বৃত্তি থেকে

যাবে। যখন ওই বৃত্তিটাও নাশ হয়ে যায় তখন কি থাকবে? বহির্জগৎ নেই কারণ এখন সে ধ্যানের গভীরে চলে গেছে, মনে কোন বৃত্তি নেই কারণ সব বৃত্তিকে নাশ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় যখন বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ দুটোরই নাশ হয়ে যায় তখন সেই পরমজ্যোতি ভাসমান হন। তখন দেখবে আমার ভেতরে যে জ্যোতি সেই জ্যোতিই জগতের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বলে জগৎ ভাসমান। এটাই এখানে বলছেন – *তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি*। তিনি আছেন বলেই, ঈশ্বররের শক্তি পেছনে আছে বলেই জগতের সব কিছু ভাসমান হয়ে আছে।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।।২/২/১১।।
।।ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ।।

(পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্তই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, উপরে, নীচে সমস্ত কিছু ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্। এই জগৎ প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই।)

মানুষ যখন বাহ্য জগৎ থেকে নিজেকে পুরো গুটিয়ে নিয়ে ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করে তখন সে তার হৃদয়গুহায় জ্যোতি দর্শন করে, যে জ্যোতিকে বলছেন দিব্যজ্যোতি। কিন্তু এই দিব্যজ্যোতি দর্শন করা মানে ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাওয়া নয়। এর পরের ধাপে মন সমস্ত রকমের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। তার মানে ক্রিয়া দুই রকমের – বাহ্য জগতের ক্রিয়া আর অন্তর্জগতের ক্রিয়া। বাহ্য জগতের ক্রিয়া যার এখনও বন্ধ হয়নি বুঝতে হবে ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা এখনও তার শুরুই হয়নি। আমরা যে কথাগুলো বলছি এগুলো খুবই উচ্চতম অবস্থার বর্ণনা, সাধারণ লোকের ধারণা করা দূরে থাকুক এসব কথা শ্রবণ করাটাও তাদের পক্ষে কেমন যেন বেমানান। কিন্তু এগুলোই আধ্যাত্মিকতার মৌলিক তত্ত্ব কথা, যার জন্য ঋষিরা উপনিষদের বাইরে সচরাচর যেসব কথা বলা হয় সেগুলোকে খুব বেশী মূল্য দেননা। এই যে বলা হচ্ছে সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করার আগে বাহ্য জগতের সমস্ত রকমের ক্রিয়াকে বন্ধ করতে হবে, শুধু তাই নয়, পরে এই মুণ্ডকোপনিষদেই বলা হবে *ভবতি নাতিবাদি*, মানে যখন সে ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করে তখন তার অন্য ধরণের কথা বলাও বন্ধ হয়ে যায়, নিজেকে কখন জাহির করতে যাবে না। কারণ সে এখন বাহ্য জগৎ থেকে মনকে টেনে গুটিয়ে নিয়েছে।

সাধনার পদ্ধতিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। বেদান্ত বাক্য গুরুমুখে শুনতে হবে, উপনিষদের কথা নিজে অধ্যয়ণ করে নিলেও হবে না, কাঁচা গুরুর কাছ থেকে শুনলেও হবে না, ব্রহ্মবরিষ্ঠ গুরুর মুখ থেকে বেদান্ত বাক্য শুনবে, শুনে নেওয়ার পর সেই বাক্যকে চিন্তন মনন করবে। চিন্তন মনন করতে করতে আস্তে আস্তে মন গভীরে যেতে শুরু হবে। গভীরে গিয়ে একটা উচ্চ অবস্থায় দিব্যজ্যোতি দর্শন হবে, এই জ্যোতি জীবন্ত, সাধারণ কোন জাগতিক আলো নয়, অন্য ধরণের আলো। এই দিব্যজ্যোতি দর্শন হওয়া মানে অনেকটাই হয়ে গেল। এরপর আরও যখন গভীরে যেতে থাকে তখন তার মনের বৃত্তিগুলো ধীরে ধীরে কমতে কমতে শেষে একটি বৃত্তিতে গিয়ে মনটা স্থির হয়ে যায়, এই বৃত্তিকে বলা হয় ব্রহ্মাকারাকার বৃত্তি। শেষে এই বৃত্তিটাও চলে গেল। তখন মন হঠাৎ করে এক নৈঃশব্দ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে যায়। তখন সে দেখে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। ঠাকুর মাকালীর সাধনা করার পর দেখছেন সবই মা, দেখছেন চারিদিকে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, মা আর শুদ্ধ চৈতন্য তো এক, ব্রহ্ম আর শুদ্ধ চৈতন্য এক। পূজা করার সময় চারিদিকে যা কিছু দেখছেন সবই চৈতন্যময় দেখছেন, মাকে ফুল নিবেদন করার বদলে ঠাকুর চারিদিকে ফুল ছুড়তে লাগলেন।

যখন প্রতিমা বা বিগ্রহের পূজা করা হয় তখন আমরা মনে মনে কল্পনা করে বাহ্যিক ক্রিয়াদির দ্বারা প্রতিমা বা বিগ্রহে শুদ্ধ চৈতন্যকে আরোপ করি। প্রতিমাকে যদি চিন্ময় দেখেন তাহলে প্রতিমাতে আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার দরকার হয় না। শ্রীমায়ের জীবনে এই রকম একটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। একজন ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করতে এসেছে, সেই সময় গোলাপ মা একটু বাইরে গেছেন। পুরুষ ভক্তকে দেখে মা একটা চাদর দিয়ে নিজেকে আপাদমস্তক ঢেকে বসে পড়েছেন। সেই ভক্ত মায়ের কাছে প্রথম এসেছে, মায়ের সম্মুখে

বসেই প্রাণায়ামাদি করে মায়ের প্রান প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চাদরের তলায় মা ঘেমে ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ পর সেখান গোলাপ মা এসে হাজির হতেই দেখেন ভক্তটি এখনও মায়ের সামনে বসে আছে আর মা সারা শরীর চাদর মুড়ি দিয়ে ঘামছেন। গোলাপ মা সোজা বলে দিলেন 'এখনও আপনি কি করে যাচ্ছেন'? 'আমি প্রাণায়াম ন্যাস করে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছি'। শুনে গোলাপ মা প্রচণ্ড রেগে গেছেন 'এটা কি প্রতিমা যে তুমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে এসেছ! সাক্ষাৎ প্রাণবন্ত জগজ্জননী সামনে বসে আছেন আর তুমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছ'!

আমরা তো প্রতিমাকে পূজো করিনা, প্রতিমার মধ্যে সেই শুদ্ধ চৈতন্যেরই পূজা করা হয়। প্রতিমায় আগে সেই চৈতন্যকে আরোপিত করতে হয়। চৈতন্যকে আরোপিত করতে গেলে কিছু বাহ্যিক পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। ন্যাসাদি প্রাণায়াম এই পদ্ধতির একটি অঙ্গ। পূজারী চিন্তা করবেন যে আমি এই প্রতিমাতে সেই চৈতন্যময়ী মাকে আরাধনা করতে যাচ্ছি। এমনকি নিজের হৃদয়পদ্ম বা গুরুস্থান থেকে মনে মনে একটি পদ্মকে কল্পনা করে বার করে মায়ের পায়ে অর্ঘ্য রূপে স্থাপন করা হয়। পূজা যখন সমাপ্ত হয় তখন সে প্রাণ বা চৈতন্যকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। আমরা যে দূর্গাপ্রতিমাকে পূজার পর নদীতে বিসর্জন দিই সেই মাদূর্গা আর যাঁকে পূজা করা হয়েছে সেই মাদূর্গা কিন্তু এক নন। যাঁর পূজা হয়েছে তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তাঁকে তখন জীবন্ত দূর্গা রূপেই দেখা হয়েছে। পূজা সমাপনের পর সেই প্রাণকে আবার ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়। শ্রীমা তো জীবন্ত সাক্ষাৎ মহাশক্তি, তাঁকে আর কি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা যেখানে হবে না সেখানে কিভাবে পূজা হবে? তিনি যেখানে বসে আছেন সেখানেই তাঁকে অর্ঘ্য দিতে হবে। আর পুজো করতে গিয়ে যদি দেখে শ্রীমা চারিদিকে আছেন, যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকেই শুধু মা আর মা, তখন কোথায় আর ফুল দেবে, চারিদিকে ফুল দিতে থাকবে।

গুরু নানকের জীবনে এই রকম একটি ঘটনা আছে। উনি একবার মক্কা গিয়েছিলেন। আলখাল্লা ধরণের এমন একটা পোষাক পরিধান করে থাকতেন যে বোঝা যেত না উনি হিন্দু না মুসলমান। মক্কাতে গিয়ে যে সরাইখানায় উঠেছেন সেখানে শোওয়ার সময় তাঁর পা কাবার দিকে ছিল। রাত্রে সরাইখানায় একজন আগন্তুক এসে ওই ভাবে শোওয়া দেখে প্রচণ্ড রেগে গেছে। গুরু নানককে বলছে 'তুমি বুঝতে পারছো না তুমি কিভাবে শুয়ে আছে, তোমার পা কাবার দিকে'। গুরু নানক বলছেন 'আমি তো খুব ক্লান্ত তুমি দয়া করে আমার পা'টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দাও'। লোকটি পা ঘুরিয়ে যেদিকে রাখছে দেখছে কাবা ওই দিকেই। সেখান থেকে পা আবার অন্য দিকে ঘুরিয়েছে দেখে কাবা সেই দিকেই। পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেদিকেই ঘোরাচ্ছে দেখছে কাবা সেদিকেই। তখন লোকটি বুঝল এ একজন সিদ্ধ যোগী। গুরু নানক দেখাচ্ছেন তুমি যে আল্লার পূজা করছ সেই আল্লা সব দিকে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি তিনি ব্রহ্মকে ঠিক এইভাবেই দেখেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী মানে, যিনি সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিভাবে প্রত্যক্ষ করেন? সেটাই এই মন্ত্রে বলছেন *ব্রহ্মৈবেদমমৃতম্*, এই যে অমৃত ব্রহ্ম এই ব্রহ্ম আমাদের এই স্থূল শরীরের মত নন যে আজকে আছে কাল থাকবে না, কিংবা কোন বস্তুর মত নন, বস্তুর মধ্যে যে দ্রব্যগুণ থাকে সেই গুণের মত নয়, এই ব্রহ্ম অমৃত। *পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম*, তোমার সামনে কি আছে? ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। তোমার পশ্চাতে কি আছে? তোমার পেছনেও ব্রহ্ম, *পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম*। আমরা প্রায়ই বলতে শুনি 'তুমি এগিয়ে যাও'। কোন দিকে এগিয়ে যেতে বলা হচ্ছে? লক্ষ্যের দিকে। লক্ষ্য সব সময় আমরা মনে করি সামনে, আর এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে বলা হয়। যখন লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কি দেখেন? সামনে ব্রহ্ম পেছনেও ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে সামনে ও পেছনে বলতে পূর্বদিক আর পশ্চিম দিককে বোঝাচ্ছে। যদি আমার মুখ অন্য দিকে থাকে তখন আমার সামনে পেছনে এবং আমার ডান দিক এবং বাম দিক হবে। সূর্যোদয় পূর্ব দিকে হচ্ছে বলে সেদিকে মুখ রেখেই কথা বলা হয়। *চ উত্তরেণ*, উত্তর মানে হয় বাম দিক। যদি কেউ প্রশ্ন করে ঈশ্বর কোথায় আছেন? এর উত্তর হল মুণ্ডকোপনষিদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো নং মন্ত্র। এই অমৃতময় ব্রহ্ম আমার সামনে, আমার

পশ্চাতেও ব্রহ্ম আর আমার ডান দিক ও বাম দিকেও ব্রহ্ম। তাহলে কি ব্রহ্ম আমার সমান সমান? না, না, *অধশ্চোর্ধ্বং* উপরেও তিনি নীচেও তিনি।

শুধু তাই নয়, চারিদিকে শুধু ব্রহ্মই আছেন, *চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং*। আর *বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্*, এই যে সমস্ত জগৎ দেখছ এও সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম, জগৎ কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া নয়। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *অবিদ্যাদৃষ্টিনাং*, যার চোখে অবিদ্যা আছে, অবিদ্যা দৃষ্টি বলতে আচার্য বলতে চাইছেন যার বহু দৃষ্টি আছে। আমরা যখন নানান জিনিষ, নানান রকমের জীব দেখছি তখন নাম ও রূপ দিয়ে সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখি। এটাই অবিদ্যা দৃষ্টি। অবিদ্যা দৃষ্টি হলেই অপরা বিদ্যার সাহায্য নিতে হয়, কারণ সেখানে কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম সব আলাদা। আচার্য বলছেন অবিদ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি সামনে এক রকমের জিনিষ দেখে, পেছনে অন্য রকম জিনিষ দেখে, দক্ষিণে আরেক রকম আর উত্তরে অন্য রকম জিনিষ দেখে। উপরে নীচে সব আলাদা আলাদা জিনিষ দেখছে। বলছেন, অবিদ্যা দৃষ্টি সম্পন্নরা চারিদিকে যা কিছু আলাদা আলাদা দেখছে জ্ঞানীরা সেখানে শুধু ব্রহ্মই দেখেন। এটাকেই আমরা ঠাকুরের জীবনে অন্য ভঙ্গিতে দেখতে পাই, হৃদয়রামের সাথে ঠাকুর কলকাতার রাস্থা দিয়ে লাট সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছেন। হৃদয়রাম ঠাকুরকে বলছেন 'মামা! মামা! এই দেখো লাট সাহেবের বাড়ি'। ঠাকুর বলছেন 'আমি দেখলাম মাটির ঢিপি'। আসলে যত বাড়ি আছে সবই তো মাটি, শুধু মাটির রূপটা পাল্টে দিয়েছে।

যিনি অবিদ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন তিনি দেখছেন লাট সাহেবের বাড়ি। আর যিনি বিদ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন তিনি দেখছেন ওটা একটা মাটির ঢিপি, মূলতঃ এটা তাৎপর্যহীন, এর কোন দাম নেই। তিনি ব্রহ্ম ছাড়া কিছু দেখেন না। হৃদয়রাম যদি বলত 'মামা! মামা! ওই দেখ মাটির ঢিপি'। ঠাকুর বলতেন 'আমি তো এটাকে পদার্থ দেখছি'। যদি বলত 'মামা! মামা! দেখ পদার্থ'। ঠাকুর বলতেন 'আমি তো ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই দেখছি না'। হৃদয়রাম যদি এক ধাপ নীচ থেকে বলে ঠাকুর এক ধাপ উপর থেকে বলবেন। তা নাহলে যাকে বলছেন সে ধারণা করতে পারবে না। যেখানে বড় বাড়ি দেখাবে সেখানে তিনি এক ধাপ উপরে গিয়ে মাটি বলছেন, যদি মাটি বলত তিনি আরেক ধাপ উপরে গিয়ে বলতেন। আসলে ঠাকুর শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিছু দেখছেন না।

সাধনার পথে আমরা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে তখনই কেউ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন যখন তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হবে, যখন দেখবেন *ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম*। একজন যে কামী পুরুষ সে সামনে এক মহিলাকে দেখা মাত্রই তার মনের মধ্যে বৃত্তি তৈরী হয়ে গেল একে পেতে হবে। এটাই অবিদ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন তাই সে ওই বস্তুকে পেতে চাইছে। কিন্তু যাঁর বিদ্যা অর্জন হয়ে গেছে তিনি দেখছেন সেই মহিলাও ব্রহ্ম, আমিই ওই মহিলা রূপে হয়েছি। বিদ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি সামনে যেটা দেখেন সেটা সেই অমৃতময় ব্রহ্ম, ঠিক তেমনি পেছনে যা দেখেন সেও সেই অমৃতময় ব্রহ্ম। আমরা বলি পেছন ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও। আমাদের জীবনের পেছনে অনেক দুঃখ-কষ্টের কাহিনী জড়িয়ে আছে বলে পেছনের দিকে তাকাতে বারণ করা হচ্ছে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি বলবেন আরে পেছনটাও তো ব্রহ্মই। তোমার ডান দিকে যা আছে তোমার বাম দিকে যা আছে সবই ব্রহ্ম, তিনি সর্বব্যাপী কিনা। *অধশ্চোর্ধ্বং*, একেবারে গভীর সমুদ্রের মাঝখানে যদি কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তার উপরে জল, নীচে জল, তার চারিদিকে শুধু জল আর জল। ঠিক তেমনি তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই।

তিনি চারিদিকে, উপরে নীচে সর্ব দিকে কার্য রূপে নাম রূপে ছড়িয়ে আছেন, তখন তাঁকে অন্য পদার্থের মত প্রতীয়মান হয়। যখন দ্বৈত জ্ঞান হয়, দ্বৈত জ্ঞান মানে আমি আর তুমি আলাদা, তখন একই জিনিষ দুই ভাবে আসে – কারণ রূপে আর কার্য রূপে। কারণ রূপে মানে তিনি পেছনে আছেন বলে এটা এই রকম হচ্ছে। আর হওয়া মানে যেটা হচ্ছে এটাই কার্য। এই স্টীলের গ্লাশ, গ্লাশটা কার্য। এই কার্যের কারণ কি? স্টীল, স্টীল না হলে গ্লাশ হত না। স্টীলও একটা কার্য, তার পেছনে কারণ কে? লোহা। লোহাও একটা কার্য, তার পেছনে কারণ কি? এ্যাটমস্। এ্যাটমসের পেছনে কারণ কি? এণার্জি। এণার্জির পেছনে কারণ কে? ব্রহ্ম।

যিনি ব্রহ্ম তিনি কারণ, আবার তিনিই বিভিন্ন কার্য রূপে এই জগৎ রূপে ভাসমান। এই ব্যাপারটা কখন দেখা যাবে? বাইরের জগৎ থেকে মনকে তুলে নিয়ে ভেতরে ধ্যানের গভীরে গেছেন, দিব্যজ্যোতির দর্শন হয়েছে, এরপর মনের সমস্ত বৃত্তি পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে। তখন পরিষ্কার দেখতে পান তাঁর ভেতরে যে দিব্যজ্যোতি সেই জ্যোতিই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে। ভেতরের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন সেই জ্যোতি দেখছেন, বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন সেখানেও এই জ্যোতি। আরে সেই জ্যোতিই তো এই সব কিছু হয়েছে। এটা যে কোন কবির কল্পনা বা কোন তাত্ত্বিক ধারণা তা নয়, এটা একেবারে এই ভাবে এই রকমই দেখেন। ঠাকুর যখন দেখছেন কোশাকুশি চিন্ময়, তখন তিনি এটাই দেখছেন। কোশাকুশিটাও দেখছেন সাথে সাথে চিন্ময় রূপটাও দেখছেন। তার মানে, কারণ আর কার্য দুটোকে তিনি যুগপৎ দেখছেন। আমরা কার্য দেখলে কারণ দেখতে পাইনা, কারণ দেখলে কার্য দেখিনা। এই মন্ত্রগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, ঠাকুর আমাদের সামনে আবির্ভাব না হলে আমরা এই মন্ত্রগুলিকে কোন দিন বুঝতেই পারতাম না। উপনিষদের মন্ত্র ঠাকুরের জীবনে আমরা মুর্ত হতে দেখছি। ঠাকুর ঠিক ঠিক এই জিনিষগুলোই প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে দুটোকে এক সঙ্গে দেখেন সেটাকে ঠাকুর নিজে সাক্ষাৎ দর্শন করে সিদ্ধ করে দিলেন। এরপর এই নিয়ে আর কোন কথা চলতে পারে না।

এখানে এটাই বলা হচ্ছে, এই যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেটা আছে এটাই কার্য ব্রহ্ম, কার্য রূপে ভাসমান। এটা আসল নয়, মূলতঃ ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হয়নি। এই পরিবর্তন যদি সত্যিই হত তাহলে তখন এটা অন্য দর্শন হয়ে যাবে, এটাই তখন বিজ্ঞানীদের ভৌতবাদ হয়ে যাবে। ভৌতিবাদে যে পরিবর্তন হয় সেটা বাস্তব, তখন সেটা পরিণামবাদ হয়ে যাবে। বেদান্ত পরিণামবাদ নয়, এটা হল সৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদে একটা জিনিষ আছে তার উপর আরেকটা জিনিষ ভাসমান, জিনিষটা আসল নয়। জগৎ সেই শুদ্ধ ব্রহ্মাই। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর কত কি করেন, তিনি দেবলীলা করেন, নরলীলা করেন আবার জগৎলীলা করেন। সৃষ্টিটাও তাঁর লীলা, জগৎ রূপে তিনি লীলা করছেন, সবটাই ঈশ্বরের লীলা।

শেষে বলছেন, বেশী কি আর বলব, এই যে জগৎ এটাই হল শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম – *ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্*। ব্রহ্মের যেটা শেষ অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে, একেবারে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, জগৎটা তাই। এখানে এসে আচার্য যোগ করছেন – *অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্বোঽহবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ*। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয় ঠিক তেমন এই জগতে ব্রহ্মের প্রতীতি হচ্ছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে মন্ত্রে বলছেন *ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্*, ব্রহ্মের বরিষ্ঠতম যেটা সেটাই জগৎ, কিন্তু তারপরেই আচার্য বলছেন রজ্জুতে যেমন সর্পের মিথ্যা ভ্রম হয়, এই জগৎটাও মিথ্যা ভ্রম। দুটো বিপরীত কথা বলা হচ্ছে, একদিকে জগৎকে বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম তারপরেই অন্য দিকে বলছেন রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয় জগৎটা সেই রকম ভ্রম। তাহলে ব্রহ্ম কি মিথ্যা? এর প্রথম উত্তর হল যদি কেউ সর্পকে জানে তাহলে সে শুধু সর্পকেই জানবে, মানে মিথ্যাটাকেই সে জানল। কিন্তু রজ্জুকে যদি কেউ জেনে যায় তাহলে রজ্জুকে তো জানছেই আর সাথে সাথে রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হচ্ছে সেটাও জানা হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে তা বলা হচ্ছে না, এখানে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম বলা হচ্ছে। আচার্য এখানে একই জিনিষকে একই লোকের জন্য দুটো আলাদা বর্ণনা দিচ্ছেন। এই কারণেই নিজে থেকে উপনিষদ পড়তে নিষেধ করা হয়। নিজে থেকে পড়তে গেলে মনে হবে সব বুঝে ফেলেছি কিন্তু মূল জায়গাতে গিয়ে সব কিছু আটকে যাবে। ঠাকুর দেখছেন সবটাই চিন্ময়, কোশাকুশিও চিন্ময়। ঠাকুর আবার দেখছেন কোশাকুশি হল রজ্জুতে সর্পের মত ভ্রম, এটাই তো বিপরীত কথা হয়ে যাচ্ছে। একদিকে বলছেন এটা বিশুদ্ধ সোনা, তারপরেই বলছেন এটা বিশুদ্ধ মাটি। আসলে এর উত্তর খুব জটিল কিছু নয়, অত্যন্ত সহজ।

আচার্য যদি রজ্জুতে সর্প ভ্রম না বলতেন তাহলে একটা মারাত্মক বিপদ এসে যেত। তখন এই জগৎটাই সত্য হয়ে যাবে। দ্বৈতবাদীরা যেমন ঈশ্বরকেও সত্য আবার জগৎকেও সত্য বলে মনে করে, ঠিক তেমনি রজ্জুতে সর্প ভ্রম না বললে জগৎটা সত্য হয়ে যাবে। প্রত্যেক বস্তুর দুটি সত্তা আছে, যেমন এই বোতলের প্রথম সত্তা হল এর নিজস্ব সত্তা, এটা বোতল। দ্বিতীয় সত্তা হল ব্রহ্ম, এই বোতলও সেই ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। বোতল রূপে এটা মিথ্যা কিন্তু ব্রহ্ম রূপে সত্য। তাহলে বোতলের কি কোন অস্তিত্ব নেই? পূর্ণ

অস্তিত্ব আছে। কিভাবে আছে? ব্রহ্ম রূপে সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা মাটি মাটি টাকা বলে টাকাকে গঙ্গায় ফেলে দিলেন। সেই টাকাই যখন শ্রীমার কাছে আসত তখন তিনি সেটি মাথায় ঠেকিয় বাক্সতে তুলে রাখতেন। একই জিনিষকে নিয়ে ঠাকুর আর শ্রীমার বিপরীত ব্যবহার কি করে হচ্ছে? ঠাকুর টাকাকে বস্তু রূপে ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীমা ওই একই জিনিষকে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করছেন। যাঁরাই বেদান্ত নিয়ে অধ্যয়ণ করেন তাঁদের সবারই এই দ্বিধা ও সংশয় হয়। বিশেষ করে যাঁরা আচার্য শঙ্করের নাম শুনেছেন, এই সব ক্ষেত্রে তাঁরা পুরো দর্শনটাকে একটা সংশয়ের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেন। আচার্য যে বলছেন জগৎ মিথ্যা সেটা তো উপনিষদই বলছে। আবার উপনিষদই বলছে *ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্*, এই জগৎ হল শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধ ব্রহ্ম। আচার্য তাহলে এই জগৎকে মিথ্যা বা মায়া কি করে বলছেন? তাহলে আচার্য শঙ্কর আর মুণ্ডকোপনিষদ দুই রকম কথা বলছেন নাকি? এগুলো বোঝা বা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রবণ মনন যদি না থাকে তাহলে নিদিধ্যাসন হয় না, নিদিধ্যাসন যদি না হয় তাহলে তত্ত্ব কথা ভেতরে ঢুকতে পারবে না। দুজনে আলাদা কথা কিছু বলছেন না, বস্তু রূপে এই জগৎএর কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তু রূপে জগৎকে যদি সত্য বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে দুটি সত্তা এসে যাবে। আসলে তা নয়, কিন্তু তুমি যদি ব্রহ্ম রূপে জগৎকে সত্য দেখ তাহলে ঠিক আছে। আর ব্রহ্ম রূপে যখন দেখবে তখন বিশুদ্ধ ব্রহ্ম রূপেই দেখতে হবে। আমি যদি কাউকে ভালোবাসি তখন দেখতে হবে আমি তাকে কিভাবে ভালোবাসছি, মানুষ রূপে না ব্রহ্ম রূপে? যদি মানুষ রূপে তাকে ভালোবাসি তাহলে এই ভালোবাসাটা মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্ম রূপে যখন ভালোবাসছি তখন এই ভালোবাসাটাই শাশ্বত হয়ে যাবে।

ঠাকুরের জীবনেও এই ধরণের খুব প্রাঞ্জল একটা ঘটনা আছে। রামলাল হলধারীরা ঠাকুরকে বলছেন ‘আপনি নরেনের মত একটা কায়েতের ছেলের উপর মন দিয়ে কেন এই রকম উতলা হচ্ছেন’? ঠাকুর তখন বলছেন ‘এদেরকে আমি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি। এদের অবলম্বন করে আমি মনটাকে নামিয়ে রেখেছি। নরেন রাখালের উপর থেকে যদি মন তুলে নিই তাহলে দ্যাখ্ কি হয়, এই আমি নরেনের থেকে মন তুলে নিলুম’। বলেই মন তুলে নিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সব চুল দাড়ি সজারুর কাঁটার মত সোজা দাঁড়িয়ে গেছে। মন একেবারে সচ্চিদানন্দে লীন হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেলেন। যদি ঠাকুর নরেন রাখালাদি যুবকদের মানুষ রূপে দেখতেন তাহলে কি সমস্যা হত? এই যে মনটাকে সরিয়ে নিতেই নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেলেন আর চুল দাঁড়ি সব সজারুর কাঁটার মত সোজা দাঁড়িয়ে গেল, এটা হত না। প্রেমিক প্রেমিকাকে বলে আমাদের প্রেম অমর, দিব্য। তোমার প্রেম যদি অমর দিব্য হয় তাহলে তোমার প্রেমিকার থেকে একবার মনটাকে সরিয়ে দেখ না তোমার চুল, লোম ঠাকুরের মত সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে যায় কিনা। হচ্ছে না, কারণ তুমি তোমার প্রেমিকাকে মানুষ রূপে দেখছ বলে এটা হবে না। নারায়ণ রূপে যদি দেখ তখন নারায়ণরই দুটো রূপ এসে যাবে, একটা বস্তু রূপে প্রকাশ আরেকটি নারায়ণ রূপে, কারণ ও কার্য রূপে। ঠিক আছে আপনার কার্য রূপে দেখার দরকার নেই আপনি কারণ রূপেই দেখুন, তখন সমাধিতে চলে যাবেন। সমাধিতে যাচ্ছেন কি? যাচ্ছেন না। তার মানে তুমি নারায়ণ রূপে দেখছ না, মানুষ রূপেই দেখছ।

আরেকজন এসে বলছে টাকাতে আমি ঈশ্বরকেই দেখছি। খুব ভালো কথা। তাহলে ঈশ্বরের যে বাস্তবিক রূপ একবার ওইটাতে মনকে নিয়ে যাও তো। তখন তোমার কি মনে হচ্ছে টাকা-পয়সা সব খারাপ। সত্যিকারের এই ধরণের ঘটনা আছে। রাধাকান্ত মন্দিরের বিগ্রহের সোনার অলঙ্কারাদি চুরি হয়ে যাওয়ার পর মথুরবাবু বলছেন ‘ঠাকুর রক্ষা করতে পারলেন না’। ঠাকুর শুনে বলছেন ‘ছিঃ! তোমার কাছে যেটা সোনা তাঁর কাছে সেটা মাটির ঢেলা’। কারণ যখন কার্যে পরিণত হচ্ছে তখন সেখানে সব সময় তাঁর দুটি সত্তা থাকবে – বস্তু রূপ আর ব্রহ্ম রূপ। বস্তু রূপ সব সময় ত্যাজ্য, বস্তু রূপটা সব সময় তাঁর রজ্জুতে সর্প ভ্রম, মানে নাম ও রূপ যেটা হয়েছে সেটা মিথ্যা। নাম ও রূপকে সরিয়ে দিলে সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মই থেকে যাবেন। সেই বরিষ্ঠ ব্রহ্ম নাম রূপের আশ্রয় করে একটা বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হচ্ছে। এই বস্তু প্রতীতিটা মিথ্যা। তাহলে জগৎটা কি? একেবারে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম। তা আমরা এই জগৎকে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম রূপে দেখছি না, জগৎ রূপেই দেখছি। জগৎ রূপে যদি দেখি এটা মিথ্যা, এটা রজ্জুতে সর্প ভ্রম তখন এই জগতের যে আসল সত্তা, যেটা সার সেটাই শুদ্ধ ব্রহ্ম।

মাটি দিয়ে নানা রকমের খেলনা তৈরী করা হয়েছে। তাতে হাতি, ঘোড়া, উট, গরু আছে। হাতি, ঘোড়া, উট, গরু এগুলো মিথ্যা, মৃত্তিকাটাই সত্য। আমি যদি দেখি সবটাই মাটি, এই দেখাটাই সত্য। কিন্তু যখন দেখছি উট, ঘোড়া তখন কিন্তু এগুলো মিথ্যা। তাহলে কি ওগুলো উট ঘোড়া নয়? নিশ্চয়ই উট ঘোড়া, উট ঘোড়া তো আছেই। বস্তু রূপে এগুলো হাতি ঘোড়া উট এতে কোন সন্দেহ নেই। সমস্যা হল যখন হাতি, ঘোড়, উট দেখছি তখন আমার মধ্যে ভেদ বুদ্ধি এসে যাচ্ছে। মানব জীবনের যত দুঃখ-কষ্ট, যত সমস্যার হেতু এই ভেদ দৃষ্টি। মাটি আর তার খেলনা এটা তো খুব সহজ উপমা, কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই সহজ উপমা দিয়েও আমাদের ধারণা হবে না।

একটা বাচ্চা ছেলেকে আমি দেখাচ্ছি এই দেখো এই উট, ঘোড়া এগুলো মাটির। বলেই আমি জলের মধ্যে খেলনাগুলো চুবিয়ে দিলাম, সব গলে মাটি হয়ে গেল। খুব সহজে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু এই জগৎটাই যে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম এটাকে কি এত সহজে বোঝান যাবে? কখনই যাবে না। আগে তোমার মনকে জগৎ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এস, ধ্যানে বস, সাধনা করতে থাক। সাধনা করতে করতে অন্তরে যখন জ্যোতি দর্শন হবে, তারপর সেখান থেকে এগোতে এগোতে মন যখন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, মনের সব কার্য যখন স্তব্দ হয়ে যাবে তখন তুমি বুঝতে পারবে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। এ এক বিশাল কঠিন কঠোর দীর্ঘকালীন সাধনা পদ্ধতির অনুশীলনের প্রক্রিয়া। তখন কি জগৎ বলে কিছু থাকবে না? কে বলেছে থাকবে না, পুরো দমে থাকবে। ঠাকুর কি কোশাকুশি দেখছেন না, কোশাকুশিতে জল রাখছেন না? সবই করছেন কিন্তু তিনি আবার কোশাকুশিকেও চৈতন্যময় দেখছেন। তার মানে তখন গ্রহণযোগ্য আর তিরস্কার যোগ্য বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমার সোনার দরকার, এখন সেটা সোনার আংটি না সোনার দুল তাতে আমার কি আস যায়। যখন ডাকাতি করতে যায় তখন তারা দেখে না যে এটা কানের দুল আর এটা হাতের বালা, তারা দেখে সোনা। ঠিক সেই রকম যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা দেখেন এই জগৎ সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, জগতের যত প্রাণী সব বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, এই জগৎ তাঁর কাছে কখনই বস্তু রূপে প্রতীতি হবে না।

শ্রীমা সব কিছুই গ্রহণ করছেন, নিজের কাছে রাখছেন, কিন্তু তিনি বস্তু রূপে কিছু গ্রহণ করছেন না। জয়রামবাটীতে যখন পিওন মানি অর্ডারের টাকা নিয়ে আসত, তিনি সেই টাকা গুনতেনও না। টাকাটা নিয়ে ব্যাগের মধ্যে চুপচাপ রেখে দিতেন। কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করছে মা টাকাটা গুনলে না? শ্রীমা তখন বলছেন ‘দেখো, এই পয়সা গোনার সময় যে ঝনঝন আওয়াজ হবে তাতে গ্রামের লোকের কষ্ট হবে’। মায়ের কাছে মিথ্যা হতে পারে কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে তো টাকা-পয়সা সত্য। সেইজন্য যিনি জ্ঞানী কারুর প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা থাকে না, কারুর প্রতি তাঁর রাগ-দ্বেষ হয় না, কারুকে তিনি উদ্বিগ্ন দেন না, কেউ তাঁর থেকে উদ্বিগ্ন হয় না – *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ*। কোন জিনিষ আমার কাছেই থাকবে, আবার কোন জিনিষ আমার কাছ থেকে চলে যাক এই ভাব তাঁর কখনই আসবে না। কিন্তু তাহলে নরেন রাখালের জন্য ঠাকুরের কেন কষ্ট হচ্ছে? কারণ নরেন রাখাল হল একেবারে বিশুদ্ধ আধার, এরা যদি ঠাকুরের কাছে না থাকে তাহলে ঠাকুর মনকে উচ্চ অবস্থা থেকে নামিয়ে কোথাও রাখতে পারছেন না। ঠাকুর যে বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে অবতারত্বকে স্বীকার করেছেন, সেই কার্য আর সফল হবে না।

এই দৃশ্য জগৎএর দুটো অস্তিত্ব, প্রথম ব্রহ্ম রূপে অস্তিত্ব আর দ্বিতীয় বস্তু রূপে অস্তিত্ব। বস্তু রূপে অস্তিত্ব অজ্ঞানীরা দেখে কিন্তু জ্ঞানীরা দেখেন বস্তু রূপটা শুধু নাম ও রূপের খেলা। কিন্তু তাই বলে কি বন্ধ্যা পুত্রের মত মিথ্যা? সেই অর্থে জগৎটা অলীক নয়, অলীক মানে যার কোন অস্তিত্বই নেই, যেমন ঘোড়ার ডিম। এই জগৎ পূর্ণ ব্রহ্ম, *বরিষ্ঠম্*। আমরা যখনই শুনি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা তখন মনে করি জগৎ বলে কিছু নেই। কিন্তু যেটা সামনে দেখছি এটা তাহলে কি? এটাই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম কিন্তু বস্তু রূপে ভাসমান। সিদ্ধ পুরুষ এই জগৎকে আর বস্তু রূপে না দেখে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম রূপে দেখেন। যারা অজ্ঞানী তারা এই জগৎকে শুধু বস্তু রূপে দেখে, ব্রহ্ম রূপে দেখতে পায় না। জ্ঞানী যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তিনি ব্রহ্ম রূপে ভালোবাসেন কিন্তু অজ্ঞানী মানুষ রূপে ভালোবাসে। এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো জ্ঞানীরা কখনই করবেন না, ঠাকুর বলছেন

তাঁদের বেতালা পা পরবে না। কেউ যদি মনে করে আমি টাকাকে ব্রহ্ম রূপে সঞ্চয় করে যাচ্ছি, এটা কপটতা। আবার রাজা জনকাদিও ছিলেন, রাজ্য করছেন কিন্তু কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই।

এই জগৎকে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলছেন সাথে সাথে বলছেন *বরিষ্ঠম্*। তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্ম আর জগৎটা যে মলিন ব্রহ্ম নয় এটা বোঝাবার জন্য বলছেন *বরিষ্ঠম্*। ব্রহ্মের কোন মলিন ও বিশুদ্ধ বলে কিছু নেই, ব্রহ্ম ব্রহ্মই। শিষ্যের মনে যাতে কোন সংশয় না হয় তাই বলছেন, তুমি এরকম কিছু মনে করো না যে ব্রহ্ম বিশুদ্ধ আর এই জগৎটা মলিন ব্রহ্ম। যেমন কার্য ব্রহ্মকে বোঝানর জন্য অনেক সময় বলা হয় অপর ব্রহ্ম কিন্তু ব্রহ্মে কোন উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম আর নিকৃষ্ট ব্রহ্ম বলে কিছু হয় না, ব্রহ্ম সব সময়ই সমান ভাবে বিশুদ্ধ। শিষ্যকে বোঝানর জন্য *বরিষ্ঠম্* বলা হচ্ছে, তুমি চারিদিকে যে জগৎ দেখছ এটাও সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম। তাই এই জগৎকে বস্তু রূপে দেখতে যেও না, বস্তু রূপে দেখলে এই জগতে তুমি সমস্যায় পড়ে যাবে। এই জগৎ হল ব্রহ্ম, মায়া, নাম ও রূপের খেলা। ব্রহ্মের উপর যখন মায়ার আবরণ এসে যাচ্ছে তখন ব্রহ্মকে নাম-রূপে ভাসমান দেখায়। নাম-রূপ যখন এসে যায় তখন তার সাথে সুখ-দুঃখও এসে যায়। উদ্দেশ্য হল সুখ-দুঃখের পারে যাওয়া। সুখ-দুঃখের পারে যাওয়া মানে নাম-রূপের পারে যাওয়া। নাম-রূপের পারে যাওয়া মানে মায়াকে অতিক্রম করা। মায়াকে অতিক্রম করা মানে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

এরপর আমরা তৃতীয় মুণ্ডকে প্রবেশ করছি। মুণ্ডকোপনিষদের মূল প্রশ্ন ছিল কোনটা জানলে সবটা জানা যায়। ঋষি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন জগতে দুটো বিদ্যা আছে অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা দিয়ে কি হয়? বলছেন *অক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যমধিগম্যতে* – পরা বিদ্যার দ্বারা অবিনাশী পুরুষসংজ্ঞক সত্যস্বরূপের জ্ঞান উপলব্ধ হয়। পরা বিদ্যা = সত্য জ্ঞান = অক্ষর পুরুষসংজ্ঞক = ব্রহ্মজ্ঞান। অক্ষর পুরুষকে জানা, ব্রহ্মকে জানা, সত্যের জ্ঞানও তাই। পরা বিদ্যার দ্বারাই সেটা হয়। যে কোন বিদ্যার কাজ হল সত্যকে জানা। যেমন সঙ্গীত বিদ্যা, যিনি সঙ্গীত বিদ্যা অর্জন করছেন তিনি সঙ্গীত বিদ্যার সত্যকে ধরতে চাইছেন, অর্থাৎ সঙ্গীতের শুদ্ধ রূপ যেটা সেটাকে আয়ত্ত করা। যে বিদ্যার দ্বারা পরম সত্যকে জানা যায় সেই বিদ্যাকে বলছেন পরা বিদ্যা। পরম সত্যই অক্ষর পুরুষের জ্ঞান, সেটাই ব্রহ্মজ্ঞান, সেটাই সত্য জ্ঞান। এই সত্য জ্ঞান পরা বিদ্যাতে হয়। অপরা বিদ্যার দ্বারা নানাত্ব জ্ঞান হয়। অপরা বিদ্যাতে ভেদ দৃষ্টির জ্ঞান হয়, অর্থাৎ কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আর তার ফল সব আলাদা আলাদা। অপরা বিদ্যাতেও মনে হয় যেন আমি সত্যকে জানছি, কিন্তু তা হয় না। একমাত্র পরা বিদ্যাতেই সত্যের জ্ঞান হয়।

বিএ এমএ পাশ করলে আমি একটা চাকরি পেতে পারি, চাকরি পেলে আমি অর্থ উপার্জন করতে পারব, অর্থ উপার্জন করলে আমি আমার ভোগের পুর্তি করতে পারব। কিন্তু এই পরা বিদ্যার দ্বারা সত্যকে জেনে আমার কি লাভ হবে? পরা বিদ্যার সাধন করলে আমার কি হবে? বলছেন পরা বিদ্যার সাধন করলে হৃদয়গ্রন্তি ভেদ হয়ে যাবে, *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ*। পরা বিদ্যাতে এটাই লাভ। এই হৃদয়গ্রন্থির কারণেই আমাদের যত বিপদ। কি বিপদ হবে, সেটাই পরের মন্ত্রগুলোতে পর পর বলা হচ্ছে। হৃদয়গ্রন্থিগুলো আমাদের অজ্ঞানের মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। পরা বিদ্যাতে এই অজ্ঞানের গিট্ গুলোর আত্যন্তিক নাশ হয়ে যায়। নাশ করার উপায় কি? যোগ। কি যোগ? *ধন্যরাদ্যুপাদানকল্পনয়োক্তঃ*, ধনুর কল্পনা করে যে উপমার দ্বারা উপনিষদে যে কথা বলা হয়েছে, সেটাকে অনুসরণ করে সাধনা করা। এটাই হল উপায়। পর পর কয়েকটা জিনিষ বলা হয়ে গেছে, পরা বিদ্যা কাকে বলে, পরা বিদ্যার দ্বারা কোথায় পৌঁছান যায়, সেখানে পৌঁছালে কি লাভ আর পৌঁছানোর পথ কি।

এই চারটে ধাপে এত কিছু বলার পরও একটা জিনিষ অবশিষ্ট থেকে যায় সেটা হল সহকারি সাধন। সহকারি সাধন মানে, মানুষ যখন সাধনার পথ এগোয় তখন তার পাশে অনেক কিছুর দরকার পরে। যেমন আমাদের মূল খাদ্য ভাত, কিন্তু শুধু ভাত তো খাওয়া যাবে না, তখন সহকারি খাবারের দরকার হয়। সহকারি খাবার হল ডাল, তরকারি, আচার ইত্যাদি। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনাতেও সহকারি সাধন থাকে, শুধু

একটা দিয়ে হয় না। সহকারি সাধন হল, সত্য, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য। যদিও বলে দেওয়া হয়েছে *ধনুর্গৃহিত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং*, মহাস্ত্র হল উপনিষদ রূপী ধনু, আর *প্রণবো ধনু*, ওঁ হল সে ধনু। অর্থাৎ বলছেন ওঙ্কার সাধনা করতে। কিন্তু এবার তার সহকারি সাধনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করবেন। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন – *প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে, অত্যন্তদুরবগাহত্বাৎ কৃতমপি*। এবার একই জিনিষকে অন্য ভাবে বোঝাচ্ছেন, কারণ আচার্য নিজে বলছেন আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য বিষয়। আচার্য তাঁর ভাষ্য রচনা নিশ্চয়ই শিশুদের জন্য করছেন না। আমাদের বেলুড় মঠের মহারাজরা বলতেন, গীতা উপনিষদের উপর আচার্য যে ভাষ্য রচনা করেছেন এগুলো হল যাদের মধ্যে একটু আধ্যাত্মিক চেতনা জেগেছে, যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের জন্য। তাঁরা আমাদের অনেক উপরে। কিন্তু আচার্য তাঁদেরকেই বলছেন এই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য। অথচ ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরকে যে যা প্রশ্ন করত ঠাকুর তাদের নিজের মত বুঝিয়ে দিতেন, সেটা কিন্তু তাদের কাছে খুব দুর্বোধ্য মনে হত না। আবার কেউ হয়ত এসে প্রশ্ন করল 'মহাশয়! আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন'। ঠাকুর তাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন সেটা আর লিপিবদ্ধ করা নেই। ঠাকুর কিন্তু কাউকে বলবেন না যে, তুমি এটা বুঝবে না। কারণ দক্ষ ও বিচক্ষণ জ্ঞানী পুরুষ একটা শিশুকেও বুঝিয়ে দিতে পারবেন আবার একজন পণ্ডিতকেও বুঝিয়ে দেবেন।

কিছু দিন আগে এই ধরণের একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। মার্কেটিং এর উপর বাজারে খুব ভালো ভালো কম্প্যুটারের প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। একটা কোম্পানি এই প্রোগ্রামগুলোর উপর আরেকটা প্রোগ্রাম তৈরী করল যার কাজ হল মার্কেটিং এর উপর যত প্রোগ্রামিং আছে সেগুলো বাজারে কেমন চলতে পারে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এই প্রোগ্রাম তৈরী করা হল। বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকটি বড় বড় কোম্পানির পদস্থ অফিসাররা এই কোম্পানিতে এসে দেখতে চাইল নতুন প্রোগ্রামিংটা কেমন আর এর দ্বারা ঠিক কি কাজ পাওয়া যেতে পারে। এই কোম্পানির যিনি চিফ ছিলেন তিনি কোন কারণে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর এক এ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে কয়েক ঘন্টা ধরে বিভিন্ন কোম্পানির অফিসারদের নতুন প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে বোঝালেন। কিন্তু কিছুতেই এরাও বুঝতে পারছে না আর এও বোঝাতে পারছে না। শেষে বস্‌কে এ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে বলল 'স্যার! এরা কিছুই তো বুঝতে পারছে না'। তখন উনি এসে দু মিনিটের মধ্যে জিনিষটাকে স্পষ্ট করে দিলেন। উনি বললেন – দেখুন ছাদে বা গাছে ওঠার সময় আপনারা একটা মই লাগান। মইটা লাগাবার আগে আপনার ভালো করে ঝাঁকিয়ে দেখে নেন মইটা মজবুত কিনা। আমার এই সফটওয়ার ওই সফটওয়ারগুলোকে ঝাঁকিয়ে দেখে নেয় ওগুলো ঠিক কাজ করবে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে এরা ওই সফটওয়ারের অর্ডার দিয়ে দিল। দু মিনিটের মধ্যে বুঝে নিল। যাঁরা নিজের বিষয়ে দক্ষ ও কুশলী হন তাঁরা যত দুর্বোধ্য বিষয়ই হোক না কেন একটা শিশুকেও দু মিনিটের মধ্যে বুঝিয়ে দেবে।

একটা বাচ্চা ছেলে আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করল Uncle what is theory of relativity? উনি তখন বাচ্চাটিকে বললেন – তোমার সঙ্গে যদি আমি এক ঘন্টা কথা বলি আমার মনে হবে আমি দু মিনিট কথা বলেছি। আর ওই যে বুড়িকে দেখছ, ওর সঙ্গে আমি যদি দু মিনিট কথা বলি আমার মনে হবে এক ঘন্টা ধরে কথা বলছি। এটাই থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি। সময় যে কোন স্থির বস্তু নয় আইনস্টাইন এটাই বাচ্চাদের সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। তাহলে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি বলতে কি অতটুকুই। কখনই না, এর থেকে অনেক বেশী। অন্য দিকে আইনস্টাইনও ভুল কিছু বলছেন না। এই হচ্ছে নিজের বিষয়ে দক্ষ ও কুশলী। কয়েকজন থিয়েটারওয়ালা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন – ঈশ্বর দর্শন কিরূপ। আজকের দিনে হিন্দী সিনেমা করে বেড়ায় এই হিরো হিরোইনরা এসে যদি বেলুড় মঠের কোন মহারাজদের এই ধরণের প্রশ্ন করে তাঁদের অনেকেই এদের সাথে হয়তো কোন কথাই বলবেন না। কিন্তু ঠাকুর থিয়েটারওয়ালাদের কি বলছেন? যেমন থিয়েটার শুরু হওয়ার আগে হলে লোকজন বসে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে থাকে কিন্তু যেমনি স্টেজের পর্দা উঠে গেল তখন গল্পগুজব বন্ধ হয়ে গিয়ে সবার দৃষ্টি স্টেজের উপর গিয়ে পড়ে। ঈশ্বর দর্শন ঠিক সেই রকম। কি সুন্দর ভাবে ঠাকুর সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের সবারই মন এখন জগতের দিকে পড়ে আছে,

জগতের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মধ্যে আমরা হারিয়ে গেছি, এটাই অজ্ঞানের পর্দা। কিন্তু যখনই পর্দা উঠে গেল সব রকম কথাবার্তা বন্ধ হয়ে নাটকের দিকে পুরো মনটা একাগ্র হয়ে গেল আর অন্য দিকে মন নেই। ঈশ্বর দর্শন ঠিক তাই, পুরো মনটা জগৎ থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বরে আটকে যাবে। ঠাকুর থিয়েটারওয়ালাদের এই কথা বললেন, তাই বলে তাদের কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে? স্পষ্ট হবে না, কিন্তু উপমাটা তাদের মনে গেঁথে যাবে। এরপর সাধনা করতে করতে স্পষ্ট হতে থাকবে।

এই যে পরমার্থ বস্তু, পরমার্থ বস্তু মানে যেটা শেষ বস্তু। ভাগবতে এটা দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করার সময় বলছেন – যখন জগতের একটার পর একটা বস্তু লয় হতে শুরু হয়, প্রলয় মানে প্রকৃষ্ট রূপে লয় হওয়া আর লয় হওয়া মানে একটার মধ্যে আরেকটা চলে যাওয়া। অন্ধদের এক ধরণের লম্বা লাঠি থাকে যাতে অনেকগুলো লাঠির টুকরো একটার মধ্যে আরেকটা ঢোকান থাকে। একটা একটা করে টেনে বার করে লাঠিকে লম্বা করা যায় আবার ঠেলে একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকিয়ে ছোট করা যায়। লয় মানে ঢুকে যাওয়া আর প্রলয় মানে পুরো নাশ হয়ে যাওয়া। ভাগবতে এটাই বলছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যখন লয় হতে থাকবে তখন শেষে ঈশ্বরই থেকে যান। প্রলয় যখন হয় তখন ভগবান বিষ্ণুই থেকে যান। কিন্তু যখন মহাপ্রলয় হয় তখনও ভগবান শেষে থেকে যান। সেইজন্য ভগবানের আরেকটা নাম শেষ। আর তিনি কখন শেষ হন না তাই তাঁর আরেকটি নাম অশেষ। সাধারণ মানুষ এত কিছু বুঝতে পারবে না বলে বলা হয় ভগবান শেষ নাগের উপর শুয়ে আছেন। শেষ নাগটা কি? সবাই জানে মাটির তলা থেকে সাপ বেরোয়। তার মানে সাপ এই পৃথিবীকে ধরে আছে। শেষ যে সে ধরে আছে পৃথিবীকে, সেই শেষ আবার সাপ। যখন সব কিছু লয় হয়ে হয়ে যে জায়গাতে গিয়ে দাঁড়াল সেটা শেষ। গ্রামের লোকেরা কিছু বুঝবে না। একটা নাগ আছে তার নামে শেষনাগ, তার হাজারটা ফনা, মানে অনন্ত। সেই শেষনাগের উপর ভগবান নারায়ণ শয়ন করে আছেন। এই ভগবানই হলেন পরমার্থ। পরমার্থ হল, এর আর কখন শেষ হবে না। যারই বস্তুত্ব আছে সেই বস্তু নাশ হয়ে যাবে কিন্তু পরমার্থের কখন নাশ হবে না, কোন লয় হয় না, কখন প্রলয় হয় না আর তাঁর কখন ষড়বিকার হয় না।

ভগবান জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। ভগবান নিজেই কি এই জগৎ হয়েছেন? না, যিনি পরমার্থ তিনি কখন পরিবর্তিত হন না। মনে হয় যেন তিনি এই সব কিছু হয়েছেন। তিনিই আছেন, এগুলো তিনিই কিন্তু অন্য ভাবে কার্য রূপে ভাসমান দেখাচ্ছে। এই জিনিষটাকে বোঝানর জন্য একটা উপমা দেওয়া হচ্ছে। এটি খুব বিখ্যাত উপমা, স্বামীজীর অনেক রচনা ও বক্তৃতায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম অধ্যায়

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।।৩/১/১।।

(সর্বদা সম্মিলিত সমান নামধারী দুটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করে আছে। এদের মধ্যে একটি তিক্ত, স্বাদু সবরকম ফলই ভক্ষণ করে। অপরটি কোন ফলই ভক্ষণ করে না, শুধু দেখে।)

কার্য ব্রহ্ম জগৎ রূপে ভাসমান এই জগতে দুটি জিনিষ সব সময় একসঙ্গে থাকবে – ঈশ্বর আর জীব। ঈশ্বর মায়াধীশ আর জীব মায়াধীন। মায়াধীশ মানে যিনি মায়ার মালিক অপর জন মায়ার অধীন। বস্তুত জীব আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জীব আর ঈশ্বরের মধ্যে যদি কোন তফাৎই না থাকে তাহলে একজন মায়াধীশ আর আরেকজন মায়াধীন কি করে হচ্ছে? ব্রাহ্মণের দুই ছেলের একজন ব্রাহ্মণ আরেকজন চণ্ডাল কখন হতে পারে না, জাতেই আলাদা হয়ে যাবে। এই ধরণের কিছু সমস্যার জন্যই বেদান্ত নিজের মত যুক্তি

তর্ক দিয়ে সাজিয়ে সামনে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। বেদান্ত দেখিয়ে দিয়ে বলে জীব বলে কিছু নেই? তাহলে এটা কি? এটা হল প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। আসল চৈতন্যকে বলছেন মায়াধীশ। কিন্তু যিনি মালিক তিনি আবার মায়ার অধীন কি করে হবেন। মালিক চাকরের গোলামী করতে যাবেন, এটা কি কখন বাস্তবে সম্ভব। চৈতন্য সব সময় প্রকৃতির রাজা, রাজা কি করে প্রকৃতির রাজ্যে আসবে? কিন্তু দেখছি চৈতন্যকে প্রকৃতির রাজ্যে আসতে হচ্ছে, কিন্তু যেটা আসছে সেটা আসল চৈতন্য নয়, প্রতিবিম্বিত চৈতন্য রূপে আসছে। এটাকে অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে কি রকম দেখাবে দেখা যাক।

আমার শরীরে শুদ্ধ আত্মা আছেন। তিনি কি কখন বন্ধনে আছেন? কখনই বন্ধনে নেই। তাহলে বন্ধনে কে আছে? ওই যে শুদ্ধ চৈতন্য সেই শুদ্ধ চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন আমার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারে। এই মন-বুদ্ধি ইত্যাদিতে যখন শুদ্ধ চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন সেখানে একটা চৈতন্যের আভাস হচ্ছে। ওই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের যে আভাস হচ্ছে এই আভাসেই জগৎ চলছে, এই আভাসের জন্যই আমি বোধ হচ্ছে, একেই ঠাকুর কাঁচা আমি বলছেন, জন্ম-মৃত্য এরই হয়, এরই সুখ-দুঃখ বোধ হয়, এরই বন্ধন এরই মুক্তি। আমরা যে বলি আমার ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা ইত্যাদি, আসলে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মনে করছে আমি স্বাধীন। এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য স্বাধীন হবে কি করে, সেতো চৈতন্যই নয়, গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এর তো কোন অস্তিত্বই নেই। যার স্বাধীন ইচ্ছা বলে বলা হচ্ছে তার তো কোন অস্তিত্বই নেই, তার আবার ইচ্ছা কোথা থেকে আসবে আর কি করেই বা আসবে। ইচ্ছা মানে তার চৈতন্য থাকতে হবে, চৈতন্য থাকা মানে তার অস্তিত্ব থাকতে হবে। আমার মন বুদ্ধিতে যেটা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তার তো কোন অস্তিত্বই নেই। আয়নাতে যখন আমার শরীরটা প্রতিফলিত হচ্ছে তখন আয়নার সেই প্রতিবিম্বের কি কোন অস্তিত্ব আছে, আয়নার সামনে থেকে সরে গেলে বা আয়নাকে সরিয়ে দিলে কিছুই থাকছে না। আয়নাতে প্রতিফলিত আমার প্রতিবিম্ব মনে করছে আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। আমি হাত নাড়লে সে বলবে আমি হাত নাড়ছি। কোন কারণে আমি যদি স্থির হয়ে থাকি আর আয়নাটা হাওয়াতে দুলতে থাকল তখন আয়নার মধ্যে আমার প্রতিবিম্বটাও নড়তে থাকবে। কিন্তু আসল যিনি তিনি রাজার মত বসে আছেন, তিনি কিছুই করছেন না, কোথাও যাচ্ছেন না, কিন্তু আয়নাটা দুলছে। আয়নাটাকে সরিয়ে এই দেওয়াল থেকে পাশের দেওয়ালে রাখলে মনে হবে আয়নাতে আমার প্রতিবিম্ব নড়ছে, আমার প্রতিবিম্ব এই দেওয়াল থেকে ওই দেওয়ালে যাচ্ছে, কিন্তু আসল আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছি। ঠিক তেমনি এই প্রকৃতি নৃত্য করে যাচ্ছে, এই প্রকৃতির মধ্যে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ছে তার বোধ এসে গেছে যে আমি আছি। আর আমি আমার প্রতিকৃতি দেখার জন্য প্রকৃতিকে নাচাচ্ছি, এখানে যেমন আয়নাকে ঘোরাচ্ছি। কিন্তু আমার কোন বোধও নেই যে আমার ওখানে প্রতিবিম্ব রয়েছে। হঠাৎ কোন আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলছি। আসলে কি হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। এই প্রকৃতি নেচে চলেছে আর আমার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রতিবিম্ব গুলি নিজেদের মনে করছে আমরা স্বাধীন। যতই স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা বলে চিৎকার করে যাও না কেন, জগতে তোমার কোন অস্তিত্বই নেই। একমাত্র সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই আছেন। তাঁরই এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছবি। তিনি প্রথম থেকেই জানেন এগুলো আমারই ছবি কিন্তু মজার ব্যাপার হল প্রকৃতি যখন কাঁদে তখন প্রতিবিম্বটাও কাঁদতে থাকে, এই প্রতিবিম্বের হাসিকান্না দেখে দেখে একটা অবস্থাতে এসে এই শুদ্ধ ব্রহ্ম নিজেকে মনে করতে শুরু করে আমি নাচছি, আমি হাসছি, আমি কাঁদছি। এবার কিন্তু প্রতিবিম্বের বোধটা আসল হয়ে গেছে। প্রকৃতির সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই, শুধু নিজের প্রতিবিম্বটা প্রকৃতির জন্য নড়ছে আর এর মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। সাধনা করে যখন বুঝে নেবে যে আরে এর সাথে তো আমার কোন সম্পর্কই নেই, এখানে আয়নাটা তো নড়ছে, আয়নার নড়াচড়ার জন্য প্রতিবিম্বটা নড়ছে, আমি তো স্থির, আমি যেখানে থাকার সেখানেই আছি।

এই বাস্তব জিনিষটাকেই এই মন্ত্রে উপমার সাহায্যে বোঝান হচ্ছে। এখন একটা উপমা দিয়ে বোঝালে কিছু জিনিষ হয়তো বোঝান যাবে না, অন্য উপমা দিলে আরেকটা দিক বাদ চলে যেতে পারে। কারণ এ এমন এক তত্ত্ব আর এই তত্ত্ব ইহ জগতের কোন বিষয়ই নয়, তাই এত দুর্বোধ্য। এই সংসার হল একটি বৃক্ষ, এই

বৃক্ষে দুটি সুন্দর পাখি বাস করে – একটি ঈশ্বররূপী পাখি আরেকটি জীবরূপী পাখি। জীব কোটি কোটি, কিন্তু এখানে একটি পাখিকে জীব রূপে নেওয়া হয়েছে উপমা দিয়ে বোঝানর জন্য। এখানে বলছেন *সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে*, দুটি পাখি একই গাছে বাস করছে। এই বৃক্ষটি হল সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এই বৃক্ষে ঈশ্বরও আছেন জীবও আছেন। ঈশ্বর সব কিছুর মালিক, কিন্তু তিনিও বাস করছেন। আর জীবও ঈশ্বরের সাথে বাস করছে। এই দুটি পাখির মধ্যে একটি পাখি *তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি*, এই জগৎরূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের সুখ-দুঃখ রূপ ফলকে আস্বাদন করছে আর *অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি*, অন্য পাখিটি কোন ফল আস্বাদন করছে না, শুধু দেখে যাচ্ছে। যে পাখিটি অশ্বত্থ গাছের ফল ভক্ষণ করছে সে হল জীব আর ঈশ্বর কিছু ভক্ষণ করছেন না, তিনি শুধু দেখে যাচ্ছেন। ঈশ্বর তো চোখ দিয়ে দেখছেন না, বিনা চোখেই তিনি দেখে যাচ্ছেন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তাই কোন কিছুই তাঁর অগোচরে থাকতে পারেনা। তিনি কোন কিছুই আস্বাদ করছেন না বলে তাঁর কোন সুখও অনুভব হচ্ছে না, আবার দুঃখেরও কোন বোধ হচ্ছে না। আর যে পাখিটি বৃক্ষের ফলকে আস্বাদ করছে, মিষ্টি ফল ভক্ষণ করলে তার আনন্দ হচ্ছে আবার যখন তিক্ত ফল আস্বাদ করছে তখন বিষন্ন হয়ে হা হুতাশ করছে। এই দুটো পাখির দ্বারা জীব আর ঈশ্বর অর্থাৎ মায়াধীশ আর মায়াধীনের উপমা দিচ্ছেন।

দ্বা সুপর্ণা, অনেক প্রাচীন সংস্কৃত বলে *দ্বা* বলা হয়েছে আসলে হওয়া উচিৎ ছিল *দ্বে* বা *দ্বৌ*। সুপর্ণা মানে সুন্দর ডানা যুক্ত দুটি পাখি। আবার সুপর্ণার পর্ণা মানে বৃক্ষের পাতাও হতে পারে, সুন্দর পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ, এই দুটো অর্থেই হতে পারে। *সযুজা সখায়া*, দুজন এক সঙ্গেই বাস করছে। কিভাবে বাস করছে? আচার্য বলছেন – *নিয়ম্যনিয়ামক* ভাবে, একজন নিয়ামক, যিনি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আরেকজন যে নিয়ম্য, যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একজন শাসক ও আরেকজন শাসিত। *সখায়া*, মানে *সমানাখ্যানৌ*, দুজনের সমান অভিব্যক্তি। সমান অভিব্যক্তি মানে দুজনেই সেই চৈতন্য। শুধু তফাৎ হল একজন শুদ্ধ চৈতন্য, আরেকজন প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি তো কখনই কোন কিছুতে জড়াবেন না, কিন্তু প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সব কিছু করে বেড়াচ্ছে, কারণ তার একাত্ম বোধ হয়ে আছে মন, বুদ্ধির সাথে। মন বুদ্ধি হল প্রকৃতির, প্রকৃতি যেমন যেমন নৃত্য করছে তেমন তেমন প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মনে করছে আমিই নৃত্য করছি, কারণ সে প্রকৃতির সাথে নিজেকে এক বোধ করে রেখেছে। মন বুদ্ধির সাথে আবার জড়িয়ে আছে ইন্দ্রিয়গুলো, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে তার বিষয়ের। এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সবটাই প্রকৃতি। ইন্দ্রিয় এখন ছুটে যাচ্ছে তার বিষয়ের দিকে। ইন্দ্রিয় ছুটছে বলে তার সাথে মনকেও দৌড়াতে হচ্ছে। মনের সাথে জুড়ে রয়েছে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, তার এখন কোন উপায় নেই তাই তাকেও এখন ছুটতে হচ্ছে।

এই জগতে ঈশ্বরকেও দেখা যায় আবার জীবকেও দেখা যায়। জগৎ যদি না থাকে ঈশ্বরকে দেখা যাবে না। ঠাকুর বলছেন, যে বাবুর বাড়ি নেই বাগান নেই সেই বাবু কিসের বাবু! যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নেই সেই ঈশ্বর কিসের ঈশ্বর। এই জগৎ ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য। পুরুষসূক্তমে বলছেন *এতাবানস্য মহিমা*, এই সব কিছুই সেই পুরুষের মহিমা। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে বোঝা যায় এই জগতে। সেই জগতে আবার জীবও বাস করছে, তাই দুজন একই বৃক্ষের বাসিন্দা। এই যে শরীররূপ বৃক্ষ, এর মধ্যেই অন্তর্যামী আর অন্তর্যামীর প্রতিবিম্বিত চৈতন্য আলিঙ্গন করে আছে। পরে বলবেন যিনি অন্তর্যামী তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম। কিন্তু প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মন বুদ্ধির সাথে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছে। কান্নাকাটি, সুখদুঃখ কার? প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের। স্বাধীন ইচ্ছা কে বলে? প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। যেমন জীব আর ঈশ্বর এই সংসার বৃক্ষে বাস করছেন, ঠিক তেমনি শুদ্ধ আত্মা অন্তর্যামী রূপে সমস্ত জীব দেহে বাস করেন আর তাঁরই প্রতিবিম্ব কাঁচা আমি রূপে সেই শরীরেই বাস করছে। পাকা আমি হলেন অন্তর্যামী আর কাঁচা আমি যে আমি ভোগের পেছনে দৌড়াচ্ছে। এই কাঁচা আমিই পরিশ্রম থেকে পালাচ্ছে, দুঃখ থেকে পালাচ্ছে আর সুখের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

যে বৃক্ষের কথা বলা হচ্ছে এই বৃক্ষকে আমরা সংসার বৃক্ষ রূপেও নিতে পারি আবার দেহ বৃক্ষ রূপেও নিতে পারি। এই বৃক্ষের কি বৈশিষ্ট্য? আচার্য বলছেন *অয়ং হি ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ*। এই ভাবটা উপনিষদেই এসে গিয়েছে, সেখান থেকে গীতা আবার পুরোটাই নিয়েছে। এই সংসার বৃক্ষের শেকড়

উপরের দিকে। উপরের দিকে মানে অব্যক্ত, প্রকৃতিই অব্যক্ত। আর প্রকৃতি থেকেই সব বেরিয়ে আসছে। প্রকৃতি থেকে প্রথমে মহৎ রূপে, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে তন্মাত্র এইভাবে পর পর বেরিয়ে আসছে। শেকড়টা উপরের দিকে আর বৃক্ষের ডালপালা গুলো নীচের দিকে ছড়িয়ে গেছে। যত প্রাণী আছে তাদের সবার কর্মফলের আশ্রয় এই বৃক্ষ। তার মানে জন্ম জন্ম ধরে আমি যত কর্ম করে এসেছি, এখন যে কর্ম করছি এই সমস্ত কর্মের ফল এই সংসারেই আমি পাব আর এই দেহের মাধ্যমেই পাব। অবিদ্যা, কাম, কর্ম, বাসনাদির আশ্রয়ভূত লিঙ্গদেহ রূপী জীব – এই যে বিশুদ্ধ আত্মা দেহের ভেতরে রয়েছেন, যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, যিনি সেই ঈশ্বর তাঁর মধ্যে যখন অবিদ্যার আবরণ এসে যাচ্ছে তখন সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম যেন প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হয়ে যাচ্ছে আর সে যেন নিজেকে মন বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম করে ফেলছে। এই অবিদ্যার সঙ্গে যখন শুদ্ধ আত্মা নিজেকে জুড়ে দেয় তখন পুরো জিনিষটা হয়ে যায় কারণ শরীর। এই কারণ শরীর থেকে যখন আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রকৃতির সাথে, অর্থাৎ মন বুদ্ধির সাথে যখন নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তখন এই লিঙ্গশরীর তৈরী হয়ে যায়। আর যে জিনিষটা এই সংসার, জগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটাই স্থূল শরীর। স্থূল শরীরের জন্ম-মৃত্যু সবই হয়। লিঙ্গ শরীরটাই এক স্থূল শরীর থেকে আরেক স্থূল শরীরে গমনাগমন করে। মৃত্যু যেটা হয় সেটা স্থূল শরীরেরই হয়। লিঙ্গ শরীরটা থেকে যায়। যত দিন আত্মজ্ঞান না হচ্ছে তত দিন এই লিঙ্গ শরীরটা থাকবে আর কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনির মাধ্যমে বিভিন্ন স্থূল দেহে ঘুরতে থাকবে। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে এই লিঙ্গ শরীরটা খসে পরে যাবে। আত্মজ্ঞান হওয়া মানে, প্রকৃতির উপর শুদ্ধ আত্মার যে প্রতিবিম্ব পড়ছিল আর যেটার মাধ্যমে সে নিজেকে প্রকৃতির সাথে এক মনে করছিল সেই প্রতিবিম্বটা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবিম্ব পড়া যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন তার বাকি জিনিষগুলো আলাদা হয়ে ছড়িয়ে যাবে। শুদ্ধ আত্মা নিজেকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম মনে করলেই বাকি সব কিছু আপনা থেকেই তাঁর চারিদিকে জমা হয়ে শুদ্ধ আত্মার সাথে জড়িয়ে যায়। কি কি জড়ায়? মন, বুদ্ধি, প্রাণ আর ইন্দ্রিয়। এই মন, বুদ্ধি, প্রাণ আর ইন্দ্রিয় এই চারটের সাথে এসে গেল পঞ্চম প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। এই পাঁচটি দিয়ে নির্মিত হয়ে গেল লিঙ্গদেহ। লিঙ্গদেহ মানে – তার মন, বুদ্ধি আছে, তার প্রাণ আছে আর ইন্দ্রিয় আছে।

এই লিঙ্গদেহ যখন স্থূল দেহ ধারণ করে তখন তার দরকার হয় স্থূল অন্নের। এই স্থূল দেহের মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি ও ঘন ঘন হতে থাকে কিন্তু লিঙ্গদেহের মৃত্যু একেবারে শেষে হয়, যতক্ষণ প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ওইখান থেকে না বেরিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এই লিঙ্গদেহ থাকবে, এই লিঙ্গদেহই আসা যাওয়া করতে থাকে। শেষ অবস্থায়, যখন জ্ঞান প্রায় হয়ে এসেছে তখন সে কারণ শরীরে অবস্থান করে। যাঁরা খুব উচ্চ সাধক তাঁরা অনেক সময় কারণ শরীরে থাকেন। অনেকে আবার কারণ শরীরকে ত্যাগ করতে চান না। কারণ, তিনি যদি কারণ শরীরে থেকে যান তাহলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আস্বাদন করতে পারেন, তাই একটা ক্ষীণ আবরণ রেখে দেন। এই কারণ শরীর যখন নাশ হয়ে যাবে তখন তিনি শুদ্ধ ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। কিন্তু যিনি উচ্চমানের ভক্ত তাঁদের লিঙ্গ শরীরটা নাশ হয়ে যায় শুধু কারণ শরীরটা থাকে, তার মানে শুদ্ধ আত্মার উপর সামান্য একটু অজ্ঞানের আবরণ থেকে যাচ্ছে।

প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন লিঙ্গোপাধিরূপ বৃক্ষ হল এই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের নিজ নিজ কর্মফলের আশ্রয় স্বরূপ। গীতাতেও ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুটো হল বিশিষ্ট ঈশ্বর। ক্ষেত্র মানে এই শরীর, যেখানে কর্মফলাদি ভোগ হয়, ক্ষেত্রজ্ঞ হল জীব, জীব মানে শুদ্ধ আত্মার প্রতিবিম্ব। কিন্তু ঈশ্বর আর ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হওয়ার জন্য তাঁর বাস্তবিক সত্তা বলে কিছু থাকে না। জীব নিজে যত কর্ম করেছ সেই অনুসারে সে এই দেহে সুখ-দুঃখ পায়, আর বৃক্ষের নানান রকম ফলের আস্বাদজনিত ফল ভোগ করে। নিজে সে একাত্ম হয়ে রয়েছে এই মন বুদ্ধির সাথে, এই একাত্মতা তাকে অবিবেকী করে দিয়েছে। অবিবেকী মানে – আমরা সবাই এখান থেকে বেরিয়ে বাস ধরব, ট্রেন ধরব, বাড়ি যাব সেখানে গিয়ে এর সাথে রাগারাগি, ওর সাথে ভালোবাসা, তারপর এই কাজ সেই কাজ

করতে থাকব, একে টাইট দিতে হবে, ওকে তোয়াজ করতে হবে, একে ম্যানেজ করতে হবে, ওকে ঘাড় থেকে নামাতে হবে এত কিছুতে জড়িয়ে থাকা আর এর ফলশ্রুতিতে সুখ-দুঃখ লেগেই আছে, এটাই অবিবেকী।

কিন্তু আমাদের মধ্যে আরেকজন আছেন যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মা। তিনি সাক্ষী রূপে সত্তা মাত্র ভোক্তা আর ভোগ্য দুটোরই প্রেরক। ঈশ্বরই কিন্তু জীবকে ভোগের দিকে প্রেরণা দিচ্ছেন, আর যে ভোগ্য বস্তুকে জীব ভোগ করবে সেটাও ঈশ্বরই জুটিয়ে দিচ্ছেন। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগতের মিলনকে তিনিই সংঘটিত করাচ্ছেন। উপমা দেওয়া হয়, রাজা থাকলে যেমন সবাই ঠিক মত নিজের নিজের কাজ করে ঠিক তেমনি ঈশ্বর আছেন বলে ভোগ্য আর ভোক্তার মিলন হয়। এখানে আমরা যে উপনিষদের কথা শুনছি, ঈশ্বর আছেন বলেই আচার্য বলছেন আর শ্রোতারা শুনছেন, স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। যা আছে সব তাঁরই ইচ্ছাতে হচ্ছে। উপনিষদের ব্যাখ্যা তাহলে কে করছেন? ভগবান করছেন কি? না, আচার্য করছেন, তাঁর কাঁচা আমি বোধটা করছে। আচার্য কি ব্যাখ্যা করছেন? মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা। কিন্তু এই মুণ্ডকোপনিষদের বিষয়ের সাথে আচার্যের মিলন কিভাবে হয়েছে? ঈশ্বরের প্রেরণাতে হয়েছে, ঈশ্বর আছেন বলে হয়েছে। ঈশ্বর যদি না থাকতেন তাহলে দুটো জিনিষ কখন এক অপরের কাছে আসবে না। দুটো জিনিষকে কাছে আসতে একজন প্রেরকের প্রয়োজন। তাই উপমা দিচ্ছেন, রাজা থাকলে যেমন সব কর্মচারীরা নিজের নিজের মত কাজ করে, রাজা কিন্তু কোথাও কোন কাজে যুক্ত নন, তিনি আছেন বলে তাঁর দৃষ্টি মাত্রেই সব কাজ হয়। ঠিক তেমনি ঈশ্বর আছেন বলেই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলেই জীব আর জগৎ, এই দুটোর মধ্যে ভোগ্য আর ভোক্তার সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে। জীব তাই ভোগ করতেই ব্যস্ত, যখন খারাপ কিছু ভোগ করে হয় তখন কাঁদে, যখন ভালো কিছু ভোগ করে তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, এই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না লেগেই আছে। কিন্তু সেই ঈশ্বর এই শরীরের মধ্যে শুদ্ধ অন্তর্যামী রূপে বাস করছেন, আর তাঁরই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য আমি বোধ করছে। প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মনে করছে – আমি আচার্য আমি মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা করছি, আমি সন্ন্যাসী, আমি এখন ক্লান্ত। কিন্তু অন্তর্যামীর এসব কিছুই হচ্ছে না, তিনি আছেন বলেই এত কিছু হচ্ছে। তিনি যদি না থাকতেন তখন এত কিছু হতই না, আচার্যও আসতেন না, শ্রোতারাও থাকতেন না, কেউ কাউকে কিছু ব্যাখ্যাও করত না, জগতের কোন কিছুই থাকত না, সব শেষ হয়ে যেত। তিনি যখন আছেন তখন লিঙ্গ শরীর রূপেই আছেন। অন্তর্যামী, যিনি শুদ্ধ আত্মা, তাঁর উপর যখন অজ্ঞানের আবরণ আসে, সেখান থেকে মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সব জড়িয়ে যাচ্ছে। আসলে এটা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব আর অন্তর্যামী যিনি তিনি শুদ্ধ ঈশ্বর।

এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে সেখানেও ঈশ্বর রয়েছেন আর কোটি কোটি জীব আছে। এই শরীরটাও যেন একটা বৃক্ষ, এর ভেতরে দুটি সত্তা, একটি সত্তা সেই বিশুদ্ধ আত্মা আরেকটি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। যা কিছু সুখ, দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ হচ্ছে এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যেরই হয়। আসল অন্তর্যামী রূপী যে আমি আছি তাঁর না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু, তাঁর মধ্যে কোন কিছুই হয় না। মূল কথা হল ঈশ্বর আছেন আর জীব আছে। জীবেরই যত কষ্ট ভোগ আর সুখ ভোগ, ঈশ্বর কিন্তু নির্বিকার। দ্বৈতবাদীরা দুটোকেই সত্য রূপে দেখে আর অদ্বৈতবাদীরা জীবকে মিথ্যা রূপে দেখে। কিন্তু উভয় পক্ষেই জীবের কষ্টের শেষ নেই।

গীতায় এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হচ্ছে। ক্ষেত্রে যেমন যেমন বীজ বপণ করা হবে তেমন তেমন ফসল উৎপন্ন হয়, এই শরীরও ঠিক তাই। এর আগের আগের জন্মে আমি যেমন যেমন কর্ম করে এসেছি, এই জন্মে যা যা কর্ম করছি তার সব ফসল এই শরীরের উপর দিয়েই কার্যকর হবে। আমার হাতে নগদ টাকাই থাকুক আর তার সম পরিমাণ টাকার একটা চেকই থাকুক তাতে কোন তফাৎ হয় না। কখন তফাৎ হবে? যখন ওই টাকা দিয়ে বা চেকটা ভাঙিয়ে টাকা করে সামগ্রী কিনে নিজের শরীরে লাগাব। কোন ছেলে যদি একটা সুন্দরী সিনেমার নায়িকাকে বিয়ে করে আর সেই সুন্দরী নায়িকা যদি ছেলেটিকে বলে তুমি আমার ধারে কাছে আসবে না, আমার সাথে কথা বলবে না। তাহলে এই সুন্দরীকে বিয়ে করে তার কি লাভ হল? মেয়েটির কাছে যেতে পারবে না, তার সাথে কোন কথা বলতে পারবে না, রান্না করে খাওয়াবে না, এই ধরণের মেয়েকে বিয়ে করে লাভ কি! কর্ম কাজ করে এই শরীরের উপরে। যে জিনিষটা শরীরের উপর দিয়ে যাচ্ছে না সে জিনিষের কোন

দাম নেই। সেইজন্য শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র। ফসল যা হবে সেটা এই শরীরের উপর দিয়েই যাবে। শরীরের মধ্যে যে ফসলের কার্য হচ্ছে না সেই ফসলের কোন দাম নেই। টাকা সঞ্চয় করে কি লাভ? তাতে তো শরীরের উপর কোন ফসল হচ্ছে না। আমি ভাবছি টাকাটা খরচ না করে ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখব, কিন্তু প্রত্যেক বছর এই টাকার মূল্য কমে যেতে থাকে। রাশিয়াতে রুবলের মূল্য তো এক সময় শেষ হয়ে গেল। যে কাগজে রুবল্ ছাপা হয়েছে সেই কাগজের থেকেও রুবলের দাম নীচে নেমে গেল। কত লোকের কত শত শত কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেল। এই যে ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চন, এগুলো তো বাইরের জিনিষ – টাকারও শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই আর কামিনীরও শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ এই কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে দৌড়ে মরছে। তার থেকে দুটো টাকার কিছু খেয়ে নিলে বরং বেশী আনন্দ, সেটুকু অন্তত শরীরে গেল। এই জন্যই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র।

মৃত দেহকে কেউ ভালোবাসে না, আমি মরে গেলে আমার প্রিয়জনরা, যারা আমাকে ভালোবাসে, তারা কতক্ষণে আমার এই দেহটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আমার কত আদর কত যত্ন। মরে যাওয়া মানে? আমার ভেতরে একজন অন্তর্যামী আছেন তিনি এখন আর এই শরীরের মধ্যে নেই। তাহলে কাকে সবাই আদর করছে? আমার শরীরের ভেতরে সেই অন্তর্যামী আছেন বলেই এই শরীরের এত গুরুত্ব, এত আদর যত্ন। এই অন্তর্যামীকেই বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ, এই ক্ষেত্রজ্ঞই ঈশ্বর। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি*, আমিই এই ক্ষেত্রজ্ঞ। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের শরীরে অন্তর্যামী রূপে বাস করছেন। এই অন্তর্যামীরই আরেকটি রূপ জীব। সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মা যিনি আমার শরীরে অন্তর্যামী রূপে বিদ্যমান, তাঁরই প্রতিবিম্ব আমাদের মন বুদ্ধিতে পড়ছে। আমার প্রতিবিম্ব আমার মতই দেখাবে, কুকুরের প্রতিবিম্ব কুকুরের মতই দেখাবে। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁর প্রতিবিম্ব কার মত দেখাবে? চৈতন্যস্বরূপই দেখাবে। আসল তিনি কখন প্রতিবিম্বিত হবেন না, কারণ প্রতিবিম্ব আর আসল কখন এক হয় না।

এই হল দুটি পাখির স্বরূপ। এই দুটি পাখি বাস করে এই শরীরের মধ্যেই। এই শরীরটাই বৃক্ষ, এর শেকড় প্রকৃতিতে, মূলটা উপরের দিকে আর তার শাখা-প্রশাখা গুলো নীচের দিকে বিস্তার করে আছে, যেন একটা উল্টো অশ্বত্থ বৃক্ষ। এই শরীরে দুজন বাস করছেন, এর মধ্যে একজন ভোগ করে যাচ্ছে আর কখন দুঃখ রূপে কখন সুখ রূপে ভোগের ফলটাও পাচ্ছে। অন্য আরেকজন যিনি আছেন তিনি ঈশ্বর, অন্তর্যামী, মায়োপাধিক। এই অন্তর্যামী কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নয়, তিনি কোথাও আসা যাওয়া করেন না। মায়োপাধিক মানে যাঁর উপর মায়ার উপাধি লাগান আছে। তিনি কিন্তু নির্বিকার, সাক্ষী রূপে সব কিছু দেখে যাচ্ছেন। আর জীব কেঁদে ভাসাচ্ছে। আসলে জীব বলে কি কিছু আছে? এটাই সমস্যা, যখন একটি মন্ত্রকে নিয়েই ব্যাখ্যা করা হবে তখন তার ব্যাখ্যা এক রকম হয়ে যাবে। অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা আবার বলেন – আগে জীবাত্মা, জীবাত্মার দর্শন না করা পর্যন্ত তোমার ব্রহ্মজ্ঞান কি করে হবে। এরপর কোন ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে গিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, জীবাত্মার দর্শনই তো আগে, তাহলে *অহং ব্রহ্মাস্মি* কি করে হবে? ব্রহ্মজ্ঞানী এই ধরণের প্রশ্ন শুনলেই বলবেন জীব বলে কিছু আছে নাকি! উপনিষদের এই ধরণের মন্ত্রের জন্য বড় বড় পণ্ডিতদের এই সমস্যাটা হয়। এই মন্ত্রে কি বলছেন, ভেতরে দুজন আছে, জীব আর ঈশ্বর। কিন্তু আসলে তো তা নেই। যাকে জীব বলে মনে হচ্ছে ওটা আসলে প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্বের কোন দামই নেই। জীবটা পুরো মিথ্যা। এই মিথ্যাটাই আস্তে আস্তে পরের মন্ত্রগুলিতে যত এগোবে তত পরিষ্কার হতে থাকবে। সেইজন্য দুম্ করে একটা মন্ত্রকে নিয়ে তার শাব্দিক ব্যাখ্যা করে সেটাকেই সত্য মনে করলে সব গোলমাল হয়ে যায়। এর পরের মন্ত্রেই বলা হচ্ছে –

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।।৩/১/২।।

(জীব সেই একই বৃক্ষে আসক্তবশতঃ দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং তার জন্য দুশ্চিন্তায় সন্তাপ করতে থাকে। যখন সে বহুজন কর্তৃক আরাধিত ও দেহবিলক্ষণ ঈশ্বরকে এবং তাঁর এই মহিমাকে ও নিজের দেহ থেকে অভিন্ন রূপে দর্শন করে তখন বীতশোক হয়।)

একই বৃক্ষে একই রকমের দুটি পাখি বাস করছে। *অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ*, এই জীব রূপী পাখি অনীশার বশীভূত হয়ে, মানে অত্যন্ত দুঃখে তার চোখে সব সময় জল। একটা দিনও আমাদের যায় না, যেদিন আমাদের মনে কোন কষ্ট হয় না। আমাদের বাসে ট্রেনে বসার জায়গা না পেলে মন খারাপ হয়ে যায়, জায়গা পেলেও জানলার ধারে বসতে না পারলে মন খারাপ হবে। এই মন খারাপ করাকে বলে অনীশা। মানুষের জীবনটাই অনীশাপূর্ণ। ঈশ মানে যিনি রাজা, যিনি শাসন করেন, যাঁর বশে সবাই আছে। আর অনীশা মানে, যার বশে কেউ নেই।

সত্যিই কি আমাদের বশে কোন কিছু আছে? বাতাস, রোদ, গরম, বৃষ্টির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বাসে একটা সিট পাবো না, জানলার ধারে সিট পাবো না, ট্রেন আমার ইচ্ছা মত চলছে না, আমাকে ট্রেনের ইচ্ছা মত যেতে হবে। যারা হেঁটে যায় তারা তাও নিজের ইচ্ছা মত যেতে পারবে। এই জীবের কি অবস্থা? একেবারে অনীশাপূর্ণ, দীন স্বভাব, সব সময় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু *জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্*, ক্কচিৎ যদি এই জীব ধ্যানের গভীরে গিয়ে দেখে নেয়, কি দেখে নেয়? *ঈশম্* যখন এই ঈশ কে দেখে তখন সে অবাক হয়ে যায় – আরে আরে আমার ভেতরেই ঈশ, আমি তাঁর সঙ্গে এক! *অস্য মহিমানামিতি*, এই বিশ্ব সংসার তাঁরই মহিমা! আমাদের বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরান সবাই এই ভাবটাকে খুব জোর দিয়ে বলেন। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যিনি এই গাছপালা করেছেন, যিনি জগতের সব কিছুর নিয়ম করে দিয়েছেন, মায়ের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন এর সব কিছুই ঈশ্বরেরই মহিমা। ঈশ্বরকে জানা যাবে না কিন্তু তাঁর মহিমাকে জানা যায়। কিভাবে জানা যায়? এই জগৎটাই তাঁর মহিমা।

আমাদের সবারই সারাটা জীবন ভয়ে ভয়েই কেটে যায়। শৈশবে স্কুলের ভয়, মাস্টারদের ভয়, একটু বড় হতেই পাশ ফেলের ভয়, আরও বড় হয়ে চাকরি পাবো কি পাবো না এই নিয়ে দুশ্চিন্তা, তারপর টাকা রোজগার করলে গুণ্ডার ভয়, পুলিশের ভয়, ইনকাম ট্যাক্সের ভয়। তারপর বিয়ে থা হল, এরপর আরেক ভয়, কোন দিন ডিভোর্স দিয়ে দেবে, কোন দিন ৪৯৮ ধারায় কেস ঠুকে দেবে। সবাই মার খাচ্ছে, মার খেয়ে আবার দৌড়াচ্ছে। তারপর এলো সন্তান। এরপর আবার ভয়, ছেলে ভর্তি হতে পারবে কিনা, ছেলে বড় হয়ে কি হবে, সব সময় টেনশান। এই জগৎ তো গঙ্গা প্রবাহের মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই প্রবাহের মধ্যে আমরা জুড়ে দিয়েছি বলেই আমাদের এত ভয় এত টেনশান। একটা জিনিষ খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার, এই জগতে কেউ কারুর উপর নির্ভরশীল নয়। খুব নামকরা উর্দু শের আছে, *কভি জানকি কসম্ খাতে থে। অব্ জনাজে মে জানে কি কসম্ খাতে হ্যায়।।* তোমার কিছু হলে আমার প্রাণ চলে যাবে এই দিব্যি দিতে, আর আজ বলছ তুমি মরলে আমি তোমার শব যাত্রায় যাব। জগতে যত রকমের জাগতিক সম্পর্ক আছে এর মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছাড়া সব সম্পর্কই স্বার্থের মোড়কে মোড়ানো।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজা আর সমাধি বৈশ্যের কথা আছে। সমাধি বৈশ্যের স্ত্রী তার ছেলের সঙ্গে একজোট হয়ে সমাধিকে বুড়ো বয়সে মেরে সব টাকা-পয়সা কেড়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো নতুন কিছু নয় সমাজে এগুলো চিরদিন সমান ভাবে চলে আসছে। এই সমাধি এক সময় নিজের স্ত্রীকে কত ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। সন্তানকে বুকে লাগিয়ে বড় করেছে। সেই স্ত্রী আর সেই সন্তান কটি টাকার লোভে মেরে বুড়ো লোকটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এর তাৎপর্য হল যারা আজকে আমার আপনার জন্য দিব্যি খাচ্ছে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, তুমি আমার একমাত্র আশা-ভরসা, আগামীকাল সেই কিন্তু আপনাকে পায়ের তলায় পিশে মারার জন্য সুযোগ খুঁজবে। এক মাত্র গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছাড়া সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

জীবন নদী নিজের গতিতে বয়ে চলেছে। আমরা ভেবে আকুল হয়ে আছি যে আমরা তার সাথে জড়িয়ে আছি। এইজন্য বলা হয় জীবনে খুব বড় ধাক্কা না খেলে আমাদের হুঁশ হয় না, একটু হুঁশ না এলে ঈশ্বরে মন যায় না। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেখা যায়, যেসব সাধু সন্ন্যাসীরা প্রথম জীবনে প্রচুর বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করছেন, পরবর্তি কালে এনারা খুব ভালো সাধু হন। অনেক বিঘ্নকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে কিনা, মনটা একেবারে বৈরাগ্যে ভরে গেছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ বলতেন – তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে সব কিছু যদি ভালো চলতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু গোলমাল আছে। যার সবটাই ভালো চলছে, ভালো বাড়ি, টাকা-পয়সাতেও স্বচ্ছল, থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধা নেই, সবাই স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছে, বুঝে নিন এদের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন হবে না। জীবনে যখন প্রতিঘাত আসতে শুরু করে তখন সে ভাবতে শুরু করে কার জন্য আমি কাঁদছিলাম, কার জন্য ভেবে ভেবে আমি ব্যাকুল হচ্ছিলাম, কার জন্য আমি এত কিছু করছিলাম! একজন স্ত্রী নিজের স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। কিছু দিন যাওয়ার পর দেখছে সেই স্বামী এক পরস্ত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেই স্বামী যদি কোন দুর্ঘটনায় মারা যায় তখন কি সেই স্ত্রীর কি এই স্বামীর জন্য কান্না আসবে! কথামৃতে ঠাকুর এই জিনিষগুলোই ছোট্ট ছোট্ট গল্পচ্ছলে বলছেন। এক শিষ্য গুরুকে বলছে ‘আপনি বলছেন বটে সব কিছু ছেড়ে আপনার সঙ্গে চলে যেতে, আমি তো যেতে রাজী কিন্তু আমার স্ত্রী কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে যাবে’। গুরু তখন শিষ্যকে একট বড়ি দিয়ে বলে দিলেন ‘এই বড়িটা খেয়ে তুই মরার মত হয়ে যাবি আর তোর হাত-পা গুলো ট্যারাব্যাকা হয়ে ছড়িয়ে থাকবে’। শিষ্য বড়ি খেয়ে মরার মত শুয়ে পড়েছে। সবাই বুঝেছে এ মরে গেছে। ঘর থেকে মৃত দেহ বার করতে হলে এবার দরজাটা ভাঙতে হবে, কারণ শিষ্যের হাত-পা এমন বেঁকে রয়েছে যে দরজা দিয়ে বার করা যাচ্ছে না। দরজা ভাঙা শুরু হতেই বউ এসে সঙ্গে সঙ্গে বলছে ‘ওগো! তোমরা একি করছ! আমি তো একেই বিধবা হলুম, তারপর এই দরজা ভাঙলে আমি কোত্থেকে সারাব, তার থেকে বরং ওর ঠ্যাঙটা কেটে বার কর’। শিষ্য শুনেই বলছে ‘তবে রে খেপী! আমার ঠ্যাঙ কাটতে বলছিস্’। দুনিয়াটা এই রকমই। আমরা মনে করছি যে আমার জন্য সংসার আটকে যাবে। তা নয়, কারুর জন্য কিছু আটকে থাকে না, সব কিছু নিজের মত চলে। এই বোধদয়টা আমাদের সহজে হয় না। কিন্তু যখন সংসার থেকে প্রচুর আঘাত পাবে, আচ্ছা করে চড়-চাপড় খাবে, আচ্ছা করে মার খাওয়ার পর যখন কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে যাবে তখন তার চেতনা জাগে। চেতনা জাগার পর ধ্যান করতে শুরু করে, মানে মনটা অন্তর্মুখী হয়ে যায়। মন অন্তর্মুখী হওয়ার জন্য জীবনে প্রচুর মার খেতে হবে, মার না খেলে মন অন্তর্মুখী হবে না। অফিসে পাড়াতে খুব সম্মান, বাড়িতে সবাই খুব আদর-যত্ন করে, সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, বুঝে নিন আগামী কয়েক জন্মেও এর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হবে না।

ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে একটা সময় নিজেকে ভাবতে শুরু করে আমি নিজেকে এতাকাল যাবৎ যে জীব ভাবছিলাম কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো তা নয়! আমিই তো সেই সাক্ষাৎ অন্তর্যামী। এই অন্তর্যামীই হলেন বিশুদ্ধ আত্মা। বিশুদ্ধ আত্মা কি ভেতরে একটা ছোট্ট আলোর মত? না, *অস্য মহিমানমিতি*, এই জগৎটা তো আমারই মহিমা, আমার থেকেই তো এই জগৎ বেরিয়েছে। আমিই এই জগতের মালিক, আমিই এর নিয়ন্তা, আমিই ঈশ, আমিই রাজা। তখন তিনি কি সত্যিই সারা জগতের নিয়ন্তা হয়ে যান? হ্যাঁ, সত্যিই নিয়ন্তা হয়ে যান, এটা তাত্ত্বিক কিছু নয়, বাস্তবিক নিয়ন্তা হয়ে যান। বাস্তবিক নিয়ন্তা যদি না হত তাহলে কামারপুকুর গ্রামের এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের শিশু, যাঁর খাওয়াটাও ঠিক মত জুটতো না, আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁরই পূজো হত না! অন্য দিকে প্রতি দিন ব্যাঙের ছাতার মত কত বাবাজীর আবির্ভাব হচ্ছে, কাগজে, টিভিতে কত ঢাকঢোল পেটান হচ্ছে। কিছু দিন পর সবাই হারিয়ে যাচ্ছে, কাউকেই আর সাধারণ মানুষ মনে রাখতে পারছে না। তাঁরা কেউ খারাপ নয়, সবাই ভালো লোক। কিন্তু তাঁরাও হারিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজী বিএ পাশ করার পর দুয়ারে দুয়ারে একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। মাথার উপর মামলা মোকদ্দমা, দিনের পর দিন অভুক্ত। তিনিও মাকে অভুক্ত রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরলেন। একশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সারা জগৎ এখনও তাঁর সামনে মাথা নত করছে। ওই শক্তিটা ভেতরে জেগে যায়। স্বামীজী বলছেন ‘আমার ভেতরে

এমন শক্তি যে জগতকে দুটো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আমি দুমড়ে মুচড়ে দিতে পারি’। বাস্তবিক সেই শক্তি এসে যায়, কিন্তু তাঁরা সেটা করেন না। দরকার হলে ছাড়বেন না, করবেন। শ্রীরামচন্দ্রও তাই, শ্রীকৃষ্ণও তাই, ভগবান বুদ্ধও তাই। সত্যিকারে সেই ক্ষমতা চলে আসে।

দুর্ভাগ্য এটাই যে আমরা মনে করছি এগুলো শুধুমাত্র তত্ত্ব। শুধু তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সত্যিকারের এই শক্তি চলে আসে, এটাই বলছেন *অস্য মহিমানমিতি*, এই পুরো জগৎ আমারই মহিমা, আমারই ঐশ্বর্য। যিশুর জীবনে আমরা দেখি, একটি নষ্টা মেয়ের বিচারের পর রায় দেওয়া হল, মেয়েটিকে সবাই পাথর ছুড়ে মারবে। যিশু এসে বললেন – যে কোন পাপ করেনি সেই প্রথম পাথর ছুড়বে। যিশুর কথা শোনার পর সবাই নিজের হাতের পাথর মাটিতে রেখে চলে গেল। আমরা মনে করতে পারি যিশুর কথাটা যুক্তিযুক্ত বলে সবাই পাথর নামিয়ে রাখল। মোটেই তা নয়, অন্য কেউ বলে দেখুক না, প্রথম পাথরটা তারই মাথায় এসে পড়বে। একবার এক দাঙ্গার সময় কিছু লোক একজনকে জীবন্ত আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারতে যাচ্ছিল। সেই সময় এক সন্ন্যাসী এসে বলছেন ‘একি করছেন আপনারা! ওকে ছেড়ে দিন’। তখন লোকগুলো বলল ‘আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন চলে যান, এরপর একটি কথা বললে আপনাকেও পুড়িয়ে মারা হবে’। কই সন্ন্যাসীর কথাতে তো কোন কাজ হল না। কাজ হওয়ার কথা নয়। যিশুর মধ্যে যে শক্তি জাগ্রত হয়েছিল সেই শক্তি জাগ্রত না হলে কেউ কথা শুনবে না। আমরা এসব ঘটনা গভীরে গিয়ে চিন্তন করতে পারিনা, কিন্তু বাস্তবিক তাই হয়। ঠাকুর বলছেন – যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, ভক্তি করে তাকে সবাই মানে, বড়লোকেরাও মানে। পরে মাস্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলছেন – নিজের স্ত্রী পর্যন্ত।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন *সমানে বৃক্ষে*, একই বৃক্ষে জীব ঈশ্বরের সাথে বাস করছে। কিন্তু সে *নিমগ্নো*, নিমগ্ন মানে একেবারে ডুবে থাকা। কিসের মধ্যে ডুবে থাকা? আচার্য বলছেন, অবিদ্যা, কাম, কর্ম, রাগ-দ্বেষাদিতে। অবিদ্যা হল যিনি পূর্ণ তিনি ভাবতে শুরু করেন আমি অপূর্ণ। এখন কারুর যদি কয়েক কোটি টাকা থাকে সে কি রোজ সকাল হলে ভিড় ট্রেনে বাসে করে ঝুলতে ঝুলতে গলদঘর্ম হয়ে চাকরি করতে যাবে? কেন কষ্ট করছে? তার মধ্যে অপূর্ণতা বোধ হচ্ছে – আমার টাকা নেই। যারই মনে অপূর্ণতা তারই কামনা আসে। কেন কামনা আসে? ওই অপূর্ণতাকে দূর করার জন্য। এই কামনার পুর্তির জন্য তখন তাকে কর্ম করতে হবে। যখনই কর্ম করবে সেই কর্মের একটা ফল হবে। কর্মের ফলে কিছু জিনিষ ভালো হবে কিছু জিনিষ খারাপ হবে। ভালো যেটা হবে সেটাকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করবে, যেটা খারাপ হবে সেটাকে যত তাড়াতাড়ি পারবে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এই অবিদ্যা, কাম ও কর্ম আর তার ফল রাগ আর দ্বেষ, এই পুরো ব্যাপারটা মানুষকে একেবারে ভারাক্রান্ত করে দেয়। কাঁধের উপর যেন কয়েক মন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশাল জাহাজ যদি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তাকে আর জল থেকে বার করে আনার কোন উপায় থাকে না। মানুষ ঠিক এতটাই ভারাক্রান্ত হয়ে এই সংসার সমুদ্রে টাইটেনিক জাহাজের মত নিমজ্জিত হয়ে আছে। এই অবিদ্যা, কামনা-বাসনা, কর্ম আর রাগ ও দ্বেষের ভারে মানুষ ভারাক্রান্ত।

কিভাবে এই সংসার সমুদ্রে ভারাক্রান্ত হয়ে ডুবে আছে? *নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নোহয়মেবাহমমুষ্য*, এই জগতে প্রত্যেকটি মানুষ, বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই, আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা থেকে ভারত পর্যন্ত সবাই একটা ব্যাপারে একেবারে দৃঢ় নিশ্চিৎ যে এটাই সত্য, তা হল আমি হলাম এই দেহ মন। আমিই দেহ মন এই ব্যাপারে কারুর মনে কোন সন্দেহ নেই। এটাকে বলছেন দেহাত্মভাব, আমার দেহই আমার আত্মা, এই ভাবটা সবারই দৃঢ়। যার এই ভাবটা যত দৃঢ় সে তত বেশী ভারাক্রান্ত। যার এই দেহবোধ যত কম তার উপর বোঝা তত কম। ডেকার্ড নামে একজন বড় দার্শনিক তিনি প্রথম শুরু করলেন, আমি আছি সেইজন্য আমি আছি। এই আমিত্ব, আমার অস্তিত্ব আছে এই বোধ প্রত্যেক মানুষের থাকবেই থাকবে। আমি বলতে কোন আমি? এই দেহ মন সম্পর্কিত আমিটা।

এই দেহাত্মবোধ থেকে কি হয় এখানে আচার্য খুব সুন্দর বলছেন *অয়মেবাহমমুষ্য*, আমি এই, আমি অমুক, আমি তমুক ইত্যাদি। আর কি? *পুত্রোহস্য*, আমার বাবার নাম এই, *নপ্তা*, আমি অমুকের নাতি, *কৃশঃ* আমি রোগা, *স্থূলো*, আমি মোটা, আমি গুণবান, আমি গুণহীন, আমি সন্ন্যাসী, আমি সুখী, আমি দুখী। এই যে আমি আমি করছি, কোন আমিটাকে নিয়ে করছি একটু কি আমরা ভেবে দেখছি! এই দেহবোধ, দেহের বাইরে আমি কিছু নয়, এটাই ঘোর চার্বাক দর্শন, যারা বলছে মৃত্যুর পর কিছু থাকে না, চোখ বুজলেই সব শেষ। এদের কি হয়? *নাস্ত্যন্যোহস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ* – যাদেরই এই দেহবোধটাই একমাত্র বোধ এরা জন্মায়, মরে, এদের সংযোগ হয় বিয়োগ হয়। কাদের সঙ্গে? সম্বন্ধিদের সঙ্গে। জন্ম নিলেই একটা বাবা মা চাই, পরিবার চাই, সম্বন্ধি চাই। তার মানে এরা জন্মাবে এদের সঙ্গে সংযোগ হবে, মরবে, মরার জন্য বিয়োগ হবে। বিয়োগ মানে তার বাবা-মা, ঠাকুরমা, ঠাকুর্দারা আগে মরবে। এই বোধটা কাদের থাকে? যাদের শুধু মাত্র দেহবোধ আছে। আমি বলতে এই দেহ, এই বোধটা যাদের একেবারে দৃঢ় তাদের এই দুরবস্থা হতেই থাকে। এদের এই জন্ম নেওয়া আর মরে যাওয়া, সংযোগ হওয়া আর বিয়োগ হওয়া এগুলো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্ম ধরে চলছে। তারই মধ্যে আবার অবিদ্যা, কাম, কর্ম এবং রাগ-দ্বেষাদির গুঁতোগুতি চলছে। এই ভাবে চলতে চলতে তার মধ্যে অনীশা আসে।

কাউকে যদি বার বার বলা হয় তুমি একটা অপদার্থ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না, দেখা যায় যদি তার কিছু সুযোগও আসে তাও সে আর কিছু করতে পারে না। কোন মানুষ বা একটা জাতিকে শেষ করে দেওয়ার ভালো উপায় হল তাকে বলা তুমি অপদার্থ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। ভারতীয়দের পিশে মারার জন্য ইংরেজরা ঠিক এই ঘৃণ্য কৌশলটাই নিয়েছিল। ভারতের উপর বিদেশীদের এত আক্রমণ হয়েছে কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি। মারল ইংরেজরা, দেড়শ বছরের মধ্যে ভারতীয়দের মনে ঢুকিয়ে দিল তোমরা অপদার্থ, তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরাণ্ড ভারতের উপর একটা বই লিখতে ভারতে এসেছিলেন। ফিরে যাওয়ার সময় তাঁকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিতে হল। ভারতের উপর তিনি একটা ছোট্ট বই লিখলেন, A Case for India, তাতে তিনি লিখছেন আমি জীবনে আর ভারত থেকে ফিরে যাব না। ওই বইটা ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে দিল। তিনি দেখাচ্ছেন ইংরেজ ভারতকে লুট করেছে ঠিক আছে, কিন্তু ভারতের নিজস্ব সত্তাকে ইংরেজ অপহরণ করে নিয়েছে। উইল ডুরাণ্ডের অনেক আগেই স্বামীজী ইংরেজদের নামে এই সব কথা বলে গেছেন। ইংরেজরা ভারতীয়দের কি শিক্ষা দিল? তোমার বাবা একটা মুর্খ ছিল, তোমার ঠাকুর্দা একটা বিকৃত ছিল। এখনও, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা এই কথাই বলে যাচ্ছে, হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি সবটাই নাকি ফাক্কা, গাঁজাখুড়ি। কাউকে ছোট করার চেষ্টা করাটা সব সময় আপত্তিজনক কারণ তখন তার ব্যক্তিত্বের প্রসার না করে তাকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তুমি হলে ঈশ, তুমি হলে রাজার রাজা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি এক। কিন্তু তোমাকে অনীশা করে দেওয়া হচ্ছে। কিভাবে অনীশা করছে? অবিদ্যা, কাম, কর্ম, রাগ-দ্বেষ দিয়ে। অনীশায় ভারাক্রান্ত হয়ে এখন তুমি হয়ে গেছ মৃত্যুধর্মা। জন্ম, মৃত্যু আর সংযোগ ও বিয়োগ এই চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছ। জলের মধ্যে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছ। হাবুডুবু আর ঘুরপাক খেতে খেতে এসে যাচ্ছে অনীশা, তোমার মধ্যে যে ঈশার ভাব ছিল, ঈশার যে ক্ষমতাটা ছিল সেটা চাপা পড়ে গেল। এক সময় ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের দাবিয়ে রেখেছিল। পরের দিকে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা শূদ্রদের ওই অবস্থা থেকে বার করে আনার চেষ্টা করে গেছেন, কিন্তু আশানুরূপ সেই রকম কিছু হয়নি। কিন্তু এখন দিনকালের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখন তাদের মধ্যে অনেকে দাঁড়িয়ে গেছে, তারাও দেখিয়ে দিচ্ছে আমার মধ্যেও ক্ষমতা আছে। অপরকে দাবিয়ে রাখার অনুমতি কখনই আমাদের উপনিষদ দেয় না। এখানেই প্রচণ্ড আপত্তি করা হচ্ছে, অনীশা – তোমার আচার-ব্যবহার, তোমার কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু থাকবে না যার ফলে অন্যের মধ্যে অনীশা ভাব এসে যায়। উপনিষদ এই ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি করছে।

অনীশা কি? *ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং*, আমি কোন কাজের যোগ্য নই। যে মানুষের মনে হীনমন্য ভাব এসে যায়, আমি কোন কিছুর যোগ্য নই, তার মানে তাকে কত দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করতে হয়েছে যে তার মনকে একেবারে বিষন্ন করে দিয়েছে। তার মানে, সে বিনাশের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। আমাদের কাজ হল সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাছে টেনে নিয়ে উৎসাহ দিয়ে তার ভেতরের সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে দেওয়া। আত্মহত্যা যারা করে তাদের এটাই হয়, আমি আর কোন কাজে আসতে পারবো না। কিন্তু যাদের এই বোধ থাকে, আমার জীবনে একটা অঘটন হয়েছে, দুঃখ এসেছে ঠিকই কিন্তু এখনও সমাজকে দেওয়ার, অপরের মঙ্গল করার আমার অনেক কিছু আছে। তার থেকেও বড় ভাব হল, আমি তো সেই শুদ্ধ চৈতন্য, আমি কেন মরতে যাব, আমি কি দেহ নাকি যে মরে গেলে বেঁচে যাব। মরে গেলে কি আর হবে, তোমার দেহটাই তো নাশ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার আসল শরীর, সূক্ষ্ম শরীরটা আরেকটা শরীরকে আশ্রয় করে নেবে। শুধু একটা দেহ থেকে আরেকটা দেহে বদলি হল। দেহ পাল্টালে কি তুমি পাল্টাবে? তুমি যা ছিলে তাই থাকবে। তোমার মনে হচ্ছে যে মরে গেলে সব শেষ। কেন মনে করছে? কারণ তুমি মনে করছ তুমি দেহ।

আর কি বলে? *পুত্রো মম বিনষ্টো মৃতা মে ভার্যা* – আমার ছেলে মরে গেছে, আমার স্ত্রী মারা গেছে। ঠাকুর বলছেন – ঠাকুরের এক বাল্যবন্ধু, কামারপুকুরে এক সঙ্গে খেলা করেছেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে দিকে কোথাও থাকতেন। বিয়ে করেছে, পরে তার ছেলেও মারা গেছে। একদিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ঠাকুরকে বলছেন আমার ছেলে মারা যাওয়ার পর আমার স্ত্রী কাঁদছিল, তখন আমি বললাম ওরে খেপী। ওই কথা শুনেই ঠাকুরের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। পরে তিনি অন্যান্য ভক্তদের বলছেন বলে কিনা ওরে খেপী, একেবারে ডাইল্যুট হয়ে গেছে। এগুলো আমরা আলোচনা করছি ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বাস্তবের মধ্যে না পরলে বোঝা যায় না। উপনিষদের এই মন্ত্রগুলো ধারণা না করলে বোঝা যায় না কিভাবে আমরা সবাই নিজেদের বিনাশের দিকে নিয়ে চলেছি।

আমার মধ্যে অবিদ্যা আছে, অবিদ্যা মানে, যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম কোন একটা অজানা কারণে তিনি যেন অবিদ্যাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, সেখান থেকে খেলা শুরু। অবিদ্যা থেকে কামনা-বাসনা, কামনা-বাসনা থেকে কর্ম, কর্ম থেকে রাগ-দ্বেষ। এগুলো থেকে শুরু হয়ে গেল জন্ম-মৃত্যুর চক্র, এর মধ্যে ঘুরপাক খেতেই থাকছে। এবার এই জগতের সব কিছুর সাথে আমাদের এমন দৃঢ় একাত্ম ভাব হয়ে গেছে যে একটা সামান্য কিছু এদিক সেদিক হয়ে গেলে, মানে স্ত্রী মরে গেল, ছেলে মরে গেল, চাকরি চলে গেল বা কিছু একটা হয়ে গেল, জন্মে জন্মে এগুলোই হতে থাকে আর কান্নারও শেষ হয় না। কেঁদে কেঁদে কাহিল হয়ে যাওয়ার পর কি বলে? *ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং*, আমি কোন কিছুর যোগ্য নই, আমার জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল, আমি কেন বেঁচে আছি, আমার মরে যাওয়াই উচিৎ - এই প্রলাপ চলতেই থাকে। আরেক ধরণের অনীশাও আছে। তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ! এইবার দেখ তোমাকে কে বাঁচায়, তোমার জীবনকে আমি কিভাবে নাশ করছি দেখ! বলেই তার মুখে হয়ত এ্যাসিড ছুড়ে দিল বা বুকের মধ্যে ছুরি বসিয়ে দিল।

অনীশা হলে কি বলে? *কিং মে জীবিতেনেত্যেবং দীনভাবোঽনীশা*, আমি বেঁচে থেকে আর কি করব, আমার মরে যাওয়াই উচিৎ, কেন আমার মৃত্যু আসছে না, আত্মহত্যা করে আমি মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসব। যেখানেই কারুর মধ্যে এই অনীশা ভাব দেখা যায় তখন বুঝে নিতে হবে তার মধ্যে দেহাত্মবোধটা মারাত্মক। একটু ভালোবাসা দিয়ে, মিষ্টি কথা বলে যদি তাদের এই দেহাত্মবোধটাকে একটু কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই এই অনীশা ভাবটা অনেকখানি কেটে যাবে। স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে দেখা যায় স্বামীজী বার বার সবাইকে এই সাহস জুগিয়ে গেছেন, তাঁর প্রতিটি বাণীর মধ্যে সেই শক্তি যে শক্তি মানুষের এই অনীশা ভাবকে নাশ করে দেয়। স্বামীজী হলেন সত্যিকারের শক্তির প্রতীক। তুমি নিজেকে দেহ ভাবছ বলেই এত দুঃখ কষ্ট পাচ্ছ, দেহ থেকে বেরিয়ে এস দেখবে মুহূর্তে তোমার সব দুঃখ কষ্ট চলে যাবে। এই যে ভাব, আমি অপদার্থ, আমার অমুক শেষ, আমার অমুকটা হল না, বেঁচে থেকে আমার কি লাভ, এই ভাবকে বলা হয় অনীশা। অনীশার বিপরীত কি? ঈশ, আমিই নিয়ন্তা, আমার মধ্যে অদম্য ক্ষমতা, কোন কিছুতেই আমার কিছু আসে যায় না।

আচার্য আরও বলছেন, এই রকম অবিবেকবশতঃ এবং নানা রকম অনর্থকারী চিন্তাতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার জন্য সব সময় তার মধ্যে সন্তাপ হয়ে চলেছে, মন সব সময় জ্বলছে, পুড়ছে, টেনশানে অস্থির হয়ে উঠছে। যার বিয়ে হচ্ছে না সেও কাঁদছে, যার বিয়ে হয়েছে সেও কাঁদছে। সংসারী সংসারীকে দেখে জ্বলছে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে, সংসারী সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে, সন্ন্যাসী সংসারীকে দেখে জ্বলছে। কোথাও শান্তি নেই, সবাই দুঃখ-যন্ত্রণা পাচ্ছে, আর সবাই তার সামনের লোককে দেখে মনে করে সে আমার থেকে অনেক শান্তিতে আনন্দে আছে। এটাকেই আচার্য বলছেন *অবিবেকবশাৎ*। তুমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, তোমার মধ্যে সেই অনন্ত শক্তি বিদ্যমান, তোমার মধ্যে ঈশ ভাবটাই সত্যিকারের ভাব, পুরো জগতের তুমি সম্রাট, তোমার থেকেই এই জগৎ বেরিয়েছে। তাও তুমি কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে ক্লান্ত হয়ে অনীশা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছ। কেন কাঁদছ? তুমি দেহভাবের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে ফেলেছ।

পুরানের একটা কাহিনী আছে যেটা স্বামীজীও বেশ সুন্দর ভাবে বলছেন। ভগবান বিষ্ণু আর নারদ কোন এক জায়গায় দুজনে বসে আছেন। এই কথা সেই কথার পর হঠাৎ নারদ ভগবান বিষ্ণুর কাছে মায়া জিনিষটা কি দেখতে চাইছেন। ভগবান বিষ্ণু নারদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দিয়ে সহজ ভাবে বলছেন 'নারদ আমার খুব জলতেষ্টা পেয়েছে তুমি পাশের গ্রাম থেকে একটু জল নিয়ে এস'। নারদ ভগবানের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক বাড়িতে এসে জল চাইছেন। জল চাইতেই জলের পাত্র হাতে ঘর থেকে এক পরমা সুন্দরী যুবতী বেরিয়ে এসেছে। ওই সুন্দরী যুবতীকে দেখে নারদের মাথা গেছে ঘুরে। নারদের মাথা থেকে তৃষ্ণার্ত বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু উধাও, আর তার স্থলে যুবতীকে বিয়ে করার প্রবল তৃষ্ণাতে নারদই তৃষ্ণার্ত। শেষ পর্যন্ত বিয়েও হয়ে গেল। সংসার পাতা হল, ঘরবাড়ি হল, চাষবাস সবই চলতে থাকল। তাদের এখন ছেলেপুলে আরও কত কি হয়ে গেছে। একবার প্রবল বন্যা এল। বন্যাতে সব কিছু খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে। নারদ আর কি করবেন, একদিকে নিজের সন্তানদের সামলাচ্ছেন, অন্য দিকে বউকে সামলাচ্ছেন। এই করতে করতে তার এক হাত থেকে ছেলেটা ছিটকে ভেসে গেল, ছেলেকে ধরতে গিয়ে অন্য হাত থেকে ছিটকে গিয়ে বউটাও বন্যার জলে ভেসে গেল। কোন রকমে নারদ ভাসতে ভাসতে একটা ডাঙায় এসে বসে ভাবছে আর হাউ হাউ করে কাঁদছে, হে ভগবান এ আমার কি হল, আমার সব কিছু চলে গেল! হঠাৎ নারদের কানের কাছে ভগবান বিষ্ণুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ও নারদ! জলের কি হল, এখনও জল নিয়ে এলে না! তেষ্টায় তো আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

এটাই মায়া। নারদের তাহলে তখন কি হয়েছিল? দেহাত্মভাব। যিনি ভগবান বিষ্ণুর পরমতম ভক্ত, তাঁর মধ্যে দেহাত্মভাব এসে গিয়েছিল। আমি দেহ যেই বোধ হল, তখন আমি পুরুষ হলে একটা নারীর দেহ চাই, আমি নারী হলে একটা পুরুষ দেহ চাই। এবার মিলন, সেখান থেকে সন্তান এরপর যা হবার, সব এক এক করে এসে যাবে। বাকি যা কিছু আছে সব এই দেহাত্মভাবের সাথে সংযোগ হয়ে আছে। এরপর জন্মও হবে, মৃত্যুও হবে, সংযোগ হবে বিয়োগও হবে। তার সাথে অবিদ্যা, কাম, কর্ম আর এই তিনটের জন্য রাগ-দ্বেষের খেলা সব একসাথে ঘুরঘুর করতে থাকবে।

আচার্য বলছেন *অনীশা তয়া শোচতি সন্তপ্যতে মুহ্যমানঃ*, অনীশাতে সে শোকে মুহ্যমান হয়ে দীনভাবকে প্রাপ্ত করে নেয়। দেহাত্ম ভাবকে অবলম্বন করে শুধু যে নিজের স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি এগুলোর সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছে তাই নয়। আরও খারাপ যেটা হয় তা হল, এই শরীরে যেমন যেমন সে কর্ম করেছে সেই অনুসারে মৃত্যুর পর সে *প্রেততির্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজবংজবীভাবমাপন্নঃ*, প্রেত, তির্যক্, মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম নেয়। যাদের মনের মধ্যে প্রচুর কামনা-বাসনা থাকে তারা কখন ভালো কাজ করতে পারেনা। কামনা-বাসনার জন্য মানুষ এত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায় যে সে নিজেকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না, এদের থেকে কোন ভালো কাজ আশা করাটাই বৃথা। এরা মৃত্যুর পর আর কোথায় যাবে! যেমন যেমন চিন্তা ভাবনা করবে সেই রকম যোনিতে গিয়ে জন্ম নেবে।

একটা কাহিনী আছে, যদিও এগুলো কাহিনী এর সব কিছুকে আক্ষরিক নেওয়াটা ঠিক হবে না, শুধু একটা প্রসঙ্গকে বোঝানর জন্য কাহিনীগুলো বলা হয়। একজন চাষবাস করে খুব কষ্ট করে কিছু ধন সঞ্চয় করেছিল। তার ছেলেগুলো কোনটাই কাজের ছিল না। ছেলেগুলো মানুষ হচ্ছে না বলে তার খুব চিন্তাও ছিল। আমার এই জমিজমা রয়েছে কিন্তু আমি মরে গেলে কে এই জমিজমা দেখাশোনা করবে, কে চাষবাস করবে, এই নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করত। তার গুরু তাকে খুব করে বুঝিয়েছিল যে এসব চিন্তা ছেড়ে নিজের পরকালের কথা ভেবে ঈশ্বরে মন দাও। কিন্তু গুরুর কথা শুনল না, জমিজমা কে চাষবাস করবে এই চিন্তা করতে করতেই একদিন সে মারা গেল। মরে এবার সে নিজের বাড়ির বলদ হয়ে জন্মেছে। এখন সে লাঙল টানে, যতটুকু টানার কথা তার থেকে বেশীই টানে যাতে ফসল ভালো হয়। তার ছেলেরাই তাকে পেটাচ্ছে আর লাঙল টানাচ্ছে। অথচ ওই বলদের মধ্যে তাদেরই বাপের আত্মা বাস করছে। বাপটি মরার সময় কিছু সোনার মোহর জমিয়ে বাড়িতে একটা গর্ত করে পুতে রেখেছিল। এখন বলদ হয়েও তার চিন্তা হচ্ছে এই মোহর গুলি যদি কেউ চুরি করে নেয়। বলদ, কিন্তু মাথার মধ্যে তার মোহর চুরি হয়ে যাবার চিন্তা ঘুরছে। বলদটি মরে এবার সাপ হয়ে জন্মাল। সাপটি এখন বাস্তুসাপ হয়ে ওই মোহরকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। গুরু সব বুঝতে পারছেন যে তার এই শিষ্য বলদ হয়ে জন্মেছে। বলদের পর এবার সর্প হয়ে জন্ম নিয়েছে, এই লোকটির কষ্টের আর শেষ নেই। ইতিমধ্যে সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ছেলেগুলোর অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। সেই সাধুবাবা একদিন এসে ছেলেদের বলছেন 'তোমরা এত কষ্টের মধ্যে কেন আছ, তোমাদের বাড়িতে তো অনেক সম্পদ লুকনো আছে'। ছেলেগুলো তো খুব উৎফুল্ল হয়ে গেছে 'তাই নাকি গুরুদেব! কোথায় আছে'? 'আছে এই বাড়িতেই কিন্তু ওখানে একটা বাস্তুসাপ আছে, ওই মোহর নিতে গেলেই ওই সাপ কিন্তু তোমাদের ছোবল দেবে'। গুরুদেব বলে দিলেন কোথায় আছে। তারপর এরা সিঁড়ি দিয়ে মাটির নীচে নেমে একটা চোরা কুঠুরি দেখতে পেয়েছে। আর ঠিক দেখে যে ওখানে একটা সাপ বসে আছে। এরপর লাঠি দিয়ে সাপটাকে মেরে সব সম্পত্তি নিয়ে নিল। ছেলেরা মিলে যখন সাপটাকে মারছে তখন ওই লোকটার চেতনা হল। এতদিন আমি কি করলাম, এদের জন্য এত কষ্ট করলাম আর শেষে এরাই কিনা আমাকে পিটিয়ে মারছে।

এই প্রেতযোনিতে তারাই জন্ম নেয় যাদের মধ্যে অপূর্ণ বাসনা থাকে, বিশেষ করে যারা আত্মহত্যা করে। মনুষ্যযোনি থেকে তির্যক যোনি, সাপ, বিছের যোনিতে সত্যিই জন্ম নেয়। যারা প্রচুর শুভ কর্ম করে তারা দেবতা যোনিতে যায়। এরমধ্যে সব থেকে খারাপ যেটা হয় – *জবীভাবমাপন্নঃ*, দিনে দিনে যত সময় চলে যেতে থাকবে তত সে লঘুতার ভাব পেতে থাকবে। যদিও ক্রমবিবর্তনবাদে বলে প্রত্যেকটি প্রাণী ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকে, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশীর ভাগ মানুষ আস্তে আস্তে নীচের দিকে যেতে থাকে। সবাই না, বেশীর ভাগ। কেন যায়? আত্মকেন্দ্রিক বলে। তুমি এখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে আছ, তোমার এই দেহ দিয়ে সব বাসনা পূর্ণ হওয়ার নয় তাই তোমার অপূর্ণ বাসনার পুর্তির জন্য তোমাকে আরও নীচ যোনিতে যেতে হবে। সেখান থেকে আরও নীচের যোনিতে, এইভাবে ক্রমাগত নীচের দিকেই যেতে থাকবে। কিন্তু সমাজে তো সবাই খারাপ নয়, ভালো লোকও সমাজে আছে। ধর্মের একটাই কাজ, মানুষকে শুভ কর্মের মধ্যে বেঁধে রাখা। ধর্ম আপনাকে গায়ের জোরে কিছু দান করিয়ে ছাড়বে, আপনাকে গায়ের জোরে তীর্থাদিতে পাঠাবে। ইদানিং বেশীর ভাগ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে চূড়ান্ত ভোগ-বাসনার মধ্যে নিমজ্জমান হয়ে আছে তাই ভারত এখন চরমতম দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এরা মরে কি আর হবে, সব কীট পোকামাকড় হবে। এর মধ্যেও কি কিছু ভালো লোক নেই? আছে, এই যে এখানে যাঁরা ধর্ম কথা শুনতে আসছেন, এনারা তো অনেক উপরে চলে এসেছেন। এর থেকে যারা নীচে তাদের মধ্যেও কেউ হয়ত একটা ভিখারীকে দুটি টাকা দিচ্ছে, মন্দিরে যাচ্ছে, প্রণামী দিচ্ছে যদিও এগুলো খুবই সামান্য কিন্তু কেন করছে? ভালো যোনিতে যাওয়ার জন্য। জন্ম জন্মান্তরে এই রকম একটু একটু শুভ কর্ম করতে করতে এগোচ্ছে। অথচ কেউ যদি চায়, তিন মাস কি ছ মাসের মধ্যে এত শুভ কর্ম করে নিতে পারে যে তার স্বর্গ নিশ্চিত। প্রথম হল কোন বাজে কাজ না করলেই হল, কারুকে হিংসা না করা, কারুর কোন ক্ষতি না করা, কষ্ট না দেওয়া, এগুলো না করলেই

হয়ে গেল, আর তার সঙ্গে কিছু শুভ কর্ম করা, মানে ঠাকুরের নামগুণগান করা, কিছু দান করা এগুলো করলেই স্বর্গ নিশ্চিত। কিন্তু মানুষ করবে না। কেননা সবাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে আছে, আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য তার মধ্যে হিংসার ভাব এসে পড়ে, আমি এর সর্বনাশ করব, ওকে ল্যাং মারব।

তখন কি হয়? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ভাষায় বলছেন *কদাচিদনেকজন্মসু শুদ্ধধর্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ* – অনেক অনেক জন্ম ধরে তার একটু একটু করে পূণ্য কর্ম সঞ্চিত হতে থাকে। এই যে একটু একটু করে জন্ম জন্মান্তর ধরে পূণ্যকর্ম সঞ্চিত হতে থাকছে, তাতে কি হয়? *কেনচিৎ পরমকারুণিকেন*, একজন পরম করুণাবান গুরুর মুখোমুখি হয়ে যায়। সৎ ও করুণাবান গুরু, কারণ কে আমাদের দিকে তাকাতে যাবে, তোমার মাথাব্যাথা নিজের মাথায় নিতে কার বয়ে গেছে! একজনই নিতে পারেন যাঁর মধ্যে প্রচুর করুণার ভাব আছে।

আমাদের ঐতিহ্যে খুব সুন্দর একটা উপমা দেওয়া হয়। বলছেন, কুকুরের শরীরে যখন কোন ক্ষত সৃষ্টি হয় তখন কুকুর সেই ক্ষত স্থানটা জিভ দিয়ে চেটে চেটে ঠিক করে নেয়। কিন্তু কোন কারণে কুকুরের মাথায় যদি ক্ষত হয়ে যায় তখন সেই ক্ষত স্থানটাকে চাটতে পারেনা বলে সারেও না। কিছু দিন পর সেই ক্ষত স্থানে পোকা জন্মায়। পোকা কুট্‌কুট্ করে যখন কামড়াতে তখন অসহ্য যন্ত্রণায় কুকুরটা রোদে গিয়ে বসে। রোদে এসে বসতেই মাছি এসে মাথার ঘায়ে ভনভন করতে থাকে। মাছির জ্বালায় বিরক্ত হয়ে কুকুরটা তখন অন্ধকারে পালিয়ে আসে। অন্ধকারে এলেই ঘায়ের পোকাগুলো মাথায় কুটুস কুটুস করে কামড়াতে শুরু করে। ওই জ্বালাটা সহ্য না করতে পেরে পালিয়ে আবার রোদে চলে আসে। রোদে এলে মাছিগুলো আবার জ্বালাতন করতে শুরু করে। ওখান থেকে পালিয়ে আবার ছায়ায় চলে আসে। এই আলো আর ছায়া, আবার আলো ছায়া করতে করতে কুকুরটা পুরো পাগল হয়ে যায়। এবার নিজেও মরবে অপরকেও মারবে। সংসারী জীবের ঠিক এই দুর্গতি হয়। যত সংসারী জীব আছে সবার মাথায় ঘা। বাড়িতে যখন থাকে তখন সব মাছি গুলো ভন্ ভন্ করতে থাকে, বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র সব মাছি। তখন মাঝে মাঝে বাড়িতে থেকে পালিয়ে কোথাও একটু মন্দিরে বসে, কোথাও বেড়াতে চলে যায়। তখন মাথার ভেতর যে পোকাগুলো আছে সেগুলো এবার কুটুস্ কুটুস্ করতে শুরু করে। একটু কিছু অশান্তি হলেই গৃহী থেকে সন্ন্যাসী সবাই একটু নির্জনে গিয়ে থাকতে চায়। নির্জনে তো থাকবে কিন্তু মাথার পোকাগুলোকে কোথায় রাখবে, সেগুলোও তো সঙ্গে যাবে। কিছু দিন নির্জনে থাকতে না থাকতেই নিজে থেকেই বলতে শুরু করে একা একা থাকা যায় না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে ঝগড়া, মারামারি করবে কিন্তু কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। সারা দিন ঝগড়া চেঁচামেচি করবে আর রাত্রি হলেই বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। এটাই নিয়ম, কারণ একা থাকলে মাথার পোকা কুট্ কুট্ করে কামড়াতে শুরু করবে আর দুজন একসাথে থাকলে মারামারি। তবুও ওই কুকুরের কখন যদি কোন সজ্জন লোক জুটে যায়, সে দেখছে – আরে কুকুরটা বার বার দৌড়াচ্ছে আর পালিয়ে আসছে, নিশ্চয়ই কুকুরটার মাথায় ঘা হয়েছে। তখন কুকুরটাকে গিয়ে জোর করে ধরে মাথায় ওষুধ দিয়ে ঘা টাকে আরাম করে দেয়। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে যাবে কিন্তু তিনি ছাড়বেন না, আর মাথায় যখন ওষুধ লাগাবেন তখন জ্বালার চোটে আরও চেঁচাবে, কিন্তু ছাড়বেন না। এই করে করে কুকুরটার মাথার ঘা সেরে উঠবে।

আচার্য এটাই বলছেন, জন্ম জন্মান্তর ধরে একটু একটু করে যে শুভ কর্ম করেছিল সেই সঞ্চিত পূণ্যের ফলে পরম করুণাময় গুরুর যখন সাক্ষাৎ হয়ে যায় তখন গুরু তাকে ধরে নেন। গুরুর কৃপা না হলে হয় না। এই কথা কোন ভক্তিশাস্ত্র বলছে না, উপনিষদ বলছে। ঐ শুভ কর্ম তাকে কোন ফল দিতে পারছিল না, একটু একটু করে জমছিল। কিছুটা শুভ কর্ম সঞ্চিত হয়ে গেছে, এবার তাকে বেলুড় মঠে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এল। সে হয়তো বেলুড়ে বিবেকানন্দ বিশ্বাবিদ্যালয়ে ভর্তি হল। এইবার সে ঈশ্বরের দিকে অভিমুখী হল।

সেই পরম কারুণিক গুরু তখন তাকে যোগমার্গ দেখিয়ে দেন, কিভাবে তাকে জপ, ধ্যান, তপস্যাদি করতে হবে। যতক্ষণ জপ, ধ্যান, তপস্যাদি শুরু না করছে ততক্ষণ কিন্তু এই সমস্যা থেকে বেরোন যায় না। জপ, ধ্যান, তপস্যা আধ্যাত্মিক জীবনে চলার পথে অত্যাবশ্যক অবলম্বন। সাথে সাথে গুরু কয়েকটি জিনিষ

কিভাবে পালন করবে বলে দেন, যেমন অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, শম, দম ও মনকে সমাহিত করা। ত্যাগ হল একটা মানসিক বৃত্তি। মা যখন নিজের সন্তানকে মারে তখন তাতে কোন হিংসার বৃত্তি থাকে না। কোন প্রাণীকে যে কোন ভাবে যখন কষ্ট দেওয়া হয় সেটাই হিংসা। কাউকে অপমানিত করা হচ্ছে সেটাও হিংসা। সত্য হল যেমনটি হয়েছে ঠিক তেমনটি বলা। যখন কারুকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে তখন এমন কোন ধরণের মজা করতে নেই যাতে সে কোন কষ্ট না পায়। যেমন আমার এক বন্ধু একটা চাকরির আশায় বসে আছে। আমি তাকে মজা করার জন্য বললাম – এই দেখো তোমার চাকরি হয়ে গেছে, এই দেখো তোমার চাকরির চিঠি এসে গেছে। বন্ধু খুব আনন্দে নাচছে, তারপর চিঠিটা খুলে দেখে এপ্রিল ফুলের একটা সাদা কাগজ। আমার বন্ধু, বন্ধুর সাথে মজা করছি কিন্তু সে কষ্ট পাচ্ছে, এটা মিথ্যা। এই ধরণের মজা করতে নেই। মজা এমন করতে হয় যাতে দুজনেই হা হা করে হাসতে পারে। পরিহাসেও যেন কেউ কষ্ট না পায়, আর উপহাস তো কোন মতেই করা উচিৎ নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে ব্রহ্মচর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ঋষিরা ব্রহ্মচর্যের উপর খুব জোর দিতেন। ব্রহ্মচর্য যদি না থাকে কখনই তার ধর্ম সাধন হবে না। সর্বত্যাগী না হলেও কিছু হবে না। উপনিষদে এই ত্যাগের উপর বার বার জোর দিচ্ছে। জগতকেও সামলাব আর ঈশ্বরের দিকেও পা বাড়াব, দুই নৌকায় পা রেখে হবে না। যতটা ত্যাগ ততটা ফল হবে। পূর্ণ ত্যাগে পূর্ণ ফল প্রাপ্তি। আর পূর্ণ ত্যাগ যদি না হয়, যতটুকু ত্যাগ হয়নি ততটুকু বাকি থেকে যাবে। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান যদি না হয় তাহলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খেতেই থাকবে। তুমি যতই উপরে চলে যাও, ব্রহ্মাও হয়ে যেতে পার কিন্তু সেখান থেকেও তোমাকে আবার ফিরে জন্ম নিতে হবে, আগামী জন্মে কি হবে সেটা ভগবানই জানেন। সর্বত্যাগ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পূর্ণজ্ঞানও হবে না। শেষমেশ সর্বত্যাগ হওয়া মানে ঠাকুর যেমন ত্যাগী। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন আমারও তো স্ত্রী আছে, আমারও দুটো বাসন-পত্র আছে, আমারও এখানে প্যালা-প্যাঁচারা এসে খেয়ে যায়, কিন্তু কই আমার তো কোন ধরণের ভাবনা-চিন্তা নেই। তাহলে ঠাকুরের সর্বত্যাগ ছিল কি ছিল না? ছিল, যখন সাধনা করছেন তখন তাঁর কোন হুঁশ নেই, তাঁর যে স্ত্রী আছে, তাঁর এই আছে সেই আছে, এসবের দিকে কোন হুঁশ নেই তাঁর। এই সর্বত্যাগের ভাব যতক্ষণ মনে না আসছে ততক্ষণ কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান হবে না। যতটুকু এদিকে কম থাকবে ততটুকু ওই দিকে কম পড়বে। আর এক কণা যদি কম থাকে তাহলে সে হয়ত ব্রহ্মা পর্যন্ত চলে যাবে কিন্তু সেখান থেকে আবার জন্ম নিতে হবে। আবার ঘুরপাক খেতে খেতে কোন্ জন্মে কোন্ যোনিতে গিয়ে পড়বে, সেখান থেকে আবার কি কর্মফল এসে জুটবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই সব করার পর আসে শম, দম। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে মনকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে সমাহিত চিত্তে ধ্যান করতে শুরু করে।

এখানেই দেখার বিষয়, গুরুর নির্দেশে কত রকম নিয়ম পালন করে কত পর্যায়কে অতিক্রম করে করে এগোতে হচ্ছে। শুরু হচ্ছে সেই সঞ্চিত শুভ কর্ম দিয়ে, জন্ম জন্ম ধরে একটু একটু করে যে শুভ কর্ম করা হয়েছে সেই শুভ কর্ম জমতে জমতে একটা জন্মে এসে সঞ্চিত শুভ কর্মফলে পরম কারুণিক গুরুর দেখা মেলা। তখন গুরু তাকে ধরে টেনে বার করে নিয়ে এসে কি কি করতে হবে বলে দেন। আমাদের পক্ষে গুরুকে ধরা সম্ভব নয়। তিনি টেনে বার করে নিয়ে আসবেন, তারপর ভালোবেসে আমাদের উপদেশ দেবেন। উপদেশ দিয়ে অহিংসা, সত্য, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করে প্রত্যেকটিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। উপনিষদের মহা বাক্য শ্রবণ করিয়ে আমাদের মনকে সমাহিত করবেন। তখন সে ধীরে ধীরে ধ্যানের গভীরে যেতে থাকবে। ধ্যানের গভীরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু হবে না। অহিংসা, সত্য, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য এগুলো হল ধ্যানের প্রস্তুতি। আর শাস্ত্রীয় বাক্যের ধারণা হচ্ছে কিনা বোঝা যাবে তার মন সমাহিত চিত্ত হয়েছে কিনা। চিত্ত যদি সমাহিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে শাস্ত্রীয় বাক্যের ধারণা তার এখনও হয়নি। সব শেষে ধ্যান। যখন ধ্যানের গভীরে যেতে শুরু হবে তখন সে ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সেই ঈশ্বর কি রকম?

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্, আচার্য এর ব্যাখ্যা করে তাঁর ভাষ্যে বলছেন *জুষ্টং সেবিতমনেকৈর্যোগমার্গৈঃ কর্মভিশ্চ*, যাঁরা অনেক যোগমার্গের এবং কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেয়েছেন। এখানে যোগ বলতে জ্ঞানযোগ

আর কর্ম বলতে কর্মযোগ বলা হয়েছে। গীতাতে দুই ধরণের যোগের কথা বলা হয়েছে, একটা হল যিনি অনাসক্ত ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম করছেন আর জ্ঞানযোগ মানে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁদের হয়েছে। এখানে বলছেন যাঁরা নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে আর যোগী যিনি ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমে বা ধ্যানের মাধ্যমে সেই ঈশ্বরের সেবা করছেন, সেবা মানে আরাধনা করেছেন। সেই ঈশ্বরের আরাধনা কি রকম? বৃক্ষরূপ সংসারের যে উপাধি দেওয়া হয়েছে এর সাথে পুরুষের কোন সম্পর্কই নেই অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বরের সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। এখানেই মজার ব্যাপার, এর আগের মন্ত্রে বলেছিলেন এই জগৎটা হল শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম। কিন্তু ঈশ্বরের কথা যখন আসছে তখন পুরো ব্যাপারটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আসলে ঈশ্বর হলেন অধ্যক্ষ, তিনি কিছু করেন না, শুধু সুপারভাইজ করে যাচ্ছেন। বিলক্ষণ মানে, সংসারের যা যা ধর্ম তার কোন ধর্মই ঈশ্বরের উপর প্রযোজ্য হয় না, তিনি নির্বিকার।

আচার্য বলছেন *অশনায়াপিপাসা-শোকমোহজরামৃত্যুতীতমীশং*, তিনি হলেন ঈশ, ভগবান। তাঁর কি বৈশিষ্ট্য? মানুষের যা যা ধর্ম তার কোনটাই তাঁর মধ্যে নেই। মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, ঈশ্বরের কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। মানুষের মধ্যে শোক মোহ আসে, ঈশ্বরের কোন রকম শোক, মোহের লেশ মাত্র নেই। মানুষের জরা, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি, কিন্তু ঈশ্বরের জরা, মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ এই সংসারে যত রকম ধর্ম আছে ঈশ্বর এই সব কিছু ধর্মের পারে। সংসারে মানুষ যা কিছু ভোগ করছে ঈশ্বর সব কিছুর পারে। এখানে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করছি, তিনি সুখ-দুঃখের পারে। এখানে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে তিনি তার পারে। এখানে আমাদের জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধিকে ভোগ করতে হয়, ঈশ্বর এগুলোরও পারে। দ্বন্দ্বাত্মমূলক যা কিছু আছে তিনি তার সব কিছুর পারে। এই ঈশ্বর সংসার ধর্মে পুরোপুরি বিলক্ষণ। সংসারের কোন ধর্মই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ধ্যানের গভীরে এই ঈশকেই দেখে। কি রকম দেখে?

সর্বস্য জগতোহয়মহমস্যাত্মা সর্বস্য সমঃ সর্বভূতস্থো, এই ঈশ্বর যিনি সংসার ধর্ম পুরোপুরি বিলক্ষণ, এটা আমিই – আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণ এক। তবে এই এক তত্ত্বগত ভাবে। ঠাকুর অনেকবার বলছেন, যতক্ষণ আমি বোধটুকু আছে ততক্ষণ আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদা – আমি আর ঈশ্বর এই দ্বৈতবোধ সব সময়ই থাকবে। যখন আমি বোধ চলে যায় তখন ঈশ্বর বোধটাও চলে যায়, তখন থাকেন শুধু ব্রহ্ম। সেইজন্য বেদান্তে গণনা শুরু হয় দুই থেকে। কারণ অদ্বৈত মানে একও নেই শূন্যও নেই, এক দুইয়ের পারে। গোণা যখন শুরু হয় তখন দুই থেকেই শুরু হয়, আমি আর আমার ঈশ্বর। তিনি তখন দেখেন এই যাঁর মহিমা আমিই সেই। হনুমান যদিও এক জায়গায় বলছেন যখন অদ্বৈতভাবে থাকেন তখন দেখেন তিনি আর শ্রীরামচন্দ্র এক। কিন্তু আমরা সাধারণ ভাবে জানি হনুমান হলেন শ্রীরামচন্দ্রের দাস। যাঁর এই বোধ আছে আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস তাঁর কি কখন অনীশা আসতে পারে! কখনই নয়। এটাই পাকা আমি। পাকা আমি মানে জীবের যা যা লক্ষণ তিনি সব লক্ষণ থেকে সরে এসেছেন। কেউ যদি মনে করে আমি ঈশ্বরের পুত্র, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর বন্ধু এই রকম যে কোন একটা ভাবে যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নেওয়া যায়, তার আর কখন অনীশা ভাব আসবে না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা যখন ঈশ্বরের সাথে কোন সম্পর্ক তৈরী করি তখন কাঙালীর মত বলতে থাকি, হে ঠাকুর! আমাকে এই দাও সেই দাও। ঠাকুর বলছেন, এখানকার জন্য দু পয়সার বাতাসা নিয়ে আসবে তার সাথে শত শত কামনা বাসনা জুড়ে নিয়ে আসে। কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে একটা ছোট্ট ডালিতে একটু ফুল, মিষ্টি, একটা ধূপকাঠি নিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, আর ঐটুকু ডালির সাথে কামনার একটা বিরাট লম্বা তালিকা জুড়ে দিয়ে বলবে – মাগো! দেখো এগুলো যেন সব হয়ে যায়। কিন্তু যিনি ধ্যানের গভীরে ওই অবস্থায় চলে যান তিনি দেখেন সমগ্র জগতে যত জীবাত্মা আছে তাদের ভেতরে যে আত্মা আছেন, *সর্বস্য সমঃ সর্বভূতস্থো*, সবার ভেতরে যে সার জিনিষটা আছে, যে চৈতন্য বিরাজমান সেটা আমি নিজে। যোগী এই ভাবে কখন ঈশ্বরকে দেখে না যে, ঈশ্বর আকাশে বসে জগৎকে চালনা করছেন আর তাঁর সাথে আমার শরীরের কোন সম্পর্ক নেই। যোগী নিজেকে দেখেন আমিই সর্বভূতে

বিরাজমান, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে আত্মা বিরাজমান সেটা সাক্ষাৎ আমি নিজে। আমার কোন মায়ার বন্ধন নেই। মায়ার বন্ধনে যে আছে সে কখন নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে দেখবে না।

আমি যাঁর সঙ্গে এক, সেই যে ঈশ্বর, তাঁরই মহিমা হল এই জগদ্রূপ বিভূতি। তখন তিনি দেখেন *মম পরমেশ্বরস্য ইতি*, ঈশ্বরের মহিমা এই জগৎ আর আমিই সেই পরমেশ্বর। আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণ এক, এই হল ভাব। সন্তান রূপে এক কিংবা দাস রূপে এক কিনা তাতে কিছু আসে যায় না, ঈশ্বরের সাথে এক। এই পুরো জগৎ যেটা ঈশ্বরের মহিমা, সেটা আমারই জগৎ, আমারই মহিমা। জগৎ যদি অন্য কারুর মহিমা হত, অন্য কারুর সম্পত্তি হত তাহলে এই জগতকে মনে করতে পারতো না যে আমিই এই জগৎ হয়েছি। জগৎ যদি স্বাধীন হত তাহলেও আমার বোধ আসত না। এই বোধটা আসছে এই কারণে যে এই জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, এর মালিক হলেন সাক্ষাৎ স্বয়ং ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর আছেন সর্বভূতে, সর্ব বস্তুতে আর ধ্যানের গভীরে গিয়ে শেষে দেখছেন আমিই সেই ঈশ্বর। আমিই তাঁর সেই মহিমার মালিক, বাবু আর বাবুর বাগানবাড়ির মত। যিনি বাবু বাগানবাড়িটা তাঁর, যিনি ঈশ্বর সৃষ্টিটা তাঁর।

এর আগে পর্যন্ত তার মধ্যে ছিল অনীশার ভাব। অনীশার ভাবের জন্য সে কি দেখছিল *অয়মমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা কৃশঃ স্থূলো গুণবান্নির্গুণঃ*, আমি এই দেহ, আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের নাতি, আমি রোগা, আমি মোটা, আমি গুণবান বা আমি গুণহীন, আমি দুঃখী আমি সুখী, এই ভাবে সে দেখছিল। সেখান থেকে সে সাধনা করে করে, সাধনা কিন্তু এক দিনেই নিজে থেকে করতে শুরু করছে না, কত জন্ম জন্ম ঘুরতে ঘুরতে কত মার খেয়ে, কত কষ্ট পেয়ে পেয়ে কোন এক সময়ে পরম কারুণিক গুরুর সঙ্গে সংযোগ হয়ে গেল। যেমন ঠাকুরের কথামৃতের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, একটা দুটো কথা কারুর কানে যেতে বা নিজে থেকে পড়েই ভেতর থেকে ঠাকুরকে আরও জানার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, এবার সে মঠের কোন আশ্রমে গিয়ে কোন মহারাজের সাথে আলাপ হল। এই আলাপেও যে কিছু হবে না তা নয়, অবশ্যই কিছু না কিছু হবে। কিন্তু ঠিক ঠিক হবে যখন গুরু নিজে এসে তার ঘাড়টাকে বাঘ যেমন তার শিকারকে ধরে, সেইভাবে ধরবে। তারপর তাকে শিক্ষা দিতে শুরু করবেন, যেগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি। গুরুর নির্দেশকে অবলম্বন করে যখন ধ্যানের গভীরে যেতে থাকে তখন সে বহির্জগৎটা আস্তে আস্তে লীন হয়ে যেতে দেখে আর অন্তর্জগৎটা স্পষ্ট হতে থাকে, এরপর অন্তর্জগৎটাও মুছে যেতে থাকে। বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ বলে যখন কিছুই থাকে না তখন সে দেখে হৃদয়াকাশে সেই দিব্যজ্যোতি ভাসমান। সেই দিব্যজ্যোতিকে দর্শন করে তার মন যখন শান্তরূপ ধারণ করল, চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয়ে সব শান্ত হয়ে গেল, তখন দেখে সেই যে ব্রহ্মজ্যোতি সেই জ্যোতিই ভাসমান সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। তখন দেখে জীব, জগৎ সব তো তাঁরই মহিমা, তাঁর বাইরে কিছু নেই। আর আমি সেই তিনি, আমি সেই পরমেশ্বর।

তাহলে এতক্ষণ আমি কেন কাঁদছিলাম? আমি কাঁদছিলাম কারণ আমার মধ্যে দেহাত্মভাব ছিল, আমি নিজেকে এই দেহ মনে করছিলাম বলেই কষ্ট পাচ্ছিলাম। যে মোটা মেয়ে সে রোগা মেয়েকে দেখে জ্বলছে, যে রোগা মেয়ে সে মোটা মেয়েকে দেখে জ্বলছে। সবাই অপরকে দেখে জ্বলছে। কিন্তু সেইই যখন আবার সাধনা করে ধ্যানের গভীরে যাচ্ছে তখন নিজেকে দেখে অবাক হয়ে ভাবে এতক্ষণ আমি কি করছিলাম! কি রকম বোধ হয়? বিষ্ণু যেমন নারদকে বলছেন 'কি ব্যাপার নারদ আমার জন্য জল আনতে এত দেরী করলে কেন'? নারদ তো এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে গিয়েছিল। কোথায় গেল সেই কান্না? দেখছে এগুলো কিছুই নয়। নারদ আসলে কে? সে হল ভগবান বিষ্ণুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। বলছেন যখনই সে এইভাবে নিজেকে জেনে যায় সে তখন হয়ে যায় শোকরহিত। বাড়ির গিন্নীর গলার নেকলেসটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ ভাবছে চুরি হয়ে গেছে, কেউ ভাবছে হারিয়ে গেছে, কেউ বলছে বাড়িতে কোথাও ভুলে রেখে দিয়েছে এখন মনে করতে পারছে না। নেকলেসের জন্য এখন দৌড়াদৌড়ি, পুলিশে খবর, কান্নাকাটি চলছে। হঠাৎ একজন এসে বলছে 'ওই তো টিভির পাশে রাখা আছে'। এখন সব দৌড়াদৌড়ি, কান্নাকাটি বন্ধ, নেকলেশটাকে নিয়ে একবার গলায় পরছে, একবার চুমু খাচ্ছে। আত্মজ্ঞানে ঠিক তাই হয়। তাঁর আত্মার হল স্বাভাবিক স্থিতি। আত্মার আসল স্বরূপকে সে

ভুলে গেছে, ভুলে গিয়ে চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সাধনা করে যখন ধ্যানের গভীরে গিয়ে আত্মার সাক্ষাৎ করে নিল তখন দেখে আমিই তো সেই। ওই অবস্থায় তার সমস্ত রকম কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

বন্ধ হলে কি হয়? *বীতশোকঃ ভবতি*, সব রকম শোকের পারে চলে যায়। এতক্ষণ অনীশা ছিল, অনীশা মানেই শোকগ্রস্ত। ভগবান বুদ্ধ এটাই বলছেন, *দুঃখম্ দুঃখম্ সর্বং দুঃখম্*, জগতে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। দুঃখ মানেই শোক। যেটাই মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাকে নিয়েই শোক। যাকে ভালোবাসছে, হয় সে ছেড়ে চলে যাবে নয় মরে যাবে, চোখের জল ফেলেই যাচ্ছে। শোকের অন্য দিকে আছে আবার মোহ। ঠাকুরের সাধনাদি হয়ে গেছে, বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথমের দিকে বিয়ের পর শ্রীমা কামারপুকুরে আছেন। শ্রীমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ঠাকুর মজা করছেন। তখনকার দিনে স্বাস্থ্য রক্ষা আর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না, শ্রীমায়ের কয়েকটি ভাই বোন বাচ্চা বয়সেই মারা গিয়েছিল। ঠাকুর বলছেন, কি হবে এই সংসার করে, কি হবে সন্তান উৎপন্ন করে, এই তো দেখো তোমারই কটি ভাই-বোন মরে গেল। ঠাকুর ব্যঙ্গ করে যাচ্ছেন, একবার বললেন, দুবার বললেন। তখন মায়ের বয়স কম, শ্রীমা বলছেন সব কটাই কি মরে যায়! শ্রীমা তো নিজেই বেঁচে আছেন। শুনেই তো ঠাকুর চেঁচিয়ে বলছেন 'ওরে হৃদু! কি বলছে দ্যাখ। এর ভেতরেও এত আছে জানতুম না'। এটাই মোহ। আমি আপনি সবাই দেখছি মানুষ কত কষ্ট পাচ্ছে। লটারীর টিকিট কেটে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, আমি ভাবছি আমি হয়তো লটারীতে টাকা পেয়ে যাব। এটাই হচ্ছে মোহ। যেটাই করতে যাচ্ছে মোহে পরে করতে যাচ্ছে। এই শোক আর মোহই সংসার। মানুষ শোক থেকে পালাতে চায় আর মোহকে পুর্তি করতে চাইছে। আমাদের যত রকমের ক্রিয়া কর্মাদি সব হল এই শোক থেকে বাঁচা আর মোহের পুর্তির জন্য। মানুষ যখন জেনে যায় আমি হলাম সেই শুদ্ধ পরমাত্মা, জগতে যা কিছু হয়েছে সবই আমার থেকেই বেরিয়েছে আর সবই তো আমার নিজের। এরপর সে কিসের জন্য কাঙালীর মত কাজ করতে যাবে।

এর আগে তার কি হচ্ছিল? *সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশা* – অবিদ্যা, কাম, কর্ম, রাগ ও দ্বেষে ভারাক্রান্ত হয়ে সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে ছিল। এখন তার কি হল? এই শোক সাগর থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেল। আসলে মুক্ত সে সব সময়ই ছিল, নিজেকে সে ভেবে নিয়েছিল আমি শোকসাগরে নিমজ্জ হয়ে আছি। মুক্ত হয়ে গেলে সে *কৃতকৃত্য ভবতি*। কৃতকৃত্য এই শব্দটা আমাদের শাস্ত্রে বার বার আসে। মানুষের যখন সব কিছু পাওয়া হয়ে যায়, ভালো কিছু হলেই যেমন আমরা বলি আমি ধন্য ধন্য হয়ে গেলাম, মানুষ যখন নিজে কিছু করে সাফল্য পায় তখন বলে *ধন্যোহম্, কৃতকৃত্যোহহম্*, আমার মত আর কেউ নেই, আমার যেটা করার মত ছিল সেটা আমি করে দিয়েছি, এটাই কৃতকৃত্য। এই ধন্য আর *কৃতকৃত্যোহম্*টা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আসল *কৃতকৃত্যম্* তাকেই বলে যখন কারুর আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, যাঁর বোধ হয়ে গেছে আমি পরেমশ্বরের সঙ্গে এক। এর বাইরে কাউকেই কৃতকৃত্য বলা হয় না। আত্মদর্শন হয়ে গেলে, পরামার্থ সাক্ষাৎকার হয়ে গেলে মানুষ কি রকম হয় যে কথাটা বলা হল, এটাকেই আবার পরের মন্ত্রে ব্যাখ্যা করছেন। সৃষ্টি তো ব্রহ্মা থেকেই হয়েছে। ব্রহ্মা তো ঋষিদেরও জন্ম দিয়েছিলেন। মূলতঃ সব জীব ব্রহ্মা থেকেই জন্ম নিচ্ছে, ব্রহ্মাই সবার পিতা। সেই ব্রহ্মারই সন্তান মানুষ, কিন্তু কিভাবে পতন হতে হতে এমন এমন জঘন্য অবস্থায় পরিণত হচ্ছে যে তাকে প্রেত যোনি থেকে তির্যক যোনিতেও চলে যেতে হচ্ছে। সেই অবস্থা থেকে শুভ কর্ম করে করে আবার উপরে উঠে আসছে। হিন্দু ধর্মের যাঁরা স্মৃতিকার ছিলেন তাঁরা এমন ভাবে আমাদের দৈনন্দীন জীবনকে বেঁধে দিয়েছেন যাতে আমরা সব সময় শুভ কর্মের মধ্যেই নিজেদের ব্যস্ত রাখতে বাধ্য থাকি। এইভাবে শুভ কর্মের দ্বারা যে সঞ্চিত পূণ্য হচ্ছে সেই পূণ্যের জোরে তারা গুরু লাভ করে। গুরু তখন টেনে তাকে ঠিক পথে তুলে দেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, এই একটি বিখ্যাত মন্ত্রের জন্য মুণ্ডকোপনিষদকে সবাই মনে রাখেন। ঋষি বলছেন এই দেহ যেন একটি বৃক্ষ। এই বৃক্ষে সমান ধর্মী দুটি সুন্দর পাখি বাস করে, একজন ঈশ্বর আরেকজন জীব। তার মধ্যে জীবরূপী পাখিটি সংসার ধর্মকে নিজের উপর আরোপ করে সুখ-দুঃখ, ভোগ-বাসনাকে নিয়ে জড়িয়ে আছে। আর যিনি ঈশ্বররূপী পাখি তিনি নির্বিকার। বিভিন্ন ভাষ্যকাররা এমন কি স্বামীজীও এই জীবরূপী পাখিকে সুন্দর ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে একটাই হল –

জগতের সব কিছুর সাথে জীব নিজেকে একাত্ম করে রেখে যতক্ষণ মধুর ফল ভক্ষণ করছে ততক্ষণ বেশ আনন্দে থাকে। কিন্তু মধুর ফল খেতে খেতে কখন সে একটা কটূ ফল খেয়ে নেয় তখন সে আমার একি হল বলে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। তখন সে বর্তমান ডালটা ছেড়ে অন্য ডালে গিয়ে বসে। স্বামীজী আসলে ঋষি কিনা, তাই তিনি নিজের মত করে ব্যাখ্যা করছেন। শুধু এখানেই নয়, বেদ উপনিষদ, গীতাতে যে মন্ত্র আছে তাকে তিনি নিজের মত ব্যাখ্যা করে তাকে নতুন ভাবে পরিবেশন করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল। স্বামীজী এখানে বলছেন, পাখি ডালে বসে যতক্ষণ মধুর ফল খাচ্ছে ততক্ষণ খুব আনন্দ পায়, আর যখন তিক্ত ফল খায় তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওই ডালকে ছেড়ে ওপরের ডালে উড়ে গিয়ে বসে। ওপরের ডালে গিয়ে বসার পর সেখানে নতুন করে মিষ্টি ফল পেয়ে যায়, এখানে আবার কিছু দিন আনন্দে কাটায়। কিছু দিন পর আবার একটা তিক্ত ফলের আস্বাদ করল। আবার সে ওই ডাল ছেড়ে ওপরের ডালে চলে যায়। এইভাবে সে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এরই মাঝে থেকে থেকে সে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে উঁচু ডালে আরেকটা পাখি বসে আছে। তাকেও যেন তার মতই দেখতে, ওরই মত সুন্দর কিন্তু তার কোন দুঃখও নেই আনন্দও নেই, সে নির্বিকার চিত্তে বসে থাকে। এইভাবে ক্রমাগত উঠতে উঠতে সে যখন সব থেকে উপরের ডালে পৌঁছে যাচ্ছে যেখানে সেই পাখিটি বসে আছে, সে তখন দেখে এই পাখিটা সে নিজেই। এতক্ষণ যাবৎ সে কখন তিক্ত কখন মধুর ফল খেয়ে যাচ্ছিল, ততক্ষণ সে ভাবছিল ওপরের পাখি আর আমি দুটো আলাদা পাখি। তিক্ত মধুর, তিক্ত মধুর করে করে যখন সে ওপরের ডালে পৌঁছে গেল, তখন সে দেখে সেই পাখিটা সে নিজে, এটাই তার আসল রূপ, পাখিটাই আর নেই। আধ্যাত্মিক জীবনের এটি একটি বিরাট বৈপরিত্যমূলক বৈশিষ্ট্য। যেটাকে আমি মনে করছি পর, সেটা হলাম আমি নিজে আর যেটা মনে করছি আমি নিজে সেটা যে শুধু পর তা নয়, সেটা আদপেই নেই। এই ব্যাপারটা শুনতে আজব লাগে। কিন্তু এটাই বাস্তব। ঈশ্বরকে আমরা মনে করছি পর, কিন্তু তিনি আমারই স্বরূপ। আমি যে শরীর, মন, বুদ্ধিকে আপন মনে করে বলছি আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এরাই আমার সব থেকে আপন, আসলে বাস্তবে এগুলোর কোন চিহ্নই নেই। এগুলো আমার থেকে আলাদা বা পর নয়, এগুলো আদপেই নেই। এটাই মায়া। মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রকে নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মানুষ সুখ-দুঃখ, শোক-তাপকে কখন অতিক্রম করে? এখন আমি যে সুখ পাচ্ছি, এর থেকে যখন বড় সুখ পাই তখন বর্তমান সুখকে অতিক্রম করে যায়। আর দুঃখকে কখন পার করে? হয় তাকে এর থেকে বেশী দুঃখ পেতে হবে, নয়তো তার এই বোধ আসতে হবে এই দুঃখের সাথে আমার কোন সম্পর্কই নেই। জীব যখন দেখে এই ঈশ্বর আমারই স্বরূপ, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই ঈশ্বরেরই মহিমা, এই সব কিছু তাঁরই সম্পত্তি মানে আমারই সম্পত্তি। তখন সে কি নিয়ে শোক করবে আর কোনটাকে নিয়ে সুখ ভোগ করবে! একশ কোটি টাকার মালিক যদি লটারীতে একশ টাকা পায় তাতে সে কি সুখ অনুভব করবে! আর একশ টাকা যদি চুরিও হয়ে যায় তাতে তার কি আর এমন সন্তাপ হবে। কারুর যদি তিন চারটে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট থাকে আর সে যদি এক লাখ টাকা এই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে তার আরেকটা ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টে জমা দেয় তাতে তার কি কোন দুঃখ হবে যে আমার ওই ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা চলে গেল বলে! আমার বাড়িতে কোন প্রিয়জন মারা গেল, তা তিনি কোথায় গেলেন? এই লোক থেকে সেই লোকে, এও তো এ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার, এতে কি দুঃখ করবে! আমার বাড়িতে একজনের জন্ম হল, তাতে কি আনন্দ করবে, এক লোক থেকে এই লোকে এসেছে। জন্ম বা মৃত্যু যাই হোক এতে দুঃখ করারও কিছু নেই আনন্দ করারও কিছু নেই। আর এটাই বাস্তব। কিন্তু না বোঝার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক আমরা মেনে নিতে পারিনা। এগুলোকে যতক্ষণ যুক্তি দিয়ে, বিচার করে করে ভালো করে না বুঝে নেওয়া হয় আর যোগ সাধন যদি না করা হয়, জোর তপস্যা যদি না করা হয় হাজার বার গীতা উপনিষদ শুনলে আর সব সময় মুখে আওড়ালেও কিন্তু কিছুই ধারণা হবে না। টিয়া পাখি এমনি সময় রাধে রাধে বলে কিন্তু বেড়ালে ধরলে তখন আর রাধে রাধে বেরোয় না, সেই ট্যাঁ ট্যাঁ বেরোয়। সবারই এই করুণ দশা হয়, কারণ যতক্ষণ না উপলব্ধি হচ্ছে ততক্ষণ মুখ দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁই বেরোবে। এই জিনিষটাকেই এবার বিস্তারপূর্বক বলছেন –

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পূণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।৩/১/৩।।

(দর্শনাভিলাষী সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ জগৎকর্তা, ঈশ্বর, পুরুষ, জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান সকল পাপপূণ্য থেকে মুক্ত হয়ে সর্বমালিন্যরহিত হয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।)

পশ্যঃ মানে এখানে দ্রষ্টা, মানে সাধক। যখন সাধক এই সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মারও যিনি উৎপত্তি স্থান, জগৎকর্তা সেই ঈশ্বরকে হৃদয়গুহায় দর্শন করে তখন সেই বিদ্বান্ পাপ আর পূণ্য দুটোকেই ত্যাগ করে নির্মল হয়ে গিয়ে *সাম্যমুপৈতি*, পরম সমতা প্রাপ্ত হন। এই বিষয়গুলোকে ধারণা করা একটু কঠিন মনে হবে। ধর্ম করা মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রথমের দিকে ধর্ম পালনের পেছনে দুটো উদ্দেশ্য থাকে, একটা বাহ্যিক উদ্দেশ্য, আমার পরিবারের সবাই যেন সুস্থ ও সুখে শান্তিতে থাকে, চাকরিতে যেন আমার প্রমোশন হয় ইত্যাদি। বাহ্যিক উদ্দেশ্যটাকে সরিয়ে দিলে থাকে আন্তরিক উদ্দেশ্য। আমি যেন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হই, এটাই আন্তরিক উদ্দেশ্য, আর ধর্মের এটাই মূল উদ্দেশ্য। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে পূণ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ভালোতে, শুভতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর আধ্যাত্মিক হওয়া মানে গুণাতীত হওয়া, সত্ত্বগুণকেও পেরিয়ে ত্রিগুণাতীত হয়ে যাওয়া। যখন মানুষ রজোগুণ, তমোগুণকে অতিক্রম করে যায় তখন আসলে সে পাপকর্ম, অধর্ম, মন্দ এগুলোকে পেরিয়ে এসেছে। যখন সত্ত্বগুণকেও ছেড়ে দিল তখন কিন্তু সব কিছুকেই সে ছেড়ে দিল, তার পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম সব শেষ। তখন কি থাকে? এটাই এখানে বলছেন, সাম্য অবস্থা।

পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম সব শেষ হয়ে গেলে কেন সাম্য অবস্থা হয়? এই প্রশ্নগুলো খুবই সাধারণ, কিন্তু শাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিষ আছে, এই ধরণের প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু ওই সূক্ষ্ম জিনিষ গুলিকে ধরা যাবে না। যেদিন কেউ বুঝে নেবে আত্মজ্ঞান হওয়া মানে পাপ-পূণ্যের পারে যাওয়া, ধর্ম-অধর্মকে অতিক্রম করা সেদিন বুঝবেন যে সে শাস্ত্র অনেকটা বুঝে নিয়েছে। এখানে বলছেন *তদা বিদ্বান্ পূণ্যপাপে বিধূয়*, তিনি পূণ্য-পাপকে পেরিয়ে গেছেন আর *নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি*। জীবনের উদ্দেশ্য হল সাম্য অবস্থা লাভ করা, সাম্য অবস্থা মানে পাপ-পূণ্যকে পেরিয়ে যাওয়া। পাপ-পূণ্যকে পেরিয়ে যাওয়ার আগে তাকে পূণ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যিনি আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চান তাঁকে আগে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে বাবা-মা গুরুজনদের সেবা করবে, মন্দিরে যাবে, জপ-ধ্যান করবে, ঠাকুরের পূজা করবে, পশুপাখিকে খাওয়াবে, দান করবে এইসব করে করে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তারপর আরও এক ধাপ এগিয়ে এই সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে পাপ-পূণ্যকেও যখন পেরিয়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকে বলছেন সাম্য অবস্থা। মানুষ যখন পূণ্য কাজ করে, ঠাকুর পূজা, জপ-ধ্যান, অপরের সেবা এসব করলে মনের মধ্যে একটা প্রসন্ন ভাব আসে, যখন কোন খারাপ কাজ করে তখন মনটা খুঁতখুঁত করে। তার মানে মানুষের মন প্রসন্নতা থেকে খুঁতখঁতানি পর্যন্ত দোদুল্যমান হয়ে থাকে। দোকানের দাড়িপাল্লার মত ওঠানামা করতে থাকে। সুখ পেলে মন আনন্দে ফুলে উঠছে আবার একটু দুঃখ পেলেই চুপসে যাচ্ছে। ধর্ম ও অধর্ম পালন করে তাই হয়, কত দিন পর আজ মন্দিরে যেতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে, অনেক দিন পর আজ অনেক জপ করতে পেরে খুব তৃপ্তি লাগছে। কেন ভালো লাগছে, কেন তৃপ্তি লাগছে? ধর্ম করছে বলে। আমি এখন দেখছি এটা পূণ্য এটা পাপ, এটা ধর্ম এটা অধর্ম। পূণ্য হলে মন আনন্দে ভরে উঠছে, পাপ হলে খারাপ লাগছে, এখানেই তো বৈষম্য হয়ে গেল। এই পাপ-পূণ্য আর ধর্ম-অধর্মকে অতিক্রম যদি করে যায় তখন তার সাম্য অবস্থা হয়ে যাবে। তখন ভালো কাজ করলে আনন্দ হবে না, খারাপ কাজ করে ফেললে মনের মধ্যে কোন খুঁতখুঁতও করবে না।

কথামৃতের বর্ণনানুযায়ী দ্বিতীয় দিন মাস্টারমশায় সন্ধ্যেবেলায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন ঠাকুর খাটে বসে আছেন, ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের ঘরে ঢুকতে মাস্টারমশায় একটু ইতস্তত হয়ে জিজ্ঞেস করছেন 'মহাশয়! আপনি কি এখন সন্ধ্যা আহ্নিক করবেন'? ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্য

অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় ঠাকুর বলছেন 'তেমন কিছু না'। ঠাকুর পাপ-পূণ্যকে পেরিয়ে গেছেন, তাঁর সন্ধ্যাবন্দনা করা না করা কিছুই নয়। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ যদি সন্ধ্যাবন্দনা না করে তার মন খুঁতখুঁত করবে, সন্ধ্যাবন্দনা করে নিলেই তাঁর মন শান্ত হয়ে যাবে। গীতায় এটাকেই ভগবান বলছেন *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে*। পুরো সৃষ্টিকে যদি নাশ করে দেন তাতেও তাঁর কোন পাপ-পূণ্যের বোধ হবে না, আমি এত পাপীদের হত্যা করেছি এই ভেবেও তাঁর আনন্দ হবে না আর আমি এতগুলো ভালো লোককে মেরে দিয়েছি এই ভেবেও তাঁর কোন অনুশোচনা হবে না। এটাই বাস্তব, ঠিক এই রকমটাই হয়। কিন্তু সমস্যা হল এই ধরণের জ্ঞানীরা তিনটে গুণের কোন একটা গুণকে অবলম্বন করে থাকেন। ঠাকুর বলছেন 'মা আমার ভাব পাল্টে দিচ্ছেন'। ঠাকুর এক এক সময় এক এক রকম ভাবে থাকতেন। যখন যে ভাবে থাকছেন তখন তিনি ওই ভাবানুসারে কিছু জিনিষ করেন, কিন্তু করলেও পাপ-পূণ্য বোধ থাকবে না, সুখ-দুঃখ বোধ থাকবে না। একটু যে থাকবে না তা নয়, তবে পোড়া দড়ির আকার মাত্র থাকবে, সেই দড়ি দিয়ে বন্ধনের কাজ হবে না। একদিকে ঠাকুর যেমন বলছেন এখন জন্ম-মৃত্যুর কোনটাই কিছু লাগে না, অন্য দিকে একটা লেবু কাটতে গিয়ে তিনি কাটতে পারছেন না। যখন সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন হচ্ছে তখন দুটোই হচ্ছে, একদিকে যখন ছাগ বলি দিচ্ছে তখন তাতে কিছু লাগছে না, আবার অন্য দিকে একটা লেবু কাটতে গিয়ে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে ভাব পরিবর্তনের খেলা। গীতা উপনিষদে যে রকম বলা হচ্ছে একেবারে যে জিনিষটা এই রকমই হবে সেই ভাবে নিতে নেই। আমাদের কাছে এখন ঠাকুরের জীবন রয়েছে, গীতা উপনিষদে যেটা বলা হয়েছে সেটা আগে দেখতে হবে ঠাকুরের জীবনে কি রকম হয়েছে, এই ব্যাপারে কথামৃতে কি বলা হয়েছে, লীলাপ্রসঙ্গে কি বলছে দেখতে হবে। তখনই পূর্ণাঙ্গ ছবিটা পাওয়া যাবে। উপনিষদ বা গীতার এই ভাবটাও ঠিকই কিন্তু একাঙ্গী, পুরো ছবি এতে পরিষ্কার পাওয়া যাবে না। এখানে পরমহংসের একটা বিশেষ অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রে পরমহংসের এই একটি অবস্থাই ছিল না। এখানে দেখানো হচ্ছে পরমহংস যখন জ্ঞানী রূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঠাকুরের সেই রকম ছিল না। কথামৃতে ঠাকুর অনেক বার বলছেন যিনি পরমহংস তিনি বালকবৎ থাকেন, তখন তিনি বাচ্চাদের মত আচরণ করেন, পরমহংসের ব্যবহার তখন অন্য রকম হয়ে যায়। তাই বলে কি তিনি পাপ-পূণ্যের বন্ধনে পড়বেন? কখনই পড়বেন না। পরমহংস আবার কখন জড়বৎ থাকেন, তখন কোন কিছুই করছেন না, কোন দিকেই তাঁর আর মন নেই। আবার কখন পিশাচবৎ, এই পিশাচবৎ যে ভাব এই ভাবের বর্ণনা আমরা উপনিষদে পাবো না, গীতাতেও পাওয়া যাবে না, লীলাপ্রসঙ্গেই আছে আর তন্ত্র শাস্ত্রে কিছু কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্য ঠাকুরের জীবন আমাদের সামনে পরমহংসের পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরছে। উপনিষদ গীতা তত্ত্বটা ঠিকই দিচ্ছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ছবিটা পাওয়া যাবে না। সেইজন্য মাঝে মাঝে অনেক কিছু গুলিয়ে যায়। যতক্ষণ ঠাকুর, স্বামীজীর জীবনী পড়া না হয় ততক্ষণ এই জিনিষগুলো পরিষ্কার হয় না।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং, *রুক্মবর্ণং* মানে সোনার মত উজ্জ্বল রঙ বা স্বয়ং প্রকাশ, কারণ আত্মা স্বয়ং প্রকাশ কিনা। সাধকের যখন সেই অবিনাশী ঈশ্বরের দর্শন হয় তখন তিনি তাঁকে স্বর্ণালোকিতে আলোকে উদ্ভাসিত দেখেন। এই স্বর্ণালোকের বিবরণ খ্রীশ্চান ঐতিহ্যেও আছে আবার ঈশোবাস্যোপনিষদেও পাওয়া যায়, *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যপিহিতং মুখম্*। যার জন্য ব্রহ্মার আরেকটি নাম হিরণ্যগর্ভ, এনাদের দিব্য আলো যেন সুবর্ণের আলো। স্বর্ণ ধাতু খুব মূল্যবান বলে উপমা দেওয়ার জন্য এখানে বলা হচ্ছে না, সাধক বা দ্রষ্টা ওই রকমই সুবর্ণের আলোর মত দেখেন। যে ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে তাঁকে কয়েকটি বিশেষণ ও গুণ দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে, তিনি *রুক্মবর্ণং* তিনি স্বয়ং প্রকাশ বা সুবর্ণের মত তাঁর দীপ্তিমান প্রকাশ। *কর্তারমীশং*, কর্তারম্, মানে তিনিই ঠিক ঠিক কর্তা, জগৎকর্তা, পুরো জগৎকে তিনিই চালাচ্ছেন।

ঠাকুর আবার আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন ঈশ্বরই কর্তা বাকি সব অকর্তা। তাই বলে আমাদের কখন কি মনে হয় ঈশ্বরই কর্তা? স্বামীকে যখন স্ত্রী গালাগাল দিচ্ছে তখন কি স্বামী মনে করে যে ঈশ্বরই তাকে গালাগাল দিচ্ছেন? স্বামী যখন স্ত্রীকে মারধোর করে তখন স্ত্রী কি মনে করছে ঈশ্বরই তাকে মারছেন? আমি এখন বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি, আমার কি মনে হচ্ছে ঈশ্বরই বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন? মনে হয় না। অথচ

ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, যা কিছু হচ্ছে সব ঈশ্বরই করছেন। ঠাকুর যেটা বলছেন, জিনিষটা একেবারে ঠিক তাই। কারণ আমাদের শরীরের পেছনে যদি চৈতন্য সত্তা না থাকেন তাহলে আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটুকুও নিতে পারবো না। একটা মৃত শরীর আর জীবন্ত শরীরের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় – সেই একই শরীর, একই ইন্দ্রিয় সব একই আছে, কিন্তু মৃত শরীরে কোন কাজ হচ্ছে না, জীবন্ত শরীরে দিব্যি কাজ চলতে থাকে। একটা মাত্র জিনিষের অভাবে এই তারতম্য হচ্ছে। একটার মধ্যে চৈতন্য সত্তা আছেন, আরেকটির মধ্যে চৈতন্য সত্তা নেই। জীবন্ত শরীরে চৈতন্য সত্তা আছেন বলে সব কাজ ঠিক মত চলছে।

তাহলে আসলে কে কাজ করাচ্ছে আমাকে দিয়ে? যে কোন কাজই করি না কেন, যেখানে মনে করছি আমি করছি, যেমন আমি খাচ্ছি, আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আমি দেখছি, এখানে আমি বলে যেটাকে ভাবছি সেই আমি এগুলো করছে না, এগুলো করছেন শুদ্ধ চৈতন্য। সেইজন্য বলছেন ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা। আর আমি ভাবছি, আমি শ্রীযুক্ত অমুক, শ্রীযুক্ত আমিটা কে? আমি হলাম অমুক, আমি এই কোম্পানিতে কাজ করি, আমার এত টাকা মাইনে, আমার এই ঠিকানা, আমি এই পোষাক পরিধান করছি, আমার এই ডিগ্রী, আমিই এইখানে উপনিষদের কথা শুনছি। না, তুমি কিছুই করছ না। তুমি করছ কিন্তু এই তুমি করছ না, অন্য তুমি করছে। সেই তুমিটা কে? শুদ্ধ চৈতন্য। একই তোমার মধ্যে দুজন তুমি আছে – এক শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁকে দেখা যায় না, শোনা যায় না কিন্তু বোঝা যায় ওই তুমিটাই আসল তুমি। আরেক তুমি আছ যার উপর অনেক উপাধি লেগে আছে – তোমার নাম এই, তোমার বাবার নাম এই, তোমার ঠাকুর্দার নাম এই, তুমি এই ঠিকানায় একটা ফ্ল্যাটে থাক, আর তুমি অমুক কোম্পানিতে কাজ কর, এই টাকা মাইনে পাও, অমুক অমুক করে হাজার হাজার উপাধি তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি যখন কিছু করছ তখন তুমি মনে করছ এই উপাধিযুক্ত তুমি করছ। আসলে কিন্তু এই তুমির কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা নেই। সেই শুদ্ধ চৈতন্য আছেন বলেই এত কিছু তুমি করছ বলে মনে হচ্ছে। এই জিনিষটাকেই ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – হাড়ির মধ্যে আলু পটল লাফাচ্ছে বাচ্চারা মনে করে আলু পটলগুলো লাফাচ্ছে। কিন্তু রাঁধুনি জানে আসলে হাড়ির নীচে আগুন আছে বলে আলু পটল লাফাচ্ছে।

তিনি জগৎকর্তা, আর বলছেন *ঈশম্*, তিনি হলেন সব কিছুর নিয়ন্তা। তিনিই মালিক তিনিই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি *পুরুষং*, বেদে পুরুষ মানে ঈশ্বর, ঈশ্বরেরই আরেকটি নাম পুরুষ। আর বলছেন, *ব্রহ্মযোনিম্*। *ব্রহ্মযোনিম্* এর দুটি অর্থ বলছেন – যিনি ব্রহ্ম আর যিনি যোনি, যোনি মানে যেখান থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। ইদানিং কালে যদি এর অনুবাদ করা হয় তাহলে হয়ে যাবে যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। *ব্রহ্মযোনিম্* এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে ব্রহ্মার যোনি, অর্থাৎ যেখান থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। সংস্কৃত ভাষার এই এক সমস্যা, একটি শব্দের পাঁচ রকম অর্থ করা যায় আবার একই জিনিষের জন্য পাঁচটা আলাদা শব্দ। সেই রকম ব্রহ্মযোনি দুটো অর্থ হতে পারে – ব্রহ্ম আর তার যোনি আর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যিনি ব্রহ্মারও যোনি। যিনি শুদ্ধ আত্মা তাঁকে যখন এইভাবে দেখেন, স্বর্ণজ্যোতির মত। কোথায় দেখেন? হৃদয়ের গুহাতে। এই দিব্য স্বর্ণজ্যোতি যদি সাধকের মনের কল্পনা হয় তাহলে কি হবে? অনেকেই বলেন যে তিনি জ্যোতি দর্শন করেছেন, ঠাকুরের ছবি থেকে আলো বেরোতে দেখেন। এগুলো তাহলে কি? এগুলোর সেই রকম পারমার্থিক গুরুত্ব নেই আবার মনের খেয়াল বলাটাও ঠিক হবে না। আমাদের আচার্যরা বলেন এগুলো হল ছোট ছোট লক্ষণ যা দিয়ে বোঝা যায় সে আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে আছে। মানুষ স্বপ্নে তো কত কিছুই দেখে আবার খালি চোখে ভুত প্রেতও দেখছে, সেখানে তিনি দেখছেন ঠাকুরের ছবি থেকে আলো বেরোচ্ছে, এটা খারাপ কিছু নয়। মনটা ভালো চিন্তার জগতে আছে বোঝা যাচ্ছে। স্বপ্নে মানুষ সব কিছুই দেখে, ভালোবাসার স্বপ্ন দেখে, ভয়ের স্বপ্ন দেখে, যাকে শ্রদ্ধা করে তাকেও স্বপ্নে দেখে। সেখানে যদি তার ইষ্টকে স্বপ্নে দেখে, আমরা বলতে পারি এটা স্বপ্ন মাত্র, ঠিকই একদিকে স্বপ্ন মাত্র সেটাও ঠিক। অন্য দিকে এর একটা মূল্য আছে কারণ সৎ পথে আছেন বলেই তিনি এই দিব্য স্বপ্নগুলো দেখছেন। মনের খেয়ালও হতে পারে, কিন্তু খারাপ কিছু নয়।

এখানে যেমন বলছেন *যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং* আর যিনি ঠাকুরের ছবি থেকে আলো বেরোতে দেখছেন এই দুটো দেখার মধ্যে কি তফাৎ? যিনি ঠাকুরের ছবি থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আসতে দেখছেন সেটা তিনি এই স্থূল চোখ দিয়ে দেখছনে, কিন্তু উপনিষদে স্থূল চোখ দিয়ে দেখার বর্ণনা করছে না। সেই সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে *রুক্মবর্ণং* দেখছেন ধ্যানের গভীরে অন্তঃচক্ষু দিয়ে। শ্রীমা বলছেন ঠাকুর আর নরেন ছাড়া এই চর্ম চক্ষু দিয়ে ঈশ্বরকে কে দেখেছে! এই জ্যোতি চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, এটা খুবই যুক্তিযুক্ত আর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর থেকেও আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এর মধ্যে আছে। শুধু জ্যোতি দেখলেই হবে না, এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, যিনি দেখছেন তিনি এটাও স্পষ্ট উপলব্ধি করবেন এই *রুক্মবর্ণং*, অর্থাৎ এই দিব্য স্বর্ণজ্যোতি স্বরূপ যিনি তিনি হলেন *কর্তারম্, ঈশ, পুরুষঃ* আর *ব্রহ্মযোনিম্*। এই চারটে জিনিষ তার সাথে সাথে আসতে হবে। জ্যোতি দর্শনের সাথে এই জ্যোতি সম্পর্কিত জ্ঞান যদি না হয় তাহলে কিন্তু এই জ্যোতি দর্শনের কোন মূল্যই নেই। এই ব্রহ্মজ্যোতি, যিনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, তিনিই সব কিছুর একমাত্র নিয়ন্তা, তিনিই *পুরুষঃ* মানে ঈশ্বর আর *ব্রহ্মযোনিম্* ব্রহ্মাও এই পুরুষের থেকে জন্ম নিয়েছেন।

এইভাবে যখন সে দেখবে তখন কি হবে? *তদা বিদ্বান্ পূণ্যপাপে বিধূয়*। প্রথম হল অন্তর্দৃষ্টি, দ্বিতীয় সেই অন্তর্দৃষ্টির বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের বোধ। যদিও অন্য অর্থে বলা হয়, যোগশাস্ত্রে বলছেন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান। যখন কেউ আমাকে গাধা বলে দিল, তখন এটা একটা শব্দ মাত্র। মন তখন শব্দের একটা অর্থ তৈরী করে গাধা মানে এই রকম কিছু। এরপর জ্ঞান, আমাকে গাধা বলেছে! জ্ঞানের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিচ্ছে। এখানে ঠিক তাই হচ্ছে, প্রথমে শব্দ, শব্দ মানে একটা ভাব, আমি ব্রহ্মজ্যোতি দেখছি বা আমি দিব্য আলো দেখছি। কিন্তু এই দিব্য জ্যোতি বাইরের স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখছে না। নিজের মনকে বছরের পর বছর শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারপর সে ধ্যানের গভীরে গিয়ে সেই দিব্যজ্যোতিকে দর্শন করছে। ওই দর্শনের সাথে কিন্তু তার জ্ঞান উৎপত্তি হতে হবে। আমার ভেতরে যে ব্রহ্মজ্যোতিকে দেখছি ইনিই সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম যিনি কর্তা, নিয়ন্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু চলছে, তিনিই সেই ঈশ্বর আর তাঁর থেকেই ব্রহ্মার জন্ম। তাহলে ব্রহ্মার জন্ম কোথা থেকে? আমার হৃদয় থেকে। তখন সে বলবে *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, আমার ভেতর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*।

মায়ের চারটি সন্তান, মা জানে এই চারজন আমারই সন্তান, আমার থেকেই বেরিয়েছে, আমার সব কিছুই এই চারজনের, চারজনের যা কিছু সবই আমার। কোন সন্তানকে তার বাবা দশটি টাকা দিয়েছে, এরপর কোন মা কি কখন সেই সন্তানের পকেট থেকে টাকা চুরি করতে যাবে, সন্তান স্কুল থেকে অনেক ট্রফি ও প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে, কোন মা কি সেই প্রাইজ দেখে হিংসা বা লোভ করবে আমিও যদি এই রকম একটা প্রাইজ পেতাম? ঠিক তেমনি যিনি দেখে নিয়েছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার থেকেই বেরিয়েছে তখন কোন জিনিষকে দেখে তাঁর আর লোভ হয় না, কোন জিনিষের জন্য তাঁর আর মোহ হয় না। তিনি তো জানেন এগুলো তো আমার থেকেই বেরিয়েছি, এগুলো তো আমারই। সত্যিকারের এই রকমই হয়, এখানে কোন ধরণের কল্পনা নেই। প্রথমে একটা জিনিষ ঘটল, তাতে একটা অনুভূতি তার হল, দ্বিতীয় বলছেন সেই অনুভূতিতে তাঁর জ্ঞান হল। কিসের জ্ঞান? তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, ওই যে দিব্যজ্যোতি দর্শন করছেন সেই জ্যোতির সাথে তিনি নিজেকে একাত্ম অনুভব করেন। তৃতীয় হল তার ফল। ফল কি? *পূণ্যপাপে বিধূয়*, সেই বিদ্বান, বিদ্বান বলতে মানে যাঁর এই জ্ঞান হয়েছে, তিনি পাপপূণ্যের উর্দ্ধে চলে যান। পূণ্য মানে শুভ কাজ করা। শুভ কাজ করা মানে ঈশ্বর নিত্য বাকি সব অনিত্য, নিত্যকে ধরে রাখা মানে পূণ্য করা আর যেটাকে ছেড়ে দিচ্ছি সেটা পাপ বলে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু যিনি দেখছেন সবই ঈশ্বর তখন তিনি কোনটা ধরবেন আর কোনটা ছাড়বেন! তাঁর আর কিসের পাপ-পূণ্য। এরপর কি হয়?

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি, পাপ আর পূণ্য কর্ম না করা আর করা মানে, মানুষ পূণ্য কর্ম করতে চায় আর পাপ কর্মে বিরত থাকতে চায়, ধর্ম করতে চায় আর অধর্ম থেকে দূরে থাকতে চায় – এই একটা থেকে দূরে থাকা আরেকটাকে ধরা এই পুরোটাই কর্ম বন্ধনের ফাঁদ। এই ফাঁদ থেকে সে বেরিয়ে যায়।

নিরঞ্জনঃ, তাঁর মধ্যে আর কোন অঞ্জন থাকে না, অঞ্জন মানে কালিমা। সব কালিমা কলুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গীতায় ভগবান বলছেন – *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন*, ভালো মন্দ যত কর্ম ছিল সবটাতেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। এবার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ছাই হয়ে গেল মানে *নিরঞ্জনঃ* হয়ে গেল। ভালো মন্দ যা কিছু ছিল সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে, কর্মে বন্ধনের আর কোন কিছুই অবশিষ্ট রইল না। ফলে সে ক্লেশরহিত হয়ে গেল, আমাদের যে পাঁচটি ক্লেশ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেল। কোন ধরণের বন্ধন আর তার থাকবে না। তখন কি অবস্থায় সে উপনীত হয়? *সাম্যমুপৈতি*, সাম্য মানে এখানে অদ্বৈত জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞান মানে সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করা। ব্রহ্ম জ্ঞান আর ব্রহ্ম প্রাপ্তি দুটো একই।

এখানে এসে আচার্য খুব সুন্দর একটা বাক্যে স্পষ্ট করে বলছেন – *পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণম্। দ্বৈতবিষয়ানি সাম্যান্যতঃ অর্বাঞ্চ্যেব, অতোঽদ্বয়লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে*। দ্বৈত বিষয়ক সমতা সব সময়ই অদ্বৈত বিষয়ক সাম্য থেকে নিকৃষ্ট। আচার্য এখানে দুটি আলাদা শব্দ ব্যবহার করছেন – সমতা আর সাম্য। দ্বৈতের ক্ষেত্রে আচার্য সমতা শব্দ আর অদ্বৈতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন সাম্য। প্রথম হল দ্বৈত বিষয়ক সমতা আর দ্বিতীয় অদ্বৈত বিষয়ক সাম্য। অদ্বৈত বিষয়ক সাম্য দ্বৈত বিষয়ক সমতা থেকে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ ভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় দ্বৈত বিষয়ক যে কোন অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা অদ্বৈত জ্ঞানের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু আচার্য এই অর্থটাকেই কত সুন্দর ভাবে প্রকাশ করছেন, বলছেন দ্বৈত বিষয়ক সমতা অদ্বৈত বিষয়ক সাম্যের তুলনায় নিকৃষ্ট। শাস্ত্র অধ্যয়ণ করার জন্য যে কত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার হয় এই সব জায়গাতে এসেই টের পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকলে শাস্ত্রের মর্মার্থ চটপট বোঝা যায়। আচার্যে এই একটি বাক্যকে বুঝে নিতে পারলে ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের তফাৎটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, বেদান্তকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে এই একটি বাক্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। ঠাকুর বলছেন আচার্য শঙ্কর অবতার। আচার্যের যে কি ক্ষুরধার বুদ্ধি কল্পনাই করা যায় না! আচার্যের কাছে সবাই শিশু। অবতার কিনা। স্বামীজী যদিও ইংরাজী ভাষায় বলেছেন কিন্তু তিনিও এই একই কথা বলছেন। আচার্য ও স্বামীজী দুজনে একই কথা বলছেন। এখানে একটা গভীর তত্ত্বকে আচার্য নিয়ে আসছেন। আচার্য কিন্তু বলছেন না যে দ্বৈতটা নিকৃষ্ট কিন্তু তুলনা করতে গিয়ে তিনি সব সময় অদ্বৈতকেই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই একটি বাক্য দিয়েই তিনি অদ্বৈতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদ্যতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমার দ্বৈত যদি সত্যও হয় তাহলেও অদ্বৈত থেকে সেটা নিকৃষ্ট সত্য হবে।

সমতা আর সাম্য দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। সাধক যখন তাঁর হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিকে দর্শন করছেন, সেই জ্যোতিই হলেন *কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্*, তখন তাঁর অদ্বৈত বোধ হয়ে যাচ্ছে। অদ্বৈত বোধ হয়ে গেলে তিনি পূণ্যপাপের পারে চলে যাচ্ছেন। পূণ্যপাপের পারে চলে যাওয়ার পর তাঁর কি হচ্ছে? *সাম্যমুপৈতি*, উপনিষদ সমতামুপৈতি বলছে না। আমরা বলতে পারি উপনিষদ ছন্দ মেলাবার জন্য সমতা বলেননি। তা নয়, এখানে সাম্য শব্দটাই প্রধান শব্দ। এই সাম্য শব্দকে যদি মূল শব্দ রূপে না আনা হত তাহলে এটা দ্বৈতবাদে নেমে যেত। যখন দেখছি আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদা তখন সেটাই হয়ে যাচ্ছে দ্বৈত। এই দ্বৈত বোধ থেকে যে অনুভূতি হবে অদ্বৈত বোধের অনুভূতি থেকে সেগুলো অবশ্যই পুরোপুরি আলাদা হবে। দ্বৈতে যাঁর জ্ঞান হয়েছে তিনি জগৎ যে রকম দেখবেন অদ্বৈতে যাঁর জ্ঞান হবে তিনি সে রকম দেখবেন না। দ্বৈত জ্ঞানে সব সময় সমতা দেখবেন, সমতা মানে সব ঈশ্বরের সৃষ্টি। তখন দ্বৈত জ্ঞানী বলবেন আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, তোমরা কারুর সাথে ঝগড়া করবে না। কিন্তু তারপরেই বলবে যারা ঈশ্বরের সন্তান নয় তাদের গলাটা কেটে দাও। দ্বৈতবাদী যত ধর্ম আছে সবাই সমতা নিয়ে আসে, তোমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। তখন সন্তান সন্তানের সাথে মারামারি তো করবেই, এক সন্তান আরেক সন্তান থেকে বেশী ক্ষমতাবান হতেই পারে, এক সন্তান অন্য সন্তান থেকে বেশী পণ্ডিত হবেই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেইজন্য সমতাকে বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে, গায়ের জোরে বেঁধে রাখা হয়। সাম্য অবস্থায় এগুলোর কোনটাই হয় না, সাম্য অবস্থায় *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, আমার

থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। তখন আর ছোট বড় বোধ থাকবে না। মায়ের পাঁচ সন্তান সব সময় মায়ের কাছে সমান থাকবে। সচরাচর আমাদের কিন্তু বলা হয় তোমরা সবাই ঠাকুরের ভক্ত, তোমরা সবাই ঠাকুরের সন্তান। যখন বলছে সবাই ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের সন্তান তখন এই কথা গুলো সব সময় দ্বৈত বোধের সমতা জ্ঞান থেকে বলা হয়। এই সমতা জ্ঞান অদ্বৈতের সাম্য জ্ঞান থেকে অনেক নিকৃষ্ট। সাম্য জ্ঞান মানে এঁরা সাবাই আমারই প্রতিমুর্তি, আমিই সব কিছু হয়েছি বা সবই ব্রহ্ম, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। এখানে এসে আর সমতা থাকছে না, একত্ব হয়ে যাচ্ছে।

দ্বৈত ভাবে সাধনা করলে বা দ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে একটা সমতার ভাব আসে – সব কিছু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে বাঘও আছে আবার সাপও আছে, ব্যাঙও আছে – এই ভেদটুকু থেকে যাবে। এই ভেদটুকু থাকলেই পছন্দ আর অপছন্দের ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবি ভাবেই চলে আসবে। তাই দ্বৈতবাদীরা কখনই পাপ-পূণ্যের পারে যেতে পারবেন না, সত্ত্বগুণে যদিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান কিন্তু ত্রিগুণাতীত হতে পারবেন না। যখন পাপ-পূণ্যকে পার করে গিয়ে সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যায় তখনই ঠিক ঠিক ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হতে পারে। দ্বৈত অবস্থা থেকে কিন্তু যে কারুরই পতন হয়ে যেতে পারে, দ্বৈত বিষয়ক সমতা তাঁকে কখন পাপ-পূণ্যের পারে নিয়ে যেতে পারবে না। পাপ-পূণ্যের বোধ থেকে যাওয়াতে *হত্বাপি সো ইমাঁল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে*, এই বোধ তাঁর কোন দিন আসবে না। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন এটা কিন্তু দ্বৈত জ্ঞান নয়। জ্ঞানী দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, এটা অদ্বৈত জ্ঞান থেকে দেখেছেন। কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি দেখছেন তাঁর ইষ্টই সব কিছু হয়েছেন, এটাও কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞান। দ্বৈত জ্ঞান মানে ঈশ্বর আছেন আর আমরা যা কিছু দেখছি সব ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন মাকালীই সব কিছু হয়েছেন, তখন তিনি অদ্বৈত জ্ঞান থেকেই বলছেন।

আচার্য এটাই বলছেন, দ্বৈত বিষয় থেকে সব সময় সমতা আসে। পাঁচ ভাই মারামারি করছে, এক ভাই মাঝখান থেকে বলছে আমরা তো একই মা-বাপের সন্তান কেন মারামারি করছিস। এরা সবাই ভাই ভাই, কিন্তু একজনের হাত কেটে দরদর করে রক্ত ঝরলে অন্য ভাইদের ব্যাথা লাগবে না। কিন্তু জিহ্বা আর দাঁত এরা সাম্য অবস্থায় আছে। খেতে খেতে জিভে যদি দাঁতের কামড় লাগে তখন দাঁতকে রেগে ভেঙে ফেলা যায় না। জিভটাও আমার দাঁতটাও আমার, এটাই সাম্য ভাব। যে কোন ক্ষেত্রে একত্ব বোধ দ্বৈত বোধ থেকে শ্রেষ্ঠ। একদিক দিয়ে দুটোই সমান, দ্বৈত বিষয়ক যাঁর জ্ঞান হয়েছে তিনি বলবেন কাউকে হিংসা করো না। কেন হিংসা করবে না? কারণ সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টি। যিনি অদ্বৈত জ্ঞানী তিনিও বলবেন হিংসা করো না। কেন হিংসা করবে না? কে কাকে হিংসা করবে, আমিই তো সব কিছু হয়েছি। আরেকটা হল সমতাতে বৈষম্য ভাবটা আসবে, কিন্তু সাম্য বা একত্ব বোধে কখন কোন ধরণের বৈষম্য ভাব আসবেই না। এই কারণে বলা হয় অদ্বৈতের সাম্য সর্ব ক্ষেত্রে দ্বৈতের সমতা থেকে শ্রেষ্ঠ। কোন কারণে যদি লোভ এসে যায়, কোন বাধা এসে যায়, তখন দ্বৈতবাদী বলবে, এতে আর কি আছে, সবই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি, দরকার হয়েছে এখন এটা করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী কক্ষণ এই রকম করবেন না। দ্বৈতবাদীদের মানসিকতার এগুলো খুব সূক্ষ্ম বিষয়, চট্ করে ধরা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই মনোভাবটা কত চালাকি করে যে ধরাও যায় না।

আমরা এতক্ষণ আচার্যের একটি খুব সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর, যেটা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, আলোকপাত করলাম। এগুলো শুধু শুনলে কিছু হয় না, গভীর ভাবে চিন্তা করে করে হৃদয়ঙ্গম করলে একদিন হঠাৎ করে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেটা এক সেটাকে কখন দুই করা যাবে না। যেমন এখানে একটি গ্লাশ আছে, আমি চাইছি এই একটি গ্লাশকে দুটি গ্লাশ করব। আমি চাইলেও কোন দিন একটি গ্লাশকে দুটি গ্লাশ করতে পারবো না। যেদিক থেকে আমি এটাকে কাটি না কেন এটা গ্লাশ আর থাকবে না, গ্লাশটা নষ্ট হয়ে যাবে। অদ্বৈত জ্ঞান তো আর নষ্ট হওয়ার জিনিষ নয়। সাম্য ভাবে একটাকে ছেড়ে আরেকটাকে পছন্দ করা যাবে না। আমার কাছে দুটো গ্লাশ আছে, আমি বলছি দুটো গ্লাশকে আমি সমান সমান ব্যবহার করি, একদিন এই গ্লাশ থেকে জল খাই আরেক দিন অন্য গ্লাশ থেকে খাই। কিন্তু এমনও হতে পারে, কোন দিন আমার মন পাল্টে গেল একটা

বিশেষ গ্লাশেই জল খেতে আমার ভালো লাগতে শুরু হল। এটা হল সমতা। একত্বে ওই একটাই গ্লাশ আছে, আমার মন ওই একটা গ্লাশেই আটকে থাকবে অন্য দিকে যাওয়ার কোন সুযোগই নেই। খুব সাধারণ উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝনর চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বৈত সাধনায় মানুষ পৌঁছায় সমতা জ্ঞানে, আমরা সবাই ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, আমরা সবাই ভাই। কিন্তু যখন সাপ তেড়ে আসে তখন সাপকে মারতে যাবে। যিনি অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁর কোনটাতেই কিছু আসে যায় না, সাপ তিনিই হয়েছেন, তিনি যদি ছোবল মারতে চান তো ছোবল দেবেন। কারণ তিনি পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জীবন-মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেছেন।

এর পরের মন্ত্রে বলছেন যাঁরা ব্রহ্মবিদ্ তাঁদের মধ্যে বরিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম কে। আমাদের পরম্পরাতে পরের দিকে যাঁরা ঋষি মহাত্মারা এসেছিলেন তাঁরা অনুভূতির স্তর অনুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনেক রকম শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন যেমন ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যাদি। যিনি ব্রহ্মের কথা শুনেছেন ব্রহ্মের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করেছেন, তার মানে তিনি ব্রহ্মবিদ্। কিন্তু এতটুকুতে হয় না, আরও এগোতে হবে। গীতার ভাষ্যেও আচার্য বলছেন যাঁরা ঈশ্বরের কথা শুনে এই পথে এসেছেন তাঁরাও জ্ঞানী। কিন্তু সাক্ষাৎ যখন জ্ঞান হয় তখন সেটা আবার সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। এই মন্ত্রে বলছেন যিনি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী তাঁর লক্ষণ কি –

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।।৩/১/৪।।

(যিনি প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, তিনি সর্বভূতরূপে বহুভাবে প্রকাশিত হন। যিনি এই পরমেশ্বরকে জানেন তিনিই বিদ্বান, তিনি আর প্রগল্ভ হন না। তিনি আপনাতে ক্রীড়াশীল, আপনাতেই প্রীতিযুক্ত, ধ্যানবৈরাগ্যাদি ক্রিয়াশীল, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।)

রাজা জনকের একবার জানার ইচ্ছে হল তাঁর সময়ে যত ব্রহ্মবিদ্রা আছে তাঁদের মধ্যে কে বরিষ্ঠ। সভার আয়োজন করে সব ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজা জনক তখন সমস্ত ব্রাহ্মণদের বলে দিলেন আপনারা বিচার করে ঠিক করুন আপনাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্। যিনি শ্রেষ্ঠ ঘোষিত হবেন তাঁকে এই হাজারটি গাভী দেওয়া হবে আর প্রত্যেক গাভীর সাথে দুটি করে সুবর্ণ মুদ্রা দেওয়া হবে। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা সভা আলো করে বসে আছেন, এনাদের মধ্যে কার এমন ঔদ্ধত হবে যে নিজে উঠে বলবেন আমি শ্রেষ্ঠ! মুর্খরাই নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। সেই সভাতে গার্গি, কহোড় ইত্যাদি সব নামকরা ঋষিদের সাথে যাজ্ঞবল্ক্যও ছিলেন। রাজা জনকের ঘোষণার পর অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর যাজ্ঞবল্ক্য দেখছেন কেউই উঠে বলছেন না যে আমি শ্রেষ্ঠ। তখন তিনি নিজের শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন 'বাছারা! কেউই যখন এই গরুগুলো নিতে ইচ্ছে করছেন না তখন এই গরুগুলো আমার আশ্রমেই নিয়ে চল'। যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যদের হুকুম দিতেই সবাই রে রে করে উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন 'আপনি কি নিজেকে ব্রহ্মিবিদ্ বরিষ্ঠ মনে করছেন'? যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন 'আমি ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ কিনা জানিনা, যদি কেউ থাকেন তাঁর চরণে আমার প্রণাম'। 'তাহলে আপনি এই গরুগুলো নিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস করছেন কি করে'? যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন 'আমার আশ্রমের জন্য গরুগুলো দরকার তাই আমি নিয়ে যাচ্ছি'। সবাই তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলছেন 'আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেকে ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ প্রমাণিত না করে এভাবে গরু নিয়ে যাওয়া যাবে না'। যাজ্ঞবল্ক্য তখন বলছেন 'ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন করা শুরু করুন'। এরপর সবাই এক এক করে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন আর যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়ে গেছেন। এই হল বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রারম্ভিক প্রেক্ষাপট।

এখন প্রশ্ন যাঁদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয়েছে তাঁদের মধ্যে বরিষ্ঠ কে? *প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি*, এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন *কিঞ্চ যোহয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ হি এষঃ*

প্রকৃতঃ, আমি আপনি প্রাণী কেন? জীবিত বস্তুকে প্রাণী বলা হচ্ছে তার কারণ তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে, অর্থাৎ যে বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে তাকেই প্রাণী বলা হয়। যখন প্রাণের সঞ্চার বন্ধ হয়ে যাবে তখন আর সে প্রাণী থাকবে না। একটা মরা মানুষকে ভেন্টিলেটর দিয়ে অক্সিজেন দিতে পারি, কিন্তু তাই বলে সে প্রাণী হয়ে যাবে না। কারণ, *যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ*, যিনি সমস্ত প্রাণেরও প্রাণ সেই তিনিই এখন এই শরীর থেকে বেরিয়ে গেছেন বলে এটা মৃত শরীর, এখন ডাক্তারী মতে যত কিছুই করা হোক না কেন সে মৃতই। প্রাণ হল, আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে বাতাসকে ভেতরে টানছি, সেই বাতাসের মধ্যে দিয়ে প্রাণশক্তির ক্রিয়া চলছে। কিন্তু এই প্রাণেরও প্রাণ আছে, যিনি এই প্রাণেরও প্রাণ। আমার আপনার সবার প্রাণ শক্তির তারতম্য হতে পারে, তারতম্য হওয়ার জন্য আমি সুস্থ থাকছি, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, আপনার গায়ের জোর বেশী, আমার শরীরে শক্তি কম। কিন্তু সব প্রাণেরও যিনি প্রাণ তিনি হলেন ভগবান, তিনিই সব কিছুর মধ্যে ভাসমান, *কিঞ্চ যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ*, ঈশ্বরই সব প্রাণেরও প্রাণ, আমাদের সবার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করছেন তিনিই সমস্ত প্রাণেরও প্রাণ। তাঁর বৈশিষ্ট্যটা কি? যিনি ঈশ্বর, যিনি পরমাত্মা, যিনি প্রাণেরও প্রাণ ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সব কিছুতে তিনিই আছেন, তিনিই সব কিছুতে বিভাসিত হয়ে আছেন। সৃষ্টি যদি না থাকে তাহলে ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারবে না। এখন একটু অন্য ভাবে চিন্তা করা যাক, এই পৃথিবীতে সব কিছুর বিনাশ হয়ে গেছে, একমাত্র আমিই একা জীবিত থেকে গেছি। কোথাও কিছু নেই, সব কিছু লয় হয়ে গেছে, পৃথিবীটা সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বংস হয়ে গেছে, কোথাও কিছু নেই, এমনকি কোন তারা নেই, নক্ষত্র নেই, চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, কিছুই নেই। কিন্তু কোন ভাবে আমিই একা বেঁচে আছি আর কোন রকমে গ্রহ নক্ষেত্রের মত আকাশে ভেসে চলেছি। এই অবস্থায় ভেসে চলতে থাকলে আমি কি কার্য দেখে বুঝব যে ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের মহিমা কোথায় প্রকাশিত হবে? যে বাবুর বাগান নেই সেই বাবু কিসের বাবু। যে ঈশ্বর ভাসমান নন সেই ঈশ্বর কিসের ঈশ্বর। তিনি যে ভাসমান, ঈশ্বর যে আছেন এটা কোথা থেকে বোঝা যায়? ঠাকুর এই কথাগুলো বার বার বলছেন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিতে তিনি মানুষ, পশু, পাখি, উদ্ভিদ করেছেন, সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা দিয়েছেন। এইটাই ঈশ্বরের মহিমা।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি, তিনি দেদীপ্যমান রূপে ভাসমান। বিভাতি মানে ভাসমান, ভাসমান রূপে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। ঈশ্বরকে খুঁজতে গেলে কোথায় খুঁজতে হবে? মানুষের মধ্যে খুঁজতে হবে, কারণ মানুষ হল শ্রেষ্ঠতম প্রাণী। আবার মানুষের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে বেশী বিভাসিত, ঈশ্বর তাঁর মধ্যে বেশী ভাসমান। সেই রকম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি বেশী ভাসমান। তাহলে এই বোতলের মধ্যে কি ভাসমান? বোতলেও ঈশ্বরই ভাসমান কিন্তু সেই জ্যোতির প্রকাশটা কম। সব জায়গাতে তিনিই ভাসমান, আর এই সৃষ্টি দিয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বোঝা যায়। সৃষ্টি যিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি আর ঈশ্বরকে বুঝতে পারবেন না। সমস্ত জীবের মধ্যে যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, সেই প্রাণেরও প্রাণ তিনি। দুষ্ট নারায়াণ তাঁরই একটা রূপ আবার শিষ্ট নারায়াণও তাঁরই রূপ। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র সব তাঁরই রূপ। তবে কি, আমি এখনও সেই অবস্থায় যায়নি যে সব কিছুতে ঈশ্বরের রূপকে প্রত্যক্ষ করব, তাই ঠাকুর বলছেন, দুষ্ট নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। যেমন সিংহ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী, সব কিছুতে সেই ব্রহ্মকে দেখছেন তাঁর কাছে সবই সমান। গীতাতে ভগবান এটাকেই বলছেন *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*, সব কিছুতে তিনি সেই এককে দেখছেন তাঁর কাছে সব সমান। আমার এখন আত্মজ্ঞান হয়নি কিন্তু আমি তত্ত্বতঃ জানি ওই বাঘের মধ্যেও সেই নারায়ণই আছেন, সর্প সেও নারায়ণরই একটি রূপ। কিন্তু এখনও আমার কাছে এটা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়নি। এই একত্বকে প্রত্যক্ষ দেখার জন্য আমার সব থেকে মূল্যবান বস্তু হল এই নিকটতম মানব জীবন। এই মানব জীবন যদি চলে যায় তাহলে একটা বিরাট সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই মানব জীবনকে, আমাদের শরীর, মনকে রক্ষা করতে হবে।

বিজানন্ বিদ্বান্, ব্রহ্মজ্ঞানী জানেন এই সব কিছু আমারই প্রকাশ, তিনি আর ব্রহ্ম এক হয়ে গেছেন কিনা। এখন কোন সন্ত্রাসবাদী একে-৪৭ নিয়ে যদি নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করে তখন কি আমরা বলতে

পারব এই সন্ত্রাসবাদী আমারই প্রকাশ? পারবো না, কারণ আমার মধ্যে এখন সেই একত্ব ভাব আসেনি, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী তখনও বলবেন এও আমারই প্রকাশ। এটাই সত্য, ব্রহ্মজ্ঞানী সত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে আছেন। *বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতি নাতিবাদী*, বলছেন যিনি পরিষ্কার দেখে নিয়েছেন তাঁর কথা তুমি এখন বাদ দাও, যে চিন্তন, মনন করে শুধু মাত্র বুঝেও নিয়েছে যে জিনিষটা এই রকমই, ঈশ্বর দর্শনের কথা এখানে ছেড়ে দাও, যে এতটুকু বুঝে নিয়েছে সব কিছু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি তখন তাঁর কি হয়? *নাতিবাদী*, সে আর বেশী কথার কচকচানি করতে যাবে না। *নাতবাদী* মানে *ন অতিবাদী*, সে আর অতিবাদী থাকে না। অতিবাদী বলতে বোঝায় যে বেশী বক্ বক্ করে সবাইকে দাবিয়ে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করতে চায়। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে জয়ী হওয়ার ইচ্ছেটা খুব প্রবল থাকে, আমি জয়ী হতে চাই, আমাকে সবাই মানুক, জানুক। এখানে এটাই বলছেন যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কথা ছেড়ে দাও, যিনি শুধু তত্ত্বতঃ এটুকু বুঝে গেছেন ঈশ্বর এই রকম বা যিনি ঈশ্বরের একটু আভাস পাওয়ার মাত্র চেষ্টা করে বুঝে নিয়েছেন তিনি প্রাণেরও প্রাণ, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিনি বিভাসিত, মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশত্মক শক্তি বেশী, তাঁরই জীবন পাল্টে যায়। কিভাবে পাল্টায়? প্রথম বলছেন *ন অতিবাদী*, বেশী বকর্ বকর্ করবে না। বকর্ বকর্ কখন মানুষ করে? আমি তোমার থেকে বেশী জানি বুঝি, এটাকে জাহির করতে।

রিডার্স ডাইজেস্টে একটা মজার জোক্ বেরিয়েছিল। একজন বিজ্ঞাপন দিয়েছে আমি আমার কিছু বই বিক্রী করতে চাইছি, এর মধ্যে নতুন এনসাইক্লোপেডিয়া, অনেকগুলো অভিধান, আরও অনেক বই আছে যা আমি খুব কম দামে বিক্রী করে দিতে চাই। ভদ্রলোকের ঘর বোঝাই সব বই আর সবই প্রায় নতুন। বিজ্ঞাপনের নীচে ছোট্ট করে লিখছেন – Reason : Newly married. Wife says she knows everything। এগুলো নতুন কিছু নয়, আমরা সবাই মনে করি আমি সবজান্তা। এই সবজান্তার ক্ষমতাটা দেখাতে হবে। কোথায় দেখাবে? নিজের বন্ধু, নিজের স্বামী বা স্ত্রী, নিজের সন্তান, নিজের সহকর্মিদের। আমি মনে করছি আমার মধ্যে এই ক্ষমতার লোভটা নেই, কিন্তু আছে, থাকতে বাধ্য। অতিবাদী মানে আমি তোমার থেকে বেশী জানি। হেন বিষয় নেই যে, যে জিনিষটার উপর মন্তব্য করবে না। এখানে বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীদের কথা বাদ দিন, শুধু মাত্র কথাবার্তা শুনে, শাস্ত্র পড়ে ব্রহ্মজ্ঞান জিনিষটা কি এটাকে তত্ত্বতঃ বুঝে নিয়েছে তারাও চুপ মেরে যায়। আমরা কথাবার্তা বেশী না বললেও আমাদের মনের মধ্যে কত রকম ভাবে প্রতিক্রিয়া হয়ে চলেছে, রাস্থায় দিয়ে যাচ্ছি কারুর অভদ্র আচরণ দেখে মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করছে, আমি যেটা চাওয়ার সেটা পাচ্ছি না তার জন্য একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, প্রতি মুহুর্তে এই প্রতিক্রিয়া হয়েই চলেছে, আর বকর্ বকর্ তো চলছে। আচার্য বলছেন অর্থজ্ঞান মাত্র, অর্থের জ্ঞানটুকুও যদি হয়ে যায় তাতেই সে চুপ মেরে যায়। আমাদের আচার্যরাও আমাদের বুঝিয়ে গেছেন এই অদ্বৈত জ্ঞানকে যদি বিচার করেও ঠিক ঠিক ধারণা করে নেওয়ার পর তোমার জীবনকে যদি সেইভাবে পরিচালিত কর তাহলে তুমিও কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী। এরপর একটা ধাপ বাকি থেকে যায় সেটা হল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। সেটা যখন হওয়ার তখন হবে। যিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে নিয়েছেন তাঁর সাথে তোমার এটুকুই তফাৎ তাঁর কখন বেতালা পা পড়বে না, তোমার পড়লেও পড়তে পারে। কিন্তু যিনি চিন্তন করে করে জিনিষটাকে বুঝে নেওয়ার অবস্থায় চলে গেছেন তিনি এখনও জ্ঞানী কিন্তু যিনি প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন তিনি বিজ্ঞানী। কিন্তু পতন যেটা হওয়ার সেটা কবে কখন এক আধবার হবে আর বাকি সময়টা এই অর্থজ্ঞান মাত্র যদি থাকে তাহলেও তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। প্রথম পরিবর্তন হবে *ন অতিবাদী*, বেশী কথা বলে নিজেকে আর জাহির করবেন না।

মানুষ আসলে কাকে জয় করতে চায়, যাকে ভাবছে সে আমার থেকে নিকৃষ্ট। কিন্তু যখন জেনে যাবে আমার কাছে যত লোক আসে তারা সবাই ঈশ্বর তখন সে কাকে অতিক্রম করার কথা ভাববে! যদি সামান্যতম একটু বোধ হয় ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই তখন সে সবার সাথে কি রকম আচরণ করবে! আমরা যদি কল্পনা করি আমাদের আশেপাশে যারাই আছে তারা সবাই বেলুড় মঠের মন্দিরের সেই ঠাকুরের ছোট ছোট মূর্তি, তখন কি ইচ্ছে হবে একে একটু ধমকে দিই, এর কাছে আমার বুদ্ধিকে জাহির করি! মন্দিরে ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে

আমরা কোন বাজে কাজ, জুয়া খেলা, মদ্যপান, ভাং খাওয়া, বিড়ি খাওয়া এগুলো কখনই করতে যাব না। এই বোধ যদি থাকে আমার সামনে, আশে-পাশে যারা আছে তারা সবাই সেই ঠাকুরেরই প্রতিমুর্তি, যদি দেখি ঠাকুর নিজেই আমার সাথে কথা বলছেন, তখন তাঁর কথাকে কি করে আমি অতিক্রম করতে যাব! আমরা তো ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছি বয়স্ক, সম্মানিতদের কথার উপরে কথা বলতে নেই। বাড়িতে বাচ্চা ছেলে কথা বলছে তার কথাকে ঠাকুরের কথা বলে কি করে ভাবব? না, সেই বাচ্চাও বালক রূপী নারায়ণ। বালক রূপী নারায়ণ যদি কিছু আজেবাজে কথা বলে তখন তাকে ভালো কথা বলা শেখাবার জন্য ধমক দিতে গিয়ে কিছু কথা বললেও সেই কথার মধ্যে আমি জয়ী হব এই মনোভাব থাকে না। আমি জয়ী হব, অন্যের কথাকে অতিক্রমণের ভাব কখন আসবে? যখন দ্বৈতরূপী সমতা থাকবে। যখন অদ্বৈতের সাম্য এসে যাবে তখন কে কাকে অতিক্রম করবে! আমার ডান হাত কি কখন আমাকে এসে বলবে তোমার বাঁ হাতের থেকে আমার কত জোর তোমার বাঁ হাতকে আমি পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি? আমি জয়ী হব বলছি, কার উপর জয়ী হতে চাইছি? যে আমার থেকে আলাদা। যেখানে আলাদা বলে কিছু নেই সেখানে কে কার উপর জয়ী হতে চাইবে আর কেনই বা জয়ী হবে!

যিনি বিদ্বান্, মানে যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তিনি আত্মা ছাড়া কিছু জানেন না, কিছু শোনেন না, কিছু বোঝেন না, সেইজন্য তিনি *ন অতিবাদী*, এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে কথা বলবেন না। এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে কথা বলা কি রকম? 'আরে তুমি কি জান! চুপ করতো'। আত্মজ্ঞানীকে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে তখন দু একটা কথা বলে দেবেন। আমাদের সমস্যা হল আমরা মনে করি আমরা সব কিছু জেনে গেছি আর এই জগৎটা একেবারে মুর্খ। সেইজন্য আমরা সব সময় কথা বলেই যাচ্ছি, সবাই অপরকে উপদেশ দেবার জন্য ছটফট করছে। আত্মজ্ঞানী যে কম কথা বলেন, তিনি কি নিজের বাক্ ইন্দ্রিয়কে সংযম করে রাখার জন্য জোর করে কম কথা বলছেন? না! না! তাঁর ইন্দ্রিয় সংযমের কোন প্রশ্নই নেই, চুপ করে থাকাটাই তাঁর স্বাভাবিকতা, অকারণে নিজের থেকে কোন কথা বলবেনই না। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তাঁর একজন শিষ্য বলছেন 'মহারাজ! আপনি তো আমাদের কখন কোন উপদেশ দেন না'। রাজা মহারাজ বলছেন 'আমি তোমাদের কি আর উপদেশ দেব, আমি তো দেখছি তোমরা সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ'। সেইজন্য যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের পক্ষে উপদেশ কার্য খুব কঠিন। একটা মায়ার আবরণ যদি তাঁদের সামনে না দিয়ে দেওয়া হয় তাঁরা কোন উপদেশ কার্যই করতে পারবেন না, তিনি তো সবাইকে দেখছেন সেই নারায়ণ। সবাই তো নারায়ণ, উপদেশ কাকে দেবেন! ঠাকুরও বলছেন 'আমার এখন এমন অবস্থা যদি ডাক্তারের কথাকে বিশ্বাস করতে হয় তাহলে একটা বাচ্চার কথাকেও বিশ্বাস করতে হয় আর তা নাহলে কারুর কথাকেই বিশ্বাস হয় না। সবই নারায়ণ, ডাক্তারও বৈদ্যরূপী নারায়ণ আর বাচ্চা বালক রূপী নারায়ণ। ডাক্তার যা বলবে সেটাও করতে হবে, বালক যা বলবে সেটাও করতে হবে। আর তা নাহলে কোন কথার উপরই ভরসা নেই। এই ভাব থাকলে সংসার কার্যও চলে না, শরীরও চলবে না। তাই দেখা যায় ব্রহ্মজ্ঞানীরা বেশী দিন শরীরটাকে ধরে রাখতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্যের জন্য তিনি কারুর মধ্যে একটু অবিদ্যার আবরণ রেখে দেন। তখন জ্ঞানী একটা কিছুকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের কার্য করতে থাকেন। যেমন শ্রীরামচন্দ্র মর্যাদা কাকে বলে দেখাবার জন্য তিনি মর্যাদার অবলম্বন করলেন। শ্রীরামচন্দ্র যা কিছু করছেন মর্যাদাকে অবলম্বন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগীশ্বর, যোগকে অবলম্বন করে সর্বক্ষেত্রে যোগকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে দেখাতে থাকলেন। আচার্য শঙ্কর বিদ্যা কাকে বলে দেখাবার জন্য বিদ্যাকে অবলম্বন করে যেসব ভাষ্য দিয়ে গেছেন যার একটা বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বইয়ের পর বই লিখে দেওয়া যায়। আর ঠাকুর দেখালেন ত্যাগ আর ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা কাকে বলে। ঠাকুর সব কিছু ত্যাগ করে দেখালেন – এই দেখো ত্যাগের মহিমা। ঈশ্বর যদি একটা অবলম্বন না দিয়ে দেন, অবলম্বন মানে অপূর্ণতা, এই অপূর্ণতা কিন্তু বাস্তবিক নয় – একটা পাতলা পর্দা ফেলে দেওয়া হয়, তা নাহলে শরীর থাকবে না।

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ – তিনি যে শুধু *ন অতিবাদী* হচ্ছেন তাই নয়, তার সাথে তিনি আত্মক্রীড়, যাঁর আত্মার মধ্যেই ক্রীড়া হতে থাকে। আমাদের সবার খেলা কোথায় হচ্ছে? কামিনী-কাঞ্চনে। এই জগতে যত রকমের খেলা আছে সব কামিনী আর কাঞ্চন এই দুটোর মধ্যে আর এই দুটোকে নিয়েই চলছে। এখন যেমন আইপিএল খেলা চলছে – এরা কি কোন ক্রিকেট খেলছে? ক্রিকেট-ফ্রিকেট কোন খেলাই হচ্ছে না, ক্রিকেটকে সামনে সাজিয়ে রেখে ভেতরে পুরোটাই কামিনী আর কাঞ্চনের খেলা চলছে। কিভাবে আমার আপনার পকেটের টাকাটা বার করে কয়েকটা লোকের পকেটে নিয়ে যাওয়া যাবে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই খেলা কাদের নিয়ে? স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া কোন খেলা হয় না। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি আত্মক্রীড় হয়ে যান, নিজের আত্মার সাথে খেলাতেই তিনি মগ্ন হয়ে যান। আত্মার মধ্যেই তিনি আনন্দে ডুবে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞানী, আমাদের মত সাধারণ লোকের জন্য চাই স্ত্রী-পুত্র, স্ত্রী-পুত্র করতে গেলে অর্থ চাই। সাধারণ মানুষ করছে বাহ্যক্রীড়া আর জ্ঞানী করেন আত্মক্রীড়া।

আত্মরতিঃ, রতি মানে প্রীতি ভালোবাসা। জ্ঞানীর একমাত্র আত্মা ছাড়া অন্য কোন কিছুতে প্রীতি থাকে না। সাধারণ মানুষের প্রীতি কিসে থাকে? আমাদের প্রীতি অনেক জিনিষের প্রতি থাকতে পারে – খেলা দেখতে প্রীতি, স্ত্রী-পুত্রাদিতে প্রীতি, ধন-দৌলতে প্রীতি, লেখালেখির প্রতি প্রীতি, বই পড়ার প্রতি প্রীতি, খাওয়া-দাওয়াতে প্রীতি এই রকম হাজার হাজার জিনিষে প্রতি আমরা প্রীতি যুক্ত হয়ে আছি।

আত্মক্রীড় আর *আত্মরতিঃ*তে তফাৎ আছে। ক্রীড়াতে বাহ্য সাধনের অপেক্ষা থাকে কিন্তু রতিতে বাহ্য ক্রীড়ার অপেক্ষা রাখে না। একজন লোক মনে মনে স্ত্রী কিংবা নারীর চিন্তা করছে কিংবা একজন মহিলা মনে মনে কোন পুরুষের চিন্তা করছে – এটাই হয়ে গেল রতি। তারপর যখন সে তাকে শারীরিক ভাবে কাছে পেল তখন আমোদ-আহ্লাদ করছে, এটা হয়ে গেল ক্রীড়া। যিনি জ্ঞানী তাঁর কোন কিছুতেই প্রীতিও থাকে না আর ক্রীড়াও থাকে না। ঠাকুর গৃহস্থ ভক্তদের বলছে – তোমার তো বাইরে ত্যাগ করতে পারবে না, তাই তোমরা মনে ত্যাগ রাখবে। গৃহস্থ যদি অর্থ উপার্জন না করে তাহলে তার স্ত্রী-পুত্র মা-বাবা না খেয়ে মরে যাবে। তাই গৃহস্থকে বাহ্যিক কর্ম করতেই হবে। কিন্তু মনের যে প্রীতি ভাব সেটা সব সময় ঈশ্বরের দিকে থাকবে। ঠাকুর সন্ন্যাসীদের বলছেন – সন্ন্যাসী বাইরের ত্যাগ আর মনের ত্যাগ দুটোই থাকবে। সন্ন্যাসী তাই আত্মক্রীড় আর আত্মরতি দুটোই হয়ে গেল। নিজের শরীর ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনে যে কোন ধরণের বাহ্য বস্তুর যখন অপেক্ষা থাকবে তখন কিন্তু বুঝতে হবে সে কিন্তু আত্মক্রীড় নয়। সেই বাহ্য বস্তুটা যখন কাছে থাকছে না তখন মনে মনে কিন্তু সেই ওই বস্তুকে নিয়ে কল্পনা করতে থাকবে, এটাই রতি হয়ে গেল। এই বাহ্য বস্তু যে কোন কিছুই হতে পারে। যদি দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসীরা বা ভক্তরাও নিজেদের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মেরে যাচ্ছে, গল্পই করে যাচ্ছে, হতে পারে তারা আধ্যাত্মিক আলোচনাই করছে কিন্তু ওটা আড্ডাই। সাধুদের মধ্যে এই আড্ডাকে মজা করে বলা হয় আড্ডাব্রহ্ম, যেমন সাকার ব্রহ্ম নিরকার ব্রহ্ম, এটা হল আড্ডাব্রহ্ম। সারাদিন আড্ডাই দিয়ে যাচ্ছে, মানে আড্ডাব্রহ্মের আনন্দ নিচ্ছে। যারা কারুর সাথে কথা বলে বা সঙ্গ পেয়ে আনন্দ সম্ভোগ করছে এরা কিন্তু আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হয়নি। আমি বলছি আমার আডা-ফাড্ডা মারতে একেবারেই পছন্দ নয়, এর থেকে বরং বই পড়ে আমি খুব তৃপ্তি পাই, যখনই সুযোগ পাই তখনই বই নিয়ে বসে পড়ি। এটাও কিন্তু আত্মক্রীড় আর আত্মরতি নয়, এটা হল বইক্রীড় আর বইরতি। এই জিনিষ যে কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। যে কোন কিছুতে যদি আসক্তি থাকে সেখানে রতি বা ক্রীড়া এই দুটোর একটা থাকবেই। ক্রীড় মানে শারীরিক ভাবে দেখা যাচ্ছে সে এটা করছে, আমি তো দেখতে পারছি আপনি বই পড়ছেন, আমি তো দেখতে পারছি আপনি আড্ডা মারছেন। আর রতি মানে আপনি মনে মনে আস্বাদ করছেন, এটা অবশ্য অন্য কেউ দেখতে পারবে না, যদিও চেহারা বা শারীরিক অভিব্যক্তিতে বোঝা যাবে আপনি মনে মনে কিছু জিনিষের প্রীতি আস্বাদন করে যাচ্ছেন। রাস্থা দিয়ে চিন্তা করতে থাকবে ঘরে গিয়ে আমাকে আজ ওই বইটা নিয়ে বসতে হবে, বইয়ের ওই জায়গাটা আরেকবার ভালো করে পড়তে হবে। যখন ক্রীড় হবে না তখন মনে মনে ওইটা নিয়েই চিন্তা চলতে থাকবে, মানে রতি হয়ে চলেছে। এখানে বই যে কোন ধরণের হতে পারে, এমনকি আপনি ধর্মীয়

বইও পড়ে থাকেন আর ওতেই আনন্দ হচ্ছে তাহলেও কিন্তু কিছু গোলমাল আছে। তবে হ্যাঁ, সাংসারিক অন্য কিছু করার থেকে ধর্মীয় বই পড়া অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আত্মজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মীয় বই পড়াতেই আনন্দ পাওয়াটা অনেক নিকৃষ্ট।

শেষে বলছেন, *ক্রিয়াবান্*, ক্রিয়াবান্ মানে যাঁর জ্ঞান, ধ্যান, বৈরাগ্য সব কিছু হবে আত্মাকে নিয়ে। তাঁর ধ্যান হবে আত্মাকে নিয়ে, তাঁর জ্ঞান, মানে চিন্তন মনন হবে আত্মাকে নিয়ে। তাঁর যে যোগ সাধনা, তাঁর বৈরাগ্য সাধন সব কিছু আত্মাকে কেন্দ্র করেই হবে। তাঁর অভাবে পরে বৈরাগ্য হবে না, স্বভাবেই তিনি বৈরাগ্য। স্বভাবে বৈরাগ্যটা কি জিনিষ? ঈশ্বরকে আমি ভালোবেসেছি, অন্য কিছুর স্থান নেই আমার কাছে। আধ্যাত্মিক পথের পুরুষ তার চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছরকে অতিক্রম করে যাওয়ার পর যে কোন কাজই তাঁর পক্ষে যেন একটা শাস্তি স্বরূপ। আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কখন কোন কাজের মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না, শুধু *আত্মক্রীড়*। যা কিছু ধ্যান জ্ঞান সব আত্মাকে নিয়েই। যে কাজটা একেবারে না করলেই নয় ওই কাজটুকু করে দিয়েই আবার আত্মক্রীড়। আধ্যাত্মিক পুরুষ মন্দির বানাচ্ছেন, চাঁদা তুলছেন, চ্যারিটি করছেন সারাক্ষণ দৌড়েই যাচ্ছেন, লেকচার দিয়েই যাচ্ছেন, লেখালেখি করেই যাচ্ছেন – এঁদের কিন্তু *আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্* হয়নি। আর যে গৃহস্থ পঞ্চাশ বছর হয়ে যাওয়ার পরেও কামিনীর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে পারেনি আর অর্থোপার্জনের পেছনে দৌড়াচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। আগেকার দিনে বাণপ্রস্থীরা এটাই করতেন। চল্লিশ বছর হতে হতেই তাঁদের সন্তান সাবালক হয়ে দাঁড়িয়ে যেত, পয়তাল্লিশ হলেই ছেলের উপর দায়ীত্ব দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে বেরিয়ে যেতেন। তবে মানুষ এখন দেরীতে বিয়ে করে আর সরকারও চাকরি থেকে অবসরের বয়স ষাট বছর করে দিয়েছে। আগে যেখানে কুড়ি বছরে বিয়ে করত এখন তিরিশ বছরে বিয়ে করছে। সন্তানকে দাঁড়াবার জন্য আরও পঁচিশ বছর দিন, তারপর পঞ্চান্ন হলে চাকরি ছেড়ে শুধু ঈশ্বরের চিন্তা নিয়ে থাকুন। তখন আপনার যে রতিঃ, আপনার ক্রিয়া আর আপনার ক্রীড়া সবটাই হবে আত্মাকে নিয়ে।

এই মন্ত্রের সার তত্ত্বটা আবার সংক্ষেপে আবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। যদিও বলা হয় জড় পদার্থ থেকে চেতন পদার্থ যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। কিন্তু প্রকাশের তারতম্য আছে। জড় বস্তুতে আত্মতত্ত্বের প্রকাশ কম, প্রকাশের মাত্রা এতই কম যে খুব উচ্চমানের জ্ঞানী না হলে জড় বস্তুর মধ্যে আত্মতত্ত্বের প্রকাশকে কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু যেখানে প্রাণের খেলা চলছে সেখানে সাধারণ মানুষ একটু চেষ্টা করলেই আত্মতত্ত্বের প্রকাশকে ধরতে সক্ষম হবে। যাদের চোখের জ্যোতি কমে গেছে তারাও যেমন যেখানে বেশী আলো আছে বুঝতে পারে এখানে বেশী আলো আছে, ঠিক তেমনি যেখানে চৈতন্যের প্রকাশ বেশী সেখানে সাধারণ মানুষ আত্মতত্ত্বকে ভালো বুঝতে পারে। প্রাণী জগতে আবার মানুষের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ বেশী, সেইজন্য বলা হয় মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখতে হয়। মানুষের মধ্যে দেখার পর আস্তে আস্তে সমস্ত প্রাণী জগৎ তারপর জড় জগতের মধ্যেও ঈশ্বরীয় প্রকাশকে দেখতে পারে। মানুষের মধ্যে প্রথম কোথায় আত্মার প্রকাশকে দেখবে? বলছেন প্রাণ, যেখানেই প্রাণের সঞ্চালন হচ্ছে সেখানেই দেখা যায়। সব প্রাণীতে তিনি হলেন সেই প্রাণেরও প্রাণ। বলছেন যাঁরা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আত্মার প্রকাশকে দেখেছেন তাঁরা তো মহান ব্যক্তিত্ব এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আত্মতত্ত্বকে নিয়ে যাঁরা বৌদ্ধিক স্তরে শুধু চিন্তা করে বুঝেছেন আত্মতত্ত্ব ঠিক এই রকমটিই, তাঁদেরও ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। কি রকম পরিবর্তন হয়? প্রথমেই বলছেন নাতিবাদী, অর্থাৎ তাঁরা আর বেশী কথা বলেন না। অপরকে দাবিয়ে – তুমি কি জান! চুপ কর তো! বলে নিজেকে জাহির করার যে প্রয়াস, এই ধরণের প্রয়াস কক্ষণ করবে না। শারীরিক ভাবে কাউকে জয় করা, বাচিক ভাবে কাউকে জয় করা এবং বৌদ্ধিক ভাবে কাউকে জয় করা এই ধরণের ইচ্ছাটাই তাঁর আর হবে না। এটাকেই উপনিষদ খুব সহজ ভাবে বলে দিচ্ছে নাতবাদী। এটা হল প্রথম।

দ্বিতীয় সে আর কোন বাহ্যিক ক্রিয়া করে না, যতটুকু না করলেই নয় ততটুকুই করবে। আর যদি সে গৃহস্থ হয় তাহলে সহজ ভাবে যতটুকুতে সংসার নির্বাহ হয়ে যাবে, শরীর ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বাইরে আর বেশী কিছু করতে যাবে না। এটাই হল সত্ত্বগুণীর লক্ষণ। যাদের মধ্যে রজো গুণ আছে তারা

বিরাট আড়ম্বর করবে, দশ রকমের তরকারী, পঞ্চাশ রকমের ব্যঞ্জন তৈরী করবে। আর তমোগুণী হলে প্রচুর মাংস-ভাত খাবে আর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে। তৃতীয় *আত্মরতিঃ*, তিনি নিজের মতই থাকবেন। গীতাতে বলছেন *আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ*, গীতা আর উপনিষদ একই কথা বলে। স্থিতপ্রজ্ঞঃ নিজের মতই থাকেন, তাঁর আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। আত্মক্রীড় হল ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা হচ্ছে আর আত্মরতিঃ হল মনে মনে যা কিছু হচ্ছে। এমন নয় যে বাইরে এক রকম আর ভেতরে এক রকম। এর আগে আমরা ঠাকুরের কথা দিয়ে উপমা দিয়েছি, ঠাকুর বলছেন গৃহস্থের তো বাইরে ত্যাগ হবে না, কিন্তু তাদের মনে ত্যাগ। সন্ন্যাসীদের দুটোই বাইরে আর মনে ত্যাগ করতে হবে। মুণ্ডকোপনিষদ সন্ন্যাসীদের গ্রন্থ তাই এই আত্মক্রীড় আর আত্মরতির কথা বলছেন। এই ত্যাগ তাঁদের জোর করে করতে হয় না, স্বাভাবিক ভাবেই ত্যাগ হয়ে যায়। সাধনা আর সিদ্ধি, যিনি সিদ্ধ অবস্থায় চলে গেছেন তাঁর যে জিনিষগুলো স্বাভাবিক, সাধনাতে সেটাকেই কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। যেমন ঠাকুর, তিনি চাইলেও তাঁর মুখ থেকে মিথ্যা কথা বেরোবে না, তার মানে সত্যটাই ঠাকুরের স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ লোককে কষ্ট করে সত্য কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুরের মন স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরে, ঈশ্বর থেকে তাঁর মনকে জগতে নামানোই যাচ্ছে না। সাধারণ লোক সাধনা করে, কষ্ট করে ঈশ্বরে মন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

এখানে আচার্য একটা জিনিষ যোগ করছেন। আচার্য যখন ভাষ্য রচনা করছেন সেই সময় একটা মতবাদ ছিল যাদের বলা হত সমুচ্চয়বাদী। আচার্য সমুচ্চয়বাদীদের সব জায়গায় আক্রমণ করে গেছেন। সমুচ্চয়বাদীদের মত ছিল তুমি উপনিষদের যে কথাগুলো বলা হয়েছে এগুলোকে নিয়ে জ্ঞানচর্চা করে যাও কিন্তু তার সঙ্গে বেদে যে কর্মের কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে ছেড়ে দিও না। তার মানে তুমি অগ্নিহোত্রাদি কর, যজ্ঞাদি কর, এগুলোকে ছাড়বে না, তার সঙ্গে উপনিষদে মন্ত্রগুলোতে যে সাধনার কথা বলা হয়েছে এটাও করবে। আর যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা এই আত্মক্রীড়, আত্মরতিঃ হয়ে গেছে তাঁরাও কিন্তু এই অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াগুলো করবেন, তাঁরা বেদের যাগ-যজ্ঞ করবেন। আচার্য যখনই কোন সুযোগ পান, তা গীতাতেই হোক আর উপনিষদেই হোক এই সমুচ্চয়বাদীদের তুলোধুনো করে ছেড়েছেন। আচার্যের মতে সমুচ্চয় বলে কোন কিছু হতে পারে না।

স্বামীজীর একটা খুব নামকরা কোটেশান আমরা প্রায়ই উল্লেখ করি – Each soul is potentially divine, the goal is to manifest the divinity within by controlling nature externaly and internaly. Do this either by work, worship, psychic control or knowledge. By one or more of these and be free. This is the whole of religion। এই যে স্বামীজী বলছেন Do this either by work, worship, psychic control or knowledge. By one or more of these and be free. This is the whole of religion। স্বামীজীর এই বক্তব্যকে কি আমরা সমুচ্চয় বলব কি, বলব না? অবশ্যই সমুচ্চয়? ঠাকুরের ভাব তো পুরো সমুচ্চয়ের। আর আচার্য শঙ্কর এই সমুচ্চয়কে একেবারে তুলোধুনো করে রেখেছেন, সমুচ্চয় বলে কোন কিছু হয় না। স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলীর পুরো বক্তব্যকে দুটো বাক্যে লিখে দেওয়া যায়, স্বামীজী বলছেন তোমার মধ্যেই সেই আত্মতত্ত্ব আছে সেই আত্মতত্ত্বকে জানতে হবে। কিভাবে জানবে? কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান এর এক বা একাধিক দ্বারা, এটাই ধর্ম। এখানে আচার্য বলছেন জ্ঞান আর কর্মের সমুচ্চয় বলে কোন কিছু হয় না। গীতাতে আর উপনিষদেও পদে পদে আচার্য এই কথা বলছেন। বেদান্ত যে কত জটিল আর কঠিন এখানে এসে বোঝা যায়। একজন ভাষ্যকার বলেছিলেন, যারা রামেশ্বরমে থাকে আর তারা যে সেতুবন্ধ দেখে তাতে তাদের যা পূণ্য হবে তার থেকে বেশী পূণ্য হবে যারা দূর থেকে কষ্ট করে এসে সেতুবন্ধ দেখে যায়। হিন্দুরা আবার এর জবাবে বলবে যাদের পূণ্য বেশী তারাই রামেশ্বরমে জন্মাবে। এটা এর কোন উত্তর নয়। এখানে ভাষ্যকার বলতে চাইছেন, যারা কষ্ট করে ঠাকুর দর্শন করতে আসছে, কষ্ট করে যারা উপনিষদ, গীতা শ্রবণ করতে আসে তাদেরই বেশী পূণ্য হয়। এই জটিল ব্যাপারটা বোঝা খুব প্রয়োজন। স্বামীজী পদে পদে যোগ সমুচ্চয়ের কথা বলছেন। কিন্তু আচার্য একেবারে প্রথমেই তা গীতাতেই হোক আর উপনিষদেই হোক এই সমুচ্চয়বাদকে খণ্ডন করে রাখছেন। গীতার যেখানে

ভাষ্য শুরু করছেন সেখানে প্রথমেই এই সমুচ্চয়বাদীদের আক্রমণ করছেন, কোন অবস্থাতেই জ্ঞান আর কর্মের কখন সমুচ্চয় হয় না। স্বামীজী আর আচার্যের মধ্যে এই যে আপাত বিরোধ এটা কি আদৌ কোন বিরোধ? যদি বিরোধ না হয়ে থাকে তাহলে দুটো কথাকে মেলান যাবে কি করে? এখানে এসে বোঝা যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে শাস্ত্রের সূক্ষ্ম জিনিষ বোঝা যায় না।

এই যে আমরা প্রায়ই বলি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা করে যাচ্ছি এই কথা কি আমরা বুঝে বলছি নাকি বলতে হয় তাই বলছি। কিন্তু যিনি বুঝে গেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে তাঁর আচরণের মধ্যে চারটে লক্ষণ পরিষ্কার দেখা যাবে, যেটা এই মন্ত্রেই বলে দিয়েছেন আর যেটাকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করে যাচ্ছি। তা হল *ভবতে নাতিবাদী* আর *আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান* – প্রথম হল তিনি বেশী কথা বলবেন না, আর একজন যেখানে কথা বলছে তার উপর কক্ষণ কথা বলবে না। দ্বিতীয় অপর কারুর সঙ্গে তাঁর কোন জাগতিক সম্পর্কই থাকবে না, অমুকের সঙ্গে দেখা করতে হবে, অমুকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হবে, বন্ধুদের নিয়ে আইপিএল ম্যাচ দেখব এই ধরণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে, এগুলো বন্ধ হয়ে তিনি আত্মক্রীড় হয়ে যাবেন। এসব বন্ধ করে তিনি একা হয়ে গেছেন তাই বলে এখন সময় কাটাবার জন্য আমার বই দরকার, আমাকে লেখালেখি করতে হবে, এগুলোও কিছু করবেন না, কারণ তিনি এখন *আত্মরতিঃ* হয়ে গেছেন। এবার কি তাহলে দুনিয়ার সব কিছুকে মাথার মধ্যে এনে মনে মনে চিন্তা করতে থাকবেন? না, তাও নয়, তাঁর চিন্তন শুধু আত্মাকে নিয়েই, এটাই ক্রিয়াবান। তিনি যা কিছু করবেন, রান্না করছেন – ঈশ্বরের জন্য রান্না করছেন, খাচ্ছেন – ঈশ্বরকে আহুতি দিচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন – ঈশ্বরের সাধনা করতে হবে তার জন্য শরীরকে বিশ্রাম দিচ্ছেন। ঈশ্বর সাধনা ছাড়া কিছু করবেন না। এগুলো হল তাঁর পরীক্ষা। এছাড়া আত্মজ্ঞান সম্ভবই নয়। তা নাহলে টিয়া পাখি যতই রাধেকৃষ্ণ বলুক বেড়ালে ধরলে সেই ট্যাঁ ট্যাঁ বেরোবে। এই জিনিষগুলো ঠিক ঠিক না বুঝলে কিছুই হবে না।

স্বামীজী একদিকে বলছেন চারটে যোগের সমুচ্চয় করতে আর আচার্য বলছেন সমুচ্চয় বলে কিছু হয় না। এই আপাত বিরোধাত্মক মন্তব্যকে নিয়ে সাধুদের মধ্যেও অনেক বাগবিতর্ক চলে। এমন এমন আচার্য ছিলেন যাঁরা বলতেন যেখানে দেখবে স্বামীজী আর আচার্য শঙ্করের মধ্যে কোথাও বিরোধের আভাস সেখানে আচার্য শঙ্করকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু এনারা আসল জায়গাটাকেই ছেড়ে দিয়েছেন বা বুঝতে পারছেন না। আচার্য শঙ্কর আর স্বামীজীর মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ নেই। শঙ্করাচার্যকে ঠাকুর বলছেন অবতার। অবতার অবতারের সঙ্গে যদি বিরোধ হয়ে যায় তাহলে তো ধর্মেরই পতন হয়ে যাবে। স্বামীজী যেখানে বলছেন Do this by knowledge সেটা এই জ্ঞান নয়, এখানে তিনি বিচারের কথা বলছেন। কিন্তু Manifestation of Divinity হল জ্ঞান। আর যেখানে বলছেন Do this either by work, worship, psychic control or knowledge এই knowledgeটা হল জ্ঞান, এটাকে অনেক সময় বলা হয় জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ আর জ্ঞান দুটো আলাদা, জ্ঞানযোগ মানে বিচার পথ। বিচার পথ মানে ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু বা বলতে পারি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার বা বলা যেতে পারে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটে গুণের বিচার। এই বিচার করাটাই জ্ঞানযোগ। যেমন আমি বিচার করছি যে আমি যা কিছু করছি এটা সত্ত্বগুণ, এটা রজোগুণ বা এটা তমোগুণ, আমি যা কিছু করছি সব গুণের মধ্যেই পরছে। আমি মন্দিরে যাচ্ছি, পূজো করছি এটাও এই তিনটে গুণের মধ্যেই পড়ছে। কিন্তু আমার জীবনের উদ্দেশ্য ত্রিগুণাতীত হওয়া। আবার এইভাবেও বিচার করা যায়, আমি যা কিছু করছি আমি আমার শরীরের জন্য করছি, মনের জন্য করছি, এটাকে ত্যাগ করতে হবে। কার জন্য ত্যাগ করব? ক্ষেত্রজ্ঞের জন্য করব, যিনি আত্মা তাঁকে লাভ করার জন্য করব, এটাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার। আবার পুরুষ-প্রকৃতি বিচারও আছে, যা কিছু আছে সব জড়। আমি যার জন্য খেটে মরছি, যেটাকে পাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছি এটা হল জড়। পুরুষকে পাওয়ার জন্য এই জড়ের পেছনে দৌড়ানটা বন্ধ করতে হবে, পুরুষ মানে চৈতন্য। এই পুরুষ-প্রকৃতি বিচার, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার, গুণ-গুণাতীত বিচার এই বিচারকে বলে জ্ঞানযোগ। ভক্তিযোগ আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ আমাকে সেখানেই নিয়ে

যাবে। কোথায় নিয়ে যাবে? Manifestation of Divinity মানে জ্ঞানে নিয়ে যাবে। কর্মযোগ নিয়ে যাবে জ্ঞানে, রাজযোগ নিয়ে যাবে জ্ঞানে। জ্ঞানযোগও নিয়ে যাবে জ্ঞানে। এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। স্বামীজী যে জ্ঞানের কথা বলছেন সেখানে তিনি বস্তু বিচারের কথা বলছেন। বস্তু বিচার আর বস্তু জ্ঞান দুটো আলাদা। যিনি এই জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী হয়ে গেলেন তিনি তখন আপ্তকাম, পূর্ণকাম হয়ে যান। আপ্তকাম বা পূর্ণকামের দ্বারা কোন কিছু করার কোন প্রশ্নই হয় না। তাঁর আর কর্ম জ্ঞানের সমুচ্চয় হতেই পারেনা। ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখছি তিনি গলিতহস্ত হয়ে গেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছে হল গঙ্গায় তর্পণ করবেন, অঞ্জলী করে জল দিতে যাচ্ছেন দেখছেন আঙুলগুলো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে আর সেখান দিয়ে জল গলে যাচ্ছে। ঠাকুর দুঃখ করছেন আমার একি হল মা। না, এটাই গলিতহস্ত, যিনি জ্ঞানী তিনি যদি ইচ্ছা করেন আমি পিতৃদের একটু জল দেব, তিনি দিতে পারবেন না। তিনি যদি চান আমি কামিনী-কাঞ্চন রাখব, তিনি চাইলেও রাখতে পারবেন না। কিন্তু যিনি জ্ঞানযোগের পথে চলেছেন তাঁকে বিচার করতে হবে যে আমাকে কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকতে হবে। ঠাকুর ভক্তদের বিচার করতে শেখাচ্ছেন টাকা দিয়ে কি হয় – ভাত-ডাল, পোশাক, থাকার জায়গা আর সাধু সেবা, এ ছাড়া আর কিছু হয় না। কামিনী নিয়ে বলতে গিয়ে দেখাচ্ছেন এই নারীর শরীরে কি আছে? মল, মুত্র, কফ ইত্যাদি। এটাই বিচার পথ, এটাই জ্ঞানযোগের পথ। জ্ঞান আর জ্ঞানযোগ দুটো পুরো আলাদা।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধ ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন, তাঁদের দর্শন, জীবনশৈলী হিন্দুদের মনে অনেক সংশয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। আচার্য শঙ্কর এসে এই সংশয়গুলোকে পরিষ্কার করে দিলেন। আজ হিন্দু দর্শন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এর রূপরেখা আচার্যের এই ভাষ্যাদি রচনার পরই ঠিক ঠিক রূপ পেয়েছে। বারশো তেরশো বছর পর থেকে আচার্যের ভাষ্যাদির প্রচার প্রসার কমে যাওয়াতে সাধারণ মানুষের শাস্ত্র বোঝার ক্ষমতাও কমে গেল, তখন ঠাকুর এসে আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে দিলেন। ঠাকুর কিন্তু কখন আচার্যের ভাষ্যাদি পড়েননি, কিন্তু যা যা আচার্য বলে গেছেন ঠাকুরের জীবনে ঠিক সেই জিনিষগুলোই প্রস্ফুটিত হতে দেখা গেছে।

আচার্য বলছেন সমুচ্চয় বলে কোন কিছু হয় না। যখন বলা হচ্ছে *ক্রিয়াবান্* তখন মনে হতে পারে ছন্দ মেলানর জন্য ক্রিয়াবান্ বলা হচ্ছে। ক্রিয়াবানের শাব্দিক অর্থ করতে গেলে এর অর্থ হবে যিনি ক্রিয়া করেন। কি ক্রিয়া করেন? সমাজের ভালোর জন্য ক্রিয়া করেন, আর্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য ক্রিয়া করেন আর এর সাথে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া করেন, পূজো অর্চনাদি করেন। আচার্য বলছেন ক্রিয়াবানের এই ধরণের অর্থ কখনই হবে না, এই ক্রিয়াবানের আগে আত্ম শব্দটা লাগাতে হবে। কেন লাগাতে হবে? কারণ এর আগের গুলোতে আত্ম শব্দ লাগান আছে, *আত্মক্রীড়*, *আত্মরতিঃ* আছে, সেইজন্য এখানেও ক্রিয়াবানের আগে আত্ম যোগ হবে। তার প্রমাণ কি? প্রমাণ করবার জন্য আচার্য উপনিষদ থেকেই আরও কয়েকটি মন্ত্র এনে দেখাচ্ছেন, যেমন এই মুণ্ডকোপনিষদেই আমরা এর আগে পেয়েছি *অন্যা বাচো বিমুঞ্চথা*, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা কোন কিছুতেই আর নিজেকে জড়াবেন না। জ্ঞানীর যা ধ্যানাদি হবে, ধারণাদি হবে, যোগাদি হবে, যা কিছু হবে একমাত্র ঈশ্বরকে নিয়েই হবে। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়া করবেন না। সেইজন্য বিধবার অশ্রু মোচন করা, অনাথের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়া এগুলো সন্ন্যাসীর কাজ নয়। এই কথা সাধারণ মানুষের সামনে বলতে গেলে রে রে করে তেড়ে এসে বলবে – কি বলতে চাইছেন আপনি! স্বামীজী সবার জন্য সেবার আদর্শ দিয়ে গেছেন। কিন্তু এরা একবারও কি ভেবে দেখবে না যে স্বামীজী সেবার আদর্শ কাদের জন্য দিয়ে গেছেন! সমাজে যারা একেবারে স্বার্থপর তাদের জন্য দিয়েছেন। সন্ন্যাসীর এটা কখন ধর্ম হতে পারেনা। সন্ন্যাসীর একমাত্র কাজ – *আত্মক্রীড়*, *আত্মরতিঃ* ও *আত্মক্রিয়াবান্*। সন্ন্যাসীর একমাত্র কর্ম শুদ্ধ আত্মার চিন্তন, মনন, এর বাইরে অন্য কোন কিছু নয়। স্বামীজী বলছেন – দেখ বাপু! সন্ন্যাসীই হও আর যাই হও, খেতে তো হবে, খেতে গেলে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, ভিক্ষা করতে গেলে দশটা বাড়ি ঘুরতে হবে। দশটা বাড়ি ঘুরতে একটা সময় খরচ করতে হবে, আর গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে কি খেতে দেবে না দেবে কোন ঠিক নেই। সব হিসাব করে দেখা যায় দশ বাড়ি ঘোরাঘুরিতে রোজ দু-তিন ঘন্টা চলে যাবে, জপ-ধ্যান বাদ দিয়ে হাতে আর দু থেকে তিন ঘন্টা সময়

পড়ে থাকে। এই পাঁচ ঘন্টা সময় যেন সমাজের জন্য দিয়ে দাও। তাহলে কি হবে? তোমার খাওয়াটা তারা পৌঁছে দেবে বদলে তুমিও একটু সেবা করে দিলে। কিন্তু তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মোক্ষ। যিনি মোক্ষতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর একমাত্র অবলম্বন হল *আত্মক্রীড়, আত্মরতিঃ* আর *আত্মক্রিয়াবান্*।

এই *আত্মক্রিয়াবান্* যখন বলছেন তখন এখানে আচার্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন – *সংভিন্নার্যমর্যাদঃ সন্ন্যাসী*, তিনি কখন আর্য মর্যাদা ভঙ্গ করেন না। আর্য মর্যাদা হল, আমাদের বেদ উপনিষদে, স্মৃতিতে যে সব নির্দেশ বাক্য দেওয়া আছে সেই সব বাক্যকে কক্ষণ তাঁরা ভঙ্গ করবেন না। ঠাকুর এটাকে অন্য ভাবে বলছেন – তার বেতালা পা পরবে না। আত্মক্রীড় মানে যখনই তিনি কিছু করবেন তখন সেই ভাবটা সব সময় থাকবে যে আত্মা ছাড়া কিছু নেই। তাহলে আর্য মর্যাদা কখন ভঙ্গ হয়? যখন আমার মধ্যে লোভ থাকবে, যখন শোক থাকবে। আমার সাইকেলটা একজন চুরি করে পালাচ্ছে আমি তাকে ধরে খুব করে পিটিয়েছি, পিটিয়ে তারপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বলছি এক্ষুণি ব্যাটাকে লক আপে নিয়ে গিয়ে খুব করে পেটান। কেন করছি? আমি বদলা নিচ্ছি, বদলা নেওয়ার জন্য আমি হিংসা করছি। আর্য মর্যাদা বলছে তুমি কখন হিংসা করবে না। হিংসা আমি কেন করছি? আমার সাইকেলটা চুরি হয়ে যাওয়াতে শোক হয়েছে। পুলিশ যদি কিছু না করে তখন সবাইকে ডেকে এনে খুব করে চোরটাকে পেটান হবে। শোক না হলে মোহ হবে। কোন কিছু পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছি কিন্তু পাচ্ছি না তখন সে লোভ হিংসায় বশীভূত হয়ে গিয়ে আর্য মর্যাদাকে ভঙ্গ করে। নেতা থেকে মন্ত্রী আর কেরাণী থেকে আইএএস অফিসার কেন টাকা চুরি করছে? মোহ, আমার আরও টাকা হোক। কিন্তু যিনি জেনে গেছেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই তিনি পরের স্ত্রী তো দূরের কথা, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই কোন সঙ্গ করতে পারবেন না। আর্য মর্যাদা তিনি কখনই ভঙ্গ করবেন না, কারণ তিনি দেখছেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই। তাহলে গৃহস্থরা কি করবে? ঠাকুর এটাকেও পরিষ্কার করে গেছেন। গৃহস্থ যদি আত্মজ্ঞানী হয়ে যান তাঁর দ্বারা আর গৃহস্থ কর্ম করা সম্ভব হবে না। হলধারী ঠাকুরকে বলছেন 'তুমি কাঙালীদের এঁঠো পাতা তুলেছ! তোমার সন্তানের বিয়ে পৈতে হবে না'। ঠাকুর শুনে খুব রেগে গেলেন, বলছেন 'তবে রে শালা! আমার আবার ছেলেপুলে হবে, তুই নাকি বেদান্তের কথা বলিস'! হলধারীকে বলছেন, তুমি একদিকে বেদান্তের কথা বলছ আর অন্য দিকে আমার ছেলেপুলে হওয়ার কথা বলছ, তার মানে তোমার ভাবনা-চিন্তায় কোন গোলমাল আছে, কারণ বেদান্তেই বলছে যিনি জ্ঞানী তিনি দগ্ধবীজ হয়ে যান, তাঁর কামনা-বাসনা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনি যদি চানও যে আমার ছেলেপিলে হোক, চাইলেও আর হবে না।

ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি কখন অলস হন না, আর তিনি কখনই অমর্যাদপূর্ণ কোন কাজ করবেন না। একটা দিক হল সন্ন্যাসী সমাজ থেকে সরে গেছে কোন কিছুই সে করছে না। যে লোকটি কোন কাজই করছে না, সেতো কখন কোন ভুল কাজও করবে না, এটা তো জানা কথা। একটি বাচ্চা ছেলে পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর মা জিজ্ঞেস করছে 'কিরে কত নম্বর পাবি'। বাচ্চাটি বলছে 'মা! একশতে আমার পাঁচ নম্বর নিশ্চিত'। 'কি করে বলছিস্'! 'মা! প্রশ্নপত্রে ছিল খাতা পরিষ্কারের জন্য পাঁচ নম্বর দেওয়া হবে। আমার খাতা একেবারে পরিষ্কার, খাতায় কিছুই লিখিনি, তাই পাঁচ নম্বর গ্যারান্টি'। যে কোন কাজ করে না সে কক্ষণ কোন দোষ করে না, যে কাজ করে সেই ভুলত্রুটি করে। ব্রহ্মজ্ঞানী যে অলস, কুঁড়ে, অকম্মা তাই কি তিনি সব কাজ থেকে সরে আছেন? না! তা নয়। করবেন, নিশ্চয়ই কাজ করবেন। কিন্তু আর্য মর্যাদা কখনই ভঙ্গ করবেন না, বেদ, স্মৃতিতে যে নিয়মের কথা বলা হয়েছে তাকে কখনই ভঙ্গ করবেন না।

এই ধরণের যাঁরা *নাতিবাদী, আত্মক্রীড়, আত্মরতিঃ* ও *আত্মক্রিয়াবান্* মানে যিনি আর্য মর্যাদা ভঙ্গ করেন না, এনারাই ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে বরিষ্ঠ। ব্রহ্মবাদী কারা? যিনি ব্রহ্মের ব্যাপারে শুনেছেন, যিনি ব্রহ্মের ব্যাপারে জেনেছেন, যিনি ব্রহ্মকে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন আলোচনা করছেন এনারা সবাই ব্রহ্মবাদী। কিন্তু ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে আবার তারতম্য আছে। তাহলে ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে বরিষ্ঠ কে? যাঁর মধ্যে এই চারটে লক্ষণ দেখা যাবে। আমরা এর আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি যে ব্রহ্ম জ্ঞান স্বসংবেদ্য, যাঁর আছে তাঁর আছে, যাঁর নেই তাঁর নেই। কেউ যদি বলে আমি আমার হৃদয়গুহায় সেই দিব্যজ্যোতি দর্শন করি। কারুর সাধ্য নেই

ধরার উনি সত্যি না মিথ্যা বলছেন। কিন্তু না, এই চারটে লক্ষণ দিয়ে ধরা যাবে তিনি ব্রহ্মবিদদের মধ্যে বরিষ্ঠ কিনা। কারণে অকারণে কথার ফুলঝুরি ছোটান তাঁর বন্ধ হয়ে যাবে, যেখানে সেখানে লেকচার দিয়ে বেড়াবেন না। গরু যেমন বাছুরের পেছনে দৌড়ায় কোন সাধুবাবাকে যদি দেখা যায় ভক্তদের পেছনে দৌড়াচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে তিনি এখনও *আত্মক্রীড়* হননি। আর যখন একা একা আছেন তখন কি তিনি কম্প্যুটার নিয়ে, বই নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন? কোন কিছু নিয়ে যদি খুটুর খুটুর করতে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর এখনও *আত্মরতিঃ* হয়নি। আর শেষে তাঁর যে চিন্তা, ভাবনা, যা কিছু হচ্ছে সবটাই ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে। *আত্মক্রিয়াবান্* ব্যাপারটা আবার স্বসংবেদ্য হয়ে যায়, কারণ আমরা ধরতে পারব না তিনি কি চিন্তা-ভাবনা করছেন। কিন্তু বাকি তিনটেতে ধরা পরে যাবে। এগুলো দিয়েই বোঝা যাবে কে ব্রহ্মবিদদের মধ্যে বরিষ্ঠ।

স্বামী প্রেমেশানন্দ একবার হৃষিকেশের দিকে তপস্যায় ছিলেন। সেখানে হিমালয়ের ওদিককার এক ভালো সাধুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সেই সাধুর শরীর খারাপ থাকাতে কয়েকদিন আর ভিক্ষায় আসেননি। একদিন বিকালে প্রেমেশ মহারাজ সেই সাধুটি কেমন আছে খোঁজ নেওয়ার জন্য দেখা করতে গেছেন। পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছেন একজন কেউ আসছে। বুঝতেই সেই সাধুটি তাড়াতাড়ি করে বিছানার উপর ধ্যানে বসে গেছেন। প্রেমেশ মহারাজ প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সাধু ছিলেন। তিনি দরজা খুলে দেখেন সাধুটি ধ্যানে বসে গেছেন। ঘরে ঢুকে প্রথম কথাই বলছেন 'আমরা তো একই জাতের, আমাদের সামনে এত ঢংঢাং করার কি দরকার'। বেশীর ভাগ সাধুই এই রকম, ভক্তদের দেখলেই এমন ভাব দেখান যে তাঁর মত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দুনিয়াতে আর কেউ নেই। এটা কোন সাধারণ ধারণা নয়, উপনিষদেই এই কথা বলছেন।

এরপর বলছেন, এই যে আত্মদর্শনের কথা বলা হয়েছে এর সাধনটা কি। এখানে মুণ্ডকোপনিষদে একটা জিনিষকে কেন্দ্র করেই সব কিছু চলছে, সেটা হল আত্মজ্ঞান। কখনো বলছেন আত্মজ্ঞানের সিদ্ধিটা কি রকম, সিদ্ধির ফল কি রকম হয়। কখন বলবেন, আত্মজ্ঞানের সাধনাটা কি রকম। এখানে পর পর দুটো মন্ত্রে সত্য সাধনার কথা বলছেন। আর দ্বিতীয় সাধনার কথা বলছেন নিবৃত্তির, মানে ত্যাগ। আচার্য শঙ্কর বেদের দুটি ধর্মের কথা বলছেন – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। যখন কর্ম করা হয় তখন তাকে বলছেন প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি মানে একটা দিকে প্রবৃত্ত হওয়া। আর নিবৃত্তি মানে কোন কিছু থেকে নিবৃত্ত হওয়া, আমরা যেমন বলি আমার কাজে নিবৃত্তি হয়ে গেছে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়াকে বলা হয় সেবা নিবৃত্তি। নিবৃত্তির অর্থ তাহলে হল যেখানে কাজ করাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর প্রবৃত্তি মানে হল যেখানে কাজ করা শুরু হচ্ছে। ধর্ম এই দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম গৃহস্থদের জন্য এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য। সন্ন্যাসী কাজকর্মের আড়ম্বর থেকে বেরিয়ে আসে। যে কোন কারণে যদি কেউ গৃহস্থ হয়ে যায়, তার যোগ্যতাই থাকুক, কি তার অভাব থাকুক, তাকে এখন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে নামতে হবে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হল, তাকে এখন কর্মে নামতে হবে, চাকরি করা, সামাজিকতা করা, এগুলো তাকে ধর্মানুসারে করতে হবে। গৃহস্থদের মধ্যে যারা ধর্মের পথে এগোতে চাইছেন তাদের জন্য এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। কিন্তু যাদের ধর্মে মন নেই তারা যা খুশী করতে পারে, এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পাঁচ ও ছয় নম্বর মন্ত্রে এই ধর্মের কথাই বলা হচ্ছে।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।।৩/১/৫।।

(চিত্তমালিন্যরহিত সন্ন্যাসীরা যাঁকে উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে অবিচল সত্য, অবিরাম একাগ্রতা, নিত্য সম্যক্ আত্মদর্শন ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারা হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করতে হয়।)

ঠাকুর বলছেন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে তার শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায়, নাড়ালে ঢপর ঢপর আওয়াজ হয়। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনি ঠিক এই রকম দেহ আর আত্মাকে পরিষ্কার আলাদা দেখতে পান। কঠোপনিষদে যেমন বলছেন মুঞ্জ ঘাস থেকে তার শাঁসটাকে টেনে বার করে নেওয়া যায়, তেমনি আত্মাকে এই রকম পরিষ্কার টেনে বার করে নেওয়া যায়। কি রকম দেখেন তাঁরা? *শুভ্রো জ্যোতির্ময়*। আমরা যখন কোন বস্তুকে দেখি সেটা কখন জ্যোতির্ময় হয় না, একমাত্র আত্মাই জ্যোতির্ময় হন। যোগীরা যে এই জ্যোতিকে দেখছেন, এই আত্মজ্যোতিকে কি ভাবে দেখা যায়? বলছেন *সত্যেন লভ্যস্তপসা*, সত্য দিয়ে পাওয়া যায়, তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায়, *সম্যগ্‌জ্ঞানেন*, জ্ঞানযোগের দ্বারা পাওয়া যায় আর *ব্রহ্মচর্যেণ*, অটুট ব্রহ্মচর্য পালন করে পাওয়া যায়। আত্মজ্যোতি দর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই কয়েকটি সাধনার বিধি উচ্চমার্গ সাধকদের জন্য বলে দেওয়া হল, এগুলো গৃহস্থদের জন্য নয়।

সত্য হল মিথ্যা ভাষণকে ত্যাগ করা। কিন্তু গৃহস্থকে পাঁচটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলতে বলা হয়েছে। প্রথম হল সত্য কথা বললে যদি নিজের বা অপরের প্রাণহানি হয় তাহলে সত্য বলবে না। দ্বিতীয়, সত্যি কথা বললে আমার সর্বস্ব চলে যাবে বা অপরের সর্বস্ব হানি হয়ে যাবে তখন সত্য কথা না বলে মিথ্যা কথা বলবে। তৃতীয় বিবাহকালে, চতুর্থ পরিহাস ছলে দু চারটে মিথ্যে কথা বলা যায়। তবে দেখতে হবে ওই পরিহাসে যেন কেউ দুঃখ বা আঘাত না পায়। উপহাস করা কোন অবস্থাতেই চলবে না। পঞ্চম রতি কালে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যখন হাসি-মজা করা হয় তখন মিথ্যা কথা বলা যেতে পারে। কিংবা বাচ্চা ছেলেকে মন ভোলানর জন্য অথবা রোগীকে সান্ত্বনা বা ওষুধ পথ্য খাওয়ানার জন্য মিথ্যা কথা বলাতে পাপ হবে না। এর সব কটাই গৃহস্থদের জন্য, সন্ন্যাসী কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলবে না। ঠাকুর কোন অবস্থাতেই সত্য ত্যাগ করবেন না। কিন্তু শ্রীমাকে সংসার চালাতে হচ্ছে তিনি ঠাকুরকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন। পাঁচ সের দুধকে জাল দিয়ে ঘন করে ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছেন, ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন কত দুধ আছে এখানে, শ্রীমা দুধের পরিমাণ অনেক কম করে বলছেন। পরে কেউ বলছেন শ্রীমা কেন মিথ্যা কথা বলতে গেলেন, ঠাকুর তো মিথ্যা কথা বলতে বারণ করেছেন। শ্রীমাও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, রোগীকে দেখাশোনার সময়, শিশুকে খাওয়াবার সময় এই মিথ্যা কথা বলা যেতে পারে। শুধু এই কটিই নয় মহাভারতে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলার অনুমতি দিয়েছে। এই রকম সাত আটটি পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলাটা মিথ্যা নয়। পরের দিকে কেউ কেউ বলেছেন একটা ভালো জিনিষকে স্থাপনা করার জন্য যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় তাহলে সেটা দোষের নয়। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এগুলো অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে, আমরা এর বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে পরিষ্কার বলছেন যিনি আত্মার ব্যাপারে জানতে চাইছেন বা সাক্ষাৎ করতে চাইছেন তাঁর জন্য *সত্যেন লভ্য*, সত্য দিয়ে পাওয়া যায়, এই সত্য হল একেবারে ঘোর সত্য, এখানে আর এই ধরণের কোন পরিস্থিতির জন্য মিথ্যা কথা বলার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না।

এরপর হল *তপসা*, আচার্য শঙ্কর তপসাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন – *মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্রং পরমং তপঃ*। মন আর ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করাটাই পরম তপস্যা। যত রকম তপস্যার কথা বলা হয়ে থাকে সব তপস্যার উদ্দেশ্যই হল মন ও ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করা। যখন উপোস করছেন তখন জিহ্বা আস্বাদ করতে চাইছে, উদর খাবার চাইছে কিন্তু উপোস করে এই ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করা হচ্ছে। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর নির্জলা একাদশী। তপস্যার দ্বারা মন আর ইন্দ্রিয় একাগ্র হলে ধর্ম পথে এগোতে সহজ হয়। মন আর ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করা হচ্ছে, আচার্য বলছেন *আত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ*, তপস্যা হল আত্মদর্শনাভিমুখী। আত্মদর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল মন আর ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা। তপস্যা, তা যে কোন তপস্যাই হোক না কেন, যার দ্বারা মন আর ইন্দ্রিয় একাগ্র হচ্ছে, এই একাগ্রতাই আত্মদর্শনের দিকে নিয়ে যায়, সেইজন্য এটা হল শ্রেষ্ঠ তপঃ। অনেকে চান্দ্রায়াণাদির দ্বারা যে তপস্যা করে এতে শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া হয়। অত্যাধিক উপোস করার ফলে শরীরটা খুব শীর্ণ হয়ে যেতে থাকে আর তা নাহলে সব সময় মন খাওয়ার দিকে পরে থাকে, এই ধরণের তপস্যা আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায় না। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে আচার্য বলছেন *ব্রহ্মচর্যেন মৈথুনাসমাচারেণ*, ব্রহ্মচর্য

মানেই সর্বতো ভাবে মৈথুন ত্যাগ। ব্রহ্মচর্যের ব্যাপারে বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন রকমের কথা বলে থাকেন। মূল কথা হল মনটা যেন কামিনী-কাঞ্চনে না আসক্ত হয়।

সম্যক্ জ্ঞান বলতে বোঝায় যথার্থ আত্মদর্শন। যতক্ষণ সম্যক জ্ঞান না হবে ততক্ষণ যতই সে চিন্তন-মনন করুক না কেন, আত্মার ব্যাপারে কিছু জানতে পারবে না। আচার্য এখানে বলছেন এই *নিত্যম্* সব ক্ষেত্রে আগে লাগাতে হবে, *নিত্যং সত্যেন, নিত্যং তপসা, নিত্যং সম্যগ্‌জ্ঞানেন* আর *নিত্যং ব্রহ্মচর্যেণ* – সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে, সর্বদা তপস্যা করতে হবে, সর্বদা সম্যক্ জ্ঞান আর সর্বদা ব্রহ্মচর্য এই চারটে সর্বদা না হলে কিন্তু আত্মদর্শন হবে না। এগুলো আলাদা করে বলার কোন অপেক্ষা রাখে না, এটাই স্বাভাবিক যে মানুষ যখনই ব্রহ্মচর্য থেকে সরে কামিনী-কাঞ্চনের দিকে মন দিচ্ছে তখন এটাই আত্মদর্শনের বিপরীতমুখী হয়ে গেল। আত্মদর্শন মানে যেটা তিন নং মন্ত্রে বলা হয়েছে *সাম্যমুপৈতি*, সব এক হয়ে গেছে। যাঁর একত্ব ভাব দৃঢ় হয়ে গেছে সে আর কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে ছুটবে কি করে। যেখানে এক সেখানে মিথ্যা কথা বলবে কি করে, তিনি যখন বুঝে গেছেন আমার সামনের লোকটি আর আমি এক তখন তিনি কি করে তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে যাবেন, সম্ভবই না। যারা কুটিল, যারা অনৃত, যাদের মন ছল-চাতুরেতে ভর্তি এরা কখন ধর্ম পথেই এগোতে পারে না, আত্মদর্শনতো সুদূর পরাহত।

ক্ষীণদোষাঃ, যাঁদের আত্মদর্শন হয়ে যায় তাঁদের চিত্ত মল শূন্য হয়ে যায়। দোষ মানে মনের ভেতরের কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপু গুলো। যে যোগীদের এই দোষ গুলো ক্ষীণ হয়ে গেছে, এই ধরণের যোগীরাই একমাত্র আত্মার সাক্ষাৎকার করতে পারেন। কোথায় সাক্ষাৎ করেন? আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, হৃদয়াকাশে। হৃদয়গুহায় অর্থাৎ পুণ্ডরীকাকাশে কি রকম দেখেন? *জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো*, শুভ্র জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে বা আগে যেটা বলা হয়েছিল *রুক্মবর্ণঃ* সুবর্ণ রঙের জ্যোতি। এই জ্যোতিকে অনেকে অনেক রকম আলো রূপে দেখেন, তবে এই আলো দিব্য আলো, এই জ্যোতিই সেই সর্বব্যাপী চৈতন্য, আলো রূপে দেখা যাচ্ছে। এই যে আত্মদর্শন যেটা যোগীরা হৃদয়াকাশে দিব্যজ্যোতি রূপে দর্শন করেন, এই দিব্য জ্যোতিকে সবাই দেখতে পারেন। কিভাবে? সর্বদা সত্য, সর্বদা তপস্যা, সর্বদা সম্যক্ জ্ঞান আর সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা। আচার্য আবার এর সাথে যোগ করছেন – যারা এগুলো মাঝে মাঝে পালন করেন তাদের দ্বারা এই আত্মদর্শন কোন দিনই হবে না। আচার্যের এই মন্তব্যকে ঠাকুর অন্য ভাবে বলছেন – ঢিমে তেতালা হলে চলবে না। একদিন একাদশী করার পর পরের এক বছর করলাম না, কিছু দিন ব্রহ্মচর্য পালন করে তারপর সেখান থেকে সরে এসে কিছু দিন ভোগের মধ্যে কাটালাম, মাঝে মধ্যে দরকারে দুই একটা মিথ্যা কথা বলছে, কেন বলছে? নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা মজা করে, এদের কোন দিনই আত্মদর্শন হবে না। যিনি সন্ন্যাস ধর্মকে গ্রহণ করে আত্মজ্ঞানের পথে নেমেছেন তাঁর আর ওই মজাটজা করার কোন সুযোগই আর থাকে না। কারণ আগেই বলে দেওয়া হয়েছে *আত্মক্রীড়, আত্মরতিঃ*, নিজের মধ্যেই নিজে ডুবে থাকবে। যিনি *আত্মক্রীড়* তিনি তো আর কারুর সঙ্গে গল্পগুজব করতে যাবেন না, তখন আর এর ওর সাথে হাসি মজা করার প্রয়োজনও হবে না। ফলে মিথ্যা কথারও বলার দরকার হবে না।

ঠাকুরের এমনই সত্যের আঁট যে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, রাণী রাসমণির সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল আর দক্ষিণেশ্বরের পুকুর গুলোও মেয়েদের মধ্যে ভাগবণ্টন হয়ে গেছে। ঠাকুর একদিন দেখেন এক বোন অপর বোনের পুকুরের অংশ থেকে শাক তুলছে। ওই দেখে ঠাকুর এমন চমকে উঠেছেন যে দৌড়ে গিয়ে সেই বোনের কাছে নালিশ করতে চলে গেলেন। ততক্ষণে যে বোন তুলছিল সেও এসে হাজির। সেই বোন বলছে 'বাবা! আমি চুপি চুপি তুললুম আর তুমি দিদিকে সব বলে দিলে'। বলে দুই বোন খুব হাসছে। ঠাকুর এদের হাসি দেখে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন 'সম্পত্তি যখন বিভাজন হয়ে গেল তখন কি করে এক অপরের অংশের জিনিষ নিতে পারে'! ঠাকুরের জন্য কোন বাগান থেকে লেবু আনা হত। একদিন সেই বাগানেরই লেবু নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু ঠাকুর আর খেতে পারছেন না। তারপর খোঁজ নিয়ে জানা গেলে আগের দিন ওই বাগানের মালিকানা বদল হয়ে গেছে। নতুন যিনি মালিক হয়েছেন তাঁর অনুমতি নেওয়া হয়নি,

এটাই চুরি। এই জিনিষগুলো অভ্যেস করতে করতে একটা অবস্থায় গিয়ে এটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। *আত্মক্রীড়, আত্মরতিঃ, আত্মক্রিয়াবান্* নিয়ে যত কথা বলা হচ্ছে এই সব কিছুকে ঠাকুর ঘুরে ঘুরে খুব সহজ করে দুটি শব্দে বলে দিচ্ছেন – কামিনী আর কাঞ্চন। যদিও ঠাকুর বেশির ভাগ কথা গৃহস্থদের বলতেন বলে অন্যান্য অনেক সমস্যার কথা প্রসঙ্গ ক্রমে এসে যেত, যদিও উপনিষদে সেই সব কথা বলা হয় না। যেমন আমি হয়তো কামিনী কাঞ্চনকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না, কিন্তু সবার সঙ্গে একটু খোশ গপ্প করার ইচ্ছা, সবাইকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছা, এই সেমিনার, এই সম্মেলনে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া, প্রচুর বই পড়া, টিভি দেখা, কম্প্যুটার নিয়ে পরে থাকা এই ব্যাপারগুলো থেকে যাবে। এই ব্যাপারগুলোও কোন না কোন ভাবে কামিনী-কাঞ্চনের সাথে যুক্ত থাকে কিন্তু সেগুলো খুব সূক্ষ্ম স্তরে এমন ভাবে থাকে যে নিজেও ধরতে পারে না, মনও এখানে চালাকি করে বুঝিয়ে দেয় – কি আছে! এগুলো তো ভালো কাজই করছ, কত কিছু জানছ, শিখছ, সাধুসঙ্গ হচ্ছে। এই চালাকি গুলো ধরা যায় না যতক্ষণ সত্য, তপস্যা, জ্ঞান, ব্রহ্মচর্যের সাধনা না করা যায়।

উপনিষদের মূল বক্তব্য আত্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করেই চলবে। কখন বলছেন আত্মতত্ত্বটা কি রকম, কখন বলছেন যিনি আত্মতত্ত্ব জেনেছেন তাঁর চরিত্র কি রকম হয়, তাঁর আচরণ কি রকম হয়, কখন বলছেন আত্মতত্ত্বকে কিভাবে দেখা যায়, কখন বলছেন আত্মতত্ত্বের কেন দরকার। সব সময় আত্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করেই আলোচনা ঘুরতে থাকে। এর পরের মন্ত্রে বলছেন -

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।।৩/১/৬।।

(*সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়, দেবত্ব প্রাপ্তির মার্গ সত্যের দ্বারা বিস্তৃত। এই সত্যকে অবলম্বন করে ঋষিরা আপ্তকাম হন। সত্যরূপ সাধনের দ্বারাই পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায়।*)

ভারত সরকারের অশোক স্তম্ভের নীচে মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রের প্রথম লাইনটি মুদ্রিত। সেখানে *সত্যমেব জয়তে* লেখা আছে কিন্তু অনেক জায়গায় *জয়তে না* লিখে *জয়তি* লেখা হয়। এতে অর্থের কিছু পরিবর্তন হয় না, যদিও আচার্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন *সত্যম্ এব সত্যবানেব জয়তে জয়তি*, *সত্যমেব জয়তে* যখন বলা হয় তখন তার অর্থ হয় সত্যের জয় আর *সত্যমেব জয়তি* যখন বলা হয় তখন তার অর্থ সত্যবানের জয়, যিনি সত্য কথা বলেন তাঁর জয় হয়। *সত্যমেব জয়তে নানৃতং*, সত্যের জয়, শুধু সত্যের জয় হয় না, আচার্যের ভাষ্যের এটাই বৈশিষ্ট্য তিনি কোন কিছুকে বোঝাতে হলে উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেন। বলছেন, মানুষের যতক্ষণ আশ্রয় না করা হয় ততক্ষণ সত্যের জয় হবে না। সত্য একটা ভাব, মিথ্যা আরেকটি ভাব, সত্য আর মিথ্যার মধ্যে কখন লড়াই হবে না, লড়াই হবে ব্যক্তিত্বের মাধ্যেম। *সত্যম্* মানে যিনি সত্যবান, যিনি সত্যভাষী তাঁরই জয় হয়, মিথ্যাবাদীর জয় হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র সত্যের জয় আর মিথ্যার পরাজয় দেখা যায় না, যিনি পুরুষ তিনিই সত্যবাদী হন বা মিথ্যাবাদী হন। সত্যবাদীরই জয় হয় আর মিথ্যাবাদীর পরাজয় হয়।

এখানে পরে বলছেন *অনৃতম্*, যদিও শব্দটি হল সত্য তখন সত্যের বিপরীত হবে অসত্য কিন্তু এখানে অনুবাদ হল *অনৃতম্*। ঋতম, সত্যম, ধর্ম এই শব্দগুলো এক অপরের পরিপূরক, পাল্টাপাল্টি করে নেওয়া যায়। কখন সত্যকেই ধর্ম বলা হয়, আবার ধর্মকেই কখন ঋতম্ বলা হয়, ঋতমকেই আবার কখন সত্যম্ বলা হয়। আবার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এদের নিজস্ব একটা বিশেষ অর্থও হয়ে যায়। ঋতমের সাধারণ অর্থ হল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু যে নিয়মের উপর চলছে সেই নিয়মকেই বলছেন ঋতম্ (Cosmic Laws)। কিন্তু যখন এই ধরণের ধারণাগুলো প্রথম ঋষিদের কাছে সিদ্ধ হয়েছিল তখন এর একই শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত

হয়েছে। সেই ভাবে ঋতমকে অনেক সময় সত্যম্ বলেও গ্রহণ করা হয়েছে। সেইজন্য ঋতমের বিপরীতটাই হয়ে যায় অনৃতম্। ঋতম্ যখন সত্যের অর্থে হয় তখন সত্যের বিপরীত হয়ে যাবে অনৃতম্। সেটাই এখানে বলছেন *সত্যমেব জয়তে নানৃতম্*, সত্যেরই জয় হয় যেটা *অনৃতম্* তার কখন জয় হয় না। মিথ্যা জিনিষটা তো ঘটছে, কিন্তু বেশী দিন চলে না।

আচার্য যখন ভাষ্য রচনা করেন তখন তাঁর ভাষ্যে একটা জিনিষকে বোঝাবার জন্য সব দিক থেকে সব কিছুকে টেনে নিয়ে এসে দেখিয়ে দেবেন জিনিষটা এই। *প্রসিদ্ধং লোকে সত্যবাদিনানৃতবাদ্যভিভূয়তে ন বিপর্যয়ঃ* – আচার্য বলছেন জগতে তো এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে এবং লোককথাতে প্রচলিত হয়ে আছে যে সত্যবাদীর দ্বারা মিথ্যাবাদী সব সময় পরাভূত হয় এর বিপরীত কখন কোন কিছু হয় না। লোককথার এত সাঙ্ঘাতিক সম্মান যে আচার্যের ভাষ্যতে এটাকে সত্য বলেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। লোককথা মানে প্রবাদ বা বাকধারা নয়, লোকেদের মুখে যে কথাগুলো প্রায়ই শোনা যায়, একেই বলা হয় ঐতিহ্য। ঐতিহ্যে একটা কথা চলে আসছে, যেমন কোন গ্রামের লোকেদের মনে বহু কাল ধরে একটা বিশ্বাস চলে আসছে যে গ্রামের একটা বিশেষ গাছে একটা প্রেতনী বাস করে। এখন এই গাছে সত্যিই কোন প্রেতনী আছে কি নেই কি করে জানবে? বলছেন, প্রেতনী আছে কি নেই এটাকে নিয়ে বিচার করার কোন দরকারই নেই। এটাই ঐতিহ্য, লোকের মুখে মুখে এটা চলে আসছে, এটাকে মেনে নিতে হয়। শ্রুতি বা শাস্ত্র প্রমাণ বা শব্দ প্রমাণ দিয়ে যখন কোন জিনিষকে প্রমাণিত করা হচ্ছে তখন এই শব্দ প্রমাণেরই একটা পরিণতি হল এই লোককথা বা ঐতিহ্য। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন 'মশাই! পুনর্জন্ম কি আছে'? ঠাকুর বলছেন 'অনেক যখন বলে গেছেন তখন পুনর্জন্ম সত্যিই আছে'। পুনর্জন্মের কি প্রমাণ? অনেকে বলে গেছেন এটাই প্রমাণ। আপনি বলতে পারেন অনেকে তো মুর্খ হতে পারে। তা হোক না মুর্খ, তাহলে আপনি প্রমাণিত করে দিন এরা সবাই মুর্খ ছিল আর পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। আচার্য কিন্তু লোককথা বা ঐতিহ্যকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করছেন। প্রমাণ হল একটি জিনিষকে জানার একটা পদ্ধতি। এখন কেউ যদি বলে অনেকে তো বলে সূর্যোদয় হয়, কিন্তু এখন তো জানা গেছে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে। এখানেও কিছুই হবে না, একটা ঐতিহ্য চলে আসছিল পরে জানা গেলে ওই জিনিষটা ভুল, এবার ওটাকে পাল্টে দেওয়া হল। এবার অনেকে এটাই বলবে, এটাই সত্য হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই হয়। বিজ্ঞানে একটা থিয়োরি চলে আসছিল, যখন আরেকজন বিজ্ঞানী প্রমাণিত করে দিলেন এই থিয়োরিটা ভুল তখন এই থিয়োরিটাই চলতে শুরু করে দেবে। এটাই এখানে আচার্য বলছেন লোকে প্রসিদ্ধ আছে *অতঃ সিদ্ধং সত্যস্য বলবৎসাধনত্বম্* - সত্যের প্রবল সাধন দেখা যায়। কিসের থেকে? *সত্যবাদিনানৃতবাদ্যভিভূয়তে*, সত্যবাদী সব সময় মিথ্যাবাদীকে পরাভূত করে। যাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁদেরই জয় হয়। একদিনে বা দুদিনেই এই জয় হয়তো হবে না কিন্তু কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর একটা সময়ে সত্যবাদীরই জয় হবে।

আগেকার দিনে যার শারীরিক ক্ষমতা ছিল তারই বেশী দাপট থাকত। এরপর হাতে তলোয়ারাদি নিয়ে যখন ঘুরতে শুরু করে দিল তখন যার হাতে তলোয়ার সেইই ক্ষমতাবান হয়ে গেল। সেখান থেকে তীর ধনুক এসে যাওয়ার পর যার হাতে তীর ধনুক তারই ক্ষমতা বেশী হয়ে গেল, তলোয়ারধারীকে দূর থেকেই তীর মেরে দেবে, সে বেচারা কিছু করতে পারবে না। এখন যার হাতে বন্দুক আছে, রাইফেল আছে, এ্যটম বোমা আছে সেই ক্ষমতাবান। একদিকে এই ক্ষমতা দিয়ে রাতারাতি অনেক ধন-সম্পদ হাতে চলে আসবে আর অন্য দিকে ক্ষমতাও প্রচুর হয়ে যাবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে যারা চালাক, মিথ্যেবাদী, জোচ্চর তাদের জয় হচ্ছে। কিন্তু না, দীর্ঘকালীনে এটা হয় না। এর খুব ভালো অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে চীন আর রাশিয়াতে। রাশিয়াতে যখন প্রথম কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করল প্রথমেই সব চার্চগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর যখন কম্যুনিস্টদের প্রভাব মুক্ত হতে শুরু করে যখন চার্চের গেটগুলো খোলা হতে শুরু করল দেখা গেল কাতারে কাতারে লোক হুমড়ি খেয়ে চার্চের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার মানে কি হল, ধর্ম যদি মিথ্যা হত, কম্যুনিস্টরা যেমন বলছে ধর্ম হল সমাজের আফিং, তাহলে তোমরা পঞ্চাশ বছর ধরে দুটো প্রজন্মকে

তোমাদের ভাবধারায় শিক্ষা দিয়ে ধর্মকে বাদ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে। তাহলে পঞ্চাশ বছর পর তোমাদের যখন পতন হয়ে গেল তখন তোমারই লোক কাতারে কাতারে চার্চের দিকে ছুটে যাচ্ছে কেন?

মিথ্যাকে আশ্রয় করে একটা জিনিষকে চালিয়ে গেলে কুড়ি বছর, তিরিশ বছর, পঞ্চাশ বছর চালিয়ে যেতে পারবে কিন্তু একদিন তার মুখোশটা খসে পড়বেই। চালাকি জোচ্চুরি সবই চলবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কত দিন চালাবে? কুড়ি বছর, তিরিশ বছর। আপনি বলবেন তত দিনে আমি তো মারা যাব। সেইজন্যই লোকে স্বল্পকালীনের মধ্যে কিছু করে নিতে চায়। কিন্তু তা হয় না। হিন্দুদের ধারণা অন্য রকম। দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি প্রাণীর প্রথম মানব জন্ম থেকে শুরু করে তার শেষ জন্ম পর্যন্ত একটি জীবন হিসাবেই হিন্দুরা দেখে। তাই সত্যের জয় এক সময় হবেই। যদি এই জন্মে না হয় তাহলে আগামী জন্মে হবে। আগামী জন্মে যদি না হয় তার পরের জন্মে হবে। তুমি কোথাও পালাতে পারবে না, এখানেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। মনুস্মৃতিতে বলা হচ্ছে, যে ছল চাতুরি করে, মিথ্যাকে আশ্রয় করে, অন্যায় ভাবে ধন-সম্পদ-ক্ষমতা অর্জন করেছে সে নিজেই এই জীবনে তার নাশ দেখে যাবে। কোন কারণে যদি রক্ষা পেয়ে যায় বা মরে যায় তাহলে তার সন্তান তার নাশ দেখবে। সন্তান যদি না দেখে তাহলে তার পৌত্র, অর্থাৎ তার তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে এর নাশ হবেই হবে, চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত আর গড়াবে না। মনুস্মৃতি তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নন, আসলে তিনি সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

সত্যের যে সাধন করা উচিৎ, সত্য যে উৎকৃষ্ট এটাই লোকপ্রসিদ্ধি, এটাই লোককথা হয়ে আছে। সেখান থেকে আবার বলছেন শাস্ত্রেও তাই বলছে। ইদানিং স্কুল, কলেজে, বিভিন্ন কার্যালয়ে কর্মচারীদের যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়, এতে যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন মূলতঃ এঁদের কাছ থেকে ছেলে-মেয়েরা মূল্যবোধের শিক্ষা পায় না। মানুষ মূল্যবোধের প্রাথমিক শিক্ষা পায় তার মা-বাবা ও পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে। এরপর তার বন্ধুবান্ধবদের থেকে, সব শেষে শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা এই মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। কিন্তু এখন প্রথমেই শিক্ষকদের কাঁধে মূল্যবোধের শিক্ষার দায়ীত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ মানুষ প্রথম মূল্যবোধ, নীতিবোধের শিক্ষা পায় মা-বাবার কাছে, পরের ধাপে বন্ধু-বান্ধব আর শেষে শিক্ষকদের কাছে আর চতুর্থতঃ মহাকাব্যাদি, নীতিকথার কাহিনী থেকে, তবে এগুলো অনেক পরের দিকে আসে। একটি বাচ্চাকে হাজার বার যদি বলা হয় সত্য কথা বলবে, সে কিন্তু সত্য কথা বলবে না। সত্য কথা তখনই বলবে যখন সে দেখবে আমার বাবা-মা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আমার বন্ধুরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আর আমার শিক্ষকরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। কারণ সে দেখছে সত্য কথা যদি না বলে তাহলে সে খুব সহজেই সাফল্য পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে বাবা-মা, শিক্ষক এরা কেন সত্য কথা বলে না? কারণ তাদেরও বিশ্বাস নেই, তারাও মিথ্যাকে আশ্রয় করে সহজে অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছে। এই যে টিভিতে, খবরের কাগজে নানা রকম দুর্নীতি, ঘোটালা, ঘুষ নেওয়ার খবর বেরোচ্ছে, যারা ধরা পরছে, জেলে যাচ্ছে তাদের নামও খবরের কাগাজে টিভিতে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অনেকেরই মনে হয় এদের সন্তানরা যখন দেখছে তার বাবা চুরি করতে গিয়ে ধরা পরেছে, ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পরেছে, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, এরা স্কুলে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা করে কি করে! একজন খুব বড় অফিসার এই ব্যপারে বলছিলেন আপনাদের ভুল ধারণা, এরা নিজেকে খুব গর্বিত মনে করে, আমার বাবার নাম কাগজে টিভিতে প্রচার হচ্ছে। আমার আপনার ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন ঘটনা হলে আমাদের কাছে মহা লজ্জাজনক মহা সম্মানহানির ব্যাপার হবে, মনে হবে এর থেকে মরে গেলেই ভালো হত। কিন্তু নোংরাম করতে করতে একটা অবস্থাকে যখন অতিক্রম করে যায় তখন মানুষ নির্লজ্জ হয়ে যায়। তখন এটাই তার কাছে সম্মানের ব্যাপার হয়ে যায়। যে জিনিষটার জন্য লজ্জা হওয়া উচিৎ সেটাই তার সম্মানজনক হয়ে যায়।

সত্য কথা বলা ভালো এটা আমরা কোথায় পাচ্ছি? শাস্ত্রেই পাচ্ছি, শাস্ত্র ছাড়া কোন প্রমাণ নেই। এই যে যারা এত চুরি, দুর্নীতি করছে এদের যদি বলা হয় সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না। হয়তো বলবে হ্যাঁ তাই করব। কিন্তু যদি সে তর্ক করতে আসে তখন বলবে – সত্য কথা বলে আমার কি লাভ! এই তো আমি চুরি করছি, ঘুষ নিচ্ছি বলে আমার এত কিছু হয়েছে। তখন আপনি তাকে কি বলবেন? শাস্ত্রে নিষেধ করেছে।

তোমার শাস্ত্রেই আমার বিশ্বাস নেই, তুমি বলছ বটে শাস্ত্র ভগবানের কথা, আমার তো ভগবানেই বিশ্বাস নেই তার আবার বইয়ে বিশ্বাস! এটাই হল সমস্যা। পতঞ্জলী যোগশাস্ত্রে যম-নিয়মাদির সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করার সময় পরিষ্কার করে বলছেন যারা যোগ সাধনা করছে না তাঁদের জন্যও এগুলো হল মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা। এই যম-নিয়মাদি হল সার্বভৌম, পুরো বিশ্বের সর্বত্র এই মূল্যবোধকে সম্মান করা হয়। কেউ যদি সত্যবাদী হন, তখন সেই সত্যবাদীতার দুটো দিক আসবে – তিনি যদি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে চান তাঁকে এই সত্যবাদীতা সাহায্য করবে, যদি তিনি সমাজেও থাকেন তাহলেও তিনি একটা আলাদা সম্মান পাবেন। যারা চোর, ছ্যাঁচড়, বদমাইশ তারা নিজদের মধ্যে এক অপরের সাথে মিথ্যা কথা বলে না, এক অপরকে ঠকায় না, বিশ্বাসঘাতকতা করে না। একজন খুনী, চোর, ঠগবাজ, যাই হোক সে কিন্তু বাড়ির লোকের সাথে কক্ষণ খারাপ কিছু করবে না। একটা জায়গায় এসে তার এই মূল্যহীনতার কার্যকলাপটা থেমে যায়। তার মানে, সততার মূল্য সার্বজনীন। যে দারোগা পুলিশ লক আপে একটা আসামীকে বেধড়ক মারছে, সেকি বাড়িতে তার বউকে বা সন্তানকে ওইভাবে মারবে? কখনই মারবে না, তার মানে না মারাটাই হল মূল্যবোধের পরিচায়ক। যে আচরণ আমি আমি প্রিয়জনের সাথে, বাড়ির লোকের সাথে, আমার ঘনিষ্ঠদের সাথে করছি না সেটাই মূল্যবোধ। মানুষ কি নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে মিথ্যা কথা বলে? খুব অঘটন কিছু না হলে মিথ্যা কথা কখনই বলবে না। চোর, বদমাইশরাও নিজের সন্তানের কাছে মিথ্যা কথা বলে না। তার মানে মিথ্যা কথা না বলটাই সার্বভৌম। শাস্ত্র আবার আরেক ধাপ এগিয়ে দিচ্ছে। শাস্ত্র বলছে তুমি যদি আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাও তাহলে এগুলো অনুশীলন করলে খুব সহজে এগোতে পারবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মূল্যগুলোর একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র প্রমাণ।

শাস্ত্র প্রমাণ কি রকম? উপনিষদ বলছেন – *সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা* – বলছেন যাঁরা ঋষি, আপ্তকাম তাঁর এই পথ দিয়ে চলেন। আমরা যেমন দেখছি ঠাকুর এই পথ দিয়েই চলেছেন, বুদ্ধ এই পথ দিয়েই গেছেন, যিশু এই পথ দিয়েই গেছেন। তার মানে, *সত্যেন পন্থা বিততো দেবাযানঃ* – এই যে দেবযানসংজ্ঞক মার্গ মৃত্যুর পর উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যায়, সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে মার্গ আধ্যাত্মিক ভাবকে ধরে রাখে তার পথ হল এই সত্য। এই আধ্যাত্মিক মার্গ যেটাকে শ্রেয়োমার্গ বলা হয়, এই মার্গকে তৈরী করেন আর রক্ষণাবেক্ষণ করেন সত্যবাদী ঋষিরা। কবে ঋষিরা সত্যবাদী ছিলেন, সেই তাঁরা কবে বেদ ধরিয়ে গেছেন সেকি আর এখন আছে! না এখনও এই মার্গকে সর্বতো উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। পরে ভগবান বুদ্ধ এসে কি করলেন? এই একই পথ করলেন। শঙ্করাচার্য কি করলেন? এই পথ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কি করলেন? একই পথ করলেন। এই যে আধ্যাত্মিক পথ আজকে আমাদের কাছে সাক্ষাৎ দেখতে পারছি, আধ্যাত্মিক পথের যে এই বিস্তার ও সম্প্রাসারিত হয়েছে, বিস্তৃতি হওয়া মানে এই মার্গ পুরো স্বীকৃত আর সুরক্ষিত। এই আধ্যাত্মিক পথ তৈরী হয়েছে *সত্যেন পন্থা*, সত্যের দ্বারা। সত্যের দ্বারা এর বিস্তার হয়েছে মানে সত্যবাদীদের দ্বারা, সত্যবাদী মানে ঋষিরা, *যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা*, যিনি আপ্তকামী ঋষি।

যে পথ দিয়ে তাঁরা গেছেন সেই পথে কি আছে? আচার্য বলছেন *কুহকমায়াশাঠ্যাহংকারদম্ভানৃতবর্জিতা*, এই পথ থেকে কয়েকটি জিনিষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে – রাষ্ট্রপতি কোন শহরে যখন কোন অনুষ্ঠানে যান তখন তিনি যে পথ দিয়ে যাবেন সেই পথের যত খানাখন্দ বুজিয়ে দিয়ে সমান করে দেওয়া হয়, রাস্তার দুই ধারের বাড়িগুলোকে হয়ত বা রঙ করিয়ে দেওয়া হয়, সব পরিষ্কার সাফসুতরো রাখা হয়। ঠিক তেমনি আমাদের ঋষিরা যে আধ্যাত্মিক পথ দিয়ে চলেন সেই পথ থেকে ছল, কপটতা, শঠতা, মুর্খতা, দম্ভ, অহঙ্কার, অনৃত এইগুলোকে সব সরিয়ে দেওয়া হয়। মানে আধ্যাত্মিক জীবনই হোক বা সাধারণ জীবনই হোক তাতে এই জিনিষগুলোর কোন স্থান নেই। *যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো*, যাঁরা পূর্ণকাম আর তৃষ্ণারহিত, তাঁরা ওই অতীন্দ্রিয় বস্তুকে দেখার জন্য এই পথে আরূঢ় হন, *আক্রমন্তি* মানে আরূঢ় হওয়া।

যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্, সত্যের পরম নিধান হলেন ঈশ্বর। এখানে বলছেন সত্য মানে পরম তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব মানেই ঈশ্বর। *পরমং নিধানমের* স্বরূপ কি রকম সেটা পরের মন্ত্রে বলছেন। এই মন্ত্রের মূল

বক্তব্য হল – দেখো বৎস্য! তোমাকে পাঁচ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে সত্যকে ধরার জন্য, কারণ সত্যেরই জয় হয়। এটাই লোকমুখে শোনা যায়। ঋষিরাও তাই বলছেন, আধ্যাত্মিক পথ অর্থাৎ ঈশ্বরের পথ সত্য দিয়ে নির্মিত, এই পথ সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যাঁরা তৃষ্ণারহিত, যাঁদের মনে কোন ধরণের কামনা-বাসনা নেই তাঁরা এই পথে আরূঢ় হয়ে সত্যের পরম আশ্রয়ে চলে যান, সত্যের পরম আশ্রয় হল পরম তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব হল ঈশ্বর, অর্থাৎ এই পথে আরূঢ় মহাজনরা পরম তত্ত্বকে জেনেছেন। এখানে পাঁচ আর ছয় নং মন্ত্রে সত্যের প্রশংসা করা হচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন সত্য হল কলির তপস্যা। যিনি নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনিই আত্মতত্ত্বকে জানতে পারেন। লোকের মুখেও তাই শোনা যায় আর যাঁরা ঋষিরা ছিলেন তাঁরাও সত্যের পথ অবলম্বন করেছিলেন। সত্য দিয়েই আধ্যাত্মিক পথ প্রশস্ত হয় আর সত্য দিয়েই এই পথের রক্ষণাবেক্ষণ হয়। তৃষ্ণারহিত আপ্তকাম ঋষিরা এই পথ দিয়েই গিয়েছেন। কোথায় গেছেন? এই পথেরই যেটা পরম আশ্রয়, সেই পরম তত্ত্বে মানে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে গেছেন। সেই পরম তত্ত্ব বা ঈশ্বরের স্বরূপ কি রকম পরের মন্ত্রে বলা হচ্ছে।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্।।৩/১/৭।।

(*তিনি বৃহৎ এবং দিব্য, প্রকাশশীল অচিন্ত্যস্বরূপ, তিনি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর আবার বহুরূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর থেকেও সুদূরে অথচ এই দেহরই অতি নিকটে – এই জগতে চেতন জীবগণের হৃদয়গুহাতেই তিনি অবস্থিত।*)

বুদ্ধি রূপ গুহায় এই পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। এই যে সত্যের পথ বলা হল এটা তো কোন বাইরের পথ নয় যে হেঁটে হেঁটে চলে যাওয়া যাবে। বাইরে কোথাও যাওয়া হচ্ছে না, নিজের ভেতরেই যাচ্ছেন। সত্যের পথকে অবলম্বন করে এই অভিযান চলেছে আমারই অন্তঃশরীরে হৃদয়গুহায় আত্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। তিনি হলেন অচিন্ত্য রূপ, তিনি দিব্য, তিনি বৃহৎ থেকেও বৃহৎ, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, দূর থেকেও সুদূরে আবার কাছের থেকেও কাছে। গণিতের ইনফিনিটি আর আধ্যাত্মিকতার ইনফিনিটির এটাই তফাৎ। গণিতের অনন্ত মানে যেটা বড় মানে বড়ই। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সব থেকে বৃহৎ আবার সব থেকে সুক্ষ্ম দুটো একই সঙ্গে থাকে। যেখানে এই পথ দিয়ে পৌঁছাচ্ছেন সেটাই *সত্যস্য পরমং নিধানম্*, সত্যের পরম নিধান, যেটা পরম আশ্রয়, মানে ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে। এই মন্ত্রে ব্রহ্মের কি গুণ সেটা বলা হল। একই কথা নানান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয় যাতে আমাদের ধারণা হয়। আত্মতত্ত্বের ব্যাপারে এভাবে বলা না হলে ধারণা করা যায় না, এমনিতেই এই তত্ত্বকে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যম্, সেই ব্রহ্ম যিনি হলেন *সত্যের পরম নিধানম্*, পরম আশ্রয় তিনি হলেন মহান্, দিব্য আর *অচিন্ত্যরূপম্*। তিনি সূক্ষ্মতর থেকেও সূক্ষ্মতর রূপে ভাসমান, তিনি অতি দূরে আবার অত্যন্ত কাছে, যোগীরা ধ্যানের গভীরে তাঁদের হৃদয়গুহাতেই তাঁকে দেখেন, হৃদয়গুহাতেই যেন সেই পরম তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। আমরা যখন বলি আমার শরীর আছে আর শরীরে হৃদয় আছে তখন শরীর আলাদা হৃদয় আলাদা কিন্তু এখানে হৃদয়গুহাতে তিনি যেন লুকিয়ে আছেন বললে এই অর্থ হবে না যে তিনি আলাদা আমার হৃদয় আলাদা আর সেখানে ঢুকে তিনি আমার সাথে লুকোচুরি খেলছেন। বোতলের মধ্যে যেভাবে জল আছে, এই শরীরের মধ্যে যেভাবে আমার হৃদয় আছে ঠিক তেমনি হৃদয়াকাশে ব্রহ্ম জ্যোতি রূপে আছেন, ব্যাপারটা সেই রকম নয়। কারণ ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তুই নেই। কিন্তু যোগীর পরম তত্ত্বের প্রথম অনুভূতিটা ওই জায়গাতে হয়। আমি মনে করছি বেলুড়ে বেলুড় মঠ, বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহ, সেই গর্ভগৃহে ঠাকুর বসে আছেন। ঠিক তেমনি এই ঘরের মধ্যে আমি আছি, আমার শরীর আছে, শরীরের মধ্যে হৃদয়, হৃদয়ের মধ্যে একটা ছোট্ট গুহা, তার মধ্যে সেই পরম তত্ত্ব দিব্য জ্যোতি রূপে বিদ্যমান। আমার মৃত্যুর সময় সেই জ্যোতি বেরিয়ে যাবে। জিনিষটা এইভাবে নয়। আমরা বেশীর ভাগই এই ধরণের ধারণা করে থাকি। এই ধারণাটাকে

কাটানো খুবই কঠিন। যতই আমরা চিন্তন মনন করি ঘুরে ঘুরে এই ধারণাটাই এসে পড়ে। দ্বৈতবাদ এটাই, আমার শরীর আছে, আমার শরীরের মধ্যে একজন আত্মা আছেন। ব্যাপারটা তা নয়, তিনি সব জায়গাতেই ব্যপ্ত হয়ে আছেন। তবে প্রথম অনুভূতিটা এই হৃদয়ের মধ্যেই হয়। এখানে সবাই বসে আছেন, হঠাৎ করে আমি দেখব না যে সবাই একটা জ্যোতির বিন্দু হয় বসে আছে।

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যের কাছে পরম তত্ত্বের কথা শ্রবণ করার পর যখন সাধনা শুরু করছে, সাধনা করে করে মনকে বহির্জগৎ থেকে গুটিয়ে অন্তর্মুখী হতে থাকে, অন্তর্মুখী হয়ে মন স্থির হয়ে যাচ্ছে, মনের মধ্যে এখন আর কোন বৃত্তি নেই তখন এই দিব্যজ্যোতিকে দেখতে পায়। ঠাকুর কত রকম উপমার সাহায্যে এটাকে বোঝাচ্ছেন – মাছ ধরার আগে কত রকমের উদ্যোগ নিতে হয়, চার তৈরী করতে হয়, ছিপ, সুতো, বরশি জোগাড় করতে হয়। তারপর পুকুরের পারে গিয়ে চার ফেলতে হবে, বরশিত খাবার দিয়ে জলে ফেলে পুকুর পারে বসে ফাতনার দিকে পুরো দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রাখতে হবে, কখন ফাতনাটা নড়ে। গভীর জল থেকে যখন মাছ আসবে তখন প্রথমে জলটা নড়বে, তখন তার মন আর কোন দিকে যাবে না।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বিখ্যাত বই The Old Man and The Sea, যার জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এক বুড়ো নাবিক, একটা নৌকা, সমুদ্র আর মাছ আর কিছু নেই, এই চারটি বস্তুকে নিয়ে একটা উপন্যাস দাঁড় করিয়ে দিলেন। এই একটি উপন্যাস দিয়েই আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন সাহিত্য কাকে বলে। এখানেও ঠিক ওই রকম, শেষ পর্যন্ত মাছটাকে ধরে ফেলার আগে পর্যন্ত বুড়ো নাবিকের মনটা ওই মাছেই পড়েছিল। একদিন গেল দুদিন গেল ক্রমশ সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে গেছে, সাত দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এদিকে লোকেদের দুশ্চিন্তা হতে শুরু হয়েছে। শেষে মাছটাকে যখন ধরল তারপর শুরু হলে মাছে মানুষে লড়াই। বিশাল মাছ, নৌকা যত বড় তার থেকেও মাছ বড়। এবার মাছটা যখন ফেঁসে গেল, নৌকা সমেতে টেনে সমুদ্রের অনেক গভীরে নিয়ে চলে গেল। বুড়ো নাবিক কিছু করছে না, ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে, কোথায় টেনে নিয়ে যাবি যা, কতদূর আর যাবি।

এই রকম যখন ঈশ্বরীয় ভাব সাধককে ধরবে তখন তাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে। টেনে নিয়ে যাওয়া পর সাধকের লড়াই শুরু হবে। যখন ওই রকম গভীর ভাবে চলে যাবে তখন সে ওই দিব্যজ্যোতি দেখতে পায়। যদি সে তার ভেতরে ওই ঈশ্বরের জ্যোতিকে দেখার পর ওখানেই থেমে যায় তখন সে হয়ে যাবে ঘোর দ্বৈতবাদী। তারপরেও সাধনার সুতো যদি ছাড়তে থাকে তখন একটা সময় সে দেখে এই জ্যোতিই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান আর সব প্রাণীর মধ্যেকার জ্যোতি যেন এক বিরাট জ্যোতির অঙ্গ বা অংশ। এখানেও যদি সে থেমে যায় তখন সে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হয়ে যাবে। এখান থেকে যদি আবার সে সাধনা করতে করতে এগিয়ে যায় তখন একটা অবস্থায় গিয়ে দেখবে আমার মধ্যে যে জ্যোতি এই জ্যোতিই সর্বব্যাপী, জ্যোতির অনন্ত সমুদ্র। আমার এই জ্যোতি থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে আর এই চৈতন্যই একমাত্র আছেন, তাঁর বাইরে আর কিছু নেই, তখন এটাই অদ্বৈতের অনুভূতি হয়ে যাবে। এগুলো কোন চিন্তা-ভাবনা বা কল্পনা করে দেখছেন না, সাক্ষাৎ এই রকমই আর এই রকমটাই দেখেন। এই মন্ত্রে এই দিব্যজ্যোতি রূপে যে পরম তত্ত্ব বা ব্রহ্মকে দেখছেন তাঁর স্বরূপটা কি রকম বলা হচ্ছে। তিনি বৃহৎ, দিব্য, তাঁর রূপ অচিন্ত্যনীয়, তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, তিনি খুব দূরে আবার সব থেকে কাছে। যেটাকে পাবার সাধন হল নিত্য সত্যবাদী, নিত্য তপস্যা, নিত্য সম্যক জ্ঞান আর নিত্য ব্রহ্মচর্য। মাঝে মধ্যে সত্য কথা বলছে, মাঝ সাঝে ব্রহ্মচর্য পালন করছে, না তা নয় – মন সব সময় সত্যে, তপস্যায়, জ্ঞানে ও ব্রহ্মচর্যে টং হয়ে আছে। এই না হলে হবে না।

এই রকম মুণ্ডুকাটা সাধনা করে যে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় তিনি হলেন *সর্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ*, সব জায়গায় তিনিই ব্যাপ্ত, সেইজন্য তিনি হলেন বৃহৎ, তাঁর থেকে বড় আর কিছু নেই। যিনি সব জায়গাতেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাঁর থেকে বড় আর কি হবে! এই ঘরে একটা জিনিষ রাখা হয়ছে যেটা এই ঘরের সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে তখন এই ঘরে তার থেকে কোন জিনিষই বড় হবে না, যেটাই রাখা হবে তার থেকে ছোট হবে। যত দূর

আমাদের দৃষ্টি যায়, যত দূর আমাদের কল্পনা যায় তত দূর শুধু তিনিই আছেন। সুতরাং তাঁর থেকে বড় আর কিছু হতে পারেনা, 'বৃ' ধাতু থেকে বৃহৎ আবার এই 'বৃ' ধাতু থেকে ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অর্থই হল যিনি সব থেকে বৃহৎ। সব অর্থেই তিনি বৃহৎ, আর সব জায়গাতেই তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। কোথাও এমন জায়গা নেই যেখানে তিনি নেই।

বৃহচ্চ, বৃহৎ চ, 'চ' মানে তিনি শুধু বৃহৎই নন, তিনি *দিব্যম্*। *দিব্যম্* মানে যাঁর স্বয়ংজ্যোতি। জগতে যা কিছু আছে বাইরের আলোতে তার প্রকাশ হয়, আলো না থাকলে কোন কিছুই আমরা দেখতে পারব না, মানে কোন কিছুর প্রকাশ হবে না। কিন্তু তিনি স্বয়ংজ্যোতি, তাঁকে প্রকাশ করার জন্য বাইরের কোন আলোর অপেক্ষা রাখে না। এমনিতে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় সূর্য হল স্বয়ংজ্যোতি। কিন্তু সূর্যেও অনু-পরমানুর নানা রকম ক্রিয়া-বিক্রিয়া হওয়ার ফলে তার মধ্যে অনেক কিছু হতে থাকে। সূর্যের আলো অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। আগামীকাল যদি তার এ্যটমিক রিয়েকশান বন্ধ হয়ে যায় তখন তার আর কোন আলো দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। আগেকার দিনে বলা হয় কিছু কিছু মণি থেকে যে জ্যোতি বেরোয় সেট মণির নিজস্ব জ্যোতি, কিন্তু এখন বিজ্ঞানের দৌলতে জানা গেছে জিনিষটা তা নয়। কিন্তু ঠিক ঠিক স্বয়ংজ্যোতি (Self- Effulgent) বলতে বোঝায় নিজের আলো। একমাত্র ব্রহ্মেরই নিজের আলো। যেহেতু তিনি স্বয়ংপ্রভ, বাকি সব আলো ধার করা আলো, সেইহেতু তিনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। দিব্য শব্দের অর্থ হল নিজস্ব আলো, তার সঙ্গে এর অর্থ হয় ইন্দ্রিয়ের অবিষয়।

এনারা একটা কথা প্রায়ই বলেন আমাদের মন আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই এই জগৎ আলোকিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হলেন স্বয়ংপ্রভ, ফলে মন আর ইন্দ্রিয় এই স্বয়ংপ্রভকে ধরতে পারেনা। ইন্দ্রিয় শুধু প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই ধরতে পারে। আর ব্রহ্মকে মন চিন্তন করতে পারে না তাই ব্রহ্মকে বলা হয় *অচিন্ত্যরূপম্*। সূর্যের আলো, চন্দ্রের আলো, প্রদীপের আলো, বিদ্যুতের আলো এই আলোগুলো যখন কোন বস্তুকে আলোকিত করে তখনই ইন্দ্রিয় সেই বস্তুকে ধরতে পারে। যে জিনিষকে ইন্দ্রিয় ধরতে পারে মন সেটাকেই চিন্তন করতে পারে। ব্রহ্ম হলেন স্বয়ংপ্রভ তাই ইন্দ্রিয় তাঁকে ধরতে পারে না আর মনও তাই চিন্তা করতে পারে না। মন আর ইন্দ্রিয় ব্রহ্মকে কেন চিন্তা করতে পারে না এই যুক্তিটাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্য দিক দিয়ে বলা হয়েছে। তিনি এতই বৃহৎ যে মন তাঁকে চিন্তা করতে পারে না, মন যে জিনিষকে চিন্তা করতে পারে না ইন্দ্রিয় সেটাকে আবার ধরতে পারে না। মূল কথা একই থাকবে, পরম তত্ত্ব মন আর ইন্দ্রিয়ের গোচরের বাইরে।

এক ভদ্রলোক একটা বই লিখে কয়েকজন মহারাজের কাছে দেখাতে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোক একটা বড় কোম্পানীতে চাকরী করেন। বইটির নাম দিয়েছে 'Science and Spirituality'। বইটিতে আবার তিনি নিজের ব্যাপারে লিখছেন Self taught in religion, philosophy and science। একজন মহারাজ তাঁকে বললেন 'দেখুন আমি বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু এটা পরিষ্কার ভাবে আমার জানা আছে যে Religion আর Philosophy তে self taught বলে কিছু হয় না। ধর্ম আর ধর্মের তত্ত্ব সব সময় গুরুর কাছে শিখতে হয়। আর বিজ্ঞানের ব্যাপারে দু-তিনজন বিজ্ঞানীদের জানি যেমন আইনস্টাইন তিনি কিছু কিছু বিজ্ঞানের থিয়োরি বার করলেন, কিন্তু পরে দেখছেন এই থিয়োরির উপরই অন্য একজন বিজ্ঞানী কাজ করে রেখেছেন। রামানুজম্, যিনি এত বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন, তাঁকেও কেম্ব্রিজে গিয়ে একজন গুরুর কাছে গণিতের বিষয়ে শিখতে হয়েছিল। যত দিন উনি কেম্ব্রিজে যাননি তত দিন তিনি মান্যতাই পাননি। তার মানে মোটামুটি বোঝা যায় বিজ্ঞানেও Self Taught হয় না'। তাই যাঁরা নিজে থেকে পড়ে শিখে কিছু লেখেন তাঁদের প্রতি সন্দেহ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। মহারাজ ভদ্রলোককে বইয়ের একটা অংশ দেখিয়ে বলছেন 'আপনি যে এখানে এই Title দিয়েছেন God meets time, এটা তো contradictory কথা হয়ে গেল, ভগবান তো কালেরও পারে, তাহলে ভগবানের সঙ্গে কালের দেখা কি করে হবে। দ্বিতীয় কথা হল, আমাদের শাস্ত্রে বার বার বলছে ঈশ্বর হলেন মন বুদ্ধির পারে। আর বিজ্ঞানের দৌড় বুদ্ধি পর্যন্ত, বুদ্ধিকে ঠেলতে ঠেলতে যত দূর নিয়ে যেতে পারেন, বুদ্ধির যত রকমের আকার দিতে পারেন সবই বুদ্ধির এলাকার মধ্যে, আর

বিজ্ঞানও এই বুদ্ধির এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। .কিন্তু ঈশ্বর শুরু হচ্ছেন বুদ্ধির এলাকার বাইরে থেকে। তাহলে আপনার বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা কি করে মিলবে বলুন তো'। ভদ্রলোকের বইয়ের বক্তব্য হল ঠাকুরের ভাষায় আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে।

যাঁরাই বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাঁরা মূল জায়গাটাকেই ধরতে পারছেন না। বিজ্ঞান মানেই হল বুদ্ধির এলাকা, আধ্যাত্মিকতা শুরু হয় বুদ্ধির এলাকাকে পার করে। তাহলে তোমার বিজ্ঞান আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিলবে কোথায়! হিন্দীতে একটা খুব নামকরা গান ছিল – মেরে সজ্জন উস্ পার, ম্যায় ইস্ পার। আমার প্রিয়তমা আর আমার মাঝখানে একটা নদী, প্রিয়তমা নদীর ওই পারে আর আমি এই পারে, আমাদের মিলন হবে কি ভাবে? বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ঠিক এই একই ব্যাপার। মানে বুদ্ধির এলাকা এই দিকে আর বুদ্ধির বাইরের এলাকা অন্য দিকে মাঝখানে একটা বিরাট নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এই দুটো কোন দিন মিলতেই পারে না। তবে হ্যাঁ বিজ্ঞানের কতকগুলি গুণ আছে যেমন যৌক্তিকতা, একটার পর একটাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে করতে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের সাথে মেলামেশা করলেই বোঝা যাবে তাঁরাও প্রচণ্ড logical। এই যে আমরা মুণ্ডকোপনিষদ নিয়ে এত আলোচনা করছি, এই উপনিষদ আগাগোড়া একেবারে raw spiritualityকে নিয়ে বলে যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোন ধরণের অযৌক্তিক কথাবার্তা পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি বাক্য এক অপরকে অনুসরণ করে চলছে। অথচ কথা বলছে বুদ্ধির পারের কথা, এটাই উপনিষদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা হয় একজন বিজ্ঞানী যদি এক রকম করেন অন্য একজন সেই রকম করতে পারে কিনা, বিজ্ঞান বলবে কেন পারবে না, নিশ্চয়ই করতে পারবে। বিজ্ঞানেরও একটা পরম্পরা আছে, এইসব জায়গাতে এসে বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা মিলে যাবে। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে যদি বলা হয় তখন আধ্যাত্মিকতা হয়ে যায় তত্ত্ব আর বিজ্ঞান হয়ে যায় তথ্য। তত্ত্ব আর তথ্য কি কখন এক হয়! তথ্য সব সময় বুদ্ধির এলাকায় চলে আর তত্ত্ব বুদ্ধির বাইরে চলে। বুদ্ধির বাইরে চলা মানে এলোমেলো সব কিছু? না, কখনই তা নয়। আধ্যাত্মিকতার জন্য একটা আলাদা বুদ্ধির দরকার, সেটা এই বুদ্ধি নয়। এখানে মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের সাত নম্বর মন্ত্রে এটাই বলা হচ্ছে এই স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় আর মনের গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয় আর মনের কাজ হল, এরা যে জিনিষটাকে ধরে নেবে সেই জিনিষটার জ্ঞান আমাদের দিয়ে দেবে। যে জিনিষটা মন আর ইন্দ্রিয়ের থেকে বৃহৎ তাঁকে এরা কি করে ধরবে! কখনই ধরতে পারে না। সেইজন্য বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা কোন দিন মিলতে পারে না। যারাই বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতাকে মেলাতে চাইছে বুঝতে হবে তারা বিজ্ঞানও বোঝে না, আধ্যাত্মিকতাও বোঝে না। কিন্তু বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে যখন অনেক লেখালেখি হয় তখন তাতে এই বিষয়গুলোকে নিয়েই আলোচনা করেন – Methodology, যৌক্তিকতা, কোথায় কোথায় বিজ্ঞানের সাথে আধ্যাত্মিকতার মিল আছে, কোথায় অমিল আছে, এই আলোচনা গুলো যখন করা হয় তখন কেউ আপত্তি করবে না।

অনেক বড় বড় আধ্যাত্মিক পণ্ডিতকেও অনেক সময় বলতে দেখা যায় বলছেন Electron is conscious। যারা মনে করে Electron is conscious তাদের বলতে হয়, হয় আপনি ইলেক্ট্রনকে চৈতন্য দেখুন আর তা নাহলে সব কিছুকেই চৈতন্য দেখুন। যদি কেউ ইলেক্ট্রনকে চৈতন্য দেখেন তাহলে তো তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলেন। এই যে বোতল আছে এটাকে কি আমি চৈতন্য দেখছি? যদি আপনি এই বোতলকে চৈতন্য দেখে থাকেন তাহলে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী। যদি চৈতন্য না দেখে থাকেন তাহলে বোতলকে বোতলই দেখবেন। যিনি বোতলকে চৈতন্য দেখছেন তাঁর কাছে বোতল বলে কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন – দেখছি কোশাকুশিও চৈতন্য। তখন তিনি সব জায়গাতেই ফুল দিয়ে পূজা করছেন। তা নাহলে কোশাকুশি কোশাকুশিই। এগুলোই সমস্যার কারণ, আমরা এখান থেকে কিছু পড়ছি, সেখান থেকে কিছু পড়ছি, বেলুড় মঠেও যাচ্ছি, এই বাবাজী সেই বাবাজীর কাছেও যাচ্ছি। এইভাবে কোনটাই হয় না। মূল জিনিষটাকে বুঝতে গেলে একটি মাত্র বই, একজন মাত্র আচার্য যদি না থাকে তাহলে গোলমাল হবেই হবে। মাস্টারমশাই ব্রাহ্ম

সমাজের কোন সভা থেকে লেকচার শুনে এসে ঠাকুরকে বলছেন – আজকে দূর্গাপূজার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা শুনলাম, মা দূর্গাকে ধরলে লক্ষ্মী আসবেন, মানে টাকা-পয়সা হবে, সরস্বতীও আসবেন, মানে বিদ্যার্জন হবে। ঠাকুর খুব ভালো করে শুনলেন, শোনার পর মাস্টারমশাইকে বলছেন – তুমি যেখানে সেখানে যেও না, এখানেই আসবে। পাঁচজনের কাছে পাঁচ রকম শুনলে নিজের গোলমালটা কোন দিন ধরা পরবে না। কিন্তু যদি শুধু একজনের কাছেই যায়, সেই গুরু আচার্য ভুল হতে পারেন বা অন্য রকম হতে পারেন। ওই গুরুর সাথে থাকতে থাকতে একদিন তার মনে হবে এখানে কিছু গোলমাল আছে। সেদিনই কিন্তু তাকে ছেড়ে সে বেরিয়ে যাবে। এই ছাড়াটা চিরদিনের মত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ একজন ভালো লোকের কাছেও যাচ্ছে সাথে সাথে একটা খারাপ লোকের কাছেও যাচ্ছে সে কিন্তু কোন দিন খারাপ লোককে ছাড়তে পারবে না। সেইজন্য একজনের কাছেই সব সময় যেতে হয়। তখন আস্তে আস্তে একটা সময় পরিষ্কার হতে থাকবে, শাস্ত্রে যে বলছে ঈশ্বর হলেন মন বুদ্ধির পারে এটাই ঠিক। যেটা মন বুদ্ধির পারে সেখানে ইন্দ্রিয় কি করে আর ধরতে পারবে। আমার হাত দিয়ে যখন কিছু ধরব সেটা আমার হাত থেকে ছোট হতে হবে। ইন্দ্রিয় তৈরী হয়েছে তন্মাত্রা দিয়ে, তাই ইন্দ্রিয় তন্মাত্রা পর্যন্ত ধরে নিতে পারবে। বুদ্ধি আবার পাঁচটি তন্মাত্রার সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরী, তাই বুদ্ধির ক্ষমতা অনেক বেশী। এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী ফলে ওই তত্ত্বটাকেই শুধু ধরতে পারে। কিন্তু মন বুদ্ধি পাঁচটা তত্ত্ব দিয়েই তৈরী, ফলে ইন্দ্রিয়ের থেকে তার পাঁচ গুণ ক্ষমতা বেশী হওয়ার জন্য পাঁচটাকেই এক সঙ্গে ধরতে পারে। শুধু পাঁচ গুণ শক্তিশালী নয়, পাঁচ গুণ ক্ষমতা হওয়ার জন্য সবটাই তার এলাকার মধ্যে চলে আসে। কিন্তু যেটা সত্ত্ব, রজো আর তমো সেটাকে কি করে ধরতে পারবে, এই তিনটে গুণ তো তার এক্তিয়ারের বাইরে চলে যায়। স্বয়ংপ্রভ আবার সত্ত্ব, রজো আর তমেরও পারে। সেইজন্য মন বুদ্ধির পক্ষে সম্ভবই নয় তাঁকে ধরার।

স্বয়ংপ্রভর সাথে তিনি আবার *সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি*। আকাশ তন্মাত্রাকে আমরা সব থেকে সূক্ষ্ম বলে জানি, আমরা যে মাথার উপরে নীল আকাশ দেখছি এটা সেই আকাশ নয়, আকাশের পার্টিকেলস্। আকাশ থেকে কম সূক্ষ্ম বায়ু, বায়ুর পার্টিকেলস্ আকাশের পার্টিকেলস্ থেকে একটু বড়। এগুলো আমাদের ঋষিরা এইভাবে দেখেছিলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় যেমন বলা হয় ইলেক্ট্রন প্রোটন ইত্যাদি। এখন ইলেক্ট্রন প্রোটন থেকেও সূক্ষ্ম জিনিষ বেরিয়ে গেছে যাকে বলছেন কোয়ার্ক। আবার কোয়ার্কের পেছনেও নাকি ইদানিং স্ট্রিং থিয়োরি এসে গেছে। বলছেন তুমি যেটা সব থেকে সূক্ষ্ম বলে জান, যেটা দিয়ে বাকি সব কিছু তৈরী হয়েছে, এই পরম তত্ত্ব তার থেকেও বেশী সূক্ষ্ম। তাহলে এই পরম তত্ত্ব তারও ভেতরে অবস্থিত। এখানে অনুর কথা বলা হচ্ছে, যেমন বাতাসের কিছু অনু আছে যার জন্য সুগন্ধ দুর্গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে আমাদের নাসিকাতে অনুভূত হচ্ছে। যেটা সব থেকে সূক্ষ্ম তিনি তার ভেতরেও বিদ্যমান। তার সঙ্গে তিনি সূর্য, চন্দ্র, তারাদি নানান রূপে ভাসিত হচ্ছেন, এটাকেই বলছেন বিভাতি। একদিকে তিনি এত সূক্ষ্ম যে আমরা যেটাকে সব থেকে সূক্ষ্ম কল্পনা করতে পারি, তিনি তার মধ্যেও বিদ্যমান, অর্থাৎ পরম তত্ত্ব তার থেকেও সূক্ষ্ম। আবার অন্য দিকে তিনি বৃহৎ, তাঁর থেকে বৃহৎ আর কেউ নেই। এটাকে মেলাচ্ছেন কিভাবে? যিনি আত্মা তিনিই এই সূর্য, চন্দ্র, তারকাদি হয়েছেন, তিনিই মানুষ, জীব জগৎ গাছপালা হয়েছেন, তিনিই স্থাবর জঙ্গম যা কিছু আছে সব হয়েছেন। এগুলো কোন কল্পনাপ্রসূত বর্ণনা নয়। ঠাকুর বলছেন – আমি যা দেখেছি সেটা কোন কল্পনা করে নয়, চিন্তা করেও নয়, এ রকমটিই দেখেছি।

আবার যারা অজ্ঞানী, অজ্ঞানী মানে যারা নিজের স্বরূপকে জানে না, তাদের জন্য এই ব্রহ্ম অত্যন্ত অগম্য। অজ্ঞানীরা ব্রহ্মকে জানতে পারে না, তাদের পক্ষে ব্রহ্মকে জানা অসম্ভব। বাংলার এক খুব নামকরা লেখক কিছু দিন আগে তাঁর একটা লেখাতে বলছেন তিনি নাকি প্রমাণিত করে দিয়েছেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ঈশ্বর বলে কিছু নেই আর মৃত্যুর পরে কিছু নেই এটাকে প্রমাণিত করে দেওয়াতে আশ্চর্যের কি আছে! এতো আমরাও বুঝতে পারছি। আমাদের যাঁরা আরাধ্য পুরুষ ঠাকুর, স্বামীজী, তাঁদেরও শরীর চলে গেছে, কিন্তু কই তাঁরাও তো আর কেউ ফেরত আসেননি। আমার আপনার বংশে যে কজন মারা গেছে তাদের কেউই তো

ফেরত আসেননি। এটা তো আমরাও দেখতে পারছি। মৃত্যুর পর যে কিছু নেই সেতো এমনিই দেখা যাচ্ছে, এই সাধারণ একটা জিনিষকে প্রমাণিত করার জন্য এত বড় নামকরা লেখকের বুদ্ধির কি দরকার! ধরুন আইনস্টাইনের মত একজন এত বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব যদি বলেন খিদে পেলে খেতে হয়, তখন এটা কি বিরাট বড় দামী কথা হয়ে যাবে? একটা ছাগল গরুরও যদি খিদে পায় সে খাবারের দিকে দৌড়ে যাবে। ছোট্ট শিশু খিদে পেলে সেও কেঁদে ওঠে। এটা বোঝার জন্য আইনস্টাইনের মত একজন বিজ্ঞানীর বুদ্ধির কি দরকার! বিজ্ঞানীরা বলবেন বিশেষ কিছু। আপনি যে বলছেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই, সেতো আমিও দেখতে পারছি ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এটা বলার জন্য অত বড় লেখকের কি দরকার। হরিদ্বার হৃষিকেশে একজন মহাত্মা প্রবচন দিতেন, সেখানে আরেকজন মহাত্মা এসে বললেন 'আমি অনেক শাস্ত্র পড়ে বিচার করে দেখলাম এটাই সিদ্ধান্ত যে দ্বৈতই একমাত্র সত্য'। তখন সেই মহাত্মা এই দ্বৈতবাদী মহাত্মাকে বলছেন 'তা তুমি কি এমন বিরাট তীর মেরে এলে! একটা গরুর কাছেও দ্বৈতটাই সত্য, সেও ভালো করে জানে আমি আলাদা আর এই ঘাস আলাদা। দ্বৈতই সত্য এটাক বোঝার জন্য শাস্ত্র পড়ার কি দরকার! আপনার বক্তব্যটা কি বলুন। যদি আপনি এমন কিছু জানেন যেটা সত্য আর যেটা আমি জানিনা। তবেই তো আমি আপনার কাছে আসব'।

কথামৃত আমরা কেন পড়ি? কারণ কথামৃতে এমন একজন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন যে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আমরা আমাদের জাগতিক জীবনে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞ। আর তিনি জাগতিক জীবনের যে কথাগুলো বলছেন সেটাও ওই জিনিষগুলোর ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতাকে দূর করার জন্য বলছেন। যারা বিজ্ঞান পড়ছে তারাও ঠিক একই কারণে পড়ছে, যে জিনিষগুলো তারা স্বাভাবিক ভাবে জানে না সেই জিনিষগুলোকে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। এখন যুক্তিবাদীরা যদি যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত করে দেয় ঈশ্বর, পুনর্জন্ম এগুলো কিছুই নেই। তাতে সে কি এমন করে দিল! সেতো আমি আপনিও দেখতে পারছি যে ঈশ্বর বলে কিছু দেখছি না, আর পুনর্জন্মকেও তো দেখছি, যে মারা যাচ্ছে সে আর ফিরে আসছে না, এর জন্য আলাদা করে বই লেখার কি দরকার। আইনস্টাইন যখন থিয়োরি অফ রেলিটিভিটি লিখে জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন, নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, তারপর তিনি জার্মান থেকে বিদায় নিয়ে আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে চলে গেলেন। হিটলার তখন বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীদের দিয়ে একটা বই লেখালেন, যে বইয়ের নাম দেওয়া হল 'Why hundred scientists believe that Theory of Relativity is wrong'। আইনস্টাইনের কাছেও বইটা পাঠান হয়েছিল, কিন্তু তিনি বইটা খুলেও দেখলেন না। আইনস্টাইনকে সবাই জিজ্ঞেস করছেন 'আপনি একবারও বইটা পড়ে দেখলেন না যে, একশ জন বিজ্ঞানী কেন মনে করছেন থিয়োরি অফ রিলেটিভিট ভুল'! আইনস্টাইন তখন খুব সুন্দর বলছেন 'আমি যদি ভুল হতাম তার জন্য একজন বিজ্ঞানীই যথেষ্ট'। এর অর্থটা কি? তুমি তো সেটাই বলছ যেটা তুমি তোমার চোখে দেখছ, তোমার বুদ্ধি দিয়ে দেখছ। আমি যখন একটা জিনিষকে উপলব্ধি করেছি, সেই উপলব্ধিকে যখন আমার বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়েছি, সেটা তখন হয়ে যাবে সাধারণ বুদ্ধির বাইরের কথা। তুমি যেটা বলছ সেতো সবাই জানে, নতুন কিছু বলছ না। কেউ যদি বলে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি সত্য নয়, এটা খুব জটিল, তখন তা কোন আশ্চর্যের কথা হবে না। যদি থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি সত্য হয় তাহলে সেটাই আশ্চর্যের হবে। যদি কেউ বলে ঈশ্বর নেই, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, সেতো আমরাও জানছি, দেখছি, বুঝছি ঈশ্বর বলে কিছু নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তুমি যদি দেখতে চাও তো আমি তোমাকেও দেখাতে পারি। তখন এটাই হবে আশ্চর্যের কথা আর শোনার মত কথা। ঠাকুরের এত দাম কেন? কারণ তিনি এমন একটা বিষয়ে কথা বলছেন যেটা সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না, বুঝতে পারেনা। কিন্তু তিনি বলছেন আমি নিজে দেখেছি তোমাকেও দেখাতে পারি। এটাই ব্যাতক্রমী কথা। যেটা অস্বাভাবিক মানুষ সেটাকেই জানতে চায়, যেটা আমার কাছে এমনিতেই স্পষ্ট সেটাকে আমি কেন আলাদা করে জানতে যাব। খিদে পেলে সবাই খায় এই নিয়ে যদি কেউ একটা বই লেখে, এই বই নিয়ে আমরা কি করব!

এখানে বলছেন অজ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান অনেক দূরে, তাদের ব্রহ্মজ্ঞান কোন দিন হবে না। অন্য দিকে যাঁরা বিদ্বান, এখানে বিদ্বান বলতে বোঝাচ্ছেন যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁদের কাছে ব্রহ্ম সব থেকে কাছে। আচার্য এই ব্যাপারটার উপর খুব জোর দেন। যেখানেই এই বিষয়টা আসবে, তিনি অনেক দূরে আবার অনেক কাছে, আচার্য সব জায়গায় এর ব্যাখ্যা ঠিক এই ভাবেই করেন। এমনিতে অনেক ভাবে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমন একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, আমার শরীরে তিনি সব থেকে কাছে আছেন, আবার যত দূরেই চলে যাই না কেন সব জায়গাতেই তিনি আছেন, সেইজন্য তিনি সব থেকে দূরে আবার সব থেকে কাছেও। এই ব্যাখ্যা দিলে তখন আবার প্রশ্ন হতে পারে আমি বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে? তখন শরীর আমি হলে আমার হাত সব থেকে কাছে। কিন্তু আচার্যের মেধা হল একেবারে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর, তিনি তাই এর উপর একটা শর্ত লাগিয়ে দিচ্ছেন – যিনি বিদ্বান, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি দেখেন তাঁর নিকটতম বস্তু হলেন আত্মা। কারণ তিনি আত্মা ছাড়া কিছুই দেখেন না, আত্মার বাইরে অন্য কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, তাই আত্মা তাঁর সব থেকে নিকটতম। আর যারা অজ্ঞানী তাদের কাছে সব থেকে দূরের জিনিষ ঈশ্বর। অজ্ঞানীদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। আমরা বলতে পারি অনেক দূরে যে তারা বা নক্ষত্র আছে তাদের খবর আমরা পাচ্ছি না, এই ব্রহ্মাণ্ডের সীমানার ওপারের ব্যাপারে আমরা একেবারেই অজ্ঞ, আর ঈশ্বরকে তো মানিই না। সেইজন্য ঈশ্বর সব থেকে দূরের হয়ে গেলেন। আচার্য তাই বলছেন অজ্ঞানীদের জন্য আত্মা অত্যন্ত দূরে আর অত্যন্ত কাছে যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, বিদ্বান পুরুষ তাঁদের জন্য।

পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্ম সর্বত্র সর্বব্যাপী, সব জায়গাতে তিনিই আছেন। এই জিনিষটাকে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের বোঝাবার জন্য পুরানে প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশ্যপু আর ভগবান বিষ্ণুর কাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রহ্লাদ তাঁর বাবাকে বলছিলেন ভগবান বিষ্ণু সর্বত্র বিদ্যমান, সব কিছুর মধ্যে তিনি প্রকৃষ্ট রূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তখন প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশ্যপু প্রহ্লাদকে বলছেন 'তোমার বিষ্ণু এই থামের মধ্যেও আছে'? প্রহ্লাদ বলছেন 'হ্যাঁ, তিনি এই থামের মধ্যেও আছেন'। 'দেখি এই থামের মধ্যে কেমন বিষ্ণু আছে'। বলে তিনি থামকে ভেঙে দিলেন। ভেঙে দিতেই সেখান থেকে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহ রূপ ধারণ করে বেরিয়ে এসেছেন। কাহিনীর মূল বক্তব্য কি? ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত কই আমরা তো তাঁকে কোথাও দেখতে পারছি না! সেইজন্য বলা হয় যদিও তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত কিন্তু তুমি তাঁকে এভাবে দেখতে পারবে না। আকাশ যে কিনা সব থেকে ছোট অনু তারও ভেতরে তিনি আছেন। কিন্তু তাঁকে কোথায় দেখা যায়? আচার্য বলছেন – *ইহ পশ্যৎসু চেতনাবৎস্বিত্যেতৎ নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়াবত্ত্বেন তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সন্ন লক্ষ্যতে* – যারা চেতনবান প্রাণী তাদের মধ্যেই এই পরম তত্ত্বকে খোঁজা যায়। ঈশ্বর কোথায় আছেন? সব কিছুতে আছেন – ইট, পাতা, কাঠ, পাথর যত জড় পদার্থ আছে, যত এ্যটম, মলিক্যুলস আছে তার সব কিছুতেই আছেন, কিন্তু তাঁর প্রকাশের তারতম্য হয়ে যায়। অনেক বড় বড় দার্শনিকদেরকেও দেখা যায় তাঁরা আচার্য শঙ্করের ভাষ্যাদির উপর কিছু লিখতে গিয়ে আচার্যকে নিয়ে অনেক রকম বিরূপ কথাবার্তা বলেন। কিন্তু চৈতন্যের প্রকাশের তারতম্যের কথা ঠাকুর বার বার বলছেন। আচার্য শঙ্করও ঠিক একই কথা বলছেন। আচার্যের কথার সাথে ঠাকুরের কথার কোন তফাৎ নেই। ঠাকুর বলছেন বাবুর জমিদারি, জমিদারির সবটাই বাবুর কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তাঁকে বেশী পাওয়া যায়। আচার্যও বলছেন তিন সর্বত্র, ছোট্ট বালিকণার মধ্যে যে আকাশ তাতেও তিনি আছেন, তবে যত প্রাণী আছে, কুকুর হোক বেড়াল হোক, মানুষ হোক, তাদের যে ক্রিয়াবৎ রূপ, মানে তাদের যে চোখের চাহনি, তাদের হাঁটাচলা, তাদের অন্যান্য যে ক্রিয়াকলাপ আছে তার মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তার মানে, জীবিত প্রাণীর ক্রিয়ালাপের মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশী। এই প্রাণীই যখন মারা যাচ্ছে তখন তার মধ্যে আর সেই চৈতন্য সত্তার প্রকাশকে দেখা যাবে না। চৈতন্য সত্তা ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু সব জায়গায় এই চৈতন্য সত্তাকে দেখা যায় না, একমাত্র জীবিত প্রাণীদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই চৈতন্য সত্তার উপস্থিতি পরিলক্ষিত করা সম্ভব। যুক্তিবাদী বা যারা ভৌতিকবাদী তারাও যখন কথা বলে তখন এই চেতনাকে নিয়ে কথা বলে। মানুষের মধ্যে চেতনা আছে, কুকুর বেড়ালের মধ্যে চেতনা আছে। কেন চেতনা আছে বলছে? এদের ক্রিয়া আছে বলে। একটা প্রাণীর ক্রিয়া দিয়ে বোঝা

যাচ্ছে এর মধ্যে চৈতন্য আছে অথচ চৈতন্য সব জায়গাতেই বিদ্যমান। *পশ্যৎস্বিহৈব* বলতে এটাই বোঝাচ্ছে, চৈতন্য সব জায়গাতেই আছে কিন্তু সাধারণ মানুষ এমনকি যোগীরাও তাঁর চৈতন্যের প্রথম অনুভূতিটা নিজের হৃদয়ে পাচ্ছেন। আমি যখন এই বোতল দেখছি আর আপনাকেও দেখছি তখন আমার ভেতর থেকে কে যেন বলছে এই মানুষটি চৈতন্যাবান আর এই বোতলটা জড়। আমরা মনে করতে পারি ছোটবেলা থেকেই আমরা এই প্রশিক্ষণ পেয়ে বড় হয়েছি যে এটা জড় আর মানুষ চৈতন্যবান। যাই প্রশিক্ষণ হয়ে থাকুক, কিন্তু মূল কথা হল জীবিত প্রাণীর নানা রকমের ক্রিয়া দিয়ে চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায়। আর যোগীরা ধ্যানের গভীরে এই চৈতন্যকেই বুদ্ধির গুহাতে পরিষ্কার দেখেন। হৃদয় আর বুদ্ধি একই, কখন বুদ্ধি শব্দ ব্যবহার করা হয় আবার কখন হৃদয় শব্দ দিয়ে বলা হয়।

মজার ব্যাপার হল প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে এই চৈতন্য রয়েছে *তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সন্ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ*, অবিদ্যা তাকে এমন ভাবে ঢেকে রেখেছে যার জন্য অজ্ঞানীরা তাঁকে কোন দিন দেখতে পারবে না। আমার যে হৃদয়াকাশ, আমার যে বাস্তবিক সত্তা, আমার যে বুদ্ধিরূপ গুহা তার মধ্যে তিনি নিত্য বিদ্যমান। আমার যত রকমের ক্রিয়া চলছে তিনি আমার ভেতরে আছেন বলে, আমি যে প্রাণী তিনি আছেন বলে। কিন্তু আমি দেখতে পারছি না কেন? কারণ আমি অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। যোগীদের অবিদ্যা নাশ হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে নিজের ভেতরেও দেখেন আবার অপরের ভেতরেও দেখেন। কিন্তু আসল কথা হল, তিনি যে শুধু প্রাণীদের মধ্যেই আছেন তা নয়, সূক্ষ্মতম যে আকাশ তার ভেতরেও তিনিই রয়েছেন, তিনিই বিশ্ব চরাচর জুড়ে যা কিছু আছে সব কিছুতে ওতোপ্রোত হয়ে আছেন। তবে প্রকাশের তারতম্য আছে। এই তারতম্য অনুসারে তিনি জীবিত প্রাণীর মধ্যে বেশী প্রকাশিত হচ্ছেন। জীবিত প্রাণী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনও তার মধ্যে ক্রিয়া চলতে থাকে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি শুয়ে আছেন। জীবিত প্রাণীর শরীর থেকে যখন সেই চৈতন্য বেরিয়ে চলে যায় তখন তার মৃত্যু হয়। জ্ঞানীরা দেখতে পান এই প্রাণীর থেকে চৈতন্য বেরিয়ে যাচ্ছে। যারা বিমূঢ় তারা এটাকে দেখতে পায় না। এটাই গীতাতে ভগবান বলছেন *উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুসাঃ।।* গীতা উপনিষদ সব মন্ত্র একটার সাথে আরেকটার যোগ রয়েছে। সবই তো খুব ভালো বুঝলাম, তিনি সর্বত্র, কিন্তু প্রাণীর মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশী দেখা যায় কিন্ত আমি কি ভাবে তাঁকে জানব, তাঁকে দেখতে পারব তার ব্যাপারে কি কোন উপায় আছে? তখন উপনিষদের ঋষি বলে দিচ্ছেন কি সাধন করলে এই চৈতন্যকে জানা যায় বা দেখা যায়। পরের মন্ত্রে এই সাধনার কথা বলছেন –

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।।৩/১/৮।।

(চক্ষু দ্বারা ব্রহ্ম গ্রাহ্য হন না, বাক্য দ্বারাও নয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা, তপস্যা দ্বারা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারাও ব্রহ্ম অনুভূত হন না। যিনি জ্ঞানের নির্মলতা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হয়েছেন এমন সতত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন।)

ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ নিরাকার, নিরবয়ব। নিরাকার যদি না হন তিনি একই সাথে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আবার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে পারবেন না। এই যে বললেন একদিকে তিনি আকাশ তত্ত্বের মধ্যেও আছেন অন্য দিকে আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও আছেন, তার মানে তাঁর কোন আকার নেই। ঠিক তেমনি তাঁর কোন গুণও নেই, গুণ থাকলে ধর্মও এসে যাবে, তখন সব জিনিষের সঙ্গে তিনি থাকতে পারবেন না। তাই বলছেন তাঁর কোন আকার নেই তাঁর কোন রূপ নেই, গুণ নেই। ফলে *ন চক্ষুষা গৃহ্যত*, চোখ দিয়ে কেউ তাঁকে দেখতে পারবে না। আমরা যে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলি কখনই তা এই চোখ দিয়ে হয় না। গীতায় অর্জুনকেও ভগবান

বলছেন এই চোখ দিয়ে তুমি আমার এই পরমেশ্বরীয় দিব্য রূপ দেখতে পারবে না, তাই *দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ* তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। *নাপি বাচা*, কেউ কোন কিছুর বর্ণনা করার সময় আমরা যেমন বলি তুমি ভুলভাল বকছ, তখনও কিন্তু ওই জিনিষটাই হচ্ছে, তার মন ওই জিনিষটাকে ভুলভাল ভাবেই ধরেছে, তবেই সেটা বাণী দিয়ে বেরোচ্ছে। কম্প্যুটারে যখন কোন প্রোগ্রামিং করা হয়, তখন আউটপুটা যাই হোক, ভুল হোক ঠিক হোক, তার পেছনে প্রোগ্রাম থাকতে হবে। প্রোগ্রাম যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আউটপুট বলেও কিছু আসবে না। আমি ঠিক কথাই বলি বা ভুল কথাই বলি তার পেছন মনের বৃত্তি যে বিষয়কে ধরেছে সেটা থাকতে হবে। কিন্তু ব্রহ্মের তো কোন আকারই নেই, মন তাহলে ধরবে কি করে তাকে। মন যেটাকে ধরতে পারবে না তাকে সে আর বাণী দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তাই বলছেন ব্রহ্মকে বাণী দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাহলে কি করে প্রকাশ করে? বিপরীত কথা দিয়ে বলা হয় – এটাও আছে ওটাও আছে, অনু থেকে অনু আবার বৃহৎ থেকেও বৃহৎ, অতিদূরে আবার অতি কাছে। এই ধরণের বিপরীতাত্মক কথা দিয়ে একটা ধারণা করানর চেষ্টা করা হয়।

ন অন্যৈঃ দেবৈঃ, দেব মানে দ্যোতনা, যে কোন বিষয়কে যিনি আলোকিত বা প্রকাশিত করেন। আমি যদি চোখ বন্ধ করে রাখি তখন সামনের কোন কিছুই জানতে বা দেখতে পারব না। যেই আমার চোখটা খুলে দিলাম তখন সব কিছু আমার সামনে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। আমি দুটো কানকে যদি তুলো দিয়ে ঠেসে বন্ধ করে রাখি তাহলে আমি কোন শব্দ শুনতে পারব না। আমার নাক যদি বন্ধ থাকে দুর্গন্ধ সুগন্ধ কোনটাই বুঝতে পারব না। আমার চর্মের স্পর্শ শক্তি যদি চলে যায় ঠাণ্ডা গরম, নরম, শক্ত, ব্যাথা, আরাম কোন কিছুরই অনুভূতি হবে না। তাহলে এই জগৎকে কে আলোকিত করছে? এই ইন্দ্রিয়গুলো। তাই ইন্দ্রিয়ের আরেকটি নাম দেব, দ্যোতনা। এই ইন্দ্রিয়গুলো এই জগৎকে আমার কাছে প্রকাশিত করতে সাহায্য করছে। এখান থেকে পরে এক একটি ইন্দ্রিয়ের এক একজন অধিষ্ঠাত্রি দেবতা এসে গেলেন। আমরা একটা জিনিষকে কিভাবে দেখে থাকি? বিজ্ঞান বলছে জিনিষটার উপর আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সেই ছবির প্রতিফলন চোখের রেটিনাতে এসে একটা রূপ নিচ্ছে, সেই রূপটা মস্তিষ্কের নার্ভ সেন্টারে যাচ্ছে তারপর আমি জিনিষটাকে জানতে পারছি। বেদান্ত কিন্তু কোন জিনিষকে জানার বিজ্ঞানের এই পদ্ধতিকে মানবে না, বেদান্তের জানার পদ্ধতি পুরোপুরি আলাদা।

বস্তুটাকে দেখছি বাইরে কিন্তু ইমেজটা তৈরী হচ্ছে মস্তিষ্কে। এই সমস্যা বেদান্তীদের কাছেও এসেছিল। বিজ্ঞানের থিয়োরিতে এই সমস্যার সমাধান খুব জটিল ভাবে করা হয়। বেদান্তীরা বলেন, আমাদের ভেতরে আত্মাই আছেন, তাঁর প্রকাশ বুদ্ধিতে গিয়ে পরে। যার ফলস্বরূপ বুদ্ধি পেয়ে গেল আত্মারই একটা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই আবার চোখের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। বস্তুর ইমেজ যখন চোখের মাধ্যমে আমার মস্তিষ্কে এসে পড়ল তখন সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি থেকে চৈতন্যের আলো বেরিয়ে এসে বস্তুটিকে ধরে নেয়। হাত বাড়িয়ে যেমন আমি বুঝে নিচ্ছি এটা বোতল, এটা গ্লাশ ঠিক তেমনি আমাদের যে অগ্নি তত্ত্ব আছে এই চৈতন্য সেই অগ্নি তত্ত্বের মাধ্যমে বেরিয়ে গিয়ে বস্তুটিকে মেপে ফেলে। মেপে নেওয়ার পর পেছনে যিনি আত্মা আছেন তিনি জেনে যাচ্ছেন এটা এই বস্তু। কি করে বুঝছি, আমার চৈতন্যটা বেরিয়ে গিয়ে ওই বস্তুটাকে ধরে নিচ্ছে। যখন কোন শব্দ এসে আমার মনকে ধাক্কা দিচ্ছে তখন ওই চৈতন্যটাই কানের মাধ্যমে বেরিয়ে এসে ধ্বণির আকারটাকে নিয়ে বুঝে নেয় এটা হল এই বস্তুর ধ্বণি। চোখের ক্ষেত্রে চৈতন্য অনেক দূর পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়, কিন্তু ধ্বণির ক্ষেত্রে কান থেকে চৈতন্য সামান্য দূর পর্যন্ত যেতে পারে। ধ্বণির ক্ষেত্রে মোটামুটি বলে দেওয়া যায় এই শব্দটা দূর থেকে আসছে নাকি কাছ থেকে আসছে। কিন্তু ঠিক ঠিক কোথা থেকে আসছে বলতে পারা যাবে না। নাসিকার ক্ষেত্রে একেবারে কাছে না আনলে ধরতে পারেনা। যার জন্য নাকে কোন গন্ধ এলে গন্ধ শুঁকে আমি বলতে পারব না এই গন্ধটা কত দূর থেকে আসছে বা এই গন্ধের উৎসটা কোথায়। জিহ্বার ক্ষেত্রে আরও কাছে আনতে হবে, আর ত্বক কখনই বেরোবে না ওটা ওখানেই পড়ে থাকবে, তার মানে যতক্ষণ না স্পর্শ করা হচ্ছে ততক্ষণ চৈতন্য সত্তা ত্বকের মাধ্যমে কাজ করবে না।

তাহলে একটা জিনিষকে আমি কিভাবে জানছি? যে জিনিষটাকে জানছি সেই বস্তুটাকে আলোকিত আমিই করছি। কিভাবে আলোকিত করছি? আমার চক্ষুর মাধ্যমে আমার চৈতন্য বেরিয়ে গিয়ে আলোকিত করছে। তাই চক্ষু হল দেবতা, এই চক্ষু না থাকলে আমি কোন দিন জানতে পারব না এই জিনিষটা কেমন, এই লোকটিকে দেখতে কেমন। বাকি সব কিছু থাকলেও আমি কোন দিন জানতে পারবো না জিনিষটা কেমন, সেইজন্য চক্ষুকে বলছেন দেবতা। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই এক একটি দেবতা, সেইজন্য বলছেন *দেবঃ*। একটা জিনিষকে জানার যে পদ্ধতি বেদান্তের এটি একটি বিশাল স্বতন্ত্র বিষয়। যুক্তিবাদীরা বা ভৌতিকবাদীরা বলতে পারে এই তত্ত্বতো বিজ্ঞানের সাথে মিলছে না। বেদান্ত বলবে, নিকুচি করেছে বিজ্ঞানের সাথে মিলছে কি মিলছে না। ঋষিরা কি বিজ্ঞানের এগুলো জানতেন না নাকি? ঋষিরা সারাদিন সারারাত এই ধরণের সমস্যা নিয়েই থাকতেন, সেইজন্য ওনাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোন ধরণের অযৌক্তিক কিছু পাওয়া যায় না। যাঁরা এগুলোকে নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা এটাকে নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

ঋষিরা কিন্তু স্থূল ভাবে কোন জিনিষকে দেখা নিয়ে কোন আলোচনা করছেন না, তাঁরাও খুব ভালো করেই জানতেন আলো যদি না থাকে কোন কিছুই দেখা যাবে না। কিন্তু যখন দেখার কথা চলছে তখন তাঁরা আলো শব্দকেই আনছেন না। কারণ তাঁরা জেনেই নিয়েছেন আলো আছে বলে বস্তুর ছবি আমার চোখে আসছে, এগুলো মেনেই চলছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি আপনাকে জানছি কি করে। এখানে জানার ব্যাপারকে নিয়ে বলছেন! এখন বিজ্ঞানে নিউরো বিজ্ঞানীরা, অপটিকস্ বিজ্ঞান দিয়ে নানা রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে আসবে। কিন্তু আমাদের কাছে সিদ্ধান্ত খুব সোজা – চৈতন্য সত্তা ভেতরে আছেন, যেমন আলো বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে বাইরে বিচ্ছুরিত হয়, ঠিক তেমনি চৈতন্য সত্তার আলো চক্ষু থেকে, কান থেকে, নাক থেকে, জিহ্বা থেকে ও ত্বক দিয়ে বাইরে যাচ্ছে। ত্বক দিয়ে খুব সামান্যই বাইরে যায়, ত্বকের খুব কাছাকাছি এনে স্পর্শ না করালে সে বুঝতে পারবে না। জিহ্বার ক্ষেত্রেও তাই, না ঠেকালে বুঝতে পারবে না জিনিষটা কি রকম। নাকের ক্ষেত্রে সামান্য একটু যেতে পারে, গন্ধটুকু আন্দাজ করতে পারে। কানের ক্ষেত্রে একটু বেশী আর চক্ষুর ক্ষেত্রে অনেক দূর যেতে পারে। চৈতন্য সত্তার আলো এই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে তাদের বিষয়কে আলোকিত করছে। যেমন বস্তুর উপর আলো পড়লে বস্তুকে আমরা দেখতে পারি, ঠিক তেমনি আত্মজ্যোতি বাইরে বেরিয়ে একটা বস্তুকে ঘিরে ফেলে তখন সেই বস্তুকে জানতে পারে, তাই ইন্দ্রিয়গুলোকে বলা হয় দেব। দেব মানে যিনি দ্যোতন করেন বা আলোকিত করেন, আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই জগৎকে আলোকিত করছে। বাইরের আলোর সাহায্যে আলোকিত করছে না, তার নিজের ভেতরের আলোকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বস্তুকে ধরে ভেতরে নিয়ে আসে।

এখানে বলছেন *নান্যৈর্দেবৈঃ*, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই আত্মতত্ত্বকে জানা যাবে না, শুধু যে চোখ দিয়েই জানা যাবে না তা নয়, কান দিয়েও জানা যাবে না। *তপসা*, তপস্যা দিয়েও ব্রহ্মকে জানা যাবে না। কেন জানা যাবে না? জগতে হেন জিনিষ নেই যেটা তপস্যা দিয়ে পাওয়া যাবে না। যেমন বলছেন *ছাত্রানাং অধ্যয়ণং তপঃ*, ছাত্রদের জন্য অধ্যয়ণই তপস্যা, তুমি যদি বিদ্যার্জন করতে চাও তপস্যা কর। তোমার টাকা চাই, তপস্যা কর, অমুক শত্রুকে নির্মূল করতে চাও, তপস্যা কর। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান তপস্যা দিয়েও হবে না। এই জগতে যা কিছু আছে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়, কদাচিৎ যদি ইন্দ্রিয় দিয়ে না জানা যায় সেখানে মন দিয়ে জানা যায়। আর *কর্মণা বা*, বিভিন্ন রকমের যত কর্ম আছে কোন কর্ম দিয়েও আত্মতত্ত্বকে জানা যাবে না। এখানে কর্ম মানে নানা রকমের বৈদিক কর্ম, অগ্নিহোত্রাদি কর্মের কথাই বলা হচ্ছে। মন আর ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যাবে না। তাহলে তপস্যা কর, কিন্তু তপস্যা হল মনের তাই তপস্যা দিয়েও হবে না। কর্ম হল বাহ্যিক তাই কর্ম দিয়েও হবে না। কর্ম বাহ্যিক তপস্যা আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি অন্তঃতপস্যা, বাহ্যাভ্যন্তরতপস্যার কথাই বলা হচ্ছে, কর্মটাও একটা তপস্যা। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম যখন করা হয় তখন তার আনুষাঙ্গিক দ্রব্য সামগ্রী জোগাড় করা হচ্ছে, আসনে বসতে হচ্ছে, এও এক প্রকার সাধনা। যখন গরীবের সেবা করা হচ্ছে সেটাও সাধনা। আবার ধ্যানের গভীরে গিয়ে মনকে সংযম করা হচ্ছে তখন সেটাও তপস্যা। যখন বাইরে তপস্যা হয় তখন সেটা হয়ে

যায় কর্ম। বাইরে যে যজ্ঞাদি রূপ কর্ম হচ্ছে আর ভেতরে যে সাধনা করা হয় এই দুটোকে আলাদা করার জন্য একটাকে বলা হয় কর্ম আরেকটাকে বলা হয় তপস্যা।

কর্মের আবার অনেক রকম বিধি নিষেধ আছে বলে তপস্যা থেকে একটু আলাদা করে দেখা হয়। বৈদিক কর্ম অর্থাৎ যে কোন যজ্ঞাদি যখন করা হয় তখন সেটা সকাম ভাবেই করা হোক বা নিষ্কাম ভাবেই করা হোক এই কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। স্বামীজী যখন বলছেন Do this either by work or by worship তাহলে কি কর্ম দিয়েও হবে? না, স্বামীজী যেটা বলছেন এর দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হবে। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম ভাবে বা পূজার মনোভাব নিয়ে কর্ম করতে হবে। কর্ম দ্বারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন সেটা হবে যাবে একটা ক্রিয়ার ফল। এগুলো খুবই সহজ যুক্তি, কিন্তু অত্যন্ত মৌলিক বিষয়। প্রথম প্রথম শুনলে ধারণা হয় না, শুনতে শুনতে একবার ধারণা হয়ে গেলে তখন বোঝা যায় আমাদের ঋষিরা কত সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে গেছেন আর এই যুক্তিগুলো না মানলে কত রকমের সমস্যা হয়ে যায়।

ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যাবে না, বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না, তপস্যা দিয়ে পাওয়া যাবে না, কর্ম দিয়ে হবে না, তাহলে কি দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যাবে? তখন বলছেন *জ্ঞানপ্রসাদেন শুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ*। প্রথমে বলছেন *জ্ঞানপ্রসাদেন*, জ্ঞানের কৃপাতেই পাওয়া যাবে। এই কথাগুলোকে সোজা অনুবাদ করে দিলে বক্তব্যটা স্পষ্ট হয় না। এখানে আচার্য বলছেন জ্ঞান মানে *আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব-প্রাণিনাং জ্ঞানং*...... জ্ঞানের যে সাধনভূতা, যাঁকে দিয়ে জ্ঞান পাওয়া যায় তাঁর কৃপাতে, মানে বুদ্ধির কথা বলছেন। এখানে জ্ঞান মানে কোন কিছুর জ্ঞান নয়, জ্ঞান মানে বুদ্ধি। তাহলে কিভাবে ব্রহ্মকে পাওয়া যাবে? আত্মবুদ্ধির কৃপাতে। আমার গুরুকৃপা থাকতে পারে, ইষ্টকৃপা থাকতে পারে, সব কিছুর কৃপা থাকতে পারে কিন্তু আত্মকৃপা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না। আত্মকৃপা মানে বুদ্ধির কৃপা। সেইজন্য আমরা যে বলি ঠাকুরের ইচ্ছাতে সব হয়ে যাবে, সত্যিই কি হবে? উপনিষদ বলছে কোন দিন হবে না। ঠাকুরের ইচ্ছা সব সময়ই জোর করে আমাকে ভেতরে দিকে টানছে কিন্তু আমার অনিচ্ছা জোর করে বাইরে বার করে নিয়ে আসছে। কারণ যিনি আত্মা তিনিই ঠাকুর। আত্মা যিনি তিনিই আমার ভেতরে, আমার ইচ্ছা আর ঠাকুরের ইচ্ছার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ওই আত্ম ইচ্ছা বাইরে থেকে ঠেলছে ভেতরে ঢুকবে বলে কিন্তু ভেতরে আত্মার যে অনিচ্ছা সেটা ঠেলে তাকে বাইরে বের করে দিচ্ছে। তাই ঠাকুরের ইচ্ছা দিয়ে কোন দিন ঈশ্বর লাভ হবে না। কোন ভগবান কোন দিন কাউকে কিচ্ছু করতে পারেনি। কে করে? *আত্মপ্রসাদেন*, একমাত্র আত্মকৃপাতেই হয় অর্থাৎ *জ্ঞানপ্রসাদেন*। ঠাকুর বলছেন, তাঁর কৃপাতো সব সময়ই আছে, মলয় বাতাস সব সময়ই বইছে তুমি পাল তুললেই তর তর করে চলতে শুরু করবে। সেটাই বলছেন, *জ্ঞানপ্রসাদেন*, জ্ঞান মানে বুদ্ধি, নিজের যদি কৃপা, আত্মকৃপা যদি না থাকে তার কিচ্ছু হবে না।

এখানে আচার্য বলছেন *সর্ব-প্রাণিনাং*, সর্ব-প্রাণি বলতে এখানে কুকুর, বেড়াল, হাতিকেও বলছেন কিনা বলা খুব মুশকিল। হয়তো কুকুর, বেড়াল, হাতির কথাও আসছে, কারণ পরের দিকে অন্যান্য যাঁরা আচার্যের ভাষ্যের উপর টীকা দিয়েছেন তাঁরাও বিভিন্ন রকম টীকা দিচ্ছেন। কিন্তু এখানে আমরা শুধু মানুষ মেনেই চলব, কারণ ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে ডেকে বলছেন দেখো ভাই হাতি এত বড় প্রাণী কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না। তাহলে মানুষ কেন এত উপরে গেল? আচার্য বলছেন স্বভাবতঃ প্রত্যেক প্রাণী এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে, অন্য দিক থেকে যদি দেখা যায়, সব প্রাণীর মধ্যে চেতনার অভিব্যক্তির যে চেষ্টা চলছে সেখানেই আত্মা আছেন, এটা আমরা আগের মন্ত্রেই দেখেছি। তাই প্রত্যেক প্রাণীর ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। কিন্তু রাগ আর দ্বেষ, কিছু জিনিষের প্রতি ভালোবাসা আবার কিছু জিনিষ থেকে সরে আসার ইচ্ছা থাকার জন্য নানা রকমের দোষ, ময়লা মনের উপর আবরণ বিছিয়ে দেয়। কারণ স্বাভাবিক ভাবে মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞান এই আত্মতত্ত্বকে প্রকাশিত করার জন্য সক্ষম। কিন্তু রাগ আর দ্বেষের প্রভাবে ময়লা পড়তে পড়তে এমন আবরণ পরে যায় যে বুদ্ধি পুরো কলুষিত হয়ে যায়। এই কলুষিত বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ের দিকে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, অন্তর্মুখী তো হতেই পারে না আর তার ইচ্ছেও হয় না। আরশিতে যদি ময়লা জমে

থাকে বা জল যদি তরঙ্গায়িত থাকে তখন তাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। ঠিক তেমনি মনের উপর এত পুরু ময়লা জমে আছে যে আত্মা এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিবিম্ব দেখা যায় না।

মনের ময়লা হল বাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা বিরক্তি। আসক্তি হলে দৌড়াচ্ছি আর বিরক্তি হলে পালাচ্ছি। এই দুটো জিনিষই মানব জীবনকে সর্বক্ষণ নাচিয়ে যাচ্ছে। কামিনী-কাঞ্চনকে ভালোবাসছি বলে তার পেছনেই দৌড়ে যাচ্ছি, নাম-যশ ভালোবাসি নাম-যশের পেছনে ছুটে চলেছি আর অভাব থেকে পালাচ্ছি। যেখানেই সৌন্দর্যের অভাব, মিষ্টতার অভাব সেখান থেকেই পালাচ্ছি। যেখানেই দুর্নাম, কলঙ্ক সেখান থেকে পালাচ্ছি। সারাটা জীবন দৌড়ে দৌড়ে কখন যে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছি টেরও পাচ্ছি না। এই দৌড়নটাই মনের ময়লা। তাই আত্মজ্ঞান এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তার নাগাল পাচ্ছি না। ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের সংসর্গে যে ময়লা জমেছে, সেই ময়লাকে পরিষ্কার করে দেওয়া মানে ইন্দ্রিয়কে তার বিষয়ের থেকে টেনে সরিয়ে আনা। ইন্দ্রিয় যত সরে আসে মন তত শান্ত হতে থাকে। মন যখন শান্ত হয়ে গেল তখন *জ্ঞানপ্রসাদেন*, মানে বুদ্ধির কৃপা হবে। আত্মপ্রসাদ, জ্ঞানপ্রসাদ, বুদ্ধিপ্রসাদ কখন হয়? যখন মনটা শান্ত হয়ে যায়। এটাই যোগশাস্ত্রে বলছেন *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*। তখন কি হয়? *তদাদ্রষ্টুস্বরূপে অবস্থানঃ*, সেই অবস্থায় যিনি দ্রুষ্টু, যিনি যোগী তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। উপনিষদও তাই বলছে – যখন জ্ঞানপ্রসাদ হবে তখন মনটা শান্ত হয়ে যাবে। মন শান্ত হওয়া মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, মনের মধ্যে যত রকমের বৃত্তি গুলো উঠছিল, মনের মধ্যে চাঞ্চল্য ছিল সেগুলো থেমে গিয়ে মন শান্ত হয়ে গেল। তখন কি হবে? তখন যা আছে সেটাই দেখা যাবে। জলাশয়ের নীচে অনেক কিছু রাখা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কারণ জলাশয়ের উপরিভাগ তরঙ্গায়িত হয়ে আছে, তরঙ্গ ওঠা বন্ধ হয়ে গেলে জলের নীচের জিনিষগুলো পরিষ্কার দেখা যাবে। ঠিক তেমনি মনের দর্পণে সেই আত্মতত্ত্বকে দেখা তখনই যাবে যখন মন শান্ত হবে।

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ, শুদ্ধচিত্তবান পুরুষ ওই জ্ঞানপ্রসাদের জন্যই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়। যতক্ষণ মন শান্ত না হয়ে যায় ততক্ষণ এই সাক্ষাৎকার হয় না। সত্যাদি সাধন সম্পন্ন করে, ইন্দ্রিয়াদিকে নিগ্রহ করে, সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করে একাগ্র চিত্তে যোগী ধ্যান করেন। তখন সেই ধ্যানই হয়ে যায় *নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ*। *কলং* মানে কলা বা অংশ, চন্দ্রের যেমন ষোলটি কলা, চন্দ্রের এই ষোলটি অবয়ব। ঠিক তেমনি আমরা যখন কোন কিছু দেখি, যেমন এই বোতল, বোতলের এটা ছিপি, এটা নীচের অংশ, এটা উপরের অংশ তেমন আপনাকে যখন দেখছি তখন দেখছি এটা আপনার মুখ, আপনার হাত, আপনার পা বিভিন্ন অঙ্গ সহ আপনাকে দেখছি। কিন্তু নানা রকমের প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন ভাবে সাধনা করে করে যখন ধ্যানের গভীরে যান তখন ব্রহ্মকে দেখে *নিষ্কলং সর্বাবয়বভেদবর্জিতঃ*, তাঁর কোন ধরণের অবয়ব বা কোন অঙ্গ, অংশ বা কলা থাকে না বা তাঁর নিজস্ব কোন ধরণের অঙ্গভেদও থাকবে না, তিনি হলেন একরস, এক সমান। তাই বলা হচ্ছে *নিষ্কলং*।

এই মন্ত্রের মূল বক্তব্য হল, ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে জানা যাবে না, ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে না জানা যাক আমি মন দিয়ে তাঁকে জানতে পারব, কিন্তু তুমি তাও জানতে পারবে না। তাহলে মন দিয়ে আমি তপস্যা করে তাঁকে সাক্ষাৎ করব, না তাও জানতে পারবে না। আমি যদি মনে করি আমার এই দেহ দিয়ে প্রচুর কর্ম করে, কর্ম মানে আমি প্রচুর তীর্থাদি করব, আমি প্রচুর দান করব, আমি প্রচুর যজ্ঞাদি করব, আমি ধ্যান করব, এই ধরণের কর্ম দিয়েও আমি ব্রহ্মকে জানতে পারব না। তাহলে কি ভাবে হবে? বুদ্ধির কৃপা দ্বারা তাঁকে জানা যাবে। বুদ্ধির কৃপা কি করে পাওয়া যাবে? আগের মন্ত্রে খুব সহজ উপায় যেটা বলা হয়েছে, সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও মনঃসংযমের অনুশীলন করে করে যখন একেবারে বিশুদ্ধ সত্ত্ব হয়ে যাবে তখন বুদ্ধির কৃপা হবে। বুদ্ধির কৃপা হলে *তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ*, ধ্যায়মান পুরুষরা *নিষ্কলং* মানে অবয়বরহিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করেন।

ধ্যায়মান পুরুষ তো শরীরের ভেতরে ধ্যান করছেন, তাহলে শরীরের ভেতরে সেই অবয়বরহিত ব্রহ্মকে কি রকম দর্শন করেন? বলছেন, যখন তুমি চিত্তশুদ্ধি করে নিয়েছ তখন দেখবে এই শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয় রূপে তিনি প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। এটাই পরের মন্ত্রে বলছেন –

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা।।৩/১/৯।।

(জীবগণের এই দেহে প্রাণ পঞ্চপ্রকারে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সমস্ত চিত্ত ওতপ্রোত হয়ে আছে। চিত্ত প্রসন্ন হলেই এই আত্মা আপনাকে বিশেষরূপে প্রকটিত করেন। সুতরাং এই দেহে যেখানে প্রাণ পঞ্চপ্রকারে সম্প্রবিষ্ট হয়ে আছে, সেই দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানতে হবে।)

এই শরীরের মধ্যে পাঁচটি প্রাণ আছে, প্রাণ, অপানা, সমানা, ব্যায়ানা ও উদানা। এই প্রাণময় শরীর যেটা, মানে মৃত শরীর নয়, এই প্রাণময় শরীরের মধ্যেই আত্মাকে জানতে হবে, আত্মাকে জানার প্রাণময় শরীরই একমাত্র উপযুক্ত স্থান। ইন্দ্রিয়, চিত্তাদি যত কিছু ব্যাপ্ত রয়েছে, এগুলো যখন শুদ্ধ হয়ে যায় তখন আত্মস্বরূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। আমাদের এই যে শরীর, অজ্ঞানবশতঃ যেখানে ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণের খেলা দেখছি, সেখানেই আত্মার খেলা দেখা যাবে যখন এই ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত যখন শুদ্ধ হয়ে যাবে। একমাত্র চিত্তশুদ্ধিই আত্মাসাক্ষাৎকার করাতে পারে।

কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না বলা মাত্র সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে যে বিজ্ঞানের কোন পদ্ধতি দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যাবে না। শুধু পদ্ধতি দিয়ে তো জানা যাবেই না, এমন কি বিজ্ঞানের কোন যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মকে বোঝা বা জানা যাবে না। যে তপস্যা দিয়ে জগতের সব কিছুই পাওয়া যায়, সেই তপস্যা দিয়েও ব্রহ্মকে পাওয়া যাবে না। তপস্যা করলে মানসিক তাপ উৎপন্ন হয় আর কর্ম করলে শারীরিক তাপ উৎপন্ন। বলছেন মানসিক ও শারীরিক কোন তাপ দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না। একমাত্র চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। কিভাবে চিত্তশুদ্ধি করতে হবে তার কথা আগের আগের মন্ত্রে বলা হয়েছে। চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেছে, এখন এই শরীরে আত্মসাক্ষাৎকার কিভাবে হবে? সেটাই এই নয় নং মন্ত্রে বলা হচ্ছে।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা, আত্মা এত সূক্ষ্ম যে আকাশ সব থেকে সূক্ষ্ম কণা, তার থেকেও আত্মা সূক্ষ্ম। প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে গিয়ে বলা যায়, একটা এ্যটমের ভেতরে যে জিনিষগুলো আছে, যেমন একটা হল ইলেক্ট্রন, আমি জানতে চাইছি একটা অনুর ভেতরে যে জিনিষগুলো আছে এগুলো কোথায় আছে, কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে, তার ওজন কত আর কি গতিতে ঘুরছে। এমনিতে বাইরের কোন জিনিষকে মেপে নেওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু এখানে জানতে চাইছি অনুর ভেতরের যে জিনিষগুলো আছে তার কথা। এই জিনিষটাকে নিয়ে যখন বৈজ্ঞানিকরা কাজ করতে শুরু করলেন তখন এনারা দেখলেন যে কোন কিছুই জানা যায় না। একটা ইলেক্ট্রনের ঠিক ঠিক কত ওজন সেটাই আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীই জানতে পারলেন না। আসলে এই বোতল যেমন শান্ত হয়ে টেবিলে বসে আছে ইলেক্ট্রন কখনই শান্ত থাকে না, সব সময়ই ঘুরছে। যদি না ঘোরে তখন ওটা আর ইলেক্ট্রন থাকবে না। যখন ঘোরে তখন ইলেক্ট্রন কত গতিতে ঘোরে সেটাও বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত জানতে পারেননি। মজার ব্যাপার হল এর একটা হিসাবকে যত কাছাকাছি জানতে সক্ষম হব তখন অন্য হিসাবগুলো ততটাই ছিটকে যাবে। ধরুন ল্যাবোরটরিতে আমরা ইলেক্ট্রনের ওজন জানার জন্য সব যন্ত্রপাতি ঠিক করে নিয়েছি, এবার ওজনের হিসাব যত কাছাকাছি যাবে তত তার অন্য জিনিষগুলো ছিটকে যাবে। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছে একটা এক গ্রাম প্রোটন আছে, এখন হিসেব করে এক গ্রামের যত কাছাকাছি যাব, ধরুন ৯.৯৭ ডেসিগ্রাম পর্যন্ত চলে গেছি, তাহলে বুঝে নিন তার গতির ব্যাপারে যেটা জানব সেটা ততই আন্দাজ করে বলতে হবে। আরও স্থূল রূপে উদাহরণ দিলে জিনিষটা বুঝতে সুবিধা হবে।

ধরুন একজন বেলুড় মঠে মন্দিরে বসে আছেন। আমি তার ওজন জানতে চাইছি, ধরে নিলাম তার আসল ওজন ষাট কিলো। বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে কিন্তু কোন দিন বলতে পারবে না যে তার ওজন ষাট কিলো। ওজনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে যদি বলে দেন ৫৮ থেকে ৬২ কিলোর মধ্যে, তাহলে খুব কাছাকাছি চলে গেলেন। এবার যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কোন জায়গাটায় আছেন, তখন বলবে বেলুড় এলাকার মধ্যে কোন একটা জায়গায় আছেন। এত বড় এলাকায় আমি কোথায় খুঁজব? আচ্ছা এবার ওজনটা আবার হিসাব করে বলছি, চল্লিশ থেকে আশি কিলোর মাঝামাঝি ওজন। তাহলে এখন কোথায় আছেন? বেলুড়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ধারে কাছে কোথাও আছেন, তার মানে তার আসল অবস্থান বেলুড় মঠের মন্দিরের কাছাকাছি চলে এসেছে তাও ঠিক জায়গাটাকে ধরতে পারবে না। কিংবা যদি তার সাইজ মাপা হয়, আসল সাইজ হয়ত দেড় মিটার। এবার যদি হিসাব করে এক মিটার পর্যন্ত যদি বলে দেয় তাহলে সে কোথায় আছে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেলুড় মঠের মন্দির থেকে হয়ে যাবে সারা বিশ্বের কোথাও কোন একটা জায়গাতে আছে। আবার যদি সাইজটাকে বার করে দেখা গেল তার সাইজ হল দশ সেন্টি মিটার থেকে একশ মিটার পর্যন্ত, তখন আবার বলে দিতে পারবে তিনি বেলুড় মঠের আশেপাশে কোথাও আছেন। এ এক বিচিত্র নিয়ম। এটাই এ্যাটমের মৌলিক নিয়ম। সেইজন্য কোয়াণ্টাম ফিজিক্স নিয়ে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বড় বড় বিজ্ঞানীরাও বলে দেন আমরা বুঝি না, আমরা শুধু এর অঙ্কটা জানি। এর কারণ বার করতে গিয়ে বলা হচ্ছে পার্টিকেল যত ছোট হবে তার শক্তি তত বেশী হবে।

বিজ্ঞানীরা তখন একটা পরীক্ষা করল, একটা মাইক্রোস্কোপে ইলেক্ট্রনকে বেঁধে রেখে দিলে পরিষ্কার দেখা যাবে ইলেক্ট্রনটা ওখানে আছে। তাহলে ইলেক্ট্রনটা কোথায় আছে এটা না দেখতে পারাটা কিছুই নয়। প্রথমের দিকে বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বুঝতে পারছিলেন না কেন জানা যাবে না ইলেক্ট্রনটা কোথায় আছে। কিন্তু আমরা তো দেখছি জানছি এই মাইক্রোস্কোপ, মাইক্রোস্কপের এই জায়গাতে ইলেক্ট্রনকে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে, তাহলে যাবেটা কোথায়। তখন ওরা দেখলেন যে এই ইলেক্ট্রনকে যদি দেখতে হয় তাহলে এর নীচে একটা আলো দিতে হবে। আলো না দিলে আমি দেখব কি করে! এবার আলোতে যে ফোটন আছে, এই ফোটনের শক্তি প্রচণ্ড, যেমনি ফোটনের গায়ে স্পর্শ হবে তখনি ওটাকে ছিটকে দেবে। আজ পর্যন্ত তাই কেউ জানেনা ইলেক্ট্রনের ঠিক ঠিক ওজন কত। হাইড্রোজেন এ্যাটমের ওজন কত বলে দেওয়া যাবে, কিন্তু ওর ভেতরে যে ইলেক্ট্রন আছে ওর ঠিক ঠিক ওজন কেউ বলতে পারবে না। কি গতিতে ঘোরে, কোথায় অবস্থিত কিছুই ঠিকঠাক বলতে পারবে না। বিজ্ঞানীরা প্লাস মাইনাস করে দেখিয়ে দেবে এত তার ওজন, এত তার গতি ইত্যাদি। তার মধ্যে একটার হিসাব যদি একটু কাছাকাছি চলে যায় অন্য জিনিষগুলোর হিসাব আসল থেকে ছিটকে অনেক দূর চলে যাবে। এটা কেন এই রকম হচ্ছে, এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের উপরই বিজ্ঞানের আলাদা একটা শাখা কাজ করে যাচ্ছে।

এখানে উপনিষদে কি বলছেন? *এষোহণুরাত্মা*। আমরা যে এতক্ষণ ইলেক্ট্রন প্রোটনের কথা বললাম এদেরও ভেতরে রয়েছেন আত্মা। অণুর ভেতরে ইলেক্ট্রন প্রোটন, আবার ইলেক্ট্রন প্রোটনেরও ভেতরে আত্মা, মানে অণুর থেকেও আত্মা অনু। কত অণু হতে পারেন আমাদের চিন্তা শক্তির বাইরে, ইলেক্ট্রন প্রোটনকেই জানা যাচ্ছে না, সেখানে আত্মাকে কি ভাবে জানবে!

তাহলে এই আত্মাকে কিভাবে জানা যাবে? একমাত্র বিশুদ্ধ চিত্ত দিয়ে জানা যায়। আমাদের ঋষিরা যে পঞ্চ তন্মাত্রার ধারণা দিয়ে গেছেন এই পঞ্চ তন্মাত্রা ইলেক্ট্রন প্রোটনের থেকেও সূক্ষ্ম। এই পঞ্চ তন্মাত্রার মধ্যে আবার আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্মতর, সেই সূক্ষ্মতর আকাশের মধ্যেও আত্মা বিরাজমান। যে ইলেক্ট্রন প্রোটনকে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন, সেই ইলেক্ট্রন প্রোটনের মধ্যেও আকাশ তত্ত্ব বিদ্যমান, আত্মা সেই আকাশেরও ভেতরে বসে আছেন, সেখানে আত্মাকে জানবে কি ভাবে, জানার কোন প্রশ্নই আসছে না। তাহলে এই আত্মাকে যখন জানবেন তখন কোথায় জানবেন। তখন বলছেন *এষোণুরাত্মা*

চেতসা বেদিতব্যো, শুধু বিশুদ্ধ চিত্ত দিয়ে এই অনু থেকেও অনু আত্মাকে জানা যায়। আমি যে মনে করব টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কপ দিয়ে জানতে পারব, কোন দিনই তা জানা যাবে না।

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ, যে শরীরের মধ্যে পাঁচটি প্রাণ কাজ করছে। যিনি যোগী তিনি সাধনা করে মনকে একেবারে বিশুদ্ধ চিত্ত করে নিয়েছেন, এবার তিনি সেই আত্মাকে কোথায় দেখবেন? নিজের শরীরের ভেতরেই দেখবেন। কোন শরীরে দেখবেন? যে শরীরে পাঁচটি প্রাণ খেলা করে। অর্থ হল প্রাণ যেখানে খেলা করে। আমাদের যাঁরা দার্শনিকরা ছিলেন, তাঁরা বললেন আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তি প্রবেশ করে যে শক্তিতে শরীরের সমস্ত ক্রিয়া চলে। এই শক্তি পাঁচ রকমের – প্রাণ, অপান, ব্যায়ানা, উদানা ও সমানা। এই পাঁচটি প্রাণ পাঁচ রকম ভাবে কাজ করে, যেমন যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি তখন সেটা অপান, নিঃশ্বাস যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা প্রাণ এই ভাবে প্রাণ পাঁচ ভাবে কাজ করছে, অর্থাৎ জীবিত শরীরে যেখানে প্রাণের ক্রিয়া চলছে সেখানেই আত্মাকে দেখা যাবে। এই শরীরের মধ্যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা এই আত্মাকে জানা যায়। তার মানে যোগী যখন ধ্যানের গভীরে আত্মাকে জানেন তখন নিজের শরীরের বাইরে কোথাও জানেন না, নিজেরই হৃদয়ের ভেতরে তিনি তাঁকে জানতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে হৃদয়কেই মন বলে আবার মনকেই হৃদয় বলে। সেইজন্য প্রায়ই বলা হয় যোগী তাঁর হৃদয়াকাশে এই আত্মার জ্যোতি দর্শন করেন। কিন্তু আসলে মনের চোখ দিয়ে দেখা হয়, এই চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেন না। আমাদের শরীরের যে স্থূল হৃদয় এখানে সেই হৃদয়ের কথাও বলা হচ্ছে না। মনের দ্বারা এই শরীরেই যেখানে গুরু ধ্যান করতে বলে দিয়েছেন সেখানেই এই আত্মজ্যোতির দর্শন করেন।

প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং, কিভাবে জানেন? *ওতং*, মানে ওতপ্রোত হয়ে মিলেমিশে থাকা। কি রকম ওতপ্রোত হয়ে থাকা? আচার্য বলছেন *ক্ষীরমিব স্নেহেন কাষ্ঠমিব চাগ্নিনা*, যেমন দুধের মধ্যে ঘি ওতপ্রোত হয়ে আছে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এই দুধের মধ্যে ঘি কোথায় আছে? এই প্রশ্নই হয় না। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কাঠে আগুনটা কোথায় আছে? পুরো কাঠেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ভগবান কোথায় থাকেন? তখন বলবে দুধে যেখানে ঘি থাকে। ঘি কোথা থাকে বেরোয়? দুধ থেকেই বেরোয়। তাহলে দুধের কোন জায়গায় ঘি আছে? দুধের সব জায়গাতেই আছে। সেই রকম ভগবান সব জায়গাতেই আছেন। ঠিক তেমনি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভগবানের মুখ কোন দিকে? এখানে যদি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় এই মোমবাতির মুখটা কোন দিকে? এর উত্তর কখন হয় না। কাষ্ঠে অগ্নি আর দুধে ঘি যেমন ওতপ্রোত হয়ে আছে, ঠিক তেমনি এই আত্মা ইন্দ্রিয় সহিত প্রজাবর্গের সমস্ত চিত্ত ও অন্তঃকরণে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। জীবের যত রকম ক্রিয়া হচ্ছে, যত রকমের ইন্দ্রিয়, প্রাণ সমূহ আর অন্তঃকরণ মানে মন বুদ্ধি এর মধ্যে আত্মা ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করে আছেন।

ক্রিয়া মূলতঃ তিনটি জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় – ইন্দ্রিয় কাজ করে, মন বুদ্ধিকে লাগায় আর এরা সবাই কাজ করে প্রাণের শক্তিতে। সাধারণ মানুষ মনে করে আমার ইন্দ্রিয়গুলো আর মন বুদ্ধিই চৈতন্য। বিজ্ঞানীরা যখন চেতনাকে নিয়ে কথা বলেন তখন তাঁরা মন বুদ্ধির কার্যকেই চেতনা বলে জানেন। এই যে সাধারণ লোকেরা বুঝছে, বিজ্ঞানীরা জানছে যে আমার মন বুদ্ধিই চৈতন্য অথবা যখন কেউ খুব কথা বলে তখন আমরা বলছি দেখছ এর জিহ্বা কেমন চলছে বা যখন কেউ প্রচুর কাজ করছে তখন বলছি তার হাত কেমন চলছে, এই যে বলছি জিহ্বা কেমন চলছে, হাত কেমন চলছে তার মানে জিহ্বা বা হাতের যে ইন্দ্রিয় তাকে যেন একটা জীবন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর দ্বারাই বোঝা যায় এই আত্মা প্রজাবর্গের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। যেমন একজন রাজার অনেক প্রজা থাকে ঠিক তেমনি আত্মা হলেন রাজা, এই রাজার প্রজারা হল এই ইন্দ্রিয় সমুদয় আর অন্তঃকরণ। এই ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে আর অন্তঃকরণে আত্মা ওতপ্রোত হয়ে আছেন। এই শরীরে আত্মা আছেন বলেই আত্মার শক্তিতেই এরা কাজ করছে। এটাই লোক প্রসিদ্ধি যে অন্তঃকরণ চেতনাযুক্ত, মানুষ মনে করে তার মন বুদ্ধিই চৈতন্য।

বিজ্ঞান আর ধর্মের ক্ষেত্রে এই নিয়ে এক বিরাট সমস্যা। ধর্ম বলে চৈতন্য থেকে জড়ের উৎপত্তি অন্য দিকে বিজ্ঞান দেখে জড় থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি। তার মানে বিজ্ঞান ক্রমবিবর্তনের দিকে থেকে দেখছে প্রথমে পাথর, জল, মাটি ছিল সেখান থেকে প্রথম এ্যমিবা জাতীয় কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর সৃষ্টি হল, সেটা কি জীবন্ত না মৃত বোঝা যায় না। সেখান থেকে বিবর্তন হতে হতে এমন কিছু উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় তখনও বোঝা যায় না এটা কি কোন জীবন্ত না উদ্ভিদ কিছু। এইভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃষ্টি হল। মুরগীর শরীরের ভেতরে যখন ডিমের উৎপত্তি হচ্ছে সেটাতেও প্রাণ বলে কিছু নেই। কিন্তু যখন মোরগের সঙ্গে সংযোগ হয় তখন সেই ডিম থেকে চৈতন্যটা বড় হতে শুরু করে। আরও আশ্চর্যের যে, একেবারে যেটা জড় পদার্থ ছিল সেটাই কিভাবে কোথা থেকে এগিয়ে এগিয়ে এসে শেষে একটা জায়গায় চৈতন্য হয়ে ওঠে। এখন কোন্ জায়গাতে জড় চৈতন্য হয়ে ওঠে আর কিভাবে হয়ে ওঠে এগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞানীর প্রচুর চিন্তা-ভাবনা গবেষণাদি করছেন। কিন্তু এদের শেষ কথা হল আমাদের মন বুদ্ধি এটাই চৈতন্য। আর সাধারণ লোকও তাই মনে করছে। কিন্তু উপনিষদ বলছেন, এই যে মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির কার্য এর মধ্যে আত্মা ওতপ্রোত হয়ে আছেন।

মজার ব্যাপার এটাই – *যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা*। আমাদের মন বুদ্ধিই শেষ কথা। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে এই জগৎকে দেখতে পারছি। আবার এই জগতের মধ্যে কোন প্রিয় জিনিষ আর অপ্রিয় জিনিষকেও দেখতে পারছি। প্রিয় জিনিষ দেখলে উৎফুল্ল হয়ে তার দিকে ছুটে যাচ্ছি আর অপ্রিয় জিনিষ দেখলে সেখান থেকে ছিটকে পালিয়ে আসতে চাইছি। এই বুদ্ধি আত্মাতেই ওতপ্রোত, এই আত্মাকে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বলি আর যেভাবেই বলি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মূল যেটা হল আমাদের এই বুদ্ধি রাগ-দ্বেষ দ্বারা কলুষিত। এই বুদ্ধিকে যখন সত্য সাধনা করে, ব্রহ্মচর্য সাধনা করে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের সাধনা করে রাগ-দ্বেষকে বিদূরিত করে একেবারে বিশুদ্ধ করে দেওয়া হল, *যস্মিন্ বিশুদ্ধে*, তখন *বিভবত্যেষ আত্মা*, যে বুদ্ধি এতক্ষণ জগৎকে আমার কাছে প্রকাশিত করছিল, এখন আর সে জগৎকে প্রকাশিত করে না, জগৎকে প্রকাশিত না করে সে তখন এই আত্মাকে প্রকাশিত করে। আসল কথা এটাই, একেবারে বিশুদ্ধ বুদ্ধিই আত্মাকে দেখায় আর অশুদ্ধ বুদ্ধি জগৎকে দেখায়। ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ আত্মা এক।

আত্মা কোন বস্তু নন, আত্মা যিনি স্বয়ংজ্যোতি তাঁর সেই জ্যোতি প্রতিফলিত হচ্ছে বুদ্ধির উপর। এদিকে বুদ্ধি হয়ে আছে রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা কলুষিত, এই কলুষিত বুদ্ধি এই নাম-রূপের খেলাতে মোহিত হয়ে গিয়ে জগৎকে দেখছে। যেমনি এই রাগ আর দ্বেষকে সরিয়ে দেওয়া হল তখন এই নাম-রূপের খেলাটা বন্ধ হয়ে যায়, তখন সে শুধু দেখে সেই শুদ্ধ আত্মাই আছেন। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, আত্মার জ্যোতি বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হচ্ছে বলেই এত কিছু হচ্ছে। আত্মার জ্যোতি সব সময়ই বুদ্ধির উপর পড়ছে কিন্তু আমার ভেতরে যে রাগ-দ্বেষাদি মল ও কল্মষ রয়েছে তার জন্য আমি দেখছি জগৎকে, জগৎ মানে নাম আর রূপ, এই নাম রূপের বাইরে জগতের কিছু নেই। এই পুরো উপনিষদে এই একই কথা চলছে – ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু নাম ও রূপের একটি খেলা আছে। এই নাম-রূপের খেলাতে বুদ্ধি কলুষিত হয়ে যাচ্ছে, কলুষিত মানে রাগ আর দ্বেষ অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয়ের খেলা, প্রিয়র পেছন ছুটে যাওয়া আর অপ্রিয় থেকে পালিয়ে আসা।

সাধারণ মানুষ যে মনে করছে আমার মন বুদ্ধিই আত্মা, এতে কোন দোষ নেই তাদের। স্বামীজী আবার এক জায়গায় বলছেন জড় চৈতন্য – চৈতন্য জড় – জড় চৈতন্য এ যেন এক অনন্ত লম্বা শৃঙ্খল। এখন আমি এই শৃঙ্খলের যে জায়গাটা ধরব সেটাই আগে আসবে। আমাদের ঋষিরা আগে চৈতন্যকে ধরেছেন মানে ঈশ্বরকে আগে ধরেন বলে তাঁরা বলছেন চৈতন্য থেকেই জড়ের উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞানীরা জড়কে আগে ধরে সেইজন্য বলে জড় থেকেই মনের জন্ম হয়। আসলে এতে কোন তফাৎ নেই। দুটো একই জিনিষ শুধু এপিঠ আর ওপিঠ। যিনি আত্মা, যিনি ব্রহ্ম, যিনি ঈশ্বর তিনিই জগৎ হয়েছেন। জগৎ আর ঈশ্বরের তফাৎ কোথায়? নাম আর রূপে। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু তিনিই যখন নিজের উপর নাম আর রূপ নিয়ে আসেন তখন সেটাকেই জগৎ বলে বোধ হয়। এই আত্মা আবার সমস্ত ইন্দ্রিয় আর অন্তঃকরণের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে

আছে, তাই যখন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যায় তখন এই আত্মাকে বাইরে কোথাও দেখা যায় না এই শরীরের মধ্যস্থ হৃদয় গুহাতেই দেখা যায়।

ধর্মের খুব জনপ্রিয় কথা গুলো শুনে শুনে আমরা প্রায়ই অনেক কিছু জিনিষ বুঝতে ভুল করে বসি। ঈশ্বর দর্শনের কথা আমরা খুব শুনে থাকি, যখনই ঈশ্বর দর্শনের কথা বলা হয় তখন আমরা মনে করি আমার সামনে যেন একজন ঈশ্বর কেউ এসে দাঁড়িয়ে যাবেন। যতই শাস্ত্রের কথা শুনে থাকুক, যতই মন্দিরে, তীর্থে যাক আমাদের সবারই মাথায় কিন্তু এটাই ঢুকে আছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়ে আমরা মা ভবতারিণীর মুর্তি দেখছি, আমরা মনে করছি মা ভবতারিণীর মুর্তি না দেখে সাক্ষাৎ জীবন্ত সচল মা ভবতারিণীকে দেখাটাই ঈশ্বর দর্শন। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন তা নয়। ঈশ্বর দর্শন মানে, ভেতরে তিনিই আছেন, আর তিনি দিব্য জ্যোতি রূপে আছেন। সব সময়ই আছেন আর আমার ভেতরে যা কিছু আছে তার মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন।

এই মন্ত্রের মূল বক্তব্য হল, অনু থেকেও অনু যে আত্মা, এই আত্মাকে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়। কোথায় জানা যায়? এই পঞ্চ প্রাণ যে শরীরে *সংবিবেশ*, মানে সম্যক্ ভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছে যার জন্য শরীরে যত রকমের ক্রিয়া হয়ে চলেছে, সেই শরীরেই আত্মাকে জানা যায়। এই পঞ্চ প্রাণের খেলা শরীরের মধ্য দিয়েই হয়। সেইজন্য বলছেন শরীরের মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। শরীরের কোথায়? হৃদয় গুহাতে। কি রকম দেখেন? তিনি দেখেন সেই আত্মা এই ইন্দ্রিয় আর অন্তঃকরণের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। কিন্তু একমাত্র শুদ্ধ মন দিয়েই এই আত্মাকে এইভাবে দেখা যায়। শেষ কথা হল এই শুদ্ধ মন হল আয়নার মত, আয়নাতে ময়লা থাকলে প্রতিবিম্ব ঠিক মত পড়বে না, মনটাও কলুষিত হয়ে থাকার জন্য আত্মার প্রতিচ্ছবি ঠিক মত দেখা যায় না। মন যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখনই আত্মাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। মন এখন কলুষিত থাকার জন্য এই জীব জগৎ দেখছে, এই একই মনের যখন সব কলুষ নাশ হয়ে যাবে তখন এটাকেই ঈশ্বর দেখবে। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক, এখানে নতুন করে কিছু হচ্ছে না। যিনি ভেতরে আছেন তিনি বাইরেও আছেন, সেইজন্য মাকালীকে আমি বাইরেও দেখতে পারি ভেতরেও দেখতে পারি, তিনিই আবার জগৎ জুড়ে রয়েছেন। নানান ভাবে দেখা যায়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – মা আমাকে এখনও নতুন নতুন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এটা কোন বিচিত্র কিছু নয়, কারণ তাঁর অনন্ত রূপ অনন্ত প্রকাশ।

মন বুদ্ধি দিয়ে আমরা যে জগৎ দেখছি, বেদান্ত মতে এই জগৎ বলে কিছু নেই। তাহলে কি আছে? নাম আর রূপই আছে, নাম ও রূপ ছাড়া কিছু নেই। এই যে গ্লাশ এটা আসলে একটা স্টীল, শুধু এর নাম গ্লাশ আর তার একটা রূপ আছে। এটাই আবার স্টীলের ঘটি হতে পারে, বাটি বা বালতি হতে পারে। যদি বলা হয় এক পাত্র জল নিয়ে আসতে, তখন আমার কাছে সবটাই স্টীল। সবারই তখন ক্ষমতা এক, তখন আর আমাকে ভাবতে হবে না জল আমি গ্লাশে নিয়ে যাব, নাকি ঘটিতে নিয়ে যাব। যাদের শিশুমন তারা চেঁচাবে, আমাকে কেন গ্লাশে দিয়েছ ঘটিতে কেন দাওনি। এই জগতের খেলাটা আসলে হল নাম আর রূপের। এই নাম আর রূপকে যেমন যেমন পেছনের দিকে নিয়ে যাব শেষে গিয়ে দেখব নাম রূপ ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন – সন্দেশ কতক্ষণ সন্দেশ, জিহ্বায় দিলে তারপর গলার নীচে গেলেই শেষ। গলার নীচে যখন চলে যাচ্ছে তখন আমি ডাল-ভাত খেয়েছি, না সন্দেশ খেয়েছি বা যে কোন রূপেই খেয়ে থাকি পেটের কাছে এগুলো কিছুই নয়, পেট শুধু জানে আমার পেট ভরা চাই আর শরীরের জন্য এগুলো আমার দরকার। আমি সেখানে সন্দেশ রূপে খেয়েছি না ডাল-ভাত রূপে খেয়েছি তাতে পেটের কিছুই যায় আসে না।

যে কোন একটা বিষয়কে নিয়ে যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করি, আমরা চমকে উঠব কিভাবে বোকার মত পাগলের মত ভোগের পেছনে আমাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে চলেছি। আমরা যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে দেখব আমরা এমন সব কিছুর পেছনে ছুটে চলেছি যেগুলোর কোন মূল্যই নেই। আমরা যে যেখানে কাজ করছি মনে করছি আমি না থাকলে এই কাজ হবে না। কিন্তু জগতে কারুর জন্যই কোন কিছু আটকে থাকে না। আমি রিটায়ার হয়ে গেলে আমার জায়গায় অন্য একজন এসে কাজ করবে।

জগতে আমরা যা কিছু করছি, খাওয়া-দাওয়া, পড়া, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স যা কিছু করছি কিসের জন্য করছি? বলবেন বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে আমাদের নুন্যতম যেটুকু করার দরকার তার হাজার গুণ জিনিষ বেশী করছি। আমার নামে ব্যাঙ্কে যদি কেউ একশ কোটি টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে আমার হলটা কি! ওই টাকা তুলে আমি যদি খরচ করি তাহলে না হয় কিছু করতে পারব। আমি এখন বাসে করে বেলুড় মঠে আসছি, তখন আমি না হয় একটা গাড়িতে আসব, এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। একটা ভালো গাড়ি পাঁচ কি ছয় লাখে হয়ে যাবে। আগে বাসে এক ঘন্টা লাগত এখন গাড়িতে পয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে, পনের মিনিটের তফাৎ আর একটু আরামে আসতে পারছি। তার জন্য এক কোটি টাকা খরচ করার কি কোন প্রয়োজন আছে! আমার পুরো শক্তি বেকার হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর সত্ত্বগুণীর লক্ষণের কথায় বলছেন – সত্ত্বগুণীর খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বর থাকে না, ঝোল ভাত হলেই চলে যায়। কিন্তু আমাদের পঁচিশ রকম ব্যঞ্জন না থাকলে চলবে না। খাওয়াটা একটা আর্ট না হয় বুঝলাম, কিন্তু এত রকমের খাওয়ার আয়োজন করতে হলে এর জিনিষপত্র জোগাড় করা, এগুলো তৈরী করার পেছনে সময় আর অর্থের কত অপচয় হচ্ছে একবারো কি ভেবে দেখছে! বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হল একদিন না হয় করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সারা বছর কেন করতে হবে। এটাই মায়া। এক গ্লাশ দুধে একটু চিনি মিশিয়ে খেয়ে নিলে সেটা আমার শরীরের জন্য ভালো, মনের জন্য ভালো আর আমার পকেটের পক্ষেও লাভদায়ক। ওই এক গ্লাশ দুধ আর চিনির সমতুল্য যখন রসগোল্লা খেতে যাব তখন সেটা শরীরের জন্যও ভালো হবে না, পকেটের দিক থেকেও ভালো নয়। আর কতক্ষণ তার মূল্য? জিভ থেকে যতক্ষণ না গলা দিয়ে নামছে। এটাই নাম রূপের খেলা। উপনিষদ এটাই বলছেন, এই নাম রূপ থেকে তুমি বেরিয়ে এস। নাম রূপের থেকে বেরিয়ে আসা মানে প্রিয় অপ্রিয় থেকে বেরিয়ে আসা। প্রিয় অপ্রিয় থেকে বেরিয়ে আসার পর ধীরে ধীরে ধ্যান ধারণা করে সেই ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন পাওয়া যায়। সেই আত্মাকে যখন নিজের ভেতরে আর বাইরে দেখে তখন সে দেখে আমি তো সবারই আত্মা। কারণ সেই ব্রহ্মজ্যোতি পরিষ্কার নিজের ভেতরে দেখছে আর এই একই জ্যোতি সবারই ভেতরে জ্বলজ্বল করছে তখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে আমিই সব কিছু হয়েছি। এই ব্রহ্মজ্যোতিকে দেখে আমার কি লাভ? এর একটা লাভ হল আমি কাম, ক্রোধ, লোভ এসব থেকে বেরিয়ে আসব কিন্তু তার থেকেও বেশী লাভ হল যেটা পরের মন্ত্রে বলছেন –

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ।।৩/১/১০।।

।।ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।।

(নির্মলান্তঃকরণ ব্যক্তি যে যে লোকের বিষয় মনের দ্বারা সঙ্কল্প করেন এবং তিনি যে যে ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধে মনের সাহায্যে প্রার্থনা করেন তিনি তৎসমুদয় প্রাপ্ত হন। সুতরাং যিনি বিভূতি বা ঐশ্বর্য কামনা করেন, তিনি অবশ্যই আত্মজ্ঞানীর সেবা অর্চনাদি করবেন।)

এই মন্ত্রে যা কিছু বলা হচ্ছে এটা কোন অর্থবাদ নয় বা স্তুতির জন্য বলা হচ্ছে না, এটা এই রকমই হয়। *বিশুদ্ধসত্ত্বঃ*, যাঁর মন থেকে সমস্ত রকমের রাগ-দ্বেষাদি চলে গেছে এবং যিনি আত্মবেত্তা তিনি *যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি*, তিনি যে যে লোককে দেখতে চাইবেন সেই লোকই তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আত্মজ্ঞানী এখানে বসে আছেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন আমি পিতৃলোকটা একটু দেখতে চাই, সেখানে কি রকম সুখভোগ হয়, উনি সঙ্গে সঙ্গে পিতৃলোকে পৌঁছে যাবেন, তাঁকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমি স্বর্গলোকের সুখ কি রকম দেখতে চাইছি, চিন্তা করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলোকে পৌঁছে যাবেন। আমি আমেরিকায় গিয়ে দেখতে চাইছি সেখানে মানুষ কি রকম সুখভোগ করে, চিন্তা মাত্র আমেরিকায় পৌঁছে যাবেন। আমরা অনেক পুরান ও অন্যান্য শাস্ত্রে দেখি অমুক মুনি অমুক স্বর্গে পৌঁছে গেলেন, অমুক লোকে গিয়ে তাদের উপদেশ দিলেন। এগুলো বাস্তবিক এই রকমই হয়। এখানে বসে আছেন শুধু মনে মনে কল্পনা করবে, যা

কল্পনা করবেন সেটা হতে বাধ্য। এটাই এখানে বলছেন *যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি*, মনের দ্বারা তিনি যা যা চাইবেন সেটা হতে বাধ্য, এখানে শুধু আত্মবেত্তার কথা বলা হচ্ছে।

আচার্য তাঁর ভাষ্যেও বলছেন *যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগান্ তম্ তম্ লোকম্ জয়তে*, শুধু যে আত্মবেত্তার নিজের ব্যাপারে কিছু মনে মনে চিন্তা করলেই যে হয়ে যাবে তা নয়, অন্যের জন্য যেটা প্রার্থনা করবেন সেটাও কার্যকর হয়ে যাবে। পিতৃবিয়োগের পর নরেনের খুব কষ্টে দিন যাচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর নরেনকে বললেন 'যা মন্দিরে গিয়ে তুই মাকালীর কাছে প্রার্থনা করগে'। এই ঘটনা আমরা সবাই জানি। নরেন মাকালীর কাছে জাগতিক কিছু চাইতে পারলেন না, তিনি মার কাছে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যই চাইলেন। একবার, দুবার, তিনবার ঠাকুর নরেনকে মন্দিরে পাঠালেন মার কাছে তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করবার জন্য প্রার্থনা করতে, কিন্তু নরেন পারলেন না। তখন ঠাকুর বলে দিলেন 'আচ্ছা ঠিকে আছে যা, তোদের মোটা অন্ন আর মোটা বস্ত্রের কখন অভাব হবে না'। পরে ঠিক তাই হল। এখানে তাই বলছেন শুধু নিজের ব্যপারেই নয়, অপরের ব্যাপারে যা বলবেন তারও তাই হবে, ভালো মন্দ দুটোই হবে। আত্মবেত্তা যদি কারুর উপর রেগে যান সে আর বাঁচার পথ খুঁজে পাবে না। কারণ বলাই হচ্ছে *যং যং লোকং*, যদি বলেন তুই নরকে যা, তাকে নরকেই যেতে হবে। সেইজন্য বলে সাধুদের চটাতে নেই, কারণ তাঁদের মধ্যে কে ব্রহ্মজ্ঞানী বোঝা খুব মুশকিল।

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্, যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, আত্মবেত্তা তিনি যে কামেরই সঙ্কল্প করুক না কেন সেটা এসে যাবে। বলে ইন্দ্রাদি দেবতারা ঋষিদের নাকি খুব ভয় পেতেন, সেইজন্য দেবতারা খুব কায়দা করে ঋষিদের সামনে এমন কিছু ভোগ্য সামগ্রী রেখে দিতেন যাতে ওটাকে দেখে ঋষিদের মনে ভোগের ইচ্ছে জাগে। আর ভোগ করতে গেলেই পতন হয়ে যাবে। এটা হল যাঁরা সাধারণ ঋষি তাঁদের ক্ষেত্রে। কিন্তু আত্মজ্ঞ ঋষির তো পতনের কিছু নেই, আর তাঁর বেতালা পা কখন পড়বেও না। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে যেটা বেরিয়ে যাবে, যেটাই কামনা করবেন সেটা হতে বাধ্য। কারণ সে ব্রহ্মালোককেও জয় করে নিয়েছেন। ব্রহ্মালোক জয় করা মানে তাঁর মধ্যে সৃজন শক্তি এসে গেছে। এগুলো কোন কল্পনা করে কিছু বলা হচ্ছে না। বাস্তবিক জিনিষটা এইভাবেই হয়। স্বামীজী যখন ভারত পরিক্রমা করে দক্ষিণ ভারতে আছেন তখন খবর হল চিকাগোতে এক বিশ্বধর্ম সম্মেলন হতে যাচ্ছে। তখন স্বামীজী তাঁর পরিচিতদের বলছেন এই যা কিছুর আয়োজন হতে যাচ্ছে এগুলো আমার জন্যই হতে যাচ্ছে। যাদের বলছিলেন তারা তখন বুঝতে পারছে না স্বামীজী কি বলছেন, কিন্তু পরে দেখছেন স্বামীজী যা বলেছিলেন সেটাই হয়েছে।

আচার্য বলছেন *তস্মাৎ বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মজ্ঞম্ আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হি অর্চয়েৎ, পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালনশুশ্রূষানমস্কারাদিভিঃ ভূতিকামঃ বিভূতিমিচ্ছঃ*, সেইজন্য যাঁরা জগতে ঐশ্বর্য কামনা করেন, তা যে কোন ঐশ্বর্যই হোক না কেন, চাকরি পাচ্ছে না চাকরি চাইতে পারে, সন্তানের মঙ্গল চাইতে পারে, তাদের জন্য খুব জরুরী যাঁরা আত্মবেত্তা তাঁদের কাছে যাওয়া, কাছে গিয়ে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করতে হবে, সেবাশুশ্রুষাদি করতে হবে আর সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদির দ্বারা আত্মবেত্তাকে সন্তুষ্ট করা। কারণ আত্মজ্ঞানী হলেন সত্যসঙ্কল্প, যেটা আমার কর্মের বিধানে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সত্যসঙ্কল্প যদি একবার বলে দেন তাহলে সেটা হতে বাধ্য। মহাভারতে আত্মজ্ঞানীর সত্যসঙ্কল্প নিয়ে একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে।

কাশ্যপ মুনি ছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের প্রজাতি আছে তাদের সকলের পিতা। কাশ্যপ মুনি একবার ঠিক করলেন সৃষ্টির কল্যাণার্থে তিনি একটা যজ্ঞ করবেন। কাশ্যপ মুনি যজ্ঞের সঙ্কল্প করেছেন শুনে দেবতারা, অন্যান্য ঋষিরাও বিভিন্ন ভাবে যজ্ঞের সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছেন। অনেককে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তখনকার দিনে একদল ঋষি ছিলেন যাঁদের নাম ছিল বালখিল্য। বালখিল্য ঋষিদের দেহের আকৃতি একবারে ক্ষুদ্র, আমাদের হাতের বুড়ো আঙুলের মাপের। ওনারা সাধারণতঃ বড় কোন গাছের ডালে থাকতেন, আর যেখানেই থাকতেন অনেকজন ঋষি একত্রে থাকতেন। বালখিল্য ঋষিরা সব সময় শুধু তপস্যাই করে

যেতেন। সেইজন্য আমাদের পরম্পরাতে যখন তখন, কারণে অকারণে গাছ কাটা নিষেধ ছিল। কারণ আমরা জানি না কোথায় কোন গাছে কি আছে। এই বালখিল্য ঋষিরাও খবর পেয়েছেন, প্রজাপতি কাশ্যপ যজ্ঞ করতে চলেছেন সেখানে আমাদেরও উচিৎ কিছু সহায়তা করে যজ্ঞে যোগদান করা। ওইটুকুতো শরীরের আকৃতি, এনারা যজ্ঞে কি আর সাহায্য করতে পারবেন। যাই হোক সাত আট জন বালখিল্য ঋষি মিলে বহু কষ্টে পলাশ গাছের একটা সরু ছোট শুকনো ডালকে টুকরো করে ভেঙেছে। ভেঙে ওই ছোট্ট টুকরো কাঠকে সাত-আট জন্য ঋষিরা মিলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে। গরুর খুড়ের চাপে এক জায়গায় মাটিতে গর্ত হয়ে জল জমেছিল। কাঠের টুকরোর ওজনের ভারে ঋষিদের তখন মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, কোন রকমে নিয়ে আসছিল কিন্তু গরুর খুড়ের ওই গর্তের জলের কাছে আসতেই আর সামলাতে না পেরে ওই গর্তের মধ্যে গিয়ে সবাই পড়েছে। ঋষিদের কাছে ওটা তো একটা পুকুরের মত। ওখান থেকে তাঁর উঠেও আসতে পারছেন না। সাত-আট জন ঋষি একটা ছোট্ট সরু ডালকে বয়ে নিয়ে আসতে গিয়ে ঐভাবে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছেন না। ইতিমধ্যে ইন্দ্রও বড় বড় ডাল কেটে একাই কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন প্রজাপতি কাশ্যপের যজ্ঞে যোগদান দিতে। পথের মধ্যে বালখিল্য ঋষিদের ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে ইন্দ্র হাসতে শুরু করেছেন, হেসে একেবারে কুটিপাটি। ইন্দ্রের ওই হাসি দেখে বালখিল্য ঋষিদের আবার খুব রাগ হয়ে গেল – আমাদের এই দুরবস্থা দেখে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এইভাবে উপহাস করছে! ঠিক আছে দেখাচ্ছি। তুমি আমাদের দেখে এইভাবে উপহাস করছ! বলেই সঙ্গে সঙ্গে ওখানে বসেই ওনারা যজ্ঞ শুরু করে দিলেন। যজ্ঞের কি উদ্দেশ্য? স্বর্গের নতুন রাজা হোক।

বালখিল্য ঋষিরা ছিলেন সত্যসঙ্কল্প। যেমনি বলে দিলেন স্বর্গের নতুন রাজা হোক, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র সহ সব দেবতাদের তো কাঁপুনি ধরে গেছে। সব দেবতারা এসে ঋষিদের পায়ে পড়ে গেছে, আপনারা এই যজ্ঞ করতে যাবেন না, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের মার্জনা করে দিন। আর ক্ষমা কি করে করবেন, ওনারা তো সঙ্কল্প করে ফেলেছেন এখন নতুন রাজা হতে বাধ্য। প্রজাপতি কাশ্যপ যজ্ঞের আয়োজন সব বন্ধ করে বালখিল্য ঋষিদের কাছে নিজে ছুটে এসেছেন। তিনিও বলছেন 'বালখিল্যরা তোমরা এই যজ্ঞে ক্ষান্তি দাও, আর এগিয়ো না, যজ্ঞ এখানেই শেষ করে দাও'। বালখিল্যরা বলছেন 'আমাদের থামাথামির তো কিছু নেই, আমরা সত্যসঙ্কল্প, যা বলে দিয়েছি সেটাই হতে বাধ্য'। প্রজাপতি দেখছেন সত্যিই তাই, এখন তো সর্বনাশ হতে চলেছে। কাশ্যপ মুনি তখন বলছেন 'আমরা এত কষ্ট করে যজ্ঞের দ্বারা এই সৃষ্টির কল্যাণ করতে যাচ্ছিলাম আর তোমরা এই ভাবে রেগে গেলে, ইন্দ্র থাকতে এখন স্বর্গের নতুন কাউকে যদি রাজা করে দেওয়া হয় তাহলে তো সৃষ্টির ভারসাম্যটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে এক মহাসর্বনাশের ঘোর বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে'। বালখিল্যরা ছিলেন ঋষি তাই কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁদের রাগটাও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। তখন কাশ্যপ মুনি বললেন 'আচ্ছা স্বর্গের একটি অর্থ হয় আকাশ। তোমরা স্বর্গের অর্থ আকাশ রূপে নিয়ে একটা নতুন কিছু সৃষ্টি কর, তখন সেখানকার একজন নতুন রাজা হবে, আকাশের রাজা'। তখন জন্ম হল গরুড় পাখি, গরুড় হয়ে গেল আকাশের রাজা। যাই হোক এইভাবে কোন রকমে সামাল দিয়ে স্বর্গের নতুন রাজা হওয়া থেকে বাঁচা গেল। না হলে ইন্দ্রের গদি ওখানেই শেষ হয়ে যেত। কাশ্যপ মুনি যতই বালখিল্যদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দিন না কেন, ওনারা হলেন সত্যসঙ্কল্প, সেটা কেউ পাল্টে দিতে পারবে না। সংস্কৃতে স্বর্গের একটা অর্থ হয় আকাশ, সেখানে থেকে হয়ে গেল আকাশমার্গের যাঁরা বিচরণ করেন তাঁদের রাজা হলেন গরুড়। সেইজন্য আচার্য বলছেন এই ধরণের আত্মবেত্তা ঋষিরা সর্বদা সবারই পূজনীয়। এই ধরণের ঋষিদের কখন চটাতে নেই, উপহাস করতে নেই। সব সময় সুযোগ নিতে হয় এই ধরণের ঋষিদের কিভাবে জল দিয়ে পাদপ্রক্ষালন, সেবা, শুশ্রূষা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা যেতে পারে।

এমন কি যারা ঐশ্বর্য চাইছে, যাদের কোন ধরণের কষ্ট আছে, সেই কষ্টের নিবারণ করতে চাইছে, তারা আত্মজ্ঞানীর কাছে গিয়ে তাঁকে সেবা করে যদি প্রসন্ন করা যায় তাহলে যে ঐশ্বর্য চাইছে তার ঐশ্বর্য হয়ে যাবে, যে কষ্টের নিবারণ চাইছে তার কষ্ট চলে যাবে। আমাদের শাস্ত্রে গুরুবন্দনার ভাবটাও এই একই। কারণ

আমাদের পরম্পরাতেই বলা হয় গুরুই ব্রক্ষা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই শিব। আমাদের বিশ্বাস গুরুর কৃপা যদি একবার হয়ে যায় তাহলে তার অনেক কিছুই হয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য গুরুকে আত্মজ্ঞানী হতে হবে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমগ্র ভক্ত সমাজ মনে করে আমার গুরু আত্মজ্ঞানী। সবারই নিজস্ব গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির জন্যই বলছে। কিন্তু গুরু সবার জন্য সব ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করেন না। ঠাকুরের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই – ঠাকুর দেখছেন নরেনের এত কষ্টে দিন যাচ্ছে। ঠাকুর নরেনকে বলছেন ‘ওরে আমি তোর জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি’। কিন্তু তার জন্য যে নরেনের সব অভাব মিটে গেল তাও নয়। তবে মোটা বস্ত্র মোটা অন্ন হয়ে গেছে। ঠাকুর যদি চাইতেন তাহলে কি সব কষ্ট কি চলে যেত না? নিশ্চয়ই যেত, কারণ সত্য সঙ্কল্প নিজের জন্য যা চাইবে, সেটা হয়ে যাবে। অপরের জন্য যা প্রার্থনা করবে তাও হবে, কেউ যদি তাঁকে তুষ্ট করতে পারে তাও হবে। সেইজন্য দুর্বাসা মুনিকে সবাই খুব ভয় পেত।

এটা যেমন জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা গেল, এরও একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে। সেই আধ্যাত্মিক দিকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে শেষ মুণ্ডকে অর্থাৎ তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে গিয়ে। আমরা এখন মুণ্ডকোপনিষদের শেষ খণ্ড আলোচনা করতে যাচ্ছি। তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

দ্বিতীয় খণ্ড

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ।।৩/২/১।।

(যে ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত হয়ে আছে এবং যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ পরম আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে জানেন। যেসব নিষ্কাম ধীমান পুরুষ আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, তাঁরা জন্মের কারণকে অতিক্রম করেন।)

এর আগে বলা হল আত্মবেত্তার কাছে যারা সকাম ভাবে গিয়ে তাঁকে সেবাদির দ্বারা তুষ্ট করে তাদের সব কামনা সিদ্ধ হয়ে যাবে। সবাই তো সকাম ভাবেই যায়, মানুষ কি আর করবে সে নিজের জন্য হয়ত কিছু চাইছে না, আমার সামান্য কিছু হলেই হয়ে যাবে, না হয় আমি না খেয়েই থাকব। কিন্তু তার উপর যারা আশ্রিত হয়ে আছে, তার স্ত্রী সন্তানাদি আছে, বৃদ্ধ বাবা-মা আছে, এদের সুখ-সুবিধা দেখতে হচ্ছে। ঠাকুর সেইজন্য পরিষ্কার করে দিচ্ছেন – পঞ্ছি আর দরবেশ সঞ্চয় করবে না। কিন্তু পঞ্ছির যখন ছানাপোনা হয় তখন সেও তাদের খাওয়ানর জন্য মুখে দানা নিয়ে আসে। সন্তান প্রতিপালন করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য। কত দিন করবে? যত দিন না তারা নিজে স্বাবলম্বী হচ্ছে। পাখিও বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পর কাছে এলে ঠুকরে দেয়। আমেরিকায় এবং বিদেশে এটাই, তোমাকে লালন-পালন করে, শিক্ষা দিয়ে বড় করে দিয়েছি এবার তোমার রাস্থা তুমি দেখে নাও। কিন্তু সেখানে এটা করা হয় ভোগ বাসনার জন্য। এখানে করা হচ্ছে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের জন্য। আমার যা কর্তব্য আমি পালন করে তোমাকে যা করার করে দিয়েছি, এবার তুমি নিজের মত থাক, সারা জীবনতো আমি তোমার দায়ীত্ব নিতে পারব না। গৃহীরা যখনই কোন সাধুর কাছে যায়, মন্দিরে যায় সব সময় সে সকাম ভাবেই যায়। সকাম ভাবে গেলেও সে যদি সেবা দিয়ে আত্মবেত্তাকে সন্তুষ্ট করে দিতে পারে সে তখন যা চাইবে তাই পাবে। কুন্তীভোজের কাছে যখন দুর্বাসা হাজির হলেন তখন তিনি দাসী বা চাকরকে না পাঠিয়ে নিজের মেয়েকেই সেবার জন্য দুর্বাসার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে দুর্বাসা মুনির সেবায় কোন গোলমাল না হয়। এটা হয়ে গেল সকাম ভাবে সেবা।

প্রথমে বলে দেওয়া হল তুমি যদি সকাম ভাবে তাঁর সেবা কর তাহলে তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আর যদি নিষ্কাম ভাবে করা হয়, আপনাকে আমার ভালো লাগে তাই আপনাকে সেবা করছি, আমি কিছু চাই না। যদি নিষ্কাম হয় তাহলে কি হয় সেটা বলছেন মন্ত্রের শেষ লাইনে – *তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি*, সে *শুক্রম্*কে

অতিক্রমণ করে যায়। *শুক্রম্ অতিক্রমণ্* মানে যে বীজের জন্য মানুষকে জন্ম নিতে হচ্ছে সেই বীজকে সে অতিক্রম করে যায়। এর শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়াবে তার মন থেকে কামিনী-কাঞ্চনের ভাব মুছে যায়। এর তাত্ত্বিক অর্থ হল তার যে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন রয়েছে সেটাকে সে অতিক্রম করে যায়। জন্ম নিতে হলে সে যেই হোক, মহাত্মাই হোক আর সাধারণ হোক, সবাইকে মা-বাবার দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়েই আসতে হবে। এখন বিজ্ঞানে ক্লোনিং ইত্যাদি জন্মের অনেক রকম পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরম্পরাতে দৃঢ় মত হল পুরুষের শুক্র অর্থাৎ যেটা বীজ তার থেকেই সৃষ্টি চলে, জীব ওটাকেই আশ্রয় করে নারীর শরীরে প্রবেশ করে।

যখন অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণের সাথে কর্ণের যুদ্ধ চলছিল তখন কর্ণ সর্পবাণ ব্যবহার করছে। তক্ষকের পুরনো রাগ অর্জুনের উপর, তাই তক্ষক এসে সর্পবাণের উপর বসে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ আগে থাকতেই বুঝে গিয়েছিলেন। যখন সর্পবাণ অর্জুনের প্রতি কর্ণ ছেড়েছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে চেপে রথটাকে মাটিতে অনেকটা বসিয়ে দিতেই সর্পবাণ অর্জুনের কপালে না লেগে মুকুটে লেগে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেল। তক্ষক আবার কর্ণের কাছে গিয়ে বলছে 'একবার তোমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে কিন্তু তুমি ছাড়বে না'। কর্ণ তখন বলে দিল 'যে বাণ আমি একবার ব্যবহার করেছি দ্বিতীয়াবার সেই বাণ আর ব্যবহার করব না। তুমি কে?'। 'আমি তক্ষক আমি অর্জুনকে বদলা নেব তাই তুমি আবার সর্পবাণ সন্ধান কর'। কর্ণ শুনে তক্ষককে বলে দিলেন 'অপরের সাহায্য নিয়ে আমি অর্জুনকে হারাব না'। এখান মূল কথা হল, তক্ষক অর্জুন পর্যন্ত কি করে পৌঁছাবে? তক্ষকেরও একটা আশ্রয় দরকার। যিনি জীব, তিনি যতই উচ্চমানের জীবই হোন না কেন, শরীর ধারণ করতে হলে তাকে শুক্র আর যোনির সংযোগকে আশ্রয় করতেই হবে, এর বাইরে কোন পথ নেই। এখানে বলছেন নিষ্কাম ভাবে যিনি এই আত্মবেত্তার সেবা করেছেন তিনি এই বীজটাকেই অতিক্রমণ করে যান। তার আর কোন বাসনাই হবে না যে আমি আবার সৃষ্টিতে আসব। ফলে এই জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রকে সে অতিক্রম করে যায়।

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম, যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি জানেন যত রকমের কামনা আছে তার যে পরম আশ্রয়, উৎকৃষ্ট আশ্রয় হল ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন। তাই যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান তখন সব কিছুই তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসে। যার সোনার আংটি, সোনার নেকলেস খুব প্রিয় এখন তার যদি একটি সোনার খনি হাতে এসে যায় তখন সে যখন যত রকমের খুশি ডিজাইনের সোনার আংটি, সোনার নেকলেস বানিয়ে পড়তে থাকবে। ব্রহ্ম হলেন এই সোনার খনি। জগতের যত কিছু বস্তু সবই ওই সোনারই নাম রূপের খেলা। যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিন ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন, তখন তিনি যেটা চাইবেন সেটাই পেতে পারেন।

জগতের যা কিছু ভোগ আছে ভোগ্য দ্রব্য আছে তার শেষ আশ্রয় হল ঈশ্বর। এটাই আমরা আকবর বাদশা আর ফকিরের কাহিনীতে পাই। আকবর এক ফকির বাবাকে বলেছিল কিছু প্রয়োজন হলে আমার কাছে আসবেন। ফকিরের কিছু দরকার পড়েছে, তিনি আকবরের কাছে চাইতে এসেছেন। এসে দেখছেন আকবর নমাজ পড়ছেন, ইশারায় ফকিরকে বসতে বললেন। নমাজ পড়ার পর আকবর প্রার্থনা করছে আল্লা আমাকে আরও ধন দাও, দৌলত দাও, সম্পত্তি, এই দাও সেই দাও। ওই শুনে ফকির উঠে ওখান থেকে চলে আসছেন দেখে আকবর আটকেছেন। আকবর জানতে চাইলে ফকির বলছেন 'আমি এলাম আপনার কাছে আশা নিয়ে কিছু টাকাকড়ির জন্য। এসে দেখছি আপনিও ভিখারীর মত আল্লার কাছে একই জিনিষ চাইছেন। তাহলে ভিখারীর কাছে আমি চাইতে যাব কেন। ভিখারী যাঁর কাছে চাইছে আমিও তাঁর কাছেই চাইব'।

বেলুড় মঠে যারা ব্রহ্মচারী হয়ে প্রথম আসে তাদের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে পেরিয়ে সন্ন্যাসী হতে হয়। শেষের আগের ধাপ হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য হওয়ার পর দু বছর ট্রেনিং সেন্টারে থাকতে হয়। তখন তার পূর্বাশ্রমের নামটাও পাল্টে ব্রহ্মচারী অমুক চৈতন্য হয়ে যায়। এরপরে শেষ ধাপ সন্ন্যাস। প্রত্যেক ধাপে মঠের অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করতে হয় যে আমি ব্রহ্মচারী হয়ে যোগদান করতে চাইছি। তারপর এক বছর পর আবার আবেদন করে বলতে হবে আমার এক বছর হয়ে গেছে আমার কাছা খুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া

হোক, তারপর আমাকে ব্রহ্মচর্য পালনের অনুমতি দেওয়া হোক। সন্ন্যাসের সময়েও ঠিক এইভাবে অনুমতি নিতে হয়। অনেক আগেকার একটা ঘটনা আছে, একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন তিনি সন্ন্যাস নেওয়ার সময় সন্ন্যাসীর এই আবেদন পত্রটি নিয়ে ঠাকুরের মন্দিরে রেখে এসেছেন। ব্রহ্মচারীর মনের ভাব হল, যদি চাইতে হয় তাহলে আকবর বাদশার কাছে কেন চাইব সোজা খোদার কাছেই চাইব। আমাকে সন্ন্যাস যদি চাইতে হয় তাহলে আমি ঠাকুরের কাছেই চাইব। তখন স্বামী মাধবানন্দজী ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি এই ব্রহ্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি সন্ন্যাসের জন্য জেনারেল সেক্রেটারীকে আবেদন না করে ঠাকুরের কাছেই তো আবেদন করেছ'? 'হ্যা মহারাজ'। 'তাহলে ঠাকুরই তোমাকে সন্ন্যাস দেবেন'। ব্রহ্মচারীর আর বেলুড় মঠে সন্ন্যাস হল না। পরে রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে দিলেন। কাশ্মীরে শ্রীনগরের কাছে তিনি বিশাল আশ্রম করে আছেন। কিন্তু খুব উচ্চমানের সাধু।

বালী মিউনিসিপ্যালিটি সব বাড়িতে জল সরবরাহ করছে, আমি বলছি ঠাকুরই আমার বাড়িতে জল সাপ্লাই করছেন। জল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে বালী মিউনিসিপ্যলিটি অফিসে দরখাস্ত না করে বেলুড়ে ঠাকুরের মন্দিরে দরখাস্ত ফেলে দিলেই সাপ্লাই চালু হয়ে যাবে। এগুলো আমাদের জন্য নয়। যাঁরা পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর নির্ভর তাঁদের জন্য। যাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্থ, কাম এমন কি ধর্মও, তাদের জন্য নয়। আমাদের বেশীর ভাগ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য অর্থ আর কাম, খুব হলে ধর্ম, কিন্তু এখনও মোক্ষের পর্যায়ে যায়নি। এখানে যে ফকিরের কথা বলা হল এরা হলেন মোক্ষ পথের পথিক, তাঁদের কাছে এই জগতের কোন তাৎপর্যই নেই। কিন্তু যারা নিষ্কাম ভাবে সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করে তারা মুক্ত হয়ে যায়, জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করে যায়।

বলছেন যত রকমের কামনা হতে পারে সব কামনার আশ্রয় ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে যিনি স্পর্শ করে নিয়েছেন সেখানেই তাঁর সব কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যে ব্রহ্মপদে এই নিখিল বিশ্ব সম্পূর্ণ সমর্পিত, *স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং*। শুধু যে সব কিছু তাঁর পরম আশ্রয়ে আছে তা নয়, এই যে বিশ্ব সংসার দেখছি এই ব্রহ্মের মধ্যেই নিহিত। ব্রহ্মের বাইরে কিছু নেই। আর তার সাথে *ভাতি শুভ্রম্*, অথচ সেই ব্রহ্মকে দেখাচ্ছে *শুভ্রম্*। তাহলে ব্রহ্মের তিনটে বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন – যত রকমের কামনা-বাসনার আশ্রয় ব্রহ্ম, দ্বিতীয় সমস্ত বিশ্ব তাঁর মধ্যেই নিহিত আর তৃতীয় তিনি নিজে *শুভ্রম্*, মানে একেবারে নির্মল। আবার ধ্যান ধারণা করে গভীরে গিয়ে হৃদয় গুহায় তাঁকে দিব্যজ্যোতি রূপে দেখা যায়। পরে দেখছেন এই দিব্যজ্যোতিই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই ধরণের আত্মজ্ঞ পুরুষ পরিষ্কার তিনটে জিনিষ দেখছেন, এক যা কিছু পাওয়ার সেই ব্রহ্ম থেকেই পাওয়া যায়, দুই জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আর তিন এই ব্রহ্ম *ভাতি শুভ্রম্*, স্বয়ংজ্যোতিতে দেদীপ্যমান। সেইজন্য বলা হয় যাঁরা ওঁ উপাসনা করেন তাঁরা যা কিছু কামনা করেন তার সব কিছুই পান। কারণ ওঁ ব্রহ্মের বাচক, নাম আর নামী যেমন অভেদ ওঁ আর ব্রহ্ম তেমনি অভেদ।

প্রথমে বললেন আপনি সোজা ব্রহ্মের উপাসনা করুন, আত্মোপসনা করে আত্মজ্ঞ হয়ে যান। যদি না পারেন তাহলে যাঁরা আত্মজ্ঞ তাঁদের উপাসনা করুন। হৃদয়রামকে ঠাকুর সেটাই বলেছিলেন, তুই আমার সেবা করে যা ওতেই তোর সব কিছু হয়ে যাবে। হৃদয়রাম বুঝলো না, সে চাইল ব্রহ্মোপসাক হতে, মুখে বললেই কি ব্রহ্মোপাসক হওয়া যায়! যদিও বলা হয়, যে কোন লোকই ব্রহ্মের উপাসনা করতে পারে, কিন্তু সবার সেই প্রস্তুতি নেই। এই কারণেই বলা যাঁরা এই সাধনা করেছেন আগে তাঁদের সেবা কর। যাঁরা মুমুক্ষু, যাঁরা নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন, যাঁদের কোন ঐশ্বর্যের তৃষ্ণা নেই, এঁরা যদি আত্মজ্ঞের সেবা করে সন্তুষ্ট করতে পারেন তাতেই তাঁদের সব কিছু হয়ে যাবে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কিছু লোক আসত তারা ভাবত ইনি বুঝি টোটকা বা ওষুধ দেন। ঠাকুর শুনে বলছেন – সে আমি না, ও আরেকজন আছে। আত্মজ্ঞ তো ছেড়েই দিন, ঠাকুর হলেন সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম। এখানে আত্মজ্ঞ পুরুষের কথা চলছে, যিনি সিদ্ধ পুরুষ তাঁর কাছে কেউ যদি যাঞ্ছা করে তিনি ইচ্ছামাত্র তা পূরণ করে দিতে পারেন। সেখানে ঠাকুর হলেন সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ, তাঁর কাছে গিয়ে টোটকা চাইতে গেলে ঠাকুর বলছেন – সে আমি নয়, ও আরকেজন আছে তার কাছে যাও। ঠাকুর এসেছেন তাঁদেরই জন্য যাঁরা তৃষ্ণা রহিত। আর যারা তৃষ্ণাবান তারা কি করল? সব শ্রীমার কাছে লাইন

দিয়েছে। শ্রীমা নিজে বলছেন – ঠাকুর নিজে সব বাছাই করা সেরা গুনোকে নিয়ে নিলেন আর আমার কাছে এক সের দুধে এক মন জল মেশান দিয়ে গেলেন জাল দিতে দিতে আমার চোখের জল বেরিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা তৃষ্ণা রহিত তাঁরা ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন আর যারা সতৃষ্ণ তারা মায়ের কাছে যায়, এরা ঠাকুরের কাছে দাঁড়াতেই পারবে না, ছিটকে যাবে। শ্রীমা এসেছেন সবার জন্য।

আচার্য বলছেন *তমপ্যেবংবিধামাত্মজ্ঞং পুরুষম্ যে হি অকামাঃ বিভূতিতৃষ্ণাবর্জিতা।* বলে গুরু আর ইষ্টে ভেদ করতে নেই। আগেকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা তো এত উন্নত ছিল না, এখন ওয়েবসাইট আছে, ইন্টারনেট আছে, মোবাইল ফোন আছে, সংবাদপত্র টিভি আছে যার জন্য সারা দেশে কোথায় কোন মহাত্মা আছেন, আর কে আসল মহাত্মা কে নকল মহাত্মা সবটাই জানাজানি হয়ে যায়। আগেকার দিনে এত কিছু সুযোগ ছিল না, সাধারণ লোক আর কোথায় যাবে, তাই যিনি গুরু, গুরু বলতে কুলগুরুরাই আগে দীক্ষা দিতেন, কুলগুরুরাই সাধারণ মানুষের ভরসা ছিল। কুলগুরুরা আবার সংসার ধর্মও পালন করতেন, গৃহস্থদের সাথেই তাঁদের ওঠাবসা ছিল। এখন কি আর করবে, আগেকার ভক্তরা তাই গুরু, কৃষ্ণ আর বৈষ্ণব এই তিনকে সমান মর্যাদায় নিয়ে যেত। এখানে বলছেন এই যে আত্মজ্ঞানী এনাকে কিভাবে পূজো করবে? *পরমিব*, ঈশ্বরের মত তাঁর পূজো করবে। পরের দিকে আচার্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন – অগস্ত্য মুনি সমুদ্র পান করে নিয়েছিলেন, সেইজন্য আজকালকার যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদেরও সম্মান করা হয়। ব্রাহ্মণকে কেন সম্মান করতে বলছেন? কারণ ব্রাহ্মণ কুলে অগস্ত্য মুনির মত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের সম্মান কেন করা হয়? শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ আর আমাদের সময়ে রাণা প্রতাপের মত ক্ষত্রিয়রা জন্ম নিয়েছিলেন বলে। এরপর বৈশ্য বর্ণে সেই রকম বিরাট কেউ নেই। শূদ্র বর্ণে যখন যাব তখন তার সংখ্যা আরও কমে যায়। ইদানিং আমেরিকার বিশ্বে এত সম্মান কেন, দেখছে সারা বিশ্বের যত মেধাবান সব ওখানে গিয়ে হাজির হচ্ছে, সারা বিশ্বের যত টাকা ওখানে গিয়ে জমছে, সারা বিশ্বের যত অস্ত্র ওখান থেকে বেরোচ্ছে। বংশে যদি একজন খুব ভালো কেউ জন্ম নেয় সেই বংশের সুনাম অনেক পরম্পরা চলতে থাকে। আত্মজ্ঞ যাঁরা হন তাঁরা গৃহস্থ কখনই হতেন না, শাস্ত্র চিন্তন আর আধ্যাত্মিক চিন্তন ছাড়া আর কিছু করতেন না। ফলে সেখান থেকে দুটো জিনিষ এসে গেল – যাঁরাই সন্ন্যাসী তাঁদেরকেই সমাজ বেশী সম্মান দেয় আর যাঁরা আধ্যাত্মিক বিদ্যা দান করেন, তা তিনি কুলগুরুই হোন বা যে কোন গুরুই হোন, তাঁকেও সবাই সম্মান করছে। কুলগুরুদের নিয়ে অনেক কাহিনী আছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে সবাই কিভাবে কুলগুরুকে সম্মান করে ভাবাই যায় না। ঠিক তেমনি ভারতে সন্ন্যাসীদের কিভাবে সম্মান করে কল্পনাই করা যাবে না। কেন এত সম্মান? আচার্য বলছেন *পরমিব*, সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঠিক এই জ্ঞানে সেবা করবে। এখানে যে কোন ব্রাহ্মণ বংশের বলে সম্মান করতে বলা হচ্ছে তা নয়, ইনি আত্মজ্ঞানী শুধু এটুকুই তাঁর পরিচয়। আর আত্মজ্ঞানী কিনা কিভাবে বোঝা যায় এগুলো আগে আলোচনা করা হয়েছে।

যাঁরা ঐশ্বর্যের তৃষ্ণারহিত হয়ে এইভাবে আত্মজ্ঞের কাছে যাবেন আর তাঁর সেবা করবেন। তোমার কি চাই? আমার কিছু চাওয়ার নেই আমি মুক্তির পথ চাই, আমি ভক্তি লাভ করতে চাই। ঠিক আছে তোমার যে গুরু আছেন তাঁকে সেবা কর। কিভাবে সেবা করতে বলছেন? ইষ্টজ্ঞানে। তাহলে কি হয়ে যায়? *তে শুক্রম্ নৃবীজং যৎ এতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবর্তন্তি,* আচার্য শঙ্কর ছিলেন প্রচণ্ড যুক্তিবাদী। আচার্যের যে কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি একবারও বলছেন না যে, পুরুষের শুক্র দিয়ে জীবের উৎপত্তি হয়, *যৎ এতৎ প্রসিদ্ধম্* জগতে এটাই প্রসিদ্ধি যে পুরুষের শুক্র দিয়ে জীবের উৎপত্তি হয়। আগামীকাল যদি প্রমাণিত হয়ে যায় পুরুষের শুক্র দিয়ে জীবের উৎপত্তি হয় না, তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না, এই প্রসিদ্ধি যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি বল ক্লোনিং দিয়েও সৃষ্টি হতে পারে, হলে হবে। কিন্তু এখানে এনাদের বক্তব্যটা কি, যে আশ্রয়কে নিয়ে জন্ম হয়। এই ব্যাপারে লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে পুরুষের শুক্রই জীবের জন্মের কারণ।

এখন বায়োলজিতে বলছে যে, জন্মের ব্যাপারে পুরুষের শুক্রের আদপেই কোন গুরুত্ব নেই। বায়োলজিতে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে মেয়েদের শুধ ডিম্বানুই নয়, তাদের শরীরের যে কোন জিনিষে যেটাতে সব কটি ক্রোমজম আছে সেটাই নতুন জীবের সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। তার মানে দাঁড়াল সৃষ্টি চালানোর ক্ষেত্রে পুরুষের কোন দরকারই নেই, মেয়েরাই একা সৃষ্টি চালিয়ে নিতে পারে। আজকাল এভাবেই ক্লোনিং হচ্ছে। তাহলে পুরুষে দরকার কেন হয়? জেনেটিক বৈচিত্র্য আনার জন্য পুরুষের দরকার। যেমন কোন মেয়ের থেকেই যদি সৃষ্টি হয় সেই সৃষ্টি পুরো সেই মেয়েটির মতই হবে। মেয়েটির যে যে রোগ আছে সেই রোগও তার মধ্যে থাকবে। এর ফলে সৃষ্টি ক্রমশ দুর্বল হতে হতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। যখনই সৃষ্টিতে পুরুষের সহায়তা এসে যায় তখনই জেনেটিকসের প্রতিরোধ সম্পন্ন জিন্ গুলোকে দাবিয়ে দেয় আর কার্যক্ষম জিন্ গুলো দাঁড়িয়ে যায়। সেইজন্য দেখা যায় ক্রস ব্রিডিং যত হয়ে সেই প্রজাতি তত শক্তিশালী হয়। এটা বায়োলজিতেও প্রমাণিত হয়ে গেছে। এটা যে ইদানিং প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, আমাদের পরম্পরাতে বহু আগে থাকতেই জানা ছিল। আমাদের পরম্পরাতে একই গোত্রে তাই কখন বিয়ের সম্বন্ধ হত না। তার মানে পাঞ্জাবী বাঙালী দম্পতির সন্তান খুব শক্তিশালী হবে। একজন ফিল্ম অভিনেত্রী ব্রাটাণ্ড রাসেলকে লিখেছিল – আপনার আমার যদি বিয়ে হত তাহলে কত ভালো হত, তাহলে আমাদের সন্তানের মধ্যে আমার সৌন্দর্য আর আপনার বুদ্ধি হত। ব্রাটাণ্ড রাসেল তাড়াতাড়ি করে চিঠি লিখলেন – উল্টোটাও ভাবুন। তবে এর খারাপ দিকও আছে, এগুলোকে যদি বেশী উৎসাহিত করা হয় তাহলে তাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা খুবই বেশী হবে। সেইজন্য আম গাছ, গোলাপ গাছের গ্রাফটিং করে করে একটা ভালো প্রজাতি যখন দাঁড়িয়ে গেল, এরপর পরিবেশ দূষণ ও অন্যান্য দূষণ থেকে তাকে রক্ষা করে ওই নতুন প্রজাতিটাকে ধরে রাখতে হবে। এরপরেও যদি ওই নতুন প্রজাতিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যায় তখন গোলমাল লেগে যাবে।

ব্যাসদেবের সময়েই হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিক্সিংটা প্রবল হয়েছিল। এ ওকে বিয়ে করছে, সে তাকে বিয়ে করছে। এরপর একটা জায়গা থেকে ব্যাসদেব সেটাকে আটকে দিলেন। এরপর সব প্রজাতিকে চারটে বর্ণের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হল – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এবার যা বিয়ে হবার সেটা ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে করবে। ব্রাহ্মণ এখন আর কোন জাতি নয়, বর্ণ হয়ে গেল। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যবস্থা করে দেওয়া হল, সেখানে আর অন্য কিছু করা চলবে না। এখন আবার এই ব্যবস্থাটা ভেঙে গেছে, এখন কে কাকে বিয়ে করছে, কে কার সঙ্গে থাকছে কোন ঠিক নেই। এই অবস্থাটা আবার দুশো বছর ধরে চলবে, কারণ ভারতে এখন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হচ্ছে। মোটামুটি তিনশ বছর পর আস্তে আস্তে পুরো নতুন প্রজাতি উঠে আসবে আবার তখন সেই আগের নিয়মে চলে যাবে, আমাদের এখন সব কিছু ঠিক ঠিক হয়ে গেছে আর এখন ক্রস ব্রিডিং চলবে না। মাঝে মাঝে এই ক্রস ব্রিডিং এর প্রয়োজন হয়। এই ক্রস ব্রিডিংএর জন্য পুরুষের দরকার পরে। ক্রস ব্রিডিং যদি না চায় তাহলে মেয়েরাই সৃষ্টির ব্যাপারে যথেষ্ট। তবে যে কটি ক্লোনিং হয়েছে সেখানে দেখা গেছে ক্লোনিং থেকে সৃষ্ট যে কোন প্রাণীই প্রচণ্ড রোগাক্রান্ত হয়। যার জন্য এদের প্রচুর এ্যন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধ খাওয়াতে হয়, যার জন্য এই ক্লোনিং পদ্ধতিতে আখেরে সুবিধা কিছু হয় না। কিন্তু তাত্ত্বিক ভাবে এটা প্রমাণিত যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখন পুরুষের কোন দরকারই হয় না। আগে মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা করার জন্য মোরগের দরকার হত। কিন্তু এখন আর দরকার হয় না। এখন মুরগীর ডিম গুলোকে নিয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ইম্পালস্ দিয়ে দেয় তাতেই ওর ফার্টিলাইজেশান প্রসেস শুরু হয়ে যায়। পোল্ট্রি ফার্মে সব মুরগীগুলোকে সেইজন্য দেখতে একই রকম।

তাহলে আচার্যের এই ভাষ্যের কি হবে? কিছুই হবে না। উনি পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন লোকে এটাই প্রসিদ্ধি আছে যে জীবের জন্মের কারণ হল *শুক্রম্*। মূলতঃ *শুক্রম্* বলতে এখানে বলতে চাইছেন জন্মের যে আধার সেটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা এখন জন্মের আধার ইলেক্ট্রিক্যাল ইম্পালস দিয়েই কর, ক্লোনিং করেই করুক আর পুরুষ দিয়েই করা হোক বা যেভাবেই করুক না কেন, জীবকে সেখানে আসতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানী এখন বলে দেবে আমরা তো ইলেক্ট্রিক্যাল ইম্পালস দিয়ে দিয়েছি আর কিছুর দরকার নেই। দরকার নেই মানে!

জীবকে তো ওখানে কোন না কোন প্রসেসে আসতে হবে। তাহলে জীব কিভাবে আসছে? ঋষিরা দেখেছেন জীব যখন স্বর্গ বা অন্য কোন লোক থেকে নামছে তখন পঞ্চাগ্নির মাধ্যমে নেমে পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে, সেখান থেকে মায়ের শরীরে আশ্রয় করে জীবের জন্ম হচ্ছে। এগুলো এনারা প্রত্যক্ষ দেখেছেন। কিন্তু ঋষিরা এটাও বলছেন এটাই একমাত্র পথ নয়, সৃষ্টির অন্যান্য পথও আছে। এখানে এ কথাটাই বলছেন লোকে এটাই প্রসিদ্ধি জীবের সৃষ্টি এভাবেই হয়। যাঁরা আত্মবেত্তাকে নিষ্কাম ভাবে সেবা করেছেন তাঁরা সৃষ্টির এই পথটাকে অতিক্রমণ করে যান, *শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ*, মানে তিনি আর এই শুক্রকে আশ্রয় করেন না। তার মানে, তিনি জন্ম-মৃত্যুকে পার করে যান।

আচার্য শেষে বলছেন – *ধীরাঃ বুদ্ধিমন্তঃ; ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি,* মন্ত্রে আছে *শুক্রম্,* সেখান থেকে আচার্য টেনে নিয়ে চলে গেলেন যোনিতে, মানে যোনিতে তিনি আর প্রবেশ করেন না। এখানে যোনি বলতে কোন মাতৃযোনিকে বলছেন না, যোনি মানে যে কোন প্রজাতি। অর্থাৎ কোন প্রজাতিতে সে আসবে না। তুমি ক্লোনিং কর, তুমি ইলেক্ট্রিক্যল ইম্পালস দাও যাই কর, সেই ধীর পুরুষ আর কোন যোনিতে প্রবেশ করবেন না। *ন পুনঃ ক্ক রতিং করোতি*, তিনি কোন ধরণের রতি করেন না, রতি করেন না মানে – কোন কিছুতে তাঁর প্রীতি থাকে না। যার মধ্যে কোন কামনা-বাসনাই নেই, কোন কিছুর ইচ্ছাই নেই, সে আর কেন জন্ম নিতে যাবে! জীব কেন শরীর ধারণ করে, তার ইচ্ছে আছে আমি এই ভোগ করব, সেই ভোগ করব, সেই ভোগের ইচ্ছাপূরণের জন্য সেই ধরণের শরীর ধারণ করে।

যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষ তিনিই গুরু, যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষ তিনিই সচ্চিদানন্দ। যখন গুরুর সেবা করা হচ্ছে তখন সচ্চিদানন্দরই সেবা করা হচ্ছে, যখন আত্মজ্ঞ পুরুষের পূজো কর হয় তখন সচ্চিদানন্দেরই পূজো করা হয়। যাঁরা সচ্চিদানন্দের পূজো করবে তাঁরা তো জন্ম-মৃত্যুকে পার করবেই, এটাই তো প্রসিদ্ধ কথা। এখানে এটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, যেমন বলছেন যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর মুক্তি, যাঁর ভক্তি হয়ে গেছে তাঁরও মুক্তি। ভক্তি হওয়া মানে একমাত্র সচ্চিদানন্দের প্রতিই প্রীতি। সচ্চিদানন্দ মানে যিনি আত্মজ্ঞ তিনি সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক, যিনি আত্মজ্ঞ তিনিই গুরু। সেইজন্য ঠাকুর বার বার বলছেন সচ্চিদানন্দই গুরু, আবার বলছেন যে সে গুরু হতে পারে না। তখনকার দিনে কুলগুরুর প্রথা ছিল বলে ঠাকুর সাবধান করে দিচ্ছেন। আমরা কোথায় এখন আত্মজ্ঞ পুরুষ খুঁজতে যাব। কিন্তু আমি যখন সেই নিষ্ঠা নিয়ে সচ্চিদানন্দ জ্ঞানে গুরুর পূজা করছি, এখন গুরু যদি আত্মজ্ঞ পুরুষ নাও হন, আমি কিন্তু তাঁর সাহায্যে ধীরে ধীরে উপর উঠে আসব। আর যদি তিনি আত্মজ্ঞ হন তখন তাঁর কৃপা মাত্রই আমার সব কিছু হয়ে যাবে। তাই যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষ তিনিই সচ্চিদানন্দ, তিনিই গুরু এটাকে বুঝে নিয়ে যিনি সাধু মহাত্মা বা আত্মজ্ঞ পুরুষের পূজা সেবাদি করেন, তাঁদের সকাম ভাবে সেবা পূজা করলে যে মনস্কামনা আছে সেটা পূর্ণ হবে আর নিষ্কাম ভাবে করলে তাঁকে আর যোনিতে প্রবেশ করতে হবে না।

এখানে আমাদের নতুন একটা মুক্তির পথ বলে দিলেন – গুরুর সেবা। গুরুসেবা থেকে যখন গুরু কৃপা হয় তখন মুক্তি তার হবেই হবে। এখান থেকেই পরবর্তি কালে গুরু বন্দনাদির প্রথা প্রচলিত হয়েছে। বেদ উপনিষদে যা বলে দেওয়া হয়েছে সেটাই পুরো হিন্দু ধর্মে পরম্পরা ভাবে চলে আসছে। গুরু বন্দনা উপনিষদেই এখানে এসে গেছে। মুণ্ডকোপনিষদে স্পষ্ট করে গুরুর বন্দনার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তি কালে গীতাতে *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়ার* কথা ভগবান বলছেন, সেটা মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রকে আধার করেই বলছেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলছেন আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা দুভাবে হয়, মানে দুটো ভাবনা নিয়ে সেবা করা হচ্ছে, একটা সকাম আরেকটি নিষ্কাম ভাবে সেবা। সকাম ভাবে সেবা করলে জগতের যা কিছু চাইবে সব পাবে, নিষ্কাম সেবা হলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে পার করে যাবে। সেইজন্য নিষ্কাম হওয়ার জন্য মুমুক্ষুদের তখন বলা হয় – দেখো যেমন যেমন তোমার কামনা হবে তোমার জন্মও সেই রকম হবে। সেইজন্য তুমি নিষ্কাম হতে চেষ্টা কর, নিষ্কাম হয়ে গেলে তোমার পুনর্জন্মের কোন সম্ভবনা থাকবে না।

মুণ্ডকোপনিষদের শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি। এখন আমরা যদি আমাদের আলোচনাকে অল্প কয়েকটি কথায় বলতে চাই তাহলে দেখতে পাব মুণ্ডকোপনিষদে মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। আত্মা কি, আত্মার জ্ঞান কিভাবে পাওয়া যায়, আত্মার জ্ঞান লাভ যদি কেউ করে নেন তাহলে তাঁর কি হবে আর শেষ বিষয় হল আত্মজ্ঞান যদি না হয় তাহলে কি হবে। মুণ্ডকোপনিষদ এই চারটে জিনিষের মধ্যেই ঘুরছে। আমাদের সব কটি উপনিষদকে যদি দুধ জাল দেওয়ার মত জাল দেওয়া হয় তখন জাল দিতে দিতে এই চারটে জিনিষে গিয়েই দাঁড়াবে। উপনিষদের সার গীতা, তাই গীতাও এই চারটে জিনিষকে নিয়েই আলোচনা করে – আত্মার স্বরূপ কি, আত্মাকে কিভাবে জানা যাবে, তৃতীয় আত্মার স্বরূপ জানলে কি হয় আর না জানলে কি হবে। এই চারটে জিনিষকে একটি শব্দে দিয়ে যদি বলা হয় তখন এটাকেই বলবে ব্রহ্মবিদ্যা।

ভারতের জাতীয় গর্ব

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় হিন্দু ধর্ম কি, হিন্দু ধর্মের আদর্শ কি অথবা এই ভারতবর্ষের জাতীয় গর্ব কি, তখন এই একটা শব্দেই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে – ভারতবাসীর জাতীয় গর্ব হল ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা হল আত্মা কি এটাকে জানা, অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে জানা। আত্মাকে জানা, ভগবানকে জানা, নিজের স্বরূপকে জানা সব একই। কিভাবে আত্মাকে জানা যেতে পারে, ভোগ করে জানা যাবে, নাকি যোগ করলে জানা যাবে। তৃতীয় জানলে আমাদের কি লাভ হবে, আমাদের কি গাড়ি, বাড়ি হবে, নাকি আমাদের সব খাওয়া-পড়ার সমস্যা মিটে যাবে। আর চতুর্থ না জানতে পারি, আত্মজ্ঞান যদি আমার না হয় তাহলে আমার কি হবে। আত্মজ্ঞান যদি না হয় তাহলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকবে। জন্ম-মৃত্যুর চক্রেরও আবার বর্ণনা করা হচ্ছে। পুরো হিন্দু ধর্ম এই একটি মাত্র বিদ্যার মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে রেখেছে।

যদি কোন ভারতীয়কে প্রশ্ন করা হয় আপনি কি ভারতীয় হিসাবে নিজেকে গর্বিত মনে করেন? এর উত্তর অনেক রকম হতে পারে। কেউ বলবেন হ্যাঁ আমি ভারতীয় হিসাবে নিজেকে গর্বিত মনে করি। কেউ বলবেন গর্ব করার কি আছে, আমি আমার নিজের কাজের জন্য গর্বিত, কেউ মনে করেন আমি মানুষ, আমার কাছে কে ভারতীয়, কে আমেরিকান, কে পাকিস্থানি এসবের কোন প্রভেদ নেই। এখন যাঁরা নিজেদের ভারতীয় রূপে গর্বিত মনে করছেন তাঁদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কিসের জন্য নিজেকে ভারতীয় রূপে গর্বিত মনে করেন। আমাদের মন্ত্রী থেকে শুরু করে একটা সান্ত্রী পর্যন্ত সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত, আর সবাই এক অপরকে দেখিয়ে যাচ্ছে। হামামে সবাই উলঙ্গ হয়ে স্নান করে, হামামে সবাই এক অপরকে দেখিয়ে যাচ্ছে দেখ দেখ তুমি উলঙ্গ। ভারতের গ্রামের কোনে কোনে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। তাহলে ভারতের এই সংস্কৃতির জন্য কি আমরা নিজেদের ভারতীয় বলে গর্বিত মনে করতে পারি?

আমাদের ভেতরেই এখন গলদ। স্বামীজী সমস্ত ভারতবাসীদের মধ্যে এই চেতনাকেই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। কয়েকটি জাতির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই, তাদের মধ্যে দুর্নীতির কথা বাদই দিলাম, কারণ দুর্নীতি তো এদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার কিন্তু তার থেকেও মারাত্মক ব্যাপার যে এরা নিজেও মরার জন্য প্রস্তুত আবার অপরকে মারার জন্যও প্রস্তুত। কোন মানুষ যখন অপরকে মারার জন্য মানসিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় তখন তার জন্য একটা বিরাট শক্তি লাগে। মিলিটারিতে সৈনিকদের মানসিকতাই সেই ভাবে তৈরী হয়ে যায়, শত্রুকে সুযোগ পেলেই মেরে উড়িয়ে দাও। মিলিটারি একাডেমির একজন পদস্থ অফিসার কিছু দিন আগে বলছিলেন একটা মানুষকে খুন করা অত সহজ কাজ নয়। আসামের আলফাদের জঙ্গী আন্দোলন দমনে মিলিটারির একজন সৈন্যকে দেখিয়ে একজন বলছেন ইনি এক সঙ্গে তিনজনকে খুন করেছিলেন। যাঁকে এই কথা বলছিলেন তিনি শুনে বলছেন 'এতে আশ্চর্যের কি আছে, ওনার তো এটাই কাজ'। তখন সেই অফিসার বলছেন 'আপনি বুঝতে পারছেন না, একটা মানুষকে খুন করা খুব কঠিন'। ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত আসামীকে যখন ফাঁসিতে ঝোলান হয় তখন ফাঁসির দড়ি যে টানবে তাকে আগে খুব করে মদ খাইয়ে দেওয়া হয়, এটা সরকার থেকেই অনুমোদন করা আছে। যারা খুনি তারাও কাউকে খুন করতে যাওয়ার আগে মদ খেয়ে নেয়। কিন্তু যত জেহাদী আছে এরা তো কেউ মদ খায় না, তাদের ধর্মে নিষেধ আছে,

কিন্তু তা সত্ত্বেও এক সঙ্গে হাজার হাজার বিধর্মীকে মারার জন্য সব সময় মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে। এই যে আফগানিস্থানে বাড়ির মধ্যে ঢুকে, বম্বিং করে মানুষকে মেরে যাচ্ছে, পাকিস্থানে এত খুন হচ্ছে এর জন্য একটা শক্তির দরকার। এই শক্তি তারা কোথা থেকে পাচ্ছে। এর থেকেও আরও মারাত্মক ব্যাপার এরা শান্ত মনে নিজে মরার জন্য প্রস্তুত। যত সিআইএর এজেন্ট আছে, মোসাহিদ্, তালিবান্ যত আছে এরা সবাই নিজে মরার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। এরা এই শক্তি কোথা থেকে পাচ্ছে? একজন জেহাদী দুর্নীতিগ্রস্ত হবে, একজন সিআইএ এজেন্ট, ইজ্রায়েলী এজেন্ট এরা কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত হবে এটা কখন কল্পনাই করা যায় না। একজন মুসলমান, একজন ইজ্রায়েলী আত্মহত্যা করবে কল্পনাই করা যায় না।

তাহলে গলদটা কোথায়? যেটা স্বামীজী দেখিয়ে গেছেন, যেটা আচার্য শঙ্করও দেখাননি কারণ সেই সময় আচার্যের দরকার হয়নি। সেটা হল এদের সবারই একটা ভাব আছে যে, আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। আমাদের ছোটবেলা থেকে বলা হয় বিনয়ী হতে শেখো। কিন্তু না, আগে গর্ব করতে শেখো, তোমার মধ্যে অহঙ্কার হোক। স্বামীজী এটাই বার বার চেয়েছিলেন। স্বামীজী কোথাও বলেননি যে তুমি বিনম্র হও, নিজেকে ছোট কর। স্বামীজী বলছেন তোমার মধ্যে শক্তিকে জাগ্রত কর, ভাবতে শেখ আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজকে ভালো করে বিচার করে দেখার সময় এসেছে ভারতবাসী হিসাবে আমরা অন্যান্য জাতির চেয়ে কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। স্বামীজী বলছেন সারা বিশ্ব তোমার পায়ের তলায় এসে বসবে। কার পায়ের তলায় এসে বসবে? যে শ্রেষ্ঠ তার পায়ের তলাতেই তো এসে বসবে। কিন্তু তুমি ভারতবাসী হিসাবে কিসে শ্রেষ্ঠ? আধ্যাত্মিকতায় তুমি সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ।

ওল্ড টেস্টামেন্টকে অবলম্বন করে ইজ্রায়েলীরা সবাই মনে করে আমরা হলাম ঈশ্বরের নির্বাচিত বিশিষ্ট মানব। খ্রীশ্চানরাও তাই মনে করে, যিশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র আমরা হলাম সেই যিশুর লোক। আমাদের জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিজের জীবন বলিদান দিয়েছেন। মুসলমানরা বলে, আল্লা ছাড়া আর কোন ভগবান নেই, একমাত্র আল্লাই আছেন। আল্লার পথকে যারা বেছে নিয়েছে তারাই ঠিক পথে চলছে বাকি সব আহাম্মক। আল্লা মহম্মদকে আমাদের জন্য দূত করে পাঠিয়েছেন। যারাই মহম্মদের কথা মত চলছে, যারাই ইসলামের লোক তারাই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকানরা, ওদের ভেতরে ভেতরে যাই ভাব থাকুক, বলছে আমরাই হলাম বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক ভাবসম্পন্ন জাতি – আমরা মানবাধিকার এনেছি, আমরা গণতন্ত্র এনেছি, আমরা সমতা এনেছি ইত্যাদি। বৃটিশরাও ঠিক তেমনি মনে করে আমরা হলাম বিশ্বের সব থেকে সভ্য ও কৃষ্টি সম্পন্ন জাতি। এক সময় ছিল যখন, আমরা হলাম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি, শুধু এটুকু বিশ্বাসকে পুঁজি করে ছোট্ট একটা দ্বীপ অর্ধবিশ্বকে শাসন করে গেল। এই যে বিশ্বাস আমি হলাম এই বিশ্ব সংসারে একজন বিশিষ্ট ব্যাক্তি আর আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাসই একটা জাতিকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যায়। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন জমিদার বাড়ির ছোট বাচ্চাও যদি গ্রামের কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যায় তাকে সেখানে সেই সম্মানই দেওয়া হয় যে সম্মান জমিদারকে দেওয়া হয়। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের যদি কোন মিটিং হয় সেখানে টাটা হল সব থেকে বড় কোম্পানির, টাটা যদি কোন জুনিয়র অফিসারকেও প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে সেই সম্মানই দেওয়া হবে যে সম্মান টাটাকে দেওয়া হত। এই সম্মান পাওয়ার জন্য চাই পরিচিতি, আমি অমুক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি? ব্রহ্মবিদ্যাই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাকে নিয়ে ভারতের কি কোন জাতীয় অহঙ্কার বা গর্ব ছিল? ছিল, চিরদিনই ছিল। কিন্তু এই অহঙ্কার একমাত্র ছিল ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণদের এতই অহঙ্কার ছিল যে তাঁরা বলতেন আমরাই হলাম একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, একমাত্র আমরাই ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য জানি। ব্রাহ্মণদের এতই অহঙ্কার ছিল, শূদ্রকে কাছে আসা দূরে থাক শূদ্রের ছায়াও তাঁরা স্পর্শ করতেন না। আর ম্লেচ্ছ! তুমি আমার ধারে কাছেই আসবে না। মনিয়ার উইলিয়মস্ ছিলেন একজন বিচারক, কলকাতাতেই থাকতেন, খুবই বিখ্যাত লোক। ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারার সাথে পরিচিত হওয়ার পর সংস্কৃতের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড শ্রদ্ধা উদয় হল। উনি চাইলেন সংস্কৃত থেকে ইংরাজীর একটা অভিধান তৈরী

করবেন। তখন সংস্কৃতের অভিধান বলে কিছু ছিল না। এই ব্যাপারে উনি পণ্ডিতদের কাছে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলেন। ভারতে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্য চলছে। ইংরেজ তখন রাজা, আর তাদের তিনি বিচারপতি। পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে তিনি ঘুরতে শুরু করলেন। কিন্তু সব পণ্ডিতদের এক কথা, সংস্কৃত শেখানো দূরে থাক, ম্লেচ্ছের সাথে কথাই বলব না। শেষে একজন ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে রাজী হলেন, আপনাকে আমি শেখাব তবে শর্ত আছে। রোজ সকালে আপনাকে গঙ্গাস্নান করে আসতে হবে, দ্বিতীয় শর্ত আমি আমার বাড়ির ঘরের ভেতরে বসব আর আপনাকে আমার ঘরের বাইরে উঠোনে বসতে হবে। আমি ঘরের ভেতর থেকে যা বলার জোরে জোরে বলে যাব, সেটা শুনে আপনার যা লেখার লিখে যাবেন যা শোনার শুনে যাবেন। মনিয়ার উইলিয়মস তাতেই রাজী হলেন। আর কয়েক বছর ধরে তাই করে গেলেন। রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করে পণ্ডিতের বাড়িতে আসতেন। এসে বাড়ির উঠোনে যেখানে ঝাড়ুদাররা দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে কাগজ কলম নিয়ে বসতেন। পণ্ডিত মশাই ম্লেচ্ছের মুখ দেখবেন না বলে ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে লাগলেন। এই করে করে মনিয়ার উইলিয়মস সংস্কৃত শিখলেন। কলকাতা হাইকোর্টের তিনি একজন বিচারক তাঁকেই এইভাবে সংস্কৃত শিখতে হল। সেখান থেকে তিনি সংস্কৃতের অভিধান তৈরী করলেন। আজ প্রায় দুশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনও সংস্কৃতের নির্ভরযোগ্য একমাত্র অভিধান হল এই মনিয়ারের উইলিয়মসের তৈরী সংস্কৃত থেকে ইংরাজী অভিধান। পরবর্তি কালে যাঁরাই সংস্কৃতের অভিধান তৈরী করেছেন সবাই মনিয়ার উইলিয়মস থেকেই কপি করে লিখেছেন। ওনার এই অভিধানের বাইরে কোন কিছু ছিল না। জাতে বৃটিশ ছিলেন, ওরা যে কাজটা করবে একেবারে নিষ্ঠা নিয়ে পাকা কাজ করে ছাড়বে।

সম্রাট আকবরের একবার ইচ্ছা হল আমি শুনতে চাই উপনিষদে কি আছে। কোন ব্রাহ্মণই রাজী হলেন না। আপনি সম্রাট হতে পারেন কিন্তু আপনি ম্লেচ্ছ, আমরা আপনাকে আমাদের শাস্ত্র শোনাব না। এখানেও কিভাবে কিভাবে একজন ব্রাহ্মণ রাজী হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁরও শর্ত হল সে বাদশার মহল্লার ভেতরে পা দেবেন না। তাহলে কিভাবে হবে? একটা কপিকল থাকবে, সেই কপিকলে একটা খাটিয়া থাকবে, সেই খাটিয়াতে পণ্ডিত মশাই বসে থাকবেন। কপিকল সেই খাট শুদ্ধু পণ্ডিতকে রাজমহলের ছাদের উচ্চতায় নিয়ে যাবে। আর ব্রাহ্মণ যেন বাদশার মুখ না দেখতে পায়, সেইজন্য যা কিছু করার রাত্রিতেই করতে হবে। ব্রাহ্মণ রোজ রাত আটটা নটায় আসতেন, ব্রাহ্মণ কপিকলের সাহায্যে খাটিয়ায় বসে আকাশে ঝুলছেন, আর ওখান থেকে বাদশাকে উপনিষদ শোনাতেন। এই ছিল ব্রাহ্মণের অহঙ্কার। ব্রাহ্মণদের এই অহঙ্কার চিরদিনের অহঙ্কার ছিল। স্বামীজী বলছেন, ব্রাহ্মণদের এই অহঙ্কার যদি না থাকত আজকে এই ভারতবর্ষকে মুসলমানরা মুসলিম রাষ্ট্র বানিয়ে দিতে আর ইংরেজরা সবাইকে খ্রীশ্চান বানিয়ে দিত।

মদন মোহন মালব্য, যিনি বেনারস হিন্দু বিশ্বাবিদ্যালয় তৈরী করেছিলেন। বৃটেনের হোম সেক্রেটারি একবার মদন মোহন মালব্যকে বললেন, আমি যদি ব্রাহ্মণ হতে চাই আমাকে ব্রাহ্মণ করবেন? চিন্তা করুন বৃটেনের হোম সেক্রেটারি মানে হোম মিনিস্টার, আর তখন ভারত আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ঝামেলা তুঙ্গে। কিন্তু বৃটেনের হোম সেক্রেটারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতের একজন হিতৈষী ছিলেন, তাঁরও ইচ্ছে ভারতের জন্য কিছু কিছু অর্থনৈতিক ছাড় দেওয়া হোক। মদন মোহন মালব্যও তখনকার দিনের খুব অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শুনে বললেন 'ব্রাহ্মণ! না না কোন প্রশ্নই ওঠে না আপনাকে ব্রাহ্মণ করার। আপনার যদি খুবই ইচ্ছা থাকে ব্রাহ্মণ হওয়ার, তাহলে আগে মনে এই বাসনাটাকে খুব তীব্র করুন। তারপর আপনার এই শরীরের মৃত্যুর পর ভারতে এসে শূদ্র হয়ে জন্মাবেন। তারপর সেখানে কয়েক জন্ম ধরে খুব সেবা করুন, তারপর বৈশ্য হয়ে, ক্ষত্রিয় হয়ে তারপর আপনার সংস্কার যদি খুব ভালো হয় তাহলে কয়েক জন্ম পরে আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাবার সুযোগ পাবেন'। মদন মোহন মালব্য কোন ব্যঙ্গ বা হাসিঠাট্টার ছলে এই কথা বলছেন না। মদন মোহন মালব্য তিনি নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন আর তিনি জানেন বৃটেনের এই হোম মিনিস্টার থেকে ভারতের জন্য অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে, মালব্যও তাঁকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন। এই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের ফল কি হতে পারে তার নিদর্শন আমরা ইতিহাসের সেই কাহিনীতে পাচ্ছি যেখানে

আলেকজাণ্ডার এক ব্রাহ্মণকে বলছেন ‘তোমাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব, তুমি যদি না যাও তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে’। ব্রাহ্মণ হেসে বলছেন ‘জীবনে তুমি এর থেকে বড় মিথ্যা কথা বলোনি। কারণ আমি হলাম সেই আত্মা, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারেনা’। এই হল ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি সম্মানের প্রতিফল। মুসলমানরা যখন ব্রাহ্মণদের বলল ‘তোমাকে গরু খেতে হবে আর মুসলমান হতে হবে, নাহলে গলা কেটে দেব’। ব্রাহ্মণদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, গলা কেটে দেবে তো দাও। অন্যান্য যে জাতিদের কথা আগে বলা হল এরা অন্যের উপর প্রভুত্ব দেখাতে চায়, কিন্তু ব্রাহ্মণরা কখন কারুর উপর প্রভুত্ব দেখাতো না। প্রভুত্ব না দেখিয়ে ব্রাহ্মণরা বলে দিত, ভাই তুমি নিজের মত থাক, আর খুব বড় হও কিন্তু আমাকে বিরক্ত করতে এসো না। আমাদের কাছে তোমরা ম্লেচ্ছ, তোমার সঙ্গে যদি কথা বলি, তোমার সঙ্গে যদি মেলামেশা করি তাহলে আমাকে আবার স্নান করতে হবে তাই তুমি আমার থেকে দূরেই থাক। ব্রাহ্মণদের এই যে অহঙ্কার, এই অহঙ্কার হল একমাত্র এই কারণে যে আমার কাছে জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা আছে। তোমরা বলছ, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, আমরা এটাকে মানিনা আর যুক্তিতর্কেও দাঁড়াচ্ছে না, আমরা বিশ্বাস করি একমাত্র জীবনমুক্তিতে। ব্রহ্মবিদ্যাতে চারটি জিনিষকে জানা যায়, আত্মা কি, আত্মাকে কিভাবে পাওয়া যায়, আত্মাকে জানলে কি হয় আর না জানলে কি হবে।

মুসলমানরাও আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করছে, খ্রীশ্চানরাও তাই করছে। ব্রাহ্মণ মানে জন্মগত ব্রাহ্মণ নয়, যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন। এই ব্যাপারে আচার্য শঙ্কর ভীষণ কট্টর, তিনি পণ্ডিতের সংজ্ঞা দিচ্ছেন যাঁর আত্মবিষয়ক জ্ঞান আছে এবং আত্মবিষয়ক বুদ্ধিতে সদা জাগ্রত তিনিই একমাত্র পণ্ডিত। ঠাকুরও বলছেন যখন দেখি পণ্ডিতের ত্যাগ-বৈরাগ্যাদি আছে তখন তাঁর কথা শুনি, ত্যাগ-বৈরাগ্যহীন পণ্ডিতদের আমার খড়কুটো বলে বোধ হয়। দু হাজার বছর আগে যিনি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আচরণ বিধি ঠিকে করে গেছেন সেই মনুই বলে গেছেন জন্ম থেকে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হয় না, একমাত্র তার কর্ম ও মানসিক প্রবৃত্তির দ্বারাই সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রূপে পরিচিত হয়। সমাজ এখন স্বার্থপরতা আর লোভের মধ্যে নিমজ্জ, রাজা চায় আমার ছেলেও রাজা হোক, ব্রাহ্মণ চায় তার ছেলে যেন সম্মান পাক। এরা দুজন যখন নিজেদের অবস্থাকে ঠিক করে নিল, বৈশ্যদেরও আর কোন উপায় ছিল না, মাঝখান থেকে বেচারা শূদ্রগুলো নীচেই পরে রইল। ব্রাহ্মণ মানেই যাঁর মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞান আছে আর সারাক্ষণ এই ব্রহ্মবিদ্যাকে নিয়েই চর্চা করে যাচ্ছেন।

কিন্তু সবাইতো ব্রহ্মবিদ্যাতে থাকতে পারবে না, সেইজন্য এর পরের ধাপে যাঁরা থাকবেন তাঁদের এই ব্রাহ্মণদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রাখবে। ক্ষত্রিয় মানসিকতার যারা তারা বলে দিল, দেখুন আমার দ্বারা এই ব্রহ্মবিদ্যা হবে না, অতক্ষণ জপ-ধ্যান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনার জন্য আপনারা সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন। চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, বদমাইশ এরাতো সমাজে থাকবেই, আর এদের উৎপীড়ন থেকে সর্বদা রক্ষা পাবার সেই শক্তি ও সময়ও আপনাদের নেই। সেইজন্য আপনারা যাতে পুরোপুরি ব্রহ্মবিদ্যা উপাসনায় নিজেদের ঢেলে দিতে পারেন তার জন্য আমরা এদের থেকে আপনাদের রক্ষা করব। এরা হলেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়রা ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে আছে, কারণ যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যাতে নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ রেখেছেন তাঁদের জীবন রক্ষার দায়ীত্ব ক্ষত্রিয় নিয়েছে। যেমন আমাদের দেশে যত নিউক্লিয়ারস প্রজেক্ট রয়েছে, যেখানে আমাদের স্যাটেলাইট প্রজেক্টগুলো চলছে সেখানে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণকে এই নিরাপত্তা দিচ্ছে, ব্রাহ্মণরা হলেন আমাদের জ্ঞান সম্পদ, এঁদের যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে। বৈশ্যরা বলছে, আপনাদের খাওয়া-পড়া কি করে চলবে? ঠিক আছে আমরা এই দায়ীত্বটা নিলাম। আমরা মন্দিরাদি বানিয়ে দেব, সেবা করব, শুশ্রূষা করবে। আর যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যাতে যাবেন তাঁদের প্রাণের কোন চিন্তা থাকবে না, নিজের ভোগের জন্য কোন চিন্তা থাকবে। ব্রহ্ম বিষয়ক চিন্তা ছাড়া কোন কিছুর দিকে তিনি মন দেবেন না। ব্রাহ্মণ নিজে না খেয়ে মরবে, নিজের বউকেও না খাইয়ে মারবে, সন্তানদের ক্ষেত্রেও তাই। সংসারের কোন কিছুর প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকবে না, শুধু আগ্রহই নয়, জগতের কোন কিছুতেই

তাঁর মন নেই। তাই বৈশ্যদের কাজই হচ্ছে সমাজে অর্থের যোগানকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে ব্রহ্মবিদ্যার পথের পথিকরা অকালে মরে গিয়ে এই ব্রহ্মবিদ্যাটা হারিয়ে না যায়। এর বাইরে যারা ছিল তারা বলছে আমার হাতে টাকাও নেই আর ক্ষমতাও নেই কিন্তু আমরা আপনাদের সেবা করব। এরা হল শূদ্র। একজন ব্যক্তির মানসিক গঠন ও মনে কি ধরণের প্রবৃত্তি আছে সেই দিয়ে বিচার করা হয় সে ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য না শূদ্র।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন বেদান্ত সাধনা করছেন তখন তাঁর শরীরের দিকে কোন মন নেই, আর সেই সময় পেটের খুব মারাত্মক গণ্ডগোল চলছে, দিনে পনের কুড়ি বার ঝাউতলা যেতে হচ্ছে। কোন খাওয়া হজম হচ্ছে না, হাড় আর চামড়া ছাড়া তাঁর শরীরে কিচ্ছু ছিল না। এদিকে সারা দিন বেদান্তের কথাই শুধু চলছে, বেদান্ত থেকে মন একটু ক্ষণের জন্যও সরছে না। এই হল ব্রহ্মবিদ্যা, এই ব্রহ্মবিদ্যার তোড় যখন আসে তখন সব কিছু শুকনো পাতার মত উড়ে যায়, থেকে যায় শুধু ব্রহ্মবিদ্যা। এর পরের প্রজন্মে যারা আসবে তাদেরও এই তিনটেই কাজ হবে। কেউ বলতে পারে আমার তো যোগ করার ক্ষমতা নেই ভোগের দিকেই মন, কিন্তু আপনার রক্ষার দায়ীত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নেব। কিভাবে রক্ষা করবে? হয় বাহুবল দিয়ে, তা নাহলে অর্থ দিয়ে, সেটাও না পারলে সেবা করবে। এই হল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রের সামাজিক ভূমিকা।

এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আধার করে ভারত এত দিন ধরে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। মদন মোহন মালব্য কিন্তু ভূল কথা কিছু বলেননি। কারণ স্বামীজীও লেকচারস্ ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়াতে প্রথমের দিকেই বলছেন Each soul that is bending his journey towards liberation, he has to be born in India। যে কোন আত্মা, যে মুক্তির পথে এগোতে শুরু করছে তাকে ভারতে জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এই একটি বাক্যকে যদি কেউ বিশ্বাস করে নিতে পারে তার পুরো ব্যক্তিত্বটাই পাল্টে গিয়ে ভেতরে একটা অদম্য শক্তি এসে যাবে। তোমার কাছে হাজার হাজার এ্যটম বোমা থাকতে পারে, তুমি জেহাদী হতে পার, ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র আমার কাছে আছে। তোমার কাছে যে বিদ্যা আছে সেই বিদ্যা দিয়ে তুমি মানুষ খুন করতে পারবে, ইহকালে ভোগ করতে পারবে আর পরকালেও হয়ত ভোগ করতে পারবে। জেহাদীদের শুধু একটাই কাজ, যত বিধর্মী আছে তাদের গলা কেটে দাও। ছোটবেলা থেকে এদের এই বলে বলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তুমি যদি আল্লার নামে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দাও তাহলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। স্বর্গটা কি রকম? তোমার যত রকম পছন্দের খাবার আছে সব সেখানে পাবে, তোমরা প্রত্যেকে এক একজন কুড়ি পঁচিশ জন করে হুরী পাবে মানে অপ্সরা পাবে। তোমাদের বয়স পঁচিশ বছরই থাকবে, তোমার কোন দিন কোন রকমের জরা ও ব্যাধি হবে না। এইভাবে বলে বলে জেহাদীদের তৈরী করা হয়, এরাও মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে যায়। যে আল্লা এদের এখানে এক টুকরো রুটি দিতে পারেনা, সেই আল্লা স্বর্গে গিয়ে তাদের অপ্সরা দেবে!

তুমি স্বর্গে গিয়ে অপ্সরা পেতে পার, কিন্তু সেটাও তো ভোগ। ব্রহ্মবিদ্যা যদি জানতে হয় তাহলে আমাদের কাছে আসতে হবে। যদি তোমার জানতে ইচ্ছে করে এই জীবনের কি অর্থ, তুমি যদি জানতে চাও এই জীবন কিসের জন্য, জীবন আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এই রহস্য যদি জানতে চাও তাহলে তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা জানতে হবে। এক একটা বিদ্যা জানার জন্য এক এক রকমের কর্ম করতে হবে। যদি টাকা বানাবার বিদ্যা জানতে চাও তাহলে তোমাকে আমেরিকা যেতে হবে। অন্য ভাবে ভোগা করতে চাও তাহলে তোমাকে ফ্রান্সে বা ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যা আছে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা জানতে হলে একমাত্র ভারতবর্ষেই আসতে হবে। অন্যান্য যে কোন ধর্মে যে কোন লোক ইচ্ছে করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্মে চলে আসতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম থেকে কেউ কোন দিন হিন্দু হতে পারবে না। কেন পারবে না? একজন ক্লাশ টেনের ছেলে যদি চায় ইচ্ছে করলে সে ক্লাশ সেভেন এইটে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে, সেভেন এইটের ছাত্র কোন দিন ক্লাশ টেনে ভর্তি হতে পারবে না। আমরা হলাম সেই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। এই ব্রহ্মবিদ্যা জানতে হলে তোমাকে নীচুতলা থেকে শুরু করতে হবে।

যতক্ষণ আমাদের ভারতবাসীর মনে এই গর্ব না অনুভব হয়, আমরা হলাম বিশিষ্ট লোক, আমরা হলাম ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, ততক্ষণ ভারত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ভারতবাসী ছাড়া আর সবাই ভ্রমবিদ্যার অধিকারী। ভ্রমবিদ্যা মানে কামিনী আর কাঞ্চন, শুধু ইহকালেই নয়, পরকালেও আমার কামিনী-কাঞ্চন চাই। যখন আমি মৃত্যুর পর অপ্সরাদের পাবো বলে মৃত্যুকে বরণ করছি, তার মানে কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যেই আমি আসক্ত। এই কামিনী-কাঞ্চনই হল ভ্রমবিদ্যা। যে ভারত এত দিন ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক ছিল, বর্তমান যুগে সেই ভারত হয়েছে ভ্রমবিদ্যার উপাসক। সব ভারতবাসী কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে উন্মত্ত হয়ে দৌড়াচ্ছে।

সব জাতিরই একটা বিশেষ কিছুকে নিয়ে অহঙ্কার আছে, ইস্রায়েলীরা মনে করে আমরা হলাম ঈশ্বরের নির্বাচিত বিশেষ সন্তান, মুসলমানদের এক রকম অহঙ্কার, আমেরিকার এক রকম অহঙ্কার। এই অহঙ্কার সেই জাতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করছে। ভারতবাসীর যে অহঙ্কার ভারতবাসীকে রক্ষা করবে সেই অহঙ্কারকে ভারতবাসী ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। এর ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে – আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে গেছে, হতাশা এসে গ্রাস করে নিচ্ছে, আর দুর্নীতির শীর্ষে চলে যাচ্ছে। ব্রহ্মবিদ্যার অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ মরে যাবে তবু সে মিথ্যা কথা বলবে না। একজন ক্ষত্রিয় মরে যাবে কিন্তু অধর্ম যুদ্ধ কখনই করবে না। কিন্তু যেমন যেমন আমরা সামাজিক স্তরে নামছি তেমন তেমন সেখানে এই মূল্যবোধ থেকে মানুষ সরে আসছে। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা জানে শুধু ঈশ্বরীয় কথা, আমরা কিন্তু জানি ব্রহ্মবিদ্যা। তারা জানে মৃত্যুর পর স্বর্গ গ্যারান্টি। স্বর্গের আবার অনেক রকম স্তর আছে। মুসলমানরা পরের দিকে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে অনেক কিছু জানার পর অনেক কিছু আবার সংশোধন করল যেটা কোরানে নেই, যেমন স্বর্গের নাকি আবার সাতটি স্তর আছে। আমাদের যেমন সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সারূপ্য আছে, মুসলমানদেরও এই রকম সাতটা স্তর আছে। কিন্তু ঠিক ঠিক ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের কাছেই আছে। ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষত্ব হল জীবনমুক্তি। এই শরীরে বেঁচে থাকাকালীনই তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে দর্শন করবে, এর জন্য তোমাকে স্বর্গ-নরক কোথাও যেতে হবে না। এজিনিষ কোথাও কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরকে এই চর্ম চোখে দেখা যাবে, ঈশ্বরের অনুভূতি এখানেই হবে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* এখানেই দেখব, শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন এটাকে এখানে এই শরীরেই উপলব্ধি হবে, এটা একমাত্র হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমরাই হলাম Chosen শুধু chosen নয় most chosen of the Lord।

মানুষ যখন বিদেশে অনেক দিন কাটিয়ে দেশে যখন ফেরে তখন বাড়ির লোক, বন্ধু, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন সবারই জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসেন। কিন্তু তার যারা খুব বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠ লোক, নিজের আদরের মেয়ে বা স্ত্রী বা মা, এদের জন্য একটা বিশেষ উপহার নিয়ে আসেন আর সেটা তাকে লুকিয়ে দেবেন, অন্য কেউ দেখলে যাতে তাদের মন খারাপ না হয়। হিন্দুরা হল সেই বিশিষ্ট জাতি। ভগবান সবাইকেই কিছু না কিছু দিয়েছেন, কিন্তু হিন্দুরা হল ভগবানের প্রিয়তম জাতি, তাই তাকে দিলেন এই ব্রহ্মবিদ্যা।

এখন ভগবান আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা দিলেন, কিন্তু তাকে তো ভগবান এসে সামলাবেন না, আমাদেরই সামলে রাখতে হবে। কিন্তু আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যাকে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন যাঁরা ব্রাহ্মণ বংশে আছেন, পাঁচ ছয় প্রজন্ম আগে তাঁদের পূর্বপুরুষদের বেদ মুখস্ত ছিল, জ্ঞানের জন্য তাঁরা জীবনের সমস্ত সুখভোগকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আজকে সেই ব্রাহ্মণ বংশের লোক একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুক আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এরা বলছে আমাদের বই পড়ার সময় কোথায়, বইয়ের আলমারি দেখলেই মাথা ঘুরে যায়, এত বই লোকে পড়ে কি করে! এদের বলতে ইচ্ছে হয়, আপনার লজ্জা করে না আপনার পূর্বজরা বেদ উপনিষদ রচনা করেছিলেন, আপনার লজ্জা করে না আপনার পূর্বজরা রামায়ণ, মহাভারত, আঠারোটা পুরান আর আঠারোটা উপপুরান লিখেছিলেন, আপনার লজ্জা করে না আপনার পূর্বজরা কিছু দিনে আগে গীতাঞ্জলী লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। লজ্জায় আপনারা এখন গঙ্গায় ডুবে মরে যাচ্ছেন না কেন এটাই আশ্চর্যের। এদেরই বংশধর হয়ে আপনারা কি করে বলতে পারছেন লোকেরা এত বই পড়ে কি করে! আজকালকার চ্যাংড়া ছেলেমেয়েরা বলছে ধর্মকর্ম করে কি হবে! এদের এই কথা বলতে লজ্জা করে না কেন ভেবে আশ্চর্য লাগে, যার জন্য এদের

পূর্বপুরুষরা সমস্ত জীবন দিয়ে দিলেন, সেই ধর্মের ব্যাপারে এরা প্রশ্ন করতে আসে! শুধু একটা প্রজন্ম নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শুধু ধর্মের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

ভারতের এই একটাই বৈশিষ্ট্য, ভারতের কাছে আছে ব্রহ্মবিদ্যা। ধর্ম সব জায়গাতেই আছে, ধর্ম মানে যেখানে মানুষ সাধনা করে ভগবানের সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? মুসলমানরা বলছে মুসলমান না হলে তোমার ভগবানের সাক্ষাৎ হবে না, খ্রীশ্চানরা বলছেন খ্রীশ্চান ছাড়া ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারবে না। হিন্দুরা কখনই এই কথা বলবে না, হিন্দু বলছে যে কোন লোকেরই হবে, আর তুমি যেখানে আছ সেখান থেকেই তোমার হবে। আর তোমার জীবদ্দশাতেই যা হবার হবে, মৃত্যুর পর তো হবেই। এই যে বলে কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, এগুলো বেদান্ত গ্রাহ্যই করবে না। জীবনমুক্তি যে হিন্দুধর্মের মুকুটমণি শুধু তাই নয়, এটাই হিন্দুধর্মের আদর্শ। এই জীবদ্দশাতে, এই শরীরে ঈশ্বর দর্শন হবে আর নিত্য সেই ঈশ্বরকে দর্শন করবে। চোখ বুজলে ঈশ্বর আছেন আর চোখ খুললে ঈশ্বর নেই, তা নয়। হিন্দু ধর্ম বলে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। মুসলমানরা যেমন বলে অন্য কোন দেবতা নেই একমাত্র আল্লাই ভগবান। হিন্দু ধর্মে উল্টো বলছে, এখানে বলছে অন্য দেবতাদের তো কোন প্রশ্নই নেই, এখানে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই।

কিছু দিন আগে একজন বুদ্ধিজীবি হিন্দুদের নিন্দা করে বলছেন, হিন্দুদের সব কিছুই ভগবান, এদের সাপও ভগবান, ইঁদুরও ভগবান, বাঁদরও ভগবান সবই ভগবান। আসলে এরা কিছুই জানেনা আর বোঝেও না। হিন্দু ধর্মে কোথাও বলে না everything is God। মেরী হেলকে স্বামীজী এটাই বলেছিলেন, সব উল্টা বুঝলি রাম, হিন্দুরা কোথাও বলে না everything is God, বলে God is everything। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, এই বোতলটা ভগবান নয়, ভগবানই এই বোতল হয়েছেন, ভগবানের বাইরে কিছু নেই। এই যে অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা বলছে আমার ধর্ম না নিলে স্বর্গে যেতে পারবে না, আমার ধর্মের লোক ছাড়া কেউ ঈশ্বরের কৃপা পাবে না, তখন বোঝা যায় এদের কিছু একটা গোলমাল আছে। যখন বলছে আমার ধর্মের লোক না হলে কেউ ঈশ্বরের কৃপা পাবে না, তখন তুমি বলতে চাইছ তোমার ঈশ্বরের বাইরেও কিছু আছে। হয় পুরোটাই তোমার ঈশ্বর আছেন আর তা নাহলে তোমার ঈশ্বরের বাইরেও কিছু আছে, এটা তো খুব সহজ ব্যাপার। তোমার ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করলেন তখন সৃষ্টির উপাদান তিনি কোথা থেকে এনেছেন, বাইরে থেকে এনেছেন, না কি নিজের ভেতর থেকেই এনেছেন? যদি বাইরে থেকে এনে থাকেন তাহলে তোমার ঈশ্বরের বাইরেও কিছু আছে, তাহলে তো তোমার ঈশ্বর আর সর্বশক্তিমান হলেন না। ঈশ্বর যদি ভেতর থেকে উপাদান নিয়ে আসেন তাহলে ঈশ্বর কখন বাড়ছেন কখন কমছেন। যে কোন দ্বৈতবাদী ধর্মকে এই সব যুক্তি দিয়ে তুলধুনো করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ কিছু কথা বলতে চায় না। আর হিন্দুরা নিজেরাই এখন জানে না উপনিষদ কি বলছে গীতা কি বলছে, শুধু শুনেছে উপনিষদ গীতা বলে কিছু আছে। তাই নয় আমাদের আবার নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা করে। যেটা আমাদের অহঙ্কার ও গর্বের জিনিষ, যে জিনিষ আমাদের ধমনীতে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে, যে জিনিষ আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধিতে শক্তি সঞ্চার করে আসছে সেখানে আমরা বলছি এটা আমাদের লজ্জার জিনিষ। আজ তাই আমরা সব দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছি, আমাদের ব্যক্তিত্বে আর সেই জৌলুষ নেই, কাপুরুষতা আর নির্লজ্জতা আমাদের আচরণে সর্বক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

কিছুদিন আগে India Calling নামে একটা নতুন বই বাজারে এসেছে, তাতে একটি যুবকের অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে। ছেলেটির বাবা-মা বরাবর ভারতেই ছিল, পরে আমেরিকাতে চলে যায়। ছেলেটির জন্ম আমেরিকাতেই। মাঝে মধ্যে ভারতে আসে। যখন ওর পঁচিশ ছাব্বিশ বছর, তখন ওর ইচ্ছে হল কাছ থেকে ভারতকে ভালো করে দেখতে হবে। এখন সে বম্বেতে এসে আমেরিকান কোম্পানীতে চাকরি করছে। এই চাকরী করতে গিয়ে তার যে নানান রকমের অভিজ্ঞতা ও অনুভব হয়েছে সেটারই বর্ণনা দিচ্ছে।

তার মধ্যে ভারতে জাতিপ্রথা কিভাবে কাজ করে একটা খুব মজার ঘটনা দিয়ে তার বর্ণনা দিচ্ছে। ছেলেটির বাবা-মা আমেরিকা থেকে ছেলের কাছে বম্বেতে এসেছে। তাদের এক বড়লোক বন্ধুর বাড়িতে সকালে

ব্রেকফাস্টের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ওই বাড়িতে তিন-চারজন চাকর আছে। সকালে যখন বন্ধুর বাড়িতে এরা উপস্থিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে খুব সম্মান করে চাকররা দরজা খুলে চারবার করে সেলাম ঠুকে আপ্যায়ন করছে। ছেলেটি চাকর-বাকরদের আদব-কায়দা আর আদর-আপ্যায়নে খুব অভিভূত হয়ে গেছে। অন্য দিকে তার একটু লজ্জা লজ্জাও করছে, কারণ আমেরিকাতে মানুষ নিজেকে এত ছোট করে এই ধরণের আদব-কায়দা দেখিয়ে আদর-আপ্যায়ন করবে ভাবা যায় না। এক দেড় ঘন্টা কাটিয়ে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাড়িতে এসে ছেলেটির হঠাৎ মনে পড়ল এদের কাছ থেকে সে একটা তোশক নিয়ে এসেছিল, সেটাকে ফেরত দেওয়ার জন্য গাড়িতে করে নিয়েও গিয়েছিল কিন্তু গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেরত দিতে ভুলে গেছে। বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলল, তোশকটা ফেরত দিয়ে আসছি। গাড়িতে পাঁচ-দশ মিনিটের রাস্তা। ইতিমধ্যে ওই বাড়ির লোকের বেরিয়ে চলে গেছে। চাকরগুলো আছে। ছেলেটি তোশকটা ঘাড়ে করে নিয়ে দরজায় কলিং বেল টিপেছে। প্রথমে তো চাকরটা অল্প একটু দরজা ফাঁক করে বলছে 'কি চাই'? ছেলেটি আস্তে করে বলল 'তোশকটা দিতে এসেছি'। 'ঠিক আছে, ওখানে রেখে দে'। অবাক কাণ্ড! আধ ঘন্টা আগে যে চাকররা সেলাম সাব করে আপনি সম্বোধন করে কত সম্মান দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল এখন সেই চাকররাই তুই তোকারিতে নেমে গেছে! 'ওখানে রেখে দে, রেখেছিস্ যাঃ এবার বেরো'। ছেলেটি বুঝতেই পারছেন কি এমন বিরাট ব্যাপার হয়ে গেল এই আধ ঘন্টার মধ্যে! ছেলেটি লিখছে 'আমার তখন মাথা ঘুরতে শুরু করেছি, হঠাৎ করে কি এমন হল যে সেই আদব-কায়দা পাল্টে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন কোন নিকৃষ্ট পশুর সাথে আচরণ করছে'। তখন ছেলেটির হঠাৎ খেয়াল হল ভারতে কোন ভদ্রলোক নিজের কাঁধে করে তোশক বয়ে নিয়ে যাবে না। তোশক একমাত্র যারা ডেলিভারি ম্যান বা চাকর শ্রেণীর কেউ কাঁধে করে নিয়ে যাবে। ছেলেটি একটা টী-শার্ট আর জিনস্ পরে আছে বলে চিনতে পারছে না, মনে করছে কোন ডেলিভারি ম্যান। তখন ছেলেটি হাল্কা করে বলল, আজকে সকালে আমাদের ব্রেকফাস্টটা খুব দারুণ ছিল। বলতেই ছেলেটির দিকে তাকিয়েই চাকরটার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্যার স্যার করতে শুরু করে দিয়েছে। আর এমন ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে যাতে ছেলেটি ভুলেও বাড়ির মালিককে যাতে কোন কথা না বলে, তাহলে ওর চাকরী চলে যাবে। ছেলেটি বলছে মানুষের চরিত্রে তার ব্যবহার যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে কিভাবে পাল্টে যেতে পারে সেটা আজ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। বাড়িতে এসে ভাবছে সমস্যাটা কোথায়। এই হচ্ছে ভারতের জাতিপ্রথা।

যখনই রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে বাসে দুজন ভারতীয়ের দেখা হবে তখন প্রথমেই দুজন দুজনকে মাপতে শুরু করবে, আমি বড়, না তুমি বড়। আচ্ছা দাদা আপনি কোথায় চাকরি করেন? যদি সরকারি চাকরি হয় তাহলে সে উপরে উঠে গেল, প্রাইভেট চাকরি যদি হয় সে নীচে চলে গেল। সরকারি চাকরিতে আপনি এখন কি পোস্টে আছেন? কি কাজ করেন? আপনার টেক হোম পে এখন কত? তারপর খুব কায়দা করে জিজ্ঞেস করবে আপনার শুভ নাম কি? উপাধি দেখে মেপে নেবে আপনি কোন জাতের। কায়স্থদের উপাধি গুলোতে আবার বোঝা যায় না, সেখানেও কায়দা করে জেনে নেবে নীচু কায়স্থ, নাকি উঁচু কায়স্থ। দুজন ভারতীয় দেখা হলে প্রথমেই চেষ্টা চলতে থাকে কে কাকে ঠোকরাবে। আমাদের জাতিপ্রথা মূলতঃ হল একজন আরেকজনকে ঠোকরান। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ, ব্রাহ্মণের উপরে আবার সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী যখন আসবে তখন তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে। ছেলেটি বলছে ভারত এই একে অপরকে ঠোকরান থেকে কোন দিনে বেরোতে পারবে না।

ছেলেটি লিখছে, হোটেলে গেছি। সেখানে চোখের সামনে দেখছি যাদেরকে আগে অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা হত আজকে তারাই অনেকে বড় বড় অফিসার হয়েছে। তারা হোটেলে খেতে গেছে, সেখানে ওয়েটাররা ব্রাহ্মণ। তাহলে এখন কি হচ্ছে? কিছুই পরিবর্তন হয়নি, যারা সেই তথাকথিক নীচু জাতের তারা অফিসার হয়ে গেছে মানে সে এবার ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে তারাই এখন তাচ্ছিল্য করে ওয়েটারদের সঙ্গে কথা বলছে, যদিও তার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। মানে পেকিং অর্ডার, অর্থাৎ আমি শ্রেষ্ঠ না তুমি শ্রেষ্ঠ শুঁকে শুঁকে বার করবে। সন্ন্যাসীরাও যখন ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছেন সেখানে কারুর সাথে পরিচয় হলেই সন্ন্যাসীকে অবশ্যই

জিজ্ঞেস করবে মহারাজ আপনার কদ্দূর পড়াশোনা আর আপনার শুভ নাম। নাম দিয়ে জানবে আপনি কোন জাতের আর ডিগ্রী দিয়ে জানবে আপনার বিদ্যা কত দূর। তারপর ঠিক করবে আপনাকে সম্মান দেবে কি দেবে না। সন্ন্যাসীরা কোথাও গেলে অনেক জায়গায় দারোয়ান প্রথমে ঢুকতেই দেবে না, পরে যখন মালিক সম্মান দিচ্ছে তখন সেই দারোয়ানদের সম্মান দেখানোর ঠেলায় সন্ন্যাসীই নাস্তানাবুদ হয়ে যান। প্রথম সন্ন্যাসীকে দারোয়ান মনে করছে এ ব্যাটা একটা কাঙালী ভিখারী। তারপর যখন দেখছে তার মালিক সম্মান করছে তখন দেখছে এখানে অন্য ব্যাপার।

স্বামীজী ঠিক এই জিনিষটাকেই তীব্র আক্রমণ করেছেন। আজকে যে আমরা ব্রহ্মবিদ্যা বলছি এই ব্রহ্মবিদ্যার অবহেলাকেই প্রথমে আক্রমণ করেছেন। প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত মানে, তুমি যদি এখন অফিসার হয়ে থাক তাহলে তোমার বিরাট এমন কিছু হয়ে যায়নি। আর তুমি যদি হোটেলের ওয়েটার হয়ে যাও তাতেও তোমার এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যায়নি। এই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী নিজের একটা ঘটনার কথা বলছেন। তিনি বিদেশে একটা কোচে করে যাচ্ছেন। একটা জায়গায় এসে কোচম্যান কোচটাকে দাঁড় করিয়ে নেমে গিয়ে রাস্থার ধারে দুটো সুন্দর বাচ্চা, তাদের পোষাকও খুব সুন্দর, কোর্ট-প্যান্ট পরা, তাদের বুকে জড়িয়ে আদর করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার কোচে এসে উঠল। স্বামীজী দেখে হতবম্ব হয়ে গেছেন। এই দুটো বাচ্চাতো ভদ্রলোকের সন্তান! কোচম্যান মানে আমাদের টাঙাওয়ালা, তাকে স্বামীজী বলছেন এরা তো দেখছি খুব সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলে, তুমি এদের কি করে আদর করলে? কোচম্যান বলছে, না, এরা আমারই বাচ্চা। আমি আগে অন্য দেশে থাকতাম সেখানে আমরা বিরাট বড়লোক ছিলাম। কিন্তু অভাবে পড়ে আমাকে দেশ ছেড়ে এখানে এসে কোচম্যান হতে হয়েছে। আমি কিন্তু আমার বাচ্চাদের ঠিক ভাবে রাখি। স্বামীজী শুনে উত্তেজিত হয়ে বলছেন This is the practical Vedanta। আমার পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে কিন্তু আমার সম্মান যেখানে ছিল এখনও ঠিক সেখানেই আছে।

আমাদের সম্মানটা কোথা থেকে আসবে? ব্রহ্মবিদ্যা থেকে। আমি হোটেলের একটা ওয়েটার হতে পারি কিন্তু আমি জানি আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। জন্মগত কারণে আমি একটা মুচি হতে পারি, তেলি হতে পারি, যা কিছু হতে পারি কিন্তু আমার মূল ভিত্তি হচ্ছে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। স্বামীজী এটার উপরেই বার বার জোর দিয়ে গেছেন। যেমন যে কোন মুসলমানের মধ্যে যে ভাত্রৃত্ব ভাব সেটা এসেছে তাদের এই বোধ থেকে আমরা সবাই হলাম আল্লার সন্তান। ঠিক তেমনি আমরা হলাম ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। কিন্তু তফাৎ হয়ে যায় এইখানে – আমার পূর্বজদের মধ্যে কেউ যদি ব্রহ্মবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না, ব্রহ্মবিদ্যার এটাই বিশেষত্ব। আমি নিজে যদি ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করি তবেই আমি ব্রাহ্মণ, তবেই আমি সম্মান পাব, তা নাহলে আমি ব্রাহ্মণ নই, আর আমার সেই সম্মানও হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে আমি যদি নাও ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করি, শুধু নিজের মধ্যে আমি যদি এই ভাবটা জাগিয়ে রাখি যে আমি মুচি হতে পারি কিন্তু আমার পূর্বজরা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের সেবা করেছিলেন, আমি জানি আমি সেই শুদ্ধ আত্মা আমারও অধিকার আছে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্জন করা, এটাই তখন ব্রহ্মবিদ্যার অহঙ্কার হয়ে যাবে, এটাই আমাদের জাতীয় গর্ব। আমাদের দেশের জন্য আজকের দিনে খুব জরুরী জাতির এই গর্বকে জাগিয়ে তোলা। নিজেদের সর্বক্ষণ ভাবা আমরা কোন সাধারণ লোক নই, আমি অফিসের কোন সাধারণ কেরানী নই, আমি সামান্য গৃহবধু নই, আমি সেই মাটিতে জন্ম নিয়েছি, সেই ধর্মে জন্ম নিয়েছি যে দেশের মাটি ও ধর্মকে ঈশ্বর বিশেষ ভাবে রক্ষাকবচ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কারণ এই জাতির হাতে ব্রহ্মবিদ্যা আছে। যতক্ষণ দেশবাসীর মধ্যে এই ভাব না আসবে, ব্রহ্মবিদ্যার জন্য গর্ব বোধ না হবে, ততদিন আমাদের মধ্যে শক্তির জাগরণ হবে না, শক্তির জাগরণ না হলে ততদিন দেশের কোন ভালো হবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র নিয়ে যত কথাই বর্তমান শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহল বলুক না কেন এগুলো ভারতের প্রাণ নয়।

আমরা অনেকেই জানিনা যে এক সময় এই ভারত সারা বিশ্বের আর্থিক সম্পদের রাজধানী ছিল, সমস্ত বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ। শুধু মাত্র আর্থিক আর সাংস্কৃতিকই নয়, জগতের যা কিছু ভালো

ছিল তার সব কিছুর রাজধানী ছিল এই ভারত। কিন্তু আজকে আমরা সব কিছুতেই দুর্বল হয়ে হীনমন্যতায় ভুগছি, কারণ আমাদের শক্তির মূল উৎসটাকে বেমালুম ভুলে বসে আছি, তাই এই দুরবস্থা। আমার কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আছে, আমি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী এই চেতনাকে জাগ্রত করে রাষ্ট্রীয় চেতনায় না রূপান্তরিত করা পর্যন্ত আমাদের ভেতরে শক্তি জাগবে না। স্বামীজী এই কথাই ঘুরিয়ে বলছেন তুমি ভেড়া নও তুমি হলে সিংহ। সমস্ত উপনিষদ, গীতা এই একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলছে।

আমরা আবার মূল উপনিষদের আলোচনাই ফিরে আসছি। ব্রহ্মবিদ্যায় চারটে প্রশ্ন, যেটা এর আগেই আমরা বলেছি। মুণ্ডকোপনিষদে এর আগের আগের খণ্ড গুলোতে আত্মা কি, আর আত্মজ্ঞান কিভাবে পাওয়া যেতে পারে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ খণ্ডে বাকি তিনটে জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করা হবে – ব্রহ্মবিদ্যা যারা সাধনা করছে না তাদের কি গতি হয় আর আত্মজ্ঞান কি কি উপায়ে পাওয়া যেতে পারে যেটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে এই খণ্ডে আবারও আলোচনা করবেন, আর আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে কি হয় এই নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বেদান্তের মূল কথা হল সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। যে কোন কারণেই হোক একটা মায়ার আবরণ বা অবিদ্যার জন্য সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকেই এই জগৎ রূপে ভাসমান দেখায়। প্রায়ই অনেককে বলতে শোনা যায় বেদান্তের এটাই মূল সিদ্ধান্ত যে এই জগৎটা মায়া, মায়া মানে জগৎ আদপেই নেই। কিন্তু বেদান্ত কখনই এই কথা বলে না, জগৎ অবশ্যই আছে, কিন্তু এই জগৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়। তুমি যেটা বস্তু রূপে দেখছ সেটা বস্তু রূপে নেই ব্রহ্ম রূপে আছে। তাহলে যিনি ব্রহ্ম তিনিই বস্তু হয়েছেন, বস্তুর ভোক্তা যে সেও ব্রহ্ম। কিন্তু বস্তু ভোক্তা যেটা মায়ার বা অবিদ্যার জন্য হয়েছে, যেটা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না, এখানে দুটোই মিথ্যা। যিনি কর্তা বা ভোক্তা আর ভোগ মানে কর্ম, এই দুটোই এক, এক অপরের উপরে ক্রিয়া করছে। করতে করতে সে গুলিয়ে ফেলছে।

এখানে অনেক সময় সমুদ্রের উপমা নিয়ে আসা হয়। সমুদ্র এখন পুরো শান্ত হয়ে আছে। যে কোন কারণেই হোক, সমুদ্রের ভেতরে যে শক্তি আছে তার জন্য সমুদ্রের জলে ঢেউ উঠতে শুরু হয়েছে। এবার প্রত্যেকটি বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে আবার ছোট ছোট ঢেউ আছে। এই বস্তু রূপ জগত-সমুদ্রে যুগে যুগে বিরাট বড় বড় ঢেউ আসে, যেমন যিশু একটি বিরাট ঢেউ, শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বিরাট বড় ঢেউ। আপনি আমি সেখানে এক একটি খুব ছোট ছোট তরঙ্গ। ঢেউ বা তরঙ্গ কিন্তু কখন সমুদ্র নয়। সমুদ্রই ঢেউ হয়েছে। বেদান্ত বুঝতে গিয়ে প্রায়ই আমরা এই ভুলটা করে বসি। এই বোতল কখনই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নয়, যিনি ঈশ্বর তিনিই বোতল হয়েছেন, যিনি সমুদ্র তিনিই ঢেউ হয়েছেন। এই ঢেউয়ের মধ্যে যে শক্তিটা আছে সেটা পর পর এক একটি ঢেউতে উঠতে নামতে থাকবে। সমুদ্রের ঢেউ এইভাবে চলতেই থাকবে, যত দিন সমুদ্র থাকবে তত দিন শেষ হবে না। একটা ঢেউ বিলীন হয়ে গিয়ে সেই শক্তিতেই আবার যখন আরেকটা ঢেউ উঠছে, সেটাই তার পুনর্জন্ম, এভাবে এই ঢেউ উঠছে, নামছে, এটা চলতেই থাকবে। কোন কারণে তার শক্তিটা যদি শেষ হয়ে যায়, ওই ঢেউটা আবার সমুদ্রের সাথে মিলে যাবে। এখানে আমি যে ঢেউ সেটা না হয় মিলিয়ে গেল, কিন্তু আমার আশেপাশে আর যত ঢেউ আছে তাদের কি হবে? তাদের ওঠা-নামা চলতে থাকবে। এগুলো উপমা, উপমাকে আক্ষরিক ভাবে সব কিছুতে লাগাতে নেই। একটা কঠিন ব্যাপারকে বোঝাতে উপমার সাহায্য নিলে জিনিষটা সহজে বোঝা যায়। বোঝা হয়ে গেলে উপমাকে ঐখানেই ছেড়ে দিতে হয়, সব কিছুতে লাগাতে গেলে এমন তালগোল পাকিয়ে যাবে যে মূল বিষয়টাই কোন দিন বুঝতে পারা যাবে না।

আমরা যখন ব্রহ্মের দিক থেকে বা তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করছি তখন এইভাবেই জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু যখন জগতের দিক থেকে দেখছি তখন দেখছি আমি আছি, আপনি আছেন। আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের পাল্লায় পরে দৌড়েই যাচ্ছি। প্রিয় জিনিষকে পাওয়ার জন্য ছুটে যাচ্ছি আর অপ্রিয় থেকে সরে আসার জন্য পালাচ্ছি। তার ফলে এই খেলা আর শেষ হচ্ছে না। একটা ঢেউ তার নিজের শক্তি পরের ঢেউকে দিয়ে দিচ্ছে, এই ঢেউটা আগের ঢেউয়েরই পরিবর্তিত রূপ। কিন্তু এই ঢেউ তো কোন জড়ের ঢেউ নয়, এই ঢেউ চৈতন্যেরই ঢেউ। তাই তার কান্নারও আর শেষ নেই। এই কান্না থেকে যদি বাঁচতে চাও, তুমি যদি

মুক্তি চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে আগে নিষ্কাম হতে হবে। কিন্তু নিষ্কাম হলেই হবে না, সাধনা চাই। নিষ্কাম হয়ে যাওয়ার পর সে কোন সাধনার দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি পায় সেটাই পরের মন্ত্রে বলছেন, ব্রহ্মবিদ্যার এটাই সার –

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।।৩/২/২।।

(যে বিষয়সমূহ এবং বিষয়ের গুণাবলীর চিন্তা করতে করতে সেই ভোগ্যবিষয়সমূহ কামনা করে সে সেই ভোগ্যবস্তুর দ্বারা পরিবৃত হয় এবং মৃত্যুর পর যেখানে যেখানে এই কাম্যবস্তুগুলি লাভ করা যায় সেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম এবং যিনি আত্মাকে লাভ করেছেন, তাঁর জীবিতাবস্থাতেই সমস্ত কামনা বিলীন হয়।)

এই মন্ত্রের অর্থ খুব সহজ। মানুষ যেমন যেমন কোন ভোগ্য বস্তুর গুণের কথা চিন্তন করে তেমন তেমন সেই বস্তু তাকে টেনে সেখানে নিয়ে চলে যায়। সেই বস্তুকে ভোগের জন্য যেমন যেমন শরীর দরকার, যেমন যেমন মন দরকার সেই অনুসারেই সব কিছু দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু যিনি *পর্যাপ্তকামস্য*, যাঁর কোন কামনা-বাসনা নেই তাঁর আর নতুন করে শরীর মন তৈরী হবে কি করে, তাঁর শক্তিটাই তো টেনে বার করে নেওয়া হয়েছে। এই পাখার সুইচকে অফ্ করে দিয়ে এর এণার্জির যোগানটাই যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে এই পাখাটা আর ঘুরবে কি করে! কিছুক্ষণ ঘুরে বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটা হল *কামান্ যঃ কাময়তে*। গীতায় এই কামনাকে ভগবান বর্ণনা করছেন – *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।* মানুষের জন্মের প্রক্রিয়া এইভাবে চলছে। প্রথমে যে কোন জিনিষের চিন্তা ভাবনা আসে। একাধিকবার একটা জিনিষকে নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে – একটা সুন্দর বাড়ি দেখল, আঃ বাড়িটা কি সুন্দর। মনটা সুন্দর বাড়ির দিকে চলে গেল, এবার ওই বাড়ির ধ্যানই সে করতে থাকবে। ভালো বাড়ি, ভালো গাড়ি, ভালো মুখশ্রী, যে কোন ভালো জিনিষের প্রতি আমাদের সবার দৃষ্টি যেতেই পারে, সেটা কোন দোষের নয়, আর তাতে কিছু হয়ও না। গোলমালটা তখনই হয় যখন ভেতরে যে দৃষ্টির ছাপটা গিয়ে পড়েছে সেটা নাড়া দিয়ে যখন বলবে চলো আরেকবার তাকাই। যে কোন জিনিষ যেমনি দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছে হবে তখনই বুঝতে হবে এবার কিন্তু গোলমালের সূত্রপাত হতে চলেছে, দাবানল শুরু হতে যাচ্ছে। কামিনী আর কাঞ্চন ছাড়া তো জগতে কিছু নেই, কামিনী অনেক রকম রূপের মুখোশ চাপিয়ে আকৃষ্ট করছে আর কাঞ্চনের অনেক রকম রূপ। একটা সুন্দর গাড়ি দেখলাম, দ্বিতীয়বার যখন ঘুরে গাড়িকে দেখছি তখন বুঝে নিন গাড়ির প্রতি সঙ্গ এসে গেছে। সঙ্গ মানে আসক্তি। বস্তুর মধ্যে সেই শক্তি কোথায় যে আমাকে টানবে, আমার ভেতরে যে শক্তি আছে সেটাই ওই বস্তুকে টেনে ভেতরে নিয়ে আসছে। *সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ*, তখন তার মনের মধ্যে সেই বিষয়ের কামনার জন্ম হয়, আমারও ওই জিনিষটা হোক।

ঋষিদের এই নিয়ে অনেক কাহিনীর মাধ্যমে এর পরিণতি কি হতে পারে দেখান হয়। গভীর বনে ঋষি তপস্যা করছেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি চলে গেল দুটো পাখির প্রতি, যারা গাছের একটা ডালে মৈথুনে রত। একবার দেখে নিল, দ্বিতীয়বার তাকিয়ে আরেকবার দেখে নিল, ব্যস্, তাঁর মাথার মধ্যে মৈথুন বসে গেল। কিছু করার থাকে না, কারণ এই সংস্কারগুলো আগে থাকতেই ভেতরে বাসা বেঁধে রয়েছে, পশুর মৈথুন দেখে সেই সংস্কারটা হঠাৎ করে চাড়া দিয়ে তাঁকে উল্টে ফেলে দিল। এখন হয় তপস্যা ছেড়ে এই কামের পুর্তি করতে হবে নয়তো পুর্তি হবে না। কাম পুর্তি করতে গলে আমাকে কাজ কর্ম করতে হবে, কর্ম না করলে কামের পুর্তি হবে না, এটাই সহজ কথা। এই কাজ কর্ম তাকে আরও নতুন কর্মের জন্ম দেবে। আমার ইচ্ছে হল বিদেশে গিয়ে একটা বড় নামী ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি। সেখানে গিয়ে আরও নতুন কিছু জানব, তখন সেই নতুন কিছুর প্রতি আবার আসক্তি জন্মাবে। যদি কামের পুর্তি না হয় তখন কি হবে? *কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে*,

এবার তার মনে ক্রোধের জন্ম হবে। এই সিরিজ চলতেই থাকবে। যদি কামের পুর্তি না হয় তখন যার জন্য এই বিঘ্ন এসেছে তার প্রতি ক্রোধ হবে। যদি তার প্রতি সেই ক্রোধটাকে বার না করতে পারি তাহলে যাকে সামনে পাব তার প্রতিই বিষ ঢালবে। কেরানী অফিসে বসের কাছে অপদস্ত হচ্ছে, বাড়িতে সেই বিষ বউ ছেলে-মেয়ের উপর ঢালে। বউ সেই বিষটা ঝিয়ের উপর ঢালবে। এই সিরিজ চলতে থাকে। *ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ*, মন যদি অনেকক্ষণ ক্রোধের মধ্যে ডুবে থাকে তখন সম্মোহ এসে তাকে গ্রাস করে নেয়। *সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ*, যা কিছু পড়াশোনা করেছে, শাস্ত্রাদি তখন কোন কাজে আসে না। *স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো*, বুদ্ধির কাজ হল কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক বলে দেওয়া, স্মৃতি যার চলে গেছে তখন তার বুদ্ধিটাও নাশ হয়ে যায়। *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*, যার বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে তার আর কিছুই থাকল না। কোথা থেকে শুরু হয়েছিল? খুব সাধারণ একটা জিনিষ থেকে, একটা বাড়ি কি গাড়ি সাধারণ দেখেছে সেখান থেকে তাকে কোথায় এনে ছিটকে ফেলে দিয়েছে। গীতার এই দুটি শ্লোকে মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের পুরোটাই সূত্রাকারে বলে দেওয়া হয়েছে।

সেইজন্য যোগী যখনই একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি যেতেই তাঁর ভালো লেগে যায়, যখনই বুঝে ফেলেন যে আমার আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে করছে, উনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে নিয়ে দৃষ্টিটাকে আটকে দেন। সাধুর কাম বেগ আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, সাধুর যদি কাম বেগ না আসে তাহলে তার মাথায় নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে, তাকে ডাক্তার দেখান দরকার। ঠাকুরেরও কাম বেগ এসেছিল। ঠাকুরের যখন কাম বেগে এসেছে তখন তিনি কি করছেন? একেবারে মাটিতে মুখ ঘষড়ে ঘষড়ে রক্ত বার করে দিয়েছেন আর বলছেন – মা এরপর যদি এই রকম হয় তাহলে গলায় ছুরি দোবো। স্বামীজীর যখন এই বেগ এসেছে তিনি জ্বলন্ত আগুনে বসে পড়েছেন, তাঁর পুরো পাছা পুড়ে গেছে, আর বলছেন – এর পর আবার যদি আস তখন আরও কড়া সাজা দেব। প্যারিসের রাস্থা দিয়ে স্বামীজী যাচ্ছেন, দেখছেন সামনে এক অপরূপা সুন্দরী নারী, ওই রূপের প্রতি নজর যেতেই স্বামীজীর মাথাটা মুহুর্তের জন্য ঘুরে গেছে। কিন্তু স্বামীজীর মন এমন ভাবে তৈরী হয়ে আছে যে, স্বামীজী বর্ণনা করছেন সঙ্গে সঙ্গে দেখছি ওই সুন্দর মুখ একটা বাঁদরের মুখে পরিবর্তিত হয়ে গেল। *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে*, স্বামীজী সঙ্গই হতে দিলেন না। সঙ্গ মানে যে তার কাছে যেতে হবে তা নয়, মনে মনে চিন্তা করতে করতে জিনিষটার প্রতি আসক্তি এসে যায়। যখন মানুষ কোন জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলে তখন তারই ছবি চারিদিকে দেখতে শুরু করে। তখন সে অনেক কিছুই করতে শুরু করে। একটা মেয়েকে হয়তো সে ভালোবাসত, সেই মেয়েটি হয়তো তার কাছ থেকে সরে গেছে, এখন যে কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখলেই হয়ত বোমা মেরে দেবে অথবা যাকে দেখবে তার প্রতিই আকর্ষিত হয়ে যায়, অনেক কিছুই হতে পারে।

এতো গেল জীবিত অবস্থায়। এর আবার অন্য দিক আছে। শৈশবে হয়ত কোন জিনিষ দেখে ভালো লেগেছিল, এত দিনে হয়ত আমি সেটা ভুলেও গেছি। এখন বৃদ্ধ বয়সে অনেক কিছুই খেতে ভালো লাগে, কিন্তু দাঁতে ব্যাথার জন্য খেতে পারছি না, কোন রকমে দাঁতকে অতিক্রম করে গলায় চলে যায় গলাটা খুস্‌খুস্ করতে থাকে। সেখান থেকে খাওয়াটা যদি পেটে কোন ক্রমে পৌঁছে যায় তখন কত বার যে বাথরুমে দৌড়াতে হবে তার ঠিক নেই। এখন আমি ভাবছি এবার আমি এগুলো থেকে পেরিয়ে এসেছি। অনেককেই বলতে দেখা যায় আমার আর কোন কামনা-বাসনা নেই। আরে ভাই কামনা-বাসনা কি অত সহজে আমাদের ছাড়বে। গীতায় কি বলছে? *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*, যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, যার রুগ্ন তারা তো ভালো খাওয়া-দাওয়া আর ভোগ থেকে সরে আসবে, এটা তো জানা কথা। কিন্তু তার ভেতরে বিষয়ের প্রতি রসটা কোথায় যাবে? কোত্থাও যাবে না, বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণার রস পুরোদমে থেকে যায়। ঠাকুরও বলছেন – পায়রাকে দেখে মনে হবে ভেতরে কিছু নেই কিন্তু গলায় হাত দিলে বোঝা যাবে দানাতে গিজ্‌গিজ্ করছে।

এটাই মন্ত্রে বলছেন *কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র*। শুধু ছোটবেলা থেকে নয়, এর আগের আগের জন্মে যে কর্মগুলো করা হয়েছে সেগুলো তো আছেই কিন্তু তার সাথে আগে থাকতেই যত রকম কামনা-বাসনা ছিল, ধরুন কোন এক জন্মে আমি আর আপনি এক সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার কোন

ব্যবহারে আপনি ঠিক করেছিলেন একে একটা ভালো রকমের শিক্ষা দিতে হবে, সেটাও হয়ত দশ জন্ম কি পনের জন্ম আগে ছিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরও অনেক কর্ম করে এইবার আবার আপনাকে আমার মুখোমুখি নিয়ে এল। আমিও জানছি না কেন, আপনিও জানছেন না কেন, কিন্তু আপনি আমার সর্বনাশটি করে ছাড়বেন। কিছু করার নেই এখানে। চারিদিকে যা কিছু ঘটছে এগুলোকে তাই সাধুরা খুব বেশী গুরুত্ব দেয় না। এই লোকটি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল, এই লোকটিই আবার জেলে চলে গেল, সাধুরা বলবে এগুলো কিছুই না, সব কর্মের খেলা। তাঁরা জানেন তার যে কামনা-বাসনা ছিল সেটাই তাকে নিয়ে খেলা করছে। সন্ন্যাসীদের তাই বলা হয় মেয়েদের থেকে খুব সাবধান থাকতে। সাধুটির হয়তো মেয়েটির প্রতি কোন আসক্তিই নেই। কিন্তু কোন এক জন্মে, হয়ত দশ জন্ম আগে তোমাকে হয়ত স্বামী রূপে কামনা করেছিল। সেই কামনা তখন পূর্ণ হয়নি। এবার সেই যোগযোগ হয়ে গেছে, তুমি সাধুই হও আর যাই হও এবার কিন্তু তোমাকে সে উল্টে ফেলবে, সন্ন্যাসীর বাঁচার কোন পথ নেই। শুধু একজনের দোষে আর ঘটনাচক্রে সব কিছু হয় না। কোন ড্রাইভার জেনে বুঝে গাড়ি দিয়ে কাউকে ধাক্কা মারতে চায়? কখনই না। দুজনের দোষে বা অপরের দোষে হয়। আপনি হয়ত ভালো গাড়ি চালাতে পারেন কিন্তু ব্রেক ফেল করল, তখন কিছু করার থাকবে না, একজনকে ধাক্কা মেরে গাড়ি থামাতে হবে। হিন্দুরা কখনই বলবে না এটা নিছক কোন দুর্ঘটনা।

শপেনহাওয়ার ছিলেন খুব নামকরা বিজ্ঞানী ও লেখক, তিনি উপনিষদ ও গীতা পড়ে খুব অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি কখন মনে করতেন না যে, এই জগতে দৈবাৎ বলে কিছু আছে। দৈবাৎ যদি না থাকে তাহলে কি থাকবে? কর্ম। কর্ম মানেই তোমার কোথাও কোন কামনা ছিল। আমাদের যত পূর্ব পূর্ব জন্ম পার করা হয়েছে সব জন্মের পেছনে একটা মূল জায়গা আছে সেটা হল *কামঃ*, এই কামই হল সব কিছুর প্রেরণা শক্তি। সমুদ্রের যে ঢেউ, সেই ঢেউ তৈরী হতে একটা শক্তি লাগে। আমাদের শরীর ধারণের, জীবন চালনার পশ্চাতে যে শক্তি সেটা হল এই কাম ভাব। যে কোন কাম ভাব, আমি কখন প্লেনে চাপিনি, আকাশ দিয়ে প্লেন উড়ে যাচ্ছিল সেটা দেখে আমার ইচ্ছা হল প্লেনে আমি কোন দিন চাপিনি, একবার প্লেনে চড়তে হবে। ঠাকুর অত্যন্ত খারাপ উপমা দিয়ে বলছেন – এক ব্রাহ্মণী বিধবা মরার সময় তাকে অন্তর্জলী করার জন্য গঙ্গায় নামান হয়েছে। বৃদ্ধা মরতে যাচ্ছে, সেই সময় গঙ্গার ঢেউ গুলো তার শরীরের অঙ্গে লাগছে আর খুব সুখ অনুভব করছে। পরের জন্মে সে বেশ্যা হয়ে জন্ম নিল। এবার নাও, এই জীবনটা অপরের শরীরের স্পর্শে সুখ ভোগ করতে থাক। এটা খুব চরম পর্যায়ের উপমা দিচ্ছেন। কিন্তু এটাই বাস্তব। কোথায় সেই ব্রাহ্মণী বিধবা সারা জীবনে এত সুন্দর ভাবে জীবন কাটালেন আর ঠিক মৃত্যুর সময় শরীরের অঙ্গে গঙ্গার ঢেউয়ের স্পর্শে তার সেই সুপ্ত সংস্কারটা জেগে গেল, সেখান থেকে কোথায় গিয়ে তাকে জন্ম নিতে হল। এই কামই হল সব কিছুর প্রেরণা শক্তি। এই জগৎ যেটা চলছে এই কামই এই চলার শক্তিকে যোগান দিয়ে চলেছে।

এই কাম তাকে কোথায় নিয়ে চলে যাবে? *স কামভির্জায়তে তত্র তত্র*, যেখানে এই কামনার পূর্তি হতে পারবে সেখানেই তাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে। প্রথম দেখবে তার গত জন্মের শেষ দিকে মৃত্যুর ঠিক আগে কোন ভাবটা সব থেকে শক্তিশালী, ওই ভাবটা বেশী প্রাধান্য পাবে তার পরের জন্মের ক্ষেত্রে, আর বাকিগুলো কর্মাশয়ে পড়ে থাকবে। আচার্য বলছেন দৃষ্ট আর অদৃষ্ট, দৃষ্ট মানে এই জগতের আর অদৃষ্ট মানে পরলোক, এই দৃষ্ট আর অদৃষ্টের যে কোন জিনিষের প্রতি যদি তার কামনা থাকে, যদি তার ইচ্ছে হয়ে আমি অপ্সরাদের সঙ্গে একটু থাকতে চাই, তারা কি রকম সুন্দর দেখতে চাই, মৃত্যুর পর টেনে সেখানেই নিয়ে যাবে। যাদের ভূত দেখার ইচ্ছে, ভূতগুলো দেখতে কি রকম, তার মানে আপনার কামনা আছে, এবার ভূত বানিয়ে তাকে ভূতলোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। এবার সে কয়েক জন্ম প্রেতযোনিতে ঘুরতে থাকবে। যখনই কোন দৃষ্ট অদৃষ্ট অভিষ্ট বিষয়ঃ থাকবে, যে কোন জিনিষকে যদি তার পছন্দ হয়ে থাকে, বাচ্চা বয়সে কোন জিনিষ পছন্দ ছিল, সেটা এখন মনেও নেই কিন্তু ঐ পছন্দটা ভেতরে সংস্কার রূপে ঠিক ছাপ থেকে যাবে। তবে পরের দিকে কোন কারণে যদি সেই জিনিষের প্রতি বিতৃষ্ণা জেগে যায় তখন ওই সংস্কারের ছাপটা মিটে যাবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে আর তৃষ্ণা জাগবে না, কিন্তু তৃষ্ণা আবার কোথা থেকে এসে যাবে বুঝতেই দেবে না।

গীতায় এই কথাই ভগবান বলছেন *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*। ডায়বেটিসের রোগী, ডাক্তার মিষ্টি খেতে নিষেধ করেছেন, এখন আর মিষ্টি খাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে মিষ্টির প্রতি কি তৃষ্ণা চলে গেছে? ব্লাড সুগার কমে গেলেই আবার খাবে। শৈশবে আমার খুব ইচ্ছে ছিল ভালো ক্রিকেটার হব। এখন বুড়ো হয়ে গেছি, পা নাড়ালেই কোমরে ব্যাথা হতে শুরু করে, এখন আমি থোরাই ক্রিকেট খেলতে চাইব। কিন্তু বাসনাটা থেকে গেছে। তাই বলছেন দৃষ্ট আর অদৃষ্ট, এই লোক আর পরলোকের অভিষ্ট বিষয়ঃ, অর্থাৎ যে জিনিষগুলো আমার পছন্দের বিষয় সেই বিষয়ের গুণের মনন চিন্তন করব। বেশীর ভাগ মানুষ কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া কিছু চিন্তাই করতে পারে না। স্বর্গলোকাদিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা আগেকার দিনের লোকেরা করত, এখন তো স্বর্গলোকের ব্যাপারেও চিন্তা করে না। এখন সব কিছু এসে দাঁড়িয়েছে কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশে, এই তিনটের বাইরে মানুষ আর কোন কিছুর কথা ভাবতেও পারে না। আসলে মানুষ ভোগকে ভালোবাসে। টাকাকে কে ভালোবাসে? আমার ব্যাঙ্কে এক কোটি টাকা আছে, তাতে হলটা কি। টাকার যে ক্রয় ক্ষমতা, টাকার বিনিময়ে যে ভোগ্য বস্তু পাওয়া যাবে সেই বস্তুকে ভোগ করতে ভালোবাসে বলেই সে টাকার পেছনে ছোটে। সোনাকে ভালোবেসে কি হবে! সোনার সঙ্গে যে ভোগের ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে সেটাকে মানুষ ভালোবাসে।

ভেতরে যে কামনা-বাসনা রয়েছে তার জন্য তার মধ্যে ধর্ম ও অধর্মের প্রবৃত্তি হয়। আমি স্বর্গে যেতে চাই, আমি জানি অধর্ম করে স্বর্গে যেতে পারব না। যখন টাকা-পয়সা চায় তখন ধর্মও করে আবার অধর্মও করে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনাও করে আবার চুরি-চামারিও করে। ভেতরে এই কামনা-বাসনা জমে আছে, এই দুটো তাকে দিয়ে প্রচুর কাজ করায়। এর মূলে আছে আবার অবিদ্যা। অবিদ্যার জন্য আমি নিজের স্বরূপ ভুলে গেছি। নিজের স্বরূপ ভুলে যাওয়ার জন্য মনের মধ্যে কামনা জন্ম নিচ্ছে। কামনা কেন জন্ম নিচ্ছে? কারণ আমি নিজেকে অপূর্ণ মনে করছি। এই কামের পুর্তির জন্য আমাকে কাজ করতে হবে। কাজ করার জন্য আমার একটা শরীর আর মন দরকার। কাম একই সাথে দুটো জিনিষ করছে, এক কামকে আমার পুর্তি করতে হবে তাই আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে আর অন্য দিকে এই কামই হল প্রেরণা শক্তি, যে শক্তি আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমার শাস্ত্র জানার ইচ্ছা হয়েছে, যদিও এখানে কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাপার নেই, একটা ভালো জিনিষ মন থেকে জানতে চাইছি, এটা পুরো নিষ্কাম, কিন্তু এখানে সকামের কথা বলা হচ্ছে। বলছেন, যেখানে যেখানে সেই বিষয় প্রাপ্তি হবে ঠিক সেখানে সেখানে তাকে জন্ম গ্রহণ করাবে। কামনা এমনই বস্তু যে, সে ঠিক জানে কোথায় আমি আমার বিষয়ের পুর্তি করতে পারব। কুকুর যেমন দূর থেকে বুঝতে পারে কোথায় মাংস পাওয়া যাবে। শকুন অনেক উঁচু আকাশ থেকেই বুঝতে পারে কোথায় ভাগাড়, কোথায় মরা আছে। ঠিক তেমনি এই কামনা গুলো জানে কোথায় আমার পুর্তি হবে। তখন সে মানুষকে এমন এমন কর্মে নিযুক্ত করবে, এমন ভাবে তাকে দিয়ে কাজ করাবে যে কাজের দ্বারা সে ঠিক সেই সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে। যে গাঁজা খায় সে যদি কোন অচেনা শহরে চলে যায়, সেখানেও একদিনের মধ্যে ঠিক খুঁজে বার করে নেবে কোথায় গাঁজার ঠেক আছে।

কর্ম মানুষকে যেভাবে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে সেই কামনা পুর্তির জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা কিভাবে সব কিছু ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি! তাহলে আমার সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু কোন কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে কখনই হয় না। কিন্তু শেষ কথাই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না, যেখানে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কার ইচ্ছা আসবে। ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু কিছু থাকত তবেই তো তার ইচ্ছার প্রশ্ন আসবে। কিন্তু যখন জগতের দৃষ্টিতে দেখছি তখন দেখছি আমার আপনার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আসলে আমাদের ইচ্ছাও নয়, আমাদের মনের মধ্যে যে কামন-বাসনা গুলো রয়েছে এরাই সমস্ত ইচ্ছার প্রেরণা শক্তি।

আফ্রিকার জঙ্গলগুলোতে মাঝে মাঝে জল শুকিয়ে খুব জল সঙ্কট তৈরী হয়। জঙ্গলের ট্রাইবালদের জীবন জলের অভাবে সেই সময় খুব দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তখন ওরা কোন ভাবে কায়দা করে একটা বানরকে ধরে নিয়ে আসে তাকে খুব করে লবণাক্ত খাবার খাওয়াতে থাকে আর বানরটাকে কোন মতেই জল খেতে দেবে না। তিন চার দিন জল না খাইয়ে রেখে দেবে আর মাঝে মাঝে লবণের কিছু জিনিষ খাইয়ে দেবে। যখন

দেখে বানরটা আর পারছে না তখন তাকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেওয়া মাত্রই বানরটা লাফ দিয়ে দৌড়তে শুরু করে, বানরের পেছনে আদিবাসী গুলোও দৌড়তে থাকে। বানর তখন ওই বিশাল জঙ্গলে, জঙ্গল মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়তনের মত বিস্তির্ণ জঙ্গল আর পুরো জঙ্গলটাই খরা কবলিত হয়ে আছে, কিন্তু সেই বানর ঠিক সেখানে পোঁছে যাবে যেখানে সামান্যতম হলেও একটু জল আছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইবাল গুলোও বানরের পেছনে পেছনে গিয়ে সেখানে পোঁছে যাবে। এই তৃষ্ণার্ত বানরটা হল কামনা আর আমরা হলাম সেই ট্রাইবাল। কামনা ঠিক বার করে নেয় আমার পুর্তি এখানে। তাই কামনা আমাকে টেনে নিয়ে ঠিক সেখানে পোঁছে দেবে, আমার কিছু করার নেই এখানে। অবসর সময়ে আমরা যদি নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার সারা জীবনে যে দুঃখ হয়েছে, যা কিছু সুখ হয়েছে, আজকে যে পরিস্থিতি ও পরিবেশ আমরা পেয়েছি, ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো কোথাও আমার মনে এমন কিছু বাসনা ছিল যার জন্য আমি এই অবস্থায় এসেছি। বাসনার পুর্তি যে সব সময় সুখের হবে তা নয়। যেমন ধরুন আমাদের ভারতে সব মেয়েদেরই বাসনা থাকে যে আমার একটা স্বামী হবে, মেয়েদের এখানে এভাবেই ছোটবেলা থেকে তৈরী করা হয়। বিয়ে তো তার হবে আর বরও জুটবে কিন্তু কোন বংশে কি রকম বর হবে তার কোন ঠিক নেই। কিন্তু বিয়ে ঠিক করিয়ে দেবে, ভারতে আগে কখন কোন মেয়ে অবিবাহিত থাকত না। এখন নতুন প্রজন্মে মেয়েরা বলছে যার-তার সঙ্গে আমি বিয়ে করব না, আগে ছেলেকে দেখব, তার উপার্জন দেখব আরও কত কি দেখবে বলছে। এই যুগে এসে এদের বাসনাটা পাল্টে গেছে। যার ফলে ছেলেগুলো মেয়ে পাচ্ছে না, অন্য দিকে মেয়েরা ছেলে জোগাড় করতে পারছে না। এটা আবার এক নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জীবনে এমন একটি ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেটার পেছনে আমার কোন কামনা ছিল না। এখন আমার ইচ্ছে হতে পারে যাই একটু নিকোপার্ক দেখে আসি। আমি এবার নিকোপার্ক যাবো বলে বেরিয়ে যদি কোন দুর্ঘটনা হয়ে যায়, সেটা আলাদা ব্যাপার। কামনা-বাসনা পুর্তি জন্য যখন মানুষ এগোয় তখন অনেক অঘটন ঘটতে থাকে। এই অঘটন গুলোকে সামলাবার জন্য আমাকে আরেকটা কিছু করতে হবে। জীবনটা তাই। যদি আমার নিকোপার্ক যাওয়ার বাসনাই নাই থাকে, তাহলে আমার এসব কোন কিছু হবে না। এটাই এখানে বলছেন।

আচার্য এই কথাই তাঁর ভাষ্যে বলছেন *যস্তু পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্যাপ্তকামঃ*, পর্যাপ্ত কাম মানে যার সব কামনা পূর্ণ হয়ে গেছে, তার মনে এখন কোন বাসনাই নেই, কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ, ভোগ বাসনা বিষয়তৃষ্ণা কোন কিছু নেই। এখন তাঁর কি হবে? তখন তাঁর একমাত্র ইচ্ছা আমি আত্মবেত্তা হব। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন – বাচ্চা খেলনা নিয়ে খেলছে, বেশ আছে। কিন্তু যখন একবার মা যাবো বলে দিল এরপর তাকে যাই দেওয়া হোক না কেন, খেলনা, মিষ্টি, লজেন্স যেটাই দেওয়া হবে সেটাই ছুড়ে ফেলে দেবে। যাঁরা ঈশ্বর পথের পথিক, যাঁদের মনে ইচ্ছা জেগে গেছে আমি আত্মাকে জানব তাঁকে এখন জগতের কোন কিছু দিয়েই আটকে রাখা যাবে না। ঠাকুর এরও উদাহরণ খুব সহজ ভাবে দিচ্ছেন – ঈশ্বর পথের পথিককে যদি কোন নারী এসে লোভ দেখিয়ে বশে আনতে যায় তখন সে বলে 'সরে যা খেপী! তোর গলা আমি কেটে দেব, আমার পরমার্থ হানি করতে এসেছিস'! ঠাকুর খুব কড়া ভাষা ব্যবহার করছেন। ঠাকুর এখানে সাধারণ সাধকদের কথা বলছেন না। যাঁরা খুব উচ্চমার্গের সাধক, যাঁরা বলছেন পরমার্থ ছাড়া জগতের কোন কিছুই আমার লাগবে না, এনারাই বেরিয়ে আসতে পারেন। ঠাকুরের কাছে এক পাগলী আসত। ঠাকুরকে একদিন বলছে 'ওগো! তুমি আমাকে তোমার মন থেকে ঠেলে দিচ্ছ কেন'? ঠাকুর আবার রামলালকে ডেকে বলছেন 'ওরে রামলাল! এখানে দেখছি ঠেলাঠেলির ব্যাপার চলছে'। বলে একটা খুব কড়া কথা বলে পাগলীকে বার করে দিতে বললেন। ঠাকুর হলেন পর্যাপ্ত কাম। তিনি না হয় পর্যাপ্ত কাম হয়ে গেছেন কিন্তু তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো পর্যাপ্ত কাম হননি। তখন বলবেন তোর গলা কেটে দেব। স্বামীজী তো পর্যাপ্ত কাম, কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে বিদেশে যে মহিলারা থাকতেন তারা তো পর্যাপ্ত কাম ছিলেন না। এখন যদি কোন মেয়ে এগিয়ে আসে? স্বামীজী আমেরিকা থেকে চিঠিতে লিখছেন যে, এখানে খোলমেলা সমাজ তাই মেয়েদের নিয়ে খুব বিপদ, সেইজন্য প্রথমেই আমি কাউকে মা, কাউকে বোন সম্বন্ধ পাতিয়ে দিই।

পর্যাপ্ত কামী পুরুষ আত্মজ্ঞান ছাড়া কিছুই কামনা করেন না। এনারাই হলেন কৃতকৃত্য পুরুষ – এখন না আছে তার কোন কর্তব্য, না আছে কোন দায়ীত্ব, না আছে কোন বাসনা, না আছে কোন ভোগ। তখন এনারা বিদ্যার দ্বারা, বিদ্যা মানে পরা বিদ্যার দ্বারা চিন্তন করে করে নিজের মনকে অবিদ্যাময় অপর রূপ, অপর রূপ মানে এই জগৎ, এই জগতে যা কিছু ভালো আছে সেখান থেকে মনকে সরিয়ে আনেন। বহির্জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে এনে এবার সেই মনকে কোথায় বসিয়ে দিয়েছে? পর রূপে অর্থাৎ আত্মার শুদ্ধ রূপে। তখন এই শরীরে স্থিত থেকেও তাঁর যত রকমের পাপপূণ্য, ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তির বীজ সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। তার মানে তিনি এখন সিদ্ধির অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সিদ্ধির কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে গেছেন এখন তাঁর আর কোন দিকে মন নেই। এরপর যেটা হচ্ছে এটাই বেদান্তের বিশেষত্ব, ব্রহ্মবিদ্যার চূড়ামণি – জীবনমুক্তি। যদি জীবনমুক্তি না থাকে তাহলে ব্রহ্মবিদ্যার কোন বৈশিষ্ট্যই নেই, তখন এটাই যে কোন অন্য ধর্মের মত হয়ে যাবে। জীবনমুক্তিই বেদান্তের বৈশিষ্ট্য, জীবনমুক্তিই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। জীবিত অবস্থায় মুক্তি একমাত্র হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না। যে কোন ধর্মে মৃত্যুর পরই মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে, বেদান্তে জীবিত অবস্থাতেই, বেঁচে থাকতেই মুক্তি হবে।

তাহলে জীবনমুক্তির লক্ষণ কি? ধর্ম ও অধর্ম কোন দিকেই তাঁর দৃষ্টি যাবে না, তাঁর পূণ্যতেও কিছু নেই পাপেও কিছু নেই। তাহলে তখন তিনি কি করেন? *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, অপরের ভালোর জন্য কাজ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজের কথা বলছেন *ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন*, হে অর্জুন! তুমি আমাকেই দেখো, এই তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার কিছু পাওয়ারও নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জগতের ভালোর জন্য মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। জীবনমুক্ত পুরুষ পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কোন কিছুই তাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, এই জগৎ থেকে তিনি কিছু প্রত্যাশা করেন না। তাই বলে কি তিনি অকম্মার ঢেঁকি হয়ে বসে থাকেন? কখনই না, তিনি প্রচণ্ড সক্রিয়, সব সময় কাজ করছেন। কিন্তু নিজের জন্য নয়, জগতের মঙ্গলের জন্য। ফলে জন্ম-মৃত্যুর যে হেতু সেই হেতুটাই তাঁর নাশ হয়ে গেছে। উৎপত্তির হেতু কি? কাম। কামই যদি না থাকে তাহলে তাকে জন্ম দিয়ে একটা শরীর দিলে সেই শরীর দিয়ে কি করবে! স্বামী ভূতেশানন্দজীকে গুজরাতে থাকার সময় সেখানকার একজন ভক্ত ভালোবেসে তখনকার দিনের পঞ্চাশ টাকার একটা পান এনে খাইয়েছেন। কিছুক্ষণ পর ভক্তটি জিজ্ঞেস করছে 'মহারাজ! পান খাচ্ছেন কেমন লাগছে'। মহারাজ বলছন 'ছাগলের মত'। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সমস্ত কামনা-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর আর জন্ম নিয়ে কি হবে আর এই জগতে এসে কিই বা করবেন। জীবনের যে উৎপত্তি হচ্ছে, সব কিছুর যে জন্ম হচ্ছে এর মূলে রয়েছে কাম। এই কামটাই তাঁর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, জন্ম আর কি করে হবে! সেইজন্য জীবিত অবস্থাতেই তিনি মুক্ত হয়ে যান।

ঠাকুর আবার নিত্যসিদ্ধের কথা বলছেন, যেমন স্বামীজী। অনেক সময় জগতের সমস্ত প্রাণীর দুঃখ-কষ্ট বেদনা দেখে এই ধরণের নিত্যসিদ্ধের হৃদয়টা করুণায় ভরে ওঠে। তখন তাঁরা শরীর ধারণ করে জগতের মাঝখানে নেমে আসেন। কিন্তু আমরা এখানে যেই অর্থে কাম বলছি সেই কামের জন্য এনাদের শরীর ধারণ হচ্ছে না, এনাদের কাম হল জগতের মঙ্গল। এই কাম কামের মধ্যে পড়ে না। তাহলে কি দাঁড়াল? যদি আমি আত্মজ্ঞানী হই তাহলে আর আমার জন্ম হবে না। আত্মজ্ঞানী যদি না হই? তাহলে যেমন যেমন ভেতরে কামনা আছে, যেমন যেমন বাসনা আছে তেমন তেমন শরীর ধারণ করাবে। জন্ম নিতেই থাকব আর তেমন মরতেই থাকব। যেমনি জন্ম নিলাম তাতে একটা বাসনার পুর্তি হয়ে আরও দশটা বাসনা জন্ম নিল, ফলে আরও দশটি জন্ম নিশ্চিৎ হয়ে গেল। এই খেলা ক্রমবৃদ্ধি হ্রারে চলতেই থাকবে। তবে যে মুহুর্তে আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে তখন ভেতরে যত কামনা জমে আছে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন দগ্ধবীজ হয়ে যাবে, সব কিছুই থাকবে, সবই দেখা যাবে কিন্তু বাঁধতে পারবে না। আর এই শরীরের পতন হয়ে গেলেই সব শেষ। কামনার বীজকে নাশ করার একটাই পথ আত্মজ্ঞান লাভ করা, নাহলে এই বীজ চলতেই থাকবে, এর কোন দিন নাশ হবে না। স্বামীজী বার বার বলছেন তুমি মুসলমানই হও আর খ্রীশ্চানই হও ভালো কাজ করে স্বর্গে যাবে, সেখানে খুব

করে ভোগ করবে। কিন্তু তারপর? *প্রাপ্য পূণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতী সমাঃ*, সব ভোগ করে পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে আবার কিছু দিন পর ফেরত চলে আসতে হবে। ফিরে এসে আবার একই জিনিষ চলতে থাকবে। কিন্তু শেষে যখন তোমার মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা জাগবে তখন তোমাকে ভারতে এসে জন্ম নিতে হবে, জন্ম নিয়ে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে অবলম্বন করে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। এই হল আত্ম সাধনের কথা, আত্ম সাধন করলে কি হয় আর না করলে কি হয় বলা হল, যদিও এই কথা এর আগেও বলেছেন। এবার বলবেন কিভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, আত্মজ্ঞান লাভের কথাও এর আগে বলা হয়েছে।

ব্রহ্ম বিদ্যার যে চারটে দিক, ব্রহ্মবিদ্যা কি, ব্রহ্মবিদ্যা কিভাবে প্রাপ্ত করা যায়, প্রাপ্ত করলে কি হয় আর প্রাপ্ত না করলে কি হয়, এই চারটের মধ্যে আত্মজ্ঞান যাঁরা প্রাপ্ত করেছেন তাঁদের কি হয় আর যাঁরা প্রাপ্ত করতে পারেননি তাঁদের কি হয়, এই দুটো দিককে একটি মন্ত্রে অর্থাৎ দুই নম্বর মন্ত্রে বলে দিয়ে বলছেন যাঁদের আত্মজ্ঞান নেই তাঁদের মধ্যে নানান রকমের কামনা থাকে। আসলে কামনা আছে বলেই আত্মজ্ঞান হয় না। ইঞ্জিন যেমন পুরো রেলগাড়িকে টেনে নিয়ে যায়, কামনা ঠিক তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বকে ঠেলে নিয়ে যায়। আর কামনার পুর্তি যেখানে হবে ঠিক সেখানেই তার জন্ম হবে। যে কোন কামনাই হোক না কেন, আমি কারুকে বদলা নিতে চাইছি কিংবা ভালোবাসতে চাইছি, সেখানেও তাই হবে। আমি বিশেষ কিছু ভোগ করতে চাইছি, তাতেও এই জিনিষই হবে। কামনার এমনই শক্তি, যার যেমনই কামনা থাকবে সেই কামনা তার সূক্ষ্ম শরীরকে, যেটা তার বাস্তবিক সত্তা, সেটাকে টেনে নিয়ে সেখানেই নিয়ে চলে যাবে, আর সেই কামনার পুর্তির জন্য যে উপযুক্ত শরীরের দরকার ঠিক সেই রকম উপযুক্ত শরীর তাকে দিয়ে দেবে। এই ভোগের পুর্তির সময় আরও অন্য অন্য কর্ম করতে হচ্ছে, সেই কর্মগুলোর জন্য আরও কিছু বাসনার জন্ম হবে, সেগুলোও আবার জমে থাকবে। সেই বাসনার পুর্তির জন্য আবার অন্য রকম শরীরের দরকার। এইভাবে জন্ম আর মৃত্যুর খেলা চলতেই থাকবে। কিন্তু যাঁরা পর্যাপ্ত কাম, যাঁদের সব কামনা পূর্ণ হয়ে গেছে তাঁদের আর শরীর ধারণ করতে হবে না। এবার তাঁরা আত্মজ্ঞানের পথে চলে যাবেন। যে শক্তি দিয়ে পুনর্জন্ম হয় সেই শক্তিটাই শেষ হয়ে গেছে, তাঁর আর জন্ম হবে কি করে!

এগুলো আমাদের আলোচনা করা হয়ে গেছে। একই বিষয় বার বার ঘুরে আসছে। এখন আবার বলছেন এই আত্মদর্শন কিভাবে হবে। এর আগেও অনেকবার এই বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বিষয় হওয়ার জন্য চট করে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য নানান দিক থেকে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে। আত্মদর্শন খুব কঠিন বিষয় না হয় বুঝলাম কিন্তু যদি প্রচুর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করা যায় আর তার সাথে শাস্ত্রের কথা ধারণা করার যদি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকে তাহলে কি এই আত্মজ্ঞান হবে? পরের মন্ত্রে ঠিক এই প্রশ্নেরই উত্তরে বলছেন –

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুণা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তণূং স্বাম্।।৩/২/৩।।

(বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা আত্মা লভ্য নন, মেধার দ্বারাও আত্মা লভ্য নন, বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক এই আত্মাকে বরণ করেন, তাঁর সেই বরণের দ্বারাই আত্মা লভ্য হন, সেই সাধকের কাছে এই আত্মা স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রকাশ করেন।)

আত্মার জ্ঞান কিভাবে হতে পারে? ঈশাবাস্যোপনিষদেও এই বিষয়ে বলা হয়েছে তবে অন্য ভাবে – *অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে*। বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় সমাজে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা কিছু কিছু বিশেষ ধরণের কর্ম করেন। তখন মনে হতে পারে এনারা যা করছেন সেইভাবে করলেই হয়ত সব হয়ে যাবে। যেমন স্বামীজী আসার পর অনেকেই বলছেন সমাজসেবা করলেই সব

হয়ে যাবে। আমাদের তাই দেশ সেবা, সমাজসেবাকে আদর্শ করতে হবে, সবাই সেবা করে যাও। কিন্তু শাস্ত্র তো কোথাও বলছে না সমাজসেবা করে গেলেই মুক্তি হবে। আবার বৈদিক যুগে অনেক ঋষিরা ছিলেন যাঁরা বলতেন তুমি বেদোক্ত কর্ম করে যাও। বেদে যে যজ্ঞাদির কথা বলা হয়েছে এটাই শেষ কথা, এরপর তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। কিন্তু স্বামীজী দেশ সেবা কাদের জন্য বলে গেছেন? আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই হল স্বার্থপর, নিজের দেহ-মন ছাড়া কিছু জানে না, অন্য কোন ভালো কাজ করতে পারবে না। ঠাকুর খুব কড়া ভাষায় বলছেন – নিজের মেয়ের বিয়েতে এলাহি আয়োজন করছে আর পাশের বাড়ির লোক না খেতে পেয়ে মরছে। এমন কৃপণ যে, দু পয়সার সন্দেশ আনতে দিলে চুষতে চুষতে নিয়ে আসে। মানুষ এমন স্বার্থপর যে তাকে যদি বলা হয় এখানে প্রস্বাব কর তাহলেও সে প্রস্বাব করবে না, কারণ তার মাথায় তখন দুশ্চিন্তা এসে যাচ্ছে, এখানে প্রস্বাব করলে বোধ হয় এর কোন উপকার হয়ে যাবে। এই ধরণের স্বার্থপর মানুষ! মানুষ এতটা স্বার্থপর কখন হয়? যখন দুর্বল হয়ে যায়, গোলামি করে করে যারা নিজেদের আত্মশক্তিকে হারিয়ে ফেলে তারা এই রকমই স্বার্থপর হয়। শক্তিহীন জাতি ঠিক এই রকমই আচরণ করে, যেভাবে স্বামীজীর সময় ভারতের লোকেরা করত বা যেভাবে আমরা এখন করছি। এগুলো হল সবই শক্তিহীন জাতির পরিচায়ক। স্বামীজী পরিষ্কার দেখছেন হয় সাধারণ লোক যারা আছে তাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই নয়তো অন্য দিকে যাদের একটু ক্ষমতা ও অর্থ আছে তারা কখনই অন্যদের জন্য ভাববে না।

স্বামীজীর হৃদয় সর্বদা ভারতাত্মার জন্য অশ্রু বিসর্জন করত, হিন্দুধর্মকে স্বামীজী কি প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, অথচ স্বামীজীর রচনাবলী ভালো করে খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায় স্বামীজী প্রতি পদে পদে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে কি প্রচণ্ড গালামন্দ করছেন। সব নিন্দা শুধু এই দুটোকে নিয়ে – দুর্বলতা আর কাপুরুষতা। দুর্বলতা আর কাপুরুষতা তো থাকবেই, কারণ এই দুর্বলতা আর কাপুরুষতাকে দূর করার জন্য যে শক্তি দরকার তার উৎসটাই সে হারিয়ে বসেছে। দুটো ডিগ্রী নিয়ে কিছু পয়সা রোজগারের ধান্দায় রাস্থায় নেমে পড়ছে, কোন রকমে একটা চাকরী বাগিয়ে নিচ্ছে, এগুলো দিয়ে তো কোন শক্তির যোগান আসতে পারে না বরঞ্চ আরও দুর্বল করে দিচ্ছে। অনেকদিন গোলামি করে করে যখন জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার হাতে যদি কোন শক্তি দিয়ে দেওয়া হয় সেই শক্তিকে সেই জাতি সব সময় দুর্প্রয়োগ করে। যেমন সাপ মানুষকে প্রচণ্ড ভয় পায় এমনকি যে কোন শব্দকেই সাপ প্রচণ্ড ভয় পায়। গ্রাম দেশের লোকেরা তাই পায়ে খড়ম ব্যবহার করে। সাপ ছোবল দেয় যখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে যায় বা ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু খড়ম পায়ে চললে তখন বড় বড় সাপও ভয়ে পালায়। ভারতবাসী ঠিক এই সাপের জাত। সব কিছুতেই তাদের ভয় – এই বুঝি এই লোকটি আমার থেকে এগিয়ে যাবে। আর ক্রোধ, যদি দেখে এই লোকটি আমার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে শেষ করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকবে – সারা জীবন তোর বাপ-ঠাকুর্দা লাঙল ঠেলল আর তুই এখন অফিসের বাবু হতে এসেছিস! এই ভাব সবার ভেতর। এগুলোই দুর্বল জাতির লক্ষণ। স্বামীজী আবার বলছেন হিন্দুদের মত অকৃতজ্ঞ জাত কোথাও নেই। স্বামীজী দেখছেন বিদেশে আমি একা লড়াই করে যাচ্ছি একটি হিন্দু পাশে দাঁড়ানো তো দূরে থাক সব সময় আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে গেছে, এতই নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। এই জাতিটাকে উপরে তুলে আনার কি কোন উপায় নেই? স্বামীজী দেখলেন দেশ সেবা করা ছাড়া, সমাজের সেবা করা ছাড়া এদের আর কোন উপদেশ দেওয়া যেতে পারেনা।

স্বামীজী তো বলে দিলেন দেশ সেবা, সমাজ সেবা করতে। এখন দেশ সেবা, সমাজ সেবা বেশ কিছু দিন চলল, করতে করতে সবারই মনের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। তাহলে কি এদের সবার মুক্তি হয়ে যাবে? কখনই মুক্তি হবে না, শাস্ত্রেও কোথাও এই কথা বলছে না। এক সময় খুব উঠেছিল যজ্ঞ যাগ কর, তারপর এল নিষ্কাম কর্ম কর। নিষ্কাম কর্ম করলে কি মুক্তি হয়? কখনই সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি একটা সময় উঠেছিল খুব শাস্ত্র পড়, খুব জ্ঞান অর্জন কর। কেউ যদি বলে আমি পুরো বেদ মুখস্ত করে নিয়েছি, উপনিষদ আমার কণ্ঠস্থ, আর শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও আমি সুন্দর ভাবে করে দিতে পারি, তাহলে কি সে মুক্ত পুরুষ হয়ে গেছে? ভাগবত পণ্ডিতরা কত নাটকীয় ঢঙে ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন, আর একা ব্যাখ্যা করেন না, এদের একটা দল

থাকে। ভাগবতের পণ্ডিত ব্যাখ্যা করতে করতে যখন ভাবে চলে যান তখন দলের মেয়েরা এসে স্টেজে নাচ করতে শুরু করে দেয়। তখন যারা দর্শক তাদেরও ভাব হতে শুরু করে। লোকেদের ধারণা এই ধরণের উপাসনা করলে আমার মুক্তি হবে। না এতে মুক্তি হবে না। ঈশোপনিষদে বলছেন *অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।* আচ্ছা এতে হবে না যখন তখন অনেকে মনে করে এই ভাবে উপাসনা করলে হবে, না তাতেও হবে না। গীতায় এই যজ্ঞকেই নিন্দা করে ভগবান বলছেন *যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং*, বেদবাদীরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তোমার মনকে আকৃষ্ট করবে, কিন্তু তোমার কোন কাজে লাগবে না।

এই মন্ত্রে ঠিক এই কথাই বলছেন, *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো*, আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খুব শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে যাচ্ছি, এই শাস্ত্র অধ্যয়ণ দিয়েও আত্মাকে জানা যাবে না। *ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন*, ধারণা শক্তি প্রখর, কিন্তু এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েও হবে না। আচ্ছা তার না হয় মেধা নেই কিন্তু তিনি খুব বিনয়ী। খুব শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে সব প্রবচন শুনে যাচ্ছেন। উপনিষদ বলছেন এদেরও হবে না। এরও হবে না, তারও হবে না, তাহলে কার হবে? *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, এই আত্মা ঠিক করেন যে আমি একে বরণ করব, একমাত্র তারই হয়। স্বয়ম্বর সভায় সব দেশের রাজারা রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য হাজির হত। রাজকন্যা বরমাল্য হাতে নিয়ে সব রাজাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াত তখন সে রাজার গুণকীর্তি রাজকন্যাকে বলা হত। এইভাবে সব রাজাদের একবার করে প্রদক্ষিণ করে আসার পর আবার তাকে রাজাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হত। তখন সে ঠিক করতে কোন রাজা বা রাজপুত্রের গলায় সে বরমাল্য দেবে। আত্মাও ঠিক তাই করেন। আত্মা যাঁকে বরণ করবেন তাঁর ছাড়া আর কারুর এই আত্মজ্ঞান হবে না।

আমাদের ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটা জিনিষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তার মধ্যে একটা হল আমাদের ব্রাহ্মণরা খুব নিয়ম নিষ্ঠা নিয়ে যা কিছু করতেন – ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গঙ্গা স্নানাদি করছেন, পূজা অর্চনা করছেন, শাস্ত্র পাঠ করছেন, এগুলো করে কি ব্রাহ্মণরা ভগবান লাভ করতেন? না, করতেন না। খুব যজ্ঞ-যাগ করছে, সমাজ সেবা করছে – এতেও হবে না। আমাদের শাস্ত্রে ঘুরে ঘুরে এই জিনিষটাকে নিয়েই আলোচনা করছে, তাহলে কিসে হবে? আত্মা যাঁকে বরণ করবেন। এখান থেকেই ঈশ্বরের কৃপার ধারণাটা এসেছে।

এই যে এখানে আত্মার প্রসঙ্গ চলছে, ব্রহ্মবিদ্যা মানে আত্মাকে জানা। আত্মাকে জানা বা আত্মাকে লাভ করার যে কথা বলা হচ্ছে, এই লাভ করা মানে কোন বস্তুকে আমরা যেভাবে লাভ করার অর্থে মনে করি সেই ভাবে আত্মাকে লাভ করা যায় না। আত্মাকে লাভ করা মানে নিজের স্বরূপকে জানা। নিজের স্বরূপকে জানাকে লাভ করা বলা যায় না, তবে সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য বস্তু লাভ বলা হয়, আত্মা বস্তু কিন্তু পরম বস্তু। সংসারে যেমন বলে বস্তু লাভ, আত্মাকে লাভ করা মানে এই সংসারের পরম বস্তুকে লাভ করা। আচার্য বলছেন *নাসৌ বেদশাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেন প্রবচনেন লভ্যঃ*, এই যে লাভ করার কথা বলছেন, *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো*, *লভ্যঃ* মানে পাওয়া। সেই পাওয়াটা কিভাবে হবে? বলছেন *বেদশাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেন প্রবচনেন লভ্যঃ*, প্রচুর বেদ উপনিষদ আরও যত শাস্ত্র আছে সব পড়েই যাচ্ছে, এই অধ্যয়ণের দ্বারাও লাভ করা যাবে না। *প্রবচনেন* বলতে অর্থ করছেন অধ্যয়ণ রূপ, প্রচুর শাস্ত্র পড়ছেন, হয়ত দিনে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা শাস্ত্রই অধ্যয়ণ করে যাচ্ছেন, এই ভাবেও হবে না। তাহলে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করব কি করব না? না, তাই বলে শাস্ত্র পাঠ কখন বন্ধ করা যাবে না, শাস্ত্র জানতে হয়।

এখানে উপনিষদ বলছে *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো*, কিন্তু এই শাস্ত্রই অন্য জায়গায় বলছে শ্রবণ-মনন-নিধিধ্যাসন, জিনিষটা তো আমাদের জানতে হবে। জিনিষটাকে না জানলে তো আমরা এগোতেই পারবো না। সকালে উঠে গঙ্গাস্নান, পূজা অর্চনা এগুলো আমাদের করতে হবে। যজ্ঞ যাগ, সমাজ সেবা, নিষ্কাম কর্ম সব কিছুই করতে হবে। কিন্তু এটা মনে করা কখনই উচিৎ হবে না যে, এর কোন একটা করলেই আমার আত্মজ্ঞান

হয়ে যাবে, আত্মজ্ঞান অন্য পদ্ধতিতে হয়। এগুলো সব চিত্তশুদ্ধির উপায়। আমাদের ভেতরে জন্ম-জন্মান্তরের যে ময়লা স্তুপীকৃত হয়ে আছে এই আবর্জনার পাহাড়কে পরিষ্কার করার উপায় হল এগুলো। কিন্তু এগুলো দিয়ে আত্মজ্ঞান কখনই হবে না। যদি কেউ মনে করে আমার জীবনকে পুরোপুরি শাস্ত্র অধ্যয়ণে দিয়ে দিলাম, আমি সারা জীবন শুধু বেদ উপনিষদই অধ্যয়ণ করে যাব, ঠাকুরের কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী এগুলোই শুধু পড়তে থাকব। না, তাহলে কিন্তু হবে না। কেন হবে না? *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো*। ঠিক আছে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করলে যখন হবে না, তাহলে শুধু জপ করে যাই, দিনে হাজার হাজার জপে করে গেলেই হবে। ঠাকুর তখন কি বলছেন? কলকাতার কত নষ্টা মেয়েরা লক্ষ লক্ষ জপ করে কিন্তু কিছুই তো হয় না। কোনটাতেই কিছু হবে না। যে কোন কর্ম হবে সেখানেই কর্তা থাকবে, ক্রিয়া থাকবে আর তার ফল থাকবে। এই তিনটে যখনই এসে যাবে তখন তা দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা হবে না। যখন শাস্ত্র অধ্যয়ণই করে যাচ্ছে তখন কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম এসে পড়ছে। প্রচুর জপ যদি করি তখনও কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম এসে গেল, তাহলে তো আধ্যাত্মিক সাধনা হল না। যেখানেই কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া এসে যাবে সেখানে আর আধ্যাত্মিক ব্যাপার থাকবে না। যে ধ্যান করছে তারও কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া এসে যাচ্ছে, যখন ধ্যান করছে তখন এই বোধ থাকছে আমি ধ্যান করছি।

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, মেধার সংজ্ঞা হল *গ্রহণ ধারণ সামর্থম্*। আচার্য একটা কথা বলে দিলেন বা শাস্ত্রের কোন কথা পড়া মাত্রই সহজে বুঝে নেওয়া যে কি বলতে চাইছে, আর সেই জিনিষটাকে ভেতরে ধরা রাখার ক্ষমতা যার যত বেশী সে তত মেধাবী। আচার্য মেধার সংজ্ঞা দিচ্ছেন *গ্রন্থধারণশক্তি*, শাস্ত্রের কথাকে ধারণ করার শক্তি। উপনিষদ মুখস্ত করে তার অর্থটাও বোধগম্য করে সেটাকে ধরে রাখছে, এটাই মেধা। বলছেন, এই মেধা দিয়েও আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হবে না। আইনস্টাইন, নিউটন, বড় বড় লেখক এনাদের প্রচণ্ড মেধা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের আত্মজ্ঞান হবে না। যদি লাটু মহারাজ আর আইনস্টাইন এই দুজনের মধ্যে কার আত্মজ্ঞান হবে বলা হয়, তাহলে কি বলা হবে? লাটু মহারাজ এই জায়গাতে আইনস্টাইনকে অতিক্রম করে চলে যাবেন। লাটু মহারাজ মুর্খ ছিলেন বলেই কি জ্ঞানী হলেন? কিন্তু লাটু মহারাজের মত প্রচুর মুর্খ রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের তো কিছুই হচ্ছে না। এগুলো আমাদের বুঝতে হবে আত্মজ্ঞানের জন্য কোন শর্তই নেই, আমাকে জ্ঞানী হতে হবে, নাকি মুর্খ হতে হবে, পণ্ডিত হলেই কি হবে। স্বামীজী, হরি মহারাজ এনারা তো শাস্ত্র পড়া বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, অন্য দিকে লাটু মহারাজ ছিলেন মহামুর্খ, ঠাকুর তো তাও বলছেন আমি শুনেছি কত কিন্তু লাটু মহারাজ তাও শোনেননি। এসব কোন কিছুই কাজে দেবে না। আইনস্টাইনের বিজ্ঞানের মেধাটা না হয় ছেড়েই দিলাম তাহলে চলে আসুন শাস্ত্র মেধাতে। বেদ, উপনিষদ, পুরান, গীতা সব মুখস্ত আর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, এই মেধা দিয়ে কি হবে? তাও হবে না।

ন বহুনা শ্রুতেন, আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হয় নিজে থেকে কোন শাস্ত্র পড়ছি না কিন্তু নিয়ম নিষ্ঠা নিয়ে আর বিনয়ের সাথে রোজ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে যাচ্ছি। একদিন দুদিন নয়, বছরের পর বছর শুনে যাচ্ছি। উপনিষদ বলছেন এতেও হবে না। তাহলে হবে কি ভাবে? যে পরমাত্মাকে এই বিদ্বান বরণ করেন, এখানে বিদ্বানের সংজ্ঞা হল, যিনি পরমাত্মার তত্ত্বকে জানেন বা জানতে চাইছেন, যিনি জানতে চাইছেন তাঁকেও বিদ্বান বলা হয়। জাগতিক বিদ্যা যার আছে তাকে বিদ্বান বলা হচ্ছে না, সম্মানার্থে যদিও বিদ্বান বলা হয় কিন্তু এই অর্থে বিদ্বান নয়। যে বিদ্বান এই পরমাত্মাকে বরণ করতে চাইছেন, কারণ পরমাত্মাই একমাত্র যিনি বরণ করার যোগ্য, এই বরণ করার ইচ্ছা যে তাঁর মনে উদয় হল, আমি পরমাত্মাকে চাই এই যে ইচ্ছা, এটা দিয়েই হবে।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, আচার্যের এর ব্যাখ্যা করছেন – যে জিনিষটি নিত্যপ্রাপ্ত, নিত্যপ্রাপ্ত মানে এটাই আমার স্বভাব, এটাই আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ বিদ্যমান, তাকে আর কিভাবে প্রাপ্ত করবে! যেমন আমি আমার হাতের মুঠোটা বন্ধ করে রেখেছি। আমি যদি হাতের মুঠোটা খুলতে চাই তাহলে কি আমাকে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে? কারুর সাহায্য নিতে হবে? খোলার কৌশল জানার জন্য অনেক বই পড়তে হবে? কিছুই করতে হবে না, আমার খোলার ইচ্ছেটা দরকার, ইচ্ছে হলেই হাতের মুঠোটা খুলে দেব। কিন্তু আমার এখন এক লাখ টাকার দরকার। এই টাকা পাওয়ার জন্য আমাকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে। এক

লাখ টাকাটা আমার নিত্যপ্রাপ্ত নয়, এই টাকা আমার কাছে যে সব সময় ঘোরাঘুরি করছে তা নয়। কিন্তু মুঠো যেটা বন্ধ সেটা নিত্যপ্রাপ্ত, আমি চাইলেই খুলে দিতে পারি। আত্মা হলেন আমারই স্বরূপ। স্বরূপ মানে তিনি সব সময় আমার সঙ্গে আছেন, নিত্যপ্রাপ্ত। আমি গলায় একটা নেকলেস পড়ে আছি, নেকলেস আমার নিত্যপ্রাপ্ত, আমার কাছেই সব সময় আছে। আমার হঠাৎ মনে হল আমার নেকলেসটা হারিয়ে গেছে। তখন আমি গলায় হাত দিয়ে দেখব আর তা নাহলে দৌড়ে আয়নায় গিয়ে নিজেকে দেখব আমার নেকলেসটা গলায় আছে কিনা। আত্মবস্তু তিনি সব সময়ই আমার ভেতরে রয়েছেন, তিনি তো কোথাও যাচ্ছেন না। তাই এই আত্মবস্তু হলেন নিত্যপ্রাপ্ত। আমরা সবাই এখন ঘুমিয়ে আছি। ঘুমিয়ে আছি মানে, আত্মার স্বাভাবিক সত্তার বোধ থেকে বিস্মৃত হয়ে আছি। ঘুমিয়ে এখন আমরা এক স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করছি, স্বপ্নে নানান জিনিষ ঘটে চলেছে। ঘুমটা ভাঙলেই সব মিলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙার পর আমি কি নতুন কিছু পাচ্ছি? কিছুই পাচ্ছি না, যা আছে সেটাই আমার স্বাভাবিক অবস্থা। যেটা আমার স্বাভাবিক সেটাকে আবার পাওয়া না পাওয়ার কি আছে! কিন্তু তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? বলছেন বরণ করতে হবে। আমার চাই, এটা বললেই হবে। ভক্তিশাস্ত্রে একেই বলা হয় ব্যাকুলতা। ঠাকুর আধ্যাত্মিক সাধনার জীবনে আত্মজ্ঞান লাভের অনেক রকম পথের সন্ধান দিয়েছেন, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঠাকুরের জীবনে পাই এই ব্যাকুলতা। এটা আমার চাইই চাই। বাচ্চা যখন মায়ের জন্য কাঁদে তখন তা হল মায়ের জন্য তার যে ব্যাকুলতা। *যমেবৈষ বৃণুতে*, যিনি এই আত্মাকে বরণ করেন তিনিই আত্মাকে পান। এই ব্যাকুলতা, আমার চাইই চাই, এটাই *যমেবৈষ বৃণুতে*।

অনেক কাল আগে এক ব্যক্তির ইচ্ছে হল সোমরস পান করবে। সোমরস তৈরী করতে সোম পাতা চাই, আর সোমরস হচ্ছে দেবতাদের অর্ঘ্য। এক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে সোমরাজা মানে সোম পাতা আছে? দোকানদার বলছে, হ্যাঁ আছে, তুমি কত টাকা দেবে? লোকটি বলছে দশ টাকা দেব। দোকানদার বলছে – *সোমরাজা ততোহভূয়াৎ*, মানে সোমরাজার দাম তার থেকেও বেশি। বলেই লোকটিকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আরেকটা দোকানে গেছে, লোকটি যে দাম বলছে, সেই দোকানদারও বলছে *সোমরাজা ততোহভূয়াৎ*। এইভাবে কয়েকটা দোকান ঘোরা হয়ে গেছে, যেখানেই যাচ্ছে সেখানে যত দাম বলছে দোকানদার এই একই কথা বলে যাচ্ছে, সে যত দাম দিতে চাইছে দোকানদার বলছে সোমরাজার দাম তার থেকে বেশি। শেষ যে দোকানে গেছে সেখানেও এই একই কথা বলতেই লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে বলছে – নিকুচি করেছে তোমার *ততোহভূয়াৎ*, আমার সোম পাতা চাইই চাই। বলেই সে যেখানে সোম পাতা রাখা ছিল সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে সোম পাতা যা পেরেছে নিয়ে এসেছে। লোকটি আস্তে আস্তে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, প্রথমে দশ টাকা, তারপর কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা এইভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে যখন তার সর্বস্ব সোম পাতার জন্য দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে তখনও যখন বলছে *সোমরাজা ততোহভূয়াৎ*, বলছে নিকুচি করেছে তোমার *ততোহভূয়াৎ*, আমার চাইই চাই। বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোম পাতা নিয়ে এসেছে। এই ব্যাকুলতা যার আছে, আমার চাই চাই। তার জন্য আমাকে কি করতে হবে বলুন। স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করতে হবে? করে দেব। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে? করে দেব। নাম-যশ ত্যাগ করতে হবে? করে দেব। এর জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করে দেব, আমার এটা চাইই চাই। এই হল *যমেবৈষ বৃণুতে*।

এই ব্যাকুলতা হলে কি হয়? আচার্য বলছেন – যখন এই ব্যকুলতা হয় তখন *অবিদ্যা-সঞ্ছন্নাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি*। আত্মাকে আমরা সব সময়ই দেখছি। যখন সন্তানকে বাবা-মা ভালোবাসছে তখন সে আত্মাকেই দেখছে। বাবা-মা বলে আমার সন্তান আমার আত্মা। স্বামী যখন নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসছে তখনও সে আত্মাকেই দেখছে। তোমার দেহকে ভালোবাসছ তোমার আত্মাকেই ভালোবাসছ। কিন্তু এগুলো হল *অবিদ্যা-সঞ্ছন্নাং*, অবিদ্যা দিয়ে আচ্ছন্ন। যিনি পরমাত্মা, যিনি শুদ্ধ আত্মা, তাঁকে অবিদ্যা আচ্ছাদিত করে রেখেছে। এখন ভারতে যে যুবকদের এক নতুন ধরণের নবজাগরণ এসেছে, আমার কেরিয়ার চাই, আমার ফ্রিডম চাই, আমার ক্ষমতা চাই, এটাও সেই আত্মশক্তিরই প্রকাশ, কিন্তু অবিদ্যা আচ্ছন্ন। অবিদ্যা আচ্ছন্নতা কোথাও বেশী, কোথাও কম। কিন্তু যখন সেই ব্যাকুলতা এসে গেল, আমি আত্মাকে শুদ্ধ রূপে দেখব,

তখন সে আত্মার আসল রূপটা এক ঝলক দেখে নেয়। এই দ্যাখ – এতক্ষণ আমার আবৃত রূপটা দেখেছিস এখন আমার এই অনাবৃত রূপটা দেখে নে। মেঘে ঢাকা সূর্য থেকে হঠাৎ মেঘটা সরে গেল, সূর্যের আসল রূপটা বেরিয়ে এল, তারপর আবার মেঘে ঢেকে গেল। এগুলো যে একেবারেই এই রকম হয় না, তা নয়।

রাজস্থানের একটা গ্রামে প্রায় বারো চোদ্দ বছর ধরে বৃষ্টি হয়নি। গ্রামবাসীরা অনেক দূর দূর গ্রাম থেকে জল নিয়ে আসত। কিভাবে একবার বারো চোদ্দ বছর পর হঠাৎ মেঘ করে বৃষ্টি হয়েছে। বারো চোদ্দ বছরের বাচ্চারা তো বৃষ্টি জিনিষটা কি জানে না, আকাশ থেকে জল পড়তে পারে তারা দেখেইনি, জানেও না। যখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করল তখন বাচ্চাগুলো আতঙ্কে বাবাগো মাগো বলে ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে। ওরা জানে মাটির তলা থেকে জল আসে, কিন্তু হঠাৎ দেখে আকাশের উপর থেকে জল নামছে। একটা জিনিষ যখন অনেক দিন ধরে চলতে থাকে সেটাই সবাই মনে করে স্বাভাবিক। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমরা যে কোটি কোটি বছর ধরে অনাত্ম বস্তুর গোলামি করে যাচ্ছি সেই ব্যাপারে আমাদের কোন হুঁশ নেই। ঠাকুর বলছেন – সবাই চাকরি করছে মানে সাহেবের বুটের গোঁজা খায়। চাকরী যারা করে তাদের তো এই দুরবস্থাই হয়, বসের গালাগাল খেতে হচ্ছে। আর এদিকে মা বলছে ছেলে আমার সংসার জ্বালায় জ্বলেপুড়ে আসবে একটা গাছের ছায়া দিতে হবে তাতে এসে সে জুড়োবে। যখন সেই গাছের ছায়ায় আসছে তখন শ্রীমতির গালাগাল খেতে হয়। একদিকে অফিসে বসের গালাগাল বাড়ি ফিরে অন্য বসের গালাগাল, তাও এই জীবন চলছে, তাও বলছে আমি বেশ আছি। এটা সত্যিকারের সমস্যা, যে মানুষ জ্বলছে পুড়ছে সেই মানুষ মনে করছে আমি বেশ আছি। স্বামীজী একটা উপমা দিচ্ছেন, বরফের উপর দিয়ে চলতে চলতে মানুষ যদি পড়ে যায় তখন তার তন্দ্রা আসতে শুরু করে, তন্দ্রা নেমে আসা মানে এবার সে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাকে যদি ঘুম থেকে ওঠাতে যায় সে আর উঠতে চায় না, তখন সে বলে আমি বেশ আছি। কিন্তু সে মরতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না। চাকরী, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমরা মনে করছি বেশি আছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না যে আমাদের অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে, মরতে যাচ্ছি। অক্সিজেনের অভাব মানে আধ্যাত্মিক শক্তির অভাব। যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে সেটাই আমার মধ্যে নেই, কিন্তু আমি মনে করছি বেশ সুখে আছি।

যখন সে বুঝে যায় এর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে, এর থেকে আমাকে বেরোতে হবে, যেমনি সে ঠিক করে নিল আমাকে এখান থেকে বেরোতে হবে, এবার কিন্তু সে আস্তে আস্তে অক্সিজেনের দিকে এগোতে শুরু করবে। এখানে আচার্য বলছেন যার মধ্যে এই ব্যাকুলতা এসে গেল তার কিন্তু আত্মজ্ঞান এসে যাবে। কঠোপনিষদেও ঠিক এই একই মন্ত্র আছে, সেখানে আচার্য যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতে মনে হবে পুরোপুরি আত্মার কৃপাতেই হয়। রমণ মহর্ষি ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী, তিনিও বলছেন – সাধনা করে করে একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর মনে হবে এখান থেকে আমি আর এগোতে পারবো না। একটা গন্তব্য স্থলে যেতে হলে এগিয়ে এগিয়ে চলতে চলতে আমি ঠিক সেই গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাব। আধ্যাত্মিকতার চরম অনুভূতি কখনই এইভাবে হবে না। আধ্যাত্মিক সাধনায় তাকে একটা অবস্থা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সেখান থেকে মনে হবে আমি আর এগোতে পারছি না। রমণ মহর্ষি বলছে, শেষ সময়ে এমন একটা অবস্থা হয়ে যায়, যেন সে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাইছে, ঘর পর্যন্ত পৌঁছে সে পৌঁছে গেল কিন্তু আর ঘরে ঢুকতে পারছে না, যেদিক দিয়েই ঢোকার চেষ্টা করা হোক না কেন পারবে না, সব দিক যেন বন্ধ হয়ে আছে। হঠাৎ ঘর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে তাকে ভেতরে টেনে নেয়। আমি যে অপরকে বলব কিভাবে এই ঘরে ঢোকা যায়, বলারও কোন পথ নেই। ঠাকুরের জীবনেও আমরা দেখি, তিনি কত করমের সাধনা করছেন, ক্রন্দন করছেন কিন্তু হচ্ছে না। ঠাকুর আর থাকতে পারছেন না, তখন হঠাৎ মাকালী যেন তাঁর হাতটা ধরে নিলেন। আচার্য এটাই বলছেন আর আমাদের উপনিষদও একই কথা বলছে। শুধু এখানে আধ্যাত্মিক কৃপার ভূমিকা এসে যায়।

যদি *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যো* না হয় তাহলে যুক্তির ক্ষেত্রে বিরাট একটা ফাঁক এসে যাবে। এটা মনে রাখতে হবে উপনিষদ কোন যুক্তি তর্কের বই নয়, উপনিষদ একটি আধ্যাত্মিক দলিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক

গ্রন্থকেও পুরোপুরি যুক্তির উপর চলতে হবে। উপনিষদ বলছে *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যো*, ঠাকুর ব্যাকুলতার দ্বারা সব কিছু পেলেন কিন্তু মায়ের দর্শন পেলেন না, কিন্তু যখন খড়্গ তুলে নিয়ে নিজের গলাটা কাটতে যাচ্ছেন তখন মা এসে তাঁর হাতটা ধরে নিলেন আর মায়ের দর্শন পেলেন। রমণ মহর্ষি বলছেন তুমি যত দূর খুশী চলে যেতে পারবে কিন্তু একটা অবস্থার পর দেখবে আর তুমি এগোতে পারছো না, তখন কে যেন তোমার হাতটা ধরে টেনে নিচ্ছে। এই তিনটে যদি না হয়, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যো* যদি সত্যি না হয় তাহলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যুক্তি তর্কের ব্যাপারে একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যাবে, পুরো উপনিষদ গ্রন্থ অযৌক্তিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি তাঁর দর্শন না হয় তাহলে কিন্তু একটা বিরাট অযৌক্তিক অবস্থা দাঁড়িয়ে যাবে। সমস্ত আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোন কর্মের ফলে হয় না। কোন কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না এই কথাটা তাহলে মিথ্যা হয়ে যাবে। এটা ঋষিরা কিন্তু কোন ভেবে চিন্তেও বলছেন না, তাঁরা প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন যে, তুমি যত যাই করে যাও একটা জায়গায় গিয়ে তুমি আটকে যাবে। তুমি যদি আটকে না যাও তাহলে তো সেটা তুমি যে ক্রিয়া করলে তার ফল হয়ে যাবে, তুমি যে কাজকর্ম করেছ তার ফলস্বরূপ তুমি এই আত্মজ্ঞান পেয়ে গেলে। তাহলে তো এটা জাগতিক কোন বস্তু প্রাপ্তি হয়ে যাওয়ার মত হয়ে গেল। জাগতিক কোন জিনিষ পাওয়া মানেই হল একজন কর্তা থাকবে, ক্রিয়া থাকবে আর একটা কর্ম থাকবে, কর্ম মানে এখানে দ্বিতীয়া। এখানে কর্তা হয়ে গেলেন আপনি, ক্রিয়া হয়ে গেল ব্যাকুলতা আর দ্বিতীয়ার কর্ম হয়ে যাচ্ছে ঈশ্বর বা মন আর তার ফল হল ঈশ্বর দর্শন। কিন্তু এভাবে তো কখন ঈশ্বর দর্শন, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। শাস্ত্রে বার বার এই জিনিষ ঘুরে ঘুরে আসে বাংলার দ্বিতীয়ার যে কর্ম তার ফল কখন আধ্যাত্মিক জিনিষ হবে না। এনারা কিন্তু যুক্তি তর্ক দিয়ে এই কথা বলছেন না, এনারা এটাকে সাক্ষাৎ দেখেছেন। তারপর তিনি দেখেন সবটাই তাঁর ইচ্ছা। যাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতিটাই তাঁর ইচ্ছাতে হয়েছে বাকি যা কিছু হবে সেটা আর কার ইচ্ছাতে হবে। তখন সবটাই তাঁর ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

এত কথা বলার পর আচার্য বলছেন *তস্মাদন্যত্যাগেনাত্মপ্রার্থনৈব আত্মলাভসাধনমিত্যর্থঃ* – অন্য সব কামনার ত্যাগ দ্বারা আত্মপ্রার্থনাই আত্মলাভের একমাত্র সাধন। আত্মলাভের সাধন হল আত্মপ্রার্থনা। আত্মপ্রার্থনা আবার হল অন্য সব কিছু কামনার ত্যাগ। কামনা বাসনা ত্যাগ মানেই আত্মপ্রার্থনা। আত্মপ্রার্থনা মানেই আত্মলাভ। যেমনি আমি বাসনা ত্যাগ করলাম তার মানে আত্মপ্রার্থনা করতে শুরু করলাম। আত্মপ্রার্থনা করছেন মানে আজ কিংবা কাল তাঁর আত্মার লাভ হবেই। মন্ত্রে বলছেন *তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্*, যিনিই আত্মার প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন তাঁকেই আত্মা তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দেন।

অমরনাথ যাত্রা পথে শেষনাগ আছেন, বলে শেষনাগে নীচে এক বিরাট শিব দেখা যায় আর ওখানে অনেকেই নাকি দেখতে পান একটা সাপ নাকি ওই শিবকে প্রদক্ষিণ করে যায়, এই সাপকেই শেষনাগ বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। একবার এক ভদ্রমহিলা বম্বে থেকে অমরনাথ যাত্রাপথে যেতে যেতে এই শেষনাগে এসে বলছিল, আমার খুব ইচ্ছা যদি এই শেষনাগকে দেখতে পাই। তখন তাকে এক সন্ন্যাসী বলছেন – দ্যাখো মা! ব্যাকুলতা না থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভদ্রমহিলা বলছে – না মহারাজ, আমার প্রচুর ব্যাকুলতা আছে, আমি এই মুহুর্তে এই শেষনাগের দর্শন ছাড়া আর কিছু চাইছি না। ভদ্রমহিলা এই কথা বলছেন অথচ তার পাশেই তার পাঁচ-ছয় বছরের পুত্র সন্তান দাঁড়িয়ে আছে। সন্ন্যাসী শুনে মনে মনে হাসছেন আবার ভাবছেন একবার বলি আপনি কি আপনার এই ছেলেকেও ছেড়ে দিতে রাজী আছেন শেষনাগের দর্শনের জন্য! কিন্তু সন্ন্যাসী জানেন এই ব্যাকুলতা সেই ব্যাকুলতা নয়। ঠাকুর বলছেন গরম তাওয়াতে একটু জল ছিটিয়ে দিলে ছ্যাঁৎ আওয়াজ হতে যতটুকু সময়, বিষয়ীদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা ঠিক অতটুকুই। একটু পরেই বাচ্চাটি যদি মা বলে ডাকে তক্ষুণি এই ব্যাকুলতা উড়ে যাবে।

আত্মতত্ত্ব লাভের একমাত্র পথ আত্মপ্রার্থনা। আমি নিজে আমার আত্মার কাছে প্রার্থনা করছি। আত্মার কাছে প্রার্থনার তাৎপর্য কি? অন্য সব রকমের কামনা বাসনার ত্যাগ। আত্মপ্রার্থনা যখন হয়ে গেল তখন আত্মার লাভ হল কি হল না তাতে আর তার কি, তার তো এখন আর অন্য দিকে মন নেই – রামকে পেলাম না বলে

কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করব! এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। সমাজে আমরা সবাই replacable, হিন্দীতে একটা কথা আছে *তু নহি তো অউর কৈ সহি*, তুমি না থাকলে কি আছে, আরেকজন আছে। চাকরী থেকে অবসর নিলে তার জায়গায় আরেকজন এসে যাবে। চাকরীর ক্ষেত্রে, বিয়ের ক্ষেত্রে, সংসার ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে সবাই replacable। জীবনে এর থেকে লজ্জার কিছু হতে পারে! তার মানে রামের সঙ্গে যদি না চলে তাহলে শ্যামের সঙ্গে চলবে, শ্যামের সঙ্গে যদি না চলে তখন মধুর সঙ্গে চলবে। রাম, শ্যাম, মধু যদি কেউ না থাকে তাহলে যে কোন লোকের সঙ্গে চলবে। তাহলে আমার আর মূল্য কোথায় থাকল। যারা জাগতিক সুখের পেছনে ছুটছে তারা এখানে না পেলে ওখানে যাবে, ওখানে পেলে অন্য কোথায় যাবে, এটা দিয়ে না হলে আরেকটা দিয়ে হবে। মেয়েরা যখন শাড়ি কেনে তখন হাজারটা শাড়ি দেখে একটা শাড়ি কেনে।

আত্মজ্ঞানে তা হবে না, আত্মজ্ঞানের জন্য বলছে আমি সব কিছুকে ত্যাগ করে দিলাম। এরপর আত্মজ্ঞানের বিকল্প কি? আত্মজ্ঞান। তোমার আত্মজ্ঞান তো বাপু হবে না। হবে না তো হবে না তাতে কি, আত্মজ্ঞানকে ছাড়া যাবে না, আত্মজ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। আমার আত্মজ্ঞান হচ্ছে না বলে অনাত্মজ্ঞানে আমাকে নিয়ে যেতে হবে? ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে না বলে ভ্রমজ্ঞানে নিজেকে নিয়ে যাব? সন্ন্যাসীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কি মহারাজ! আপনার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে? সন্ন্যাসী এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যই তো সে সর্বস্য ত্যাগ করে ঈশ্বরের পথে নেমেছেন, এখন যদি তাঁর ঈশ্বর দর্শন না হয়ে থাকে তাহলে কি একটা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করতে নেমে পড়বেন। যে জিনিষের কোন বিকল্প যখন হয় না, যেমন আপনি যে সেবা করছেন, আপনি যে কাজ করছেন যখন অন্য কাউকে দিয়ে সেই কাজ করান যাবে না তখন বুঝতে হবে সেখানে আত্মার শক্তির প্রকাশ হয়েছে। পাড়ার কোন গায়ককে যদি আপনার ক্লাবের জলসায় দুটো গান গাওয়ার অনুরোধ করেন আর সেই গায়ক যদি বলে আমার অন্য কাজ আছে আমার সময় হবে না, তখন পাড়াতে আরও অনেক গায়ক আছে তাদের কাউকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু কিশোরকুমার আপনাদের ক্লাবের ফাংশানে গান গাওয়ার জন্য আসছেন, প্রচুর টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। হঠাৎ করে খবর এল বিশেষ কোন কারণে কিশোরকুমার আসতে পারছেন না, তখন পাড়ার কোন গায়ককে দিয়ে কিশোরকুমারের বিকল্প দাঁড় করান যাবে? নব্বুই ভাগ লোক এমনিই চলে যাবে। সেইজন্য নিজের জীবনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে আমার বিকল্প কেউ থাকবে না।

যখন সব কামনা, সব বাসনা ত্যাগ হয়ে যায় তখন এটাই আত্মপ্রার্থনা হয়ে যাবে। যিনি আত্মপ্রার্থনা করছেন তিনি প্রার্থনার উত্তর পান আর নাই পান, সংসারের দিকে মন তার আর কোন ভাবেই যাবে না। আত্মাকে আর এখানে রিপ্লেস করা যাবে না। আত্মার বদলে যে অন্য কিছু চাইবেন কখনই সে আর পারবে না, আত্মাকেই তার চাই, আত্মাতেই তার মন লেগে থাকবে। তখন আত্মা বলে 'ও, তোমার জীবনে আর কেউ নেই? ঠিক আছে আমিই আছি তোমার জন্য'। অর্থাৎ আমিই আমার জন্য আছি। এটা হল অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা। আমি যখন বিদ্যা পাওয়ার জন্য বিদ্যার পেছনে ছুটে চলেছি, তখন আমি একবার এদিক থেকে একবার ওদিক থেকে বিদ্যাকে একটা ঝলক শুধু দেখছি। কিন্তু বিদ্যা যতক্ষণ বিদ্যার সৌন্দর্য না দেখিয়ে দেয় ততক্ষণ আমি জানতে পারবো না বিদ্যা জিনিষটা কি। বিদ্যার ওই সৌন্দর্যকে জানার জন্য আমাকে তখন বাকি সব কিছু ছাড়তে হবে। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন – বাচ্চা যখন একবার বলে দেবে 'মা যাবো' ওকে আর অন্য কোন কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। এখন আপনি ওকে খেলনা দিন, মিষ্টি দিন, নতুন কাপড় দিন সব ছুড়ে ফেলে দেবে, মা মানে মা, মা ছাড়া আর কিছুতে সে ভুলবে না। এই হল *যমেবৈষ বৃণুতে*, যখন আমি ঠিক করলাম আমার আত্মজ্ঞান চাই, তারপরেই আসে *তেন লভ্যো*, তখনই সে আত্মাজ্ঞান লাভ করতে পারে। *তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্*, তখন আত্মা নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করে দেন।

স্বরূপ প্রকাশ মানে কোন ধরণের অবিদ্যার আবরণ আর থাকছে না। তাঁর যে বাস্তবিক স্বরূপ, আত্মা এই রকমই – এই ভাবেই তাকে কৃপা করেন। আত্মজ্ঞানই জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।

এইখানেই আমরা সব ধর্ম থেকে আলাদা – আমরা সাক্ষাৎ এই জীবদ্দশাতেই আত্মার সাক্ষাৎকার করতে চাই। ঈশ্বরের বাস্তবিক স্বরূপকে আমি দেখতে চাই। সব কামনা-বাসনা যখন ত্যাগ হয়ে যায় তখন কোন একটা স্তরে তিনি নিজের স্বরূপকে দেখিয়ে দেন। সুফিরা অনেক কবিতার মাধ্যমে এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করেছেন, সেইজন্য সুফিদের কবিতা অনেকে বুঝতেই পারেনা। লায়লা-মজনুর কাহিনী খুব সাধারণ কাহিনী ছিল। কিন্তু সুফিরা যখন এই কাহিনীটা নিয়ে লায়লা-মজনুর ভালোবাসাকে দিব্য ভালোবাসার দিকে ঘুরিয়ে দিল, তখনই এই কাহিনী ঠিক ঠিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একটি ছেলে একটি মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসতে শুরু করল। কিন্তু মুসলমানদের পর্দানশীনতার জন্য মেয়েটিকে কখনই সে দেখতে পায় না, কিংবা কখন মেয়েটির পা একটু দেখে নিল বা একটা আঙুল দেখে নিল, তাতেই সে উন্মাদ হয়ে উঠছে। এরপর মেয়েটি ছেলেটির হাজার রকম পরীক্ষা নিতে শুরু করল – এ কি শুধু আমাকেই ভালোবাসে না অন্য কাউকেও ভালোবাসে। মানে আমি replacable কি না। যখন শেষ পর্যন্ত দেখে নিল, না আমি replacable নই, তখন সে কোন অবস্থায় অন্য কারুর কাছে যাবে না। তখন সে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়, দেখ আমি দেখতে এই রকম। ওই রূপ দেখে তার চোখ ঝাঁঝড়া হয়ে যায় – তোমার এত সৌন্দর্য! ঠাকুর বলছেন ব্রহ্মানন্দের এক কণা যার অনুভূতি হয়েছে, রম্ভা তিলোত্তমার সৌন্দর্য তার কাছে চিতার ভস্ম মনে হয়। আত্মার স্বরূপকে যে দেখে নিয়েছে তার কাছে এই জগতের সৌন্দর্য তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যতক্ষণ না নিজে নিজেকে উন্মোচিত করে উদ্ভাসিত করছেন ততক্ষণ কোন উপায় নেই তাঁকে জানার। তাঁকে পাওয়ার একমাত্র পথ সব রকমের কামনা, সব রকমের বাসনার পূর্ণ ত্যাগ।

এই মন্ত্রে যেমন বলা হল সর্বত্যাগ মানেই আত্মপ্রার্থনা, আত্মপ্রার্থনা মানেই আত্ম লাভ। মূল কথা পূর্ণ ত্যাগ না হলে কিছুতেই হবে না। কথামৃতে ঠাকুরকে কোন কোন গৃহী ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন – আমাদের কি ত্যাগ করতেই হবে। ঠাকুর বলছেন – তোমার কেন ত্যাগ করতে যাবে, তোমরা এও কর ওও কর, অর্থাৎ সংসারও কর আবার ঈশ্বরকেও ধর। পূর্ণ ত্যাগের কথা সবাইকে বলা যায় না, যার মনে একটু ভোগের বাসনা থাকবে তাকে পূর্ণ ত্যাগের কথা বললে হয়ত আর ঈশ্বরের কথাই শুনতে চাইবে না। গৃহী ভক্তরা সংসার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ঠাকুরের কাছে আসছে তখন তাকে যদি বলে দেওয়া হয় তোমার দ্বারা কিছু হবে না, তাতে তো বেচারি মরেই যাবে। তাই ঠাকুর সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই ধরণের কথা বলতেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা আত্মদর্শন ত্যাগ ছাড়া হবে না। সংসারও করব আবার ঈশ্বর দর্শনও করব এইভাবে হবে না। যিশুও একই কথা বলছেন – একই খাপে দুটি তলোয়ার থাকে না। তুমি ভগবানকে আর মানুষকে একই সঙ্গে সেবা করতে পারবে না। এই মন্ত্রকেই আবার পরের মন্ত্রেও টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে –

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।।৩/২/৪।।

(এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়। আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগের দ্বারা বা সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নন। যে বিবেকী এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা অর্থাৎ বল, অপ্রমাদ, লিঙ্গযুক্ত তপস্যা এই কয়টির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন তিনিই সে সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে প্রবেশ করেন।)

আত্মজ্ঞান কিভাবে হবে এর আরও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। *নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* স্বামীজী এর ব্যাখ্যা করছেন তোমার ভেতরে শক্তি চাই। আচার্য এখানে বলছেন বলহীন মানে *বলপ্রহীণেনাত্মনিষ্ঠাজনিতবীর্যহীনেন*, বীর্যহীন, যাদের মধ্যে তেজ নেই। তেজ কোথা থেকে আসে? *আত্মনিষ্ঠাজনিতবীর্য*, আত্মার প্রতি যাদের নিষ্ঠা, একেবারে পূর্ণ নিষ্ঠা, একমাত্র তাদেরই বীর্য বা তেজ হয়। ঠাকুর তেজহীন, বীর্যহীনদের বলছেন চিড়ের ফলার, জলে দিলেই ভ্যাদভ্যাদে হয়ে যায়। আরেকটি উপমা দিচ্ছেন, বাজারে যখন গরু কিনতে যায় তখন গরুর

লেজের তলায় হাত দেয়। কিছু গরু আছে লেজের তলায় হাত দিলেই শুয়ে পরে। আবার কিছু গরু তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। যে গরুটা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সেই গরুটাই কেনে। সেইজন্য অনেক গরুর মালিক করে কি গরুর লেজে ছুঁচ ফুটিয়ে রাখে আর নয়তো লেজটাকে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এমন ব্যাথা করে দেয় যে হাত দিলেই যাতে লাফিয়ে ওঠে, তখন মরা গরুও লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু মূল কথা হল তোমার মধ্যে তেজ নেই, আঁট নেই। এই তেজ বা আঁট আসবে আত্মজনিত নিষ্ঠা থেকে। আমি আত্মা এই ভাবে যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না হয়, আর এই ভাবে যদি প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে তাহলে রাজার ব্যাটার মত হতে হবে। রাজার ব্যাটা জানে আমি রাজা নই কিন্তু আমি রাজকুমার, আমিই এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমার আত্মজনিত নিষ্ঠা না থাকতে পারে কিন্তু আমার এই ভাব থাকতে হবে আমি সেই বংশের লোক, যে বংশের লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করেছেন। কিন্তু আমি যদি দেখি আমার বাবা ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করেননি, আমার বাবার বাবা, কিংবা তার বাবা, এইভাবে যদি দেখি আমার বংশের দশ পুরুষ কেউ ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করেননি, তাহলে আমার ভেতরে শক্তি আসবে কোথা থেকে! স্বামীজী এই দেশের লোকদের এত গালামন্দ দিয়ে গেছেন, তোমরা সব কাপুরুষের দল, এই কারণেই বলে গেছেন। আমাদের আত্মজনিত নিষ্ঠা নেই, আত্মজনিত নিষ্ঠা মানে আত্মজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা কিংবা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যেখানে সে বলতে পারছে তুমি আমার গলা কেটে দেবে বলছ, তা কেটে দাও – *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। আমি তোমার গলা কেটে দিলে আমার কোন পাপ বোধ হবে না, তুমি যদি আমার গলা কেটে দাও তাতেও আমার কিছু হবে না, আমার মৃত্যভয় বলে কিছু নেই। এই বোধ আমার নেই, আমার বাবারও ছিল না, ঠাকুর্দারও ছিল না, বংশে কারুরই ছিল না। তাহলে আমার মধ্যে কোথা থেকে তেজ আসবে! তেজ আসার জন্য তো কিছু একটা চাই, বংশে তো কিছুই নেই সবই ফাঁক্কা, আমার বাবা, ঠাকুর্দা জন্মেছিলেন আবার মরে গেলেন, তাতে কি হল! কিন্তু যে রাজার ব্যাটা সে জানে আমার ঠাকুর্দা রাজা ছিলেন তাঁর এই এই কীর্তি, তাঁর বাবা এই এই করেছিলেন। কিন্তু আমি যখন আমার বংশের দিকে তাকাই, কোথাও কিছু পাচ্ছি না যে আমার বংশের কেউ এই এই করেছিলেন। ঠিক আছে যা ভুল হওয়ার হয়ে গেছে। আমি এখন অন্ততঃ যদি পুরো ভারতকে নিজের পরিবার মনে করি, পুরো হিন্দু ধর্মকে যদি নিজের পরিবার বলে মনে করি তাও তো নিজস্ব একটা কিছু ভাব আসবে। তেজ যতক্ষণ না আসছে জগতের কোন কিছুই উপলব্ধি করা যাবে না, একটা চাকরিই জোগাড় করতে পারবে না, সেখানে আত্মজ্ঞান লাভ কোথা থেকে হবে। আমাদের ভেতরে কোন তেজ নেই, কোন ধরণের শক্তি নেই, চেহারা ঝকঝক করছে না, মুখটা সব সময় মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বাংলার পাঁচ হয়ে আছে। যতই ক্রীম মাখুক আর ফেসিয়াল করুক চেহারায় তেজ আর আসছে না। চেহারায় তেজ আসে ব্রহ্মতেজ আর ক্ষাত্রতেজ থেকে, এই দুটো ছাড়া চেহারায় তেজ আসে না। টাকা-পয়সাতে কিছু তেজ হয় না। আমি আত্মাকে পেতে চাই, এই আত্মজনিত নিষ্ঠা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তেজ আসবে না। এর শক্তিই আমাকে সবার থেকে আলাদা করে দেবে, হাঁটাচলা, চোখমুখের ভাব সব আলাদা। এই তেজ যাদের নেই এদের দ্বারা কোন দিন আত্মজ্ঞান হবে না। ভাববার কথায় স্বামীজী এগুলোকে নিয়ে খুব ব্যঙ্গ করেছেন।

কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় – কি দাদা বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন। হ্যাঁ নিয়েছি। ব্যস্ আর কোন চিন্তা করতে হবে না। বছরে একদিন গিয়ে খিচুড়ি খেয়ে আসছেন তো। হ্যাঁ খেয়ে আসছি। ব্যস্ আর কিছু করত হবে না। এবার নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে থাক, আর কষ্ট হলে মাঝে মাঝে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবেন। এই করে কিচ্ছু হবে না। ভাই তুমি খুব কড়া কথা বলছ। কিন্তু শাস্ত্রই বলছে *নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ*। আমাদের কেউ একটা কিছু কথা বলে দিল সারা দিন মুখ ভার করে বসে আছি। একটু শক্তি নেই যে কোন কথাকে হজম করে নিতে পারবে। জীবনে একটু কিছু এদিক সেদিক হয়ে গেলেই হয় ট্রেনের তলায় গলা পেতে দিচ্ছে নয়তো গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ছে।

অনেক দিন আগে বিদ্যামন্দিরে যখন স্বামী তেজসানন্দ অধ্যক্ষ ছিলেন তখনকার একটা ঘটনা আমাদের অনেকের মনে এখনও রেখাপাত করে। বাইরে থেকে একজন প্রফেসার আসতেন, ক্লাশ নিতেন,

ক্লাশের পরে মহারাজের ঘরে গিয়ে এক কাপ চা খেতেন। সেদিনও ক্লাশের পর প্রফেসার চা খাচ্ছেন। মহারাজ হঠাৎ তাঁকে বলছেন 'আজকে আপনাকে কেমন যেন দুখী দুখী লাগছে, আপনার কি কিছু হয়েছে'! একটা দুটো কথা বলার পর বলছেন 'মহারাজ! আজকে আমার একমাত্র ছেলেটি মারা গেছে, এখন গিয়ে দাহ করতে হবে'। শোনা মাত্র স্বামী তেজেসানন্দের তো মাথা ঘুরে গেছে 'আপনি এই অবস্থায় আজকে কলেজে এলেন'! বলছেন 'না, তেমন কিছু না, ছেলেরা আমার ক্লাশের জন্য অপেক্ষা করবে। দেখলাম সবাই যা ব্যবস্থা করার করছে ততক্ষণে এখানে ক্লাশটা নিয়ে নিই'। মহারাজ হতবাক! বিদ্যার চর্চা করে, বিদ্যাকে ভালোবেসে একটা মানুষ কোন অবস্থায় যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। একজন বুড়ো মানুষ, তাঁর একমাত্র সন্তান মারা গেছে। এখন দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মাঝখানে কিছুটা সময় আছে, ছাত্ররা অপেক্ষা করছে, তাদেরকে পড়িয়ে আবার তিনি চলে গেলেন, কাউকে জানতেও দিলেন না।

বার্মার মেয়ে শুচি যে আজ বার্মাতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য এত আন্দোলন করে যাচ্ছেন, শুচির মার কাহিনী শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। শুচির বাবা ছিলেন বার্মার প্রেসিডেন্ট। যেদিন বার্মাতে সামরিক অভ্যুত্থান হল আর শুচির বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলা হল সেই সময় বার্মার রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট বড় হাসপাতালে একটা অনুষ্ঠান চলছিল, শুচির মা সেই সময় ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। সেই সময় একজন দৌড়ে এসে খবর দিল এই রকম মিলিটারি ক্যু হয়ে গেছে। শুচির মা জিজ্ঞেস করছেন 'প্রেসিডেন্ট কি মারা গেছেন'? 'না, এখনও বেঁচে আছেন'। 'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কি?'।আবার একজন দৌড়ে এসে খবর দিচ্ছে 'ম্যাডাম্ তিনি এই মাত্র মারা গেছেন'। 'ঠিক আছে'। আর কিছু বললেন না। সেখান থেকে আবার সভাপতির ভাষন দিলেন। টিফিনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি আর টিফিন নিলেন না। সেখান থেকে সরাসরি স্বামীর কাছে চলে গেলেন। ততক্ষণে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে বার্মাতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়ে গেছে, বার্মার রাষ্ট্রপতিকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির স্ত্রী একটুও চঞ্চল হলেন না। রাত্রিতে নিজের দলের লোকদের এবং গণতন্ত্রকামী জনগণের উদ্দেশ্যে ভদ্রমহিলা একটা বাণী দিয়ে বলছেন 'তোমরা কাঁদবে না। আমাদের শত্রুরা আমাদের দেখছে। আমাদের কান্না দেখে তাদের আনন্দ হবে। কান্নার জন্য তোমাদের সারা জীবন পড়ে আছে, তাই কান্না দিয়ে এখন শত্রুদের আনন্দ দিও না'। এই হল বীর্য, তেজ। কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের আত্মনিষ্ঠাজনিত তেজ।

যাদের এই তেজ নেই তাদের দ্বারা আত্মার ব্যাপার ছেড়ে দিন, জাগতিক ক্ষেত্রেও কিছুও হবে না। *ন চ প্রমাদাত্তপসা*, যারা প্রমত্ত তাদের দ্বারাও হবে না। প্রমত্ত মানে যাদের মন পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণায় পড়ে আছে। আচার্যও তাঁর ভাষ্যে তাই বলছেন – *লৌকিকপুত্রপশ্বাদিবিষয়াসঙ্গনিমিত্তপ্রমাদাৎ*, এখন আর পশু কেউ রাখে না, পশুর জায়গায় এখন হবে গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি। সন্তান, গাড়ি, বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, লৌকিকতা এই সব দিকে যাদের মন পড়ে আছে এদের দ্বারা হবে না। এগুলোকেই ঠাকুর দুটো শব্দে বলে দিয়েছেন – কামিনী আর কাঞ্চন। যেখানেই আসক্তি সেখানেই প্রমাদ, প্রমাদ মানে মনটা ঘুরে যায়। ইদানিং আমাদের আশাপাশে এক নজর যদি ভালো করে তাকিয়ে দেখি, মানুষ সারাটা দিন বসে বসে হয় ইন্টারনেট দেখছে, নয়তো টেলিভিশন দেখছে, আর তা নাহলে মোবাইলে সারাক্ষণ কথাই বলে যাচ্ছে আর তা নইলে বড় বড় শপিং মলে কেউ অকারণে ঘুরছে, কেউ শপিং করছে। সারাটা দিন মানুষ এর মধ্যেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। মন তোমার প্রমাদে ভরা, তোমার দ্বারা কি করে হবে!

তার সঙ্গে বলছেন *তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ*, তোমার যদি তপস্যা না থাকে তাও হবে না। আর লিঙ্গ যদি না থাকে। এখানে তপস্যা মানে জ্ঞান, শাস্ত্র জ্ঞান আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান। লিঙ্গ মানে চিহ্ন, চিহ্ন হল সন্ন্যাস। সন্ন্যাস যদি না হয় তাহলে আত্মজ্ঞান হবে না। আচার্য শঙ্কর কোথাও যদি সামান্যতম একটু সুযোগ পান সেখানেই তিনি বলবেন সন্ন্যাস ছাড়া হবে না। মানে যেখানে সন্ন্যাসের কথা আছে সেখানে তো কোন প্রশ্নই নেই, যেমন এখানে পরিষ্কার বলাই হচ্ছে *বাপ্যলিঙ্গাৎ*, তুমি যদি অলিঙ্গ হও, মানে তোমার যদি চিহ্ন না থাকে, গেরুয়া যদি না থাকে তাহলে কিন্তু বাপু তোমার আত্মজ্ঞান হবে না। এই ব্যাপারে আচার্য একেবারে কট্টর,

সন্ন্যাসী ছাড়া হবে না। তিনি আবার বাহ্য সন্ন্যাসের উপর খুব জোর দিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক জায়গায় অন্তঃসন্ন্যাসের উল্লখ আছে, কিন্তু আচার্য শঙ্কর এই ব্যাপারে কখনই আপোশ করবেন না, তাঁর কাছে অন্তঃসন্ন্যাস তো অবশ্যই কিন্তু তার সাথে বাইরেও সন্ন্যাস হতে হবে। ঠাকুর যেমন বলছেন – তোমরা গৃহস্থ, তোমরা সংসারী, তোমাদের মনে ত্যাগ, বাইরে ত্যাগ তোমাদের হবে না। সন্ন্যাসীর মনেও ত্যাগ বাইরেও ত্যাগ। এখানে আচার্য এটাই বলছেন মনেরও ত্যাগ বাইরেও ত্যাগ, অন্তঃসন্ন্যাস তো তোমার করতেই হবে কিন্তু শুধু অন্তঃসন্ন্যাস করলেই হবে না, তোমাকে বহিঃসন্ন্যাসও নিতে হবে।

কিন্তু এই জিনিষটা যুক্তিতে কোথাও যেন আটকে যায়। বহিঃসন্ন্যাস, মানে গেরুয়া নেওয়া, মস্তক মুণ্ডিত করার সাথে অন্তঃসন্ন্যাসের কি সম্পর্ক থাকতে পারে এটা খুব বিতর্কিত বিষয়। একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, যিনি বহিঃসন্ন্যাস নিয়েছেন তাঁর সংসারে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটা কমে যায়। পদে পদে পতনের সম্ভবনাটা কমে যায়। অন্তঃসন্ন্যাসী সংসারে থেকে অনেক কিছুই করতে পারেন কিন্তু বিরজা হোম করে গেরুয়া ধারণ করার পর একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সেই জিনিষ গুলো করা সম্ভব নয়। স্বামীজী যখন অমরনাথ যাত্রায় যাচ্ছেন, সাথে নিবেদিতা আছেন। একটা জায়গায় স্বামীজী রাত্রিবাস করবেন। স্বামীজীর তাঁবুর পাশে নিবেদিতার তাঁবু খাটানো হয়েছে। হঠাৎ একজন বাইরের সন্ন্যাসী স্বামীজীকে ডেকে বললেন 'স্বামীজী! আমি জানি আপনি কামজয়ী পুরুষ, আপনার কাছে এগুলো কিছুই নয়। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই জিনিষটা ঠিক হবে না'। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার টেন্টটা দূরে সরিয়ে দিলেন।

কিন্তু শুধু বহিঃসন্ন্যাসেও হবে না, অন্তঃসন্ন্যাস তো সবার আগে তার বাধ্যতামূলক। অন্তঃসন্ন্যাস, ঠাকুর যেটা বলছেন তোমাদের মনে ত্যাগ, মনের ত্যাগ অবশ্যই। অন্তঃসন্ন্যাস না করে উপনিষদ শোনা বা পড়া, চিন্তন করা, আত্মজ্ঞান, ঈশ্বর দর্শন আশা করা, এগুলো একেবারেই বেকার। দুটো জিনিষ এক সঙ্গে চলতে পারে না। ঠাকুর যে বলছেন কেশব সেনের যোগ ভোগ দুইই আছে, তার মানে আপনি ধ্যানেও বসবেন আবার ভোগও করবেন কিন্তু তাই বলে কি ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাবে নাকি! যোগ ভোগে সেটা কখনই হবে না, তা নাহলে সেটা শাস্ত্রের বিরোধ হয়ে যাবে। ঠাকুর যেখানে যেখানে এই ধরণের কথা বলছেন সেখানে তিনি বলতে চাইছেন তোমার এই দিকটাও যখন আছে তখন এই পথে তুমি নামতে পার, এই পথে নেমে গেলে আস্তে আস্তে ভোগের ব্যাপার গুলো খসে যেতে থাকবে।

শাস্ত্রের দৃষ্টিতে *ন চ প্রমাদাৎ*, সংসারে মন আছে? হবে না। যার তপস্যা নেই তারও হবে না। *বাপ্যালিঙ্গাৎ*, সন্যাসে আপনি যদি প্রতিষ্ঠিত না হন, তাহলে আপনার হবে না। বলছেন যিনি বিদ্বান এই কটি জিনিষ তাঁর থাকতে হবে, বিদ্বান মানে যিনি আত্মাকে জানতে চাইছেন বা আত্মজ্ঞানী পুরুষ – তাঁর আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা রয়েছে, তাঁর মধ্যে বীর্য, তেজ, আমি করব, আমি পারব এই দৃঢ় ভাব রয়েছে। অপ্রমাদ, সংসারের কোন সুখ পাওয়ার দিকে তাঁর মন নেই, তাঁর তপস্যা আছে, তপস্যা মানে জ্ঞান আর অন্তঃ ও বাহ্য সন্ন্যাস। এই কটি জিনিষ যাঁর মধ্যে আছে তিনিই একমাত্র আত্মজ্ঞানের চরম লক্ষ্যে এগোনর আশা করতে পারেন। এখানে অসফল হওয়ার কথাই আসে না, পরে এক জায়গায় অসফল নিয়ে কথা বলছেন। আচার্য এখানে বলছেন *তস্য বিদুষঃ এষ আত্মা বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম* – এই ধরণের পুরুষের আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে যায়, ব্রহ্মধাম মানে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ব্রহ্মধাম বলতে এখানে কোন লোক বোঝান হচ্ছে না। কেন ব্রহ্মধাম বলা হচ্ছে এটাকেই পরের মন্ত্রে ব্যাখ্যা করবেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হতে চান বা সাধারণ লোকদের ভাষায় বোঝানর জন্য বলছেন ব্রহ্মলোকে যেতে চাইছেন তাদের এই চারটে জিনিষ প্রথমে করতে হবে – প্রথমে আপনাকে আত্মাকে জানার ইচ্ছা করতে হবে, এই ইচ্ছা হলে প্রথম চাই বীর্য, তেজ, তারপর দ্বিতীয় অপ্রমাদ, সংসারের কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকবে না। তৃতীয় সন্ন্যাস – অন্তঃ বহিঃ দুই সন্ন্যাসই। চতুর্থ তপস্যা, মানে জ্ঞান। এই চারটে জিনিষ যাঁর মধ্যে আছে তিনি এবার ব্রহ্মধামে প্রবেশ করবেন। কিভাবে তিনি ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন?

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মনো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।।৩/২/৫।।

(ঋষিরা এই আত্মাকে অবগত হয়ে কেবল জ্ঞানদারাই তৃপ্ত হন, তাঁদের আত্মা পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁরা আসক্তিশূন্য হন ও তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এইরূপে বিবেকী ও নিত্য সমাহিত ব্যক্তিগণ জীবনকালে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্বত্র প্রাপ্ত হয়ে (দেহান্তকালে) সর্বস্বরূপে প্রবেশ করেন।)

যাঁরা এই চারটে জিনিষকে অবলম্বন করে আত্মজ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন তাঁদের জগতের কোন কিছুরই আর প্রয়োজন নেই। কারণ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁদের জ্ঞানতৃপ্ত হয়ে যায়। আর *কৃতাত্মনঃ*, তাঁরা কৃতকৃত্য হয়ে যান, *বীতরাগাঃ*, সংসারের সব কিছুতে তাঁর বিরক্তি এসে যায়। তার ফলে তিনি একেবারে প্রশান্ত চিত্ত হয়ে যান। *তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা*, সর্বত্র যে ব্রহ্ম আছেন সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করেন। *সম্প্রাপ্যৈ*, এই আত্মাকে প্রাপ্ত করে, প্রাপ্ত করা মানে জেনে। বস্তুকে যেভাবে প্রাপ্ত করা হয় সেই অর্থে প্রাপ্ত করা নয়।

আগের মন্ত্রে বলেছিলেন *বিশতে ব্রহ্মধাম*, আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে গেলে তিনি ব্রহ্মধামে সম্যক্ রূপে প্রবেশ করেন। এখানে প্রবেশ করা বলতে আমরা যেমন বুঝি একটা জিনিষকে আরেকটা জিনিষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, সেই অর্থে এখানে প্রবেশ করা হয় না। পরের মন্ত্রে বলছেন *সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো*, ঋষিরা সম্যক্ রূপে আত্মাকে প্রাপ্ত করে। আচার্য এই প্রাপ্তকে ব্যাখ্যা করছেন আত্মাকে প্রাপ্ত করা মানে আত্মাকে জানা। বেদ উপনিষদের যে কোন মন্ত্রের যখন অর্থ করা হয় তখন অনেক সময় দেখা যায় এর শাব্দিক অর্থ এক রকম হচ্ছে কিন্তু আচার্য তার অর্থ অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। উপনিষদ বা বেদের অর্থ করার সময় পুরো উপনিষদের বা পুরো বেদের বক্তব্যটা কি সেটাকে আগে ধরে নেওয়া হচ্ছে। ওই মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি মন্ত্রের অর্থগুলোকে বার করা হয়। যেমন পদার্থ বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব হল আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি, যিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ তিনি আগে জানেন থিয়োরি অফ রিলেটিভিটিতে এগুলো হল মূল বক্তব্য। এখন একটা পাঠ্য বইতে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন এমন শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে বা এমন কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে সাধারণ যার অর্থ অন্য রকম। কিন্তু যিনি পড়াচ্ছেন তিনি পুরো ব্যাপারটা জানেন যে জিনিষটা এই রকম। তখন তিনি সেইভাবে শব্দের ব্যবহার করে অর্থটাকে পরিষ্কার করে দেন। এখানেও ঠিক তাই, যতক্ষণ পুরো উপনিষদের বিষয় বস্তু ও বক্তব্য যদি স্পষ্ট না থাকে তখন একটি বিশেষ মন্ত্রের অর্থ যদি বার করতে যাওয়া হয় তখন গোলমাল লেগে যাবে।

এখানে যদি শাব্দিক অর্থকে অনুসরণ করা হয় তখন দেখা যাবে অন্য একটা মন্ত্রের অর্থ বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। এই বিপরীত অর্থ থেকে যাতে সংশয় না হয় তাই আচার্য আগেই পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। কারণ এর পরেই বলবেন যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে জানা মানে এটা একটা জ্ঞান। যেমন আমার জ্ঞান আছে আমি এই শরীর, মন, বুদ্ধি। শরীর বোধ নিয়ে আমি সারা জীবন চলছি। আর আমি জানি কদিন পর আমার মৃত্যু হবে। তখন এই শরীরকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই রকম আমি কোন রকম আচরণ করি না যে আমার শরীর ছাড়া অন্য দিকে আমার দৃষ্টি যাবে। কারণ ওই বোধটা আমার মধ্যে ঠিক ঠিক বসেনি। যার এই বোধটা দৃঢ় হয়ে ভেতরে বসে যাবে যে, আমি কদিন পর মারা যাব, তার আচরণ অন্য রকম হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি আমি যে শরীর নই এই বোধ প্রতি মুহুর্তে আমাকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা বয়সে আমি এক রকম ছিলাম, ক্লাশ টেনে আমি দেখতে এক রকম ছিলাম, গ্রাজুয়েট হওয়ার পর অন্য রকম চেহারা হয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহুর্তে আমার শরীর পাল্টাচ্ছে। বায়োলজিতে বলছে আমাদের শরীরের কোষ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে, তবুও মনে করছি আমি এই শরীর। একদিকে দেখছি আমার শরীরের প্রতিনিয়ত

পরিবর্তন হচ্ছে তবুও আমি মেনে নিয়ে বসে আছি যে আমি শরীর। ঠিক তেমনি বড় বড় আচার্যরা যতই আমাকে বলতে থাকুন তুমি ঈশ্বরের অংশ, এটা কিছুতেই আমাদের ভেতরে ঢুকবে না। কারণ যে মুহুর্তে আমি জেনে যাব আমি ঈশ্বরের অংশ বা আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক সাথে সাথে আমার জীবনধারা পুরো পাল্টে যাবে। কি রকম পাল্টে যাবে? ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। যে কাঙালীপনা আমরা সব সময় করে যাচ্ছি সেই কাঙালীপনা আর করতে যাবো না। এই অজ্ঞানটা ওই জ্ঞানে কেটে যায়।

আমরা গাড়ি, গয়না যে ভাবে দোকান থেকে কিনে আনি, ব্রহ্মকে কি সেইভাবে কিনে আনতে হবে? না, এখানে কিছুই হচ্ছে না। আমার সামনে অনেক রকম জ্ঞান ঘুরছে, জ্ঞান মানে কতকগুলো সত্য, আমার যে ঠিক ঠিক স্বরূপ। এখন আমি এই শরীর বোধ নিয়ে আছি, এই জ্ঞান এসে গেলে আমি শরীর বোধটা পাল্টে গিয়ে তার জায়গায় আমি ব্রহ্ম এই বোধ হবে। শুধু বোধটুকু পাল্টাবে, তাছাড়া আর কিছু হবে না। এই বোধ পাল্টানোকেই বলে প্রবেশ করা, এই বোধ পাল্টানোকেই বলে প্রাপ্ত করা। কিন্তু জিনিষটা সব সময় জ্ঞান, আমি সেই সচ্চিদানন্দ এই জ্ঞান। গীতা, উপনিষদ, কথামৃত সব মোক্ষশাস্ত্রের এই একটিই সার কথা, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই আর তুমি সচ্চিদানন্দের সাথে এক। ঠাকুর যখন বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, এখানেও সেই একই অর্থে বলা হচ্ছে, বোধে বোধ করা যে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। ঠাকুরের দর্শন তো আমাদের সব সময়ই হচ্ছে, যখন ইচ্ছে হবে তখনই ঠাকুরের দর্শন করিয়ে দেওয়া যাবে। কারণ শ্রীমা বলছেন ছায়া কায়া সমান। তাহলে ঠাকুর আর ঠাকুরের মুর্তি বা ছবি তো আলাদা হবে না। ছায়া কায়া সমান, বেলুড় মঠে গিয়ে ঠাকুরের মুর্তি দেখে নিলেই ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন হয়ে গেল। দিন রাত তো ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন হচ্ছে কিন্তু তাতে কি হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না, যেমন ছিলাম তেমনই আছি, কিছুই পাল্টাচ্ছে না। ঈশ্বর দর্শনে কিছুই হয় না। কিন্তু যখন এই বোধ হচ্ছে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তাই আমিও স্বভাবত দিব্য, তখন সমস্ত আচরণ মুহুর্তের মধ্যে পাল্টে যায়। ঈশ্বর দর্শন আর ঈশ্বরকে জানা বলতে এটাই, ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন দেখা। কলকাতার সোনার দোকানে রোজ গিয়ে এত গয়না দেখছি তাতে আমার কি আসছে যাচ্ছে। আমি যদি রোজ বেলুড় মঠে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন তাতে আমার কি হবে, কিছুই হবে না। এই যদি ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহলে এই ঈশ্বর দর্শনে কিছু হয় না। ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরকে জানলে, ঈশ্বরের জ্ঞান হলে তখন চরিত্র পাল্টায়। এই চরিত্র পাল্টালে মানুষ সংসারের শোক আর মোহ থেকে মুক্তি পায়। তখন মানুষ জীবনের আনন্দকে উপভোগ করে।

সেটাই এখানে বলছেন *সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মনো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ*, এই আত্মাকে সম্যক্ ভাবে প্রাপ্ত করা, আচার্য প্রাপ্তকে বলছেন জেনে, পাওয়া মানে জিনিষটাকে জানা। আমি বলতে পারি, আমি যদি জেনে যাই যত গয়না সব সোনা দিয়ে তৈরী তাতে আমার কি হবে। এটা সেই জানা নয়, এই জানা হল আমার স্বরূপকে জানা। একজন নিজের ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুকে ধরে বলছে আমার হাতের তালু আটকে গেছে আমি বন্ধনে পড়ে গেছি। এখন তাকে যতই বলা হোক তুমি বন্ধনে নেই তাতে তার কিছুই হবে না। কিন্তু যখন সে ঠিক ঠিক বুঝে যাবে যে আমি বন্ধনে নেই তখন আপনা থেকেই তার হাতটা খুলে যাবে। এটাই এখানে বলছেন *সম্প্রাপ্য এনম্, এনম্* মানে এই জিনিষটাকে পেয়ে, পেয়ে মানে জেনে। জানা মানে, এটাই তো তোমার আসল স্বভাব, বাইরে তো কিছু নেই। বাইরে যেমন টেবিল, চেয়ার, লোকজন দেখছি ব্রহ্ম কি সেইভাবে বাইরে রয়েছেন যে তাঁকে দেখতে হবে! ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমার স্বরূপ। আমার নিজের স্বরূপ যখন জেনে গেলাম আমার ব্যবহার আপনা থেকেই পাল্টে যাবে। *ঋষয়ো*, মানে ঋষিরা, আত্মদর্শনবান, যাঁরা আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন পান, ঋষিরা স্পষ্ট দেখেন এই সব কিছু নাম রূপের খেলা এর পেছনে সেই আসল ব্রহ্মই একমাত্র আছেন।

ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই আর আমি সেই ব্রহ্ম, ঋষিদের দুটো স্তরে এই জ্ঞান হয় – *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* আর *অহং ব্রহ্মাস্মি*। আমি সেই ব্রহ্ম, কোন ব্রহ্ম? *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, জগতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, এই জগতে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের প্রকাশ। এখানে এসে যারা হিন্দু ধর্মকে ভালো করে বোঝেন না তারা বার বার এই

ভুলটা করে ফেলেন। কিছু দিন আগে একটি পত্রিকায় একজন লেখকের একটা লেখা বেরিয়েছে, লেখক আবার হিন্দু ধর্মকে উঠতে বসতে গালাগাল দেন। তাঁর লেখাতে তিনি বলছেন হিন্দু ধর্ম এক বিচিত্র ধর্ম, এদের সবই ভগবান সাপও ভগবান, ইঁদুরও ভগবান, বানরও ভগবান। ভদ্রলোক হিন্দু ধর্মের মূল জায়গাটাকেই ধরতে পারছেন না, কিংবা হয়ত জানেন না। হিন্দু ধর্মে বলা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। তুমি যা কিছু দেখছ সবই ঈশ্বরেরই এক একটি রূপ। যাদের ধর্মে ঈশ্বর আছে আবার শয়তানও আছে তাদের ধর্মে এই ধরণের সমস্যা আছে। আমাদের ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, আমাদের দৃষ্টিতে ভালো মন্দ যা কিছু দেখছি সব তিনিই।

যখন একজনের বোধ হয়ে যায় ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তখন ওই জ্ঞানেই সে তৃপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তৃপ্ত হয় বিষয় ভোগের দ্বারা। আমি যখন ভাবছি আমি এই শরীর তখন ভালো খাওয়া-দাওয়া করে, ভালো পড়ে, ভালো ভালো জিনিষের ভোগ করে তৃপ্ত হব। যিনি মনে করেন আমি হলাম বুদ্ধি, তিনি যখন ভালো কিছু চিন্তা করছেন কিংবা যারা আর্টিস্ট তারা যখন খুব সুন্দর একটা ছবি আঁকছে তখন তারা তৃপ্ত হয়ে যায়, কবি একটা কবিতা লিখে তৃপ্ত হয়ে যায়। যখন খাওয়া-দাওয়া করছে, যখন সেই ভোগ করছে, যখন কবিতা লিখছে, ছবি আঁকছে, যখন ভালো বই পড়ছে এগুলো সবই বহিঃসাধন। যে মনে করছে আমি হলাম শরীর, মন, বুদ্ধি, এদের তৃপ্ত হওয়ার জন্য এই বহিঃসাধন করতে হচ্ছে। যিনি চিন্তা ভাবনা করেন তাঁকেও কারুর সাথে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ভাগ করে নিতে হয়। এর ভালো উদাহরণ হলেন সক্রেটিস। উনি নিজে খুব বড় চিন্তক ছিলেন, কিন্তু নিজের চিন্তা ভাবনা গুলো এথেন্সের যাঁরা তাঁর ভক্ত ছিল তাঁদের গিয়ে তাঁকে বলতে হত। আবার অনেক চিন্তাবিদ কম কথা বলেন, কিন্তু তাদের লিখতে হয়। এনাদের সবার ক্ষেত্রে বহিঃসাধন দরকার। কিন্তু ঋষিদের এই বহিঃসাধনের দরকার পরে না। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* আর *অহং ব্রহ্মাস্মি* এই জ্ঞানেই সব সময় তৃপ্ত হয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পশু, গাড়ি, বাড়ি কোন কিছুই লাগবে না। নিজের মধ্যেই নিজে তৃপ্ত হয়ে আছেন।

এই তৃপ্ত হওয়া মানে *কৃতাত্মা*। কৃতাত্মা কখন হয়? মানুষ যখন মনে করে আমি ধন্য হয়ে গেলাম, আমি পূর্ণ হয়ে গেছি এই বোধ যখন আসে। সিনেমাতে হিরো হিরোইনকে বলে তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেলাম, কিন্তু এখানে বহিঃসাধন হয়ে যাচ্ছে। বাইরের একটা জিনিষকে পেয়ে ধন্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপার এখানে আসছে না। এই আত্মার জ্ঞানেই তিনি তৃপ্ত হয়ে *কৃতাত্মানো* হয়ে যান। এই ধরণের কৃতকৃত্য মানুষের আত্মা বলে কিছু থাকে না, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন *পরমাত্মস্বরূপেণৈব নিষ্পন্নাত্মনঃ*, তিনি বুঝে যান আমি আমি বলে যা করছি এই আমি বলে কিছু নেই। এই আমি পরমাত্মারই স্বরূপ।

আমি যাকেই ভালোবাসছি, সে আমার সন্তান হতে পারে, আমার আচার্য হতে পারেন, আমার স্ত্রী বা স্বামী হতে পারে, সে আমার হৃদয়েই থাকে। কিন্তু মানুষ যখন পরমাত্মাকে ভালোবাসে তখন সে কোথায় থাকে? এখানে এসে পুরো ব্যাপারটাতে একটা বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে। ভগবান গীতায় বলছেন – *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী হলেন আমার আত্মা। যিনি জ্ঞানী, যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁর হৃদয়ে ভগবান থাকেন না, ভক্ত বা জ্ঞানী তখন ভগবানের হৃদয়ে থাকেন। এখানে পুরো পাল্টে যায়। এই ব্যাপারটা ধরা খুব কঠিন, বুঝতে সময় লাগবে। জাগতিক অর্থে যাকে ভালোবাসছে, যে জিনিষকে সে ভালোবাসছে সব তার হৃদয়ে থাকে। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু যাকেই আমি ভালোবাসি না কেন সে আমার হৃদয়ে থাকবে কিন্তু তাদের হৃদয়ে আমি তখনই থাকতে পারব যখন তারা আমাকে ভালোবাসবে। থাকতেও পারি নাও থাকতে পারি, অথবা আমি এক তরফা ভালোবেসে যেতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরকে ভালোবাসলে তা হয় না। ঈশ্বরকে ভালোবাসার প্রথম লক্ষণই হল যেটা গীতায় ভগবান বলছেন *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, আমার হৃদয়ে আর ঈশ্বর নেই, আমিই এখন ঈশ্বরের হৃদয়ে। জাগতিক বস্তুর প্রতি ভালোবাসা আর পারমার্থিক বস্তুর প্রতি ভালোবাসার মধ্যে এটাই বিরাট পার্থক্য। পারমার্থিক বস্তুকে ভালোবেসে সে পরমার্থ স্বরূপ হয়ে যায়। পরমার্থ স্বরূপ হয়ে যাওয়া মানে তার হৃদয়ে আর ঈশ্বর বাস করছেন না, তখন ঈশ্বরের হৃদয়ে ভক্ত বাস করে। এই অবস্থায় যখন সে পৌঁছে যায় তখন তো সে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। অভিন্ন হলেই সে পরমার্থ স্বরূপের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এর

আগের খণ্ডে বলছিলেন এই ধরণের মহাত্মাদের যদি সেবা পূজা করা হয় তাহলে মানুষ যা কিছু কামনা করবে সেটারই পুর্তি হয়ে যাবে। কারণ তিনি তো পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেছেন আর কি করে বোঝা যাবে? *বীতরাগাঃ* মানে *বীগতরাগাদিদোষঃ*, তাঁর মধ্যে মনের আবেগজনিত ধর্মের কারণে কোন রকম দোষ অবশিষ্ট থাকে না। মনের আবেগের দোষ বলতে রাগ আর দ্বেষ, এই ধরণের কোন দোষ তাঁর মধ্যে থাকবে না। তার মানে একটা বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা বা আকর্ষণ কিংবা কারুর প্রতি দ্বেষ, ঘৃণা করা এই ধরণের মনের কোন ধর্ম তাঁর মধ্যে আর থাকবে না, তখন তাঁর মন একেবারে প্রশান্ত হয়ে যায়। তাঁর মধ্যে অনুরাগ জাতীয় কোন দোষ নেই এতেই বোঝা যায় তাঁর আত্মা পরমাত্মস্বরূপ হয়ে গেছে।

এই ধরণের ভাব যাদের মধ্যে এসে যায় তাদের কি হয়? *তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা*, ধীর পুরুষ তখন সর্বব্যাপী ও সর্বগামী সেই পরম বস্তুকে প্রাপ্ত করেন। তার মানে তিনি যে জিনিষটাকে নিয়ে সাধনা করেছেন, যে জিনিষটাকে তিনি ভালোবেসেছেন, সেই জিনিষটাকে একটা জায়গাতেই আর সীমাবদ্ধ দেখেন না। যেমন এই বোতলটা এই স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ঠাকুরের যে মুর্তি তা বেলুড় মঠের মন্দিরে আবদ্ধ তার মানে এই বস্তু বা মুর্তি একদেশীয়, একটা জায়গাতে আবদ্ধ। কিন্তু ধীর পুরুষরা যে জিনিষটাকে নিয়ে চিন্তন করেছেন, সাধনা করে কৃতকৃত্য হয়ে গেছেন তাঁরা সেই জিনিষটাকে এক জায়গাতে আবদ্ধ দেখেন না, সেটাকেই তিনি সর্বব্যাপী রূপে দেখেন, দেখেন সব জায়গাতে তিনিই আছেন। ঠাকুর যখন বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, ঠাকুর এই ঈশ্বর দর্শনের কথাই বলছেন। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ম্যাজিকের মত ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মুর্তি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়ে যাবে। না, এটা কখনই ঈশ্বর দর্শন নয়।

উপনিষদ ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে এই ধরণের উদ্ভট ধারণাকে বার বার আটকে দিচ্ছে। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তিনি দেখবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সেই ঠাকুরই আছেন। যতক্ষণ বেলুড় মঠের মন্দিরের ভেতরেই ঠাকুর বিদ্যমান আছেন দেখছি ততক্ষণ বুঝতে হবে আমাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোথাও গলদ থেকে যাচ্ছে। যদি আমাদের ভেতর থেকে অনুরাগাদির দোষ না গিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। আর আমরা যদি কৃতাত্মা না হই, মনের আনন্দেই যদি না থাকি তাহলেও কিছু একটা গোলমাল আছে। সব শেষে ঈশ্বরকে যদি সর্বব্যাপি না দেখি বা না ভাবতে পারি তাহলে কিছু একটা গোলমাল থেকে যাচ্ছে। উপনিষদের এই কথাগুলোকে কখনই কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এটাই চরম সত্য। কিন্তু উপনিষদকে আধার করে পরের দিকে যেসব শাস্ত্র রচিত হয়েছে, যেমন অষ্টাবক্র-সংহিতা বা যোগবশিষ্ঠ শুদ্ধ অদ্বৈতকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু অধ্যাত্ম জিনিষটাকে যদি ঠিক ঠিক বুঝতে হয়, ঈশ্বর দর্শন বলতে ঠিক কি বোঝায়, তখন আমাদের উপনিষদ থেকেই বুঝতে হবে। কারণ এগুলো হল সহায়ক শাস্ত্র, সহায়ক শাস্ত্র দিয়ে কখনই তত্ত্বকে বোঝা যায় না। তত্ত্বকে বুঝতে হলে মূল গ্রন্থে যেতে হবে। উপনিষদই আমাদের মূল গ্রন্থ।

উপনিষদ পুরো লক্ষণগুলোকে বলে দিচ্ছে। *সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা*, তুমি ঈশ্বরকে কোথায় দেখতে পাবে? তিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাবে। একটা জায়গাতেই তিনি আবদ্ধ নন, তিনি একদেশীয় নন। যে ধর্ম বলে আমার ভগবানই একমাত্র ভগবান আর অন্যরা যারা এই ভগবানকে মানে না তাদের গলা কেটে দিচ্ছে, এদের কোন কথাই উপনিষদের সঙ্গে মিলছে না। আমাদের যত ঋষিরা এসেছেন তাঁরা পরম্পরাতে সবাই এই একই কথা বলে গেছেন। যেখানে পরম্পরা নেই, যে ধর্মে একজনই ঋষি, তিনি যা বলে গেছেন সেটাই সাধারণ মানুষ সত্য বলে মেনে আসছে, কারণ সেই ঋষি ঠিক বলেছেন না ভুল বলেছেন পরীক্ষা করার জন্য পরবর্তি কালে আর কোন ঋষি আসেননি।

যখন কোন ধীর পুরুষ আত্মাকে এইভাবে জেনে যান তখন কি হয়? *যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশন্তি*, তখন তাঁর মৃত্যুও হয়ে গেলে দেখেন ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে গেল। একটা মাটির ঘটের মধ্যে যে স্পেস রয়েছে

সেটাকে বলা হয় আকাশ, ঘটের মধ্যে যে আকাশ রয়েছে তাকেই বলছেন ঘটাকাশ। যদি এই ঘটকে এখন ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে এর ভেতরের আকাশ কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না। ঘটের আকাশ বাইরের আকাশের সাথে এক হয়ে গেল। কিন্তু ঘটাকাশ আর এই আকাশ কখনই আলাদা ছিল না। ঘটাকাশকে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই ঘট দিয়ে, কিন্তু এখন ঘট ভেঙে গেছে। আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, আমাকে সেই পূর্ণব্রহ্ম থেকে পরিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে একটা বিজ্ঞানময় কোষ দিয়ে। বিজ্ঞানময় কোষ যখন এসে যায় তখন এক এক করে মনোময়, প্রাণোময়, অন্নময় সব কোষ এসে এই স্থূল শরীরটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন আমি ভাবছি আমি আলাদা, সে আলাদা, ও আলাদা, সব কিছু আলাদা দেখছি। দশটা ঘটের মধ্যে যে আকাশ আছে সবটাই আলাদা, কিন্তু দশটা ঘটকে ভেঙে দিলে যেমন আকাশ তেমন আকাশ থাকবে। আকাশের কি পরিবর্তন হল? কিছুই পরিবর্তন হয়নি। মাঝখান থেকে যে বাধা ছিল, যে বাধাটা সব কিছু আলাদা করে রেখেছিল, সেই বাধাটা অপসারিত হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় কোষ, যে সূক্ষ্ম শরীর আছে এই সূক্ষ্ম শরীর একটা সীমা দিয়ে সেই পূর্ণব্রহ্মকে বেঁধে রেখেছে। সীমাটা ভেঙে দিলে যেমন ছিল তেমনই থাকবে, নতুন কিছু হয় না। আমি বলব ঘটাকাশ এখন মূলাকাশে চলে গেছে। কোথায় যাবে! চিরদিনতো ওখানেই ছিল, শুধু যে সীমা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল সেটা অপসারিত হয়ে গেছে। অন্য একটা উপমা দিয়ে যদি দেখি। একটা দীপ জ্বলছিল, সেটাকে আমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলাম। ওখানেই ওটা শেষ হয়ে গেল, আর হবে না। কোনটা শেষ হয়ে গেল, এই বিজ্ঞানময় কোষ। ঠিক তেমনি এই ধীর পুরুষের শরীর পতন হয়ে গেলে তিনি সেই ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান। ভগবান বুদ্ধ যখন দেহত্যাগ করলেন তখন তিনি একেবার পূর্ণ ভাবে এক হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেহত্যাগ করলেন এটাই হল, ঘটাকাশ সেই মহাকাশে মিলে গেল।

কিন্তু যারা ধীর পুরুষ নয়, তাদের কি হবে? সাধারণ মানুষ যখন মারা যাচ্ছে তখন তার এই স্থূল শরীরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভেতরে সেই সূক্ষ্ম শরীরটা তো থেকে যাচ্ছে। ওই সূক্ষ্ম শরীর আরেকটা স্থূল শরীর নিয়ে নেবে। এখানে দেহের পতন হচ্ছে, ঘটাকাশের পতন হচ্ছে না। এই ঘটকে যদি আমি আরেকটা বড় ঘটের মধ্যে রেখে দিই। আমাকে বলে দেওয়া হল এর ভেতরে যে ঘটটি আছে এটি খুব দামী, এটাকে আরেকটা ঘটের মধ্যে রেখে দেবে। আমি সেই দামী ঘটটিকে আরেকটা বড় ঘট দিয়ে ঘিরে দিলাম। এই উপরের ঘট যদি ভেঙে যায় তখন আরেকটা পাত্রের মধ্য ছোট ঘটটাকে ঢুকিয়ে রাখব। যতক্ষণ ওই ছোট দামী ঘটটা না ভেঙে যাচ্ছে ততক্ষণ এর আবরণ রূপ বড় ঘট আসতেই থাকবে। এই ছোট ঘট ভাঙবে কখন? যখন আমার জ্ঞান হয়ে যাবে, আমি সেই মহাকাশ। জ্ঞান হলে এই বিজ্ঞানময় কোষ নাশ হয়ে যায়।

এখানে দুটো শর্তের কথা বলছেন। প্রথম বলছেন যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি যে চোখ বন্ধ করলে বা সমাধিস্থ হয়ে গেলেই ঈশ্বরকে দেখেন তা নয়। চোখ খুলে থাকলে দেখেন এই জগৎ ঈশ্বর বৈ কিছু নয়। চোখ বন্ধ করলেও দেখেন ঈশ্বরই আছেন। ঠাকুর বলছেন চোখ বন্ধ করলেই ঈশ্বর আছেন আর চোখ খুললেই কি ঈশ্বর নেই! তখন এই যুক্তাত্মারা পূর্ণ ভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে যান। এখন যিনি নিজের জীবদ্দশায় ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই দেখছেন না, আমরা যেমন জীবিত কালে শরীর ছাড়া কিছু দেখছি না, তখন মৃত্যুর সময় দেখছি আমার শরীরটা নাশ হয়ে গেল, তেমনি জীবদ্দশায় যারা ব্রহ্ম ছাড়া কিছু দেখছেন না তাঁরাও কি তাহলে মৃত্যুর সময় দেখেন ব্রহ্মটা চলে গেল? না, তা হয় না। মৃত্যুর সময় তাঁরা চিরদিনের মত ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। এর জন্য তাঁর যে কোন আলাদা অনুভূতি হচ্ছে তা নয়, কারণ জীবদ্দশায় যখন দেখছেন ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই তখন এনাদের কাছে জীবন-মৃত্যু বলে আলাদা কিছু থাকে না। এর আগের মন্ত্রে যেমন বললেন কিভাবে ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, *সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ*, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে বা জেনে তিনি জ্ঞানতৃপ্ত হয়ে যান, অন্য কোন বস্তু থেকে তিনি তৃপ্ত হন না। শুধু মাত্র আত্মজ্ঞানেই এনারা তৃপ্ত হয়ে যান। তখন তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন, তাঁর আর অন্য কোন কিছু থেকে আনন্দিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। গীতায় ভগবান বলছেন – *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*। এরপর যে কোন বস্তুর প্রাপ্তি তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হবে। *বীতরাগাঃ*, ঋষিদের কাম, ক্রোধ, লোভাদি কিছুই থাকে না, আর সব সময় প্রশান্ত, কোন কিছুই তাঁকে আর উদ্বেলিত

করতে পারে না। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়? যখন কোন ভালো খবর আসে তখন আনন্দে বেলুনের মত ফুলে উপরে উঠে গেলাম, যেমনি কোন খারাপ খবর এসে গেল অমনি বেলুনের সব হাওয়া বেরিয়ে চুপসে নীচে পড়ে গেলাম। সারা জীবন ধরে আমরা একবার উপরে উঠছি একবার নীচে নামছি। কিন্তু যখন জেনে গেলেন আমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম তখন তিনি প্রশান্ত হয়ে যান, তিনি আর উপরেও যাবেন না, নীচেও আসবেন না।

একই ভাবকে আবার পরের মন্ত্রে ব্যাখ্যা করছেন কিন্তু অন্য ভাবে বলা হচ্ছে। এই মন্ত্রের মূল কথা হল, ব্রহ্মকে যাঁরা জানেন তাঁদের কয়েকটি লক্ষণ আছে। তিনি দেখেন ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, আর ব্রহ্মকে একদেশে পরিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখেন না, সর্বব্যাপী সর্বত্র ব্রহ্মকেই দেখেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। ফলে তাঁর নিজের চারিত্রিকগত একটা বিরাট পরিবর্তন হয়। আমরা এত মন্দিরে যাচ্ছি, ভজনাদি করছি কিন্তু আমাদের চরিত্র তো পাল্টাচ্ছে না। এত খ্রীশ্চানরা চার্চে যাচ্ছে, মুসলমানরা দিনে পাঁচবার করে নমাজ পড়ছে কিন্তু কারুরই তো চরিত্রের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। চরিত্র কিভাবে পাল্টাবে এখানে বলা হয়েছে, *কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ*, তোমার মনে আর কোন উদ্বেগ আসবে না, তোমার কখন কোন ভাবের পরিবর্তন হবে না, শরীরে ও মনে কোন চাঞ্চল্যের ভাব থাকবে না। তার সাথে সাতে আরও কি হবে এর পরের মন্ত্রে বলছেন –

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে।।৩/২/৬।।

(বেদান্ত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁদের নিকট সুনিশ্চিত হয়েছেন, সন্ন্যাস অবলম্বনে যে যোগী শুদ্ধচিত্ত হয়েছেন – এঁরা সকলে (জীবদ্দশাতেই) পরমাত্মার সাথে একীভূত হয়ে চরম দেহত্যাগের কালে সর্বত্র নির্বাণপ্রাপ্ত হন।)

একই ভাব কিন্তু অন্য ভাবে বলা হচ্ছে। যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল *বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ*, আমরা মনে করি গুরুর কাছে দীক্ষামন্ত্র নিয়ে জপ করে গেলেই সব বুঝে যাব। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এভাবে হবে না। বেদান্ত আমাকে জানতে হবে, বেদান্ত না জানলে হবে না। বেদান্তের তত্ত্বকে জানলে ভেতরে একটা বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরী হয়ে যায়। বেদান্তের কথা ও ভাব ভেতরে যত ঢুকতে থাকবে ততই তার ভেতরে ও বাইরের আচরণে অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হবে। বেদান্তের ভাব ভেতরে গিয়ে যে একটা বিশেষ ধারণা তৈরী হচ্ছে এটাকে বলছেন বিজ্ঞান। সেইজন্য বলছেন বেদান্তবিজ্ঞান। যে জিনিষটাকে জানার ফলে তার সম্বন্ধিত যে জ্ঞান আসে সেটাকে বলা হয় ওই জিনিষের জ্ঞান। যেমন সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান তেমনি বেদান্ত বিজ্ঞান। ওই বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করতে করতে মনের মধ্যে নতুন কিছু ধারণা তৈরী হয়, সেই ধারণাগুলো ধীরে ধীরে একটা রূপ নিতে থাকে, এটাকেই বলছেন ওই বিষয়ক জ্ঞান। তেমনি একে বলছেন বেদান্ত বিজ্ঞান। বেদান্ত বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি হল যখন এই বিজ্ঞান একটা বিশেষ অর্থের দিকে নিয়ে যায়। যিনি পদার্থ বিজ্ঞানী, তিনি যখন দশম শ্রেণীতে পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছিলেন, তারপর দ্বাদশ ক্লাশে গেলেন, কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হলেন, তারপর এমএসসি পাশ করে পিএইচডি করলেন আর সারা জীবন পদার্থ বিজ্ঞান নিয়েই চর্চা করে আসছেন। তার ফলে পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান তাঁর ধীরে ধীরে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞানের থেকেও বেশী হবে পদার্থ জ্ঞান। পদার্থ যদি বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ পদার্থ জ্ঞান যে একত্বে নিয়ে যাবে, সেই একত্বের কথা বলতে স্বামীজী বলছেন পদার্থ বিজ্ঞানে যেদিন সেই শক্তি আবিষ্কৃত হবে, সেই একটি শক্তি বাকি যত শক্তি জগতে আছে সেটা তারই রূপ, সেদিন পদার্থ বিজ্ঞান সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই হবে, যেদিন সেই কেমিক্যালটা জানা হয়ে যাবে যে কেমিক্যাল থেকে সব কিছুর জন্ম হচ্ছে সেদিন কেমিক্যাল বিজ্ঞানের খেলাও শেষ হয়ে যাবে। যখন এই একত্বে নিয়ে চলে যাবে সেটাই তখন হয়ে যাবে বিজ্ঞান আর বাকিটা জ্ঞান হয়ে থাকল, তার মানে জ্ঞান ছড়িয়ে আছে। যখন আমরা বেদান্ত পড়ছি তখন এই বেদান্তও কিন্তু জ্ঞান রূপেই ছড়িয়ে

আছে। এই বেদান্তই যখন আস্তে আস্তে একত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাই তখন হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান। ওই একত্বের দিকে যখন যাচ্ছে তখন সেখানে অনেক গুলো সম্ভবনা থাকছে। আমি যখন বলছি ব্রহ্মই বস্তু বাকি সব অবস্তু এটা যেমন একটা বিজ্ঞান আবার দ্বৈতবাদীরা যখন বলছে আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদা, এটাও একটা বিজ্ঞান, কিংবা রামানুজ বলছেন ঈশ্বর আর আমার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, এটাও বিজ্ঞান।

কিন্তু এখানে তা বলছেন না। *সুনিশ্চিতার্থাঃ*, এটাই ঠিক। বেদান্তজ্ঞান প্রথমে ছড়িয়ে দিয়ে পুরো বেদান্ত আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে, এতগুলো উপনিষদ জানিয়ে দিচ্ছে, এতগুলো বেদ জানিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে গুটিয়ে এবার একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। সেই একটা জায়গায় যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন মনে হতে পারে এটা একটা সত্য, ওটা একটা সত্য, আর এটাও সত্য হতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানেও তাই হয়, শেষের দিকে যখন থিয়োরি গুলো যেতে থাকে তখন শেষ পর্যন্ত কয়েকটা থিয়োরি গিয়ে দাঁড়ায়। যেমন স্ট্রিং থিয়োরি দাঁড়াচ্ছে, কোয়ান্টাম থিয়োরি দাঁড়াচ্ছে, পরে হয়তো আবার আরও অনেক থিয়োর আসবে। এর মধ্যে কোনটা ঠিক? যে তত্ত্বটা একেবারেই ঠিক ঠিক সেটাকেই বলছেন *সুনিশ্চিতার্থাঃ*, সুনিশ্চিত কর তার অর্থ জেনে নেওয়া, অর্থ মানে এটাই তার বিষয়বস্তু।

বেদান্তের যে বিজ্ঞান সেটা একটা জায়গায় সুনিশ্চিত করে নিয়ে আসছে, নিশ্চিত করে নয় একেবারে সুনিশ্চিত করে নিয়ে আসছে আর এটাই তার বিষয়বস্তু, মানে এটাই তার অর্থ, এটাকেই বলছেন *বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ*। বেদান্ত ঠিক কি বলছে এটাকে যতক্ষণ ভেতর থেকে না বুঝে নিচ্ছে ততক্ষণ সে এগোতে পারবে না। আর যদি বলি গুরু বলে দিয়েছেন ঠাকুরই সত্য, তাই আমার আর বেদান্ত পড়া বা জানার দরকার নেই। তাহলে কি হবে? টিয়া পাখিকে যখন বেড়ালে ধরবে তখন আর রাম রাম বেরোবে না, ট্যাঁ ট্যাঁই বেরোবে। এই *বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ* যদি না হয় তাহলে যখন রোগ-শোক ধরবে, মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়াবে তখন আর হরি হরি মুখ দিয়ে না বেরিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজই বেরোবে। এত লোক দীক্ষা নিচ্ছে, এত লোক মন্দিরে আসছে, সাধুসঙ্গ করছে তাও তাদের জীবনে এত অশান্তি কেন? কারণটা এখানে, *বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ* হয়নি, বেদান্তবিজ্ঞানে তাদের মন এখনও বসেনি। ফলে কি হচ্ছে? যেমনি বেড়ালে ধরছে তখনই ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। কিন্তু বেদান্তবিজ্ঞানের মধ্যে যখন মনটা পুরো বসে গেল তখন আর কোন কিছুই তাকে টলাতে পারবে না।

বেলুড় মঠে একজন খুব প্রাচীন মহারাজ আছেন, তাঁর বয়স এখন একশ বছর। মঠের অনেক সন্ন্যাসীকেই তিনি অল্প বয়স থেকেই দেখেছেন। ওনার স্মৃতি শক্তি এখনও পুরোপুরি সতেজ। কোন সন্ন্যাসী যদি তাঁর সাথে দেখা করতে যান, গিয়ে হয়ত জিজ্ঞেস করলেন 'কি মহারাজ! কেমন আছেন'? সাথে সাথে তিনিও খুব সপ্রতিভ ভাবে বলবেন 'আরে তুমি কেমন আছ বল'। 'ভালোই আছি মহারাজ'। এই কথা শোনার পরেই মহারাজ চেঁচিয়ে উঠে বলতে থাকবেন 'কিচ্ছু ভালো নেই তুমি, সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বর দর্শনের জন্য এখন পর্যন্ত কি এমন বিশেষ চেষ্টা করছ, না করছ সেই রকম জপ, না করছ গভীর ধ্যান'। প্রথমেই একটা জোর ধাক্কা দিয়ে তারপর কাছে ডেকে পনের কুড়ি মিনিট বসিয়ে সেই সন্ন্যাসীকে শুধু সাধু জীবন, অধ্যাত্ম জীবন ও তার অনুশীলন এই নিয়েই আলোচনা করতে থাকবেন। এটাই দেখার, একশ বছর বয়স, বিছানা থেকে উঠতেও পারেন না। কিছু প্রয়োজন হলে তাঁকে বেল বাজিয়ে সেবকের সাহায্য নিতে হচ্ছে কিন্তু তাঁর চেতনা সর্বদা সজাগ। সব সময়ই হাসছেন, এই হাসিটাও ভেতর থেকে দিব্য আনন্দের স্ফুরন। তিনি বলেন 'রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুর শুধু সুবিধাই সুবিধা, খাওয়া-পড়ার কোন কষ্ট নেই, রোগ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, এত ভালো ভালো সাধুদের সঙ্গ হচ্ছে। ঠাকুর বলেছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, তা দু-চার টাকা সব সাধুদের কাছেই থাকে সেটা এমন কিছু নয় আর কামিনী ত্যাগ তো হয়েই আছে, কারুরই তো স্ত্রী-সন্তানাদি নেই। কিন্তু তাও তো অনেকেরই এমন কিছু হচ্ছে না। এদিকে আমরা মনে করছি মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে হাত ধরে আমাকে নিয়ে যাবেন। তবে কি জানো, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তো মুক্তি নয়, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য জীবনমুক্তি'। আপনি যদি মনে করে থাকেন মৃত্যর পর মুক্ত হয়ে যাব, মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে হাত ধরে

নিয়ে যাবেন, তাহলে আপনার সাথে অন্য ধর্মের তফাৎ কোথায় রইল! হিন্দু ধর্মে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনমুক্তি – *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, যা পাওয়ার এইখানেই এই শরীরেই পেতে হবে। এই মন্ত্রের আগের মন্ত্রে যে বলছেন *বীতরাগাঃ*, আপনি মুক্ত এখানেই হবেন আর যখন শরীর চলে যাবে তখন দেহমুক্তি হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর মুক্তির কথা ভাবা মানে ঈশ্বর এসে দেখা দেবেন, হিন্দুধর্মে এই ধরণের ভাবনা-চিন্তাকে কোন ভাবেই উৎসাহিত করা হয় না। রাধু ছিল মায়ের সঙ্গী। রাধুর যখন মরার সময় হয়েছে তখন তাকে একজন বলছে চল তোমাকে কাশীতে নিয়ে যাই। রাধু বলছেন আমি তো মায়ের সঙ্গিনী যোগমায়া আমার কাশী লাগবে না। শেষ দিনেও রাধুর মায়ের কথা মনে আছে। সব কিছুই যদি লীলা বলে মেনে নিই তাহলে তো কোন কিছুর আলোচনার করার প্রয়োজনই থাকবে না। আমাদের পরিষ্কার দেখতে হবে শাস্ত্র মতের সঙ্গে মিলছে কিনা। শাস্ত্র মতে মৃত্যুর সময় মায়ের দর্শন হচ্ছে, ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে এগুলো কোন মূল্যই নেই। এগুলো মন্দের ভালো ছাড়া আর কিছু না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনমুক্তি, আর যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। ঠাকুর তাই বার বার বলছেন অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার কর। মানে, আগে জীবনমুক্ত হও। জীবনমুক্তির ধারণা হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে নেই, হিন্দু ধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই হিন্দু ধর্মে অন্য সমস্ত ধর্ম থেকে আলাদা করে দেয়।

একশ বছরের সন্ন্যাসী, হাত পা নাড়তে পারছেন না, বিছানায় পরে আছেন তাও তিনি পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে জোরের সাথে বলছেন – আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি নয়, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য জীবনমুক্তি। এটাই *বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ*। সারা জীবন ব্যাপী বেদান্ত বেদান্ত করে বেদান্তের অর্থটা সুনিশ্চিৎ হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে কোথাও এতটুকু ডানদিক বামদিক নেই। তোমার শরীর কেমন আছে, আমার শরীর কেমন আছে, কেমন খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, কেমন ঘোরাঘুরি হচ্ছে কোন দিকে দৃষ্টি নেই। মহারাজকে কোন দিন বলতে শুনিনি আমার ঘাড়টা আজকে ব্যাথা হয়েছে, কোমরটা যন্ত্রণা করছে, হজম হচ্ছে না ইত্যাদি, শুধু ঠাকুর, মা, স্বামীজী আর জীবনমুক্তি এর বাইরে কোন প্রসঙ্গ নেই। একেই বলে *বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ*, এটাই সত্য এর বাইরে কিছু হতে পারে না, এই ভাবটা একেবারে ভেতরে ঢুকে বসে গেছে।

এঁদের কি হয়? *সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ*, প্রথমে এনারা বেদান্তের অর্থটা ঠিক ঠিক বুঝে গেছেন, এরপর দ্বিতীয় ধাপ হল *সন্ন্যাসযোগাদ্*, মানে পূর্ণ ত্যাগ। পূর্ণ ত্যাগের ব্যাপারে উপনিষদের কোন ধরণের আপোষ নেই। এই কারণে মুণ্ডকোপনিষদ গৃহস্থদের শুনতে দেওয়া হত না। তাদের জন্য শুধু ভক্তির কথা বলা হত, তুমি ঈশ্বরকে শুধু ভক্তি করে যাও, হরি নাম করে যাও। এই ধরণের উপনিষদ হল মুষ্টিমাত্র কয়েকজন বাছাই করা মানুষের জন্য। আধ্যাত্মিকতা কখন সর্বসাধারণের জন্য হয় না। ধর্মই একমাত্র সর্বসাধারণের জন্য। স্বামীজী বলছেন খুলে দাও সব দরজা জানালা, বনের বেদান্তকে শহরে নিয়ে আসতে হবে। বনের বেদান্তকে না হয় পরে নিয়ে আসা যাবে, তার আগে যিনি এই কথা বলছেন তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলীটা ভালো করে পড়ে আত্মস্থ করুন, কজন স্বামীজীর সম্পূর্ণ রচনাবলী পড়েছেন! এত উচ্চ তত্ত্ব নেওয়ার দম আমাদের নেই, জোর করে বেশী চেষ্টা করলে মাথা ফেটে যাবে।

কেন মাথা ফেটে বেরিয়ে যাবে? প্রথমেই বলছেন *বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ*, বেদান্ত জ্ঞানে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হও, দ্বিতীয় পূর্ণ ত্যাগ, শুধু মনে ত্যাগ নয়, মনে ত্যাগ আর বাইরে ত্যাগ দুটো। পূর্ণ ত্যাগ, মানে মনে ও বাইরে, একটা ছুঁচের প্রতিও আসক্তি থাকলে হবে না। যদি আপনার সাথে আমার আগামীকাল বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তারপর আপনার জীবনের একটা দুঃখের কথা আমাকে শোনালেন, এবার আমার মন ওখানে জড়িয়ে যাবে, কিছু করার থাকবে না। ঠাকুরের জীবনে দেখুন, দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি একের পর এক সাধন করে যাচ্ছেন তখন তাঁর কোথায় মা, কোথায় দাদা, কোথায় স্ত্রী, সব উড়ে গেছে। নরেন খড়ের গাদার ভেতর দিয়ে, এর ওর উঠোনের ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্ব শ্বাসে দৌড়াচ্ছেন, কোন দিকে হুঁশ নেই। তাঁর মা, ভাই-বোনেরা না খেয়ে রয়েছে, এক বোন পরে আত্মহত্যা করছে কিন্তু তাঁর কোন উদ্বেলতা নেই। এগুলোই প্রকৃত সন্ন্যাসের চিহ্ন, জগতের সব কিছু উড়ে বেরিয়ে যাবে। এখানে সন্ন্যাসযোগ বলতে আচার্য বলছেন *সর্বকর্মপরিত্যাগ...*

ব্রহ্মনিষ্ঠাস্বরূপাদ্‌যোগাৎ, সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ হয়ে তাঁর মন সব সময় ব্রহ্মনিষ্ঠাতে স্থির হয়ে থাকে। ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন দিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়বে না।

ব্রহ্মনিষ্ঠাতে স্থির হয়ে গেলে তিনি *শুদ্ধসত্ত্বাঃ* হয়ে যান, সাত্ত্বিক হয়ে যান। বেদান্ত বিজ্ঞানে সুনিশ্চিত, সন্ন্যাসে প্রতিষ্ঠিত আর সর্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠাতে অবস্থিত, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন দিকেই তাঁর মন নেই, এই তিনটেতে যখন অবিচল হয়ে গেলেন তখন তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়ে পরম অমৃতঃ হয়ে যান। অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেও তিনি পরম অমৃত হয়ে যান আর মৃত্যুর পরেও তিনি পরম অমৃত হয়ে যান। মানে, মৃত্যুধর্ম তাঁকে ত্যাগ করে দিয়েছে, ফলে তিনি অমর হয়ে যান। যেমন দীপ নির্বাণ হলে বা ঘট ভেঙে গেলে সব দিক থেকে মুক্তি হয়ে যায় ঠিক তেমনি তাঁরও সব দিক থেকে মুক্তি হয়ে যায়।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে, এখানে এই পরান্তকাল শব্দটির অর্থ খুব তাৎপর্পূর্ণ। পরান্তকালের বিপরীত শব্দ অপরান্তকাল। অপারন্তকাল মানে যখন দেহত্যাগ হয় তখন ওই দেহের যদিও মুক্তি হয়ে গেল কিন্তু আবার সেই সময়ে যদি ফিরে আসে কিংবা একটা শরীরের মধ্যে ফিরে আসছে এটাকে বলছেন অপরান্তকাল। আর যার মহামুক্তি হয়ে যাচ্ছে যার আর কোন আসা যাওয়া নেই, একে বলছেন পরান্তকাল। বলছেন *তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে*, তাঁর মহামুক্তি হয়ে গেলে, আর কোন টাইম লিমিট নেই, কোন স্পেস লিমিট নেই। মুক্তি অনেক রকমের হয়। যেমন যোনি মুক্তি। একটা কুকুর মারা যাওয়ার পর কুকুর যোনি থেকে সরে অন্য একটা যোনিতে চলে গেল, এটাকে বলা হয় যোনি মুক্তি। দেহ মুক্তি, মৃত্যুর সময় এই দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। এই ধরণের নানা রকমের যে মুক্তির কথা বলা আছে এখানে এই ধরণের কোন মুক্তির কথা বলা হচ্ছে না। এটা হল মহামুক্তি, *পরান্তকালে*, মানে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে যাওয়া। যাঁরা মুমুক্ষু তাঁদের এই সংসারের নিবৃত্তি হয়ে যায়, সেইজন্য বলছেন *পরান্তকাল*।

কিন্তু যেহেতু এখানে আবার বলছেন *ব্রহ্মলোকেষু*, সেইহেতু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, কারণ *ব্রহ্মলোকেষু* এখানে বহুবচন অর্থে বলা হচ্ছে। যেমন স্বর্গলোক অনেক আছে, এখানে ব্রহ্মলোকও অনেক আছে বলছেন। আচার্য বলছেন – মুমুক্ষু অনেকই হয়, মুক্তিও অনেকের হয়, এটাকে স্তুতি করার জন্য ব্রহ্মলোককে বহুবচনে বলা হয়েছে। সংস্কৃতে আছে – *আদরণার্থে বহুবচন*, কাউকে সম্মান দিতে হলে বহুবচনে বলতে হয়। আমাদের এখানে প্রথাই আছে যখন বলা হয়, এনারা কি যাবেন, এটা হল বহুবচন, আর সম্মান যখন দেওয়া হয় তখন বলা হয় আপনারা কি যাবেন, এটাও বহুবচন। আবার যখন বলা হয় তুমি কি যাবে, এটা তখন একবচন হয়ে গেল। যেখানেই সম্মান সেখানেই বহুবচন হয়, ব্রহ্মলোককে সম্মানার্থে বলা হয়। অনেকেই মুক্তি পেয়ে ব্রহ্মলোকে যান, আর ওখানে এক হয়ে যান। সেইজন্য বহুবচন হয়ে গেল।

আচার্য এখানে অন্য জায়গা থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, পাখি যখন আকাশ পথে উড়ে যায় তখন আকাশে পাখীর কোন চিহ্ন থাকে না, আর মাছ যখন জলের মধ্যে বিচরণ করে তখন জলে মাছের কোন দাগ থেকে যায় না। ঠিক তেমনি যাঁরা জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মাতে গমনেচ্ছু তাঁরা কোন পথকে অবলম্বন করে গমন করেন না। মাটির উপর দিয়ে যারা চলাফেরা করে মাটিতে তাদের পদচিহ্ন থেকে যায়, আকাশ আর জল দিয়ে গেলে চিহ্ন থাকবে না, ঠিক তেমনি জ্ঞানীদেরও কোন চিহ্ন থাকে না। আমি বেলুড় থেকে বর্দ্ধমান যাচ্ছি, এই যাত্রাপথে আমার পদচিহ্ন থেকে যাবে। আমার যদি মোবাইল থাকে তাহলে পুলিশ চাইলে টাওয়ার ট্র্যাকিং করে আমার অবস্থানকে বার করে নেবে। এখন একটা নতুন শব্দ এসেছে ফিনান্সিয়াল ইন্টালজেন্স, মানুষের হাতে যখন অনেক বেনামী টাকা হাতে এসে যায় তখন সে এই ব্যাঙ্ক থেকে সেই ব্যাঙ্ক টাকা সরাতে থাকে। কিন্তু আপনি যেখানেই টাকা রাখুন কিন্তু এরা আপনার টাকার পুরো ট্র্যাকিং করতে থাকে। আমি যখন মারা যাব তখন মৃত্যুর পর আমি এই স্বর্গে যাব, সেখান থেকে আবার একটা শরীর ধারণ করব, সেই শরীর থেকে আবার কিছু কর্ম হব, সেই কর্ম করে আবার একটা লোকে যাব, এইভাবে আমাকে পুরো ট্র্যাকিং করা যাবে।

জ্ঞানীর কোন ট্র্যাকিং হয় না। কারণ তাঁর আর কোন শরীর থেকে যায় না, কোন কর্মও থেকে যায় না। সেইজন্য এটাকে বলছেন পরান্তকাল।

যখন সাধক সাধ্যের সাধনা করছে, সাধ্য মানে যে জিনিষটার সাধনা করা হচ্ছে, সেই সাধনা পরিচ্ছিন্ন সাধন, তাই তার গতি যেটা হবে সেটাও পরিচ্ছিন্ন হবে। বাংলায় যেমন প্রবাদ আছে যেমন চিনি ঢালবেন তেমন মিষ্টি হবে। একটা জিনিষের জন্য যখন আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, সেটাতো পরিচ্ছিন্ন, তখন তার ফলটাও পরিচ্ছিন্ন হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না, কারণ সেখানে কোন কিছু জোগাড় যন্ত্র করে কিছু করা হচ্ছে না। একজন বাড়ি করছেন, এখন উনি যেমন টাকা-পয়সা খরচা করতে পারবেন তার বাড়িও তেমন হবে, যখন যজ্ঞ-যাগ করছে তখন যেমন যজ্ঞ-যাগ করবে তার তেমন স্বর্গলোক প্রাপ্তি হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এসব কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না, কোন পরিচ্ছিন্ন দেশ, কোন পরিচ্ছিন্ন কাল এগুলো তখন থাকে না। সেইজন্য জ্ঞানের যে ফল সেটাও অপরিচ্ছিন্ন হয়।

ব্রহ্ম যদি দেশ পরিচ্ছিন্ন হতেন, দেশ পরিচ্ছিন্ন মানে আমরা যেমন ঈশ্বরকে কল্পনা করি মাকালীর রূপ একটা শরীরে, এই রকম একটা শরীর যদি ব্রহ্মের হত তাহলে ব্রহ্ম মুর্ত দ্রব্যের মত আদি অন্তবান হয়ে যাবেন। তার মানে ব্রহ্ম দেশ কালের সীমার বাইরে। যদি দেশ ও কালের সীমার মধ্যে ব্রহ্ম থাকেন তাহলে যে কোন মুর্ত দ্রব্যের মতই ব্রহ্ম হয়ে যাবেন, আদি অন্তবান, অন্যাশ্রিত মানে পরের উপর আশ্রয় নিয়ে থাকবেন, *সাবয়বম্* ব্রহ্মের অবয়ব থাকবে, অবয়ব থাকলে অঙ্গ থাকবে, অনিত্য হবেন আর কৃত্রিম হয়ে যাবেন। কিন্তু শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ যা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সব কিছু এর বিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে ব্রহ্মের মধ্যে এই জিনিষগুলো নেই। সেইজন্য তার এমন কোন সাধন হবে না যেটা দেশ কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

যাঁরা ব্রহ্মবেত্তা তাঁরা অবিদ্যা সংসার বন্ধনের নিবৃত্তি চাইছেন, কোন পদার্থকে তাঁরা চান না। উপনিষদ যে মুক্তির কথা বলছে তা জগতের অন্যান্য যাবতীয় যা কিছু আছে তার সব কিছুর থেকে আলাদা। আমরা আমাদের জীবনের জন্য যা কিছু চাইছি সবই পদার্থ, কর্মকাণ্ডীরা বা মুসলমানরা বা খ্রীশ্চানরা যখন মৃত্যুর পরে যে স্বর্গে যেতে চাইছে সেই স্বর্গটাও পদার্থ। একমাত্র বেদান্তই বলছে আমার মুক্তি চাই। মুক্তির ইচ্ছাটা তাহলে কি? ঠাকুর বলছেন মুক্তি কামনা বা ভক্তি কামনা এটা কামনার মধ্যে নয়। এই ইচ্ছাটা ইচ্ছার মধ্যে নয় কেন বলছেন? কারণ এই ইচ্ছা পদার্থের জন্য ইচ্ছা নয়। আমার অবিদ্যা আমাকে আদর করে জড়িয়ে রেখেছে, কিন্তু আমি কিছু পেতে চাইছি না, আমি ছাড়তে চাইছি। এই জগতে যে কোন জিনিষের ইচ্ছা করা মানে একটা জিনিষকে পাওয়া। মুক্তির ইচ্ছাটা তাহলে কি? মুক্তির ইচ্ছাটা কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা নয়, ছাড়ার ইচ্ছা। কি ছাড়ার ইচ্ছা? অবিদ্যাকে ছাড়ার ইচ্ছা। খ্রীশ্চানদের ফাদার আর রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসী, এই দুজনকে আমাদের মনে হবে এক, কারণ দুজনেই আধ্যাত্মিক পথের পথিক। খ্রীশ্চান ফাদাররাও বিয়ে করেন না, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরাও বিয়ে করে না, তাঁরাও চার্চের জন্য আছেন, সন্ন্যাসীরাও চার্চের জন্য আছেন, তাঁরাও লোককল্যাণ করছেন, এনারাও লোককল্যাণ করছেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ আছে। খ্রীশ্চান ফাদাররা শপথ নেন আমি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত থাকব, আমি কোন নারীসঙ্গ করব না, কোন জিনিষপত্র রাখব না, আর চার্চের প্রতি আমার আনুগত্য থাকবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরাও তো তাই করছে। কিন্তু একটা জায়গায় দুজনের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। এনারা বলছেন আমি দিব্যি খেলাম আমি পবিত্র থাকব। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনে তা হয় না, বা যে কোন হিন্দু সন্ন্যাসী সেটা করেন না। হিন্দু সন্ন্যাসীরা সব সময় ত্যাগ করেন, ওরা গ্রহণ করছে। যেমন খ্রীশ্চান ফাদাররা বলছেন আমি ঘর-বাড়ি ছাড়লাম চার্চকে ধরলাম, টাকা-পয়সা ছাড়লাম অভাবকে ধারণ করলাম। হিন্দু সন্ন্যাসী কখনই সেটা করবেন না। হিন্দু সন্ন্যাসী সব সময় বলে আমি ত্যাগ করলাম। হিন্দু সন্ন্যাসী এই দিব্যি করেন না যে আমি মুণ্ডিত মস্তক থাকব, তাঁরা বলেন আমি কেশৈষণা ত্যাগ করলাম, মানে চুলের প্রতি ভালোবাসাকে ত্যাগ করলাম। হিন্দু সন্ন্যাসী কখন দিব্যি খেয়ে বলে না আমি বিয়ে করব না, তাঁরা বলেন আমি দারৈষণা ত্যাগ করলাম, নারীসঙ্গের ইচ্ছাকে ত্যাগ করলাম, পুত্রৈষণা, আমার সন্তান চাই এই ইচ্ছাকে ত্যাগ করলাম, নিজের সন্তান যে হবে না তাও না, অপরের

সন্তানকে নিয়ে যে আদর করব তাও হবে না। সন্ন্যাসীদের যে বিরজাহোম হয় সেখানে তাঁরা কক্ষণ কোন পণ করেন না। তাঁরা সমস্ত এষণাকে ত্যাগ করে দেন, কোন এষণাই থাকবে না।

হিন্দু সন্ন্যাসীদের এই রকম হাজার রকমের এষণা ত্যাগ করতে হয়। এটাই অবিদ্যার নিবৃত্তি। এখানে কোন জিনিষকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে না। আমার গলায় একটা সাপ জড়িয়ে আছে, এখন আমি যদি বলি আমি সাপ থেকে মুক্তি পেতে চাইছি। এখানে কি আমি কিছু পেতে চাইছি, না সরাতে চাইছি? ঠিক তেমনি অবিদ্যা সর্প আমাদের পেঁচিয়ে রেখেছে, আমি এখন চেষ্টা করছি এটা এখন আমার কাছ থেকে চলে যাক, এই চেষ্টার মধ্যে পাওয়া-পাওয়ির কিছু নেই। অন্য সব কিছুতে পাওয়ার ব্যাপার থাকে, কিন্তু মুক্তি কোন কিছু পাওয়ার মধ্যে পড়ছে না। মুক্তি কামনাই হল ত্যাগকেন্দ্রিত। মুক্তি কামনা বাদে যত যা কামনা আছে সব পাওয়ার ইচ্ছা। সেইজন্য ঠাকুর যে বলছেন ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়, আসলে ভক্তি মুক্তি তো আলাদা কিছু নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়, তেমনি মুক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। এখানে পাওয়ার কিছু নেই। এই যে ব্রহ্মলোকাদির কথা আসছে এটা যে আমরা পেতে চাইছি তা নয়। একটা বিষ জমে আছে এটাকে কোন উপায়ে বার করতে চাইছেন। যে কোন অন্য ধর্মের সাথে উপনিষদের এটি একটি বিরাট তফাৎ।

মুসলমানরা স্বর্গ পেতে চায়। কিন্তু উপনিষদের ঋষি তিনি বলছেন – আরে ভাই একটা অবিদ্যার সর্প আমার গলায় পেঁচিয়ে রয়েছে, এটাকে আমি কোন ভাবে তাড়াতে চাইছি। আমার পাওয়া-পাওয়ির কিছু নেই আমি এমনি দিব্যি আনন্দে আছি। কারণ আমি পূর্ণব্রহ্ম কিন্তু অবিদ্যা আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি এটাকে তাড়াতে চাইছি। যখন অবিদ্যা সরে যাচ্ছে তখন তিনি বলতে পারেন – বাবাঃ! আমি শান্তি পেলাম। আরে বাবা, তিনি তো শান্তিতেই ছিলেন, অবিদ্যাটা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল বলে অন্য রকম মনে হচ্ছিল। আর অবিদ্যা মানে, বাস্তবিক কোন কিছু যে তাঁকে ঘিরে রেখেছিল তা তো নয়। এটা মায়া, যার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই।

জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞানীর আচরণ কি রকম হবে এর উপর আমরা আগে আলোচনা করেছি, যেখানে বলা হয়েছিল, তিনি *বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ* হয়ে যাচ্ছেন। যখন তাঁর মৃত্যু আসে তখন যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে মিলে যায় ঠিক তেমনি তাঁদের সুক্ষ্ম শরীরটা ভেঙে গিয়ে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যান। পরমব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয়ে কিভাবে একটা ব্যক্তি রূপ ধারণ করে সেখান থেকে আবার কিভাবে সেই ব্যক্তি পরমব্রহ্মে ফেরত যাচ্ছে তারই বর্ণনা পরের মন্ত্রে করা হচ্ছে। যে জিনিষটা তাকে সমষ্টি থেকে ব্যষ্টি রূপ দিয়েছিল, যে আবরণ দিয়ে ব্যষ্টি বেষ্টিত হয়ে আছে সেই আবরণে কি কি আছে, যে আবরণ গুলো আবার এক এক করে খসে পড়ছে, তারই বর্ণনা এই সাত নম্বর মন্ত্রে করা হচ্ছে। এই একটা মন্ত্রেই পুরো সৃষ্টির তত্ত্বটা দেওয়া হয়েছে। এখানে বলছেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্ম সমষ্টি কিন্তু সেখান থেকে ব্যষ্টি কি করে হয়ে যাচ্ছে। একজন কুমোর একটা মাটির ঘট তৈরী করছে, এখানে ঘটা আলাদা, মাটি আলাদা আর সে আলাদা। মা যখন শিশুকে জন্ম দিচ্ছে তখন মা আলাদা শিশু আলাদা। যদিও প্রথমে মা আর শিশু এক ছিল, তারপর একটা সময়ের পর দুজন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ঘট আর মাটি প্রথম থেকেই আলাদা ছিল। তাহলে ব্রহ্ম থেকে যখন সৃষ্টি হয় তখন সেই সৃষ্টি কোন শ্রেণীতে আসবে।

এরা আগে *যথোর্ণাভি সৃজতে গৃহ্নতে চ* মন্ত্রে বিভিন্ন রকম সৃষ্টির আলোচনা করা হয়েছিল, ওখানে সব কটি সৃষ্টিকেই উপমার সাহায্যে বলা হয়েছে আবার সব কটিকেই নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ওভাবে হয় না। কারণ ব্রহ্মের বাইরে কিছু নেই, তাহলে সৃষ্টিটা হবে কি করে। সেইজন্য বলেন শুদ্ধ ব্রহ্মের উপর একটা আবরণ এসে যায়। খুব সহজ উপমা দিয়ে জিনিষটা বোঝান যেতে পারে। ধরে নিন এই ঘরটাই শুধু আছে, এই ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। এই ঘরের বাইরে আমি কখন যাইনি, তাই এই ঘরের বাইরে কি আছে কিছুই জানি না। ধরে নিচ্ছি এই ঘরেও কিছু নেই, চারদিকের দেওয়ালগুলো আলোকিত। আলোটা আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন যদি আমাকে সৃষ্টি করতে হয় তাহলে আমি কিভাবে সৃষ্টি করব। তখন এই আলো-ছায়ার

খেলা করে একটা বিভাজন করে দেব। একটা ছায়া যদি এই দেওয়াল থেকে সেই দেওয়াল পর্যন্ত টেনে দিই তাহলে ঘরের দুটো ভাগ হয়ে গেল। আবার যদি আরেকটি ছায়াকে সামনে থেকে পেছনে টেনে দিই তখন ঘরের চারটে ভাগ হয়ে গেল। অথচ এই বিভাজন গুলো আসল নয়। যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যাঁর ব্যতিরেকে কিছু নেই, তাঁর বিভাজন কি করে হবে! তাহলে সৃষ্টি কি করে হবে! সেইজন্য এই বিভাজনকে বলছেন অবিদ্যা আবরণ। অবিদ্যা আবরণ আমি যত খুশী করে নিতে পারি, কারণ এটা অনন্ত সৃষ্টিও তাই অনন্ত, জীবও অনন্ত। পরের মন্ত্রে ঠিক এই সৃষ্টি তত্ত্বকেই বলা হচ্ছে –

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি।।৩/২/৭।।

(প্রাণাদি পঞ্চদশ কলা যে কারণগুলো থেকে এসেছিল, সেই কারণগুলোতে তারা সব ফিরে যায়। দেবতারা ফিরে যান মূল দেবতাতে। সঞ্চিত কর্মসমূহ ও অন্তঃকরণ এবং উপাধি-পরিচ্ছিন্ন আত্মা অব্যয় স্বরূপে একীভূত, অভিন্ন হয়ে যায়।)

প্রথমে বলছেন *গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা*, এই শরীরকে জন্ম দেওয়ার জন্য পনেরটি কলা লাগে। এই পনেরটি কলা না থাকলে মানব শরীরের কোন সৃষ্টিই হবে না। আত্মজ্ঞানীর শরীর চলে যাওয়ার সময় এই পনেরটি তত্ত্ব, দেহ সৃষ্টির জন্য যে পনেরটি তত্ত্বের কথা বলা হল, এরা সব নিজের নিজের আশ্রয়ে গিয়ে অবস্থান করে। *দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু*, ইন্দ্রিয়ের যত দেবতারা আছেন তাঁরা প্রতি দেবতাদের মধ্যে মিশে যায়। *কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা*, তাঁর যত কর্ম বাকি আছে আর *বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি*, পর অব্যয় দেবের মধ্যে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। মুক্তি হওয়া মানে ঘটাকাশের ঘট ভেঙে যাওয়া। এই ঘট হল সূক্ষ্ম শরীর। মানুষের মৃত্যুর সময় যখন দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায়, তখন এই দেহ যেটা পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী হয়েছিল, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত থেকে এসেছিল সেখানেই এই দেহ লীন হয়ে যায়। এটা তো গেল স্থূল শরীরের লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর সূক্ষ্ম শরীর যখন লীন হয়ে যাবে তখন সে কোথায় যাবে?

এখানে সূক্ষ্ম শরীরের কয়েকটি ব্যাপার বলছেন। সূক্ষ্ম শরীরের পনেরটি কলা নিজের নিজের আশ্রয়ে চলে যায়। আমাদের যত গুলো ইন্দ্রিয় আছে সব ইন্দ্রিয়েরই একজন দেবতা আছেন, তাঁরা তখন প্রতি দেবতাতে, মানে যে মূল দেবতা থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে যান। যতগুলো কর্ম ছিল সেগুলো অব্যয়ে চলে যায় আর বিজ্ঞানময় আত্মাও অব্যয়ে চলে যায়। এই পনেরটি কলার বিশদ বিবরণ প্রশ্নোপনিষদে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা আছে। একজন রাজা ঋষির কাছে এসে প্রশ্ন করছেন প্রাণ আর পনেরটি কলা মোট এই ষোল কলার ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কিনা। যে ঋষিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সেই ঋষির আবার এই প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না। তখন তিনি নিজের আচার্যের কাছে গিয়ে বলছেন প্রাণ আর পনেরটি কলা বিষয়ে আপনি বলুন। তখন সেই আচার্য বলছেন এই প্রাণের পনেরটি বিবর্তন হয়, তাই এর পনেরটি কলা, প্রাণ নিজেও একটি কলা, তাই প্রাণকে নিয়ে মোট ষোল কলা। কিভাবে এই বিবর্তন হয় এক এক করে তিনি বলছেন –

সৃষ্টি যখন হয় তখন সেই ব্রহ্ম বা ভগবান তিনি প্রথমে পুরুষের রূপ ধারণ করেন। সেই পুরুষ সর্ব প্রথমে (১) প্রাণের রচনা করেন। প্রাণের পর আসছে (২) শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পর পাঁচটি তত্ত্ব (৩) আকাশ, (৪) বায়ু, (৫) তেজ, (৬) জল ও (৭) পৃথিবী। এই পঞ্চ তত্ত্ব থেকে সৃষ্টি হয় (৮) ইন্দ্রিয়, (৯) মন, (১০) অন্ন, (১১) বীর্য, (১২) তপ, (১৩) মন্ত্র, (১৪) কর্ম ও (১৫) লোক, (১৬) নাম। প্রথমে যিনি পুরুষ তিনি তো ব্রহ্ম তাই তারপর থেকে ধরা হচ্ছে, প্রথমে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে পনেরটি কলা, প্রাণেরই এই পনেরটি কলা। হিরণ্যগর্ভকেই

এখানে প্রাণ বলা হচ্ছে। প্রশ্নোপনিষদ আরও কঠিন উপনিষদ, সেখানে যেভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটা ধারণা করা বা বোঝা খুব কঠিন। কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদে যেটা বলতে চাইছেন তা হল, এই পনেরটি কলা নিজের আশ্রয়ে চলে যান, এই আশ্রয় হল প্রাণ। এই পুরুষ কিভাবে সৃষ্টি করেন?

প্রথমে তিনি হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি করলেন, হিরণ্যগর্ভ মানে প্রাণ। আমার আপনার এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে প্রাণের খেলা চলছে তাকে বলছেন প্রাণ আর সমস্ত প্রাণের সমষ্টিকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। যত প্রাণী আছে তাদের মধ্যে যে শুভ কর্মের প্রবৃত্তি হবে, সেই প্রবৃত্তি হওয়ার জন্য একটা হেতুর দরকার, সেই হেতুটাই শ্রদ্ধা। তাই হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ থেকে জন্ম নিচ্ছে শ্রদ্ধা। কোন শুভ কর্ম করার জন্য সেই কর্মের প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা থাকা চাই। যাঁরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসছেন, তাঁদের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, অধ্যয়ন কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। হিরণ্যগর্ভ প্রথম তাই রচনা করলেন শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পরেই পাঁচটি মহাভূতের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে শ্রদ্ধাটা ভেতরে তৈরী করে নিলেন, কারণ ব্রহ্মাকে এখন সৃষ্টি রচনার কাজে নামতে হবে সেইজন্য তাঁরও শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধার জন্ম হওয়ার পর এবার কাজ শুরু হবে – সেখান থেকে এক এক করে পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টি হল। পঞ্চমহাভূতের পর তিনি ইন্দ্রিয় সমুদয়কে অর্থাৎ মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করলেন। এই পঞ্চতত্ত্বগুলো আবার তিনটে গুণ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো দিয়ে নির্মিত। এই পঞ্চতত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ দিয়ে এক একটি ইন্দ্রিয় তৈরী হয় আর পাঁচটি তত্ত্বকে মিলিয়ে তার সাত্ত্বিক অংশ দিয়ে সৃষ্টি হয় মনের।

ইন্দ্রিয় আর মন তো সৃষ্টি হয়ে গেল কিন্তু এগুলোকে ধরে রাখা হবে কি করে? ইন্দ্রিয়গুলো যে নিজের নিজের বিষয়ের উপর গিয়ে কাজ করবে সেই কাজ করার জন্য শক্তির দরকার। সেইজন্য অন্নের সৃষ্টি হল, তাই অন্নও একটি কলা। অন্ন হল ঈশ্বরের সৃষ্টি তাই অন্নের কখন নিন্দা করতে নেই, আর অন্নের অপচয় তো কখনই করা উচিৎ নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন *অন্নং ন নিন্দাৎ। তদ্‌ব্রতম্। অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্।* অন্নকে কখন নিন্দা করবে না, এটাই তোমার ব্রত। অন্নকে কখন উপেক্ষা করবে না। এটাই তোমার ব্রত। অন্ন প্রাণীরা খায় কেন? যাতে শরীরের মধ্যে তেজ আসে, সেই তেজকে ধরে রাখার জন্য বীর্যের সৃষ্টি করলেন। ইন্দ্রিয়ের কাজের জন্য শক্তি দরকার, সেই শক্তি আসবে অন্ন থেকে তাই অন্নের সৃষ্টি হল আর এই শক্তি বা তেজের জন্য বীর্যের দরকার তাই অন্নের পর বীর্যের সৃষ্টি করলেন। অন্ন খেলে তাই আমাদের শৌর্য বীর্য হয়। এই বীর্যের যদি সৃষ্টি না হত তাহলে ইন্দ্রিয়গুলোকে ধরে রাখা আর সম্ভব হত না।

এবার ইন্দ্রিয়ের শক্তি এসে গেল, সবাই যার যার বিষয়ের উপর কাজ করতে থাকবে, মানুষও এক অপরের সঙ্গে মেলামেশা করবে, তাতে অনেক কিছুর গোলমাল হয়ে বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, বর্ণসঙ্কর হওয়া মানে সব কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে। এই অশুদ্ধি থেকে শুদ্ধি হওয়ার জন্য তপস্যার রচনা করলেন। তপস্যা থেকে যাদের অন্তঃকরণ ও বাহ্যঃকরণ সব শুদ্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্য সেই পুরুষ সৃষ্টি করলেন মন্ত্র, মন্ত্র মানে ঋক্, যজুর্বেদাদির মন্ত্রগুলো রচিত হল। যাঁদের এই শুদ্ধি হয়ে গেছে একমাত্র তাঁরাই এই মন্ত্র পাঠ করতে পারবেন। সেই কারণে ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ পাঠের অধিকার আর কারও ছিল না। মনুস্মৃতিতে বার বার বলা হচ্ছে কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, জন্ম দিয়ে মনু কখন ব্রাহ্মণত্বকে স্বীকার করেননি। এটা আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে মনুকে জাতিপ্রথার জনক বলে নিন্দা করা হয় কিন্তু মনু জন্মগত ব্রাহ্মণকে কোন গুরুত্বই দেননি। তিনি বার বার বলছেন যে ব্রাহ্মণ অর্থোপার্জন করে তাকে সমাজ থেকে চ্যুত করে দাও। যে ব্রাহ্মণ বেদের জ্ঞানকে বিক্রী করে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার কর। কি কি কারণে ব্রাহ্মণকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করতে হবে তার এক বিরাট তালিকা মনু দিয়েছেন।

কিন্তু তার সাথে মনু আবার বলছেন ব্রাহ্মণকে খুব সম্মান দিতে হবে। কারণ এঁদের বংশেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্ম নেয়। টিভি, সিনেমা, খবরের কাগজ দৌলতে সাধু সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের যতই খারাপ ধারণা তৈরী হয়ে থাকুক না কেন, তার সাথে সাধারণ মানুষ এটাও জানে তত্ত্বের জ্ঞান সন্ন্যাসীদের

কাছেই আছে। তাই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে যতই গালমন্দ করা হোক না কেন, আসল বস্তু আছে সন্ন্যাসীদের কাছেই। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ যদি দুষ্ট হয়, গোলমেলেও যদি হয় তাহলেও কিন্তু ব্রাহ্মণের হাতেই ধর্ম রক্ষার দায়ীত্ব অর্পিত আছে। ধর্মকে রক্ষা করতে ব্রাহ্মণই পারবে অন্যের দ্বারা হবে না। যেমন আমাদের এমপিদের নামে সবাই কত গালমন্দ করে যাচ্ছে, কিন্তু পরের পর নির্বাচনে এদেরকেই মানুষ ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠাচ্ছে। আসলে এরা যতই চোর হোক, বদমাইস হোক চলছে কিন্তু এই এমপিদের দ্বারাই, আমার আপনার দ্বারা চলছে না। আমাদের হাতে যদি চালাবার দায়ীত্ব দেওয়া হয় দুদিনে আমরা ল্যাজেগোবরে হয়ে পালিয়ে আসব। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণরা যত গোলমেলে হোক ধর্ম এদের দ্বারাই রক্ষিত হবে। সন্ন্যাসীকে লোক যতই গালাগাল দিক কিন্তু অধ্যাত্ম বিদ্যা সন্ন্যাসীদের হাতেই আছে। সেইজন্য মনু ব্রাহ্মণদের গালাগাল দিচ্ছেন, বলছেন কর্ম দিয়ে ব্রাহ্মণ হবে কিন্তু আবার জন্ম দিয়েও ব্রাহ্মণকে মানছেন, কিছু করার নেই। মনু এটা ভালোভাবেই বুঝতেন এরা দুষ্ট হোক আর যাই হোক এদের হাতেই ধর্ম সুরক্ষিত থাকবে।

সেইজন্য বলছেন যাঁদের সব কিছু শুদ্ধি হয়ে গেছে তাঁরা যাতে ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাই বেদের রচনা করে মন্ত্র সৃষ্টি করলেন। মন্ত্র মানে এই চারটে বেদ। এই মন্ত্রের সৃষ্টির পর তিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সৃষ্টি করলেন। মন্ত্র যখন এসে গেল তখন কর্ম শুরু হয়ে গেল। যারাই মন্ত্র করবে তাদের যজ্ঞ করতে হবে, কর্ম মানেই যজ্ঞ, মন্ত্র ছাড়া আবার যজ্ঞ হবে না। যেখানেই কর্ম হবে সেখানেই লোক হবে, লোক মানে স্বর্গলোকাদি। যে যজ্ঞাদি করবে সে স্বর্গে যাবে। লোক যখন হয়ে গেল তখন কি হবে? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত সব নাম এসে যাবে। নাম এসে যাওয়া মানে ব্যক্তি বিশেষ তৈরী হয়ে গেল। আমরা এখানে যে কজন বসে আছি সবারই নাম আছে। এই নামধারী ব্যক্তিরা কোথা থেকে এসেছে? সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম থেকে। কিভাবে এল? ঠিক এই ক্রমানুযায়ী পদ্ধতিতে। প্রথমে নাম, নামের ঠিক আগে এই পৃথিবী মানে লোক, এই লোকের আগে তৈরী হয়েছে কর্ম, মানে যজ্ঞাদি। যজ্ঞাদিকে জন্ম দিচ্ছে বেদ মন্ত্র। বেদ মন্ত্রের আগে আছে তপস্যা, মানে শুদ্ধিকরণ। এই করে করে যত পেছনের দিকে যেতে থাকবে শেষের দিকে আসবে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পেছনে আসবে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার পেছনে প্রাণ, প্রাণের পেছনে সেই ব্রহ্ম। এই হল পঞ্চদশ কলা। যখন ব্রহ্মবেত্তার দেহ পতন হয়ে যায় তখন এই পঞ্চদশ কলা মুখ্য প্রাণে মিশে যায়। এটা সবার জন্য নয়, শুধু ওই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের জন্য এই পনেরটি কলা মুখ্য প্রাণে মিশে গেল। তাই বলছেন *গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা*।

তার সাথে *দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু*, আমাদের হিন্দুদের পরম্পরাতে প্রথম থেকেই এই ধারণাটা খুব দৃঢ় ভাবে বসে আছে যে আমাদের যে একাদশ ইন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন করে দেবতা আছেন। যেমন দর্শন ইন্দ্রিয়ের দেবতা আদিত্য, এই আদিত্য আর সূর্যের যে দেবতা আদিত্য এই দুজন এক। সেইজন্য আগেকার দিনে যাদের চোখের কোন গণ্ডগোল থাকত তারা সূর্যের উপাসনা করত। মনের দেবতা হলেন চন্দ্রমা, বলা হয় পুর্ণিমা আর অমাবস্যায় মানসিক রোগীদের রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। ইংরেজরাও এই ব্যাপারটা মানছে, মানসিক রোগীদের ইংরাজীতে বলা হয় লুনাটিক পেশেন্ট, লুনার থেকে লুনাটিক এসেছে। ওরা এমনিতে ব্যাপারটা জানত না, আমাদের ঋষিরা একেবারে প্রত্যক্ষ ভাবে জানতেন যে মনের দেবতা হলেন চন্দ্রমা। এই ভাবে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন করে দেবতা আছেন। এই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের যখন সূক্ষ্ম শরীরের পতন হয়ে যায় তখন প্রতেকটি ইন্দ্রিয়ের দেবতারা মূল দেবতাতে চলে যান। মূল দেবতা হলেন, আমাদের চোখে যে দেবতা আছেন তিনি সেই আদিত্য দেবতাতে চলে গেলেন। আমার নিজের ইন্দ্রিয়ের দেবতা যদি দুর্বল থাকেন তাহলে কিন্তু আমার ওই ইন্দ্রিয় ভালো থাকবে না। যার চোখের ইন্দ্রিয় দুর্বল, সে যদি সেই ইন্দ্রিয়ের দেবতার সাধনা উপাসনাদি করেন তাহলে তার ওই ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে সবাই এই একই কথাই বলছে। যেখানে দুই রকম কথা বলে সেই জায়গাতেই সন্দেহ হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে সবাই দৃঢ়, এটা এই রকমই। আমার যে ইন্দ্রিয়টা দুর্বল সেই দেবতার উপাসনা করলে সেই ইন্দ্রিয়টা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। আমাদের যে এত এত দেবতাদের কথা বলা হয়েছে, এই কারণে বলা হয়েছে। যেমন রোগ, শোক এদেরও দেবতা আছেন। যার জন্য বসন্ত রোগ হলে মা শীতলাদেবীর কাছে যায়।

তার সঙ্গে বলছেন যত *কর্মাণি*, *কর্মাণি* মানে যিনি মুমুক্ষু তাঁর যত অপ্রবৃত্ত কর্ম জমে আছে সব সেই অব্যয়ে চলে গিয়ে নাশ হয়ে যায়। এমনিতে আমরা সবাই পিঠে একটা বিরাট কর্মের বোঝা নিয়ে চলেছি। যদি আমার মুক্তি না হয় তাহলে আমার কত জন্ম যে নিতে হবে তার কোন হিসাব দেওয়া যাবে না। অনন্ত জন্ম নিতে হবে, এত বিশাল কর্ম আমার জমে আছে। আর প্রত্যেক জীবনে আমি যে কর্ম করছে সেগুলো আবার নতুন করে জমছে। তার ফলে আরও নতুন নতুন জন্ম সুনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের কাছে যে অবতার তত্ত্ব এসেছে, এই অবতার তত্ত্ব উপনিষদের সময়ে ছিল না, তাঁরা এগুলো নিয়ে সেই ভাবে চিন্তা-ভাবনাও করেননি আর খুব একটা মানতেনও না। তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন ঋষি, যিনি আত্মজ্ঞান পেয়েছেন। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের যে এত দিনের কর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তি না পেলে এত দিনের কর্মগুলো যে তাঁকে পরের জন্মে ঠেলে নিয়ে যেত, আর এখন শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তি পেয়ে গেলে সেই কর্মগুলো কোথায় যাবে? বলছেন *পরেহব্যয় সর্ব*, সব কর্ম সেই অব্যয়ে চলে যায়। কার সাথে? *বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা*, শুদ্ধ আত্মার উপর একটা অজ্ঞানের আবরণ এসে যায়, ওই অজ্ঞানটা এখন মিটে গেছে, তাহলে বিজ্ঞানময় আত্মা অর্থাৎ ওই যে সূক্ষ্ম শরীর যেটা আছে এই দুটো এক সঙ্গে মিলে সেই অব্যয়ে চলে যাবে।

একটা ঘট আছে, ঘটের মধ্যে জল আছে, সেই জলে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। আমি জলটাকে দিলাম শুকিয়ে আর ঘটটাকে দিলাম ভেঙে। এখন ওই প্রতিবিম্বিত সূর্যটা কোথায় যাবে? যেখানে ছিল ওখানেই আছে। এতক্ষণ আমি যে সূর্যটা দেখছিলাম সেটা সূর্যের প্রতিবিম্বিত রূপ দেখছিলাম। আমরা যে পরস্পর পরস্পরকে দেখছি, আসলে আমরা সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সবার মধ্যে দেখছি। কিন্তু এই প্রতিবিম্বটা প্রথম কোথায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে? বিজ্ঞানময় আত্মায়। সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম তাঁর প্রতিবিম্ব বুদ্ধি, মন আদিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই প্রতিবিম্বকে বলছেন বিজ্ঞানময় আত্মা। মুক্তি পেলে এই বিজ্ঞানময় আত্মা যেখানে শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন, সেই প্রতিবিম্ব কোথায় যাবে? কোথায় আর যাবে? নিজের উৎসে চলে যাবে। আমি যে আয়নাতে রোজ মুখ দেখছি, সেই আয়নাটা ভেঙে গেল তাহলে আমার আয়নার মধ্যে যে আমার রূপ দেখছিলাম সেই রূপটা কোথায় গেল? সেই উৎসে ফিরে গেল। এই বিজ্ঞানময় আত্মাও ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরের পতন হয়ে গেলে সেই উৎসে চলে গেল। এই যে কর্ম এত জন্ম ধরে জমে আছে সেগুলোও তার উৎসে চলে গেল। এগুলো সব আমার মাধ্যমেই কাজ করছিল, এখন আমার অজ্ঞানটাই নাশ হয়ে গেল, তখন যাবতীয় যা কর্ম জমে ছিল সব তার উৎসে ফিরে গেল। এর মূল অর্থ হল এই কর্মগুলো আর কোন দিন ফল দিতে পারবে না।

এই কর্মগুলো বিজ্ঞানময় আত্মাকেই অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকেই কর্মের ফল দেয়, শুদ্ধ আত্মা তো কোন ফল নেন না। এই দেহের তো কোন মূল্যই নেই, দেহের মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য বোধটা আছে বলেই কর্মের ফল পাচ্ছে। এই বিজ্ঞানময় আত্মাই জীবাত্মা। আমরা যে আমি আমি করছি, এটাও সেই বিজ্ঞানময় আত্মাই আমি আমি করছে। এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ বিজ্ঞানময় আত্মারই নাশ হয়ে গেল তখন সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে, কারণ এই বিজ্ঞানময় আত্মার সাথেই সব কিছু জুড়ে আছে, তাই বিজ্ঞানময় আত্মার নাশ হয়ে গেলে সেখানেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। যত রাশিকৃত কর্ম জমে ছিল, তার সাথে এই বিজ্ঞানময় আত্মা সবটাই শেষ হয়ে গেল।

তখন কি হয়? আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন – *পরে অব্যয়ে অনন্তেহক্ষয়ে ব্রহ্মণি আকাশকল্পেহজেহরেহ-মৃতেহভয়েহপূর্বেহনপরেহনন্তেরেহবাহ্যেহদ্বয়ে শিবে শান্তে সর্বে একীভবন্তি*, আচার্য শঙ্কর বিরাট বড় কবি ছিলেন, আত্মার কি কি গুণ কবিতার ছন্দে শুধু ‘অ’ ‘অ’ দিয়ে সুন্দর বর্ণনা করে দিলেন। আচার্য বলছেন আত্মার উপর অবিদ্যা কল্পিত উপাধি আরোপ করা হয়েছে। এই উপাধিগুলো এখন নিবৃত্ত হয়ে গেল, এখন এটাই আকাশের মত হয়ে যাবে। আমরা যেমন আকাশ দেখছি তেমন হয়ে যাবে। *অজে, অজরে, অমৃতে, অভয়ে, অপূর্বে, অনপরে, অনন্তরে, অবাহ্যে, অদ্বয়ে শিবে শান্তে*, তার আগে বলছেন *পরে অব্যয়ে অনন্ত অক্ষয়ে ব্রহ্মণি*। পর, মানে ব্রহ্মের থেকে বড় আর কেউ নেই। *অব্যয় অনন্ত অক্ষয়*, কোন দিন এই ব্রহ্মের ক্ষয় হয় না। এই হচ্ছে আত্মার বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মবেত্তার শরীরের পতন হলে তাঁর সব সঞ্চিত কর্ম আর বিজ্ঞানময় আত্মা

এই শুদ্ধ ব্রহ্মে লয় হয়ে যায়, কোন কিছুই তাঁর আর অবশিষ্ট থেকে যায় না। একজন বাবা মরে গেলে তার সম্পত্তি কোথায় যাবে, তার ছেলের কাছেই যাবে। এখানে সেটা হয় না, এখানে বলছেন লয় হয়ে যায়। জল আর তার পাত্রকে সরিয়ে নিলে তার প্রতিবিম্বিত সূর্য যেমন সূর্যের মধ্যে মিলে যায়, আর ঘটাকাশ মহাকাশে মিলে যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানীর আর কোন কিছু চিহ্ন থেকে যায় না, সব কিছু সম্পূর্ণ ভাবে লয় হয়ে যায়। এখানে শুধু যে শরীর মনের কথা বলা হচ্ছে তা নয়, বলছেন *গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ*, তোমার শরীর মনের কথা ছেড়ে দাও *পঞ্চদশঃ কলা* যেটা, যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি এগিয়ে চলে, যে পদ্ধতিতে সমষ্টি ব্যষ্টিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সেই পঞ্চদশ কলারই নাশ হয়ে যায়। তাই নয়, যে দেবতারা তাঁর শরীরকে চালাচ্ছিলেন তাঁরাও সবাই প্রতিদেবতাতে চলে যাচ্ছেন আর তাঁর কর্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অব্যয়ের সাথে এক হয়ে যায়।

এই বিজ্ঞানময় আত্মা যখন সে বিভিন্ন জিনিষের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিয়ে একত্ব মনে করে তখন অনেক রকম রূপ ধারণ করে, যেমন দেহাত্মা, নিজেকে দেহের সঙ্গে এক মনে করছে এটা অন্নময় কোষ। যেখানে প্রাণের সঙ্গে জুড়ে নেয় সেটা হয়ে যায় প্রাণময় কোষ, যখন মনের সঙ্গে এক মনে করে তখন মনোময় কোষ আর শেষে বিজ্ঞানময় আত্মা যেখানে সে বুদ্ধির সঙ্গে নিজেকে এক করে নিচ্ছে। একবারে শেষে থেকে যায় আনন্দময় কোষ, যেখানে অজ্ঞানের একটা পাতলা আবরণ থেকে যায়। আনন্দময় কোষকে কখন এর মধ্যে ধরা হয় না, এটাই কারণ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হয়ে যাওয়া মানেই সব কিছু শেষে হয়ে যাওয়া। সূক্ষ্ম শরীরকে নাশ করা খুব কঠিন। স্থূল শরীর তো বুঝলাম পঞ্চভূতে মিলে যাচ্ছে, কিন্তু এই কারণ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর নাশ হয়ে কোথায় যায়? এগুলো ঠিক ওই একই পদ্ধতিতে নাশ হয়ে যায়। এখানেই মুণ্ডকোপনিষদের মূল বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। এই উপনিষদের মূল প্রশ্ন ছিল কোনটা জানলে সব কিছুকে জানা যায়, মোটামুটি তার সব উত্তর এই মন্ত্রে এসে শেষ হয়ে যায়।

সাধারণ জীবাত্মা মৃত্যুর পর যেখানে যেখানে যাচ্ছে, যে যে লোকে জন্ম নিচ্ছে সব জায়গাতেই তার চিহ্ন থেকে যায়, কিন্তু যাঁরা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন তাঁদের আর কোন চিহ্ন থেকে যায় না। ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশে মিলে যাচ্ছে। মহাকাশ থেকে কখনই সে আলাদা ছিল না, কিন্তু একটা প্রতিবন্ধকতা এসে গিয়েছিল। বেদান্ত অধ্যয়ণ করার সময় এই প্রতিবন্ধকের ধারণাটা খুব ভালো করে বোঝা দরকার। যে পনেরটি কলার বর্ণনা করা হল এগুলোই তার প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। যেটা মহাকাশ, যিনি সমষ্টি তাঁকেই এই পনেরটি কলা ঘিরে ফেলছে। কিন্তু মহাকাশ বরাবর মহাকাশই, কিন্তু কৃত্রিম একটা আবরণ তৈরী করে মহাকশকে বিভক্ত করে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। এই আবরণ ও বিভাজন যদি বাস্তবিক হয় তাহলে তার মুক্তিটাও কখন বাস্তবিক হবে না। মুক্তি তখন কোন কিছুকে পাওয়ার মত হয়ে যাবে। কোন কিছু পাওয়ার মত যদি হয় তাহলে মুক্তি কখনই স্থায়ী হবে না। আচার্য সব কিছুই যুক্তি তর্ক দিয়ে উপনিষদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু এখানে যুক্তি তর্কের কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ এগুলো বেদ প্রমাণ। বেদে এটাই আছে, উপনিষদে এই কথা বলছে তাই এটাই সত্য। এবার এটাকে নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করে দেবেন কেন এটা সত্য। যেমন আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রমাণ, ঠাকুর এই কথা বলে গেছেন, এর পর এই নিয়ে কোন যুক্তি তর্ক চলবে না। তাহলে কি চলবে? এর অর্থটা কি বোঝার জন্য ব্যাখ্যা চলতে থাকবে। ঠাকুর বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, ঠাকুরের এই কথাকে নিয়ে তর্ক করার আর কিছু নেই, এটাই সত্য। এবার ঈশ্বরের অর্থ কি ব্যাখ্যা করুন, জীবনটা কি ব্যাখ্যা করুন, তার উদ্দেশ্যটা কি এর ব্যাখ্যা করন। কিন্তু ঠাকুরের এই বাণীকে নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। ঠাকুরই প্রমাণ, প্রমাণ মানে যা দিয়ে একটা জিনিষকে জানা যায়। আচার্যও তাই বলবেন, উপনিষদে ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে সবটাই সত্য, যুক্তি তর্কের কিছু নেই।

কিন্তু যাঁরা বলবেন আমরা এগুলো মানছি না। আচার্য শঙ্কর তখন অন্য বিষয় বা প্রসঙ্গে গিয়ে যুক্তি তর্ক করবেন। আচার্য বলবেন – তুমি মানছ না ঠিক আছে, কিন্তু তোমার কি বক্তব্য তুমি বল। এরপর তাঁরা যখন তাঁদের বক্তব্য রাখবেন তখন আচার্য যুক্তি তর্ক দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তোমার বক্তব্যের মধ্যে অনেক দোষ আছে, তাই তোমার বক্তব্যকে গ্রহণ করা যাবে না। আচার্যের ভাষ্যাদি যদি কেউ কখন পড়েন, যদিও

তাঁর ভাষ্য অনুধাবন করা খুবই কঠিন, দেখবেন আচার্যে যুক্তির কোথাও এতটুকু কোন অযৌক্তিকতার ফাঁক পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। সবাই আবার আচার্যের প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিকে ধরতেই পারেন না যে, আচার্য আসলে কি বলতে চাইছেন। যে কারণে বলা হয় আচার্যের ভাষ্য পুরোপুরি যাঁরা দার্শনিক তাঁদের জন্য। যে কোন ধর্মীয় দর্শনই নিয়ে আসা হোক না কেন, আচার্য যুক্তি তর্ক দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তোমার দর্শনে অনেক দোষ আছে। উপনিষদে মূল ভাবের উপর আচার্যের বক্তব্যকে যখন কেউ আক্রমণ করবে তখন তিনি উপনিষদের ভাব ও দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তি তর্ক দিয়ে দেখিয়ে দেবেন এই এই কারণে আমার বক্তব্য ঠিক। তখন দু-পক্ষের যুক্তি তর্ক এত উচ্চ স্তরে আর সূক্ষ্ম বিচারে চলে যায় যে, আমাদের পক্ষে বোঝা সম্বব নয়। যারা দার্শনিক তাঁরাই একমাত্র ধরতে পারবেন।

এখানে তিনি যুক্তি তর্কের বিচারকে একটু পেছনের দিকে রেখে উপনিষদের বক্তব্যের অর্থকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। উপনিষদে বলছে আত্মা আর ব্রহ্ম এক, এইটুকু বক্তব্যের অর্থকে ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। এই যে আমরা ঘটাকাশের কথা বললাম, এই ধরণের অনেক রকমের উপমা এনারা দেন, কঠোপনিষদে এক রকম উপমা আছে, এখানে পরের মন্ত্রে আরেক রকম উপমা দিচ্ছেন –

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
হস্তং গচ্ছ্যন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরাং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।৩/২/৮।।

(প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রের সঙ্গে একতা প্রাপ্ত হয়, সেই রকম জ্ঞানী পুরুষ নাম-রূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।)

আট নং মন্ত্রে মুক্তি ব্যাপারটাকে উপমার সাহায্যে বোঝান হচ্ছে। বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথ দিয়ে যখন সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়ে সমুদ্রে বিলীন হয় তখন নদীর নাম আর রূপও বিলীন হয়ে যায়। গঙ্গাসাগরে সমুদ্রের কাছে দাঁড়ালে আর বোঝা যাবে না কোনটা গঙ্গা, কোনটা পদ্মা, কোনটা যমুনা, কোনটা নর্মদা। সব নদী সমুদ্রে মিশে এক হয়ে গেছে। খালিজ ইব্রাম্ নামে একজন নামকরা কবি ছিলেন, তাঁরা খুব বিখ্যাত বই 'দি প্রফেট'। খুব গভীর চিন্তায় নিজেকে তিনি বেশীর ভাগ সময় নিমগ্ন রাখতেন। তাঁর লেখার মধ্যে বেদান্তের বড্ড বেশী প্রভাব নজরে পড়ে। মনে হয় তিনি যেন বেদান্ত অধ্যয়ণ করে এই কথাগুলো বলছেন। একদিকে তিনি যেমন কবিতা লিখতেন আবার তাঁর লেখা অনেক উপন্যাস, ছোট ছোট কাহিনী আছে আবার দু-তিন লাইনের কাহিনীও আছে। খুবই উচ্চমানের লেখক ছিলেন। ঠিক এই উপমাকে নিয়ে তাঁর একটা লেখা আছে। যেখানে তিনি বলছেন, দুটি জলধারা দুটি অচীন দেশ থেকে নেমে সমুদ্রের অভিমুখে চলেছে। পথে যেতে যেতে দুজনের দেখা হয়েছে। একটি জলধারা আরেকটি জলধারাকে প্রশ্ন করছে –

'বোন! তোমার যাত্রা পথ কি রকম হল'?

'কোথায় আর সেই ভালো হল!'

'কেন? কেন'?

'আমি তো পাহাড় থেকে নামলাম, নেমে পথ চলছি। কিন্তু লোকেরা নিজেদের সব আবর্জনা আমার মধ্যে ফেলছে, নোংরা জামা, এঁটো বাসন আমার জল দিয়ে পরিষ্কার করছে আর আমার সারা শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠত। তা বোন! তোমার কেমন হল বল'।

'আমার তো সব সুন্দরই ছিল, আমাকে এই পাহাড় সেই পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে হয়েছে, কত লোকালয়, কত সুন্দর সুন্দর সবুজ বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে এসেছি। লোকালয়ের কি সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে শিশুরা তাদের নরম কোমল পা আমার বুকে রাখত, আর লোকেরা আমার ঠাণ্ডা জল পান করে তৃষ্ণা

নিবারণ করে যখন তৃপ্ত হত তাদের সেই তৃপ্ত মুখ দেখে আমার হৃদয় জুড়িয়ে যেত'। এই দুটি ছোট্ট নদী এই ভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে উজাড় করছিল তখন হঠাৎ বড় নদী এসে বলছে

'তোমাদের কথাবার্তা এবার বন্ধ কর। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে এসে মিলে যাও, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সমুদ্রে প্রবেশ করতে হবে। এরপর তোমার আবর্জনার অভিজ্ঞতার কাহিনীও থাকবে না আর তোমার যে সৌন্দর্যের গল্পও থাকবে না। আমরা সবাই এখন সমুদ্র হয়ে যাব'।

ঠিক এই কথাই আট নং মন্ত্রে বলছেন *যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে*। চারিদিক থেকে কত কত নদী এসে সমুদ্রে মিলছে। এই গঙ্গা যখন হিমালয় থেকে নেমে প্রবাহিত হয়ে এলাহাবাদে আসছে তখন তার সাথে যমুনা আর সরস্বতী এসে মিশে যাচ্ছে। বলে সরস্বতী নদী এখন হারিয়ে গেছে। যত যত এগোচ্ছে কত নদ-নদী, খাল এসে গঙ্গায় মিশে যাচ্ছে, সেই গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে নিজেও সমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এই যে আমাদের প্রত্যকের ঈশ্বরের কাছ থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, কত জন্ম জন্ম ধরে এই যাত্রা চলছে, তার মধ্যে কত আবর্জনা আসছে, কত ভালোবাসা আসছে, কত দুঃখ, আনন্দ, হাসি-কান্না আসছে যাচ্ছে, কত ভালো জিনিষ আসছে, কত অপ্রিয় জিনিষ আসছে। সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে একটু একটু করে সে মিলতে মিলতে শেষ বৃহৎ যেটি তার সাথে মিলে যাচ্ছে। তখন কি হচ্ছে? এগুলো উপমা, উপমার শাব্দিক অর্থ নিয়ে তর্ক করা যায় না। এখানে বলছেন, সমুদ্র আগে থেকেই ছিল, আরও পাঁচটা নদী এসে সমুদ্রে মিলে গেল, তাতে সমুদ্রের কি হল? কিছুই হবে না। নদীর সাথে সমুদ্রের যে মিলন এটা কি জলের মধ্যে চিনি মিশিয়ে দেওয়ার মত মিলন? না, এটাকে মিলন বলা যায় না, কারণ জলে যখন চিনি দিলাম তখন সেটা আর জল থাকল না, তখন ওটা শরবৎ হয়ে গেল। জলের মধ্যে যখন চিনি দেওয়া হচ্ছে তখন জলের মধ্যে চিনি মিশে গেলেও চিনির স্বভাবটা থেকে যায়, কিন্তু সমুদ্রে যখন নদীগুলো মিশে যাচ্ছে তখন এই ব্যাপারটা হয় না, তার নাম ও রূপ এই দুটো মিটে যায়। বৃহৎএর সাথে মিলন হওয়া মানে তার নাম ও রূপের নাশ হয়ে যাওয়া। নাম আর রূপ এটাই মায়া। যখন মিলে যাচ্ছে ওই জল আগে যে গঙ্গার জল ছিল এখন সেই জলই সমুদ্রের জল হয়ে গেল। গঙ্গার নাম আর রূপ দুটোই মিটে গেল।

নাম ও রূপের যে কি সাঙ্ঘাতিক মাহাত্ম, ট্রেনে করে দুই ভদ্রলোক যাচ্ছেন, দুজনই দুজনের অপরিচিত। একজন আরেকজনের নাম জিজ্ঞেস করতেই যদি তার নামটাই বলে দেয় তক্ষুণি বলবে – ও! তাই! আমারও নাম তাই। সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মধ্যের সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকবে। এই যে আইপিএল ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, তাতে কলকাতা নাইট রাইডারস্ একটা ক্লাব। শুধু একটা ক্লাবের নাম আর নামের মধ্যে কলকাতাটা লাগান আছে। সেই ক্লাব জিতেছে বলে কলকাতার সব লোক উন্মাদের মত হয়ে গেছে। কলকাতা শহরের সাথে এই ক্লাবের কোন সম্পর্ক নেই, না আছে কলকাতার নামকরা খেলোয়াড়রা। সব বিদেশী খেলোয়াড় টাকার বিনিময়ে খেলছে আর ক্লাবের মালিকও কলকাতার লোক নয়। ক্লাবের নামে শুধু কলকাতা এই শব্দটা লাগান আছে তাতে রাজ্য সরকারও মন্ত্রী সমেত নেমে পড়েছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে উন্মাদনা করতে। এটাই নাম আর রূপের মহিমা, এটাই মায়া।

এই কথাই এখানে বলছেন *অস্তং*, অস্ত হয়ে যাচ্ছে। কি অস্ত হয়ে যাচ্ছে? নাম ও রূপের খেলা। অনেকে আবার এগুলোকে নিয়ে কিছু প্রশ্ন তোলেন। ঈশ্বর দর্শনে আমার কি প্রয়োজন, ঈশ্বর দর্শনে তো আমার নিজস্বতা, আমার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিটি কি? তোমার নাম-রূপের ব্যক্তিত্ব। ঈশ্বর দর্শনে তোমার ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হয়ে যাচ্ছে, এছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। বাংলার এমপি যদি কাল ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে যায় তাহলে কি আর হবে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হয়ে যাবে। ছিল ছোট্ট একটা নদী, সমুদ্রে মিশে তার নাম আর রূপটা মিটে গেল, এখন সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে বৃহৎ হয়ে গেল। মুক্তি মানে এটাই, আমার ক্ষুদ্র শরীর মনের সাথে একত্ব ভাবটা কেটে গিয়ে বৃহৎএর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

এখানে বলছেন *নাম রূপ অস্তং*, অস্তং মানে অদর্শন। অদর্শন মানে জিনিষটা আছে, কোথাও যায়নি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, শুধু তার নাম রূপটা শেষ হয়ে গেছে। নাম রূপটা আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বস্তুটা থাকবে। সন্ধ্যা হলে বলি সূর্য অস্ত হয়ে গেছে, বলি না যে সূর্য নাশ হয়ে গেছে। কারণ সূর্যকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, অস্ত হয়ে গেছে। আগামীকাল আবার দেখা যাবে। তার নাশ হয়ে যায়নি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। তাই অস্ত মানে অদর্শন। বিনাশ হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া মানে শেষ, আর দেখা যাবে না। এখানে অদর্শন বলতে আচার্য বোঝাচ্ছে অবিশেষ ভাব। আমি একজন গৃহী, আমি শ্রোতা, আমি সন্ন্যাসী, আমি আচার্য এটা হচ্ছে আমার বিশেষ ভাব। আমি আজ এখানে আছি, কিছুক্ষণ পর এখানে থাকব না, আগামীকাল আবার অন্য কোথাও থাকব, আজ আমার মন এক রকম, কাল অন্য রকম থাকবে, এগুলো সব বিশেষ ভাব। ব্রহ্মের সঙ্গে এক মানে অবিশেষ ভাব। এই যে আমার নাম-রূপ, নাম-রূপ আছে বলে আমার চরিত্র আছে, জামা-কাপড় আছে, আমার কথা বলার ভঙ্গি আছে, এই রকম আমার ব্যক্তিত্বের হাজার রকম দিক আছে। এই ব্যক্তিত্ব আমাকে একটা বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে, ঈশ্বর দর্শনে এই বৈশিষ্ট্যাই নাশ হয়ে যায়। তখন আমার যেটা বাস্তবিক স্বরূপ তার সাথে এক হয়ে যাচ্ছি। তাই বলছেন যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি বিদ্বান, বিদ্বান মানে যিনি আত্মদর্শন করেছেন, ইনি নাম ও রূপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। *বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ*, বিশেষ ভাবে নাম ও রূপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, এই নাম আর রূপ আর কোন দিন আসবে না। এগুলো কোন কবির কল্পনা নই, এটাই বাস্তব।

পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্, পর থেকেও পর, মানে সগুণ ঈশ্বরের শেষ যদি কল্পনা করতে পারি তারপরেও যা আছে, মানে সচ্চিদানন্দ, সেই নির্গুণ ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাচ্ছে। নির্গুণ ব্রহ্মের যে দিব্য ভাব সেটাকে সে পেয়ে যায়। সাধারণ লোকদের বোঝানর জন্য এই নদী উপমা দিয়ে বোঝান হচ্ছে। নদী যেমন নিজের নাম-রূপকে ত্যাগ করে সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যিনি বিদ্বান, যিনি আত্মজ্ঞানের পথে বা মুক্তির দিকে এগোচ্ছেন তাঁর কি হয়? *পরাৎ পরং*, পর থেকেও পর, সগুণ ঈশ্বরকে অতিক্রম করে সে অক্ষর ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। আচার্য বলছেন *বিদ্বান্ পরাৎ অক্ষরাৎ পূর্বোক্তং পরং দিব্যং*, এর আগে যে অক্ষর পুরুষের কথা বলা হয়েছে, বিদ্বান তাঁকেও পেরিয়ে যাচ্ছেন। মানে, তাঁর সদ্যমুক্তি হয়ে যাচ্ছে, আর কোন কিছুর অপেক্ষা করছে না। সেখানেই তাঁর মুক্তি হয়ে যাচ্ছে, মৃত্যুর জন্য তাঁকে আর অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। হিন্দু ধর্ম বা উপনিষদের উদ্দেশ্য মুক্তি নয়, জীবনমুক্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য। যিনি জীবনমুক্ত, মৃত্যুর পর আর তাঁর এই অক্ষর পুরুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম এঁদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। জীবনমুক্ত পুরুষ মৃত্যুর পর ঘটাকাশ মহাকাশে মিলে যাবে।

ভক্তিশাস্ত্রে এই জিনিষটা হয় না, সেখানে সৃষ্টি যতক্ষণ চলছে ভগবান বার বার নতুন নাম ও রূপ নিয়ে আসতে থাকেন। তিনি আছেন বলে তাঁর কয়েকজন পার্ষদও থাকবেন, তাঁদের বলছেন ঈশ্বরকোটি বা নিত্যমুক্ত। এই ঈশ্বর আর ঈশ্বরকোটির মুক্তি হবে না, হয় এই কল্পান্তে আর না হয়তো যখন মহাপ্রলয় হয়ে যাবে তখন তাঁদের মুক্তি, মুক্তি মানে এই বৈশিষ্ট্যের নাশ হওয়া। নরেন, রাখাল এনাদের কোন দিনই মুক্তি হবে না। আবার যদি ঠাকুর আসেন তখন নরেন রাখালকে আবার আসতে হবে। ঠাকুর বলছেন এরা হল কলমির দল, যেমনি অবতার আসবেন এনারাও পার্ষদ হয়ে আসবেন, তবে অন্য নাম ও রূপে আসবেন। যেখানে রামকথা বা কৃষ্ণকথাদি পাঠ হয় সেখানে এই জিনিষটাকে এই ভাবেই উপস্থাপন করা হয়। কখন তাঁরা গোপী হয়ে আসবেন কখন তাঁরা বানর হয়ে আসবেন কিন্তু আসতে সবাইকেই হবে। ঠিক তেমনি ভক্তও দুই ধরণের, একদল ভক্ত আছে যাঁরা বলছেন আমার আর জন্ম চাইনা এবার আমি মুক্তি চাইছি, আরেক দল ভক্ত বলছেন আমার মুক্তি চাইনা আমি ভক্তি চাই, আমি ঈশ্বরের লীলা আস্বাদন করতে চাই। যাঁরা মুক্তি পথের পথিক তাঁরা বলছেন এই জগতে অনেক হয়েছে আর নয়, কিন্তু যাঁরা ভক্ত, শুধু ভক্ত নয় খুব উচ্চমানের ভক্ত, তাঁরা বলেন আমার মুক্তি দিয়ে কি হবে, আমি ঠাকুরকে ভালোবাসি, শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসি তাঁর লীলা আস্বাদন করব। ঠাকুরও এই ভক্তির প্রসঙ্গে বলছেন – আমি চিনি হতে চাইনা, চিনি খেতে চাই। তৃতীয় আরেক ধরণের আছে। একজন এসে ঠাকুরকে বলছে – আমার তো আবার জন্ম নিতে ভয় নেই। ঠাকুর বলছেন – তুমি বলো

না কেন, আমার এখন ভোগ করার ইচ্ছা আছে! ঠাকুর এই তৃতীয় শ্রেনীদের কথাই এখানে বলছেন, যারাই ভোগী তারাই বলতে পারবে আমার আবার জন্ম নিতে ভয় নেই। যাঁরা বলেন আমি ভক্ত আমি ঈশ্বরের লীলা আস্বাদন করতে চাই, তাঁরা যদি এই শরীরে আস্বাদ করতে চান তাহলে সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য এই তিন ভাবে তাঁরা ঈশ্বরকে আস্বাদ করতে চান। ঈশ্বর যখন আবার অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর ইচ্ছা হলে তাঁদের নিয়ে আসেন। ভগবানকে ভালোবেসেছেন, ভগবান যদি অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁকেও আসতে হবে।

কিন্তু সে যদি বলে আমার আর কিছুই লাগবে না। উপনিষদে এঁদেরই কথা বলা হচ্ছে, সগুণ ঈশ্বর, অক্ষর পুরুষ এসব কিছু নয়। এক কথা মুক্তি। শুধু মুক্তিই নয় এই জীবন থাকতে থাকতে মুক্তি, এটাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। উপনিষদ সেইজন্য এই ধরণের কোন দ্বিতীয় কথা বলবে না। যাদের ইচ্ছে আছে তারা করুক, তারা ভক্তিশাস্ত্র পড়ুক, উপনিষদ তাদের জন্য নয়। এরা হল একেবারে কট্টর বেদান্তী। জীবনমুক্তি ছাড়া আমার আর কিছু চাই না। একজন শঙ্কা করে বলছেন, অনেক সময় দেখা যায় ভালো কাজ করতে গেলে নানা রকম বিঘ্ন আসে, *শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি*। ভালো কাজে অনেক রকম বিঘ্ন আসে। সেইজন্য চাণক্য নীতিতে বলছে *শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্*। যেটা শুভ কাজ এক্ষুণি সেই কাজটা করে নাও, কখন বিঘ্ন এসে যাবে কোন ঠিক নেই। ভগবানের উপরও শুভ কাজ ছাড়তে নেই। সেইজন্য বলে যেটাই শুভ কাজ, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলেও পেয়ে গেছ, এক্ষুনি দিয়ে দাও আর দেরী করো না। কোথা থেকে কি হয়ে যাবে কিছু বলা যায় না। আর অশুভ কাজ যদি হয়, সেই কাজটাকে যত পিছিয়ে দেওয়া যায় পিছিয়ে দাও। যদি আমি জানি কেউ ডিভোর্স দিতে চাইছে, এটা অশুভ কাজ, তাকে বলতে হয়, ভাই ডিভোর্স হয়ে গেলে তো সব হয়েই গেল, এত তাড়াহুড়োর কি আছে, কিছু দিন অপেক্ষা কর, দেখ কি হয়। সেইজন্য সব কাজের আগে দেখতে হয় যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা শুভ না অশুভ। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে বা যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে আছেন ঈশ্বরের পথে যে কাজটাই এগিয়ে নিয়ে যায় সেটাই শুভ কাজ, যে কাজটাই ঈশ্বরের পথে বাধা সৃষ্টি করে সেটাই অশুভ। সংসারীদের জন্য স্মৃতি আদি ধর্মগ্রন্থে যা যা বিধান করা আছে সেটা করাই কর্তব্য, সেগুলো শুভ কাজ। যেগুলো অকর্তব্য সেগুলো অশুভ। যখনই কর্তব্যের ব্যাপার আসছে, মানে শুভ কাজ এসেছে সেটাকে এক্ষুণি করে ফেলতে হবে, ফেলে রাখা যাবে না, সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বলে শুভ কাছে বিঘ্ন হয়। এই যে এনারা মুক্তির পথে যাচ্ছেন শোনা যায় দেবতারা নাকি অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। তাহলে ব্রহ্মবেত্তা যাঁরা, যাঁরা ব্রহ্মবিদ্ তাঁরা যখন মুক্তির পথে এগোচ্ছেন দেবতারা তো বিঘ্ন করতে পারে তখন কি হবে? আচার্য বলছেন, এটা হয় না। কেন এই ধরণের কিছু হয় না বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন, যেটা এর আগেও অনেকবার আলোচনা হয়েছে – অন্য সব কিছু প্রাপ্তিতে একটা বস্তু প্রাপ্তি হয় কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তিতে অবিদ্যার নিবৃত্তি হচ্ছে, একটা যে প্রতিবন্ধ ছিল সেটার নিবৃত্তি হয়ে গেছে। ক্ষেতে জল আনতে হবে। এখন জল কেন আসছে না? আলের ধারে মাটি দিয়ে একটা প্রতিবন্ধক তৈরী করা আছে। এখন সেই প্রতিবন্ধকটা সরিয়ে দিলেই জল আসতে শুরু করবে। আমার সাথে ঈশ্বরের মিলন, ব্রহ্মের যে মিলন এর প্রতিবন্ধকতা হল অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে নাম ও রূপের প্রতিবন্ধক। এই নাম রূপের প্রতিবন্ধককে ভেঙে দিলেই তো সব শেষ, তখন তাঁর আর আসা-যাওয়ার কিছু নেই। একজন মানুষ যজ্ঞ করছে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে বলে, এখানে পাওয়ার ব্যাপার আসছে। সেখানে অনেক কিছু বিঘ্ন করতে পারে। কেউ যদি একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দেয় সেও ইন্দ্র হয়ে যায়। বর্তমানে যিনি ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁরও গদি হারাবার ভয় আছে। সেইজন্য কেউ যদি নিরানব্বুইটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে একশ নম্বর যজ্ঞ করতে যায় ইন্দ্র তার ঘোড়াটাই চুরি করে সরিয়ে দেয়, যাতে শততম যজ্ঞটা না করতে পারে।

মোক্ষের ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন প্রাপ্তির ব্যাপার কিছু থাকছে না, শুধু প্রতিবন্ধকটাকে সরিয়ে দিচ্ছে। অন্যান্য শাস্ত্রে সব সময় পাওয়ার ব্যাপার থাকে, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তে পাওয়ার কোন ব্যাপার থাকে না। এই জিনিষটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই নিয়ে আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি, আবার যখন প্রসঙ্গ আসবে তখনও আলোচনা করতে হবে। এই আলোটা সব সময় জ্বলছে কিন্তু আলোটার উপর একটা আবরণ পড়ে

আছে, আবরণটা সরিয়ে দিলে আলো যেমন ছিল তেমনই থাকবে। ঠিক তেমনি আমরা সবাই হলাম সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, কিন্তু আমাদের মাঝখানে একটা প্রতিবন্ধক এসে যাচ্ছে যার জন্য আমরা যে সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে জানতে পারছি না। কি সেই প্রতিবন্ধকতা? সেই পঞ্চদশ কলা, যেটা এর আগে আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি। এই পনেরটি কলা পূর্ণ ব্রহ্মের উপর একটা কৃত্রিম বন্ধন সৃষ্টি করছে। এই কৃত্রিম বন্ধনটাকে সরিয়ে দিলে আমার যে স্বরূপ সেই পূর্ণ ব্রহ্মই থাকছেন, তাই এখানে কোন প্রাপ্তির ব্যাপার থাকছে না বলে কোন বিঘ্নের প্রশ্নও আসে না। কেন বিঘ্ন হয় না সেটা পরের মন্ত্রে বলছেন –

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানাং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।।৩/২/৯।।

(যিনিই সেই পরম তত্ত্বকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম হয়ে যান। তাঁর কুলে কেউ অব্রহ্মবিৎ জন্মায় না। সেই ব্যক্তি শোক-দুঃখ, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য সব কিছুকে অতিক্রম করেন। তিনি হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে অমরণধর্মী হন।)

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, এটাই পুরো মুণ্ডকোপনিষদের সার। যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হতে চলেছে তাঁর ভবিষ্যৎকে নিয়ে কোন ধরণের ভয় ভীতি থাকে না। তিনি ব্রহ্মকে পাবেন কি পাবেন না, মৃত্যুর পর তার কি হবে এই প্রশ্ন বা সংশয় আর তাঁর থাকে না। কেন থাকে না? *স যো হ বৈ তৎ পরমং*, যে কোন মানুষ, সে যে কোন ধর্মের, যে কোন জাতির লোকই হোন না কেন, তিনি পুরুষ না স্ত্রী এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যে কোন মানুষ যখন জেনে যায় তৎ *পরমং*, সেই পরম তত্ত্বকে জেনে যায়, মানে আমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের সাথে এক তখন তাঁর অন্য কোন দিকে যাওয়ার প্রশ্নই থাকবে না, কোন দেবতা, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ কেউ কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। বিঘ্ন কখন সৃষ্টি করতে পারবে? যখন আমি আর আপনি আলাদা তখন আমি আপনার জন্য কিছু সুবিধা করে দিতে পারব আবার আমি আপনার জন্য কিছু বিঘ্নও তৈরী করে অসুবিধা করে দিতে পারি। কিন্তু যিনি জেনে গেছেন তিনি দেবতাদেরও আত্মা, দেবতাদের সঙ্গেও এক হয়ে গেছেন, তাঁকে আর কে বিঘ্ন করবে! তিনি তো সবার সাথে এক হয়ে গেলেন, দেবতাদেরও তিনি আত্মা হয়ে গেছেন আবার পশু, পাখিদেরও আত্মা হয়ে গেছেন, সবারই তিনি আত্মা হয়ে গেছেন, তাঁকে আর কেউই কোন বিঘ্ন করতে পারবে না। সেইজন্য বলছেন *ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি*, যিনি ব্রহ্মকে জেনে গেছেন তিনিই ব্রহ্ম, এটাই উপনিষদের সার।

তাহলে ব্রহ্ম কিভাবে হবে? যিনি ব্রহ্মকে জেনে গেছেন তিনিই ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। এর উপর ভিত্তি করে জৈনদের একটা দর্শন তৈরী হয়েছিল, পাশ্চাত্য জগতেও কেউ কেউ এই দর্শনকে মানছেন। আমরা কখনই কোন জিনিষকে সম্পূর্ণ ভাবে জানতে পারব না। কোন জিনিষকেই পুরোপুরি জানা যায় না, কারণ যে কোন বস্তুরই হাজার রকম প্রপার্টি আছে, হাজার রকম গুণ আছে যে, বৈশিষ্ট্য আছে, তাই কখনই সম্পূর্ণ ভাবে জানা সম্ভব নয়। যখন কোন জিনিষকে কেউ পুরোপুরি জেনে যাবে তখন সে সেই জিনিষের সাথে এক হয়ে যাবে। এই নিয়ে বেদান্তের বিরুদ্ধবাদীদের অনেক যুক্তি তর্ক আছে। কিন্তু উপনিষদে কোন যুক্তি তর্ক নেই, এখানে পরিষ্কার – *ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি*, যিনি ব্রহ্মকে জেনে গেছেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে গেলেন। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্ বলে কিছু হয় না। ব্রহ্মবিদ্ মানেই ব্রহ্ম, তাঁকে আর আলাদা করে ব্রহ্মবিদ্ বলার কোন অর্থই হয় না। আমরা যেমন বলি তিনি পদার্থবিদ্, যিনি পদার্থবিদ্যা জানেন। আবার কেউ আছে রসায়নবিদ্, তিনি রসায়নশাস্ত্র জানেন। এই ভাবে ব্রহ্মবিদ্ কখন হয় না। ব্রহ্মবিদ্ মানেই তিনি ব্রহ্ম। এখন যত দিন পূর্ব কর্মের জোরে শরীর চলার চলবে কিন্তু তাঁর সব খেলা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে। যেদিন শরীরে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে সেদিন ঘটাকাশের ঘটটা ভেঙে যাবে আর ঘটের আকাশ মহাকাশে মিলিয়ে যাবে। এখানে পাওয়ার কিছু হচ্ছে

না। আপনি ব্রহ্ম জিনিষটাকে জেনে গেছেন, ঠাকুর বলছেন বোধে বোধ করেছেন, আমরা যে পুরো মুণ্ডকোপনিষদ উপর থেকে নীচে পড়ে পড়ে জানছি এই জানা নয়, বোধে বোধ মানে সাক্ষাৎ তিনি দেখছেন শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিচ্ছু নেই।

মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রটিকে অর্থবাদ বলা হয়। অর্থবাদ হল, যে কোন বিদ্যার একটা স্তুতি থাকে। কারণ যখনই মানুষ কোন বিদ্যা অর্জন করতে এগিয়ে আসে তখন তাকে বিদ্যার স্তুতি করে বিদ্যার প্রশংসা করে বলতে হয়। ছাত্রদের বলা হয় ভালো করে পড়াশোনা কর তাহলে বড় হয়ে চাকরী পাবি। বাচ্চাদের বলা হয় তুমি যদি দুধ খাও তাহলে তোমার চুল তাড়াতাড়ি বড় হবে কিংবা বলা হয় চন্দ্রিমা বাড়বে মানে ফর্সা হবে। ঠিক সেই রকম বিদ্যারও প্রশংসা করা হয়।

প্রশংসা করে বলছেন *নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি*। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর কুলে কখন কেউ *অব্রহ্মবিৎ* হয় না। এই লাইনটা যদি অর্থবাদ হিসাবে না দেখা হয় তাহলে এর ব্যাখ্যাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। ব্যাখ্যাটা এই কারণেই কঠিন হয়ে যাবে, যিনি ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী হন তাঁর কুল বলে কিছু থাকতে পারেনা। কারণ তার আগেই বলা হয়ে গেছে *ব্রহ্মচর্যং নিত্যম্*, সর্বদাই তিনি ব্রহ্মচারী। বিয়েথা করে সন্তান উৎপাদন করছে আবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে, এটা কখনই সম্ভব নয়। তিনি নিত্য ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত। যিনি নিত্য ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আর সন্তান কি করে হবে! আর সন্তান যদি তাঁর নাইই হল তাহলে কুল কোথা থেকে আসবে। মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যের প্রথম দিকেই আচার্য কিন্তু বলে দিচ্ছেন – বিদ্যার পরম্পরা বলতে এখানে এমন কয়েকজন ঋষিরর নাম বলা হয়েছে যাঁরা গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু শুধু নাম উল্লেখ করার জন্যই মুণ্ডকোপনিষদের এই বিদ্যা গৃহস্থদের জন্য হয়ে যাবে না, এই বিদ্যা একমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্যই। কারণ যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হন তাঁর দ্বারা আর কোন গৃহস্থ কার্য হবে না, অসম্ভব। এমন কয়েকজন আছেন যেমন ভগবান বুদ্ধ, তাঁর সন্তান হয়ে যাওয়ার পর তিনি সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এটা আলাদা ব্যাপার, তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না। ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলে তাঁর আর সন্তান হতো না। যেমন সেদ্ধ ধানকে মাটিতে রোপণ করলে আর গাছ হবে না। সেইজন্য ঠাকুর হলধারীকে খুব রেগে গিয়ে বলছেন 'এই তোর বেদান্ত জ্ঞান! আমারও আবার ছেলে হবে বলছিস্'! ব্রহ্মজ্ঞানীর নারীসঙ্গ কোন মতেই সম্ভব নয়, কোন প্রশ্নই হয় না। কারণ নিজের কথারই বিপরীত আচরণ হয়ে যাচ্ছে, কারণ আগেই বলে দিচ্ছেন নিত্য ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত।

নিত্য ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু এটাই নয়, কোন কিছুই হয় না। কোন কোন শাস্ত্রে গৃহস্থদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু কথা বলতে হয় বলে বলা হয়। পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চা যদি অতিথিকে এক গ্লাশ জল এগিয়ে দেয় তখন তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যেমন বলা হয় তুমি কি দারুণ কাজ করেছে, তুমি না থাকলে সত্যিই তো এই কাজ কে করত, ইত্যাদি। সংসারী মানুষের মাথার উপর এক মণ বোঝা তার মধ্যেও সে ঈশ্বর চিন্তা করছে, এখন একে নিরুৎসাহ করাটা কখনই উচিৎ কাজ হবে না। কিন্তু আসল জায়গায় এসে আটকে দেবে। যার জন্য যাঁরা কথামৃত খুব ভালো করে অধ্যয়ণ করেন তাঁরা দেখবেন, ঠাকুর পদে পদে বলছেন – যাঁরা ঈশ্বরের পথে এগোচ্ছে ঈশ্বর তাদের কাজ কমিয়ে দেন। হয়তো বাড়িতে কোন ভাই কিংবা উপযুক্ত দাদা আছে তিনি সংসারের দায়ীত্বটা নিজে তুলে নিলেন। কারণ ঘরের দায়ীত্ব তো একজনকে নিতে হবে। বাড়িতে বুড়ো বাবা-মা আছেন, তাঁদের দায়ীত্ব একজনকে তো নিতে হবে। সত্যিই যদি কারুর ভেতর জ্ঞানের স্পৃহা আসে প্রকৃতিই তাকে সন্ন্যাসী বানিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু জগৎ আর সমাজ এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সব কিছু আমার আজকেই চাই। টাকা-পয়সা? আজকেই চাই। গাড়ি বাড়ি? আজকেই চাই। বিয়ে? আজকেই চাই। ডিভোর্স? এক্ষুণি চাই। এরাই যখন শাস্ত্র পড়তে আসে তখন বলবে সব শাস্ত্র আমার আজকেই জানা চাই। আর ঈশ্বর দর্শনও আজকেই চাই। এভাবে শুধু ঈশ্বর দর্শন কেন, কোন কিছুই হয় না। কিন্তু চরম উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান একমাত্র সন্ন্যাসী ছাড়া হবে না। ভাগবতের রাসলীলাতে ঠিক এই ভাবটাই নিয়ে আসা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেরকে দিয়ে ঠিক এই কাজটা

করিয়েছিলেন। রাসলীলার অধ্যায়ে ব্যাসদেব যেখানে ঈশ্বরে পরাভক্তি কিভাবে হয় বর্ণনা করছেন, ঈশ্বরের প্রতি ওই ভালোবাসা হলে কিভাবে তাঁকে জানা যায়, সেখানে তিনি বলছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গোপীদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় সব সরিয়ে দিচ্ছেন। যার লজ্জা, ঘৃণা ভয় চলে গেল সে তো সন্ন্যাসীই হয়ে গেল, তার আর বাকী থাকল কি! এই গোপীরা তখন নিজের, বাবা-মা, স্বামী, সন্তান সবাইকে ছেড়ে চলে আসছেন। যাঁরা কোন কারণে ঘর থেকে বেরোতে পারছিল না, তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে চলে এসেছে। জগতের কোন দিকেই গোপীদের আর দৃষ্টি নেই, এটাই সন্ন্যাস। এই ভাব সম্পন্ন ব্যক্তিকে যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে গেরুয়া পরিয়ে দিচ্ছে সেই তখন সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের দ্বারা আর কোন কাজ হবে না। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, রাসলীলার পরে কি গোপীদের সন্তান হয়নি? অবশ্যই হয়েছে, কেন হবে না, না হওয়ার কিছু নেই। কারণ ব্যাসদেব এখানে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করে ইতিহাস লিখছেন না। ব্যাসদেব আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের একটা অত্যন্ত উচ্চমানের ভাবকে সাধারণ মানুষের কাছে রাসলীলার মাধ্যমে প্রকট করাচ্ছেন। ঈশ্বরের প্রতি কি রকম ভালোবাসা চাই? এই রকম। গোপীরা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিল, যেখানে নিজের যা কিছু প্রিয় সব কিছুকে ছেড়ে ভগবানের কাছে চলে আসছে। যত সামাজিক নিয়ম, বন্ধন আছে সব কিছুকে শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য ভেঙে তছনছ করে বেরিয়ে আসছে। সন্ন্যাসী মানে তাই, এছাড়া হয় না।

তাই বলছেন *নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি*। ব্রহ্মজ্ঞের তো কুলই নেই তাহলে কি করে হবে? সেইজন্য এটাকে অনেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের যাঁরা শিষ্যরা হন, তাঁদের কেউ অব্রহ্মবিৎ হন না। এনাদের শিষ্যরা কি লাইন দিয়ে সবাই যেমন দীক্ষা নিয়ে শিষ্য হচ্ছে সেই রকম শিষ্য নাকি? না, শিষ্য মানে শ্রীরামকৃষ্ণের নরেনের মত, রাখালের মত। বাকিরা 'শ্রীরামকৃষ্ণের চেলা প্রসাদ পাবার বেলা'। এখানে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত, নিবেদিত শিষ্যদের কথা বলা হচ্ছে – লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সমাজের যে কোন জিনিষের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে গুরুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। এই প্রকারের সমর্পিত শিষ্যরাও ব্রহ্মবিৎ হন। এই ধরণের শিষ্য পাওয়াও খুব কঠিন।

তরতি শোকং, তখন সমস্ত শোককে তিনি পার করে যান। শোক মানে, সমাজ ও পরিবারের মধ্যে মানুষ যখন বাস করে তখন অনেক কিছু তাকে সব সময় ঘিরে রাখে। এই জিনিষগুলো যখন তার জীবন থেকে হারিয়ে যায় তখন তার মনের মধ্যে একটা সন্তাপ উৎপন্ন হয়। যখন আমি কাউকে বা কোন বস্তুকে প্রচণ্ড ভালবাসছি তখন সেই ব্যক্তি বা বস্তুটি হল আমারই সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব। এইভাবে আমার বাড়ি, গাড়ি, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সবই আমার সম্প্রাসারিত ব্যক্তিত্ব। এই ধরণের কিছু যখন আমার জীবন থেকে বেরিয়ে যায় তখন মনে হবে আমার ব্যক্তিত্বটাই হারিয়ে গেল। তখন মানুষের শোক হয়। আমরা জানি বিষয়ীরা বিষয়ের জন্য শোক করে, কিন্তু ঠিক ঠিক শোক হয় মা যখন নিজের সন্তানকে হারায়। সন্তান মানে মায়ের শরীরের অঙ্গ, এখানে কোন সম্প্রাসারিত ব্যক্তিত্বও আসছে না, দশ মাস তার গর্ভে ছিল। ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয় যায় কিংবা মারা যায় মায়ের যে কি কষ্ট, এই কষ্ট মা ছাড়া আর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এটাকে বলে সন্তাপ। এই সন্তাপটা ব্রহ্মকে যিনি জেনে নিয়েছেন তাঁর হয় না, কোন কিছুতেই তাঁর আর কোন শোক হবে না। কারণ জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি তাঁর আর কোন আসক্তি থাকে না।

তরতি পাপ্পানাং, পাপ মানে জগতের ধর্ম। সংসারের ধর্ম মানে, সংসারে যে কোন ক্রিয়া বা কর্ম সবটাই পাপ। সংসারে পূণ্যটাও পাপ, ধর্মটাও পাপ সবটাই পাপ। কারণ, যেখানেই দ্বন্দ্বাত্ম কিছু সেখানেই পাপ। আচার্য বলছেন *তরতি পাপ্পানাং ধর্মাধর্মাখ্যম্*, ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক দুটোকেই তিনি পার করে যান। উচ্চতম ব্রহ্ম তত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্মটাও বন্ধন, তবে সত্ত্বগুণের বন্ধন আর অধর্ম রজোগুণ আর তমোগুণের বন্ধন। গীতাতে ভগবান বলছেন *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সুখ আর জ্ঞান এই দুটো সত্ত্বগুণীকে বাঁধে। যাদের প্রচণ্ড খুঁতখুঁতানি থাকে, সকালে মন্দিরে না গেলে সে আর কোন কাজেই মন লাগাতে পারবে না, ছুচিবাঈগ্রস্ত, এই ধরণের ভাব যাদের মধ্যে খুব প্রবল এরা কিন্তু প্রকারন্তরে ফেঁসে আছে, ধর্মের মধ্যে বেঁধে

গেছে। সেইজন্য আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা বড় বড় পণ্ডিত হতেন কিন্তু জ্ঞানী হতে পারতেন না, কারণ ওই ধর্মাচরণের মধ্যেই ফেঁসে থাকতেন।

গুহাগ্রন্থিভ্যো, মানুষের হৃদয়ের যে গ্রন্তিগুলো মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে, সেই গ্রন্থিগুলো তাঁর খুলে যায়। আমরা এর আগে *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি* যখন আলোচনা করেছিলাম সেখানে এই ব্যাপারে অনেক বিশদ ভাবে বলা হয়েছে। *বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি*, সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে তিনি অমৃত মানে অমরণধর্মী হয়ে যান। কিভাবে অমর হন? শুধু আমি কে এইটা জেনে নিলে, আমি সেই ব্রহ্ম। নিজেকে জেনে নেওয়ার ফলস্বরূপ পর পর এই জিনিষগুলো তাঁর হয়ে যায়। এখানেই মুণ্ডকোপনিষদ শেষ হয়ে যায়। দশ আর এগারো নম্বর মন্ত্র হল এই উপনিষদের উপসংহার। দশ নম্বর মন্ত্রে ঋকবেদের একটি মন্ত্রকে নিয়ে আসা হয়েছে, একে ঋচাও বলা হয়, ঋচা মানেই ঋকবেদের মন্ত্র।

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্ - ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্।।৩/২/১০।।

(যাঁরা যথাশাস্ত্র কর্মপরায়ণ, বেদাভ্যাস্কারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাসহকারে একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতিদানকারী এবং যাঁরা যথাশাস্ত্র শিরোব্রত (মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত) অনুষ্ঠান করেন, তাঁদেরকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলবে।)

ঋষি তাঁর শিষ্যকে এই বিদ্যা দান করে শিষ্যকে আবার সাবধান করে দিচ্ছেন পরবর্তি কালে এই মন্ত্র তুমি কাকে কাকে বলবে। সবাইকে এই বিদ্যার কথা বলতে যাবে না। এই বিদ্যা অত্যন্ত গুহ্যবিদ্যা তাই সবাইকে বলতে নেই। তাহলে কাকে কাকে বলা যাবে? যে *ক্রিয়াবন্তঃ*, ক্রিয়াবন্ত বলতে বোঝাচ্ছেন যাঁরা কর্মানুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞাদি করেছেন, যে কর্ম মানুষকে শুদ্ধ পবিত্র করে। এনাদের প্রথম থেকে ধরাই ছিল দ্বিজ ছাড়া আর কারুর যজ্ঞাদি করার ক্ষমতা নেই। আর বাচ্চা বয়স থেকে যারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করেছে, বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে যারা নিঃস্বার্থপূর্বক কর্ম করে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করেছে, মনকে সংযত করেছে। এটা হল প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত *শ্রোত্রিয়া*, শ্রোত্রিয় মানে যিনি বেদ অধ্যয়ণ করেছেন এবং বেদের প্রতিপাদ্যের মনন-চিন্তন করেছে। যারা বেদ অধ্যয়ণ করেনি, শাস্ত্রাদি পাঠ করেনি, এদেরকে এই বিদ্যা কোন মতেই বলতে যাবে না, এদের জন্য এই বিদ্যা নয়। তার মানে, যাঁরাই আধ্যাত্মিক জীবনচর্চা করেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাইছেন তাঁদের জন্য প্রথম কর্তব্য হল কাজকর্ম করে নিজের দেহ-মনকে একেবারে পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করতে হবে।

যারা নোংরা কাজ করে বেড়ায়, যারা ভোগ প্রবৃত্তির মধ্যে নিমজ্জ তাদের দ্বারা এই বিদ্যা হবে না। সমাজে যারা কামিনী-কাঞ্চনের পিছনে দৌড়াচ্ছে এদের জন্য এই বিদ্যা নয়। নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে যারা কিছু কাজ করেছেন, এদের ছাড়া এই বিদ্যা অর্জন হবে না। এর সাথে তাঁকে শ্রোত্রিয় হতে হবে, শ্রোত্রিয় মানে এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন বেদ তোমাকে অধ্যয়ণ করা চাই। এখন বেদের বক্তব্য অর্থাৎ বেদ যা বলতে চাইছে, বেদের প্রতিপাদ্য যে সমস্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেই ধরণের শাস্ত্রও যদি ঠিক ঠিক অধ্যয়ণ করে থাকেন তাহলেও তিনি শ্রোত্রিয়।

ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, অপর ব্রহ্মে যিনি লেগে আছে আর পরব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছুক। তার মানে, ঈশ্বরের উপাসনা যিনি করেন। আচার্য এখানে ব্রহ্মনিষ্ঠের পরিভাষার ব্যাখ্যা করছেন – *অপরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যভিযুক্তাঃ*, অপর ব্রহ্ম মানে, ঠাকুর বলুন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র বলুন, শিব বলুন, মাকালী বলুন এঁদের যে কোন একজনের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তি আছে। এবার তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে তৎপর হতে চাইছেন। একনিষ্ঠ ভক্তির জন্য আগে থাকতেই তাঁর একটা প্রস্তুতি হয়ে আছে। এখানে তিনটে জিনিষের কথা বলছেন – কাজের দিক থেকে তিনি পবিত্র, জ্ঞানের

দিক থেকে তিনি পবিত্র অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেছেন আর শেষে তাঁর ধ্যান পবিত্র। ঠাকুর যখন মাকালীর সাধনা করে মাকালীর দর্শন পেলেন তখন তাঁর অপর ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়ে গেছে এরপর তোতাপুরী এসে ঠাকুরকে বেদান্তের শিক্ষা দিচ্ছেন। যদিও ঠাকুর স্বামীজীর ক্ষেত্রে এই জিনিষগুলো প্রযোজ্য নয়, তবে উপমা রূপে জিনিষটাকে বোঝাবার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যিনি কর্মশুদ্ধি, জ্ঞানশুদ্ধি আর ধ্যানশুদ্ধি, এই তিনটে যাঁর শুদ্ধি হয়ে গেছে একমাত্র তাঁকেই এই বিদ্যা বলা যায়। এই তিনটের মধ্যে একটিতেও যদি কম থাকে তাহলেও তাঁর এই বিদ্যা লাভ হবে না। কারণ এই বিদ্যাকে তারা ধরতেই পারবে না। এত লোক চারিদিকে কত শাস্ত্রের আলোচনা শুনছে কিন্তু কোন প্রভাব পড়ছে না কেন? শুনলেই তো জ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। কারণ কর্মশুদ্ধি নেই, যদি কর্মশুদ্ধি থাকে তো জ্ঞানশুদ্ধি নেই, কারণ একদিকে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে যাচ্ছেন অন্য দিকে ঈশ্বরের ধারণাই স্পষ্ট হয়নি, যার জন্য ধ্যান ধারণাও নেই। এই তিনটে না হলে হবে না, সেইজন্য প্রথমেই বলছেন তুমি বলবেই না। যারা তোমার কাছে আসবে তাদের সঙ্গে খোশগপ্প করে হাসি মজা করে মানে মানে বিদায় করে দাও।

এই তিনটে *ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ*, এটা আবার মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্র নয়, ঋকবেদের মন্ত্র। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের শর্ত লাগিয়ে দেওয়া থাকে। আবার যেখানে ভক্তির ভাব সেখানে সব কিছুর ছাড় দিয়ে দেওয়া হয়, স্বামীজী ঠাকুরের নামে বলছেন *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ*, চণ্ডাল থেকে শুরু করে সবার প্রতি ঠাকুরের প্রেমপ্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে সমান ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু সবারই তো জ্ঞান, ভক্তি হচ্ছে না। না হওয়ার কারণ – এই তিনটে শর্ত, এই শর্তগুলো পূরণ না করলে হবে না। ঠাকুরের কথা শুনলে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি একটু বাড়বে, সেও একটু জীবনে এগিয়ে যাবে, এতে ক্ষতি তো তার কিছু হচ্ছে না। কিন্তু গুরু যদি চান আমার এই বিদ্যার ঠিক ঠিক প্রসার লাভ হোক, তাহলে এই তিনটে শর্ত থাকতে হবে – *ক্রিয়াবন্তঃ*, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করেছে, *শ্রোত্রিয়া*, বেদ অধ্যয়ণ করেছে আর *ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ*, সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করেছে।

শুধু এই তিনটে শর্ততেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বলছেন *স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ*। বেদের সময় একর্ষি নামে একটা যজ্ঞ ছিল, যেটা একা একা করতে হত, একা একা থাকতেন এবং একা একাই যজ্ঞ করতেন, পাঁচজনকে জড়াতেন না। বলছেন যিনি এই একর্ষি যজ্ঞে লেগে আছেন, এখানে আমরা এখনকার ভাষায় বলতে পারি ঠাকুরের প্রতি যাঁর ভক্তি আছে আর যিনি নির্জনে, গোপনে প্রচুর জপ-ধ্যান করে যাচ্ছেন। *তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত*, এই ধরণের লোককেই এই বিদ্যা বলবে, যাকে তাকে বলতে যাবে না। *শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্*, বলছেন যিনি শিরোব্রত নামে যজ্ঞ করেছেন। এই যজ্ঞ গুলো এখন উঠে গেছে, বেদের সময় ছিল মাথার উপর আগুন রেখে একটা যজ্ঞ করা হত। এখন যেমন সন্ন্যাসের সময় হোমাদি করতে হয়, এই রকম যিনি শিরোব্রত করছেন। মাথার উপর আগুন কিভাবে রাখা হত এখন জানার উপায় নেই, কারণ এগুলো ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গেছে। অনেক ভাষ্যকার, যাঁরা মুণ্ডকোপনিষদের উপর ভাষ্য লিখছেন, তাঁরা অনেক সময় বলেন, মুণ্ডকোপনিষদ হল অথর্ব বেদের অন্তর্গত, তাই যাঁরা অথর্ববেদের পরম্পরাতে এই বিদ্যা গ্রহণ করতে যেতেন তাঁদের জন্যই এই শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু মূল কথা হল তোমার এই তিনটে জিনিষের শুদ্ধি হয়েছে কিনা। ইন্দ্রিয়শুদ্ধি, মনশুদ্ধি আর অন্তঃশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হয় কর্ম দিয়ে, মনশুদ্ধি হয় শাস্ত্র দিয়ে আর অন্তঃশুদ্ধি হয় ধ্যান দিয়ে। এই তিনটে শুদ্ধি ঠিক ঠিক যদি না হয়ে থাকে তাহলে কদিন পরে তার স্খলন হয়ে যাবে। শেষে বলছেন –

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ। নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।।৩/২/১১।।

(অঙ্গিরা ঋষি সেই সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। যে চীর্ণব্রতের অনুষ্ঠান করেনি সে এই গ্রন্থ পাঠ করবে না। পরম ঋষিদের নমস্কার, পরম ঋষিদের নমস্কার।)

শৌনক ঋষি অঙ্গিরার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাকে বলুন কোন জিনিষটা জানলে সব কিছুকে জানা যায়। তখন ঋষি অঙ্গিরা এই বিদ্যা শৌনককে বলেছিলেন। যদি কোন মোক্ষকামী মানুষ আসে গুরু যেন সত্য স্বরূপ এই বিদ্যার কথা তাকে বলেন। অতীতে অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে এই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলেছিলেন। তবে *নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে*, যারা ওই শিরোব্রত যজ্ঞাদি করেনি তাদেরকে এই বিদ্যা বলবে না। সেইজন্য প্রথম থেকেই মুণ্ডকোপনিষদকে বলা হয় এই গ্রন্থ একমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য। অথর্ববেদের পরম্পরায় যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁদের জন্য বলছেন যাঁরা *অচীর্ণব্রত*, মাথার উপর অগ্নিধারণ ব্রত যে করেনি তারা হল অযোগ্য অধিকারি, এদের জন্য এই উপনিষদ পঠনীয় নয়। এখন যেমন বলা হয় সন্ন্যাসী ছাড়া মুণ্ডকোপনিষদ কাউকে বলবে না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা শুধু মুণ্ডকোপনিষদের ক্ষেত্রেই নয়, বাকি সব উপনিষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন উপনিষদই সাধারণ লোকেদের জন্য ছিল না। শুধু ব্রাহ্মণ হলেও উপনিষদ বলা যাবে না, বহির্জগতের কোন কিছুর দিকে যাদের আর দৃষ্টি নেই একমাত্র তাদের জন্যই উপনিষদ। আবার এটাও বলা হচ্ছে, যাদের মধ্যে এই উপরোক্ত গুণগুলো আছে তাদেরকেই এই বিদ্যা ফল দেবে, তা নাহলে এই বিদ্যা কোন ফল দেবে না। তার মানে যার কোন ধরণের শুদ্ধি নেই, মন, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, কোন কিছুরই শুদ্ধি নেই তারা ইচ্ছে করলে এই বিদ্যা শুনতে পারে, শুনলে ক্ষতি তো কিছু হবে না কিন্তু ফল দেবে না। ক্ষেত যদি তৈরী না থাকে, লাঙল চালানো হয়নি, মাটি নরম করা হইনি শুধু বীজগুলো ফেলে গেছেন, তাতে কিছুই হবে না। যার জমি সব দিক থেকে তৈরী তার জমিতেই ফসল ফলবে।

সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা, এই যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা এত দিন ধরে চলছিল এখানেই সমাপ্ত হল। এই বিদ্যা পরম্পরা বিদ্যা, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে এত যুগ ধরে চলে আসছে সবটাই পরম্পরা ধরে আজ এখানে এসেছে। সেইজন্য পরম্পরার ঋষিদের সম্মান জানানো জন্য বলছেন *নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ*। ব্রহ্মা থেকে এই বিদ্যা আরম্ভ হয়েছে, সেখান থেকে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত এসেছে, আজকে ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারায় এসে আমরাও মঠের সন্ন্যাসীদের মুখ থেকে এই বিদ্যাকে শ্রবণ করলাম। এই পরম্পরা বিদ্যাকে ধারণ করে আছেন ঋষিরা সেইজন্য সম্মানার্থে বলছেন ব্রহ্মাদি যাঁরা পরম ঋষি, যাঁরা এই বিদ্যাকে লাভ করেছিলেন, যাঁরা পরম্পরাতে এই বিদ্যাকে এগিয়ে দিলেন সবাইকে প্রণাম করে বলছেন *নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ*।

।।সমাপ্তেয়ং মুণ্ডকোপনিষৎ।।

।।ওঁ তৎ সৎ ওঁ।।

।।ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।।